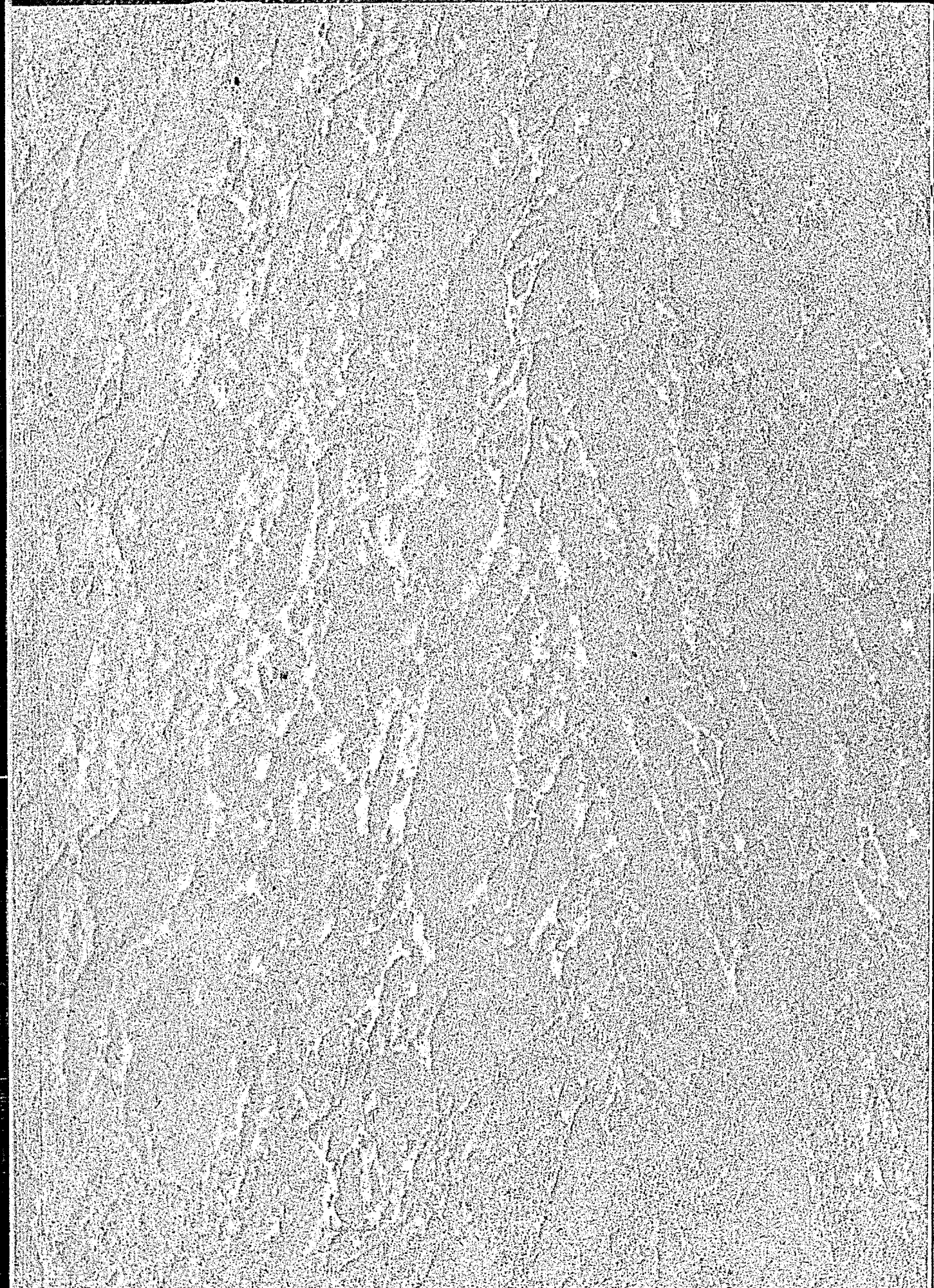


কবির এবং আতাউর রহমান প্রতিষ্ঠিত

চতুরঙ্গ

বর্ষ ৬৫ সংখ্যা ১-২ কার্তিক-চৈত্র ১৪১২

র সামন্ত-র গবেষণাভিত্তিক নিবন্ধ—
ান্দোলনে ভদ্রলোক নেতৃত্ব ঃ সাফল্য
'—বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলনের
ন সরকারি নথিপত্রের ব্যাপক
ার ভিত্তিতে হিন্দু বাঙালি
দর ভূমিকার বিচার।

শের মহাফেজখানা থেকে আহরিত
া তথ্যের ভিত্তিতে নেতাজির অন্তর্ধান
৪৬-এর ঘটনাবলির উপর নতুন
ত করেছেন রুশ ভাষাবিদ পূরবী রায়।

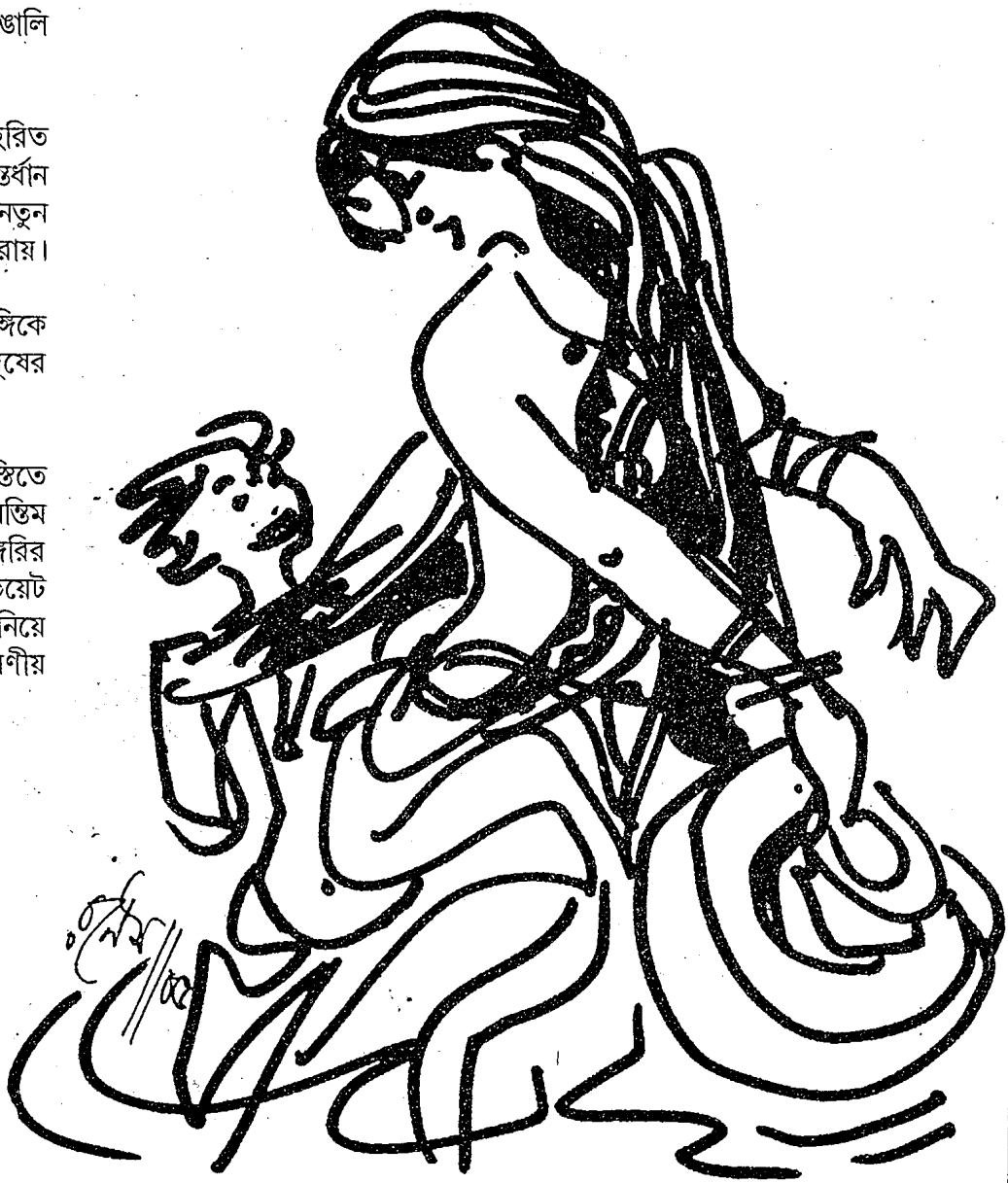
র্তী তাঁর প্রবাদপ্রতিম ভাষা ও আঙ্গিকে
কয়েকজন খেটে খাওয়া মানুষের
জীবনের চমকপ্রদ আখ্যান।

র রাঙা ধুলায়'—এবারের কিস্তিতে
জননেতা হকসাহেবের অন্তিম
জীবনের অজানা কাহিনি। হাঙ্গেরির
ন ও জয়প্রকাশ নারায়ণ। সোভিয়েট
পার্টির ২০তম কংগ্রেস নিয়ে
ও হাওয়ার্ড ফাস্টের অবিস্মরণীয়
ডিসিশন'।

চৌধুরীর 'আমার সময়ের
বারের মুখ্য আকর্ষণ কাছের
তিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়।

রর রবীন্দ্রনাথ'—স্বপন
'স্বাধীনতা-পরবর্তী অসমিয়া
আশিস সান্যাল।

চনায়—শেরে বাংলা ফজলুল
বীন্দ্র কুমার দাশগুপ্ত,
দীন খান প্রমুখ ব্যক্তিত্ব প্রসঙ্গ।



WITH BEST COMPLIMENTS :

"TO BUILD A BETTER TOMORROW D.T.M OFFERS
A WIDE RANGE OF CIVIL ENGINEERING AND
DREDGING & DISILTING SERVICES UNDER ONE ROOF"

SPECIALISED IN THE CONSTRUCTION AND ERECTION OF :—

- MATERIAL HANDLING PLANTS
- LPG BOTTLING PLANTS
- 400 KV SUBSTATION & SWITCHYARD FOUNDATION
- MULTISTORIED BUILDING
- HOUSING COMPLEXES
- BRIDGE & ROADS
- FACTORY BUILDING & SHEDS
- GAS TURBINE PROJECTS
- MANUFACTURING OF PRE-STRESSED CONCRETE POLES
- DREDGING OF LAKES, CANALS, WATER RESERVOIR & RIVER BEDS
- HEAVY EQUIPMENTS FOUNDATION

D. T. M. CONSTRUCTION (INDIA) LIMITED

CIVIL/STRUCTURAL ENGINEERS and MASTER DREDGERS

Registered Office :

59B, CHOWRINGHEE ROAD, (3RD FLOOR)
CALCUTTA-700 020
PHONE : 2283 2538
TELE FAX : 22832545

35 Years' Dedicated Service to the Nation

চতুরঙ্গ

বর্ষ ৬৫ সংখ্যা ১-২
কার্তিক-চৈত্র ১৪১২

প্রবন্ধ

স্বদেশি আন্দোলনে ভদ্রলোক নেতৃত্ব ঃ
সাফল্য ও ব্যর্থতা — অমিয়কুমার সামন্ত — ৯

আখ্যান

বেঁচে থাকার বৃত্তান্ত — সুধীর চক্রবর্তী — ১৭

কবিতা ৩৩-৪০

অমিতাভ দাশগুপ্ত ❖ বিজয়া মুখোপাধ্যায় ❖ চৈতালী চট্টোপাধ্যায়
পার্থপ্রতিম মজুমদার ❖ মোহন সিংহ ❖ মানসকুমার চিনি
মংশুমান কর ❖ অনুরাধা মহাপাত্র

প্রবন্ধ

নেতাজির অন্তর্ধান ঃ ১৯৪৬-এর ঘটনাবলি—
নতুন আলোকপাত — পূরবী রায় — ৪১

ছোটগল্প

পাপবিদ্ধ — দিলীপ ভট্টাচার্য — ৪৬

ধারাবাহিক স্মৃতিচারণ

আমার সময়ের কথা — ননীমাধব চৌধুরী — ৫১
রাঙা পথের রাঙা ধুলায় — সুখরঞ্জন সেনগুপ্ত — ৬৪

সাহিত্য-সমাজ-সংস্কৃতি

নন্দশঙ্করের রবীন্দ্রনাথ — স্বপন মজুমদার — ৭৭
স্বাধীনতা-পরবর্তী অসমিয়া কবিতা — আশিস সান্যাল — ৮১

গ্রন্থসমালোচনা ৮৭-১০১

বিশ্বেশ্বর সেনগুপ্ত ❖ চিন্ময় গুহ ❖ চিত্ততোষ মুখোপাধ্যায়
মুজাদ হোসেন ❖ সৌমিত্রশঙ্কর সেনগুপ্ত ❖ বুলবুল আহমেদ

চলচ্চিত্রসমালোচনা

৯শ কলকাতা চলচ্চিত্র উৎসব ঃ দ্য কোরাস — মেঘ মুখোপাধ্যায় — ১০২

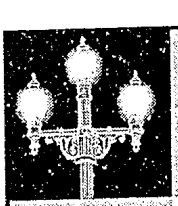
সম্পাদক : আবদুর রাউফ

শিল্পপরিকল্পনা : রণেন আয়ন দত্ত

সম্পাদনা সহকারী : মেঘ মুখোপাধ্যায়

উপদেষ্টামণ্ডলী
শঙ্খ ঘোষ
দেবব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়
সুখরঞ্জন সেনগুপ্ত
রণেন আয়ন দত্ত
তৃষার তালুকদার

শ্রীমতী নীরা রহমান কর্তৃক ক্রান্তি প্রেস ৩৭ রিপন স্ট্রীট,
কলকাতা-১৬ থেকে মুদ্রিত এবং ৫৪ গণেশচন্দ্র অ্যাভিনিউ, কলকাতা-১৩ থেকে প্রকাশিত
অক্ষর বিন্যাসে ক্রান্তি প্রেস ● ৩৭ রিপন স্ট্রীট, কলকাতা-১৬




অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর


আশুতোষ মুখার্জি


উত্তমকুমার


কাজী নজরুল




হেমন্ত মুখার্জি


সিস্টার নিবেদিতা


সি ভি রমন


সত্যেন বোস


সত্যজিৎ রায়


শরৎচন্দ্র


রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর


যামিনী রায়


কানন দেবী


কার্জন

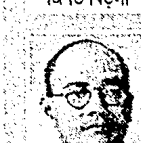

গওহর জান


গিরীশ ঘোষ


চিত্তরঞ্জন দাশ


জগদীশচন্দ্র বোস


জি ডি বিড়লা


নেতাজী সুভাষচন্দ্র

CESC LIMITED

১৮৯৯ ১৯৯৯

১৮৯৯ সালের ১৭ এপ্রিল এই শহরে দেশের প্রথম তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপিত হয়। বিশ শতকের কলকাতায় যাঁদের সেবা করে আমরা ধন্য হয়েছি তাঁদের তালিকা দীর্ঘ।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর থেকে স্বামী বিবেকানন্দ; দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ থেকে নেতাজী সুভাষ চন্দ্র বসু; গিরীশচন্দ্র ঘোষ থেকে উত্তমকুমার; গওহরজান থেকে হেমন্ত মুখার্জি; অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর থেকে যামিনী রায়; জগদীশচন্দ্র বোস থেকে সি ভি রমন এবং সত্যেন বোস; আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় থেকে জি ডি বিড়লা; প্রমথেশ বড়ুয়া এবং কানন দেবী থেকে সত্যজিৎ রায়; সিস্টার নিবেদিতা থেকে মাদার টেরিজা ঃ শতবর্ষেরও বেশি সময় ধরে কলকাতা এই খ্যাতনামাদের আলোয় আলোকিত।

১৮৯৯ সালে মাত্র ১ মেগাওয়াট থেকে শুরু করে কলকাতায় বিদ্যুতের চাহিদা বেড়েই চলেছে। এখনও পর্যন্ত সর্বোচ্চ চাহিদা ১২৮১ মেগাওয়াট। নগরবাসীদের উন্নততর পরিষেবার জন্য সিইএসসি-র বিদ্যুৎ উৎপাদন দ্বিগুণ করা হয়েছে। ভবিষ্যতের চাহিদা মেটাতে সিইএসসি আরও নতুন পরিকল্পনা নিয়েছে।

১৮৯৯তে সিইএসসি ছিল এ দেশের প্রথম তাপবিদ্যুৎ কোম্পানি। একুশ শতকে সিইএসসি হতে চায় ভারতবর্ষের সেরা বিদ্যুৎ প্রতিষ্ঠান।

RPG

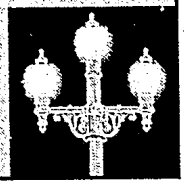



মাদার টেরিজা


বিবেকানন্দ


প্রমথেশ বড়ুয়া


প্রফুল্লচন্দ্র রায়



With best compliments from :

BESCO LIMITED

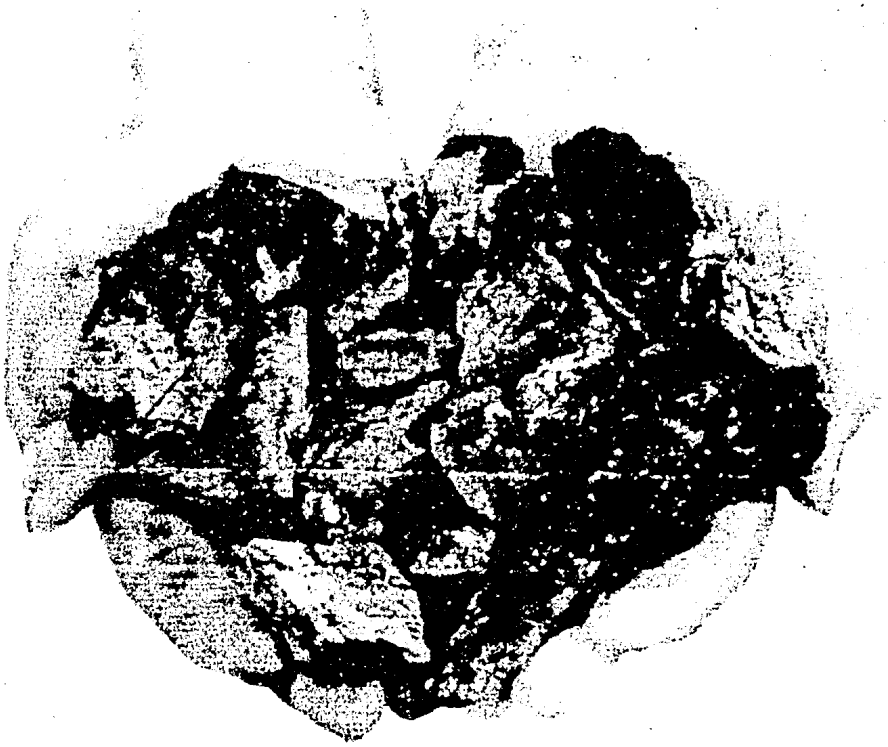
STEEL FOUNDERS TO THE NATION

RAILWAY EQUIPMENT BUILDERS

Works & Head office :
8, Anil Maitra Road, Ballygunge,
Calcutta 700 019
Phone : (91) (33) 2440 6364/ 6365/4666
Fax : (91) (33) 2440 4075

Designer, Manufacturer and Exporter of Cast Steel Bogies for Freight Cars, High Tensile Centre Buffer Couplers, Friction Draft Gears, Austenitic Manganese Steel Crossing for Railway Permanent Way and Railway Wagons. We also cater to the needs of Defence,Mining, Steel Plants, Thermal Power Plants, Ship Building & Heavy Engineering Industry.

Product range includes carbon, low alloy and high Manganese Steel castings to International specification viz. JUS, GOST, DIN, ASTM, BS etc. A single piece may weigh from 100 Kgs. to 5,000 Kgs.



EMTA GROUP of Companies,
a multi-business conglomerate
and having core competence
in captive coal mining
for the thermal power stations
across the country

THE POWER BEHIND POWER

EMTA Group of Companies

Kolkata: 801 Central Plaza, 2-6, Sarat Bose Road, Kolkata 700 020. Ph : 033 2485 8510/ 2485 8559. Fax : 033 2485 8513. e-mail : emta@cal2.vsnl.net.in
Delhi: 6 Poorvi Marg, Vasant-Vihar, New Delhi 110 057. Ph : 011 5107 5107. Fax : 011 5166 2808. e-mail : emta@mdc.vsnl.net.in
Bangalore: 301 Regency Enclave, 4 Magrath Road, Bangalore 560 025

SPS:Emta:05

With Best Compliments from :



Cookme Spice Powder



Krishna Chandra Dutta (Spice) Pvt. Ltd.

235, Maharshi Debendra Road

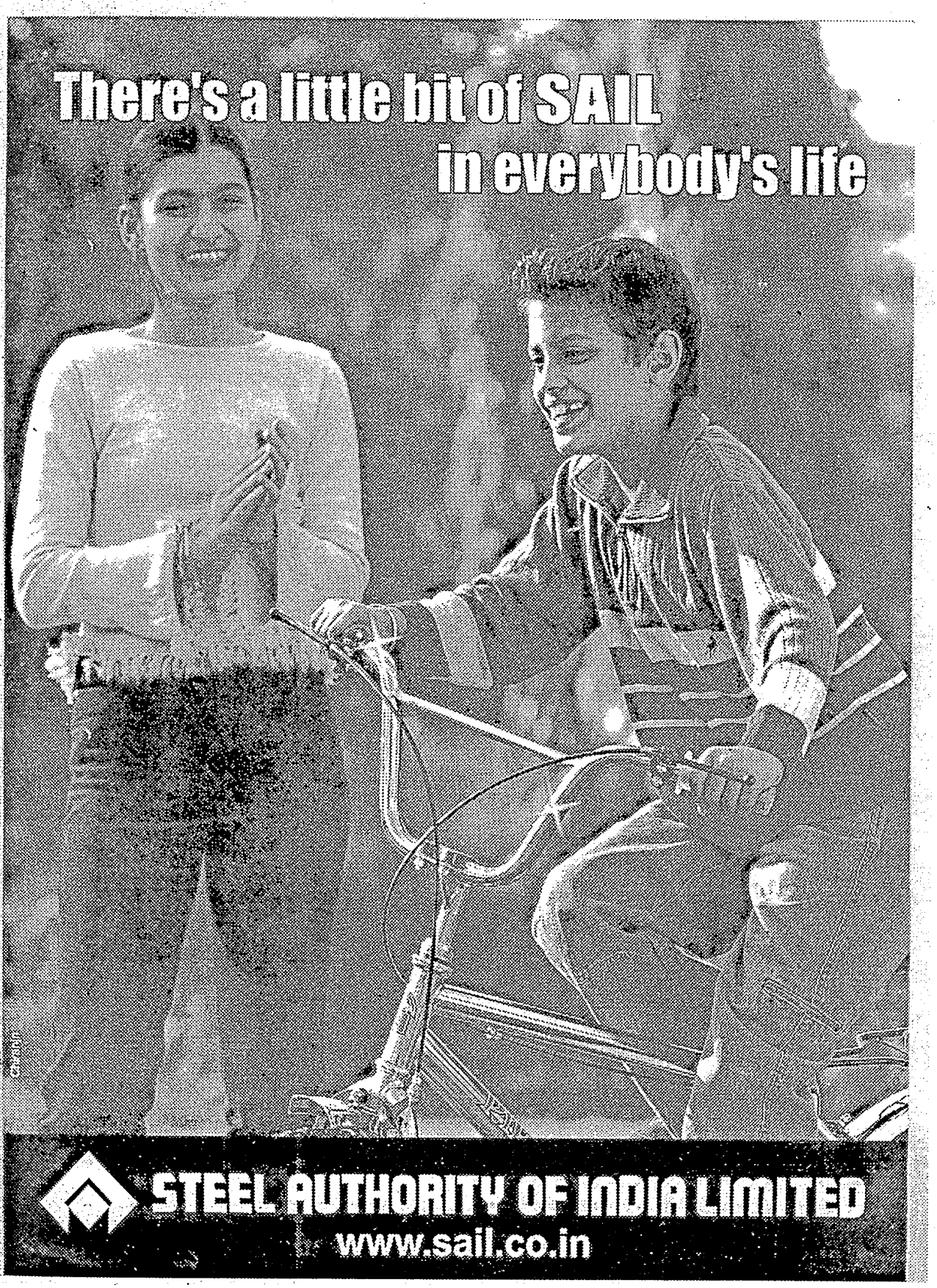
Kolkata-700 007

TEL : 2259-8432

A

WELL

WISHER


There's a little bit of SAIL
in everybody's life
STEEL AUTHORITY OF INDIA LIMITED
www.sail.co.in

নতুন অধ্যায়ের যাত্রা শুরু

সুবর্ণ জয়ন্তী বর্ষ

(১৯৫৫–২০০৫)



১৯৫৫ থেকে ২০০৫, দীর্ঘ ৫০ বছর ধরে পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য বিদ্যুৎ পর্ষদ দেশবাসীর সেবায় নিয়োজিত।

প্রায় ৫০ লক্ষ বিদ্যুৎ গ্রাহক, অগণিত শুভানুধ্যায়ী ও জনগণের শুভেচ্ছা পাথেয় করে সুবর্ণ জয়ন্তী বর্ষে উন্নততর বিদ্যুৎ পরিষেবাই আমাদের আগামী দিনের অঙ্গীকার।

আলোকোজ্জ্বল পশ্চিমবঙ্গের স্বপ্ন সফল করতে আমরা আপনাদের সহযোগিতা চাই।

পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য বিদ্যুৎ পর্ষদ

বর্ষ ৬৫ সংখ্যা ১-২ চতুরঙ্গ কার্তিক-চৈত্র ১৪১২

প্রবন্ধ

স্বদেশি আন্দোলনে ভদ্রলোক নেতৃত্ব ঃ সাফল্য ও ব্যর্থতা

অমিয়কুমার সামন্ত

স্বদেশি আন্দোলনের শুরু থেকে ১৯০৭ সালের প্রথম ভাগ পর্যন্ত আন্দোলনে মুসলমানদের অংশগ্রহণ খুব নগণ্য ছিল না। শিক্ষিত শহরবাসী ব্যারিস্টার আবদুল রসুলের মতো মুসলমান, রঙপুরের ভূস্বামীদের অনেকে এবং মুসলমান সম্প্রদায়ের কংগ্রেসি রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত ক্ষুদ্র অংশটি বঙ্গভঙ্গ বিরোধী ও স্বদেশি আন্দোলনের সমর্থক ছিলেন। কিন্তু সরকারি নথিপত্রে মুসলমানদের অংশগ্রহণকে নগণ্য করে দেখানোর একটা সচেতন প্রয়াস লক্ষ করা যায়। এই প্রয়াস অবশ্য ঔপনিবেশিক সরকারের দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টির নীতির সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ। সামাজিক ও ধর্মীয় স্তরে হিন্দু ও মুসলমানদের মধ্যে বিভেদের গভীরতা এবং সেই বিভেদকে রাজনৈতিক দ্বন্দ্বের স্তরে আনতে পারলে যে সুবিধা তা উপলব্ধি করেই ইংরেজ সরকার তাদের নীতি নির্ধারণ করেছিল। আন্দোলনের শুরু থেকেই নানাভাবে ব্রিটিশ প্রশাসকরা মুসলমানদের মতিগতি প্রভাবিত করার চেষ্টা করেছে। এ বিষয়ে ঔপনিবেশিক রাষ্ট্রের ঘোষিত নিরপেক্ষ নীতির কোনও তোয়াক্কা করেনি। কার্জন ১৯০৪ সালে তাঁর ঢাকা বক্তৃতায়,[১] হার্বার্ট রিশলে তাঁর কথাবার্তায় প্রচ্ছন্ন উস্কানি দিতে দ্বিধা করেননি। কিন্তু ১৯০৫ সালের ১৬ই অক্টোবর পূর্ববঙ্গ ও আসাম নামে নতুন প্রদেশ গঠিত হওয়ার পর, ওই প্রদেশের গুরুত্বপূর্ণ শাসনকর্তাদের অনেকেই এ বিষয়ে বেশ একদেশদর্শী হয়ে পড়েছিলেন তা সরকারি নথিপত্র থেকেই বোঝা যায়।[২] নবগঠিত পূর্ববঙ্গ ও আসাম প্রদেশের গোয়েন্দা বিভাগের প্রধান ছিলেন ই. সি. স্টুয়ার্ট বেকার। প্রাদেশিক সরকার ভারত সরকারের নিকট যে পাক্ষিক প্রতিবেদন[৩] পাঠাত তাতে স্টুয়ার্ট বেকারের রিপোর্টগুলিই গুরুত্ব পেত; বস্তুতপক্ষে বেশিরভাগ সময় চিফ সেক্রেটারির রিপোর্ট স্টুয়ার্ট বেকারের রিপোর্ট থেকেই সংকলিত হত।[৪]

বঙ্গভঙ্গের এক বৎসর পূর্ণ হওয়ার দিনে আরও ব্যাপকভাবে প্রতিবাদ সভা করার পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছিল। পূর্ববঙ্গের প্রাদেশিক সরকারের পরিসংখ্যান অনুসারে বঙ্গভঙ্গের বিরুদ্ধে মিটিং হয়েছিল মোট ৮৩টি এবং সমর্থনে মুসলমানদের মিটিং হয়েছিল মোট ৩৭টি। মিটিঙের সংখ্যা যেহেতু বঙ্গভঙ্গের বিরোধিতা প্রমাণ করছে তাই স্টুয়ার্ট বেকার মিটিঙের জনসমাবেশের ভিত্তিতে বঙ্গভঙ্গের বিরোধিতা বিচার করলেন। দেখা গেল বঙ্গভঙ্গের বিরুদ্ধে মিটিংয়ে মোট জনসংখ্যা ছিল ২৮,৮৭০, আর বঙ্গভঙ্গের সমর্থনে জনসংখ্যা ছিল ৫০,৫৮০ জন। স্টুয়ার্ট বেকার বললেন যে মুসলমানদের মিটিং হয়েছিল জেলা শহরে আর বঙ্গভঙ্গের বিরুদ্ধে হিন্দুদের মিটিং হয়েছিল প্রত্যন্ত এলাকায় ("holes and corners")। যদিও জেলা ও মহকুমা শহরগুলিতেই হিন্দুর সংখ্যা ছিল বেশি। কিন্তু এতেও সন্তুষ্ট হলেন না স্টুয়ার্ট বেকার। তাঁর কথায় থানা, মহকুমা থেকে যে রিপোর্ট আসে সেই রিপোর্টে লোকসংখ্যা ঠিক মতো দেখানো হয়নি। তাঁর মতে বঙ্গভঙ্গ-বিরোধী মিটিংয়ে লোকসংখ্যা ২৫ হাজারের বেশি নয়; সমর্থনে যে মিটিং হয়েছিল, তাতে হয়েছিল অন্তত ৭৫ হাজার।[৫] মজার কথা হল, চিফ সেক্রেটারি একথা মেনে নিলেন এবং ভারত সরকারের নিকট সেই ভাবেই রিপোর্ট দিলেন। স্টুয়ার্ট বেকার স্পষ্টই জানালেন যে, প্রশাসনের নীচের স্তরের বেশির ভাগ কর্মচারী হিন্দু, তাই তাদের রিপোর্ট বিশ্বাসযোগ্য নয়।[৬] সামান্য বিচ্যুতির জন্য পুলিশ অফিসারদের শাস্তিও দেওয়া হয়েছে। লবণ দোকানে পিকেটিংয়ের ঘটনা ঠিক মতো রিপোর্ট করেনি বলে বরিশালের নাজিরপুরের সাব-ইন্সপেক্টর শরৎ ঘোষকে শাস্তি দেওয়া হয়। অনুরূপ বিচ্যুতির জন্য আরও পাঁচজনকে সাময়িকভাবে বরখাস্ত করা হয় এবং একজনকে বিতাড়িত করা হয়।[৭] একজন এস ডি ও মৌলবাদীদের কার্যকলাপ সম্পর্কে রিপোর্ট দিয়েছিলেন। তাঁর ওপর চাপ সৃষ্টির ফলে তিনি জানান যে তিনি ব্যাপারটি সম্পূর্ণরূপে তদন্ত করে জানাবেন—আগের তদন্ত সম্পূর্ণ ছিল না।[৮] পাবনার জেলাশাসক—যাকে চিফ সেক্রেটারি

বিশেষ করে "Hindu gentleman" বলে উল্লেখ করেছেন—রিপোর্ট দিলেন যে স্বদেশি আন্দোলন স্বায়ত্তশাসনের জন্য আন্দোলনের রূপ নিচ্ছে।[৯] পাবনাতে বয়কট ও স্বদেশি আন্দোলন তীব্র রূপ ধারণ করেনি। পাবনাতে ওই বৎসর (১৯০৮) প্রাদেশিক সম্মেলনে রবীন্দ্রনাথ সভাপতিত্ব করেন। পাবনার জেলাশাসককে তার চাকুরি জীবনে ওই পদের উপরের পদে আর প্রমোশন দেওয়া হয়নি।[১০]

এই রিপোর্টগুলি হিন্দু-মুসলমান সম্পর্কের বিষয়ে একদেশদর্শী ও পক্ষপাতদুষ্ট। হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে একটি সম্প্রীতির বাতাবরণ সৃষ্টির যে চেষ্টা জাতীয়তাবাদী নেতারা করছিলেন তাকে নস্যাৎ করতে কয়েকটি সরকারি পদক্ষেপ নেওয়া হয়। স্বদেশি ও বয়কট আন্দোলনে অংশ নিতে যে সমস্ত স্বেচ্ছাসেবী শহর থেকে গ্রামে আসত, তাদের বিরুদ্ধে ব্যক্তি-স্বাধীনতা রক্ষার নামে আইনিভাবে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হত। শুধু তাই নয়, এই স্বেচ্ছাসেবীদের ওপর সাম্প্রদায়িক উত্তেজনার দায় চাপিয়ে হিন্দু-মুসলমান সংঘর্ষের জন্য দায়ী করা হয়েছে। জামালপুর সহ অন্যান্য জায়গায় সংঘর্ষ ও উত্তেজনার জন্য এই স্বেচ্ছাসেবকদেরই দায়ী করা হয়েছে।[১১] অপরদিকে মৌলবাদীদের কার্যকলাপকে যতদূর সম্ভব উপেক্ষা করা হয়েছে।[১২] স্বেচ্ছাসেবীদের বিরুদ্ধে আইন অনুসারে ব্যবস্থা নেওয়ার ফলে ও তাদের জেলে আটকে রাখার ফলে, দূরবর্তী শহর থেকে, বিশেষ করে কলকাতা থেকে স্বেচ্ছাসেবী আসাও বন্ধ হয়ে যায়।[১৩] লাল ইস্তাহার নিয়ে আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়ার ব্যাপারে সরকারি মহলের টালবাহানা সুপরিচিত। সরকার যে এই ইস্তাহারের বিষয়বস্তু ও উস্কানিমূলক বক্তব্য যথাসম্ভব লঘু করে দেখার চেষ্টা করেছে।[১৪]

কিন্তু এই সমস্ত বিচ্যুতি সত্ত্বেও সরকারি রিপোর্ট স্বদেশি আন্দোলনের সমসাময়িক কয়েকটি বৈশিষ্ট্যকে চিহ্নিত করেছে। প্রথমত, আন্দোলন ছিল মূলত ভদ্রলোক বাঙালির। জনপ্রিয় পেশাগুলিতে নিযুক্ত বাঙালিরাই এই আন্দোলনের সঙ্গে বিশেষভাবে যুক্ত হয়ে গিয়েছিলেন। গ্রামাঞ্চলে জমিদার বা ভূম্যধিকারী শ্রেণি ও আইনজীবী, ডাক্তার, শিক্ষক ইত্যাদি বুদ্ধিজীবী শ্রেণি এই আন্দোলনের শক্তভূমি। নেতৃত্বে ছিলেন কংগ্রেসের প্রাদেশিক নেতা ছাড়াও কংগ্রেস সমর্থক স্বদেশি চিন্তায় উদ্বুদ্ধ মানুষ। সরকারি রিপোর্টে এঁদের প্রায়ই "Calcutta leaders" বা[১৫] "কলকাতা থেকে আগত নেতৃবৃন্দ" বলে উল্লেখ করা হয়েছে। এঁরাই ছিলেন আন্দোলনের নেতা এবং প্রেরণাস্বরূপ। নেতৃত্বের বিশ্বাসযোগ্যতা এবং জনসংযোগ রাখতে তাঁরা জেলায় জেলায় ঘুরে মফসসলের শহুরে মধ্যবিত্ত বাঙালি এবং ছাত্র ও স্বেচ্ছাসেবকদের উৎসাহ ও প্রেরণা দিতেন।[১৫] জেলাস্তরে অনেক হঠাৎ-সক্রিয় হয়ে ওঠা নেতা থাকলেও অশ্বিনী দত্ত বা অম্বিকা মজুমদারের মতো প্রভাবশালী নেতা খুব বেশি ছিলেন না।

জাতীয় বিদ্যালয়ের ছাত্র ও অন্যান্য স্কুল-কলেজের ছাত্ররাও এই আন্দোলনে যোগ দিয়েছিল। তাদের সঙ্গে ছিল বিভিন্ন শরীরচর্চা এবং আত্মরক্ষার কৌশল শিক্ষা দেওয়ার জন্য যে সমস্ত ক্লাব বা সমিতি সংগঠিত হয়েছিল তাদের সদস্যবৃন্দ। ছাত্র-যুবক সমিতির সদস্য মিলে স্বেচ্ছাসেবক সমিতি গঠিত হয়েছিল। তারাই ছিল আন্দোলনের অগ্রগামী অংশ। তারা স্বদেশি প্রচার করত, বয়কটের নির্দেশ মান্য করার জন্য আবেদন করত—কখনও বলপ্রয়োগও করত। তাই সরকার তাদের বিরুদ্ধে ফৌজদারি মামলা করে তাদের নিরস্ত করার পথ নিয়েছিল। এই আন্দোলনের আর একটি শক্তি ছিল প্রধানত কলকাতার জাতীয়তাবাদী খবরের কাগজ।[১৬] এর মধ্যে ছিল অমৃতবাজার পত্রিকা, সঞ্জীবনী, বেঙ্গলি ইত্যাদি। পরবর্তীকালে এর সঙ্গে যোগ হল যুগান্তর (মার্চ, ১৯০৬), বন্দেমাতরম, নবশক্তি, ভারতী, সন্ধ্যা ইত্যাদি। এগুলি বস্তুতপক্ষে শহরের সঙ্গে মফসসলের যোগাযোগের মাধ্যম। কলকাতা থেকে প্রকাশিত এই পত্রিকাগুলির সাহায্যে বিভিন্ন কর্মসূচি যেমন শিক্ষিত মানুষদের মধ্যে ছড়িয়ে দেওয়া হত, তেমনই দেশাত্মবোধক চেতনারও বিস্তৃতি ঘটত। নেতা ও সংবাদপত্র কলকাতা কেন্দ্রিক ছিল—তাই আন্দোলনটিও নিয়ন্ত্রিত হত কলকাতা থেকে। সরকারি নথিতে দেশীয় কাগজে মিথ্যা সংবাদ পরিবেশনের অভিযোগ করা হয়েছে।[১৭] সরকারি তদন্তে দেখা গিয়েছে যে খবরের কাগজে পরিবেশিত সংবাদ সত্য নয়। সংবাদপত্র ছাড়াও সংবাদ কিংবা বিশেষ বিশেষ চিন্তা ও মতবাদ প্রচারের জন্য ছোট ছোট পুস্তিকা বিভিন্ন স্থানে দূত মারফত ছড়িয়ে দেওয়া হত। রাজরোষে 'যুগান্তর' বন্ধ হয়ে যাওয়ার পর যুগান্তরে প্রকাশিত রচনা এবং অন্যান্য রচনাও এইভাবে প্রচার করা হত। সরকারি রিপোর্ট সুতরাং স্পষ্ট করেই নির্দেশ করছে যে বঙ্গভঙ্গ বা স্বদেশি আন্দোলন প্রধানত মধ্যবিত্ত শিক্ষিত হিন্দু বাঙালির আন্দোলন।

দ্বিতীয়ত, সরকারি রিপোর্ট অনুসারে বঙ্গ-বিভাগ-বিরোধী আন্দোলন আদৌ গতিশীল হতে পারেনি। বিশেষ কোনও প্রতিরোধ ছাড়াই নিঃশব্দে বঙ্গবিভাগ সম্পন্ন হয়ে গিয়েছিল। তাই 'স্বদেশি' অবলম্বন করে সাধারণ মানুষকে ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলনে সামিল করার চেষ্টা করা হয়। বয়কট স্বদেশির, বিশেষ করে আগ্রাসী স্বদেশির, অনিবার্য পরিণতি। সরকারি

মতে বয়কট আন্দোলনের ফলে বঙ্গবিভাগ বাতিল করার দাবি আর প্রাসঙ্গিক রইল না এবং অন্য সমস্যার জন্ম দিল। সেই সমস্যার জন্য অর্থাৎ হিন্দু-মুসলমান বিরোধের জন্য, হিন্দুদের মধ্যে অনৈক্যের জন্য ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলন নিতান্ত দুর্বল হয়ে পড়েছিল।

বঙ্গভঙ্গ, স্বদেশি ও বয়কটের পরিপ্রেক্ষিতে রবীন্দ্রনাথ যা লিখেছেন, তা সরকারি রিপোর্টের মন্তব্যের প্রসঙ্গে প্রণিধানযোগ্য।

> "আমরা বয়কট ব্যাপারটাকে একমাত্র কর্ত্তব্য বলিয়া ধরিয়া লইয়াছিলাম, যে কোনও উপায়েই হোক, বয়কটকে জয়ী করিয়া তোলাতেই আমাদের সমস্ত জেদ এত বেশী মাত্রায় চড়িয়া গিয়াছিল যে, বঙ্গবিভাগের যে পরিণাম আশংকা করিয়া পার্টিশনকে আমরা বিভীষিকা বলিয়া জানিয়া ছিলাম, সেই পরিণামকেই অগ্রসর হইতে আমরা সহায়তা করিলাম"।[১৮]

রবীন্দ্রনাথ ইঙ্গিত করেছেন যে বয়কটের ফলে সাম্প্রদায়িকতার পরিণামই অনিবার্য হয়ে উঠল। সরকারি রিপোর্টের তৃতীয় বক্তব্যও তাই। এই বয়কট আন্দোলনের ফলশ্রুতি হিসাবে সম্প্রদায়গত, শ্রেণিগত ও জাতভিত্তিক বিভাজন আরও তীব্র হয়ে উঠেছিল। হিন্দু-মুসলমান সম্প্রদায়গত বিভেদ রাজনীতির সঙ্গে জড়িত হয়ে ভৌগোলিক গণ্ডি বা বিশেষ সময়ের সীমা ছাড়িয়ে ভারতীয় ইতিহাসে একটি চিরকালীন সমস্যা হয়ে উঠল। সন্দেহ নেই যে দুই সম্প্রদায়ের সম্পর্কের ক্রমাবনতিতে, সরকারের একটা বিশেষ সক্রিয় ভূমিকা ছিল। রিপোর্টেও সেই ভূমিকাকে সম্পূর্ণরূপে আড়াল করা সম্ভব হয়নি তা আমরা ওপরের আলোচনায় দেখেছি।

রবীন্দ্রনাথ পাবনা প্রাদেশিক সম্মেলনে (১৯০৮) সভাপতির আসন থেকে হিন্দু-মুসলমান সম্পর্কে সরকারি প্ররোচনা বিষয়ে বলেন, 'বাহির হইতে হিন্দু-মুসলমানের প্রভেদকে যদি বিরোধে পরিণত করার চেষ্টা করা হয় তবে তাহাতে আমরা ভীত হইব না—আমাদের নিজেদের মধ্যে যে ভেদবুদ্ধির পাপ আছে তাহাকে নিরস্ত করিতে পারিলেই আমরা পরের কৃত উত্তেজনাকে অতিক্রম করিতে নিশ্চয়ই পারিব। এই উত্তেজনা কালক্রমে আপনিই সারতে বাধ্য। কারণ, এই আগুনে নিত্য কয়লা যোগাইবার সাধ্য গভর্ণমেন্টের নাই।'[১৯] কিন্তু বাঙালি শিক্ষিত সম্প্রদায়ের পক্ষে এই 'ভেদবুদ্ধির পাপ' থেকে মুক্ত হওয়ার জন্য কোনও উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ নেওয়া সম্ভব হয়নি। বরং স্বদেশি ও বয়কটকে যেন-তেন-প্রকারে সফল করার জন্য তাঁরা যে পদক্ষেপ নিয়েছিলেন তাতে ভেদবুদ্ধির পাপ আরও বেড়ে গিয়ে সম্পর্ককে বিষিয়ে তুলেছিল।

সম্ভবত সিপাহি বিদ্রোহের পশ্চাদপটের ঘটনাবলি স্মরণ করে এই সময় সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বিপিন পাল, অম্বিকা মজুমদার ও অন্যান্যরা প্রচার শুরু করেন যে বিদেশ থেকে আমদানিকৃত কাপড় চিনি ও নুন তৈরিতে পশুর চর্বি এবং অস্থিচূর্ণ ইত্যাদি ব্যবহৃত হয় বা "ইহাদের দ্বারা শোধন হইয়া থাকে"।[২০] আবদুল গফর নামে এক বয়কট প্রচারকও চট্টগ্রাম ও নিকটবর্তী জেলাগুলিতে বিদেশি লবণ, চিনি ও কাপড় মুসলমানদের ব্যবহারের পক্ষে অপবিত্র বলে প্রচার করেন। কিন্তু দুই সময়ের ঘটনার পরিপ্রেক্ষিত ছিল ভিন্ন। সিপাহি বিদ্রোহে অপবিত্র কার্তুজ প্রথম ব্যবহারের জন্য আনা হয়েছিল; আর লবণ, চিনি ও কাপড় অনেক দিন থেকেই হিন্দু ও মুসলমানরা ব্যবহার করে আসছেন। সুতরাং এই প্রচার বিশেষ প্রভাব বিস্তার করতে পারেনি। উলটে এই ধরনের প্রচারে নেতাদের বিশ্বাসযোগ্যতাই প্রশ্নের সামনে দাঁড়িয়ে ছিল। এই ধরনের প্রচার বিপরীত ফল প্রসব করেছিল।

জমিদার ও উকিলরা বয়কটকে কার্যকরী করার জন্য যে পদ্ধতি গ্রহণ করেছিলেন তার ফলে সাধারণ মানুষের সঙ্গে স্বদেশি আন্দোলনের দূরত্ব আরও বেড়ে গিয়েছিল। হিন্দু জমিদাররা মুসলমান প্রজার ওপর জোর করে স্বদেশি চাপাতে গিয়ে কিংবা তাদের দোকান থেকে বিদেশি জিনিস বিক্রি বন্ধ করতে গিয়ে তাদের মধ্যে ক্ষোভ ও ক্রোধের সৃষ্টি করেছেন।[২১] তারা জমিদারের আদেশ অমান্য করলে তাদের ওপর জবরদস্তি করা হয়েছে; খাজনা বাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে, কখনও কখনও হাটে আগুন লাগিয়ে দেওয়া হয়েছে। লবণ বোঝাই নৌকা নদীতে ডুবিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করা হয়েছে।[২২] এই সমস্ত জবরদস্তি ও আক্রমণাত্মক ঘটনার ফলে শুধু মুসলমানরাই নয় নিম্নশ্রেণির হিন্দু প্রজারাও এই আন্দোলনের বিরোধী হয়ে গিয়েছিল। সামাজিক-বয়কটকেও জমিদার এবং অন্যান্য ভূস্বামীরা ব্যবহার করেছেন। যারা বিদেশি জিনিস ব্যবহার করতেন বা বিদেশি জিনিসের ব্যবসা করতেন তাদের চিকিৎসা করতেন না ডাক্তাররা, কিংবা উকিলরা তাঁদের মামলা নিতেন না।[২৩] ধোপা-নাপিত বন্ধ করা, কিংবা খেয়াঘাটে পারাপারের সুবিধা প্রত্যাহার করে নেওয়া প্রভৃতি ছিল সামাজিক বয়কটের পদ্ধতি।[২৪] অনেক সময় ব্রাহ্মণরা পর্যন্ত পূজা করতে অস্বীকার করতেন।[২৫] এই সমস্ত ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে দেখা গেল বরিশাল, ফরিদপুর, ঢাকা প্রভৃতি জেলায় মুসলমানদের সঙ্গে যোগ দিয়ে নিম্ন জাতের হিন্দুরা[২৬] সস্তা বিদেশি জিনিসই ক্রয় করছিল। নিজেদের আর্থিক স্বার্থে তারা স্বদেশিবাবু বা জমিদারদের আদেশ বা অনুরোধ মানতে রাজি হয়নি।

এইগুলি সরকারি গোপন তথ্য; রবীন্দ্রনাথের এই তথ্য জানার কথা নয়। কিন্তু তিনি এইরূপ অনেক ঘটনা সম্পর্কে অবহিত ছিলেন। সে সম্পর্কে তাঁর প্রতিক্রিয়া কিরূপ ছিল তা দেখা যেতে পারে। বয়কট ও স্বদেশি সম্পর্কে তাঁর মন্তব্য : 'এই উপলক্ষে দেশের নিম্নশ্রেণীর প্রজাগণের ইচ্ছা ও সুবিধাকে দলন করিবার আয়োজন করিয়াছিলাম, সে কথা স্বীকার করিতে আমাদের ভালো লাগে না, কিন্তু কথাটাকে মিথ্যা বলিতে পারি না।' ইচ্ছা ও সুবিধাকে দলন করবার জন্য যে পদ্ধতিগুলি নেওয়া হয়েছিল সেগুলিকে 'আমাদের দেশের অনেক ভদ্রলোক আজও অন্যায় বলিয়া মনে করিতেছেন না। মানুষের বুদ্ধিবৃত্তির প্রতি শ্রদ্ধা রাখিবার মতো ধৈর্য্য আমাদের নাই, আমরা ভয় দেখাইয়া তাহাদের বুদ্ধিকে দ্রুত পদানত করিবার চেষ্টা করি। পিতৃপুরুষকে নরকস্থ করিবার ভয়, ধোবা-নাপিত বন্ধ করিবার শাসন, ঘরে অগ্নিপ্রয়োগ বা পথের মধ্যে ধরিয়া ঠেঙাইয়া দিবার বিভীষিকা, এ সমস্তই দাসবৃত্তিকে অন্তরের মধ্যেই চিরস্থায়ী করিয়া দিবার উপায়।'[২৭] এইভাবে আমাদের দেশের যারা স্বদেশি প্রচারের ব্রত নিয়েছেন তারাই একশ্রেণির মানুষকে স্বদেশির প্রতি বিদ্বেষী করে দিচ্ছেন।

রবীন্দ্রনাথ ভদ্রলোক ও গ্রামের বৃত্তিজীবী মানুষের মধ্যে যে একটা দুস্তর ব্যবধান আছে তা অনেকদিন থেকেই ভদ্রলোক শ্রেণিকে বলবার চেষ্টা করেছেন। 'ভদ্রলোকের নিকট চাষা বেটা প্রায় মনুষ্যের মধ্যেই নহে'[২৮]। 'হিন্দুমেলা'র সময় নব উজ্জীবিত জাতীয়চেতনায় প্রাণিত 'বাবু' বাঙালির কাপুরুষতার অপবাদ ঘোচানোর চেষ্টায় নিম্নশ্রেণির মানুষের শরীরচর্চার ঐতিহ্য বাঙালির ঐতিহ্য হিসাবে আত্মীকরণ করার চেষ্টা হয়েছিল। সেই চেষ্টার ফলে বাঙালি ভদ্রলোক শ্রেণির মধ্যে শক্তিচর্চার প্রেরণা জাগ্রত হয়েছিল। এই শক্তিচর্চা জাতীয়তাবাদী চেতনাকে আত্মবিশ্বাসী করেছিল; কিন্তু 'চাষা-বেটা'র প্রতি অবজ্ঞা আর ঘৃণার অবসান ঘটাতে পারেনি। সেরূপ কোনও শক্তিশালী সামাজিক আন্দোলনেরও সূচনা সেই সময় হয়নি। জাতব্যবস্থা যে সামাজিক জীবনে এক ঘোরতর অনৈক্য সৃষ্টি করে রেখেছিল এবং সেই সামাজিক বৈষম্য যে নিম্নশ্রেণির মানুষেরও জীবনকে নিত্য অবমাননায় দুর্বিষহ করে তুলেছিল সে সম্পর্কে ভদ্রলোক-সমাজে সচেতনতা ছিল নিতান্তই প্রান্তিক। উচ্চবর্ণের হিন্দু ও নিম্নশ্রেণির হিন্দুদের মধ্যে দূরত্ব এত বেশি ছিল যে নিম্নশ্রেণির হিন্দুরা এবং মুষ্টিমেয় মুসলমান ভূস্বামী বাদ দিয়ে প্রায় সমগ্র মুসলমান সমাজ ছিল পরস্পরের কাছাকাছি। উচ্চবর্ণের ঘৃণায় ও অবহেলায় দুই শ্রেণি পরস্পরের কাছাকাছি এসেছিল। দুই শ্রেণিই সাধারণত কৃষিনির্ভর, প্রধানত প্রান্তিক বা ভূমিহীন চাষি, বিভিন্ন বৃত্তিজীবী, যেমন জোলা, মাঝি, মৎস্যজীবী ইত্যাদি। শোষণ ও দারিদ্রের ফলে তারা একই গোত্রভুক্ত। বসতিও পরস্পরের কাছাকাছি। সংস্কৃতির দিক থেকে একই উৎস থেকে তারা রস আহরণ করে—একই সংস্কারের ছায়ায় তারা লালিত। সেখানে সাম্প্রদায়িক বিভাজনের উত্তাপ অর্থনৈতিক অবস্থার সাম্যকে নষ্ট করতে পারেনি। বরং সংস্কৃতির মিলনে বাউল-ভাটিয়ালি, সত্যপীর সহ পারস্পরিক যোগসূত্রের সাধনা গড়ে উঠেছিল। তাছাড়াও পূর্ববঙ্গের অনেক মুসলমানই যে আগে হিন্দু ছিল, এইরূপ একটি চেতনাও এই দুই শ্রেণির মধ্যে ঐক্যের বন্ধনকে দৃঢ় করেছিল। কিন্তু নিম্নবর্ণের হিন্দু ও মুসলমানদের আরও কাছাকাছি এনেছিল উচ্চবর্ণের হিন্দুর ঘৃণা ও সামাজিক অবমাননা।

রবীন্দ্রনাথ নিম্নজাতের হিন্দু-মুসলমানদের দৃষ্টিভঙ্গি যথার্থভাবে অনুধাবন করতে পেরেছিলেন। তাঁর কথা এখানে শোনা যেতে পারে।

'এইরূপ ঘটনাই কি ঘটিতেছে না? "যাঁহারা কখনও বিপদে আপদে আমাদের স্নেহ করে নাই, তাহাদিগকে যাহারা সামাজিক ব্যবহারে পশুর অপেক্ষা অধিক ঘৃণা করে তাহারা আজ কাপড় পরানো বা অন্য যে কোনও উপলক্ষে আমাদের প্রতি জবরদস্তি প্রকাশ করিবে ইহা আমরা সহ্য করিব না।" দেশের নিম্ন শ্রেণীর মুসলমান ও নমঃশূদ্রদের মধ্যে এইরূপ অসহিষ্ণুতা জাগিয়া উঠিয়াছে। ইহারা জোর করিয়া এমনকি ক্ষতি স্বীকার করিয়াও বিলাতী সামগ্রী ব্যবহার করিতেছে।'[২৯]

জাতীয় আবেগের দ্বারাই যে ভারতীয়দের মধ্যে ঐক্য গড়ে উঠবে না তা রবীন্দ্রনাথ স্পষ্ট করে বলেছিলেন। ' "বন্দেমাতরম" মন্ত্র উচ্চারণ করিলেও মাতার বন্দনা করা হইবে না—বরং দেশের লোককে মুখে ভাই বলিয়া ভ্রাতৃদ্রোহীতা করা হইবে। সবলে গলা টিপিয়া ধরিয়া মিলনকে মিলন বলে না, ভয় দেখাইয়া এমনকি কাগজে কুৎসিৎ গালি দিয়া মতের অনৈক্য নিরস্ত করাকেও জাতীয় ঐক্য বলে না।'

স্বদেশি আন্দোলনের নেতৃত্বে ছিলেন যে ভদ্রলোক শ্রেণি, তাদের পক্ষে ওই কাঙ্ক্ষিত ঐক্য গড়ে তোলা সম্ভব ছিল না। রবীন্দ্রনাথই সাধারণভাবে তার সীমাবদ্ধতা নির্দেশ করেছেন; 'আমাদের সমাজ স্তরে স্তরে উচ্চে নীচে বিভক্ত; যে ব্যক্তি কিছুমাত্র উচ্চে আছে সে নিম্নতর ব্যক্তির নিকট অপরিমিত অধীনতা প্রত্যাশা করে।' সুতরাং উচ্চশ্রেণির ভদ্রলোক নেতাদের পক্ষে তাঁদের সামাজিক অবস্থানে অবিচল থেকে সেই ঐক্য বিধান ছিল দুরূহ।

বস্তুতপক্ষে 'ভদ্রলোক' হিন্দু ও মুসলমানদের মধ্যে যে ব্যবধান, সেইখানে অবস্থান ছিল অনেকগুলি নিম্নবর্ণের ও অস্পৃশ্য হিন্দু জাতের। এই জাতগুলিকে যদি হিন্দুসমাজ সম্যক সম্মান ও মর্যাদার আসন দিতে পারত তবে হয়ত মুসলমানদের সঙ্গে বিভেদ এত ত্বরিতগতিতে বিক্ষোভে পরিণত হত না, এবং ঔপনিবেশিক প্রশাসকরাও এত সহজে বিভেদকে সংঘর্ষে পরিণত করতে পারত না। স্বদেশি আন্দোলনের ঐতিহাসিক সুমিত সরকারের মতে ভদ্রলোক ও জনগণের মধ্যে ব্যবধানকে দূর করা যায়নি বলেই আন্দোলন বানচাল হয়ে গিয়েছিল।[৩০] এই প্রসঙ্গে জমিদার ও প্রজার সম্পর্ক ও আন্দোলনে কৃষক কর্মসূচির অভাবের কথা তুলে তিনি স্বদেশি আন্দোলনের সীমাবদ্ধতাকে শ্রেণি-সংগ্রামের কাঠামোর মধ্যে আলোচনা করেছেন। ভদ্রলোক ও জনগণের মধ্যে ব্যবধান কেবল শ্রেণিস্বার্থের নয়, সেখানে জাত ও ধর্মের ব্যবধান আছে। অর্থনৈতিক শ্রেণিস্বার্থকে ইতিহাসের অমোঘ শক্তি হিসাবে স্বীকার করে নিলেও ধর্ম ও বিশেষ ক্ষেত্রে জাত বিভাজনের শক্তিকেও অগ্রাহ্য করা যায় না। অনেক সময় আবার জাত-ধর্ম ও অর্থনৈতিক শ্রেণি সমার্থক হয়ে উঠেছে বলে শ্রেণিচরিত্রের সঙ্গে জাত-চরিত্রও প্রাসঙ্গিক হয়ে উঠেছে। ভারতবর্ষের ক্ষেত্রে জাত-শ্রেণি সমীকরণ করে আলোচনা করাই বাস্তবসম্মত।

Broomfield-এর ভদ্রলোক সাধারণত উচ্চকুলজাত এবং উঁচু জাতের তকমা প্রায় একটি শর্ত বিশেষ। যদিও ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রধানত ভদ্রলোকের অর্থনৈতিক অবস্থান অনুসারে শ্রেণিবিভাগ করেছেন, তবুও তাঁর ভদ্রলোকেরা বস্তুতপক্ষে ছোটলোকের বা গরিবলোকের বিপরীতে অবস্থিত। তাই তাঁর বিভাজন শুধু অর্থনৈতিক নয়, একটি সামাজিক অবস্থানের ইঙ্গিত দেয়। আর 'ছোটলোক' শব্দটিতে নিম্নজাতের অনুষঙ্গ অবিচ্ছেদ্য। সেইজন্য স্বাভাবিকভাবে ভদ্রলোকের সঙ্গে জাতের একটা সম্পর্ক আছেই। ভবানীচরণের সময় জাতের ওপর যতটা জোর দেওয়া হত বিংশ শতাব্দীতে জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের সময় ভদ্রলোক কথাটিতে জাতের অনুষঙ্গটি ধীরে ধীরে ক্ষীয়মাণ হয়ে আসতে থাকে. ভদ্রলোক হয়ে উঠতে থাকে একটি 'status group', সমাজে একটি বিশেষ অবস্থান বা গোষ্ঠী/ভদ্রলোক প্রথম থেকেই শহুরে শ্রেণি—কলকাতাতেই এর উদ্ভব এবং কলকাতা ও আশেপাশের শহরেই এর বিস্তার। সব মিলিয়ে ভদ্রলোকের পরিচিতির বৈশিষ্ট্য হল (ক) অপেক্ষাকৃত সচ্ছল মধ্যবিত্ত, (খ) উচ্চ জাত উদ্ভূত, (গ) নিজ হাতে কোনও শ্রমসাধ্য কাজ করে না। (ঘ) প্রধানত শহরবাসী তবে গ্রামেও থাকেন, (ঙ) শিক্ষিত। এর মধ্যে জাত অবস্থানটি ক্ষেত্র বিশেষে অপরিহার্য নয়। বিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকে অবশ্য এই নতুন 'status group'-এর সমস্ত বৈশিষ্ট্যই প্রয়োজনীয় ছিল। গ্রামের জমিদার বা বড় জমির মালিক-শ্রেণি, উকিল-শিক্ষক ও ডাক্তারেরা ছিলেন গ্রামের ভদ্রলোক-শ্রেণি। যাঁরা শহরের নাগরিক ছিলেন না বা শিক্ষিতও ছিলেন না, তাঁরাও ভদ্রলোক নামে অভিহিত। ভদ্রলোক ও 'চাষা বেটা'র মধ্যে সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ব্যবধান ছাড়াও ছিল ধর্মের ব্যবধান। অধিকাংশ কৃষক মুসলমান, হিন্দু কৃষকেরা নিম্নজাতের। বঙ্গভঙ্গ ও স্বদেশি প্রাথমিকভাবে ধর্মের স্বার্থ ধরেই টান দিয়েছে। বঙ্গভঙ্গ একটি মুসলমান গরিষ্ঠ রাজ্য গঠনের সম্ভাবনাকে উজ্জ্বল করে তুলেছিল। যেখানে মুসলমানের স্বার্থ সুরক্ষিত, সেখানে নিম্নশ্রেণির হিন্দুর স্বার্থও উপেক্ষিত নয়।

মুসলমান পৃথক ধর্মাবলম্বী হলেও হিন্দু উচ্চবর্ণের নিকট অস্পৃশ্যদের ন্যায় ব্যবহার পায়। তাই হিন্দুর নেতৃত্ব মেনে নেওয়া তাদের পক্ষে মুশকিল। হিন্দু কৃষকদের বৃহত্তম অংশ নিম্নজাতের মানুষ। কৃষকদের স্বার্থরক্ষায় কোনও কর্মসূচি নিলে তা জোতদার জমিদারের স্বার্থবিরোধী হবে, অথচ তারাই এই আন্দোলনের নেতৃত্ব দিতেন। তাছাড়া তাদের জাত-অবস্থানের সুবাদে তারা সামাজিক নেতা। সেই অবস্থানকে তারা রাজনৈতিক নেতৃত্বে রূপান্তরিত করে আন্দোলনের নেতৃত্ব গ্রহণ করেছেন। সুতরাং জাত ও কৃষি কর্মসূচি দুটিই তাদের নেতৃত্ব ও স্বার্থের পক্ষে হানিকর। এই অবস্থায় আন্দোলনের নেতাদের পক্ষে কোনও কৃষক কর্মসূচি নেওয়া যেমন সম্ভব ছিল না তেমনই জাতব্যবস্থাকে আক্রমণ করাও সম্ভব ছিল না। বস্তুতপক্ষে মার্কসবাদী চিন্তায় জাতকে একটি বিশেষ উৎপাদন ব্যবস্থায় উদ্ভূত এবং সেই ব্যবস্থার উপযোগী শ্রমবিভাজন হিসাবে গণ্য করা হয়েছিল। ফলে জাতব্যবস্থার স্বতঃসিদ্ধ সমাধান হিসাবে বলা হয়ে থাকে যে উৎপাদনব্যবস্থার পরিবর্তন ও উৎপাদন-সম্পর্কের পুনর্বিন্যাস ঘটলেই জাতব্যবস্থার অবসান ঘটবে। জাতবিভাজন ও কৃষিতে শোষণ এই দুইয়ের বিরুদ্ধে লড়াই করার মানসিকতাও ভদ্রলোক-শ্রেণির ছিল না। ছিল না বলেই জাতীয় ঐক্য গড়ে ওঠেনি—ব্রিটিশ বিরোধী সংগ্রাম গতিশীল হয়নি।

স্বদেশি আন্দোলনের প্রতি মুসলমানরা গরিষ্ঠ সংখ্যায় বিরূপ ছিল। হিন্দুসমাজের জাতসোপানের নীচের দিকের জাতগুলিও যে আন্দোলনের সমর্থক ছিল একথা বলা যায় না। নমশূদ্র (পূর্বনাম চণ্ডাল) নামে একটি জাত আন্দোলনে অংশ তো নেয়ইনি; বরং বিরুদ্ধাচরণ করে বঙ্গপ্রদেশ দ্বিখণ্ডিত করার সরকারি নীতিকে সমর্থন জানিয়েছিল। ঐতিহাসিকরা

এই বিরুদ্ধাচরণকে ঔপনিবেশিক সরকারের চক্রান্তের ফল বলে একটি সহজ ব্যাখ্যা উপস্থিত করেন। Divide and rule-এর নীতির সঙ্গে সহজে খাপ খেয়ে যায় বলে এই ব্যাখ্যা একটি মসৃণ গ্রহণযোগ্যতাও লাভ করে। সুমিতও একটু দ্বিধার সঙ্গে সেইরূপ কথাই বলেছেন। নমশূদ্রদের সম্পর্কে তাঁর অভিমত 'the government of the new province encouraged such tendencies'.[৩১] সুমিতের এই বক্তব্যটি একটি ঘটনার সূত্র থেকেই অনুমান করা হয়েছে। পূর্ববঙ্গের লাটসাহেবের নিকট আবেদনের প্রেক্ষিতে লেখা হয়েছিল, 'the lower castes of Hindus, who have testified that they consider the orders of government regarding admittance to the public service of more members of communities other than the high caste Hindus as giving them their first chance of rising in public estimation'.[৩২] নিম্ন জাতের হিন্দুদের চাকুরির আশ্বাস দিয়ে তাদের আন্দোলন থেকে দূরে রাখার চেষ্টা করা হয়েছে। বরিশালের টাঙ্গাইলের এই সভায় লাটসাহেব মুসলমানদেরও শিক্ষার ক্ষেত্রে কিছু সুযোগসুবিধার আশ্বাস দিয়েছিলেন। বরিশালে নমশূদ্রদের সংখ্যা অনেক সুতরাং ওই সভায় মুসলমান ও নমশূদ্ররাই উপস্থিত ছিলেন। বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলনের সূচনাতেই নমশূদ্ররা ঘোষণা করে দিয়েছিলেন যে তারা আন্দোলনে সামিল হবেন না। মুসলমান ও নমশূদ্রদের অবস্থানগত নৈকট্য রাজনৈতিক আন্দোলনের প্রেক্ষিতে একটি নতুন মাত্রা পেয়েছিল।

(২)

ভদ্রলোকের পক্ষে উঁচুজাতের তকমা একটি শর্ত বিশেষ। স্বদেশি আন্দোলনের নেতৃবৃন্দ ভদ্রলোক শ্রেণির। তাই স্বদেশি আন্দোলনের প্রতি নমশূদ্র ইত্যাদি কয়েকটি কৃষিজীবী নিম্নজাতের দৃষ্টিভঙ্গি ও প্রতিক্রিয়ার আলোচনা প্রাসঙ্গিক। বস্তুতপক্ষে এইরূপ পর্যালোচনা ব্যতিরেকে আন্দোলনের প্রকৃতি, চরিত্র, দুর্বলতা ও শক্তি স্পষ্ট হয়ে উঠবে না। নমশূদ্র জাত ১৮৭২ সালের জনগণনায় চণ্ডাল নামে অভিহিত। হিন্দুশাস্ত্র, 'বৃহদ্ধর্ম পুরাণ' অনুসারে তারা 'অধমসংকর' ও 'বৃহদারণ্যক পুরাণ' অনুসারে অন্ত্যজ। সুতরাং তারা জল-অচল জাত।[৩৩] প্রধানত যশোহর, ফরিদপুর, বাখরগঞ্জ, ঢাকা, ময়মনসিংহ ও শ্রীহট্ট জেলায় এদের বাস (১৮৭২-এর সেন্সাস)। ১৯০১ সালে মোট হিন্দু জনসংখ্যার শতকরা ৯.১৭ জন ছিল নমশূদ্র। উচ্চবর্ণের অত্যাচারের ফলে নমশূদ্রদের কোনও কোনও অংশ ইসলাম কিংবা খ্রিস্ট ধর্ম গ্রহণ করেছিল। ১৮৭২ সালের পরে প্রতি দশ বৎসর অন্তর জনগণনার রিপোর্টে প্রত্যেক জাতের জনসংখ্যা, তাদের আচারব্যবহার, উৎপত্তি ও বিকাশ সম্পর্কিত নানা তথ্য প্রকাশ হতে থাকায় বিভিন্ন জাত তাদের ইতিহাস, সমাজ, হিন্দুসমাজে আপেক্ষিক অবস্থান ইত্যাদি বিষয়ে অনেক তথ্য জানতে পারে এবং সেই নিরিখে তাদের আত্মবিশ্বাস ও জাতের মধ্যে ঐক্য দৃঢ় করার প্রয়াস পায়।

জনগণনার রিপোর্টে সরকারই বিভিন্ন জাতের জাত সোপানের আপেক্ষিক অবস্থান নির্ধারণ করে তালিকা প্রকাশ করেছিল। প্রত্যেক জাতই তালিকায় নির্দেশিত অবস্থান পরিবর্তন করে জাত-সোপানের আরও একটু উচ্চে আরোহণ করতে চায়। সেই জন্য সোপানের মাঝামাঝি অবস্থানে যে সমস্ত জাত ছিল এবং যারা নিম্নবর্ণের তাদের তরফে সংস্কৃতায়নের মাধ্যমে জাতের মধ্যে একটা সম্মানজনক স্থান পাওয়ার চেষ্টা চলছিল। এই সংস্কৃতায়নের দুটি রূপ এই আলোচনায় প্রাসঙ্গিক। প্রথমত, জাতের নামের সঙ্গে উচ্চবর্ণের অনুষঙ্গ গ্রহণ করলে শাস্ত্রীয় জাতের সঙ্গে সম্বন্ধ তৈরি হয়। যেমন কায়স্থ জাত নিজেদের ক্ষত্রিয় বলা শুরু করে। কোনও জাত আবার নতুন নাম নেয়, যেমন চণ্ডালরা নাম নেয় নমশূদ্র। দ্বিতীয় রূপটি হল রীতিনীতি ও আচারব্যবহারের সংস্কৃতায়ন, অর্থাৎ শাস্ত্রীয় নির্দেশ অনুযায়ী নিয়মকানুন পালনের প্রবণতা দেখা যায়। উচ্চবর্ণের মানুষ যে সমস্ত নিয়মকানুন পালন করে সেভাবে নিয়মকানুন পালনও সংস্কৃতায়নের ফল। জনগণনা শুরু হওয়ার পর থেকে জাত-কাঠামোর উচ্চস্থানে আরোহণের লক্ষ্যে সংস্কৃতায়ন আরও প্রবল হয়ে ওঠে। সরকার-প্রকাশিত জাতের তালিকায় কায়স্থকে বৈদ্য জাতির ওপরে স্থান দেওয়ার পর থেকে যে উষ্মা ও বিতণ্ডার সৃষ্টি হয়েছিল তার রেশ চলেছিল বেশ কিছুদিন ধরে। ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ ভাগে অনেকগুলি নিম্ন ও মধ্য-শ্রেণির জাতের মধ্যে উচ্চে আরোহণের তীব্র প্রবণতা দেখা যায়।

নমশূদ্ররা ১৮৭২ সাল থেকেই তাদের জাতের "চণ্ডাল" নাম ত্যাগ করে নতুন নাম 'নমশূদ্র' গ্রহণ করেছিল, এবং সরকারের নিকটে এই নামকে স্বীকৃতি দেওয়ার আবেদন জানিয়েছিল।[৩৪] 'চণ্ডাল' নামের জাতটির সম্পর্কে হিন্দু শাস্ত্রীয় বিধান নিষ্ঠুর ও অমানবিক। এই নামটি সম্ভবত ১৮৭২ সালেই এই জনগোষ্ঠী সম্পর্কে প্রথম ব্যবহৃত হয় এবং ১৮৭২-এর সেন্সাস রিপোর্টে লেখা হয়েছিল যে এটি "sweeper caste"। কিন্তু আশ্চর্যের কথা, ১৮৭৩ সালে সরকারের নিকট প্রতিবেদনে জেলাশাসক ও পুলিশসুপার এই জাতের বৃত্তি সম্পর্কে লিখেছেন যে তারা কৃষিজীবী,

কলের মিস্ত্রি, নৌকা তৈরি ইত্যাদি কাজ করে থাকে। তাদের চণ্ডাল বা "sweeper caste" বলে তারা উল্লেখ করেননি। তাই নমশূদ্রদের ধারণা হয়েছিল যে এ দেশীয় উচ্চবর্ণের সরকারি কর্মচারীরা তাদের স্বাভাবিক জাতঘৃণাবশে এইভাবে অনভিজ্ঞ উচ্চপদস্থ কর্মচারীদের ভুল বুঝিয়েছিলেন। এই সন্দেহ ভিত্তিহীন ছিল না। নিয়ত অপমান ও অবমাননাজনিত ক্ষোভ অলক্ষ্যে জাতের মধ্যে একটি ঐক্যসূত্র তৈরি করেছিল। ১৮৭৩ সালের একটি ঘটনায় সেই অসংগঠিত ক্ষোভ একটি ঐক্যবদ্ধ অসহযোগিতার রূপ নিয়ে প্রকাশ পেল। ফরিদপুর জেলার মসলন্দপুরের দ্বারকানাথ মন্ডল নামে এক নমশূদ্র ধনীকৃষকের বাবার শ্রাদ্ধে কায়স্থ সহ অন্য সম্প্রদায়ের গ্রামবাসীদের নিমন্ত্রণ করা হয়েছিল। কায়স্থরা ঘৃণার সঙ্গে নিমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যান করা ছাড়াও নানা অবমাননাকর উক্তি করে এবং অন্য জাতের মানুষদেরও নিমন্ত্রণ গ্রহণ করতে নিষেধ করে। এর পরেই নমশূদ্ররা সংগঠিত হয়ে সিদ্ধান্ত নেয় যে তারা হিন্দু ও মুসলমান সম্প্রদায়ের উঁচু জাতের জন্য কোনও কাজ করবে না এবং তাদের মেয়েরাও হাট-বাজারে যাবে না।[৩৫]

চণ্ডাল জাতি হিসাবে উচ্চবর্ণের দ্বারা ঘৃণিত ও অপমানিত হওয়ায় এই প্রতিবাদের আরও একটি বিশেষ কারণ ছিল। বাখরগঞ্জ ও ফরিদপুর জেল সহ আরও কয়েকটি জেলে নমশূদ্র কয়েদি থাকলে তাদেরই জেলে বাধ্যতামূলক ভাবে ময়লা পরিষ্কারের (মেথরের) কাজ করতে হত। এই সময়ে বন্দি নমশূদ্ররা এই কাজ করতে অস্বীকার করলেন, ফলে সরকারকে কিছু অসুবিধার মধ্যে পড়তে হল। এক শ্রেণির সরকারি কর্মচারীদের সহানুভূতি সত্ত্বেও সরকার খরচের কথা বিবেচনা করে এই প্রথা বহাল রাখার সিদ্ধান্ত নিল।[৩৬]

প্রথম আন্দোলনটিও ব্যর্থ হয়েছিল, কারণ সংখ্যাগরিষ্ঠ নমশূদ্র দিনমজুর ও প্রান্তিক চাষিরা পেটের দায়ে উচ্চবর্ণের জমির মালিকের কাছে আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য হল। ফলে তাদের ওপর সামাজিক নিপীড়ন ও অত্যাচারের মাত্রা আরও বেড়ে গিয়েছিল।[৩৭] দুই ক্ষেত্রেই সরকারি মহলে নমশূদ্ররা কিছু সহানুভূতি ও সমর্থন পেয়েছিল বলে সরকারের প্রতি কৃতজ্ঞ থাকার কারণ ঘটেছিল। সামাজিক ন্যায়, আইনের দৃষ্টিতে সমতা, ব্যক্তি হিসাবে স্বাতন্ত্র্যবোধ ইত্যাদি ধারণাগুলি ঔপনিবেশিক সরকারের দ্বারা বিধিবদ্ধ হলেও নিম্নশ্রেণির মানুষেরা অর্থনৈতিক ও সামাজিক অবস্থার জন্য এর ফল ভোগে বঞ্চিত ছিল। কিন্তু এ সম্পর্কে তাদের ধারণাও ছিল সীমিত; খুবই অস্পষ্টভাবে অবহিত ছিল মাত্র।[৩৮]

(পরবর্তী অংশ আগামী সংখ্যায়)

সূত্রনির্দেশ

১. Nityapriya Ghosh & Ashok Mukherjee : Partition of Bengal—Significant Signposts : 1905-1911, Calcutta 2005, Pp. 25-26. কার্জন ঢাকায় ১৯০৪ সালের ১৮ই ফেব্রুয়ারি এক বক্তৃতায় বলেছিলেন, '[The Province] so created would invest the Mohammedans in Eastern Bengal with a unity which they had not enjoyed since the days of the Mussalman Vice roys and kings.' Risley-এর ১৯০৪ সালের ৬ই ডিসেম্বরের Note-এ আছে, 'One of our main objects is to split a solid body of opponents to our rule'.

২. Terrorism in Bengal, Vol. IV. A compilation of secret and confidential documents of the Terrorist and Swadeshi Movement in Bengal. Vols. I to VI, Edited by Amiya K. Samanta, 1995. এরপর থেকে T. B. Documents এই নামে উল্লেখ করা হবে। Pp. 1086-1229. এখানে সংকলিত স্বদেশি ও বয়কট সংক্রান্ত গোপন রিপোর্টগুলি নবনিযুক্ত পূর্ববঙ্গ ও আসামের প্রাদেশিক সরকার ভারত সরকারের নিকট পাঠিয়েছিল।

৩. T. B. Documents, Vol. IV, Pp. 1066-1067. স্টুয়ার্ট বেকারের প্রতিবেদনে উল্লেখ আছে যে তিনি জেলায় ভ্রমণ করে বিশিষ্ট মুসলমানদের সঙ্গে কথা বলে তাঁদের মতামতই সংগ্রহ করতেন না, সরকারের প্রতিনিধি হিসাবে তাঁদের মতামত প্রভাবিত করার চেষ্টা করতেন। একই উদ্দেশ্যে নতুন প্রদেশের গভর্নর Bamfyld Fullerও নিরলসভাবে জেলা পরিভ্রমণ করে মুসলমান নেতাদের নিয়ে মিটিং করতেন। তাদের কাজকর্মে প্রশাসন বিশেষভাবে প্রভাবিত হয়েছিল। ঢাকায় স্বদেশি সমর্থকরা একটি শোভাযাত্রা বের করার চেষ্টা করলে জেলার পুলিশসুপার তাদের কোনও গন্ডগোল হবে না বলে অঙ্গীকার করতে বলেন। মুসলমানদের ক্ষেত্রে অনুরূপ কোনও মুচলেখা দিতে হয় না বলে উল্লেখ করাতে এস পি বলেন, 'I stand guarantee for them.' এরূপ পক্ষপাতিত্বের নমুনা অনেক আছে।

৪. T. B. Documents : Vol. IV. Pp. 1098-1099.

৫. ওই Pp. 1101-1112.

৬. T. B. Documents, Vol. II, Report on the Samities of Barisal. Pp. 800-810.

৭. ওই Vol. II, P. 813.

৮. ওই Vol. IV, P. 1130.

৯. ওই Vol. IV. Pp. 1128-1129. Chief Secretary লিখছেন, 'The magistrate who is a Hindu gentleman alludes to the Swadeshi movement having developed recently into a general movement for the self-government in India.' স্বদেশি আন্দোলনকে হিন্দুদের আন্দোলন হিসাবে ব্যাখ্যা করতেই তৎপর ছিল প্রশাসন। তাই "হিন্দু ম্যাজিস্ট্রেট" সতীশ মুখার্জি এই আন্দোলনকে স্বায়ত্তশাসনের আন্দোলন বলাতে ইংরেজ

শাসকদের ভাল লাগেনি। তাই ব্রাহ্ম সতীশ মুখার্জিকে 'হিন্দু' বানানো হয়েছে। ১৯০৬ সালের ২২শে নভেম্বরের একটি রিপোর্টে দেখা যাচ্ছে যে, সিরাজগঞ্জ মহকুমায়, "all pending cases between the Hindus and the Muslims and different sections of the Mohammedans have been amicably settled". দুই সম্প্রদায়ের সম্প্রীতি বজায় রাখার জন্য জেলাশাসকের উদ্যোগ কল্পনা করতে কষ্ট হয় না। কিন্তু এইভাবে সম্প্রীতি রক্ষা করা সরকারের নীতি ছিল না। তাই সরকার জেলাশাসকের ওপর রুষ্ট হয়েছিলেন।

১০. Renuka Roy : My Reminiscences, Stree, 2005, Pp. 2-3. সতীশ মুখার্জি আই. সি. এস. ছিলেন রেণুকা রায়ের পিতা। স্মৃতিকথায় তিনি লিখছেন ঃ 'When the Bengal Provincial Conference was held in Pabna in 1906 at which Rabindranath Tagore presided and it went off without any incident, the authorities were further incensed. Even Bamfyld Fuller got annoyed because the anti-partition agitation was successful in the area. ... They could not demote or dismiss the district magistrate; all his promotions were, however, stopped'. সতীশ মুখার্জি তাঁর ২০/২২ বছরের অবশিষ্ট চাকুরি জীবনে কোনও প্রমোশন পাননি। রেণুকা রায় পাবনা কনফারেন্সের তারিখটি ভুল করেছেন। এটি হয়েছিল ১৯০৮ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে।

১১. Fortnightly Reports, T. B. Documents, Vol. IV Pp. 1107, 1152, 1160.

১২. ওই, Pp. 1157, 1160, 1167.

১৩. ওই P. 1137.

১৪. ওই Pp. 1175-1195. লাল ইস্তাহারকে গুরুত্ব না দেওয়ার ইঙ্গিত বারবার দেওয়া হয়েছে।

১৫. ওই, P. 1132. গোয়েন্দা প্রধান জেলাগুলি পরিভ্রমণ করে লিখছেন, 'Wherever I have found, the anti-partition agitations of the 16th were engineered entirely from Calcutta'. এই তথ্যটি প্রত্যেক পাক্ষিক রিপোর্টেই উল্লেখ করা হয়েছে। বিপিন পাল যে উত্তরোত্তর তাঁর বক্তৃতায় রাজদ্রোহী হয়ে উঠছেন তাও উল্লেখ করা হয়েছে। সুরেশ বন্দ্যোপাধ্যায় ও বিপিন পালের সমস্ত মিটিং-এর বিবরণ সরকারিভাবে রিপোর্ট করা হত। Pp. 1118, 1122, 1123, 1126.

১৬. ওই, ঃ পৃঃ ১১৪১, ১১৪৭, ১১৬২; সরকার জাতীয়তাবাদী খবরের কাগজগুলি সম্পর্কে যথেষ্ট সচেতন ছিল। এই নজরদারির ফল হল ১৯১০ সালের প্রেস নিয়ন্ত্রণ আইন।

১৭. ওই, পৃঃ ১১৪৭, ১১২২।

১৮. রবীন্দ্রনাথ

১৯. রবীন্দ্রনাথ ঃ পাবনা কনফারেন্সে সভাপতির অভিভাষণ।

২০. T. B. Documents : Vol. IV. Pp. 1169, 1176.

২১. T. B. Documents : Vol. IV. Pp. 1149, 1173.

২২. ওই, Pp. 1169, 1176.

২৩. ওই, P. 1169.

২৪. ওই, P. 1123.

২৫. ওই, P. 1124.

২৬. তাদাত্ম্য (identity) সূচক অভিধাগুলিকে ইংরাজি থেকে বাংলায় অনুবাদ করতে গেলে কিছু অসুবিধার সম্মুখীন হতে হয়। বাংলায় জাতি শব্দটি আমরা বহু অর্থে ব্যবহার করি। জাতি বলতে nationality বোঝায়, আবার race বোঝায় এবং casteও বোঝায়। চলন্তিকায় জাতির অর্থ সমলক্ষণ অনুযায়ী বিভাগ। "জাতের অর্থ জন্মগত সামাজিক বিভাগ।" এই নিবন্ধে চলন্তিকার অর্থেই 'জাত' ও 'জাতি' শব্দ দুটি ব্যবহার করা হয়েছে। কায়স্থ জাত, বাঙালি জাতি। কিন্তু তাহলে 'nation' বা 'nationality'র বাংলা কী? কিংবা বর্ণের ইংরাজি? চতুর্বর্ণ ঠিক জাতবিভাগ নয়। বর্ণের ইংরাজি 'Varna'ই শ্রেয়— এইভাবেই ব্যবহৃত হয়ে থাকে।

২৭. রবীন্দ্রনাথ ঃ সদুপায় (১৩১৫) রবীন্দ্ররচনাবলি, ১৩ খণ্ড, পৃঃ ২৮৩।

২৮. রবীন্দ্রনাথ ঃ অপমানের প্রতিকার (১৩০১), ওই, পৃঃ ২১১।

২৯. রবীন্দ্রনাথ ঃ ওই, পৃঃ ২১২।

৩০. Sumit Sarkar : ওই, Pp. 330-331.

৩১. ওই, পৃঃ ৩৪০।

৩২. T. B. Documents, Vol. IV, P. 1084 এবং Sumit Sarkar, ওই, P. 340.

৩৩. Sekhar Bandopadhaya : Caste, Politics and the Raj. 1990, Pp. 29-30.

৩৪. শিপ্রা বিশ্বাস ঃ অন্বেষণ, ১৯৯৬, পৃঃ ৪৫।

৩৫. Mayasuki Usnda : ' "Pushed Towards the Partition" in Caste System, Untouchability and the Depressed', Ed. H. Katami, 1999 P. 222 শিপ্রা বিশ্বাস ঃ ওই, পৃঃ ১৪৪।

৩৬. Mayasuki Usnda : ওই, পৃঃ ২২৩।

৩৭. Sekhar Bandopadhaya : ' "A Peasant Caste in Protest", in Caste and Communal Politics in South East Asia,' 1993, P. 154.

৩৮. এই প্রসঙ্গে শরৎচন্দ্রের 'মহেশ' গল্পের গফুর চরিত্র স্মরণযোগ্য। নিম্নশ্রেণির মুসলমান গফুর জমিদার, পুরোহিত ও মহাজনের দ্বারা সদা-উৎপীড়িত। কখনও মাথা তুলে কথা বলতে পারে না। সহনশীলতার শেষ সীমায় পৌঁছে সে একদিন জমিদারের আদেশ অমান্য করে বলে বসে, 'মহারাণীর রাজত্বে কেউ কারুর গোলাম নয়।' সামন্ততান্ত্রিক সমাজে ব্যক্তিস্বাধীনতার দোহাই অর্থহীন— কিন্তু ঔপনিবেশিক শাসন অত্যন্ত ক্ষীণভাবে হলেও ব্যক্তিস্বাধীনতার চেতনা সঞ্চার করতে পেরেছিল।

বেঁচে থাকার বৃত্তান্ত

সুধীর চক্রবর্তী

কথাটা বলেছিল সুমতি গড়াই—মাঝবয়েসি সাধারণ একজন মেয়েমানুষ। থাকে আমাদের শহর সংলগ্ন আধা গ্রাম্য জনপদে। জাতে তিলি, কিন্তু বিয়ে হয়েছিল কলুদের ঘরে। তবে ওই জাতই সার। তার বাপ ছিল খেতমজুর। বারো চোদ্দ বছর বয়স হতেই বিয়ে দিয়ে দিয়েছিল চেনাজানা শ্রীকান্ত গড়াইয়ের সঙ্গে—সে জাতব্যবসা না করে রিকশা টানে। ছিরিকান্ত যদিবা পঞ্চম শ্রেণি পর্যন্ত পড়ে হাল ছেড়ে দেয়, সুমতি একেবারে নিরক্ষর। ঘটনাক্রমে শ্রীকান্ত আমাদের বাড়ির কাছাকাছি রিকশা স্ট্যান্ডে বসে। ভোরে গ্রাম থেকে পান্তা খেয়ে শহরে ঢোকে—সারাদিন রিকশা চালায়। দুপুরে পাউরুটি-ঘুগনি খায়। সন্ধের পর রিকশা নিয়ে বাড়ি ঢোকে। স্নানটান সেরে চারটি গরম ভাত খেয়ে ঘুম দেয়। শান্তশিষ্ট মানুষ, সাতেপাঁচে থাকে না—বউয়ের ওপর অগাধ ভরসা। সংসারের শতেক ঝামেলা ঝঞ্ঝাট সুমতিই পোয়ায়। তার বছর পঁয়তাল্লিশ বয়েস কিন্তু চার-চারটে কন্যাসন্তান বিইয়ে সে খানিকটা হতাশ আর হতভম্ব।

এসব ঘটনা দেখে দেখে আমি হদ্দ হয়ে গেছি। শ্রীকান্ত-সুমতির চারটে কন্যাসন্তান যে হয়ে গেছে তার কারণ আমি জানি—একটি পুত্রমুখ দেখতে চাওয়াতেই তাদের এই বিড়ম্বনা। নইলে জন্মনিয়ন্ত্রণের ব্যাপার-স্যাপার তাদের অজানা নেই। সাইকেল চড়া ব্লকের দিদিমণি তাদের কাছে অবাধে 'নিরোধ' বিলোয়, পরামর্শ দেয় অপারেশনের—গ্রামে এখন এসব কোনও নতুন ব্যাপার নয়। যেমন অঙ্গনওয়াড়ি নারীকর্মী (যাদের তারা বলে অঙ্গনাদিদি), কুষ্ঠভীতি দূরীকরণের স্বাস্থ্যকর্মী কিংবা সাক্ষরতা বা সর্বশিক্ষার কর্মকাণ্ড এখন তাদের খুব চেনা। মুশকিল যে এত জেনে-বুঝেও সুমতির পুত্রবাসনা কমে না, গর্ভাধানের ঝুঁকি নেয় এবং গাড্ডায় পড়ে। শ্রীকান্ত তো ভোরে উঠে গাড়ি নিয়ে টাউনে চলে যায়, কিন্তু ক্রমে ক্রমে মেয়েগুলো বড় হয়। তাদের পোশাক-আশাক দানাপানি দিতেই সুমতি জেরবার—লেখাপড়ার প্রশ্নই নেই। এত কিছুর মধ্যেও তার হাসকুটে ভাব আর রঙ্গরসিকতা মরে না। প্রতিবেশী নারীদের বলে : শহর বাজারে বাসনের দোকানে দেখেছ? ডেক বিক্রি হচ্ছে। বড় ডেক সবচেয়ে নীচে সাজানো, তার ওপরে আরেক সাইজ ছোট, তার ওপরে আরেকটা, তারও ওপরে ছোট একটা। তেমনি সাজানো আমার ময়না, আয়না, চায়না আর আন্না। বারো, দশ, আট আর পাঁচ বছর বয়েস। বাপরে যেন কলা গাছের ঝাড়—এমনি বাড়বাড়ন্ত। মানুষটা মুখের রক্ত তুলে যা রোজগার করে সব পেট ভরাতেই শেষ। সাধ-আহ্লাদ বলে কিছুর মুখই দ্যাখলাম না।

নাম যতই দূরছাই মার্কা হোক, কন্যাসন্তানদের কোনও অবহেলা করে না সুমতি—সবই তো ভগমানের দান। দুঃখ আছে, কষ্ট আছে তবে গর্বও তার একটু আছে। তা হল তার স্বামীকে নিয়ে। নেশাভাঙ নেই—মেয়েদের ব্যাপারে যত্নশীল। রাগে কষ্টে সুমতি যদি বা মেয়েদের গায়ে হাত তোলে বা গালমন্দ করে—তাদের বাপ সর্বদা তাদের আগলে রাখে। সাধারণ মানুষ তো! অত উচ্চ আদর্শটাদর্শ নেই কিন্তু বুকভরা ভালবাসা আছে। মাঝে মাঝেই মেয়েদের শখসৌখিনতার জিনিস এটাসেটা কিনে আনে। চুলের ফিতে কি ক্লিপ, সস্তাদামের শোনপাঁপড়ির প্যাকেট। হঠাৎ একদিন এনে বসল কাছিমের মাংস। বাপসোহাগী মেয়েগুলো খলবল করে উঠল। যাকে বলে মাটিতে চাঁদের উদয়।

এখনকার দিনে এমনতর আধা গাঁয়ের জীবনে শহুরে জীবনের আঁচ সদাসর্বদাই লাগছে। তার একটা কারণ টিভি, আরেকটা কারণ খবরের কাগজ। নিমেষে সব খবর চাউর হতে দেরি হয় না। ছোটখাট মুদির দোকানদার তার মুদিখানার একপাশে গুঁড়ো সাবান বা শ্যাম্পুর সস্তা প্যাকেট, পেস্ট, মাথার ক্লিপ, পাউডার, ক্রিম আর লিপস্টিক রাখে। গাঁয়ের মেয়েরা এখন যত না ফ্রক পরে তার থেকে বেশি পরে ম্যাক্সি। বেকার বা মস্তান বা উটকো রাজনীতি করা যুবকদের অভাব নেই। তাদের অনেককে একটা কাজ নিষ্ঠার সঙ্গে করতে দেখা যায়—স্কুলের বালিকাদের গমনপথে নাছোড়

সঙ্গদান কিংবা হালকা আলাপ। অনিচ্ছুক বালিকাটি ক্রমে কিশোরী হয়, দু'চারটে কথার পিঠে তাদের একটু আধটু জবাব দিতেই হয়. এসব আধা গ্রামদেশে মেয়েরা নিজের শরীর দিয়ে জীবনকে, সবচেয়ে আগে বাস্তবকে জানতে পারে এবং সতর্ক থাকে। মনের ভূমিকা বা ইচ্ছা অনিচ্ছার কীই বা দাম থাকতে পারে তাদের? লেখাপড়ার তেষ্টা বা মেধা নেই তেমন, মাধ্যমিক পর্যন্ত এগোয় আর কই? সস্তা রিবনে বাঁধা দুই বেণি, পায়ে হাওয়াই চটি, আধময়লা স্কুল ড্রেস পরে স্কুলে তারা যেতে চেষ্টা করে মোটামুটি দল বেঁধে। ছিটকে পড়লেই কেউ না কেউ একজন দাঁত বার করে এসে গা ঘেঁষে হাঁটতে শুরু করবে—সুযোগ পেলে অন্তরঙ্গতা দেখাতে অন্তত কাঁধে হাত রাখবে কিংবা সাইকেলে উঠতে বলবে—'চল না, একটু পৌঁছে দিই।' একবার যদি সাইকেলের সামনের রকে উঠেছ তো রক্ষে নেই—ফাঁকা পথে সুযোগ বুঝে নাক ডুবিয়ে দেবে চুলে। এসবই তো তারা জানে, তবু শেষমেষ কেউ কেউ ফাঁদে পড়ে—সাইকেলে চড়ে গিয়ে আশপাশ থেকে টিটকিরি শোনে গানের ভাষায়; কুছ কুছ হোতা হায়।

কথাটা বিশদে বলেছিল মীরা। ওই রকম একটা আধা গ্রামের শিক্ষিকা। বিশ বছরের ওপর শহরের বাড়ি থেকে টানা রিকশায় গিয়ে চাকরি করে। আত্মসচেতন, রুচিশীলা, প্রগতিপন্থী। গ্রামের উন্নতি সাধন বিশেষত স্ত্রী-শিক্ষার ভাবনা তার মধ্যে রাজনৈতিক চেতনা থেকেও এসেছে খানিকটা। ছাত্রীদের অভাব অভিযোগ তাই সে শোনে মন দিয়ে, প্রয়োজনে গরিবদের একটু আধটু সাহায্য করে, কোনও কোনও মেধাবী ছাত্রীর বাড়ি নিজের ইচ্ছেতেই উজিয়ে গিয়ে তাদের মা-দের বোঝায় কিছুতেই যেন তারা মেয়ের পড়া বন্ধ না করে, যেন হুট করে অন্যের পরামর্শে তাদের বিয়ে না দিয়ে দেয়। মায়েরা তার অনুরোধে সায় দেয় কিন্তু তাদের আশ্বাস ধোঁপে টেকে না। মীরা রোলকল করতে করতে দিনসাতেক জবাকে অনুপস্থিত দেখে একদিন জিজ্ঞেস করে বসে: হ্যাঁরে—জবা আসছে না কেন? অসুখ-বিসুখ করল নাকি?

ক্লাসের কোণ থেকে বিভা বলে ওঠে : দিদ্‌মনি, জবা মামার বাড়ি গেছে। হি হি। ওর বিয়ে হবে সামনের মাসে।

মীরা আমাকে এসব ঘটনা বলে হতাশকণ্ঠে। মন্তব্য করে; বিশ্বাস করুন দাদা, জবা মেয়েটা দারুণ চটপটে আর বুদ্ধিমতী। স্পোর্টসে আর লেখাপড়ায় খুব মাথা। ফার্স্ট ডিভিসন তো পেতই কিন্তু ক্লাস নাইনেই পড়া শেষ। ভাবলে খুব কষ্ট হয়, কিন্তু কিছু করবার তো নেই। তার বাবা ঘরামির কাজ করে, হতদরিদ্র। ভাল একটা সম্বন্ধ এসেছে—ছেড়ে দিলে আর কি আসবে? আন্ডার এজ কিন্তু তাতে কী? কে বা দেখতে আসে? কিছু করতে পারি না। নারীবাদ নারীবাদ বলে লাভ কী?

আমি বলি : তবু একটা সহায় সম্বল তো হল? খেটে খাওয়া গরিব ঘরামির মেয়ে। তার মধ্যে থেকে খনা বা লীলাবতী কি টিকবে? বিয়ে হলে অন্তত পেট ভরে খেতে তো পাবে। ভাল সংসারও সে পেতে পারে—জীবন তো অনেক বড় তাই না?

মীরা বলে, হ্যাঁ সেটাই একটা সান্ত্বনা। বিকল্প তো নেই—কোন ভরসায় বলব যে ভাল রেজাল্ট করলে একটা হিল্লে হবে? অবশ্য অনেকে বিয়েথার পর ভালই আছে। সাধারণ মানুষ তো—তাই চাহিদা খুব একটা নেই। বাপের বাড়ি এলে স্কুলে দিদিমণিদের সঙ্গে দেখা করতে আসে কেউ কেউ—খুব একটা খারাপ নেই। দু'একজনের ভাগ্য মন্দ তো হতেই পারে। এই তো আমার সাথে চাকরি করে লোপামুদ্রা—বরের সঙ্গে আলাদা হয়ে চলে এসেছে। দু'জনেই উচ্চশিক্ষিত। কিন্তু কি জানেন দাদা, রাগ হয় অন্য একটি ব্যাপারে।

—কী সেটা?

—আজ পনেরো কুড়ি বছর ধরেই দেখছি স্কুলে যে কটা সুন্দরী মেয়ে আছে তাদের মধ্যে বেশির ভাগ মস্তান বকাটে টাইপদের কাছে কী করে যেন ধরা পড়ে ভিড়ে যায়। ওইসব ছোকরাদের যেমন উৎকট চেহারা, তেমনই পোশাক, আর চুলের ছাঁট। কিন্তু কী একটা চার্ম আছে। আছে দুর্দান্ত সাহস আর তারা নির্বিকারচিত্তে নিষ্ঠুর কাজ করতে পারে। তোলাবাজ, সাট্টাবাজ, চুল্লু খায় কিন্তু দারুণ কাঁচাপয়সার দাপ। আমাদের নরম স্বভাবের নিরীহ মেয়েগুলো ওদের কাছে কী করে যেন সেঁটে যায়। বাই হুইলারে চড়িয়ে ওদের ঘোরায়, রেস্টুরেন্টে খাওয়ায়, উপহার দেয়—ব্যস, অমনি সব মজে যায়।

—তারপর?

—হ্যাঁ, বিয়েও হয়। এক গা গয়না পরে এক গাল হেসে দিদিমণিদের সঙ্গে দেখা করতে আসে। দেখে অবশ্য গা জ্বলে যায় আবার ওদের জন্য ভারি মায়াও হয়। আহা রে, কী সুন্দর ফুটফুটে নরম সরম মেয়েটা, দুধে আলতা বর্ণ—পড়ল গিয়ে কাটখোট্টা এক বজ্জাতের কবজায়? নতুন বিয়ে তো! মেয়েটা একেবারে ভালবাসায় হাবুডুব খাচ্ছে যেন। কিন্তু...

—কিন্তু?

—কিন্তু বছর দু'য়ের মাথায় ওদের মধ্যে কেউ কেউ ফিরে আসে। অত সুন্দর চেহারা ততদিনে যেন কাঠিসার হয়ে গেছে। সারামুখে কালি ঢালা—হতশ্রী। ময়লা একটা সস্তা

প্রিন্টের শাড়ি পরনে। হাতে শুধু পলা আর শাঁখা। কোলে একটা রিকেটি বাচ্চা। বর আর এখন নেয় না তাদের। উলটে ভয় দেখায়। আর তাদের বাঁচার রাস্তা নেই—তাই বাপের বাড়ি। বাপ মা তো তাড়িয়ে দেবে না, তবে আদর-আপ্যায়নও করবে কি? তারপরে ওই দুধের বাচ্চা—তার ভবিষ্যৎ কী? কে দেখছে? কাজেই করুণমুখে স্কুলে এসে বলে, 'দিদিমণি— আরেকবার চেষ্টা করলে লেখাপড়াটা শেষ করতে পারব না?'

মীরার মুখে এসব বৃত্তান্ত শুনে মনটা দমে যায়—ভারি কষ্ট হয় সেইসব অদেখা কন্যাদের জন্য। ভাগ্যহত সাধারণ সব মেয়ে। রূপলাবণ্যই তাদের কাল হল। কালোকুচ্ছিৎ নয়, খুব একটা চেকনাই ছাড়াও সাধারণ মেয়েদের কতই তো বিয়ে থা হচ্ছে। মোটামুটি বেঁচেও তো আছে। স্বচ্ছন্দে না হোক, শান্তিতে বা স্বামীসন্তানের বন্ধনে আছে বাঁচার আকাঙ্ক্ষা নিয়ে। সিনেমা দেখে মাঝেসাঝে, বছরে একবার পুজোর সময় আহ্লাদ করে পছন্দসই একটা শাড়ি কেনে, কোনও ধর্মস্থানে বেড়াতে যায় স্বামীকে নিয়ে, পাড়ার কোনও বাড়িতে গিয়ে হাঁ করে কেমন অন্তর দিয়ে টেলিফিল্ম দেখে। স্বামীকে অন্তরঙ্গভাবে জড়িয়ে ধরে আদর করতে করতে বলে, 'একদিন বিউটি পার্লারে নিয়ে যাবে? খুব শখ হয়, স্ট্রেপকাট চুল বানাতে।' স্বামী হাসে, মুখে বলে, 'হ্যাঁ। একদিন যাওয়াই তো যায়।' মেয়েটি বলে, 'আজকাল সবাই কেমন লম্বা চুল রাখে। কেবলই হাত দিয়ে চুল সরায়। টিভিতে দেখি। আমার অমনি করতে ইচ্ছে করে।'

একে বলা যায় সাধারণ মেয়েদের ইচ্ছে। আগেকার দিনের মতো গাঁ-ঘরের মেয়েরা তেমন আর নেই। মেয়েদের বউদের সেই উদয়াস্ত খাটনি, ঢেঁকিতে পাড় দেওয়া শেষ রাত থেকে, সকালে গোয়াল কাড়া, উঠোন নিকানো গোবর দিয়ে, মুড়ি চিঁড়ে ভাজা, পাট কাঠিতে গোবর লেপে জ্বালানি বানানো বা জাঁতা ঘুরিয়ে ডাল ভাঙা, গরুকে জাবনা দেওয়া—আর সেই সঙ্গে বাচ্চাকাচ্চাদের কান্না সামলানো, বয়স্কদের জলখাবার, স্বামীদের হুকুম তামিল করা আর মুনিষদের জমিতে ভাত তরকারি ও তামাক পাঠানো এখন আর তত নেই। গাঁয়ের গেরস্থরা থাকে একই ভিটেয় কিন্তু খায় আলাদা আলাদা। এজমালি জমি পুকুর আছে কারোর কারোর—তার বস্তু ভাগ হয়। পরিবারের এক এক ভাইয়ের এক এক রকম রোজগার আর রুচি। বাড়ির উৎসবে বা পুজো আচ্চায় সকলে এককাট্টা হয়, নইলে সম্বৎসর যার যেমন তার তেমন যাপন। সেই যেন যাদুবিন্দুর গানের মতো :

যে ভাবেতে রাখো গোঁসাই
সেই ভাবেই থাকি—
আমি আর অধিক বলব কি?
কভু দুগ্ধ ছানা মাখন ক্ষীর ননী,
কখনও জোটে না ফেন আমানি—
তখন আ-লবণে কচুর শাক ভখি'।

গাঁয়ের জীবনযাত্রায় এ আলেখ্য এখনও অটুট। এই আছে এই নেই। তবু তার মধ্যে পরিবারের কোনও কোনও ভাই একটু গুছোনো স্বভাবের হয়। পোস্টাপিসে সঞ্চয় করতে শিখেছে। অবরে সবরে হাটে গিয়ে লটারির টিকিট কাটে। কেউ হয়ত জোগাড় করেছে একটা 'প্রাইমারি টিচারি' বা নিজের বাড়ির একটা ছেলে শহরে গিয়ে শিক্ষিত হয়ে কাছের গাঁয়ে হয়েছে প্যারাটিচার। ব্যস, সঙ্গে সঙ্গে তাদের বসতঘরের টালির ছাদ ফুঁড়ে উঠেছে এক তলতা বাঁশের নিশানা, তাতে অ্যানটেনা। কোনও ভাই বাড়ির পাশে টেম্পোরারি চালায় বসিয়েছে আটা কল—ঘটা ঘং ঘটা ঘং আওয়াজে পাড়া অতিষ্ঠ।

এ ধরনের পরিবারের মেয়ে আর তরুণী বউরা সকালে ম্যাক্সি পরে বাড়ির বাইরের দিকে বেড়ার ধারে দাঁড়িয়ে পেস্ট ব্রাশে দাঁত মাজে। তারপরে টিউকলের জলে শব্দ করে মুখ ধোয়। ঘরে তাদের খুব সাধারণ স্তরের একটা ড্রেসিং টেবিল থাকে, তার আয়নায় মুখ দেখলে নিজেকে অন্যরকম লাগে—কেমন যেন বেঢপ-হাস্যকর। আয়নার কাঁচে লাগানো থাকে বিন্দি টিপ। এরা নেল পালিশ লাগায় এবং গান শুনে সত্যে সত্যি ত্বকের যত্ন নেয়। আজকাল আবার কোনও কোনও মেয়ে সাইকেল চড়ে দূরের গ্রামে বা আধা শহরে উচ্চ মাধ্যমিক পড়তে যায়—কেউ কেউ বাড়িতে অবোধ শিশুদের টিউশুনি পড়ায়, মাসে পঞ্চাশ টাকা রেট কিন্তু সেই টাকা আদায় করতে প্রাণান্ত পরিচ্ছেদ। বেশির ভাগ চাষি বলে, 'এখন তো তুমি পড়াও মেয়েডারে—পরে পশ্চাতে ধান উঠলে থোক টাকা সব শোধ হবে।' বারোআনা চাষিই অবশ্য কথা রাখে না—নানা বাহানা করে, দাঁত বার করে হাসে—বলে, 'ওসব লিখাপড়া করে কী যে সব হাত পা গজাবে কে জানে। বাদ দাও।' এরই মধ্যে গ্রাম্য বিদ্যালয়ে ঘণ্টা পড়ে। মাস্টার আসে সাইকেল চেপে। তারা বয়ে আনে অদ্ভুত সব খবর। গাঁয়ের মানুষদের মাস্টারদের ওপর খুবই রাগ। বলে, 'তোমরা ভিন জায়গা থেকে এসে এ গাঁয়ের টাকা নিয়ে যাচ্ছ—সাবধান।'

এইরকম একটা গ্রামে থাকে মাহবুব আলম নামে এক যুবা। না, তাকে বোধহয় আর যুবা বলা যাবে না। ছোট বয়সে তার অবিবেচক বাবা সেহাদন মোল্লা তাকে বিয়ে দিয়ে দিয়েছিলেন, অথচ নিতান্ত কম বয়সেই তিনি মাটি নিয়েছেন। ফলে শহরের

উচ্চশিক্ষা নিতে পারেনি, উলটে তার বাবার সংসার অর্থাৎ মা বোন ভাইয়ের দায়িত্ব এসে গেছে তার শীর্ণ কাঁধে। যৌনতা, কামনাবোধ, জন্মনিয়ন্ত্রণ এসব বোঝার বয়সে না পৌঁছতেই নিতান্ত প্রবৃত্তিবশে সে দুই সন্তানের জন্ম দিয়ে ফেলেছে। তারা এখন যথাক্রমে দশ আর আট বছর বয়েসি। এসব কারণে এবং সংসারের চাপে, দারিদ্রে আর শ্রমে মাহবুব একেবার বুড়িয়ে গেছে। তিরিশ পেরোতে না পেরোতে তার গলার কণ্ঠ বেরিয়ে গেছে, চুল ফিকে হয়ে গেছে—হঠাৎ পেটে আলসারের ব্যথা ওঠে। কারণ সে কোনওদিনই সময়ে খায়নি আর সুযম খাদ্য খাওয়া তার পক্ষে দিবাস্বপ্ন। জমিজমা সামান্য যা ছিল তা বেঁচে মাহবুব বোনের বিয়ে দিয়েছিল। মাঝে দিনকতক সে জনমুনিষ খাটতে গিয়ে ব্যর্থ হয়, কেননা অতটা কায়িক শ্রম, অত রোদে বেগুনপোড়া হবার মতো স্বাস্থ্য তো তার ছিল না। উপরন্তু খানিকটা বিদ্যাচর্চা, কলেজীয় পরিবেশের স্নিগ্ধ স্মৃতি ও বিদ্যার পরিবেশ এমন ক্ষণস্বর্গের স্বপ্ন বরাবরের মতো তার মনে বুনে দিয়েছিল যে জল-মাটি-লাঙল-গরু-বিদেকাঠি-মই-কাদা আর খেতের ঢ্যালা তাকে প্রায় দোজখ দেখিয়ে ছেড়েছিল। সে সভয়ে চাষবাস থেকে পালিয়ে আসে। কিছুতেই ভুলতে পারে না যে কলেজের দেয়ালপত্রিকায় তার কবিতা পড়ে অনেকে ভাল বলেছিল। মোটামুটি জীবনানন্দীয় জগতে তার বিচরণ ছিল এবং তার চোখে শিশিরের ঘ্রাণ, মাটির মায়া, শঙ্খমালাদের রূপকথা বা রাতচরা পেঁচাদের রহস্যময় রোমান্টিকতা এতটাই মোহজাল বিস্তার করেছিল যে সে ইচ্ছে করে এড়িয়ে যেত তার দুই সন্তানের খিদের কান্না, স্ত্রীর অসহায় চেয়ে থাকা বা মায়ের নীরব চোখের ভর্ৎসনা। পান্তাভাত তেল, নুন আর লঙ্কাসহ খেতে পেলে সে নিজেকে মনে করত একজন খোদ খোদার রহমতের গোলাম।

এখন ছন্নছাড়া অনিশ্চিত জীবন আর জীবিকাহীন ব্যর্থ যুবা মাহবুবের সঙ্গে আমার পরিচয় হয় এক গ্রামীণ কবি সম্মেলনে। আশ্চর্য যে সে চমৎকার কবিতা লেখার জাদু ভাষা আয়ত্ত করেছিল কিন্তু তার জন্য একদিনও কোনও পারিবারিক প্রশ্রয় বা পরিবেশ পায়নি।

হঠাৎই সেদিন মাহবুব কেন যেন আমার শহরের বাড়িতে হানা দিয়েছিল। ঠিকানা চেয়ে নিয়েছিল তাই ভেবেছিলাম যে কোনও একটা চাকরির কথা বলবে কিংবা চাইবে কিছু অর্থ সাহায্য। কোনওটাই নয়। সে বার করল ক'টি কবিতার পাণ্ডুলিপি। তার গ্রামপরিবেশে কোনও সমঝদার শ্রোতা নেই—আমার মধ্যে সে খুঁজতে চাইছিল একজন অনুকম্পায়ী কাব্য অনুরাগীকে। কিন্তু তাকে প্রথমেই বাধা দিয়ে আমি কিছু খাওয়াতে চেষ্টা করলাম। গোগ্রাসে খেল দুটো টোস্ট ও মিষ্টি—যেন কতদিন খায়নি। তার চোখের দৃষ্টি উদভ্রান্ত, মলিন পোশাক, শরীর একেবারে হাড়সর্বস্ব। দেখেশুনে আমার গিন্নি তাকে বললেন, দুপুরে খেয়ে যেতে। সে কুণ্ঠিতভাবে রাজি হল কিন্তু কেবলই তার ভাল কবিতা না লিখতে পারার যন্ত্রণার কথা বলতে লাগল। কাউকে খাওয়ানোর মতো আকর্ষণীয় তেমন রসদ বাড়িতে সেদিন ছিল না—তখন দুপুর, বাজারও বন্ধ। যাহোক করে গার্হস্থ্য প্রতিভার স্পর্শে মাহবুবকে ভাত ডাল বড়াভাজা, একটা তরকারি আর চারা মাছের ঝাল দেওয়া হল। আমার সঙ্গে এক টেবিলেই সে সংকোচের সঙ্গে বসল কিন্তু আমরা কর্তা গিন্নি সবিস্ময়ে আবিষ্কার করলাম যে মাহবুব হয়ত কবিতা লিখতেও পারে কিন্তু ভোজনের রীতিপদ্ধতি একদম জানে না। তাই আগে ভাগে মাছ খেয়ে বসে, তারপরে ঝপ করে ভাতের মধ্যে ডাল ঢালে—তরকারির দিকে অসহায়ভাবে তাকিয়ে থাকে। অথচ সাগ্রহে খেয়ে চলে সমানে। তার লক্ষ্য শুধু ভাত আর নুন। এ কী খাওয়ার ছিরি?

দেখেশুনে আমার স্ত্রী আর থাকতে না পেরে বলে ওঠেন, এ কী! তুমি তো খেতেই জানো না? আগে ডাল মেখে ভাজা দিয়ে খাবে—তারপরে তরকারি আর সবশেষে মাছ এই হল খাবার নিয়ম। তুমি কি সব এলোমেলো করে ফেললে! ব্যাপার কী? খাবার দিকে মন নেই?

লজ্জিত মাহবুব বারবার মাপ চাইতে লাগল। বলল, বউদি কী আর বলব—আমাদের হল হা-অন্ন জীবন। সত্যি সত্যি নুন ভাত আর পেঁয়াজ লঙ্কা টিপে আমাদের চাট্টি পেট পোরানো। আব্বা ছিল জন্মরুগি, টিবি হয়েছিল। ওষুধ পথ্য কিছুই জোগাড় করতে পারেনি। চল্লিশ বছর পেরোতে না পেরোতে তেনার গোরে মাটি পড়েছে। রোগাভোগা মানুষ, মাঠের কাজ পারত না। ঘরের এক কোণে বসে হাঁফাতে দেখেছি তেনাকে—পাশে থাকত নারকোলের মালা ভর্তি ছাঁই—তিনি কাশতে কাশতে তাতে রক্তমাখা থুতু ফেলতেন। মরার আগে দু'দুটো বছর আমাদের সংসার যে কেমন করে ছন্নছাড়া হয়ে চলেছে তা কি জানেন? খাওয়ার তরিকা আমরা কী করে জানব? এতসব জানতাম না আমরা। গিন্নি অপ্রতিভ হয়ে বললেন, বুঝতে পারিনি ভাই, চোখের জল ফেল না। খেতে বসে কাঁদতে নেই। এবারে মাহবুব ম্লান হেসে বলে, অথচ খেতে বসে বরাবরই তো আমাদের কান্না আসে। কী খাব? কোথায় পাব? পেট ভরাব কীসে?

প্রসঙ্গ ঘোরাবার জন্য আমি মাহবুবকে জিজ্ঞেস করি, মাহবুব বাড়িতে তো তোমার চার পাঁচজন খাউন্তে মানুষ—মা বউ দুই ছেলে আর তুমি—চলে কী করে? বোনের বিয়ে দিয়ে জমিজমা তো আর কিছু নেই। বোনেদের লেখাপড়াও বন্ধ নাকি?

—না, সেটা আমার মতো সচেতন মানুষের পক্ষে কী মেনে নেওয়া সম্ভব? কোনওক্রমে পড়ছে তারা। মাস্টারমশাইরা বইপত্তর দেন—পড়াশোনার মাথা তাদের বেশ সাফ, ক্লাসে উঠে পড়ে ঠিকঠাক। আজকাল মিড ডে মিল হচ্ছে—দুপুরে খেতেও পায়।

—কিন্তু তুমি ঠিক কী কর?

প্রশ্নটা এড়িয়ে মাহবুব বলে, কিন্তু দাদা আমি কিন্তু আপনাকে আব্বার কথা বলতে চাই। তাঁর মতো নরম মনের মানুষ আর আমি দেখিনি—বসে থাকতেন শেষ দিকে, হাঁপের কষ্ট হত। কিন্তু চেয়ে থাকতেন কুমড়োর চারা কিংবা লাউডগার বাড়বাড়ন্তের দিকে। বলতেন, দ্যাখো এরা কেমন আপনা-আপনি বেড়ে যাচ্ছে।

আমি তর্ক তুলে বলতাম, আপনা-আপনি কি আর বাড়ছে? মাটি থেকে সার আর রস টেনে তবে এই বাড়বাড়ন্ত।

বাবা বলতেন, হ্যাঁ। সেটাই ঠিক। তবে বীজেরও তেজ আছে। তোদের পুষ্টির জন্যে আমি মাটিটা বা রসটা দিতে পারিনা। পেট ভরে খেতেই তো পাস না। তার ওপরে ধর বীজের তেজও আবার কম। আমি বরাবর কমজোরি মানুষ—সেই বীজে তোদের জনম। সারাজীবন রোগাভোগাই থাকবি। ব্যাধি চেপে বসবে এই আমার মতো।

আব্বা যখন এইরকম বকবক করতেন তখন আমি তার কাছে গিয়ে বসতাম। সান্ত্বনা আর কী দেব? তবে নানা আন কথায় মন ভোলাতে চেষ্টা করতাম। তারপরে কিছুতে কিছু করতে না পারলে আমাদের পালপোষা গরু ধলোর কথা তুলতাম। ব্যস, আব্বার চোখের জ্যোতি ফুটে উঠত। বলতেন, তোর মনে আছে কালো আর ধলোর কথা?

খাওয়াদাওয়ার আনাড়ি পর্ব মিটিয়ে ততক্ষণে আমরা বসেছি বাইরের ঘরের সোফায়। মাহবুব বেশ উজ্জ্বল চোখে চেয়ে বলতে লাগল; জানেন তো দাদা চাষিবাসী মানুষের সবচেয়ে বড় ভরসা হল দুটো—জমি আর বলদ। আমাদের নেই নেই করেও যে জোতজমি একদা ছিল তাতে হাল দেবার জন্য আব্বা দুটো গরু কিনেছিল গোহাটে। তাদের বয়স তখন বড় জোর এক বছর হবে। একটা কালো কিন্তু তাতে শাদা ছিটে—আর একটা শাদা কিন্তু মাথার কাছে ছিল কালো খাঁজ। বাবা নাম দিয়েছিল কালো আর ধলো। নিজেই তাদের তোয়াজ করত, জাবনা কাটত, জমি থেকে কেটে আনত ঘাস—কত যত্ন করে খাওয়াত। মা গোয়াল কাড়ত—তাদের শিঙে তেল মাখাত, মাথায় দিত সিঁদুর। কী যে মায়ালি চোখ ছিল তাদের। আব্বা কোথাও থেকে বাড়ি আসলেই কালো ধলো ছটফট করত কতক্ষণে সে যাবে গোয়ালে, একটু গায়ে মাথায় হাত বুলিয়ে আদর করবে। গলকম্বলে নাক ঘষবে চোখ বুঁজে।

সত্যি বলতে কি, মধ্যাহ্নভোজের পর একটু আলস্য আসে—শরীর চায় একটু শয্যাশ্রয়। সামান্য একটু ভাতঘুম। কিন্তু তার বদলে কোন এক অজানা সেহাদন চাষার গরুসোহাগি বৃত্তান্ত শুনতে কি ভাল লাগে? তাছাড়া গরুকে নিয়ে নানা কাহিনি কি আমরাও পড়িনি? মনে মনে গরু ও মুসলমান এমনতর ইকোয়েশন এসে পড়েও। কেননা এত যে আদর সোহাগ তাদের তবু শেষতক তারা তো গরুই খায়। তবে কিসের গরু প্রণয় বৃত্তান্ত।

সরল সাদাসিধে স্বভাবের গ্রাম্য যুবা মাহবুব আমাদের এসব নাগরিক আলস্যপরায়ণতা কিংবা মুসলমানদের নিয়ে কূটকচালি কী বা বোঝে? আমরা ভাবি, গরুকে ভালবাসা, তাদের নিয়ে ভাবাবেগ যেন হিন্দুদেরই একচেটিয়া যেহেতু গরু হল ভগবতী। আমার চিন্তাভাবনার রেশ ছিন্ন করে মাহবুব হঠাৎ বলে বসল, আচ্ছা দাদা আপনি গোফালি বা গোঁফালি কথাটা শুনেছেন?

—গোফালি বলে কিছু তো শুনিনি—কী বলো তো?

—এ আমাদের মুসলিম সমাজের একটা শব্দ। জানেন তো। পালা গরু আমাদের প্রাণ। তাদের নিয়েই তো চাষবাস বেঁচেবর্তে থাকা। তাই প্রাণ থাকতে কোনও মুসলমান তার গোয়ালের গরু বেচে না। কিন্তু অবস্থা বিপাকে বেচতেও হয়। যেমন ধরুন মেয়ের বিয়ে তাই সোনাদানা কিনতে হবে—মানুষজনকে ভোজ দিতে হবে। চাষির তো জমানো টাকা থাকে না। মহাজনের কাছে কর্জ করা আর আত্মহত্যা একই ব্যাপার তাই শেষমেষ গরুকেই বেচতে হয় গো-হাটে—যেন মা লক্ষ্মীকেই বেচা। তো নিতান্ত যখন গোধনকে হাটে বেচতে হয় তখন সারা বাড়িতে ওঠে কান্নার রোল। বিশেষ করে মেয়ে মহলে। সে কান্না চলে বেলান্ত।

—সে তো স্বাভাবিক। তারপর?

—হ্যাঁ, সেটাই সবচেয়ে কষ্টের কাজ। বাড়ির কর্তা তার প্রিয় গরুর লেজের চুলের খানিকটা অংশ কেটে জুতো দিয়ে বেঁধে ঘরের চালের বাতায় ঝুলিয়ে রাখে। তাকেই বলে গোফালি। যে কদিন তার স্মৃতিচিহ্ন থাকে থাক। সামনে ঝোলে—সবাই ঘুরেফিরে দেখে—হাত বোলায়।

গোফালির বৃত্তান্ত বেশ নতুন লাগল আমার। কত কীই যে জানি না। কিন্তু মাহবুব তো কেবল ধলোর কথাই বলে, কালোর কথা বলে না। সেকথা মনে করাতে সে বলে কালো ছিল খুব সাধারণ গরু—ধলোর মতো তার বুদ্ধিসুদ্ধি ছিল না, তাই তাকে নিয়ে কারোরই তেমন আদিখ্যেতা ছিল না। তারও আমাদের ওপর তেমন টান ভালবাসা ছিল না

বোধহয়। সেটা বোঝা গেল পরে একটা আশ্চর্য ঘটনায়। তা কি শুনবেন?

হ্যাঁ, শুনব তো বটেই—আমি চাঙ্গা হয়ে উঠে বসি। জানতে চাই, তোমরা কি সেই কালো ধলোকে বেচে দিয়েছিলে নাকি। গোফালি রেখেছ? এখনও আছে?

—না, এখন আর নেই। অতদিন কি থাকে? সে ধরুন বছর পনেরো আগেকার ঘটনা। তখন আমাদের খুব হতদশা—আব্বার রোগ মোটে তখন ধরা পড়েছে।

—কালো ধলো দুটোই বেচে দিলেন?

—কী করবে আব্বা? ধরুন হাল বলদ সবই বেচতে হল, যাকে চলতি কথায় বলে হালবেহাল। কেননা আব্বার চিকিৎসাখরচ পথ্যখরচ কোথা থেকে আসবে? কালো ধলোকে খড়বিচুলি কিনে খাওয়াতে গেলে টাকা চাই। সংসারই যেখানে আর চলে না—তাই...

কোথায় বেচলে? কে কিনল? এই পর্যন্ত জিগ্যেস করে আমি ক্ষান্ত হলাম। জানতে চাইছিলাম কত টাকা পেয়েছিল কিন্তু তা কি জিগ্যেস করা শোভন?

মাহবুব বলল, কাছেভিটে গরু বেচতে নেই। মায়া থাকে তো, কেবলই মনে হয় যাই একটু চোখের দেখা দেখে আসি। আমরা তাই রাত থাকতে রওনা দিলাম সেই আট ক্রোশ দূরে হবিগঞ্জের গোহাটে। আমরা মানে আমি আর মুরুব্বি আমার এক মামা। আব্বার যাবার প্রশ্নই ওঠেনি, তিনি তো অসুস্থ। আট ক্রোশ হাঁটতে দম বেরিয়ে আসে। কেননা গরুর সামনে পেছনে হাঁটা আর তারা তো যেতে নারাজ। জোর করে টেনে নিয়ে যেতে হয় সময়ে সময়ে। পাঁচনবাড়ি তখন কি তাদের গায়ে আর মারা যায়? ধরুন তারা তো চিরজনমের মতোই চলেই যাচ্ছে—সেটা তারা বুঝতেও পারে। গেরস্থের গরু গেরস্থর হাল সবচেয়ে আগে বোঝে। কদিন ধরেই ধলোর চোখে পানি দেখেছি আমরা। তার গলা জড়িয়ে ধরে আব্বা কেঁদে কুল পায় না।

—আর মা?

—তার তো নাওয়া খাওয়া ত্যাগ হয়ে গিয়েছিল কদিন। শুধু দুটোর শিঙে তেল মাখায় আর কাঁদে। পেটের সন্তানের মতোই ছিল—গায়ে হাত বোলাত, জাবনা খাওয়াত কত মোহব্বতি করে। যাক্‌গে, সংক্ষেপে বলি। যেদিন শেষরাতে রওনা হলাম তার আগের সন্ধেয় মা আর পাকসাক করেনি। কে খাবে? কার মুখে অন্ন রুচবে? ঘরের লক্ষ্মীকে অভাবের জন্য পর করে দিলে ঘরগেরস্থির কি ভাল হতে পারে? শেষ বিকেলে আব্বা আর মামা কালো-ধলোর গোফালি কেটে চালের বাতায় আটকে দিল সুতুলি দিয়ে বেঁধে। সেদিকে আর কেউ তাকাতে চায় না, কিন্তু চোখে পড়ে যায়—আর সঙ্গে সঙ্গে হু হু করে সে কি চোখের পানি।

একটু থেমে মাহবুব বলে, আব্বাকে সেই সন্ধেয় তার অজান্তে ঘুমের ট্যাবলেট দেওয়া হয়েছিল। অসুস্থ মানুষটা কালঘুমে জানতেই পারল না কোন শেষরাতে তার পরানপুতলি বাড়ি ছেড়ে চলে গেল হাটে।

দু'জনের হাতে দু'গাছা কড়ায় বাঁধা দু'খানা বলদ। বেলা বারোটা নাগাদ পৌঁছলাম হবিঞ্জের গোহাটে। ওরে বাপরে সে যাকে বলে শতাবধি মানুষ আর মানুষ—মাহবুব বলে।

তাকে বাধা দিয়ে বলি, কী বললে? শতাবধি মানুষ?

মাহবুব লজ্জিত হেসে বলে, এ হল গ্রামদেশের কথার ভাঁজ। জীবনানন্দ-র মতো তারা কি বলতে পারে—'এক দুই তিন চার....অজস্র অপার?' শতাবধি মানে অগুন্তি। ওই যেমন বলে অসাগর পানি। তার মানে থৈ থৈ করছে বন্যার জল। তো সেই মানুষের বন্যায় আমরা কালো আর ধলোকে নিয়ে গিয়ে সবে দাঁড়িয়েছি, সঙ্গে সঙ্গে দালাল ধরেছে। কোথায় বাড়ি? কী দাম? বলদের উমর কত? আমার চোখ ফেটে জল এসে গেল। ভাবলাম, ইস, এরা তো এখন আর আমাদের সেই কালো ধলো নয়—বিক্রির মাল। এদের এখন যাচাই হবে, লক্ষণ দেখা হবে, দামের ওঠানামা হবে...ছিঃ। আমি একটু তফাতে দাঁড়ালাম। ওইসব কঠিন পাষণ্ডের কাজ কি আমি পারি?

—কী করে পারবে? তুমি কি কোনওদিন গোহাটে গিয়ে গরু বেচাকেনা করেছ? তুমি হচ্ছ কবি মানুষ....নরম-সরম।

—সেইজন্যেই তো আব্বা মুরুব্বি এক মামাকে সঙ্গে দিয়ে দিয়েছিল। রসকষহীন সে এক কঠিন চাষা। হেঁকোডেকো মানুষ। দরদাম করতে লাগল নানা জনের সঙ্গে। বেলা দুটো আড়াইটে নাগাদ কাজ শেষ। কালোকে নিল একজন, ধলোকে আরেকজন। টাকা গেঁজেয় পুরে কোমরে বেঁধে মামা চলল, তার পেছনে মনখারাপ আমি।

কী করে বিদায় দিলে? দিতে পারলে?

মাহবুব চোখ ঢেকে বলল, সত্যি কথা বলছি দাদা—আমি আর ওদিক মাড়াইনি। কী জানি ধলো কী রকম করে চেয়ে থাকবে—এত বড় বিশ্বাসঘাতক তোমরা? বলবে তো কথাটা তার নিজস্ব গো-ভাষায়। নাকি?

আমি তারিফ করে বললাম, খুব সুন্দর করে কথাটা বললে মাহবুব—গো-ভাষা। কথাটা কি এক্ষুনি বানানো? বাঃ বাঃ।

লজ্জিত ভঙ্গিতে কবি মাহবুব বলল, হ্যাঁ। কথাটা এখুনি মনে এল—গো-ভাষা। হ্যাঁ, তাই-তো। আপনারা বলেন কবিদের নিজস্ব কবিভাষার কথা—এও তেমনি গো-ভাষা। তার প্রকাশ হয়ত নেই কিন্তু ভাবটা বুঝে নেওয়া যায় তাদের

কাজলটানা অবোধ চোখের চাউনিতে। বিশেষ করে ধলো, তার যেমন বুদ্ধি তেমনই শান্ত নরম ভাব।

ফেরার সময় হাটের বাইরে একটা হোটেলে মামা সেই গরু বেচা টাকায় ভাত গোস্ত খেল, শরাবও খেল। আমার মুখে কিছু রোচবার কথা নয়। তবু মামা হম্বিতম্বি করে রুটি আর আন্ডার তরকারি খাইয়ে ছাড়ল। মনে আমার খুব অভিমান হল আবার আফশোস হল—ইস্ কে যে ধলোকে কিনে নিয়ে গেল। কী তার নাম....কোথায় বাড়ি...কিছুই তো জানা হল না।

নেশাগ্রস্ত মামাকে কথাটা বলতে সে বলল, চোপ। গরু বেচে আর পেছনে তাকাবে না। তাহলেই মায়ার বাঁধনে পড়ে যাবে। যে কিনেছে তাকে আমাদের গাঁয়ের হদিশ দেবার দরকার কী? আমি তাই কিছু বলিনি, জানতেও চাইনি। তবে লোকটা গোয়ালা, যে ধলোকে নিয়েছে। কালো মুসলমান ঘরেই গেছে। —কী করে টের পেল, মাহবুব জানতে চেয়েছিল।

—গোয়ালাটাকে দেখলেই বোঝা যায়। খাটো ধুতি, গায়ে ফতুয়া, গলায় কণ্ঠি। প্রথমেই জানাল তার গোয়ালে চারটে গাই—হলস্টিন। জমি চাষের একটা বলদ দরকার তার, আরেকটা আছে। কেবলই বলে 'হরেকৃষ্ণ'। চারটে হলস্টিন আছে মানেই দুধের ব্যাপারি। আর কালোকে যে কিনল সে যে আমাদের স্বজাতি তা বুঝতে তার ভাষাই যথেষ্ট। গরুর লেজ দেখেই সে বলল, গোহালি রেখে দিয়েছ দেখছি। ইনশাল্লা এর পালপোষ ভালই হয়েছে বুঝছি। মুসলমানে গরুর যত্ন জানে।

মাহবুবের বর্ণনার রং শুনে চমকে উঠি। মানুষে মানুষে কত যে প্রচ্ছন্ন বোঝাপড়া। কেমন আশ্চর্য সব জাতাজাতির নিশানি। কৃতজ্ঞ বোধ করি মাহবুবের কাছে—যেন সে একটা পুরো মনুষ্যসমাজের জীবনযাপনের ছবি বয়ে এনেছে। ভাগ্যিস সে আমার আহারান্তিক আলসেমি দেখে নিজেকে গুটিয়ে নেয়নি—জোর করেই প্রায় তার কালো ধলোর আশ্চর্য কথন শুনিয়েছে। কী মর্মান্তিক অথচ জীবনরসে পুষ্ট এই আখ্যান। যার কেন্দ্রে দুটি মানবেতর প্রাণী।

ক্লান্ত বিষণ্ণ মাহবুবকে বলি, এখন তো আর ধলোর জন্যে তোমার শোক দুঃখ কিছুই নেই। কত বছর তো হয়েই গেছে এখনও এই ঘটনা তোমাকে এত বিচলিত করে কেন? ধরো তোমারসেই আদরের ধলো এখন তো বেঁচেই নেই...তবু কেন তার কথায় তোমার চোখ ভিজে?

মাহবুব বলে, সে রহস্য আপনি বুঝবেন না। শহরে থাকেন, প্যাকেটের দুধ খান, কিংবা গুঁড়ো দুধ। আপনাদের কাছে দুধ মানে একরকম তরল পানীয়...

বাধা দিয়ে বলি, তা কেন? জীবনদায়ী...পুষ্টিকর...সুষম খাদ্য। জানো তো ডেয়ারিতে আজকাল নানারকম রিসার্চ হচ্ছে! সরাসরি খাঁটি দুধ নাকি পেটের পক্ষে খারাপ, তাই তাতে আরও কীসব মিশিয়ে বেরচ্ছে। ডেয়ারি মিল্ক।

মাহবুব বলে, আপনাদের কাছে গরু মানে দুধ। আমাদের গ্রামজীবনে গরু হল মানুষের সুখদুঃখের সঙ্গী। বাচ্চারা তাদের সঙ্গে খেলে। জমি চাষে তাদের অংশ খুব জরুরি। সকলের তো ট্র্যাক্টর নেই। তারপরে ধরুন গোবর...জ্বালানি... কী জানেন দাদা, চাষার জীবনে গরুর গল্পের কোনও শেষ নেই। চাষার বাড়ি ঢুকলেই গোবর আর চোনার গন্ধ পাবেন—এটা হল জীবনের একটা স্বাদ...অবাধ অগাধ।

বুঝতে পারি মাহবুবকে এবার জীবনানন্দে পেয়েছে। জীবনের স্বাদ অবাধ অগাধ এমন বাচন আর কার হতে পারে? কিন্তু তার গরুবৃত্তান্ত এবার তো ক্ষান্ত করা দরকার। তাই দীর্ঘশ্বাস-চাপা মাহবুবকে জিগ্যেস করি, আর তো এখন তোমাদের গরু নেই।

—সে তো আমাকেই দেখছেন...শ্রীহীন রুগ্ন। গরু আর কোনওদিনই আমাদের বাড়ি আনা হয়নি। বাড়িতে অপঘাত মৃত্যুও তো ঘটেছে। ভাইটা মার্ডার হয়েছে।

—সে কী! কেন? তার সঙ্গে গরুর কী সম্পর্ক?

—গরু চলে গেলে বাড়িতে নানা উপসর্গ এসে জোটে...এসব আমাদের গ্রামদেশের বিশ্বাস। নইলে গরিবের ঘরের ছেলে খইবরের মাথায় রাজনীতি এসে ঢুকবে কেন? আব্বাও মরল, সেও ঢুকে গেল পার্টিতে। তাতেই মরণ—বাড়িতে এসে গুলি করেছে—না, কিনারা হয়নি।

গল্পের গরু গাছে উঠে শুনেছিলাম কিন্তু তাই বলে বাড়ির গরু অভাবের তাড়নায় বেচে দিলে যে পরিবারে অনাকাঙ্ক্ষিত উপদ্রব এসে পড়ে এমন কখনও শুনিনি। অবশ্য কতটুকুই বা আমরা জানি বা শুনি! এই যেমন মাহবুব হঠাৎ না এলে গোফালি থেকে শুরু করে এতরকম গো-ঘটিত অনুপুঙ্খ আমার কি জানা হত? সেইজন্যই দেহতত্ত্বের গানে বলে : 'মানুষ হয়ে মানুষ চেনো/মানুষ রতনধন'। সে তো বটেই, মানুষ ধনরত্নের মতো মূল্যবান কিংবা বোধহয় মানুষই রতন। সেই রতনের কিন্তু কোনও বিনিময় মূল্য নেই। অথচ সমাজের অর্থনীতির কী সব অদ্ভুত নিয়মনীতি। পুঁথিপড়া বিদ্যেবোঝাই বাবুমশাই আমি বেশ করে খাচ্ছি সমাজে, দেখনসই একটা বাড়িও আছে আমার। অথচ অভিজ্ঞতায় টইটম্বুর জীবনের দুঃখসুখের ঢেউ খেলানো ভরপেট মাহবুব আজ জানে না কাল কী খাবে। সে এক অসম্পূর্ণ শিক্ষিত বেকার।

ভাবতে ভাবতে আমার দিশা হারায়। সত্যি তো কেমন করে মাহবুবদের নিত্যদিন কাটে তার হালহদিস আমি কি জানি? আন্তরিকভাবেই তাই জানতে চাই : মাহবুব তোমাদের জমিজিরেত নেই, মুনিষ খাটবার শক্তি নেই শরীরে। সমর্থ সাজোয়ান ভাইটা মরে গেছে গুলিতে। বাড়িতে আছেন বিধবা মা, তোমার বউ, তুমি, তোমাদের দুটো বাচ্চা। কী করে চলে?

মাহবুব খুব শান্তস্বরে বলে, কাঁঠালের বোঝা কাঁঠালগাছই বয়।

সঙ্গে বিদ্যুৎ চমকের মতো আমার মনে পড়ে গেল আমাদের নিতান্ত পরিচিত সুমতি গড়াইয়ের কাছে এই কথাটা প্রথম শুনে আশ্চর্য হয়ে গিয়েছিলাম। তার বাড়ি অবশ্য মাহবুবদের মতো গহন গ্রামে নয়—তারা বলতে গেলে আমাদের শহরের কাছে-ভিতে আধাগ্রামে থাকে। তার বর শ্রীকান্ত শহরবাজারে রিকসা চালায় বলে চোখকান খোলা। স্বামীর সুবাদে সুমতি অনেক শহুরে কথা, গুজব কিংবা ফ্যাশনের খবর রাখে। এখন হতে পারে যে সুমতির বেড়ে ওঠার বাপের বাড়ি হয়ত ছিল মাহবুবের মতো কোনও অজগাঁয়ে—যেখানে অন্ধবিশ্বাস, ভূতপ্রেত, গরুসেবা, অভাব অনটনের সঙ্গে বেঁচে থাকে নানা প্রবাদ-প্রবচন। আর কে না জানে প্রবাদ-প্রবচন পাখির মতো পরিযায়ী। হেথাকার কথা হোথা যেতে সময় নেয় না—কেননা মানুষের স্মৃতি আর রসনার মধ্যে তার বসবাস। ঝপ করে অবস্থা বুঝে তা বেরিয়ে আসে। তাছাড়া বোঝাই যাচ্ছে কাঁঠাল সংক্রান্ত এই প্রবচন একেবারে ভূমিজ অভিজ্ঞতার তাপে কত সমৃদ্ধ। আটদশ কেজি ওজনের কাঁঠাল তো আকছার ফলে—বাজার থেকে একটা কাঁঠাল কিনে ব্যাগে ভরে হাতে ঝুলিয়ে আনতেই প্রাণান্ত হয়। অথচ গ্রাম্য সড়কে যেতে যেতে কতই দেখেছি একটা কাঁঠাল গাছের কাণ্ডকে জড়িয়ে ধরে দশ বিশটা কাঁঠাল ঝুলছে এবং সে বোঝা কাঁঠালগাছই তো বয়। জীবনও সেই রকম বহনক্ষম বুঝি? প্রকৃতি থেকে পাঠ নিয়ে বোধহয় মানুষ ঘাতসহ হয়।

কিন্তু সুমতি কথাটা বলেছিল অন্য প্রসঙ্গে। পাড়ার রিকশাস্ট্যান্ডে তার বর শ্রীকান্ত থাকে, অবরেসবরে তার গাড়িতে চড়ে যখন কোথাও যাই তখন সে বেশ বকবক করে। আর কে না জানে, রিকশাচালক মানেই স্থানীয় খবরের খনি। কারণ তাদের সাহায্য সবাই নেয়। এই যেমন আমাদের পাড়ার বিপত্নীক শিক্ষক সুদীনবাবু বেশ ধোপদুরস্ত আদর্শবাদী মানুষ। একমাত্র মেয়ের বিয়ে হয়ে গেছে। একা মানুষ অথচ সংসারে শতেক চাহিদা—সেসব পূরণের ফাইফরমাস খাটতে শ্রীকান্ত আছে। একজন মহিলা এসে রান্নাবান্না করে দিয়ে যায়, একজন পরিচারিকা বাকি কাজ করে দেয়। কিন্তু তাদের যেসব ছোটখাট চাহিদা, যেমন গুঁড়ো সাবান গেছে ফুরিয়ে, চা বাড়ন্ত, এক্ষুনি লাগবে ডিম পাউরুটি—ডাক শ্রীকান্তকে। সেসব ঠিকই আছে। কিন্তু সন্ধ্যাকালে সুদীনবাবুর যে একটু মদ্যপানের নেশা আছে তা কি কেউ জানে? খবরটা শ্রীকান্ত মারফত জানাজানি হয়ে যায়—কারণ প্রতি সন্ধ্যায় বাড়ি ফেরার আগে সে-ই তো ব্যাগে পুরে মালটা এনে দেয় চুপিচুপি। বেশি মাল একসঙ্গে আনান না মাস্টারমশাই—কে বলতে পারে কাজের লোকরা কখন দেখে ফেলবে। বোতলগুলো শ্রীকান্তই পাচার করে, নিশ্চিন্ত। এসব গোপন গুহ্য খবর শ্রীকান্তই বলে গাড়ি প্যাডেল করতে করতে। আমার তত শোনার আগ্রহ নেই কিন্তু তার হল বলার নেশা।

শ্রমজীবী মানুষদের কথাবলার একটা নেশা থাকে। আর সেই সঙ্গে তাদের অভিজ্ঞতার থলিতে থাকে নানা বেড়াল। একসময়ে যখন জীবিকার কারণে চন্দননগরে যেতাম সপ্তাহে পাঁচদিন তখন নামতাম কাঁকিনাড়া স্টেশনে। বাঁধা রিকশা ছিল ট্রেনের টাইমের সঙ্গে মিলিয়ে। রিকশাওলা রামচরিত ঝা ভাগ্যান্বেষণে দেশভাইদের সঙ্গে এসেছিল বিহারের আরা জেলা থেকে। জগদ্দলের বস্তিতে স্থিতু হয়ে গেছে এখন বিয়েশাদি করে বাল বাচ্চা নিয়ে। জগদ্দল কাঁকিনাড়ার অপসামাজিক জগৎ তার নখাগ্রে। একদিন ট্রেন থেকে নেমে তাকে বলি, চালাও। দাঁড়াচ্ছ কেন?

রামচরিত বলল, একটু ঠাইরিয়ে যাই কেনকি এখন একটা বোমাবাজি হবে, সেইরকম আঁচপাঁট দেখেছি।

ভয়ার্ত কণ্ঠে বলি, কী সর্বনাশ! বোমাবাজি হবে এক্ষুনি?

—ঘাবড়াবেন না। রেললাইনের এপারে আর ওপারে দুইদলের মধ্যে বোম ছোঁড়াছুঁড়ি হবে এই ধরুন দশ মিনিট—কেউ মররে না, কেউ টার্গেট নেই।

—তবে? বোমাবাজি কেন?

—ওই দু'দলের পাওয়ার দেখাবে। বলতে চাইবে, আছে আমাদেরও মাল আছে—হুঁশিয়ার। তবে ভেতরের খবর আমরা জানি।

—সেটা কী?

—সেটা হল বোমার ধক্ বেশি দিন থাকে না। তখন লোকদেখানো একটা ফাইট করে খরচ করে ফেলতে হয়। আজ সেরকম একটা নকল লড়াই হবে। দেখুন না মাজাকি।

সত্যিই প্রায় সঙ্গে সঙ্গে দু'দিক থেকে শুরু হল বোমা বর্ষণ। বহুলোক ছুটল এলোপাতাড়ি, তারস্বরে কুকুর ডেকে উঠল, কয়েকটা দোকানে ঝাঁপ পড়ে গেল। কেবল রামচরিত আর কটা রিকশাঅলা সওয়ারি নিয়ে একপাশে গাড়ি

ভেড়াল। কিছুক্ষণের মধ্যে সব সুনসান, শান্ত। দু'দলই ভেগে গেল গলিঘুঁজি দিয়ে। তারপরে সদলবলে পুলিশ এল। রামচরিত বলল, চলুন এবারে। আর ঝামেলা নেই।

একেবারে যাকে বলে ভানুমতীর খেল। নিমেষে সব নর্মাল হয়ে গেল। বহুদর্শী ও প্রাজ্ঞ রামচরিত বলল, এমন দিনরাত নেই যে জগদ্দল এরিয়ায় একটা দুটো হাঙ্গামা বা রাহাজানি কি কেপমারি না হবে। বোমাবাজি তো পানাপানি। চটকল এরিয়া এটা—সাট্টাবাজ গুন্ডা বদমাস ডাকু চোর ছ্যাঁচ্চোর সবাই ব্যস্ত। মার্ডারও হয় মাঝে মাঝে। তবে পাবলিকের কোনও ভয় নেই। আমাদেরও কখনও ছিনতাই ফিনতাই হবে না। সব হল টক্করের খেলা দু'দলের মধ্যে। পুলিশ সবই জানে—দু'দিকেই টাকা খায়। তবে মাঝে মাঝে দু'একটাকে লকআপে পুরে দেয় ওই লোকদেখানো বোমাবাজির মতো এটাও সাজানো। কী বুঝলেন?

বোঝবার আছেটা কি তাই তো জানি না। আমাকে নির্বাক দেখে রামচরিত যে থামবে তা হবার উপায় কী? সে উজিয়ে বলে, কাল আমাদের পাড়ার পাশের ধোবিপট্টিতে চারটে মার্ডার হয়েছে। আমি বললাম, বলে দিলেই হল—কে আর দেখতে যাচ্ছে।

একথা শুনে রামচরিত ভয়ানক চটে গিয়ে বলল, আমাকে বিশোয়াস করলেন না তাই না? ঠিক আছে।

আর কোনও কথা নয়। —শুধু একমনে গাড়ি টানতে লাগল সে। পথেই পড়ে জগদ্দল থানা। হঠাৎ পথ ছেড়ে নেমে গেট দিয়ে সে আমাকে রিকশাশুদ্ধ সোজা থানার কম্পাউন্ডে ঢুকিয়ে দিল। বলল, এবার আপন চোখে দেখুন।

একেবারে বিস্ফারিত চোখে আমাকে দেখতে হল একপাশে রিকশার পাদানিতে চার চারটে লাশ দড়া দিয়ে বাঁধা। তাদের লুঙ্গি গেঞ্জি রক্তে মাখামাখি। মুখে মাছি ভনভন করছে। কয়েকটা পুলিশ আশপাশে বসে খৈনি খাচ্ছে যেন কিছুই ঘটেনি। সারা রাস্তা রামচরিত আর কোনও কথা বলল না, তবে নীরবে বুঝিয়ে দিল যে তার শ্রেণির শ্রমজীবীদের থলেতে অনেক বেড়াল থাকে।

পরে নানারকম পেশার মানুষের সঙ্গে মেলামেশা করতে করতে জানতে পেরেছি সবচেয়ে বহুদর্শী হচ্ছে যে কোনও শ্রেণির গাড়ির চালক। তাদের মধ্যে সেরা হচ্ছে রিকশাচালকরা। তারপরেই স্টিয়ারিং হাতের ড্রাইভাররা। তবে সাধারণত ড্রাইভারদের একটু গুমোর থাকে। দেখেছি পরের গাড়ি চালালেও তাদের অহংভাব মোটেই কম থাকে না। তার একটা কারণ নিশ্চয়ই গতি, দুরন্ত গতি, যা থাকে হাতের কব্জায়। খেলাচ্ছলে যে স্পিডোমিটারে গতি তোলে। এরা কথা কম বলে কিন্তু বললে তা হয় এক একটা মোক্ষম বাণী।

এমন যে ভুয়োদর্শী জীবন আর দ্যোতনাময় কথা বলার শক্তি তার পশ্চাৎপটে অনেক সময়ে থাকে অন্য একটা বস্তুর প্রভাব—তা হল মদ। মোদোমাতাল মাত্রই যে দার্শনিক এবং নরম মনের মানুষ সে তো আমরা অহরহই দেখি। ড্রাইভারদের মধ্যে শতকরা সত্তর ভাগই নেশাখোর। কেউ গাড়ির স্টিয়ারিং ধরার আগেই খায়, কেউ খায় যাত্রাশেষে। তার মধ্যে অস্বাভাবিক কিছু নেই, কারণ গাড়ি চালানো আগাগোড়া একটা মস্ত টেনশনের ব্যাপার। তবু মদ্যপানের জন্য দুর্ঘটনা ও জীবনহানি আকছার ঘটে। সেইজন্যে গড়পড়তা পাবলিক ড্রাইভারদের একটু সন্দেহের চোখে দেখে। কিন্তু আমাদের চেনাজানার মধ্যে তারাপদ নামের যে মাঝবয়েসি জিপ ড্রাইভারকে দেখেছি তার মতো দ্রষ্টা বা দার্শনিক সচরাচর দেখিনি। তারাপদ সরকারি বাস্তুবিভাগের জিপ ড্রাইভার। পোশাকেআশাকে সদা ফিটফাট, দাড়ি কামানো ঝকঝকে গাল, টি শার্টে বাহারি প্রিন্ট। বলে, সাহেবসুবোদের নিয়ে চলাফেরা করি, একটু ফাটে থাকতেই হবে ব্রাদার।

এক্ষেত্রে সাহেবসুবো মানে বাস্তুবিভাগের বড় মেজ সেজ ইঞ্জিনিয়ার। তাঁদের অফিসিয়াল কথাবার্তা শুনতে শুনতে সরকারি কাণ্ডকারখানার হাড়হদ্দ তার মুঠোর মধ্যে। তার রঙ্গরসিকতাবোধ এতটাই অভিনব যে অফিসাররাও তাকে পছন্দ করে। এ ব্যাপারে তার ফুট কাটার যে একটা অত্যাশ্চর্য বৃত্তান্ত সে নিজেই বলেছিল আমাদের তা অবিস্মরণীয়। কথাটা তার মুখ দিয়েই শোনা যেতে পারে।

তার আগে বলা দরকার, তারাপদ দত্ত একটু থেমে থেমে কথা বলে এবং কথার ফাঁকে চমৎকার চোখ মারে। তার অর্থ হল বুঝলে কিনা। একদিন সে আমাদের আসরে কী করে যেন এসে পড়েছিল। সাধারণত তার সঙ্গে আমার দেখা হয় পাড়ার মোড়ে চায়ের দোকানে। বেশ ক'বছর আগে সন্ধেবেলা তাকে একবার চা অফার করে মোক্ষম জবাব পেয়েছিলাম। চোখ মেরে বলেছিল, 'দাদা সন্ধের পর চা-ফা আমরা ছোট বয়সে খেতাম। যেদিন থেকে জ্ঞানচক্ষু খুলেছে সেই থেকে চুল্লু খেয়ে সকালের আচমন, আর পাঁচ খেয়ে সন্ধ্যাহ্নিক'। সকালে দশটা নাগাদ সে চায়ের দোকানের পাশের ঝোপড়িতে মদের ঠেকে এসে চোখ বুঁজে একপাত্র খেয়ে নেয়। এখন তার ডিউটি শুরু হবে। একজন ফুট কাটল, কি তারাপদদা ডিউটির গোড়াতেই...

তার কথা শেষ হবার আগেই তারাপদ বলল, গাড়িটাকে পরিষ্কার টরিষ্কার করে ভালভাবে তেল-মবিল খাইয়ে

নিয়েছি—তাহলে আমারও তো ব্রাদার তেল-মবিল লাগবে তাই না? বলেই সেই মোক্ষম চোখ মারা।

তো সেই তারাপদ একদিন কেন যেন আমাদের আসরে এসে গজগজ করতে লাগল। কী হল কী? সকলে জানতে চাইতেই সে বলল, সায়েবদের কথাবার্তার কোনও মাথামুণ্ড নেই।

—কেন? কড়কেছে?

—কে বে তারাপদ দত্তকে কড়কাবে? শালা কত সায়েবকে পার করলাম আর এ তো সিসু। শিশুকে Sisu উচ্চারণ থেকেই বোঝা গেল সে রঙে আছে। তাকে ঘাঁটিয়ে লাভ নেই। মুখহল্‌সা মানুষ নিজেই বলবে।

ঠিক তাই হল। বলল, আজ বড় সায়েবের অফিসে ইন্সপেকশনে এসেছিলেন ডিভিশনাল ইঞ্জিনিয়ার। তাদের কাজকাম খতম হতেই বড়সায়েবের হুকুম হল বেথুয়াডহরির বনবাংলোয় যেতে হবে...মানে বস-কে একটু ফুর্তিফার্তা, চিলিচিকেন সঙ্গে মালঝাল খাওয়াবে আর কি, বুঝেছ? সিভাস রিগাল...বনেদি মাল। খানসামাদের সঙ্গে দোস্তি আছে তো, তাই একটু তলানি পেটে পড়েছে। জাত জিনিস...পেটে এখনও কথা বলছে।

—তো ঘটল কী?

—না, মানে ঘটেনি কিছু। সায়েবদের কথার মাঝখানে একটা ফুট কেটে মহামুশকিলে পড়ে গেছি। তখন ফিরছি, বুইলে। মেজাজটা টঙে রয়েছে। বড় সায়েব আর ডিভিশনাল সায়েব তাদের ডিপার্টমেন্টের কথা বলছেন। আলোচনা হচ্ছে স্টাফদের মধ্যে কে কে যেন টেম্পোরারি রয়ে গেছে, পার্মানেন্ট করা দরকার। সেসব নিয়ে নানা কচকচি চলতে লাগল। ফিনান্সের অ্যাপ্রুভাল না কী সব ফাঁকড়া আছে কথা হচ্ছিল তাই নিয়ে। কী মনে হল গাড়ি থামিয়ে দিলাম। ডেড স্টপ।

—সঙ্গে সঙ্গে বড় সায়েব বললেন, 'কী হল দত্ত? এনি প্রবলেম?' আমি বললাম না, গাড়ির কোনও প্রবলেম নেই। প্রবলেম আপনাদেরই কথাবার্তায়। এই যে সমানে আধঘণ্টা ধরে পার্মানেন্ট আর টেম্পোরারি নিয়ে কচলাকচলি করছেন তাতে লাভ কী? লাইফটাই তো ধরুন গিয়ে টেম্পোরারি।

—বলো কী? বলে দিলে?

—হ্যাঁ। সঙ্গে সে কী হাসি সায়েবদের।

দত্ত এরপরে বলল, সায়েবদের ওই হাসি দেখে আস্কারা পেয়ে আমি বলে বসলাম, 'সায়েব, এমনকী এই যে আপনাদের চাকরি, এত বোলবোলাও, এত ট্যুর, এত খানাপিনা, এ-ও ধরুন গিয়ে পিয়োরলি টেম্পোরারি।' শুনে তাদের হাসি থেমে গেল। ডিভিশনাল সায়েব বললেন, 'দত্ত তুমি ড্রাইভার না ফিলোজফার?' আমি চুপ করে থাকলাম।

আমরা দত্তকে বললাম, চুপ করে গেলে কেন?

দত্ত চোখ মেরে বলল, আসলে মনে ভয় ঢুকে গেল—সত্যিই তো, আমার সার্ভিসও তো বলতে গেলে টেম্পোরারি। মোটে তো পাঁচ বছর আছে। আর তো আমার পশ্চিম দিকে যাওয়া হবে না!

—পশ্চিমদিকে যাওয়া বলতে?

—দেখ ছোট মুখে বড় কথা হয়ে যাবে তবু বলব, জীবনে যেটুকু যা শিখেছি সব এই স্টিয়ারিং ধরে। গাড়ির সিটে বসে এপাশ ওপাশ সামনে পিছনে চেয়ে চেয়ে অনেক কিছু তো দেখলাম। দেখি সূর্য ওঠে পুবদিকে, অস্ত যায় পশ্চিমে। এর কারণ কী? ভেবে দেখেছ কখনও? এর কারণ শুধু ড্রাইভারই বোঝে। আরে পশ্চিমদিকেই তো তেলের দেশ। সূর্য তাই সারাদিন গাড়ি চালিয়ে সন্ধে হলে পশ্চিমে যায় তেল ভরতে—নইলে পরদিন ভোরে তার রথ চলবে না, চলবে না....বুইলে?

আমরা সমস্বরে হেসে উঠলাম। দত্ত বোধহয় সিভাস রিগালের খোয়ারি ভাঙাতে পারেনি। তাই বলে, জীবনটা একটা ট্যুর বুইলে। টেম্পোরারি-পিয়োরলি টেম্পোরারি। যাই এখন আবার তেল ভরতে হবে।

—আবার এখন পুল কার অফিসে যাবে? টাকা নেবে তারপরে পাম্পে গিয়ে তেল ভরবে?

আরে না না। দত্ত চোখ মেরে বললে, আমার পাম্প তো ওই পাশের খোপরিতে। সায়েবদের দেওয়া বকশিসের টাকাও আছে। পাঁচ পাঁচ দশ এই দুটো তেল ঢালব গলায়। ধরো সিভাস রিগাল হল মবিল আর আমার পাঁচু হল তেল। ব্যস, তেল মবিলে মিলে এবার তারাপদ দত্ত। বাড়ির গ্যারেজে গিয়ে বডি ফেলবে...বুইলে? গ্যারেজ মানে বিছানা—এবারে ড্রাইভার হবে বউ। বউ মানে ইস্ত্রি—আয়রন।

এমন যে বাকচাতুরি, এত যে দেখার চোখ, তার পেছনে নিশ্চয়ই তারাপদ দত্তর নিজস্ব কিছু এলেম আছে, কিন্তু সেটাই সব নয়। চলমান জীবনই তাকে কথা জোগান দেয়। মানুষ তো আসলে ভোক্তা, আবার দ্রষ্টাও। তারাপদ দত্ত, রামচরিত ঝা বা শ্রীকান্ত গড়াই একেকজন মহান দ্রষ্টা—কেবল তাদের একেকজনের দেখার চোখ আলাদা, পরিবেশ আলাদা। তারাপদর জিপ তাকে কতদিকে নিয়ে যায়, তার দেখার পরিধি তাই অনেক বড়। তার জিপের ভেতরকার নতুন নতুন ইঞ্জিনিয়ারদের বয়ে বয়ে আরও কত অন্য পরিধির মানুষের অভিজ্ঞতা তার মনের ভেতরকে চওড়া করে দিচ্ছে। যেসব সায়েবদের সে আজ্ঞাবহ তাদের সে স্পষ্ট দুটি ভাগে ভাগ করে

ফেলেছে। যেসব সরকরি ইঞ্জিনিয়ার সৎ তাদের সে বলে 'দেবতা', আর যারা ঘুষ নেয় তাদের বলে 'চোর'। তুলনায় জগদ্দলের রামচরিত ঝা-র অভিজ্ঞতার জগৎ যেমন হিংস্র তেমনই আঞ্চলিক। তার সীমা সরহদ্দ ওই জগদ্দল-কাঁকিনাড়ার অসামাজিক খুন-ধর্ষণ-ছিনতাই-বোমাবাজির ভীতিকর বৃত্তে। তার চোখে তাই মানুষ মানে কেবল দেবতা বা চোর নয়—সে দেখেছে মানুষ হয় মারে কিংবা মার খায়। সে বুঝেছে যেকোনও দাঙ্গা-বোমাবাজি বেশিক্ষণ চলে না। সে জেনেছে জীবনে বেঁচে থাকা খুব কঠিন কাজ। এই যাকে সে পথে দেখল, পরে দেখবে তার রক্তাক্ত মৃতদেহ। এ শ্রেণির মানুষদের দেখা বা জানাকে আমরা অবশ্য বিশেষ আমল দিই না।

তারাপদর মতো চৌখস নয় শ্রীকান্ত এবং রিকশাঅলা হলেও তার অভিজ্ঞতা রামচরিতের মতো নয়। কিন্তু সে হল খবরের খনি। তার গাড়িতে উঠলেই সর্বদা তরতাজা খবর। স্টেশনের কাছে রেললাইনের ধারে একটা মেয়ে আত্মহত্যা করেছে—সে নিজে দেখে এসেছে। তার গাঁয়ের তরকারির ভেন্ডার সিরাজের ছেলে সাহজাদ সবাইকে তাক লাগিয়ে দিয়েছে বি.এ-তে অনার্স নিয়ে পাশ করে। শ্রীকান্ত মন্তব্য করে, চেষ্টা করলে কী না হয় বলুন?

এতদিনে তাকে বাগে পেলাম। নিজের বা নিজের পরিবারের কথা সে কখনও বলে না। শুধু সে একদিন বিষণ্ণকণ্ঠে জানিয়েছিল তার চারচারটে মেয়ে। 'চেষ্টা করলে কী না হয় বলুন?' তার এই কথার পিঠোপিঠি সুযোগ পেয়ে বলে বসলাম, তোমার চার চারটে মেয়ের জন্যে কী চেষ্টা করেছ?

—কী চেষ্টা করব বলুন? গরিব প্যাডলার। গাড়িটাও নিজের নয়।

—গাঁয়ে তো ইস্কুল আছে। প্রাইমারি পড়তে তেমন খরচ লাগে না তা জানো? শুধু চুলের ফিতে, ক্লিপ বা শোনপাপড়ি কিনে নিয়ে গেলেই হবে? বই কিনে দাও। আচ্ছা আমিই কিনে দেব। রাজি?

হঠাৎ উৎসাহিত হয়ে শ্রীকান্ত বলে বসে, কথাটা কতবার বলব বলব করেও বলা হয়নি। বাবু, আপনি বড় মেয়েটাকে আপনার বাড়িতে রাখবেন? ওর বেশ মাথা আছে। বাড়ির কাজকর্ম সব করবে। একটু যদি লেখাপড়া শেখান বাড়িতেই। খুব উপকার হয়।

স্বামী স্ত্রী দু'জনেই যখন শিক্ষক তখন আপত্তি করবার আছেটা কী? গিন্নির সঙ্গে কথা বলে তাকে সবুজ সংকেত দিই এবং দিনদুয়ের মধ্যে শ্রীকান্তর রিকশা চড়ে তার মেয়ে ময়না আর বউ সুমতি আমাদের বাড়িতে আবির্ভূত হয় দুপুরে। সেদিন ছিল রবিবার। লোকজন রাখায় পোক্ত আমার গিন্নি সুমতিকে প্রথমেই বলে নেন, লেখাপড়া শেখাব, ভাল শিক্ষা সহবৎ পাবে—থাকবে বাড়ির মেয়ের মতো। কিন্তু হুট বলতে যখন তখন বাড়ি নিয়ে যাওয়া চলবে না—দু'নৌকোয় পা দিলে কাজ হয় না। রাজি তো? আর হ্যাঁ হঠাৎ যেন বলে বোসো না যে মেয়ের বিয়ে দোব। ওর বিয়ের বয়েস হতে অনেক দেরি।

সুমতি যে খুব কথার্তে সেটা জানা গিয়েছিল পরে। প্রথম দিনে অনেকক্ষণ সে চুপ করেই সব শুনছিল। সে বেশ বুদ্ধিমতী, তবে পুত্রবাসনার টানে খামোখা চারটি কন্যাকে গর্ভে ধারণ করে খানিকটা বোকা বনে গেছে। অবস্থা তার বেশ গুরুতর। আস্তে আস্তে খোলস ভেঙে তার কথার আভা ফুটে উঠতে লাগল। সে ময়নাকে প্রথমে বলল, এরা হল তোর মামা-মামী বুঝলি। নিজের তো মামা নেই, কপালে মামার বাড়িও নেই। মন দিয়ে ব্যাগ্রতা দিয়ে কাজ করবি। মিষ্টি করে কথা বলবি—মানুষ হল কথার বশ।

সুমতির কথার ভাঁজ শুনে আমরা স্বামী-স্ত্রী পরস্পর একটু চোখ চাওয়াচাওয়ি করে নিলাম। বোঝা গেল চার মেয়ের মা-র অভিজ্ঞতার জগৎ বা কথনের দ্যোতনা অনেক গভীর। আমাদের মনে, বিশেষত আমার স্ত্রীর মনে প্রত্যয় জাগানোর জন্য সুমতি এবার বলল, মেয়েটা একটু আদুরে বাপসোহাগি—প্রথম সন্তান তো। ময়না মা, কোনও দুঃখ নেই রে তোর। বাবা তো রোজই এ পাড়ায় সারা দিনমানই থাকবে। দেখা হবে বেলান্তই, কথা হবে। এবারে মন বসিয়ে কাজে লেগে যা, খানিকটা লেখাপড়া শিখে নে। হ্যাঁ, বুনদের জন্যে কষ্ট হবে...সে প্রথম প্রথম তো হবেই বউদি বলেন...তারপরে সয়ে যাবে। বউদি জানেন, ময়নার মনটা খুব নরম, শরীলে খুব মায়াদয়া। একটু ভাল মুখ দেবেন, দেখবেন, সব কাজ তুলে দেবে।

গিন্নি বললেন, না না, খুব একটা কাজের চাপ নেই। বাইরের কাজের লোকও আছে। এই একটু আমার কাছে থাকবে, হাতে হাতে সাহায্য করবে। মামার কাছে পড়বে। আমাদের বাড়িতে মানুষ তো আমরা দু'জন। মেয়ের বিয়ে হয়ে গেছে। নাহয়, আরেকটা মেয়ে এসে গেল। সঙ্গীও হবে আমার।

এইভাবেই আমাদের বাড়িতে বহাল হয়েছিল ময়না, যদিও অচিরে গিন্নি তার নামটা পালটে করেছিলেন মমতা। সুমতিকে কদিন পরেই গিন্নি বলেছিলেন, তোমার মেয়ের নামটা যেন কেমন দিয়েছ—আমি ওকে মমতা নাম দিয়েছি। চলবে?

—আপনি যা ভাল বুঝবেন করবেন। মাটির তাল ও—যেমন মূর্তি গড়বেন সেইরকম হবে তাই না বউদি?

আমাদের গ্রামের জীবনে মেয়েমানুষের বড় অছেদ্দা। ময়না নামটা ওর ঠাকুমা রেখেছিল। তার খুব শখ ছিল নাতির মুখ দেখবে। কিন্তু কপালে হল ময়নার পরে আরেক মেয়ে—বুড়ি তখন তার নাম দিল আয়না।

—সে কি ময়নার সঙ্গে মিল করে?

—না না, বউদি। আয়না মানে যে তার ভাইকে ডাকছে যাতে পরের বার পেটে সে আসে। আ পোড়া কপাল। এবারও মেয়ে। বুড়ি গজগজ করে বলত, আমার সংসারে মেয়ের নৌকো এসেছে। ইস, কত আশা ছিল নাতি হবে। কিন্তু ভগমানের দান বউমা, যা দিয়েছেন হেলাফেলা কোরো না। ওর নাম থাক চায়না। কী জানো বউমা, চায়না নাম দিলে আর মেয়ে জন্ম হয় না—কী না ভগমানকে বলা হচ্ছে আর আমরা মেয়ে চাই না। এবারে থামো।

সুমতি বেশ আসন পিঁড়ি হয়ে বসে রবিবারের দুপুরে খেয়ে দেয়ে গিন্নির সঙ্গে জম্পেশ আড্ডা মারছে। আমার কানে যাচ্ছে তার কথা—আমি পাশের ঘরে খবরের কাগজে মুখ আড়াল করে। মন আর কান কিন্তু সজাগ আছে সুমতির কথার দিকে। ভাবছি, কী সুন্দর সাধারণ মানুষের দৈনন্দিন জীবনের বিন্যাস! আমাদের জীবনধারার একেবারে অজানা বাঁকে বইছে এদের জীবন। জানতে মন চাইছিল যদি নাতি হত বুড়ির তবে তার নাম কি এমন দূরছাই মার্কা হত? আশ্চর্য, একেই বোধহয় বলে টেলিপ্যাথি যে গিন্নি তাকে সেটাই জিগ্যেস করলেন, হ্যাঁগো সুমতি, তোমার শাশুড়ি তার সাধের নাতির জন্যে কি কোনও নাম বেছে রেখেছিলেন?

সুমতি তার না হওয়া পুত্রসন্তানের জন্য গর্বে আনন্দে নাকের পাটা ফুলিয়ে বলল, শাশুড়ি-মার মনে খুব আশা ছিল যে তখনকার পেটেরটা হবে ছেলে। তার নাম হবে সম্রাট, সবাই ডাকবে রাজা বলে। কিন্তু সেই রাজা আর জন্মাল না, জন্মাল আন্না—তাকে অবিশ্যি বুড়ি দেখে যায়নি। এ নামটা আমারই রাখা। কী আর নাম দোব বলেন? ভগমানকে বললাম আর না—যথেষ্ট হয়েছে।

প্রচ্ছন্ন নারীবাদী আমার শিক্ষিকা স্ত্রী খানিকটা ব্যঙ্গের চালে বললেন, বাঃ, মেয়ে হলেই চায়না, আন্না, আর ছেলে হলে একেবারে রাজা...সম্রাট?

সুমতি একটুও অপ্রতিভ না হয়ে বলল, সে আপনি যা-ই বলুন বউদি। আমরা হলাম গাঁ-ঘরের হতমান গৃহস্থ অশিক্ষিত আর গরিব। ছেলেসন্তান যেমনই হোক একটা মস্ত বলভরসা। তাই সবাই ছেলে চায়। তাতে দোষের কী আছে? তাছাড়া ধরেন মেয়েসন্তান হলে সব সময়ে কোলে কোলে রাখতে হয়। তার দেহধর্ম আছে। উস্‌কানি আছে। তারপরে, সব সামলে সুমলে তার পরেও ধরেন বিয়ে দিতে হবে—তখন একগাদা টাকা চাই। তা জোগাড় করতে গেরস্থ ফতুর। বিয়ে দিলেও অশান্তি। কেমন ঘর বর হবে। মারধোর করবে নাকি? বলতে নেই, ভয়ে বুক কাঁপে বউদি, আমাদের পাশের বাড়ির মেয়ে নির্মলা—ভাল খরচ করে বিয়ে দিল, ওমা, হঠাৎ শুনি শ্বশুরবাড়িতে ফলিডল খেয়ে মরেছে। তাহলেই বলেন মেয়েজন্মের শতেক জ্বালা, আর না, আর না। আমার আন্নাই বেঁচে থাক। আহা।

ময়না থুড়ি মমতাকে আমাদের বাড়িতে দেবার পেছনে তার মা-র যে অন্য খেলা ছিল সেটা বুঝতে আরও একমাস লাগল। একমাস পরে মাইনে নিতে এসে সুমতি জাঁকিয়ে বসল। খানিকক্ষণ আজেবাজে নানা কথা বলে হঠাৎ গলা নামিয়ে গিন্নিকে জিগ্যেস করল; আপনার মমতা বাইরে টাইরে যায় না তো?

—কেন? বাইরে কী কাজ?

—না, মানে উঠতি বয়সের মেয়ে তো, হয়ত একটু আশপাশে হাঁটতে গেল। আপনাদের শহরের বাড়ি কেমন যেন দেশলাই বাক্সের মতো আঁটআঁট। আমাদের মন হাঁপিয়ে ওঠে। গাঁয়ে মাঠঘাট জমিজঙ্গল গাছপালা—ময়না তো ওইসব খোলামেলা জায়গায় ছুটোছুটি করেই বড় হয়েছে। ঘরে আর থাকত কতক্ষণ? ডেকে আনতে হত এখান সেখান থেকে।

—এখানে মমতা ঘরের মধ্যেই তো থাকে। আমি পাড়া-পড়শির কাছে অবরেসবরে বেড়াতে গেলে সঙ্গে নিয়ে যাই। মামার সঙ্গে হয়ত ব্যাগ নিয়ে তোমার ময়না বাজারে গেল রবিবারে। এইরকম আর কি? কি জানো সুমতি তোমার মেয়ের লেখাপড়ার দিকে টান আছে বেশ—নিজেই আগ্রহ করে পড়তে চায়। মাঝে মাঝে মন খারাপ করে বসে থাকে। প্রথম প্রথম সেটা তো স্বাভাবিক—বোনেদের জন্যে মন কেমন করে। এক কাজ করো সুমতি, সামনের রবিবারে ওর বাবাকে বলো ময়নাকে বাড়ি নিয়ে যেতে। একরাত থাকবে বোনেদের সঙ্গে। পরের দিন সকালে বাবার সঙ্গে চলে আসবে। কী বল?

—না, বউদি ময়নার গিয়ে কাজ নেই—বোনেরাই নাহয় একদিন ঘুরে যাবে। ওকে আর এখন কিছুকাল বাড়িমুখো করব না বুঝলেন? কী আবার গোলমাল পাকাবে। বলা যায় কী?

এতক্ষণে সুমতির সরল নাট্যে একটু যেন পার্শ্বচরিত্রের গন্ধ পাওয়া গেল? তাই বলে তখনই কথাটা গিন্নি উত্থাপন করলেন না। বিকেলে চা-পর্বের পর শ্রীকান্ত যখন রিকশা নিয়ে এসে হাঁকডাক শুরু করে দিল তখন আমার সামনেই আলাদাভাবে সুমতিকে ডেকে গিন্নি বললেন : তোমাদের গ্রামে মমতার কি কিছু সমস্যা হয়েছিল?

সুমতি বলল, তেমন কিছু নয়—মেয়েটার বয়স ছাড়া বাড়ন্ত গড়ন, দেখছেনই তো বউদি। এ বয়েসটাও ভাল নয় না কি বলেন?

—আসল কথাটা কী সুমতি? ঝেড়ে কাশো দেখি।

নির্বিকারভাবে সুমতি বলল, দেখুন গাছে যদি বদরি ফলে তবে সকলেই একটু কি গাছটা ঝাঁকাবে না?

—বদরি মানে?

—বদরি মানে আপনারা যাকে বলেন কুল। তো শীতকালে যখন গাছ ঝাঁপিয়ে বদরি ফল আসে তখন সকলেই কি গাছে ঝাড়া মারে না? ওই যদি একটা দুটো পাকা বদরি পড়ে—টকমিষ্টি খেতে খেতে পথ চলা যাবে, কী বলেন?

—কী সর্বনাশ! এত অনায়াসে এমন একটা কথা বলে দিলে? মেয়েদের জীবন কি বদরি ফল?

—বউদি এটা হল গাঁ ঘরের চলতি বুলি। গরিব মানুষ যে আমরা। আপনাদের মতো ঢাকাচাপা বাড়ি তো নেই আমাদের যে মেয়েকে আটকে রাখব; কোথায় কোথায় ঘুরে বেড়াত ময়না—একটা ছেলের চোখে পড়ে গেছে। ওইটুকু তো মেয়ে—চেহারাটাই যা বাড়বাড়ন্ত। ভয় নেই, সময়মতো সরিয়ে এনেছি। এখন এখানে বেশ কিছুকাল আটকে রাখলেই সব ঠিক হয়ে যাবে তাই না?

সুমতি মোটামুটি একটা বোম ফাটিয়ে চলে গেল। তবে আমাদের একটু সহানুভূতি তার প্রতি যে হয়নি তা বলব না। বিপন্ন পরিবার, অসহায়। কে জানে ছেলেটা কেমন? আমাদের বাড়ি পর্যন্ত এসে না হানা দেয়। আজকাল গ্রামেও তো মস্তান তৈরি হচ্ছে। তাছাড়া সুমতির বেশি বেশি কথা বলা আমার তত পছন্দ না হলেও শ্রীকান্তকে আমি বরাবরই ভালবাসি। মানুষটা নিরীহ শ্রমজীবী। তার অভিজ্ঞতার ঝুলিতে অনেক বেড়াল। তবে নিজের বেড়ালটির বৃত্তান্ত বোধহয় লজ্জায় বলতে পারেনি। যাইহোক, সুমতি-শ্রীকান্ত তথা তাদের প্রথমা কন্যা ময়নার বিবরণ এখানেই শেষ করা যাক এই বলে যে এরপরে অন্তত চারবছরে ময়না আস্তে আস্তে মমতা হয়ে উঠেছিল—লেখাপড়াতেও টান থাকায় গল্পের বই পড়তে পারত। পরিষ্কার বুদ্ধিসুদ্ধি ছিল বলে কাজে কর্মে দক্ষ হতে সময় নেয়নি। সংসারে সে নিজের ভূমিকাটি প্রতিষ্ঠা করতে পেরেছিল, সেইসঙ্গে স্বভাবআদুরে ছিল বলে আমাদের ভালবাসা কেড়ে নিতে দেরি করেনি। তার সঙ্গে পোস্টঅফিসে একটা পাশ বই খুলে চার বছরে বেশ কিছু টাকা জমিয়ে দিয়েছিলাম। বেশ চলছিল আমাদের ঘরোয়া অনুভূতির ছন্দোময় জীবনের স্বাভাবিক ধারা। মমতা যেন আমাদেরই একজন। আবদার করে, শাসন করে, যত্ন করে। ঘড়ি ধরে ওষুধ খাওয়ায়, দু'এক পদ রেঁধে চমকে দেয়, মাঝে মাঝে টিভি দেখে, সাজেগোজে। তার গ্রাম্য প্রণয়স্মৃতি সম্পূর্ণই বিলীন হয়ে গিয়েছিল। ষোল বছর বয়স হতে আমরাই একটা ছেলেকে বেছে নিয়ে তার সঙ্গে বিয়ে দেব মমতার এমন সব ভাবছিলাম মাঝে মাঝে, যদিও তার চলে যাওয়ায় খুব একটা মনের সায় ছিল না।

ইত্যবসরে শ্রীকান্ত-র রিকশার সঙ্গে লরির ধাক্কা লেগে সে অন্তত ছ'সাত মাস হাসপাতাল আর গৃহবন্দি থাকায় তাদের সংসারে বিপন্নতা এসেছিল এক বছর আগে। এখন সে আবার শুরু করেছে গাড়ি চালানো, তবে আকণ্ঠ ঋণ। আমাদের সাহায্য, মমতার পাশ বই, সবই শেষ। কিন্তু এমনতর সাংঘাতিক বিপন্ন আর্থিক সময়ে সুমতি একদিন এসে বলল, সে তার ময়নাকে নিয়ে যাবে।

একেই বলে বিনামেঘে বজ্রাঘাত। কিন্তু কেন যাবে ময়না? তাদের পরিবারের দারিদ্র আর দুঃসময় এখন যে পর্যায়ে তাতে তাকে নিয়ে যাওয়া মানে তো আর একটা পেট বাড়ল। সহজ বুদ্ধিতে সুমতির আবেদনের মাথামুন্ডু কিছু সমাধান করতে না পেরে আমাকেই এগোতে হল, কারণ ঘটনায় আকস্মিকতায় গিন্নি খানিকটা হতচকিত তো বটেই বরং অনেকটা মুষড়ে পড়েছিলেন। প্রশ্ন করলাম সুমতিকে : হঠাৎ কেন নিয়ে যাবে?

সুমতি বেশ কঠিন কণ্ঠে বলল, এখানে থাকলে ময়নার আর বিয়ে হবে না।

—কেন?

—আমাদের গাঁ-ঘরে আজকাল যদি বরপক্ষ জানতে পারে যে মেয়ে অন্যলোকের বাড়িতে ঝিয়ের কাজ করে তবে তাকে বাড়ির বউ করে না।

—তা কী করতে চাও?

—এখন ওকে নিয়ে গিয়ে বাড়িতে রেখে দেব ছ'সাত মাস কি একবছর। গা থেকে ঝিয়ের গন্ধ মুছে যাবে—তারপরে বিয়ে দেব।

সুমতির কথাবার্তা এতদিন পরে এতটাই কর্কশ লাগল এবং তার সমস্ত চরিত্রের এমন একটা স্বার্থপর রূপ ফুটে উঠল যে তা আমাকে ব্যথাতুর করে তুলল। বিপদের দিনে সহানুভূতির এমনতর প্রতিদান তো আশা করি না আমরা। মমতাকে আমরা প্রকৃত মমতা দিয়েই চার বছর কাছে রেখেছি। তাকে কাজের লোক এবং অন্তত 'ঝি' হিসাবে দেখিনি, ভাবিওনি। হঠাৎ খেয়াল হল সুমতি আজ একাই এসেছে, শ্রীকান্তর সঙ্গে রিকশায় আসেনি। আমার মন মেজাজ চটকে গেল—পাশের ঘরে চলে গেলাম। ভাবলাম, এরা ঠিক কী চায় আমাদের কাছে? এরা কি আমাকে বা আমাদের 'অপর' ভাবে? মানে অন্য একটা শ্রেণি? অথচ এই

এখনকার শিক্ষিত সমাজসচেতন মধ্যবিত্তদের একটা চেষ্টা রয়েছে নিম্নবর্গের বা অনগ্রসরদের জন্য কিছু করার সেটা কি তারা বোঝে না? কিংবা উলটো বোঝে?

মার নির্দেশে মমতা তার জিনিসপত্র গুছোতে লাগল। তার চোখের জলটুকু সত্যি ভেবে আমাদের আপাতত যেটুকু সান্ত্বনা। সরল বুদ্ধিতে বুঝতে অসুবিধে নেই যে আসলে সুমতিদের পাড়ায় মমতার বা ময়নার এখন আর নিরাপত্তার অভাব নেই। আস্তে আস্তে এবারে খুব অনায়াসে মমতা হয়ে যাবে ময়না। চাই কি শ্রীকান্ত হয়ত আর আমাদের পাড়ার স্ট্যান্ডে না বসে ঠাঁই বদল করে নেবে। কিন্তু আমাদের দহনের যন্ত্রণা কে নেবে? অন্তত একজন ময়নাকে মমতা করে তোলার আত্মতৃপ্তি আর কি আমাদের থাকবে? ভবিষ্যতে আর কোনও বিপন্ন গরিবের পাশে দাঁড়ানোর যে মানবিক গরজ তাতে কি একটু ঘা লাগবে না? এতরকম চিন্তার স্রোতে আর ক্রিয়াপ্রতিক্রিয়ায় আমি যখন মূহ্যমান ততক্ষণে মমতার শিকড় উপড়ানো পর্ব শেষের দিকে। গিন্নি বলে বসলেন, তোমাদের সংসারের এখন যা হাল, যে টানাটানি তার মধ্যে তোমার ময়না যাওয়া মানে তো আরেকটা পেট বাড়ল—তা-কি ভেবেছ?

সুমতি বলল, বউদি কাঁঠালের বোঝা কাঁঠাল গাছই বয়।

বেশ অনেক বছর আগে সুমতি গড়াইয়ের কাছে সম্পূর্ণ অন্য এক পরিপ্রেক্ষিতে শুনে চমকে উঠেছিলাম আজ এতদিন পরে সেই একই লজ্জ মাহবুবের মুখে শুনে মানবধর্মের অবিনশ্বর ঘাতসহ কোনও সংগ্রামের কথা মনে এল। মানুষ প্রকৃতির কাছ থেকে কত কীই যে শেখে এবং তাতে লাগায় মানব জীবনের অভিজ্ঞতার সংরাগ ভাবলে অবাক মানতে হয়। প্রবাদ প্রবচন আসলে তো অভিজ্ঞতারই নির্যাস। কাঁঠাল গাছের কাঁঠাল বহনের বিচিত্র চিত্রকল্প প্রথম যেদিন যেভাবে শুনি সুমতির কাছে তখন তা তারিফ করবার মতো মনের অবস্থা ছিল না। এতদিন পরে মাহবুবের কাছে আবার সেটা শুনে কিন্তু বেশ উপভোগ করলাম এবং তাকে এতক্ষণে চেপে ধরবার সুযোগে বললাম, মাহবুব কাঁঠালের বোঝা কাঁঠালই বয় এটা প্রকৃতির দিক থেকে সত্যি কিন্তু এখনকার এই কঠিন বাস্তবে তোমাকে সংসার চালাতে তো ভয়ঙ্কর লড়াই করতে হয়। তোমার বাবার তবু সামান্য জমি ছিল, গরু ছিল দুটো। কালো ধলোকে বেচে দিয়ে বেশ কিছু টাকাও পেয়েছিলেন আপৎকালে, কিন্তু তোমার কী বা আছে? চলে কী করে? বলতেই হবে তোমাকে।

মাহবুব বলে, গরুর গল্প কিন্তু এখনও শেষ হয়নি।

—সে কী! কালো ধলোকে গোহাটে বেচে দিয়ে মোটা টাকা গেঁজেয় পুরে মুরব্বি মামা আর কবি ভাগ্নে বাড়ি ফিরে এলে—তারপর এ-আখ্যানের আর কি কোনও নতুন বাঁক থাকে? মামা কি টাকা নিয়ে গায়েব হয়ে গেলেন নাকি? কিংবা পথে ছিনতাই? সত্যি মাহবুব, গ্রাম গ্রামান্তরের গল্পে সাসপেন্স যে এত বহুমুখী কে জানত? বল বল তাড়াতাড়ি।

মাহবুব তার মুখে এক চিলতে হাসি ফুটিয়ে বলল, তার আগে আমার জীবিকার কথাটা বলে নিই। খেয়াল করেছি আগে একবার জিগ্যেস করেছিলেন তখন আমি এড়িয়ে গিয়েছিলাম ইচ্ছে করে। এখন বলছি। আসলে কি জানেন, বলতে লজ্জা করে—বলার মতো নয়। এটা তো ঠিক যে উচ্চ মাধ্যমিক পাশ করে এখনকার দিনে চাকরি পাবার সম্ভাবনা খুব কম। সে চেষ্টা একটু-আধটু করে আশা ছেড়ে দিয়েছি। একটা-দুটো টিউশনি করে দেখেছি টাকা আদায় করা কঠিন—আমার ধাতটা নরম। পারিনি। শেষতক গত দু'বছর যা করে কোনও রকমে চলছে তাতে খাটনি প্রচণ্ড কিন্তু শরীর বিগড়োনো মুশকিল। তবে স্বীকার করব গ্রামে গ্রামে এখন বেশ কিছু মানুষ শিক্ষিত হয়েছে বলে এবং টি ভি দেখেই হোক বা রাজনীতি করে বহু লোক যা চায় আমি তাই বেচি।

মাহবুব কবি স্বভাবের বলেই বোধহয় তার বাচনে একটা আধফোটা ভাব থাকে কিংবা রহস্যের গন্ধ। আমাকে তাই বলতেই হয় যে, তার কথার অর্থ খুব স্পষ্ট নয়। উত্তরে সে বলে, আমি আসলে খবরের কাগজ বেচি এবং সেইসঙ্গে পাঁউরুটি, বিস্কুট, মাখন, জেলি, বাদামের প্যাকেট এসবও বেচি।

—তার মানে তোমার বাড়ির বাইরের দিকে একটা দোকান দিয়েছ?

—না না। সেরকম ঘরই বা কই আমার? তাছাড়া শুধু একটা গ্রামের ওপর নির্ভর করে এ জীবিকা চলতে পারে না—ঘুরতে হয়।

—ঘোরা মানে হকারি? সে কি সাইকেলে চড়ে?

—হ্যাঁ এতে ঘোরপ্যাঁচের কিছু নেই। আমি শীত-গ্রীষ্ম-বর্ষা শেষরাতে উঠে সাইকেল নিয়ে তিন কিলোমিটার মেঠো পথ ভেঙে রাধাগঞ্জের বাজারে যাই ভোর পাঁচটা সাড়ে পাঁচটায়। সেখান থেকে পঞ্চাশটা খবরের কাগজ নিয়ে, সঙ্গের বড় র‍্যাশন ব্যাগে পাঁউরুটি, বিস্কুট নিয়ে হ্যান্ডেলের দুদিকে ঝুলিয়ে আর পেছনের ক্যারিয়ারে রেখে সাইকেল চালিয়ে আসতে থাকি আর লোকের বাড়ি বাড়ি মাল ডেলিভারি দিই।

আমি অবাক হয়ে ভাবি মাহবুবের এমন শীর্ণ শরীরে এত ধকল সয় কী করে? উপস্থিত তার কাছে জানতে চাই, কটা গ্রাম তাকে পেরোতে হয়, বাড়ি ফেরে কটায়?

—ধরুন রাধাগঞ্জের পরে মুক্তাদহ, শাপলাবিল, আড়ংসরিষা, বাথানগাছি, রুদ্রনগর হয়ে আমাদের গাঁ

হবিবপুর। থামতে থামতে কাগজ বা অন্য কিছু ফেলতে ফেলতে চলা। গাঁয়ের লোক খুব ভোবে ওঠে—হাতে হাতেই দেওয়া যায়। তবে পথের কষ্ট বর্ষাকালে, ধরুন জুলাই থেকে সেপ্টেম্বর দারুণ কাদা পথে, বহু জায়গায় হেঁটে সাইকেল টেনে চলতে হয়।

—টাকা ঠিক ঠিক পাও?

—টাকা কেউ মারে না। আপনাকে বলি, লোকে আমাকে ভালবাসে। কবিতা লিখি বলে একটু ভাবুক বলে মনে করে। মিষ্টি কথাও বলে। কেউ কেউ চা মুড়ি খাওয়ায়। অত কষ্ট হলেও মানুষজনের দুঃখকষ্ট যা দেখি পথেঘাটে তাতে সান্ত্বনা পাই। তাছাড়া ভোরের মিহিন কুয়াশা, গাছপালার সোঁদা গন্ধ, পাখির ডাক, বক চরার মাঠ, দিঘিতে ফুটে আছে শালুক ফুল, পশ্চিম দিক থেকে ঘন মেঘ ছুটে আসছে, শরতের ভোরে সূর্য ওঠা—ওই যে রবীন্দ্রনাথের গানে আছে ঃ আলোর অমল কমলখানি কে ফোটালে—সব সবই আমি দেখি।

মাহবুবের ভেতরের কবিপ্রাণ সত্তা মাঝে মাঝেই বেরিয়ে আসে লক্ষ করেছি। হয়ত সেই অন্তঃসত্তা তাকে বাঁচিয়ে রেখেছে। এর পরেও তো সে কবিতা লেখে! ধরে নিতে অসুবিধে নেই যে, তার এত লম্বা পরিক্রমার পরে বাড়ি ফিরতে অন্তত দশটা বাজে। শ্রান্ত ঘর্মাক্ত সর্বাঙ্গে ব্যথা। খবরের কাগজের মাসকাবারি টাকা আদায় করতে হয়—দোকানে দোকানে যে সব পাঁউরুটি, বিস্কুট সাপ্লাই দেয় তার টাকা কি আর অত সকালে নগদে জোটে? পথে পথে বাচ্চারা যে বিস্কুট, লজেন্স, গোল পাঁউরুটি খায় তার মা-বাবার কাছে আবদার করে তার খুচরো হিসাব রাখতে হয়। বুঝতে পারি কোনওরকমে খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে চলে মাহবুবের সংসার। ভাইটা থাকলেও একটু বলভরসা পেত। বিধবা মা হয়ত মাঠেঘাটে ঘুরে শাকপালা, গুগলি, কন্দ জোগাড় করে। মাছ খাওয়া অলীক স্বপ্ন। বড়জোর বাড়ির পালপোষ করা মুরগির ডিম। মা ছাগল পালে। বেচে কিছু টাকা আসে। এইসব ভাবি আমি।

ভাবনার থই পাই না। ইতিমধ্যে বেলা পড়ে আসছে। মাহবুবকে যেতে হবে। তাকে বৈকালিক চা দেওয়া হল, সঙ্গে লুচি আর সন্দেশ। কুণ্ঠায় সে খেতে ইতস্তত করে। এ তো তার পক্ষে রাজভোজ। খেতে গিয়ে ছেলে বউয়ের মুখও কি মনে পড়ছে না? আমার বিষণ্ণতা কাটানোর জন্যে প্রসঙ্গ পালটে বললাম, মাহবুব তোমার গরুর গল্প কিন্তু বাকি আছে।

খেয়াল আছে দাদা—মাহবুব বলে, সেটা বলেই উঠব। ব্যাপার হল, সেদিন গোহাট থেকে কালো-ধলোকে বেচে দিয়ে ভালভাবেই বাড়ি ফিরেছিলাম। পথে কোনও বিপদ-আপদ কিংবা দিগদারি হয়নি। তবে মনটা খুবই খারাপ ছিল। ঘরে ফিরে কিছু আর না খেয়ে শুয়ে পড়েছিলাম। বাড়িতেও সেদিন রান্নাবান্না কী হয়েছিল কে জানে। মোটকথা কালো-ধলো চলে গিয়ে, বিশেষত ধলোর কথা ভেবে আমাদের বাড়ির লোকজন যেন কেমনধারা হয়ে গেল। ঘরের লক্ষ্মী চলে গেলে যেমন হয়। সবাই ভাবতে লাগল না জানি কোনদিক থেকে কী বিপর্যয় আসে।

—কেন?

—ঘরের গৃহস্থির গরু বেচা খুব অলক্ষণ বলে গাঁয়ের লোক বিশ্বাস করে। তাতে কারোর বআ হয়নি আজ পর্যন্ত। কিন্তু দিন পনেরো পরে কোনও বিপদ-আপদ, রোগ-ব্যাধি বা কোনও বিপর্যয় না ঘটলেও একটা আশ্চর্য কাণ্ড হল। সেদিন ছিল বৈশাখী পূর্ণিমা—রাতে চারদিক আলোয় আলো—খেয়েদেয়ে সবাইয়ের এক ঘুম হয়ে গেছে। হঠাৎ মাঝরাতে শোনা গেল হাম্বা রব। এ তো ধলোর ডাক? এ কী স্বপ্ন না সত্যি? সকলে ধড়মড়িয়ে উঠে বসল বিছানায়, কেউ ঠিক বেরতে চাইছে না—হতেও তো পারে গোভুতের ডাক। মা কিন্তু পাঁচিলের আগল খুলে চেঁচিয়ে উঠল বাইরে থেকে—'ওরে সবাই আয়, আমাদের ধলো ফিরে এসেছে।' সবাই ধলোকে ঘিরে ধরল—বাবা তাকে আদর করতে লাগল—ধলোর দু'চোখে যেন তীব্র অভিমানের কান্না। কিন্তু কোথা থেকে এল সে? পাড়াপড়শি ছুটে এল—এমন কথা কেউ কোনওদিন শোনেনি যে বেচে-দেওয়া গরু ফিরে এসেছে। অনেকে নিরিখ করে বলল, এর পেট পর্যন্ত পানি লেগে আছে, তার মানে পুবের দিকে নদী পেরিয়ে এসেছে। কিন্তু কেউ তো বলতে পারে না কাকে বেচা হয়েছিল গরু, কোথায় কোন গ্রামে তার বাড়ি। এখন এ গরু ঘরে নেওয়া হবে অধর্ম, ফেরৎ দেওয়াও যায় কি অবলা প্রাণীকে? যে স্রেফ ভালবাসার টানে মায়ায় চলে এসেছে তার পুরনো ডেরায়? কিন্তু তার ডেরাই বা কই? বাবা রাগে দুঃখে গোয়ালঘরই তো ভেঙে দিয়েছে।

এমন অত্যাশ্চর্য আখ্যান কেই বা শুনেছে? আমি সেই দৃশ্যটা ভাবতে চাইলাম। একটি গরুকে ঘিরে গাঁয়ের মানুষ—আরও কত কত মানুষ আসছে গ্রাম ভেঙে খবর পেয়ে। বেচা গরু নাকি ফিরে আসে কখনও! এলই যদি তবে তাকে ফেরত দেয় কে? কোথায় কোন গ্রামে থাকে তার তখনকার মালিক? তাকে খবর দেওয়ারই বা উপায় কী?

মাহবুব বলল, অভিজ্ঞ লোকরা জানাল এ গরু অনেক দূর থেকে এসেছে। কী করে বোঝা গেল? মাঝরাতে এসেছে, তার মানে রওনা দিয়েছে সকলের নজর এড়িয়ে জমি থেকে সন্ধেকালে। এতক্ষণ হেঁটেছে, নদী পেরিয়েছে। কিন্তু তাকে ঘরে তোলা হবে বেইমানি কাজ। আমরা তো মালিক নই। বাবা কাঁদছে, ভাই কাঁদছে, মা উঠোনে আছাড়ি-পিছাড়ি দিয়ে

কাঁদছে। আমার মনে হল এ যেন আমাদের সেই ধলো নয়—কেমন থমকে গেছে—তার নিরাশ্রয় দু'চোখে অগাধ পানি। সে তো জানে না, মানুষের সমাজে ইসলামের বিধানে তার ভবিষ্যৎ কী?

—তারপরে কী হল?

—ওই রাস্তার একপাশে সে দাঁড়িয়ে রইল। মা তাকে ঘাস খেতে দিলে ঘাড় ঘুরিয়ে নিল অভিমানে। তাতে মার কান্না আরও বেড়ে গেল। সকালে এলেন গাঁয়ের মোড়ল আর মসজিদের ইমামসাহেব। সব শুনে মোড়ল বললেন, বেচা গরু ঘরে তোলা নাপাক কাজ। ইমাম বললেন, হাদিশ কোরানে এ ব্যাপারে কোনও নির্দেশ নেই—এমন ঘটনা আরবে ঘটবেই বা কী করে? তবে মোড়লের কথা ঠিক—বেচা গরু পুরনো মালিকের ঘরে ঢোকানো নাজায়েজ। তবে আবার বিচারে বলে এ গরু এক মাস সরকারি পণ্ডবে রাখা যাবে। সব দিগরে ঢোল সহরৎ দাও গরু হারিয়েছে যার নিয়ে যাক। নিয়ে গেলে ভাল —নইলে এক মাস পরে আল্লার নামে এর কোরবানি হবে।

—কী কান্ড! তোমরা মেনে নিলে?

—আমরা মানামানির কে? গ্রামসমাজের শক্তি অনেক বড়। তাছাড়া মন থেকে আমরা ধলোকে বিদায় দিয়েছিলাম। তার স্মৃতি ছিল আর ছিল গোফালি। তাকে ফিরিয়ে নেবার মন কি ছিল? ছিল না। তাই গাঁয়ের জোয়ান ছেলেগুলো যখন ধলোর গলার দড়ি ধরে টেনে নিয়ে গেল আমরা শুধু চেয়ে থাকলাম।

স্তব্ধ হয়ে এই মর্মান্তিক কাহিনি শুনে আমি বললাম, কেউ আর ধলোকে নিতে আসেনি তাই না? তার স্মৃতি রইল শুধু! আর গোফালির কী হল?

গোফালি আর কতদিন টেকে? মাহবুব বলল, কিন্তু এ গল্পের শেষ নেই। এখনও যখন শেষ রাতে পূর্ণিমার চাঁদের আলোয় সাইকেল নিয়ে বেরই তখন স্পষ্ট দেখি, আলোর অমল কমল খানি তখনও ফোটেনি—সবদিক শান্ত। যেন প্রান্তরে দাঁড়িয়ে আছে ধলো, তার সারা অঙ্গে পানি টুপিয়ে পড়ছে। যেন সে এক্ষুনি হাম্বা রবে ডেকে উঠবে কিন্তু কেউ সাড়া দেবে না।

অন্নদাস

অমিতাভ দাশগুপ্ত

আমি কপাল থেকে
ঘামের মতো মুছে ফেলেছি পিতৃপুরুষের নাম,
আমার শেষতম অশ্রুপাত ছিল
খরাচৌচির বাঁকুড়া পুরুলিয়ার জন্য।
নিজের মেহনতের শাকান্ন নয়,
প্রভুপত্নীর সুবর্ণ কংকণশোভিত হাতে এগিয়ে দেওয়া অন্নব্যাঞ্জনে
ঢেকুর তুলতে তুলতে
আমার হালফিলের নধরকান্তি শরীর
ভুলে গেছে—আমি এখন সর্বার্থে অন্নদাস।
ফুল্লরার বারোমাস্যার জীর্ণ পৃষ্ঠাগুলি
কবে খসে পড়েছে আমার স্মৃতির পুঁথি থেকে,
প্রভুর 'তু' ডাকের অপেক্ষায়
ল্যাপডগের মতো ঘন ঘন দুলছে আমার লেজ,
বিলকুল ভুলে গেছি
পরিশ্রমী হাজার হাজার হাতের শাবল আর কুঠার
কবে তেভাগা তেলেঙ্গানার আগুন জ্বেলেছিল।

রবীন্দ্রকাহিনির তোতা পাখিটির মতো
আমার শিক্ষাও এতদিনে সম্পূর্ণ হয়েছে।

মাস্তুলের পাখি

বিজয়া মুখোপাধ্যায়

দেখতে-দেখতে মনে হয় তুমি সেই মাস্তুলের পাখি।
অকূল সমুদ্রে বুঝি ভেসে যাচ্ছে বিশ্বাসী জাহাজ
কে জানে কোত্থেকে পাখি একদিন বসেছ মাস্তুলে
তারপর হঠাৎ দেখলে আদিগন্ত জল, আগ্রাসী বিস্তার
যার, আকাশ তুলনা।
তুমি ঘুরে ঘুরে ওড়ো, খোঁজো ডাঙা, গাছগাছালিতে
সগোত্র আরেকজন, কখনও পাও না খুঁজে—সব অনিশ্চয়।
একসময় ডানা ব্যথা করে, ফিরে আসো আবার মাস্তুলে
সমুদ্রের মাঝখানে যে তোমার নিশ্চিত আশ্রয়—

উন্মাদের চোখে সে কবিতা
দার্শনিক তাকে ভাবে কেন্দ্রবিন্দু ওই
পাঠক নিশ্চিন্ত হয় আশ্রয়ে ফিরেছ এই ভেবে।

আমরা যে ইতরজন, চিনেছি কি প্রকৃত তোমাকে
ভুলো পাখি?

আড্ডা

চৈতালী চট্টোপাধ্যায়

ধুনকিতে মাথা জাগছে না। ওই নোংরা কিলবিলে পোকাগুলো
পারিজাত হয়ে উঠল।
তোমাদের মুখ? যেন চকখড়ি। শোক-তাপ স্রেফ চানাচুর,
পড়ছে কি উড়ে যাচ্ছে।
সব জটিলতা আজ ক্রমশ সরল হয়ে এল।
অত হাসি ভাল নয়।
আঁচল ফেলতে হবে, মহাশয়া—
আপনিও তৈরি থাকুন

জ্যোৎস্না

পার্থপ্রতিম মজুমদার

জ্যোৎস্না নেমেছে ঘোর
এ বাগানে আজ কেউ তো জানে না
দু'জনাই ফুলচোর

কে যেন বাজায় বাঁশি
দূর থেকে দূর পাহাড়ে পাহাড়ে
বরফের হাসাহাসি

তবু কেন জাগে ভয়
হৃদয়প্রাকারে সন্ধ্যাসকালে
যে আসে সে নয়, নয়

ভুল হয়ে গেছে আসা
কার অভিশাপে শুধু জ্বলে যায়
পুড়ে যাওয়া ভালবাসা?

আয়না

মোহন সিংহ

সাজার টেবিলে তিন পাট করা আয়না
আয় না এখানে নিজেকে দেখতে আয় না।

বড় ভয় করে তার কাছে তাই যাই না।

আমার কত না টলে-যাওয়া-ছবি
পাহাড়িয়া পথে চুড়ি ভেঙে দেওয়া
সমুদ্র ঢেউয়ে ঢেউয়ে জলখেলা
সিঁথির সিঁদুর কেড়ে নেওয়া কত ছলনা...

পথে বাঁকে বাঁকে কত যে ভাঙন
ঠোঁটের পরাগ কাজলের দাগ
উঠে আসে সব আয়নায়।

কেউ যে চায় না নিজের স্খলন নিজেই দেখতে আয়নায়।

নিসর্গ

মানসকুমার চিনি

এ ভাবেই আহত কিছু কথা
এ ভাবেই জ্বলে ওঠা রাত
এ ভাবেই নীল শাড়ি ঢেউ
হেসে ওঠে
ক্লান্ত করে মন।

কথা মানে মৃত্যু নয়
তারা ফুটে ওঠা
আকাশের সীমা ভেঙে
নিজেকেই চেনা।

কাঙাল

অংশুমান কর

প্রিয় কুকুরকে ভাত মেখে দেয় লোকটা
মাছেদের দেয় কেঁচো, পাখিদের তুষ, ধানের দানা
এক ঘর থেকে অন্য ঘরে যায়
আয়নায় দেখে নিজের মুখ
হাতের ধাক্কায় উলটে ফেলে গ্লাস
সে কী শব্দ ঝনঝন ঝনঝন।
প্রিয় কুকুরকে ভাত মেখে দেয় লোকটা
মাছেদের কেঁচো, পাখিদের ধানের দানা
নিজের নিঃশ্বাসের শব্দ নিজেই শোনে
আর দিন গোনে
আজ ঠিক সাত দিন মা-বউ-মেয়ে নেই
ঘরে কুকুর, মাছ, পাখিদের নিয়ে সে একা
তার হাত চেটে দেয় কুকুর, পাখি এসে বসে মাথায়
নীল জলে এ প্রান্ত থেকে ও প্রান্ত ছুটে বেড়ায় রঙিন মাছেরা
যেন বলে। কী হল তোমার? কী হল?
কী হল তার? কী হল?
ভাবতে ভাবতে লোকটা বোঝে
স্পর্শ না, দৃষ্টি না, বিদ্যুৎ না
মানুষ আসলে কথার কাঙাল, কথা।

ভিখারিনি

অনুরাধা মহাপাত্র

সূর্য নামছে পাতালে
মেঘ খরপ্রভা
বাতাস ধাবমান
কান্নার পাখিরা জন্ম নিচ্ছে

অসূরীর মতো সন্ধ্যা এল
বৃষ্টি ডোবাল আমাকে
কোথায় আলো?
কোথায় আগুন, ভিখারিনি?
কোথায় আঁচল?
কোথায় পাতা জ্বালাও?

এসো আমার কাছে,
এসো আমার ঘরে
সব স্বাদ, মধু,
জীবনের সব তেতো হয়ে এসো
মিশে যাই অন্ধকারে

সাড়া দাও, ভিখারিনি
বিদ্যুতে, ঝলসে যাওয়া তরঙ্গে
উৎপাটিত মাটি, গাছ ও পৃথিবীতে
এ অনন্ত কালো গর্ভের হাহাকারে
আমাকে ফেলে রেখে
কোথায় গিয়েছ ভিখারিনি?

কোথায় আগুন?
কোথায় পাতা জ্বালাও?
কোথায় রান্না হয়?

নেতাজির অন্তর্ধান ঃ ১৯৪৬-এর ঘটনাবলি—নতুন আলোকপাত

পূরবী রায়

নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুর রহস্যজনক অন্তর্ধানের পরবর্তীকালের এক বিশেষ অংশ জুড়ে আছে ঘটনা-বহুল ১৯৪৬ সাল। এই বছরের দেশবিদেশের নানা ঘটনা-প্রবাহে কত যে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য সংগৃহীত আছে যেগুলিকে বিশ্লেষণের মাধ্যমে সংযোজিত করলে এক নতুন ভাবধারার প্রতি আলোকপাত করা যাবে। ইতিহাসের পাতায় হবে নতুন সংযোজন।

দোমেই সংবাদ সংস্থার মাধ্যমে ২১/২২ আগস্ট ১৯৪৫-এর বিমান দুর্ঘটনার সংবাদ প্রচারের সঙ্গে সঙ্গেই ব্রিটিশ তৎপর হয়ে ওঠে যাতে তাদের 'Number one enemy'-র ইতি টানা যায়। জাপানি গোয়েন্দা বিভাগের দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার নানা শহরে ছড়িয়ে পড়া জরুরি কাগজপত্র ঘেঁটে ব্রিটিশ গোয়েন্দা বিভাগ সেপ্টেম্বর ১৯৪৫-এ যে রিপোর্ট প্রস্তুত করল তাতে কিন্তু সম্পূর্ণভাবে এই শত্রুর হাত থেকে ব্রিটিশ মুক্ত হতে পারল না। রিপোর্টের শেষ পংক্তিতে লেখা হল সব কিছু সরেজমিন তদন্ত করেও ব্রিটিশ গোয়েন্দা বিভাগের সংশয় থেকেই যাচ্ছে, মনে হচ্ছে এ এক প্রতারণামূলক পরিকল্পনা। সুতরাং সম্পূর্ণ নিশ্চিন্ত হওয়া গেল না। এরপর দুই ব্রিটিশ সামরিক গোয়েন্দা বিভাগের অফিসার ফিন এবং ডেভিসের নেতৃত্বে দুটি পৃথক তদন্ত কমিটি গঠিত হয়। ফিন এবং ডেভিস কমিটিতে ব্রিটিশ এবং ভারতীয় উভয় তদন্তকারীরা কাজ করেছিলেন। ডেভিসের নেতৃত্বে তদন্ত চলে সাইগনে অর্থাৎ যেখান থেকে তাইওয়ানের পথে যাত্রা শুরু আর অপরদিকে ফিনের নেতৃত্বে তদন্ত চলে ব্যাংককে। ডেভিস এবং ফিন উভয়েই যথাসময়ে তাঁদের স্ব স্ব তদন্ত রিপোর্ট পেশ করেন অথচ আজ অবধি সেই দুটি রিপোর্টের কোনও খোঁজ মেলেনি। অন্তত আমার জানা নেই।

১৯৪৫-এর সেপ্টেম্বর থেকে ডিসেম্বর পর্যন্ত ভারতের ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার নানা প্রান্ত থেকে সংবাদ আসতে লাগল সুভাষচন্দ্র বসু রাশিয়ায়, ব্রিটিশ গোয়েন্দা বিভাগের দলিল MI 2 MI 6 এর পাতায় গোয়েন্দাপ্রধানরা সংবাদ প্রেরণ করতে লাগলেন যে সুভাষচন্দ্র বসু রাশিয়ায়। ভারতের সংবাদপত্র "National Herald" (Dec. 31st 1945) মাধ্যম-এ যখন প্রকাশ পেল সুভাষচন্দ্র বসু রাশিয়ায়—শুরু হল ১৯৪৬ সালের ঘটনাপ্রবাহের প্রথম সঙ্কেত—সোভিয়েত কমিউনিস্ট পার্টি ও সরকারের দৈনিক মুখপত্র "প্রাভদা" (অর্থাৎ "সত্য")-তে স্তালিনের অত্যন্ত কাছের লোক, এক বিখ্যাত সাংবাদিক জাস্লাভস্কির প্রবন্ধে ভারতকে এক অলীক স্বপ্নের দেশ বলে আখ্যা দিয়ে ব্যাখ্যা দেওয়া হল যে সুভাষচন্দ্র বসুর ন্যায় ফ্যাসিস্ট আর যেখানেই থাকুন মস্কোর আবহাওয়া থেকে অনেক দূরে (প্রাভদা-৭ জানুয়ারি ১৯৪৬)। প্রবন্ধকার সরাসরি খোলসা করে কোনও কথাই লিখলেন না, কারণ তাঁর প্রবন্ধের দুই-তৃতীয়াংশ জুড়ে রইল "National Herald" থেকে উদ্ধৃতি। আর নেতাজি জীবিত কি মৃত—সে বিষয়ের উল্লেখ এড়িয়ে গেলেন।

এই হল ১৯৪৬ সালের ঘটনাপ্রবাহের সূচনা। মস্কোয় অবস্থিত ব্রিটিশ দূতাবাস থেকে 'Foreign Office' এ সেই দিনই সংবাদ প্রেরিত হল :

'Important : ...2) Information from Indian News papers occupies one quarter of space article and remainder consist of **laboured refutations** of the report and accusations against the Indian News papers of conducting anti Soviet lying campaign.' (PRO.London. FO 371/56774-1946) প্রবন্ধটি সম্পর্কে জানুয়ারি মাসে কর্নেল হিউ টয়ের (Springing Tiger এর লেখক)-একই মন্তব্য ব্রিটিশ অপর একটি গোয়েন্দা রিপোর্টে লিপিবদ্ধ হয়ে আছে (ST/12/66 of Jan. 16, 1946), যা C.S.D.I.C-র **Confidential** No. MS 5/5 C.S.D.I.C. Red Fort Delhi Dt. 23/1/46 মাধ্যমে পাওয়া গেছে (সব তথ্যই ব্রিটিশ মহাফেজখানা থেকে সংগৃহীত)। অতএব ১৯৪৬ সালের ঘটনা-প্রবাহের সূচনা প্রাভদায় প্রকাশিত প্রবন্ধ দিয়ে।

১৯৪৬-এর ফেব্রুয়ারি ভারত থেকে প্রেরিত সিঙ্গাপুরে ব্রিটিশ গোয়েন্দা দপ্তরের Intelligence Bureau, New Delhi 3 dated 19 Feb. 1946-এ W. Mck Wright জানাচ্ছেন (Major Courtenay Young, Intelligence Division C.I.C.B. H.Q. SACSEA, Singapore. ব্রিটিশ মহাফেজখানা) যে কোনও প্রকারেই এই বিমান-দুর্ঘটনাকে প্রমাণ করা সম্ভব হচ্ছে না। প্রতিটি সংগৃহীত রিপোর্ট ও তথ্যগুলি পরস্পর-বিরোধী এবং একে অপরের পরিপন্থী—অতএব পরিকল্পিত প্রতারণা, সন্দেহ ও বৈপরীত্যে পরিপূর্ণ সুতরাং ক্রমশ সন্দেহ ও সংশয়ই বৃদ্ধি পাচ্ছে। এছাড়া প্রতিটি সংগৃহীত তথ্য দৃঢ়তার সঙ্গে দুর্ঘটনাকে প্রমাণ করতে সর্বতোভাবে অক্ষম।

ব্রিটিশ গোয়েন্দা বিভাগ একদিকে যেমন কোনও প্রকারেই বিমান-দুর্ঘটনা সম্পর্কে সুনিশ্চিত হতে পারছে না অপরদিকে ভারত ও দক্ষিণপূর্ব এশিয়ার গোপন তথ্য আদান-প্রদানের আবার আর একটি দিকও লক্ষণীয়, তা হল আজাদ হিন্দ সরকারের ধনসম্পদ। এই বিশাল ধনসম্পদ কোথায় কীভাবে বাটোয়ারা হবে তার প্রাথমিক হিসাব-নিকাশ করতে ১৯৪৬-এর মার্চ মাসে মাউন্টব্যাটেন নেহরুকে মালয়ে পাঠিয়েছিলেন তা প্রত্যক্ষভাবে সরজমিন দেখার জন্য। নেহরু মার্চ মাসে মালয়ে যান—কারণ এই ধনসম্পদের একটি বিরাট অংশ, আজাদ হিন্দ সরকারের স্বর্ণভাণ্ডার—যা Supreme Commander অর্থাৎ মাউন্টব্যাটনের মতে একমাত্র নেহরুই উদ্ধার করতে পারবে—আর সেই সোনা ওখানকার কোনও ব্যাংকে জমা দেবার ব্যবস্থা করা যাবে। উদ্দেশ্য অত্যন্ত সাধু কেননা এই সোনা আজাদ হিন্দ ফৌজের সাহায্যার্থে ব্যবহৃত হবে। অত্যন্ত উত্তম প্রস্তাব। পেনাং থেকে ভারত রওনা হবার প্রাক্কালে নেহরু মাউন্টব্যাটনকে অস্ট্রেলিয়ায় চিঠি লিখে জানালেন।

Penang
March 26, 1946

Dear Lord Louis Mountbatten.....

.....'we propose to put the monies we have in a Trust-Fund and further we are taking steps to have a Trust-Deed drawn up. I have also nominated a Relief Committee, though a number of additions will have to be made to it in the near future.

.....

[(L/P& J/12/761) Justice Mukherjee Commission Exhibit-248]

পরবর্তীকালে ভারতবর্ষে আজাদ হিন্দ ফৌজ সাহায্য শিবির খোলা হয়। আজাদ হিন্দ ফৌজের ভারত প্রত্যাবর্তন—তাদের প্রতি ভারত সরকারের মনোভাব ও সাহায্যপ্রদান—এসবই বিতর্কের বিষয়। এখন শুধু দেখা যাক আজাদ হিন্দ সরকারের প্রধান কোথায় গেলেন? তাঁর তথাকথিত বিমান-দুর্ঘটনায় মৃত্যু পুরোপুরি সমর্থনযোগ্য নয়, অথচ ব্রিটিশ ভারত ছেড়ে যাওয়ার আগে তার আখের গোছাতে ব্যস্ত—আজাদ হিন্দ সরকারের এত টাকা, সোনা, সাহায্য শিবিরের নামে কোথায় কীভাবে ব্যবহৃত হয়েছিল সে আর এক ইতিহাস!

এইরকম পরিস্থিতির মধ্যে IPG (Indian Political Intelligence) যত প্রকার ব্যবস্থা নেওয়া সম্ভব ততপ্রকার ব্যবস্থা নিয়ে সারা ভারত জুড়ে তল্লাশি চালাল যাতে শেষ একটা রিপোর্ট দিয়ে সুভাষচন্দ্র বসুর অন্তর্ধান রহস্যের যবনিকা টানা যায়। অতএব রিপোর্ট প্রস্তুত হল ১৯৪৬ সালের মে মাসে।

WITH 2227
POL (S) IIIS/24 POI (S)
587
Secret 2nd MAY 1946 1946
India Office : Miss Hauchet

.....

2. The DIB during his recent visit to London, mentioned the receipt from various places in India of information to the effect that Subhas Bose is alive in Russia. In some cases circumstantial details have been added.

I.P.I/EBP I.P.I

(Foreign and Commonwealth office Records. London, ব্রিটিশ মহাফেজখানা)

এদিকে ব্রিটিশ সোভিয়েত সম্পর্ক যে ক্রমশ ম্রিয়মাণ হয়ে উঠছে সে সম্পর্কে বহু পূর্বেই অর্থাৎ ১৯৪৫ সালের ২১ মে-র ভাষণে সুভাষচন্দ্র বসু পরিষ্কারভাবে জানিয়ে দিয়েছিলেন..... 'You know very well that I have been always of the opinion that if Germany collapsed, it would be a signal for the outbreak of an acute conflict between the Soviets and the Anglo-Americans.'

তাঁর এই দূরদর্শিতা সত্যই বাস্তবে পরিণত হয়েছিল। একদিকে ব্রিটিশ যেমন তার প্রধান শত্রুকে সোভিয়েত রাশিয়া আশ্রয় দিয়েছে কোনওমতেই তা মেনে নিতে পারছে না আর

অপরদিকে তেমন কোনও সঠিক সংশয়হীন প্রমাণও সংগ্রহ করতে পারছে না যাতে বিমান-দুর্ঘটনায় তার 'Number one enemy'র মৃত্যু নিঃসন্দেহে প্রমাণিত হয়। ওদিকে আজাদ হিন্দ সরকারের ধনভাণ্ডার; তাতেও ব্রিটিশের লোভ—ভারত ছেড়ে যাবার আগে যদি ওইসব ফয়সালা না করে যেতে পারে তাহলে সোভিয়েত রাশিয়াকেও উচিত জবাব দিয়ে যাওয়া হবে না। অতএব বিমান-দুর্ঘটনার প্রায় একবছর বাদে ব্রিটিশ গোয়েন্দা কর্নেল ফিগেস যিনি তখন টোকিওয় ব্রিটিশ দূতাবাসের গোয়েন্দা বিভাগে কর্মরত, তাঁর পরিচালনায় একটি Death Report প্রস্তুত করা হল—জুলাই ১৯৪৬-য়ে। কর্নেল ফিগেস দ্বারা প্রদত্ত Death Report-এর সময়কাল ২৫শে জুলাই ১৯৪৬। ডাক্তারের নাম ত্সুরুতা—তাইপেই আর্মি হাসপাতালের "নানমন" বিভাগের শল্যচিকিৎসক (Army Surgeon)। সুভাষচন্দ্র বসুর দগ্ধ দেহে তিনি ক্যামফর ইনজেকশন প্রয়োগ করেন এবং তার কিছু পরেই অর্থাৎ সন্ধ্যা সাতটার কিছু পরে নেতাজির মৃত্যু হয়। এরপর কর্নেল ফিগেস নানারকম সাক্ষী খাড়া করে প্রমাণ করার প্রচেষ্টা করেন। (কর্নেল হিউ টয়ের লেখককে প্রদত্ত এই রিপোর্ট, Office of Military Adviser United Kingdom : Liaison Mission in Japan British Embassy)

ব্রিটিশ গোয়েন্দা বিভাগের প্রমাণ-প্রচেষ্টা যখন চলছে সেই ১৯৪৬ সালে জুলাই মাসের ২৩ তারিখে কমরেড সোমনাথ লাহিড়ীর সোভিয়েত সফর—সে তথ্য ভারতে মুম্বই শহরে বসবাসকারী সোভিয়েত গোয়েন্দা ভি. সাইয়াদিয়ানৎসের প্রদত্ত রিপোর্ট থেকে পাওয়া যাচ্ছে। ১৯৪৩ সাল থেকে সোভিয়েত গোয়েন্দা সোভিয়েত বই, রেকর্ড পত্রপত্রিকা বিক্রির সংস্থা পরিচালনা করার অজুহাতে সংবাদ সংগ্রহ করে বেড়াতেন। আর অপরদিকে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির দৈনন্দিন সংবাদ সংগ্রহ করতেন ও কমরেডদের সঙ্গে আলাপ আলোচনাও করতেন।

সোমনাথ লাহিড়ী ৪৬-এর জুলাইয়ের সফর শেষে সোভিয়েত কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির প্রতি যে হতাশা প্রকাশ করেছিলেন তা সবই সাইয়াদিয়ানৎস তাঁর গুপ্ত রিপোর্টে লিপিবদ্ধ করেছিলেন। তাঁর সেই রিপোর্টটি সোভিয়েত সরকারের বিদেশমন্ত্রকে পাওয়া যায়। সেখানে এই সোভিয়েত গোয়েন্দা আরও উল্লেখ করছেন যে আগস্ট মাসে নেহরু ব্যক্তিগতভাবে তাঁকে অনুরোধ করেন যে নেহরুর একটি ব্যক্তিগত চিঠি স্তালিনের কাছে পৌঁছে দিতে হবে। সময়টা বিশেষভাবে লক্ষণীয়। কারণ এই '৪৬ সালের আগস্ট মাস অর্থাৎ আর একমাস বাদে মধ্যবর্তী সরকার গঠন হতে চলেছে। (MID. FOND 0179 year 1946 OPIS la Popka la Delo 8—মস্কো-রুশ মহাফেজখানা) নেহরুর স্তালিনকে লেখা চিঠি রুশ মহাফেজখানায় থাকা সত্ত্বেও কোনও প্রকারে উদ্ধার করা সম্ভব হচ্ছে না।

এবার মধ্যবর্তী সরকার গঠনের সঙ্গে সঙ্গেই নেহরু তাঁর একান্ত বিশ্বস্ত প্রতিনিধি যিনি কমিউনিস্ট হিসাবে পরিচিত, সেই কৃষ্ণ মেননকে প্যারিসে সোভিয়েত বিদেশমন্ত্রী মলোতভের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে পাঠালেন। মলোতভ তখন প্যারিসে এসেছেন 'Peace Conference'-এ যোগ দিতে—সেই সুযোগে নেহরু তাঁর ব্যক্তিগত অনুরোধযুক্ত চিঠিটি দিয়ে কৃষ্ণ মেননকে পাঠান। চিঠির বিষয় জানানো হয় ভারতের খাদ্যশস্যাভাবে যদি সোভিয়েত সাহায্য পাওয়া যায় তাহলে ভারত প্রকৃতভাবে উপকৃত হবে। যে কোনও সাধারণজ্ঞান সম্পন্ন ব্যক্তির বুঝতে অসুবিধা হবে না যে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সবে সমাপ্তি, তার মধ্যে সোভিয়েত-জাপান বিরোধ—আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে নানান সমস্যা এবং শস্যের ক্ষেত্রে সোভিয়েত ভাণ্ডারের সে অবস্থা নয় যে সে ভারতকে সাহায্য করতে এগিয়ে আসতে পারে। এ শুধু বাহানা! প্যারিসে সোভিয়েত দূতাবাসে ব্রিটিশ চরও নজরদারি করে তথ্য সংগ্রহ করে জানায় দু'ঘণ্টাব্যাপী দরজা বন্ধ করে মেনন-মলোতভের গোপন কথাবার্তা হয়েছে, কিন্তু সে সম্পর্কে মন্তব্য করতে একেবারেই রাজি হন না তবে... 'that the discussion was over highly secret matters which could not and would not be disclosed. There is no connection between Menon's interview and Peace Conference subjects. ....the meeting deals exclusively with Indian and Russian Relations. Pandit Nehru selected Menon for the secret mission to Molotov because of his Communist background.' এই সংবাদের ভিত্তিতে ব্রিটিশ গোয়েন্দা বিভাগের মন্তব্য "Informed quarters here believed that the purspose of Menon's interview was to gain Soviet-support for a new Indian interim Government to offset particulary in foreign relations predominant British influnce."

এ বিষয়ে ভারতে অবস্থিত ভাইসরয় ওয়াভেলের বিরক্তি প্রকাশ—তাঁর মতে নেহরুর ব্যক্তিগত দূতের সমস্ত খরচ বহন করতে হবে ব্রিটিশ ভারত সরকারকে আর অন্যান্য সুযোগ সুবিধার জন্য ব্যবহৃত হবে ব্রিটিশরাজ—সবদিক খতিয়ে দেখে তাঁর মন্তব্য...."I think this is a most ill advised and ill timed proposal. I have told Nehru

I dislike it and that it will do little credit to interim Government or Congress and have said that I think representatives, when sent, should be officially accredited and given official briefs."

মলোতভ দেশে প্রত্যাবর্তন করে নেহরুর আবেদন যথাস্থানে পৌঁছে দেন। স্তালিন আমৃত্যু নেহরুর প্রতি কোনও প্রকার উৎসাহ প্রকাশ করেননি। বরং ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির প্রতিনিধিদের সঙ্গে সাক্ষাতে নেহরুর থেকে দূরত্ব রাখার উপদেশ দিয়েছেন। সুতরাং এ ক্ষেত্রেও শস্যের জন্যই আবেদন হোক, অথবা মধ্যবর্তী-সরকার ও সোভিয়েত সরকার আরও কাছাকাছি আসার সঙ্কল্পেই হোক কিংবা নেহরুর সোভিয়েত দেশে যাবার নিমন্ত্রণ পাবার ইচ্ছেতেই হোক—কোনও কিছুতেই সোভিয়েত তরফ থেকে আমল না দিয়ে নেহরুর অনুরোধকে বিনয়ের সঙ্গে প্রত্যাখ্যান করে ৪৬ সালের ১০ অক্টোবর মলোতভ উত্তর দিলেন... 'Owing to drought in a number of important agricultural districts of the USSR, the Soviet Government unfortunately are unable this year to send any amount of cereals to India.' ভারত-সোভিয়েত কূটনৈতিক সম্পর্ক মাথায় রেখে কিছু প্রশ্ন এড়িয়ে গিয়ে তিনি চিঠি শেষ করছেন' .....In admitting the existence of particular difficulties which are to be overcome at the beginning by new Indian Government and by you personally. I wish you success in your work to perform tasks facing new Indian Government for the good of all Indian people.

yours sincerly
M. Molotov.

(সবকটি উদ্ধৃতিই L/P&S/12/4045. India Office London ব্রিটিশ মহাফেজখানা)

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শেষে ১৯৪৫ থেকে ৪৬ সালে আজাদ হিন্দ ফৌজের প্রত্যাবর্তন। কলকাতা, চট্টগ্রাম, মাদ্রাজ বন্দরে একের পর এক জাহাজ এসে ভিড়েছে সেইসব সৈনিকনিয়ে যাঁরা যুদ্ধ করেছেন ভারতের স্বাধীনতা ফিরিয়ে দিতে। তাঁরা এক মহান আদর্শে দীক্ষিত। যে আদর্শবান ব্যক্তিত্ব প্রতি মুহূর্তে তাঁদের স্মরণ করিয়েছেন দেশ স্বাধীন করাই আমাদের একমাত্র লক্ষ্য, তবে কেন যুদ্ধ শেষে কারও কারও মধ্যে বিশ্বাসঘাতকতার প্রবণতা দেখা দিল। এদের মধ্যে সর্বাগ্রে যে নাম উল্লেখযোগ্য তিনি আজাদ হিন্দ সরকারের ভারপ্রাপ্ত প্রচার বিভাগীয় মন্ত্রী এস. এ. আয়ার। তিনি তাঁর Unto him a witness গ্রন্থে লিখছেন যে নেতাজি তাঁকে আজাদ হিন্দ ন্যাশনাল ব্যাংকের চেয়ারম্যান এবং নেতাজি অর্থ তহবিল কমিটির চেয়ারম্যান করে সেগুলোর ভার দেন। তিনি সেই সব পদাধিকার করে কতবড় বিশ্বাসঘাতকতার পরিচয় দিয়েছিলেন সে এক বিরাট ইতিহাস। প্রথমত তিনি টোকিও-তে ব্রিটিশ দূতাবাসের ভারপ্রাপ্ত গোয়েন্দা প্রধান কর্নেল ফিগেসের নিকটতম ব্যক্তি হওয়াতে যুদ্ধবন্দিদের নামের তালিকায় তাঁর নাম থাকা সত্ত্বেও—তিনি বেকসুর খালাস পেয়ে বহাল তবিয়তে জাপানে ঘুরে বেড়িয়েছেন ১৯৪৫-এর ২০শে নভেম্বর পর্যন্ত। কারণ তাঁর কথামতো ২১শে নভেম্বর তিনি ও হাবিবুর রহমান একসঙ্গে দিল্লির মাটিতে পা রাখেন। এরপর এই এস এ আয়ারের নানা তদন্তের ভিত্তিতে এবং তাঁর আনা কাগজপত্রের ভিত্তিতে নেহরুর সম্পূর্ণ বিশ্বাস জন্মায় যে তথাকথিত বিমান-দুর্ঘটনায় নেতাজির মৃত্যুর মধ্যে কোনও সন্দেহের চিহ্ন থাকতে পারে না!

এই মৃত্যু ও ডা: ত্সুরুতার Death Certificate ঘিরে ৪৬ সালে আবার সন্দেহ দেখা দিলে ওই বছর অক্টোবর মাসে MI 2-র দ্বারা আবার একটি Death Certificate প্রস্তুত করা হয়। এই রিপোর্ট লিখছেন সেই তাইপেই আর্মি হসপিটালের অপর এক ডাক্তার নাম ইয়োশিমি—তাঁর প্রদত্ত রিপোর্টে মৃত্যুর সময় চিহ্নিত হয়েছে রাত্রি ১১টার পর। বিস্তারিত বিবরণের মাধ্যমে তাঁর রিপোর্ট প্রস্তুত হয়েছে। (PRO WO 208/3812 MI 2 MD/JAG/FS (A) 1223 London ব্রিটিশ মহাফেজখানা)।

৪৬ সালের জুলাই-এ প্রদত্ত রিপোর্ট ও অক্টোবরে প্রদত্ত রিপোর্ট আর্মি হাসপাতালের দুই ভিন্ন ডাক্তার লিখেছেন ও সই করেছেন। অতএব কোনটিকে স্বীকার করে নিতে হবে তা বিবেচ্য বিষয়।

অপরদিকে ব্রিটিশ গোয়েন্দা বিভাগের W. Mck Wright-এর প্রদত্ত রিপোর্ট থেকে দেখা যাচ্ছে....'10. I enclose a copy of Habi-ur-Rahaman's CSDIC report. We find this unsatisfactory. The multitude of discrepancies in accounts of the actual crash as given first to C.I.C. in Tokyo." [INA 273. J. M. C Exhibit-300]

পরে আরও লিখছেন, এত সন্দেহ থাকা সত্ত্বেও হাবিবুর রহমানই একমাত্র ব্যক্তি যিনি সুভাষচন্দ্রের সঙ্গে ছিলেন; হাবিবুর কিছু কিছু বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ ঘটানোয় নেহরু এই মৃত্যুর গল্পকে বিশ্বাস করছেন। আর এস এ আয়ার বোম্বাইয়ে সংবাদমাধ্যমের কাছে জানিয়েছেন যে তিনি মনে করেন সুভাষচন্দ্র বসুর মৃত্যু হয়েছে। সুতরাং যেখানে একদিকে ব্রিটিশ গোয়েন্দা বিভাগের মধ্যে অনিশ্চয়তা,

সন্দেহ, অপরদিকে আজাদ হিন্দ সরকারের প্রাক্তন মন্ত্রীর অত্যন্ত দৃঢ় উক্তি—এসবের মধ্যেই সন্দেহের অবকাশ থেকে যায়। অথচ নেহরু নিঃসন্দেহে মৃত্যু হয়েছে বলেই স্বীকার করে নেন। ১৯৪৬ থেকে আজ ২০০৬-এ উপনীত হয়েছি। এরমধ্যে বহু জল গড়িয়েছে—কমিটি, কমিশন—সে বিষয়ে আলোচনা বর্তমান প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নয়।

১৯৪৬ সালে আজাদ হিন্দ ফৌজের যে-ফৌজিরা প্রত্যাবর্তন করেছিলেন আজ তাঁরা কোথায়? যে জাহাজে করে যাঁরা চট্টগ্রামে নেমেছিলেন তাঁদের হিসাব পাওয়া কঠিন। কারণ, কয়েক মাসের মধ্যেই দেশভাগ এবং পাকিস্তান সরকার পূর্ব-পাকিস্তানে সেই সৈনিকদের কোথায় কীভাবে নিয়োজিত করেছিলেন জানা যায় না। সে দেশে এ বিষয়ে গবেষণা হয়েছে কি না তা-ও আমার জানা নেই। যে-জাহাজ মাদ্রাজ শহরে এসেছিল তাঁদের মধ্যে বহু ফৌজিই মাদ্রাজ জেলে বিনা বিচারে হারিয়ে গেছেন। এ সম্বন্ধে অধ্যাপক আন্নামালাইয়ের গবেষণা প্রশংসাযোগ্য। যে-জাহাজ কলকাতায় এসেছিল তাতে যাঁরা এসেছিলেন, তাঁদের নীলগঞ্জ ও ঝিকাড়গাছা ক্যাম্পে রাখার ব্যবস্থা হয়। বিচার বিভাগীয় তদন্তের কাগজপত্র থেকে কিছু কিছু ব্যক্তিকে ছেড়ে দেওয়া হয়—আর বাকি সব! তাদের নামের এক বিশাল তালিকা মহাফেজখানায় জমা পড়েছে অথচ তাঁরা বা তাঁদের পরিবার কোথায়! কী করে, কেন এবং কী কারণে তাঁদের মুছে ফেলা হয়েছে—সে কথা কী আমাদের জানবার অধিকার নেই? হয়ত সম্পূর্ণ অধিকার হারায়নি। এদের মধ্যে অনেকেই ছাড়া পাবার পর নতুন উদ্যমে নেতাজির আদর্শে আবার ব্রিটিশের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানোর জন্য সংগঠিত হচ্ছিলেন। গোপনে সংঘবদ্ধ হয়ে যে সংগ্রাম গড়ে তুলতে চাইছিলেন—এই সেই ১৯৪৬ সাল ব্রিটিশ আবার তাদের গুঁড়িয়ে শেষ করে দিয়ে চলে গেছে। তাঁদের সংগৃহীত অর্থতহবিলের সিংহভাগ নিয়ে তাঁদের এই নতুন ভাবনাচিন্তাকে ধুলোয় মিশিয়ে দিয়ে বিদায় নিয়েছে। নেতাজির সংগ্রামী আদর্শকে সামনে রেখে তাঁরা যখন আবার নতুন করে সংগ্রামকে ঘরে ঘরে পৌঁছে দিতে ব্যস্ত—সেই সময় নানা প্রকারে শেষ এবং সর্বশক্তি প্রয়োগের এক ধ্বংসলীলার মাধ্যমে ব্রিটিশরাজ বিদায় নিয়েছে—সেই হারিয়ে যাওয়া সংগ্রামীদের খোঁজ নেবার শক্তিটুকুও খর্ব করে দিয়েছে। ভুলে গেছি আমরা এই স্বাধীনতালাভের এক অংশে সেই হারিয়ে যাওয়া আজাদ হিন্দ ফৌজের সত্যনিষ্ঠ কর্মবীরদের কথা! এ সবই সমকালীন ঘটনার সরকারি বিবরণী সংরক্ষণ দফতরে লিখিত আছে। সময় এসেছে ফিরে দেখার নতুন ভাবনাচিন্তার মাধ্যমে গবেষণার—যেন ভুলে না যাই।

অপাপবিদ্ধ

দিলীপ ভট্টাচার্য

মধ্য কলকাতার একটা স্কুলে দুপুরে টিফিনের সময় একটি ছাত্র তার বই ব্যাগ নিয়ে স্কুলের পাশের পার্কে ঢুকল। বৈশাখ মাস, খুব গরম ছিল সেদিন। ছেলেটা পার্কের কোণের কলে ভাল করে হাত মুখ ধুয়ে একটা গাছের ছায়ায় বসল। ছেলেটা বেশ রোগা আর লম্বা। গরমে তার মুখটা বেগুনি হয়েছে, ছোট ছোট করে ছাঁটা চুল খাড়া হয়ে আছে। তার পরনে সাদা জামা, ঘন নীল প্যান্ট। হাতে ঘড়ি নেই সে ব্যাগ খুলে তা থেকে একটা খবরের কাগজ, একটা টিফিন বাক্স আর ওয়াটার বটল বার করল। তারপর কাগজটা মাটিতে পেতে টিফিন বাক্স খুলল। একটা কুকুর লেজ নাড়তে নাড়তে এসে তার থেকে একটু দূরে বসল। আর গাছের ওপর থেকে দুটো কাক চেঁচিয়ে তাদের উপস্থিতি জানাল। ও স্কুল থাকলে এখানে বসেই খায়, আর কুকুর, কাককে রুটির টুকরো বিলি করে। আজকে সে-সব হওয়ার আগেই স্কুলের ঘণ্টা বেজে উঠল।

ছেলেটা অবাক হয়ে স্কুলের দিকে চাইল। এত তাড়াতাড়ি টিফিন শেষ হওয়ার কথা নয়। কী হল আজ? ও দেখল যে দলে দলে ছেলেমেয়ে স্কুল থেকে বেরিয়ে আসছে। ও আবার যেমন করে একটা একটা জিনিস বার করেছিল, ঠিক উলটোভাবে এক এক করে সেগুলো ব্যাগে পুরল। শুধু একটা রুটি হাতে রেখে দিল। স্কুলের দিকে হাঁটা দেওয়ার আগে সে রুটিটাকে টুকরো করে কুকুর আর কাক দুটোকে ছুঁড়ে দিল।

স্কুলে এসে ছেলেটা শুনল যে স্কুলের একজন প্রাক্তন ছাত্র মন্ত্রী হয়েছেন, তাঁকে আজ পাঁচটার সময় সংবর্ধনা দেওয়া হবে। তাই আজ আর ক্লাস হবে না। ছাত্রছাত্রীদের অনুরোধ করা হয়েছে তারা যেন সংবর্ধনায় উপস্থিত থাকে। ও একটু দোটানায় পড়ল। একদল ছাত্রছাত্রী চেঁচামেচি করতে করতে বেরল, ছেলেটাকে দেখে তারা হাসল। ছেলেটা মিশুকে নয়, একাচোরা। কিন্তু ওর নিরীহ প্রকৃতি, শান্ত স্বভাবের জন্য সহপাঠীরা ওকে ভালবাসে।

'সিনেমায় যাবে? আইনক্সে।'

'সংবর্ধনায় থাকবে না তোমরা?'

'সে তো পাঁচটার সময় হবে। অতক্ষণ কে থাকে? যাবে তো চলো।'

ওর লোভ হল। কিন্তু অত টাকা তো সে আনেনি। তাই হাসিমুখে বন্ধুদের না করল।

'ঠিক আছে। পরের বার কিন্তু ছাড়ব না।'

'আগে থেকে প্রোগ্রাম করলে যাব।'

'আজ তবে বাড়ি যাচ্ছ?'

'হ্যাঁ। মা একলা থাকে।'

বন্ধুরা ওকে টা-টা করে চলে গেল।

সেদিন শুক্রবার ছিল, পরের দিন কী একটা পরবের জন্য স্কুল বন্ধ থাকবে। তারপরে রবিবার। আড়াই দিন একটানা ছুটির খুশি নিয়ে ও শিয়ালদা স্টেশনের দিকে হাঁটতে লাগল। গরমে ওর গেঞ্জি জামা ভিজে গেছে, চুলগুলো যেন আরও খাড়া হয়ে উঠেছে, ওর গাল, কপাল বেয়ে ঘামের ধারা নেমে সেগুলো থুতনি বেয়ে পড়তে লাগল। পরিশ্রমে অভ্যস্ত ছেলেটা হনহন করে স্টেশনের দিকে হাঁটতে লাগল।

ওর ভাল নাম রণেন, ডাক নাম অনেকগুলো, সেগুলো মা ছাড়া কেউ বিশেষ ব্যবহার করে না। এখন মা ওকে বাবাই বলে ডাকেন। ও মাধ্যমিক পাশ করে এই কলেজে ঢুকেছে। লেখাপড়ায় দারুণ কিছু না হলেও প্রথম বিভাগ পেয়েছে, অঙ্ক ওর প্রিয় বিষয়, এবং জয়েন্ট এন্ট্রান্স করে ওর ইঞ্জিনিয়ারিং পড়ার ইচ্ছে আছে।

ছেলেটার মার নাম রীনা। সে লড়াকু মানুষ। রীনার মা অর্থাৎ ছেলেটার দিদিমা বিশ হাজার টাকা পণ দিয়ে আঠারো বছরের মেয়েকে ধনী পরিবারে বিয়ে দিয়েছিলেন। বিয়ের পরে জানা গেল যে জামাই অপরিণত বুদ্ধি, রাতকানা এবং সীমিত শারীরিক ক্ষমতার অধিকারী। রীনার বিয়ের এক বছর পর রণেনের জন্ম হয়। জামাইয়ের রোজগারপাতি কিছুই ছিল না। তাদের সংসার চালানোর বাহানায় ছেলের বাবা রীনার মায়ের কাছে আরও টাকা চায়। মেয়ের ওপর অত্যাচার শুরু করে। উকিলমামার পরামর্শে রীনা বিবাহ-বিচ্ছেদের মামলা আনে। মামলায় সে খোরপোশের ডিক্রি পায়। কিন্তু শ্বশুরবাড়ি টাকা দিতে টালবাহানা করতে থাকে। রীনা ফের মামলা করলে, আদালত তার শ্বশুরবাড়িকে রীনার নামে এক লাখ টাকা ব্যাঙ্কে

জমা করতে বলে। যাতে সেই টাকার সুদে তার খোরপোশ হয়। রীনা সেই ভরসায় যাদবপুরে মার কাছে ফিরে আসে।

কিন্তু ওই টাকায় সংসার চালানো সম্ভব ছিল না। রীনা তাই তার সাধ্যমতো ব্যবসা শুরু করে। ও বিয়ের আগে শাড়িতে নকশা করা শিখেছিল। এখন সে ব্লাউজ বানানো শিখল। ওরা যাদবপুরে থাকত। সেখানে আরেকজন মহিলা শাড়ির ব্যবসা করতেন। তাঁর নাম সীতা। রীনার সঙ্গে তাঁর বন্ধুত্ব হয়। ওই ভদ্রমহিলা বিয়ের শাড়ি সরবরাহ করতেন। রীনার গুণ দেখে সীতা তাকে দিয়ে সেইসব শাড়িতে নেট, ফলস লাগিয়ে নিত। বিয়ের মরসুমে ওদের দু'জনেরই ভাল রোজগার হতে লাগল। ব্যবসা বড় হতে ভাড়া বাড়ির সামান্য জায়গায় রীনার আর কুলোত না। তার মামা মধ্যমগ্রামে একটা জায়গার খোঁজ দিলেন। সাত বছর আগে, রণেনের বয়স যখন দশ, তখন রীনা তার ব্যাঙ্ক আমানত ভাঙিয়ে সেই জমি কিনে, জমি বন্ধক রেখে ব্যাঙ্কের কাছ থেকে ধার নিয়ে একটা ছোট বাড়ি করল। সে যাদবপুর থেকে মধ্যমগ্রামে চলে গেল। যাদবপুরে তার নানা জানাশোনা হয়েছিল। সেগুলো রীনা নষ্ট করেনি। তার মধ্যমগ্রামের বাড়িতে ফোন ছিল না, পাবলিক বুথ থেকে ফোন করে সে যাদবপুরের খদ্দেরদের সঙ্গে যোগাযোগ রাখত। পয়সাকড়ির ব্যাপারে সে খুব সমঝদার মানুষ, সে ফোন, সেলফোন নেয়নি, ছেলেকে একটা ঘড়ি পর্যন্ত কিনে দেয়নি। এখন রীনার বয়স ঠিক ছত্রিশ। তার ছেলের বয়স সতেরো। তার আন্তরিক বিশ্বাস এবং সে জানে যে তার বিশ্বাস মিথ্যা নয় যে একদিন এইগুলো সব হবে। কিন্তু তাঁর আগে ছেলেটাকে মানুষ করা দরকার।

রণেন ঠিক সময় শিয়ালদা থেকে ট্রেন ধরে প্রায় আড়াইটের সময় মধ্যমগ্রামে পৌঁছল। স্টেশনের ভেতরে ভিড়, বাইরে কড়া রোদ। ও রিকশা নিল না। পায়ে হেঁটে বাড়ির দিকে চলল। মিনিট কুড়ি বাদে সর্বাঙ্গে ঘাম নিয়ে ও বাড়িতে দরজার সামনে এসে দাঁড়াল। ওদের কলিং বেল নেই, ও দরজায় কড়া নাড়ল। মিনিট পাঁচেক অপেক্ষা করল, মা দরজা খুললেন না, নিশ্চয়ই কোনও কাজে বেরিয়েছেন।

ওদের বাড়ির পেছনে আরেকটা দরজা আছে। ও আর ওর মা দু'জনের কাছে পেছনের দরজার চাবি থাকে। গলি দিয়ে পেছনের দরজার এসে ছেলেটা ব্যাগ থেকে চাবি বার করে দরজার ইয়েল লক খুলে ভেতরে ঢুকল। ঘরের ভেতরটা একটু ঠান্ডা। তেষ্টায় ওর গলা ফেটে যাচ্ছিল, কিন্তু মুখ হাত ধুয়ে শরীরটাকে ঠান্ডা না করে ও জল খাবে না। মার শিক্ষা ও অক্ষরে অক্ষরে মেনে চলে।

ওদের বাড়িতে দুটো ঘর। একটায় ওর মা শোয়, আরেকটায় ও পড়াশোনা করে। অনেক দিন রাত্রে ও পড়ার ঘরে ঘুমোয়। এই দুটো ঘর ছাড়া বাড়িতে বাথরুম, রান্নাঘর, ডাইনিং-স্পেস আর এক চিলতে বসার জায়গা আছে। তার ওপর ছাদে যাওয়ার সিঁড়ি, ছাদে আর একটা চিলেকোঠা আছে। ওটাকে মা তাঁর কাজের জন্য ব্যবহার করেন। বাড়ির পেছনে একটু জমি আছে, যাতে মরশুমি ফল আর তরিতরকারির গাছ লাগানো হয়। বাড়ির চারধারে বাঁশের বেড়া আর সামনে হাতে বানানো এক পাল্লার দরজা, যাতে গরু-ছাগল পেছনের জমির গাছপালা না খেয়ে যায়।

ছেলেটা জুতো খুলে তার পড়ার ঘরে ঢুকে টেবিলে বই ব্যাগ রাখল। টেবিল ফ্যান চালাল। ব্যাগ থেকে টিফিন কৌটো, জলের জায়গা আর খবরের কাগজ বার করে সেগুলো রান্নাঘরে রেখে এল। ফিরে এসে জামা, প্যান্ট, গেঞ্জি ছেড়ে সেগুলো আলনায় রাখল। তারপর আলনা থেকে তোয়ালে নিয়ে একটা ছোট আন্ডারপ্যান্ট পরে বাথরুমের দিকে গেল।

বাথরুমের দরজা খুলে ও স্তম্ভিত হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। বাথরুমে দু'জন অচেনা মহিলা দাঁড়িয়ে আছেন। তাঁদের আতঙ্কিত চোখ ওকে গিলে খাচ্ছে। বোধহয় মা মেয়ে। বয়স্কা মহিলা কমবয়সির পিঠের কিছু পরীক্ষা করছিলেন। ওকে দেখে কিশোরী একেবারে ন যযৌ ন তস্থৌ দাঁড়িয়ে রইল। মায়ের বয়সি মহিলা মেয়ের পেছনে নিজেকে যতটা সম্ভব আড়াল করলেন। সেই সঙ্গে দু'হাতে পেছন থেকে মেয়ের বুক আর কোমর জড়িয়ে ধরলেন।

ছেলেটার হৃৎপিণ্ড লাফাচ্ছিল, ও ভেবে পাচ্ছিল না এটা কী করে সম্ভব। ও সত্যিই চলৎশক্তিরহিত হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। মানুষের এরকম অসহায় মুখ, এরকম নিরুপায় অবস্থা ও কখনও দেখেনি। ওর বুকের ভেতরটা উথালপাথাল করছিল। করণীয় সম্পর্কে সম্পূর্ণ হতবুদ্ধি হয়ে ও হাঁ মুখে বাথরুমের দরজা ধরে দাঁড়িয়ে রইল। তারপর একটা সময় ওর খেয়াল হল যে ও ভীষণ অন্যায় কাজ করেছে। তখন ও গায়ের সমস্ত শক্তি দিয়ে বাথরুমের দরজা বন্ধ করে নিজের কামরায় ছুটে এল। ও দু'সেকেন্ড সময় ওখানে দাঁড়িয়েছিল। অথচ ওর মনে হচ্ছিল যেন ওই দরজার মুখে একটা যুগ কেটে গেছে। দরজাটা বন্ধ করার সময় ওর নির্বুদ্ধিতায় পাল্লাটা সোজা ওর নাকে এসে লেগেছিল। কিন্তু ত্রস্ত হতভম্ব ছেলেটার কোনও সাড়, কোনও ব্যথার অনুভূতি ছিল না তখন।

কামরায় ঢুকে ও আড়ষ্ট হয়ে বিছানায় বসল। দরদর করে ঘামছিল ও। টেবিলে ফ্যানের হাওয়া কোনও কাজে আসছিল না। কিছুক্ষণ এভাবে বসে থেকে ওর বিহ্বল ভাবটা কমে কতগুলো বাস্তব চিন্তা ওর মাথায় ভিড় করল। বাথরুমের ছিটকিনিটা কাল রাত্রে ভেঙে গেছে। আজ ভোরে উঠে ও কাঠের মিস্ত্রিকে ঘুম থেকে তুলে নতুন ছিটকিনি লাগাতে বলে

এসেছে। নিশ্চয় কুঁড়ে ছুতোরটা এখনও কাজটা সারেনি। দ্বিতীয়ত, দু'জন মহিলার একজন প্রায় তার মায়ের বয়সি। আরেকজন রণেনের চেয়ে ছোট। তাকে এখনও মহিলা বলা চলে না। বয়স্কা মহিলার গালে একটা তিল আছে। তিল না বলে ওটাকে আঁচিল বলা ঠিক। ভদ্রমহিলা বেশ সুন্দরী। তিলটা ওঁর মুখের সৌন্দর্য বাড়িয়েছে।

এইসব নোংরা কথা নয়, যেটা ওকে ভাবিয়ে তুলছিল তা হল, তার মনে হচ্ছে ভদ্রমহিলাকে সে আগে দেখেছে। ওই তিলটা তার বিশেষ পরিচিত। কোথায় বা কখন ওঁকে দেখেছে তা মনে পড়ছে না। তৃতীয় যে কথাটা ওকে ভাবাচ্ছিল তা হল ওঁরা ওর সম্পর্কে কী ভাবলেন। ওঁদের কাছে ওর প্রথম পরিচয় হল একটা নোংরা মানুষ। এটা ভেবে ওর মন গ্লানিতে মন ভরে যাচ্ছিল। ওঁরা রনেণকে ঘৃণা করছেন। ভবিষ্যতেও করবেন। এবং তাহলে মা-সর্বস্ব রণেনের ভবিষ্যৎ কী দাঁড়াবে। এই ছিল সেই সময়ে ওর মূল ভাবনা।

বাইরে থেকে আসা একটা শব্দে ওর ভাবনার ছেদ পড়ল। আবার ওর হৃৎপিণ্ড লাফিয়ে উঠল। ওরা বাথরুমের দরজা খুলেছে, ও লাফিয়ে উঠে নিজের কামরায় দরজা বন্ধ করল। তারপর দুরুদুরু বুকে খাটে বসে অপেক্ষা করতে লাগল। কিছুক্ষণ বাদে ওর ভয় সত্যি হল। কামরার দরজায় মৃদু টোকা পড়ল। ভয়ঙ্কর একটা আতঙ্ক ওকে আচ্ছন্ন করল। ও দরজা খুলল না। সে এখন একটা চরম ঘৃণার পাত্র। সেই ঘেন্নাকে মোকাবিলা করার প্রবৃত্তি হচ্ছে না তার। ও একটা অন্যায়ের শিকার হয়েছে, কিন্তু কেউ বিশ্বাস করবে না যে ওর কোনও দোষ নেই। একবার ওর মনে হল যে ওর মতো অসহায় কেউ নেই। ও একটা এসপার-ওসপার করার সিদ্ধান্ত নিল। এই বাড়িতে থাকলে ওই দুই নারীর মুখোমুখি তাকে হতেই হবে। সুতরাং সে বাড়ি ছেড়ে চলে যাবে। ওঁরা চলে গেলে ফিরে আসার কথা ভাবা যাবে। আপাতত সে বাইরে থাকবে।

কোথায় কার কাছে গিয়ে থাকবে এসব বাস্তব সমস্যা তার মাথায় এল না। কারণ তখন তার সমস্ত ভাবনা জুড়ে আছে একটা ভয় এবং সেই ভয়ের উৎস থেকে যতটা সম্ভব দূরে থাকার ব্যাগ্রতা। ও আবার জামা প্যান্ট পরল, মানিব্যাগ পকেটে পুরল, ওতে সামান্য কটা টাকা ছিল। তারপর কামরার দরজা খুলে মাথা নিচু করে পা টিপে টিপে পেছনের দরজায় এসে দাঁড়াল। ওর মার কামরার পাশ দিয়ে আসার সময়ও চোখের কোণ দিয়ে দেখতে পেল অতিথি মা মেয়ে মাথা নিচু করে মার খাটে বসে আছে। তাঁরা নিশ্চয় ওকে দেখলেন। কিছু বললেন না।

দরজা খুলে ও দেখল মা দাঁড়িয়ে আছেন। হাতে ভর্তি বাজারের থলি, মিষ্টির বাক্স।

'তুই এসে গেছিস?'

মার স্নেহময় কথা শুনে ওর কান্না পেল।

'স্কুল ছুটি হয়ে গেল?'

ওর নীরবতায় মার মুখে দুশ্চিন্তা ফুটে উঠল।

'শরীর খারাপ? কী হয়েছে?'

'না কিছু হয়নি।'

'গলা তো একদম ভেঙে গেছে। রোদে ঘুরেছ নিশ্চয়। স্টেশন থেকে হেঁটে এসেছ?'

ও মাথা নেড়ে জানাল হ্যাঁ।

'এতবার বলেছি, রিকশায় আসবে। তবু রোদে না ঘুরলে শান্তি হয় না। চল থার্মোমিটার লাগা।' মা বকতে বকতে ভেতরে ঢুকলেন।

মা নিজের ঘরে ঢুকলেন।

'বাবাই সীতামাসির সঙ্গে আলাপ হয়েছে তো? চিনতে পেরেছিস? নীতা কত বড় হয়েছে দেখেছিস?'

ওর বুকটা আবার ধক করে উঠল। যাদবপুরের সুন্দরী সীতামাসি। ওঁর মুখের তিলটাও চিনতে পেরেছিল, মানুষটাকে পারেনি। মাসির মেয়ে নীতা, তার ছোটবেলার খেলার সাথি এবার যৌবনে পা দেবে। আবার গ্লানিতে ওর মন ভরে উঠল। প্রায় ছুটে ও নিজের কামরায় ঢুকল।

'কী রে? মাসি তোর জন্য কী সুন্দর জামার পিস এনেছে জানিস?'

'দেখব। তুমি ব্যস্ত হচ্ছ কেন?'

ব্যস্ত রীনা রান্নাঘরে ঢুকল। কিছুক্ষণ বাদে তাঁর চিৎকার শোনা গেল।

'তুই টিফিন খাসনি?'

ও চুপ করে রইল।

'আমাদের সঙ্গে ভাত খাবি। অনেক খাবার আছে।'

ওরা একসঙ্গে খেতে বসল। ও মুখ নিচু করে খাবার মুখে তুলল। সীতামাসি আর নীতা পাথরের মতো মুখ করে খেতে লাগল।

'নীতা কথা বলছিস না কেন? লজ্জা লাগছে?'

নীতা মাথা তুলল না। রীনা হাসল।

'সীতা তোরও লজ্জা লাগছে নাকি। কথা বলছিস না।'

সীতা ম্লান হাসল। রীনা বুঝল না। শুধু বুঝল যে অতিথি এবং তার ছেলের মধ্যে কথাবার্তা হবে না। সে বুদ্ধিমতী মেয়ে, ভেবে নিল যে বয়ঃসন্ধির সঙ্কোচে তার বাবাই আর নীতা চুপ করে আছে। ওরা নীরবে খাওয়া শেষ করল। খাওয়ার পর রণেন নিজের কামরায় ঢুকে হাঁটুতে মুখ গুঁজে খাটের ওপর বসে রইল। ও সীতামাসির কণ্ঠস্বর শুনতে পেল।

'রীনাদি একটু ঘরে চলো।'

সীতামাসি প্রায় হাত ধরে টেনে রীনাকে তার কামরায় নিয়ে গেল। কিছুক্ষণ বাদে মার হাতের ছোঁয়ায় রণেন মুখ তুলল। মার মুখ থমথম করছে।

'ওরা চলল।'

বিস্ময়ে ওর মুখে কথা সরল না।

'কেন?'

মা ভুরু কুঁচকে অন্যদিকে মুখ করলেন।

'না গিয়ে উপায় কী?'

ওর গলায় একটা দলা পাকাল।

'আমি কি ইচ্ছে করে করেছি।' পুরুষ মানুষের কাঁদা বারণ। তাই রুদ্ধ কণ্ঠে কোনও মতে ও মার কাছে মিনতির স্বরে বলল। এবার মা ওর দিকে বিস্ময় ভরা মুখে তাকালেন। মাসি এসে দরজায় দাঁড়িয়েছে।

'তাই যদি ভাব, তাহলে ওঁরা যাবেন কেন? আমি নোংরা লোক, আমি চলে যাব। যাচ্ছিলাম তো। তুমি ঢুকলে তাই যাওয়া হল না। এবার সত্যি যাব।' ও উঠে দাঁড়াল।

ও দেখল না, কী বিস্ময় মা আর সীতামাসির মুখে জমা হচ্ছিল।

'তুই চাস ওরা থাকুক?' মা বিহ্বল স্বরে জিজ্ঞেস করলেন।

ও হাঁ করে মার দিকে চাইল।

'তুই রাগ করিসনি ওদের ওপর?'

হতভম্ব ছেলেটার মুখ দিয়ে কথা সরছিল না।

'ওরা তোর ভয়ে চলে যাচ্ছিল। তোর ঘেন্না এড়াতে।'

ও আর পারল না। মার সব শিক্ষা জলাঞ্জলি দিয়ে, নিয়ম ভেঙে ও হাউ হাউ করে কাঁদতে কাঁদতে বিছানায় উপুড় হল। কাঁদতে কাঁদতে ও মাথায় পিঠে দুটো স্নেহময় হাতের স্পর্শ টের পেল। অনেকক্ষণ বাদে ও ঠান্ডা হল, উঠে বসে চোখ মুছে মাথা নিচু করে রইল। মাসি সামনে এসে ওর চিবুকে হাত রেখে ওর মুখটা উঁচু করলেন। তারপর হাসলেন। ও তখন আবার ফোঁসফোঁস করে উঠল। ওঁরা উঠে দাঁড়ালেন।

'আয়।' মা ডাকলেন।

ও মা মাসির পেছন পেছন মায়ের ঘরে এল। ওখানে নীতা ওরই মতো হাঁটুতে মাথা গুঁজে মায়ের খাটে বসেছিল। মা নীতার মাথায় হাত দিতে ও মুখ তুলে চাইল। নিরীহ মুখে সেই ভয়টা আর নেই। ছেলেটা নীতার দিকে চেয়ে রইল। নীতা ওর দিকে চেয়ে মাথা নিচু করল।

'যেও না।'

নীতা উত্তর দিল না।

'কী? থাকবে তো?'

নীতা মাথা নেড়ে জানাল সে থাকবে।

সন্ধে হতে সীতামাসি তাঁর ডালা খুলে বসলেন। একটা ঝকমকে শাড়ি বার করে মাকে দিলেন।

'এটা তোমার রীনাদি।'

'এই দামি বেনারসি দিচ্ছিস।'

'একটা মাড়োয়ারি বিয়ের কয়েক লক্ষ টাকার অর্ডার পেয়েছি। নেট, ফলস লাগানো, ম্যাচিং শায়া, ব্লাউজ করার ভার তোমার।'

দরজার কড়া নাড়ার শব্দ এল। ছেলেটা উঠে গেল। কাঠের মিস্ত্রি এসেছে। ও তার কাজ দেখতে গেল। লোকটা দশ মিনিটের মধ্যে নতুন ছিটকিনি লাগিয়ে টাকা নিয়ে চলে গেলে ও আবার মায়ের ঘরে এল।

'দ্যাখ এগুলো তোর জামা প্যান্টের পিস।'

'এই শাড়ি দুটো?'

'এটা মাসির আর এটা নীতার। যা নীতা পরে আয়।'

'আমিও এগুলো আমার ঘরে রেখে আসি।'

কিছুক্ষণ বাদে শাড়ি পরা নীতা স্কার্ট ব্লাউজ হাতে ঘরে ঢুকল।

'বোস।'

ফের সে মাথা নিচু করে বসে রইল। ওরাও কথা বলছিল না। ও বুঝতে পারল যে আজ মাসি কিংবা নীতা কারও পক্ষেই বেশি কথা বলা সম্ভব নয়। মুখচোরা ছেলেটার মন খারাপ হল। দমবন্ধ করা ভাবটা কাটছে না। জোর করে কাটানোর ক্ষমতা ওর নেই, সেটা ঠিকও হবে না। তবু ও মার কানের কাছে মুখ নিল। মা অবাক হয়ে ওর দিকে চাইলেন।

'বলবি কিছু?'

ও মাথা নেড়ে সম্মতি জানাল।

'চুপি চুপি বলবি কেন? জোরে বল।'

ও মুখ গোঁজ করল।

'ঠিক আছে বল কী বলবি।'

ওর ফিসফিস স্বরের কথা শুনে মায়ের মুখে হাসি এল।

'চল তো সীতা, তোর শাড়িটা নিয়ে আয়।'

'কোথায় যাব রীনাদি?' মাসি অবাক হয়ে হাসল।

'আয় না।'

ঘরে ও আর নীতা বসে রইল। ও জানে মার শাড়ি পরতে বেশ সময় লাগে। ততক্ষণ নীতার সামনে একা নীরবে বসে থাকা মুশকিল। অথচ উঠতেও পারছে না। সেটা অসভ্যতা হবে। তখন ওর মনে একটা প্রশ্ন এল। ও নীতার দিকে চাইল।

'একটা কথার উত্তর দেবে?' খুব সাবধানে জিজ্ঞেস করল ও।

নীতা ওর দিকে চাইল।

'আমার সামনে বসতে ঘেন্না করছে?' এবারও খুব নিচু সঙ্কোচ ভরা স্বরে ও জিজ্ঞেস করল।

নীতা অল্প হেসে মুখ নিচু করল।

'ইচ্ছা না করলে উত্তর দিও না।'

নীতা মুখ নিচু রেখেই খুব অল্প করে দু'দিকে মাথা নাড়ল।

'ঘেন্না করে?'

নীতা আবার দু'দিকে মাথা নাড়ল।

মা, মাসি নতুন শাড়ি পরে এসে দাঁড়ালেন। ও অপলক মুগ্ধ দৃষ্টিতে দু'জনের দিকে চেয়ে রইল। একটা ঝড় উঠল। মার মুখে আতঙ্কের ছায়া পড়ল।

'ছাদের ঘর খোলা আছে?'

রণেন উঠে দাঁড়াল।

'তুই নীতার কাছে থাক। সীতা আয়।'

ওঁরা ওপরে গেলেন। আর তখনই আলো নিভে গেল। ও টর্চ নিয়ে মার কাছে ছুটল। ছাদে ফোঁটা ফোঁটা বৃষ্টি পড়ছে।

'তুই নীচে গিয়ে মোমবাতি জ্বালা। আমরা জানালা বন্ধ করে আসছি।'

ও নীচে ফিরে এল। অন্ধকার ঘরে নীতা একলা বসে আছে। ওই ঘরেই মোমবাতি। ও ঘরে ঢুকল না। ওর নিজের কামরায় একটা ব্যাটারির ল্যাম্প আছে। সেটা ওর অতি প্রিয়। সেটা জ্বালিয়ে ও নীতার কাছে গেল। তারপর মেঝেয় বসল। ভীষণ বেগে হাওয়া বইল। নীতা বড় বড় চোখ করে এদিক-ওদিক চাইল। ও জানলা বন্ধ করে দিল। তারপর মোমবাতি জ্বালিয়ে ব্যাটারির ল্যাম্পটা নিভিয়ে দিল। আলোর শিখা থরথর করে কাঁপতে লাগল। বাইরে কান্নার মতো হাওয়া দিল। তখন একটা অদ্ভুত ঘটনা ঘটল। নীতা তার ডানহাত দিয়ে রণেনের বাঁহাত ধরল। উত্তপ্ত হাত। ওর সারা শরীর শিউরে উঠল। শিরা ধমনি দিয়ে গরম রক্ত বইতে লাগল। ও জোরে জোরে নিঃশ্বাস নিতে লাগল। ওর আর মনে হল না যে ওরা নীরবে বসে আছে। মায়েরা নীচে নেমে এলেন। অল্প আলোয় ওঁরা ঘরে ঘোরাফেরা করছিলেন। ও সেদিকে চেয়ে রইল। ওর মনে হচ্ছিল পরীদের সভায় বসে আছে। একটা আবেশ ওকে আচ্ছন্ন করল। আলো যেমন হঠাৎ গিয়েছিল তেমনই হঠাৎ ফিরে এল। আর রণেনের ঘোরটাও কেটে গেল।

'তোর নাকটা ফুলেছে কেন রিন্টু?'

রিন্টু। ওর কয়েক গন্ডা নামের মধ্যে এই নামটা দিয়েছিলেন সীতামাসি। কতদিন বাদে ও শুনল।

'ব্যথা করছে না?'

ও দু'দিকে মাথা নাড়ল।

'পড়ে গেছিলি?'

'না তো?'

'তবে?'

নীতা ভুরু কুঁচকে মার দিকে চাইল। তার মুখে তিরস্কারের ছাপ। সীতামাসির চোখ গোল হল। তিনি আর প্রশ্ন করলেন না।

রাত্রে মাসিরা রণেনের ঘরে আর রণেন মায়ের সঙ্গে শুল।

'সত্যিই তোর নাকটা ফুলেছে। কী করে হল?'

ও উত্তর দিল না।

'বলবি না আমায়?'

'তুমি আবার ওই কথা মনে করাচ্ছ।'

'কোন কথা?'

ও কিছুক্ষণ চুপ থেকে উত্তর দিল।

'ছুটে পালাতে গিয়ে বাথরুমের দরজাটা বেকায়দায় বন্ধ করে দিয়েছিলাম। ওটা নাকের ওপর এসে পড়ল।'

'ওষুধ দিসনি?'

'তখন টেরই পাইনি।'

রীনা পোড়খাওয়া মেয়ে। জীবনযুদ্ধে তার অনেক অভিজ্ঞতা আছে। সেই সংগ্রামের ছাপ তার চেহারায় পড়েনি। মনের ওপর পড়েছে। সে ছেলেকে ভালবাসে। কিন্তু সেই ভালবাসার মধ্যে দেখন-আদিখ্যেতা নেই। তার ছেলে এখন কৈশোর ছেড়ে যৌবনে পা দিয়েছে। অনেকের যেমন হয়, ওর চেহারাটা অস্বাভাবিক লম্বা হয়েছে, গালের হনু উঁচু হয়েছে, গাল বসে গেছে, কণ্ঠার হাড় উঁচু হয়েছে আর চুলগুলো হয়েছে খাড়া খাড়া। রীনা আশা করে তার ছেলে সুপুরুষ হবে। হয়ত হবে, কিন্তু বর্তমানে তাকে কেউ কুৎসিত বললে অন্যায় করবে না। কাঠখোট্টা রীনার চোখ জলে ভরে গেল। তার হৃদয় তার কুদর্শন সাত রাজার ধন মানিক বাবাইয়ের জন্য উথলে উঠল। সে ছেলের মাথায় হাত বুলল।

'মা।'

'বল।'

'সীতামাসি খুব ভাল। তাই না?'

'হ্যাঁ।'

'তোমার মতো।'

মা সাড়া দিলেন না।

'নীতাও খুব ভাল।'

এবারও মা নিরুত্তর রইলেন।

'বলছ না কেন? নীতা ভাল না?'

'হ্যাঁ, খুব ভাল।'

'তোমার মতো।'

'না।'

'তবে?'

'তোর মতো।'

রীনা আবার ছেলের মাথায় হাত বুলল।

আমার সময়ের কথা

ননীমাধব চৌধুরী

সম্পাদনা ও টীকা—সুমিতা চক্রবর্তী

(পূর্বপ্রকাশিতের পর)

(কলকাতার ছাত্রজীবন)

'চতুরঙ্গ' পত্রিকার আগের সংখ্যা থেকে শুরু হয়েছে ননীমাধব চৌধুরীর আত্মস্মৃতি 'আমার সময়ের কথা'-র ধারাবাহিক প্রকাশ। পূর্ববর্তী সংখ্যায় তাঁর সাধারণ পরিচয় দেওয়া হয়েছে। সেখানে তিনি নিজের বাল্যজীবন ও বিদ্যালয়ের কথা লিখেছেন। এই সংখ্যায় থাকছে ননীমাধব চৌধুরীর বি.এ. ও এম. এ. পড়বার সময়ের স্মৃতি।

পাবনা থেকে কলকাতায় এসে ছাত্রাবাস ও মেস-এ থেকে ইংরেজি সাহিত্যে স্নাতকোত্তর উপাধি অর্জন করেছিলেন তিনি। কারা ছিলেন তাঁর শিক্ষক ও সহপাঠী; কাদের সঙ্গে থাকতেন মেস ও হস্টেলে তার মনোজ্ঞ বিবরণ আছে এই অংশে।

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক এবং কেমনভাবে, কিছুটা অমনোযোগের কারণে সেই সম্পর্কের পরিণতিতে বিভূতিভূষণের সঙ্গে তাঁর শেষ দেখা হল না সে বিষয়ে তাঁর স্বীকারোক্তি পাঠককে কিছুটা ভারাক্রান্ত করবে।

ননীমাধব চৌধুরী বিভিন্ন ধরনের লেখা লিখেছেন। প্রবন্ধ, ছোটগল্প, উপন্যাস, প্রাচীন ভারতের আদিবাসীদের সম্পর্কে গবেষণাগ্রন্থ। কীভাবে তিনি নিজের পঠনপরিধি বিস্তৃত করে নিচ্ছিলেন তার পরিচয় আছে এখানে। সেই সঙ্গে সেই সময়ে (১৯১৫-১৯২৫) ভারতের রাজনৈতিক পরিস্থিতি সম্পর্কেও নিজের ধারণা ব্যক্ত করেছেন তিনি।

আমরা অনেকেই আজ বিস্মৃত হয়েছি যে ননীমাধব চৌধুরী সমাজ রাজনীতি-কেন্দ্রিক এক সুবৃহৎ আট খণ্ডে বিন্যস্ত উপন্যাসের পরিকল্পনা করেছিলেন। তার ছয়টি খণ্ড মুদ্রিত হয়েছিল। এই পরিকল্পনা গোপাল হালদারের 'ভদ্রাসন' উপন্যাস-মালার কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। এই কিস্তির লেখাটিতে একাধিকবার চতুর্থ খণ্ড 'অভিযাত্রী' উপন্যাসের কথা আছে। এই সূত্রে আমরা ননীমাধব চৌধুরীর উপন্যাস সম্পর্কে সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের আলোচনার অংশবিশেষ উদ্ধৃত করছি। সুনীতিকুমারের লেখাটি ভূমিকা হিসাবে সংযুক্ত হয়েছিল ননীমাধবের উপন্যাসমালার শেষ খণ্ড 'শেষ অধ্যায়'-এর ভূমিকা রূপে। সেই উপন্যাসও এখন দুষ্প্রাপ্য। সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের লেখাটিও সম্ভবত আর কোথাও সংকলিত হয়নি।

পরবর্তী কিস্তিতে 'সবুজপত্র' গোষ্ঠীর সঙ্গে ননীমাধব চৌধুরীর ঘনিষ্ঠতা ও সেই সূত্রে লিখিত রচনার পরিচয় আমরা সন্ধান করব।

বাংলা সাহিত্যে নূতন সংযোজন রাজনৈতিক উপন্যাস

শ্রী সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়

(অংশ)

কাহিনী ঃ আমাদের জাতীয় জীবনের পঞ্চাশ বছরের অতি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়ের ইতিহাস ননীমাধববাবু আট খণ্ডে বিভক্ত বিরাট রাজনৈতিক ও সামাজিক উপন্যাসের আকারে রচনা করেছেন। এই উপন্যাসের কাহিনী ব্রিটিশ শাসন ও শোষণের বিরুদ্ধে দেশের মধ্যবিত্ত শ্রেণীর স্বদেশী আন্দোলনের মাধ্যমে বিদ্রোহ ঘোষণার (১৯০৫) কিছু আগে থেকে আরম্ভ হয়েছে এবং শেষ হয়েছে স্বাধীনতা লাভের পর গান্ধীজীর হত্যার বছরে (১৯৪৮)। ১৯১৯ থেকে সংগ্রামের সৈনাপত্য গ্রহণ করেছিলেন মহাত্মা গান্ধী, সৈনাপত্য শেষ হল বিদেশী শত্রুর আঘাতে নয়, দেশবাসীর একজনের হাতে চরম আঘাত পেয়ে। এই মর্মান্তিক ট্রাজেডির মধ্যে নিহিত রয়েছে আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রামের শেষ অধ্যায়ের নিষ্ঠুর মর্মকথা।

কাহিনীর ধারাবাহিকতা ঃ দেশের অর্ধ-শতাব্দীর রাজনৈতিক ও সামাজিক জীবন যার বর্ণনার বিষয় ভিন্ন নামে পরিবেশিত উপন্যাসের আটখণ্ডে বিবৃত সে কাহিনীর ধারাবাহিকতা রক্ষিত হয়েছে উত্তর-বাংলার রাজনগর নামে পরিচিত একটি প্রাচীন পল্লীগ্রামের দুটি পরিবারের পঞ্চাশ বছরের কাহিনীর সাহায্যে। এই দুটি পরিবারের কাহিনীর গতি স্বাধীনতা সংগ্রামের গতির সঙ্গে তাল রেখে অগ্রসর হয়েছে।

বৈশিষ্ট্য ঃ অসংখ্য গল্প ও চরিত্র এসে মিশেছে পঞ্চাশ বছরের কাহিনীর মধ্যে, কাহিনীর স্থান পরিবর্তন ঘটেছে বহুবার, সংগ্রামের বিভিন্ন দিকের কথা বলবার জন্য। লক্ষণীয় বিষয় এই যে পল্লী অঞ্চলের আবির্ভাব ঘটেছে বারবার গণসংগ্রামের বাস্তব রূপের পরিচয় দেবার জন্য। ছোট ছোট গল্পের প্লট অনেক আছে, কিন্তু কেন্দ্রীয় প্লট নাই এই বিরাট উপন্যাসে। রাজনৈতিক ঘটনার নিরবচ্ছিন্ন গতি আশ্রয় করে যে কাহিনী অগ্রসর হয়েছে তার পক্ষে এটা স্বাভাবিক। সংগ্রামের ক্ষেত্রে নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিরা নেপথ্যে রয়েছেন, সংগ্রামের যাঁরা পদাতিক সিপাহী, তাঁদের আশা নিরাশা, চিন্তা ভাবনা, বাক্যে ও কর্মে যেভাবে প্রকাশ পেয়েছে সংগ্রামের ইতিহাসের ছোট বড় সব ঘটনার রূপায়নে সেইটে হয়েছে প্রধান অবলম্বন। সংগ্রামের বিরোধী ও সমালোচক দলের কথাও ছেঁটে দেয়া হয়নি।

প্রথম পাঁচ খণ্ড ঃ ১৯০৫-২৬ ঃ আট খণ্ডের এই বিরাট উপন্যাসের প্রথম পাঁচ খণ্ড রাজনগর (১৯০৫-৬), দেবানন্দ (১৯০৭-৯), স্ফুলিঙ্গ (১৯১০-১৪), অভিযাত্রী (১৯১৫-১৯) এবং আবির্ভাব (১৯২০-২৫) প্রকাশিত হয়েছে। এই পাঁচ খণ্ডে স্বাধীনতা সংগ্রামের কাহিনী স্বদেশী আন্দোলন (১৯০৫) থেকে অসহযোগ আন্দোলন, বর্দোলী সিদ্ধান্ত ও তার বিভিন্ন প্রতিক্রিয়ার কথা (১৯২৫) পর্যন্ত বলা হয়েছে।

অপ্রকাশিত দুই খণ্ড ঃ উপন্যাসের ষষ্ঠখণ্ডে (১৯২৬-৪১) এবং সপ্তম খণ্ডে (১৮৪২-৪৫) স্বাধীনতা সংগ্রামের কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়, বিপ্লবী আন্দোলনের তৃতীয় অধ্যায়, আইন অমান্য আন্দোলন, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ, বর্মার পতন, বর্মা হতে শরণার্থীদলের ভারতে আগমন, ব্ল্যাক রুট ও হোয়াইট রুটের কেলেঙ্কারী, বাংলায় পোড়ামাটি নীতি, আগষ্ট বিদ্রোহ, বাংলায় দুর্ভিক্ষ, নেতাজীর আজাদ হিন্দবাহিনী ও আজাদ হিন্দ সরকার গঠন, ইম্ফল অভিযান, নৌবাহিনীর বিদ্রোহ, নেতাজীর মৃত্যু সংবাদ, আই এন এ বিচারের কথা রয়েছে।

স্বাধীনতা সংগ্রামের মধ্যকার কুড়ি বছরের কাহিনীর প্রকাশ স্থগিত রেখে ননীমাধববাবু অষ্টম খণ্ডে শেষ দুই বছরের (১৯৪৬-৪৮) কাহিনী পাঠক সমাজের কাছে উপস্থিত করেছেন। স্থগিত রাখবার হেতু আমরা জানি। তাঁর বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ হবে না, বাংলা সাহিত্যের পাঠকসমাজ, তাঁদের জন্য পাঠ্য নির্বাচন করবার খবরদারি যাঁরা করেন এবং দেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের নিরপেক্ষ ইতিহাস রচনার জন্য যাঁরা মৌখিক উৎসাহ প্রকাশ করে থাকেন অভিযোগের পাত্র তাঁরা।

অষ্টম খণ্ড শেষ অধ্যায় ঃ অষ্টম খণ্ডে আছে ডাইরেক্ট এ্যাকশানের প্রস্তুতি, কলিকাতা, নোয়াখালি, বিহারে দাঙ্গা, সিন্ধ, বেলুচিস্থান, উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ ও পশ্চিম পাঞ্জাব থেকে বিতাড়িত সাতাশ মাইল দীর্ঘ রেফুয়ুজী কলামের দিল্লী মুখে অভিযান, চারদিকে দাঙ্গাহাঙ্গামার বিস্তৃতি, দেশবিভাগের দাবি স্বীকার, পূর্ব ও উত্তর বাংলা থেকে লক্ষ লক্ষ শরণার্থীর পলায়ন, তাঁদের দুর্দশার কথা, স্বাধীনতার উৎসব ও গান্ধীজী, কাশ্মীর, জুনাগড় ও হায়দারাবাদেব কথা, দিল্লীতে গান্ধীজীর প্রার্থনা সভায় বোমা, ক্যাশ ব্যালান্স, গান্ধীজীর অনশন, গান্ধী হত্যার কথা। গল্পের মাধ্যমে স্বাধীনতা সংগ্রামের শেষ অধ্যায়ের ইতিহাস গ্রন্থকার পাঠকসমাজকে শুনিয়েছেন, জমাট গল্পের মধ্যে দীর্ঘ পঞ্চাশ বছরের কাহিনীর পরিসমাপ্তি ঘটেছে।

আমাদের বক্তব্য ঃ আধুনিক ও অতি আধুনিক পাঠকসমাজের প্রতিক্রিয়ার কথা বলতে পারব না, বয়সে প্রাচীন আমরা অভিভূত হয়েছি ননীমাধববাবুর এই বিরাট মর্মস্পর্শী এপিক উপন্যাস পড়ে, বাংলা সাহিত্যে এই বইয়ের তুলনা নাই।

ননীমাধববাবুর প্রথম চারখানি উপন্যাসের আলোচনা আমরা এর আগে করেছি, ভাষার ওপরে তাঁর অসামান্য দখলের, তাঁর সার্থক রচনাশৈলীর সকল বয়সের ও অবস্থার নরনারীর চরিত্রের বাস্তবানুগ রূপায়নের স্বাভাবিক দক্ষতার আন্তরিক প্রশংসা করেছি। আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রামের কাহিনীর শেষ দু'বছরের কথা 'শেষ অধ্যায়' পড়ে বলতে চাই অসামান্য বিষয়বস্তুর সার্থক রূপদানে উপযুক্ত ভাষার ব্যবহারে আশ্চর্য ক্ষমতার পরিচয় দিয়েছেন লেখক। ননীমাধববাবুর এই রাজনৈতিক উপন্যাসগুলি নিজস্ব দাবিতে বাংলা সাহিত্যে স্থায়ী আসন দখল করে থাকবে, স্মরণীয়, সার্থক সংযোজনরূপে।

আর একটা কথা বলে আমাদের বক্তব্য শেষ করব। ননীমাধববাবুর বিবৃত ইতিহাসের সুদৃঢ় ভিত্তির কথা বলেছি। দেশের যে পঞ্চাশ বছরের রাজনৈতিক ইতিহাস ননীমাধববাবু উপন্যাসের আকারে আমাদের জানিয়েছেন সে ইতিহাসের বারো আনা তাঁর প্রত্যক্ষ জ্ঞানের বিষয়, সংগ্রামে বাইরের চেহারা ও ভেতরের চেহারা নিজের চোখে দেখেছেন তিনি। গভীর সত্যনিষ্ঠা নিয়ে প্রশংসনীয় সাহসের সঙ্গে, পরিণত বয়সে অসাধারণ শ্রম স্বীকার করে এই ইতিহাসের সম্পূর্ণ কাহিনী শুনিয়েছেন আমাদের। এর মধ্যে কোথাও ফাঁকি নাই, গোপনতা নাই, অতিরঞ্জন নাই, পক্ষপাত বা বিদ্বেষ নাই। গভীর দেশপ্রেম ও সত্যের প্রতি একান্ত নিষ্ঠা নিয়ে এই পণ্ডিত, স্থিতধী, শক্তিশালী লেখক যে সম্পদ উত্তরপুরুষের জন্য রেখে গেলেন সে সম্পদ হবে দেশের সত্য সন্ধানী ভবিষ্যৎ ঐতিহাসিকদের আকরগ্রন্থ, এ বিষয়ে আমাদের মনে কোনও সন্দেহ নাই।

আশা করছি উপন্যাসের ষষ্ঠ ও সপ্তম খণ্ড শীঘ্র প্রকাশ করা সম্ভব হবে

"সুধর্মা", কলিকাতা
১১ নভেম্বর, ১৯৭৩

শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়

জানকীবাবু, বিপিনবাবু এবং সুকুমারবাবুর কাছে আমি পড়েছি। রামেন্দ্রসুন্দর বিজ্ঞান বিভাগে পড়াতেন। একবার মাত্র তাঁর সঙ্গে কথাবার্তার সুযোগ হয়েছিল বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের কিছু উপলক্ষে যখন তিনি আমাদের কয়েকজনকে তাঁর বাড়িতে ডাকেন। জানকীবাবু আমাদের ইংরাজি অনার্সে পড়াতেন শেক্সপিয়রের Tempest। ক্লাসে ঢুকে তাড়াতাড়ি রোলকল শেষ করে বই খুলে পড়াতে শুরু করতেন। একটানা স্বরে, বই থেকে চোখ তুলতেন না, ছেলেদের দিকে চাইতেন না, অন্য কথা বলতেন না, মাথা নিচু করে ইংরাজি ব্যাকরণের ব্যাখ্যা করে যেতেন ইংরাজিতে। তাঁর পড়ানোর খ্যাতি এত বিস্তৃত ছিল যে অন্য কলেজের ছেলেরা ক্লাসে ঢুকে স্থানাভাবে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে পড়ানো শুনত। পড়াতে পড়াতে দু' একটা স্থূল রসিকতা হঠাৎ করে ফেলতেন। একটা রসিকতার কথা মনে পড়ছে। Prospero তার কন্যা Miranda-কে বলছেন Miranda I am the father, মাথা নিচু করে জানকীবাবুর ব্যাখ্যা করছেন (বাংলায়)। মিরান্দা আমি তোমার বাবা, যদি তোমার মা এর মধ্যে কিছু কারসাজি না করে থাকেন। পেছনের বেঞ্চের ছেলেরা এ ব্যাখ্যা শুনতে পেল না, সামনের দিকের ছেলেরা যারা শুনতে পেল তারা নির্বাক রইল। সুকুমার দত্তের সঙ্গে আলাপ হয়েছিল, তাঁর কারবালা ট্যাঙ্ক লেনের বাড়িতে গিয়েছি। ইতিহাসের অধ্যাপক বিপিনবাবুর মুখের চেহারা ছিল forbidding, পড়াবার কায়দা ছিল ভাল, আমাদের Modern Europe পড়াতেন।

আমি থাকতাম কলেজের হস্টেলে মির্জাপুর স্ট্রিটে (এখন সূর্য সেন স্ট্রিট) একটা লম্বা ব্যারাক মতো বাড়িতে। একতলায় দোকানপাট দোতলায় ছাত্ররা থাকত। ছোট ছোট ঘর, একটা ঘরে দু'জনের তক্তপোশ ধরত কোনমতে। শৈশবে কিছুদিন

স্কুলে বোর্ডিংয়ে বাস করেছি। অনাত্মীয় অপরিচিত ছেলেদের সঙ্গে নিজের অভিভাবকত্বে ছাত্রাবাসে বাস করবার অভিজ্ঞতা নূতন। খেতে বসে অসুবিধায় পড়ে যেতাম। বাড়ি থেকে ভাল গাওয়া ঘি এসেছিল সঙ্গে। ছেলেদের সঙ্গে বসে একা তা খেতে লজ্জা হত, অযাচিত ভাগ দিতাম যারা পাশে বসত তাদের। নিজের কাপড়জামা নিজে ঠিক রাখতে হত, কাচতে দিতে হত, এটাও প্রথম দিকে অসুবিধার ব্যাপার ছিল। অনেক জায়গায় অনেক রকম চরিত্রের ছেলে থাকত এক সঙ্গে, ভাল ছেলে, ঝগড়াটে ছেলে, বখাটে ছেলে, ধার চাওয়া ছেলে, মুরুব্বিয়ান করবার অভ্যাসওয়ালা ছেলে, তাদের চরিত্র বুঝে সেই মতো চলবার শিক্ষা লাভ করতে সময় লেগেছিল। তখন কলেজের মাইনে ছিল পাঁচ টাকা, হস্টেলে সিটরেন্ট বোধহয় দু'টাকা, আর খাইখরচ মাসে দশ/এগারো টাকা। এই টাকায় মাসে দু'বার feast হত। feast মানে লুচি, মাংসের ঝোল, চাটনি, দই, রাবড়ি, মিষ্টি ইত্যাদি। রোজকার খাওয়া ডাল তরকারি, মাছের ঝাল, ঝোল, চাটনি। মাঝে মাঝে ডিম বা মাংস হত শনি-রবিবারে। সকাল ও বিকালের চা, খাবার ইত্যাদিতে রোজ দু'-তিন আনা লাগত। বই, কাপড়, জামা, জুতোর খরচ বাদে মাসে ত্রিশ টাকায় বেশ ভালভাবে চলে যেত তখন। অনেক ছেলে এই পরিমাণ টাকা বাড়ি থেকে পেত না।

হস্টেলে তাস ও দাবা খেলত ছেলেরা, গল্পের আড্ডাও বসত। এ দুটো খেলাই আমি জানতাম না, গল্পের আড্ডায় যোগ দিতাম মাঝে মাঝে। রবিবার ও ছুটির দিন আমি প্রায়ই বাইরে কাটাতাম। যাবার জায়গা ছিল আমার মাসির বাড়ি, বিডন রোডে ডা. জগৎচন্দ্র রায়ের বাড়ি এবং ব্রাইট স্ট্রিটে কুমুদনাথ চৌধুরীর বাড়ি। তাঁকে ডাকতাম সেজজ্যাঠা মশায় বলে। প্রতি শনিবার তাঁর বাড়িতে যাবার স্ট্যান্ডিং নিমন্ত্রণ ছিল। রবিবারটা সেখানে কাটাতে হত, সোমবার সকালে হস্টেলে ফিরতাম। কোনও শনিবার তাঁর বাড়িতে না গেলে চিঠি নিয়ে লোক আসত ধরে নিয়ে যাবার জন্য।

বালিগঞ্জে তাঁর বাড়িতে যাতায়াতের ফলে তাঁর মা মগ্নময়ী দেবী, দিদি প্রসন্নময়ী দেবী, ভাগ্নি প্রিয়ম্বদা দেবীর সঙ্গে, ছোট ভ্রাতার স্ত্রী প্রমীলা দেবীর সঙ্গে পরিচয় হয়। সেজজ্যাঠা মশায়ের শ্বশুর ডা. প্রতাপ মজুমদারকে তাঁর বাড়িতে দেখেছি। দু-একবার তাঁর সঙ্গে থিয়েটার রোডে ডা. মজুমদারের বাড়িতে গিয়েছি। ডা. মজুমদারের স্ত্রী, ছোট ছেলে এবং মেয়েদের কয়েক জনের সঙ্গে আলাপ হয়েছে। ডা. মজুমদারের এক মেয়ের বিয়ে হয়েছিল আমাদের আত্মীয় পাবনার তাঁতিবন্দের ডা. নগেন্দ্রনাথ চৌধুরীর সঙ্গে।

গ্রে স্ট্রিটের পাথরাইল হাউস ছিল আমাদের ছোট মামির শ্বশুরবাড়ি। ছোট মামির শাশুড়ি ছিলেন কচিয়ার মহারানি হেমন্তকুমারীর ভাগ্নি, ছোট মামির শ্বশুরমশায়ের হাতে তখন মহারানির বিস্তৃত জমিদারি দেখাশোনা করবার ভার ছিল। দারোয়ান ঝি, চাকর, আত্মীয়কুটুম্ব আশ্রিত লোকজন নিয়ে তখন জমজমাট ছিল মামার বাড়ি। এই সময় University Institute -এর সভ্য হয়েছিলাম। সভাসমিতিতে বিশেষ বনত না, একবার গার্ডেন পার্টিতে গিয়েছিলাম, বোধহয় বারামারিতে এটর্নি নিমাই বোসের বাগানবাড়িতে। কলকাতার বড়লোকদের বাগানবাড়ি কী বস্তু আমার মতো অপ্রাপ্তবয়স্ক মফসসলবাসী ছেলের জানার কথা নয়। বাড়ির দোতলার একটি ঘরের দেয়ালে নগ্ন স্ত্রী-চিত্রগুলি দেখে এবং সঙ্গী ছেলেদের দু'চারজনের মন্তব্য শুনে এ বিষয়ে একটা ধারণা জন্মাল। ঘরটা কিন্তু তালাবন্ধ ছিল, ছেলেরা তালা ভেঙে ফেলেছিল।

বি.এ. পড়বার সময়কার যে ঘটনার কথা স্পষ্ট মনে আছে এখনও সেটা হচ্ছে রাশিয়ান সাহিত্যের সঙ্গে পরিচয়। বোধহয় ওই সময় (১৯১৬-১৭) টলস্টয়, ডস্টয়েভস্কি, তুর্গেনিভ গোরকির বিখ্যাত উপন্যাসের ইংরাজি অনুবাদ এদেশে আসতে আরম্ভ করে। কলেজ লাইব্রেরিতে এই সব বই কেনা হয়েছিল। যে নূতন স্বাদের পরিচয় ছিল এই সব বইতে নেশার মতো তা পেয়ে বসেছিল আমাকে। ক্লাসের পড়াশোনার কথা ভুলে গিয়ে রাত জেগে আনা কারেনিনা, রিজারেকশন, ওয়ার অ্যাণ্ড পিস, ক্রাইম অ্যাণ্ড পানিশমেণ্ট, ফাদার্স অ্যাণ্ড চিলড্রেন, ভারজিন সয়েল পড়তাম। ইবসেন, মেটারলিঙ্কের আমদানিও বোধহয় এই সময়ে হয়েছিল। ইবসেনের নাটকগুলো বাংলা দেশের ইন্টেলেকচুয়াল মহলে খানিকটা চাঞ্চল্য এনেছিল মনে পড়ছে। পরিবারে ও সমাজে নারী-সমস্যা নিয়ে নানা রকম আলোচনা হত কাগজে। যতদূর মনে পড়ে শরৎ চট্টোপাধ্যায়ের 'নারীর মূল্য' প্রবন্ধ বাংলা সাহিত্যে ইতরশ্রেণির ঢেউয়ের অন্যতম সাক্ষ্য। ভিক্টর হুগোর উপন্যাসগুলির অনুবাদও এই সময়ে পড়েছিলাম, গয়েটের ফাউস্ট এবং উইলহেলম মেইস্টারস এই সময়ে পড়েছি। বাংলা সাহিত্যে ইবসেনিজম নিয়ে যে আন্দোলন চলেছিল তার একটা ছাপ রয়ে গিয়েছে মনে। আমার চতুর্থ উপন্যাস "অভিযাত্রী"-তে (১৯১৫ থেকে ১৯১৯ পর্যন্ত দেশের রাজনৈতিক আন্দোলন নিয়ে লিখিত) ইবসেন ক্লাবের বিবরণে এর কিছু পরিচয় আছে।

"অভিযাত্রী" উপন্যাসে বর্ণিত এই ইবসেন ক্লাবের ব্যাপার নিয়ে একটা গল্প বলছি। এই গল্প থেকে আমার উপন্যাসগুলির মালমসলা সংগ্রহের পদ্ধতি সম্বন্ধে কিছু জানানো যাবে। প্রৌঢ় বয়সে যখন "অভিযাত্রী" উপন্যাস লিখতে আরম্ভ করি তখন তার Secondary Story, যাতে ১৯১৬ থেকে ১৯১৯ এই ক' বছরের প্রথম দিকের দেশের

Social and intellectual অবস্থার কিছু পরিচয় থাকবে; নির্বাচন করতে গিয়ে ইবসেনীয় আন্দোলনের কথা মনে পড়ল। এই আন্দোলনের অস্পষ্ট স্মৃতিকে স্পষ্ট করবার অভিপ্রায়ে বন্ধু সত্যেন্দ্রনাথ বসুকে ধরলাম—তাঁর কী মনে আছে বাংলার এই আন্দোলন সম্বন্ধে জানবার জন্য। তাঁর বিশেষ কিছু মনে নাই জানিয়ে তিনি আমাকে পাঠালেন তুলসী গোস্বামীর কাছে। তুলসীবাবু তখন থাকতেন ডোভার লেনে। আগে চিঠি লিখে তাঁর সঙ্গে দেখা করতে গেলাম।

চারদিকে ছড়ানো ও স্তূপাকার-নূতন কেনা ইংরাজি বই, দুটো টেলিফোনের রিসিভার, চারপাঁচটা সিগারেটের টিন, কার্পেট জোড়া সোফা কোচ, .গোল টেবিলওয়ালা ঘরে পাঞ্জাবি পায়জামা-পরা মতিলাল নেহরু এবং চিত্তরঞ্জন দাসের যোগ্য লেফটনেন্ট অ্যাসেম্বলিতে, স্বরাজ পার্টির ডেপুটি লিডার বিখ্যাত বক্তা ও পণ্ডিত তুলসী গোস্বামীর সাহায্য পেলাম। সৌজন্যের তুলনা নেই। আলাপ জমে উঠতে দেরি হল না। আলাপের ফাঁকে দু'চারখানা মোটা বই উলটে পালটে দেখলাম Agricultural Economics, World Food Problem, World Population সম্বন্ধে সেই বছর বা আগের বছরে বিলাতে ছাপা বই।

দু'দিন তুলসীবাবুর সঙ্গে আলাপ হয়েছিল যদিও যে খবর আমি চাইছিলাম তাঁর কাছে তার কিছুই পাওয়া গেল না, পাওয়া গেল দেশের রাজনৈতিক আন্দোলনের যে অধ্যায়ের সঙ্গে তাঁর যোগ ছিল সেই অধ্যায়ের যাকে বলা হয় inside picture। এই চিত্রের বিষয়ীভূত ছিলেন মহাত্মা গান্ধী, দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন, মতিলাল নেহরু, শরৎ বসু প্রমুখ ব্যক্তিবর্গ, ননকো আন্দোলন, কাউন্সিল-প্রবেশ-বিতর্ক, স্বরাজ পার্টি গঠন, সাময়িকভাবে কংগ্রেস ছেড়ে গঠনমূলক আন্দোলনে মহাত্মাজির মনোনিবেশ ডায়াকির পতন ইত্যাদি। তুলসীবাবু ছিলেন গোঁড়া intellectualist প্রকৃত পণ্ডিত। উৎসুক সমবয়সি শ্রোতা পেয়ে খোলাখুলি ভাষায় uninhibited নিজের কতকগুলো অভিজ্ঞতার কথা বলে গেলেন। "অভিযাত্রী"-র পরবর্তী উপন্যাস "আবির্ভাব"-এর (১৯২০-২৫) এক অংশে এবং তার পরের উপন্যাসে তুলসীবাবুর উদঘাটিত চিত্রের অতি সামান্য অংশ রেখেঢেকে প্রকাশ করবার চেষ্টা করেছি। একদল লোকের দৃষ্টিকোণ থেকে দেখলে কতগুলো রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত ও ঘটনার চেহারা দেখা যায় এইভাবে, নিজের অভিমত প্রকাশ করছি—মোটেই এভাবে নয়। তুলসীবাবুর অনেক forthright মত ও কথা লিখে প্রকাশ করা চলে না, করবার প্রয়োজনও নাই।

সবসময়ে উপন্যাসগুলির ঠিক মাল-মশলা সংগ্রহের জন্য নয়, বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে দেখলে নানা দলের রাজনৈতিক মত ও কাজের চেহারা কী রকম দেখায় তা জানবার জন্য অনেক লোকের সঙ্গে দেখা করেছি এবং আলোচনা করেছি, সময় পেলে সে সব কথা পরে বলবার চেষ্টা করব।

আঠারো থেকে কুড়ি বছর বয়সে পঠিত কনটিনেন্টাল সাহিত্যের যে সংক্ষিপ্ত তালিকা দিয়েছি তার মধ্যে ভুল নাই। এখন বৃদ্ধ বয়সে এই তালিকা পড়ে একটু হাসি পায় এই ভেবে যে সে বয়সে এইসব বই বোঝবার মতো বুদ্ধি হয়েছিল কি? বোঝবার বুদ্ধি নিশ্চয় হয়নি। ভাল মন্দ লাগবার বয়স হয়েছিল, তা না হলে রাতের পর রাত জেগে পড়তাম কেন? সে এক দুরন্ত নেশায় পেয়ে বসেছিল। "ওয়ার অ্যান্ড পিস" যখন পড়ছি তখন ঘাড়ের ওপর বি.এ.-র টেস্ট পরীক্ষা। মনে আছে টেস্ট পরীক্ষার তিনদিন আগে "ওয়ার অ্যান্ড পিস" শেষ হল। তারপর পাঠ্যপুস্তকের পাতা ওলটাবার সময় হল। এই অবহেলার প্রতিফলও পেয়েছিলাম।

হস্টেলের পনেরো আনা ছেলের সঙ্গে সদ্ভাবে কাটিয়েছি, বয়সোচিত কিছু কিছু নূতন বিদ্যাও ছেলেদের কাছে শিখেছি কিন্তু বন্ধু জোটেনি একজনও। কলেজের সহপাঠীদের মধ্যে কয়েকজনকে পেয়েছিলাম বন্ধুরূপে, পরবর্তী জীবনে তাদের সঙ্গে আলাপ-পরিচয় বজায় ছিল। এদের দু'জনের কথা বলব. একজন বি.এ. ও এম.এ. ক্লাসের সহপাঠী, এবং এক ইউনিভারসিটি হস্টেলে তার সঙ্গে দু'বছর থেকেছি। এঁর সঙ্গে পড়াশোনা নিয়ে একটু প্রতিদ্বন্দ্বিতার ভাব ছিল, বন্ধুত্বও ছিল। নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ, সন্ধ্যা-আহ্নিক করতেন, খাওয়ার ব্যাপারে ছোঁয়াছুঁয়ি মানতেন। ভট্টাচার্য উপাধি, নাম জানকীরাম। বোধহয় যশোরে বাড়ি। পরে ইনি বারুইপুর কোর্টে পসারওয়ালা উকিল হন।

অপরজন বিখ্যাত সাহিত্যিক বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়। বিভূতি আলাদা সেকশনে পড়তেন। মির্জাপুর হ্যারিসন রোডের মোড়ে অবস্থিত আলাদা হস্টেলে থাকতেন। বোধহয় রাশিয়ান সাহিত্য পড়া নিয়ে তাঁর সঙ্গে আলাপের সূত্রপাত হয়। কলেজের কমনরুমে মাঝেমাঝে দেখা হত, কথাবার্তা হত। পড়াশোনায় বা কথাবার্তায় আকৃষ্ট হবার মতো কোনও বিশেষত্ব দেখা যায়নি বিভূতির মধ্যে। সে সময় সাহিত্যপাঠে তাঁর রুচি ছিল, আমারও ছিল, এই ছিল যোগসূত্র। যতদূর মনে পড়ে আমাদের বছরে অর্থাৎ ১৯১৮-তে বিভূতি বোধহয় বি.এ. পরীক্ষা দেননি, পরের বার দিয়েছিলেন। এম.এ. পড়বার সময় তাঁর সঙ্গে বোধহয় বিশেষ দেখাসাক্ষাৎ হয়নি, অথবা হঠাৎ রাস্তায় দেখা হয়ে থাকলে দু'পাঁচ মিনিট গল্প হত।

এম.এ পরীক্ষার পরে আমি যখন হরিপুরে বৈষয়িক ব্যাপারে ব্যস্ত আমার এক গ্রামের বন্ধু (এঁর নাম সোমনাথ

সান্যাল, রিপন কলেজে পড়তেন এবং বিভূতিকে জানতেন) একদিন বললেন বিভূতির একটা গল্প বেরিয়েছে মাসিকপত্রে এবং গল্পটা ভাল হয়েছে। আমি ইংরাজির ছাত্র এবং সেই সময় ফরাসি ভাষার চর্চা করেছি, ফরাসি থেকে মোপাসাঁর গল্পের অনুবাদ সবুজপত্রে দু'একটা বেরিয়েছে, অর্থাৎ একটুখানি Complex জন্মে গেছে। বন্ধুর অনুরোধে বিভূতির গল্পটি পড়লাম। "মৌরীফুল" গল্পটির নাম। পড়ে ভাল লাগল এবং এই উপলব্ধি হল যে ভাল বাংলা লেখায় বিভূতির হাত আছে।

কলিকাতায় আসবার কয়েক বছর পরে উপেন গাঙ্গুলি মশায়ের "বিচিত্রা" কাগজে বিভূতির "পথের পাঁচালী" ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হতে থাকে এবং তাঁর নাম ছড়িয়ে পড়ে। এই সময় থেকে মাঝে মাঝে তাঁর সঙ্গে দেখা ও কিছুক্ষণ গল্প হত। বিভূতির সঙ্গে অন্তরঙ্গতা হয় আরও পরে, তাঁর মৃত্যুর ক'বছর আগে। সে সময়ে কলকাতায় আসলে তিনি আমার বাড়ির কাছে সুইন হো স্ট্রিটের একটি বাড়িতে উঠতেন। হঠাৎ একদিন সকাল বেলা বছর আড়াইয়ের ছেলের হাত ধরে তিনি আমার বাড়িতে উপস্থিত হলেন। তাঁর আগমনবার্তা শুনে আমার বাড়িতে অর্থাৎ ছেলেমেয়ের মধ্যে সোরগোল পড়ে গেল। তারা বিভূতির বইগুলির অনুরাগী পাঠক এবং জানত বিভূতি আমার সহপাঠী।

কথাবার্তায় জানতে পারলাম বিভূতি 'প্রবাসী'-তে ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত আমার বৈদিক ও সিন্ধু সভ্যতা সম্বন্ধে প্রবন্ধগুলির কয়েকটা পড়েছেন, শনিবারের চিঠি ইত্যাদিতে প্রকাশিত দু'চারটে গল্পও পড়েছেন। প্রবন্ধগুলি সম্বন্ধে তিনি যে সব প্রশ্ন করলেন তা থেকে বুঝতে পারলাম ভারতবর্ষের প্রাগৈতিহাসিক সভ্যতা এবং আর্কিওলজি অ্যানথ্রোপলজি ইত্যাদি সম্বন্ধে তাঁর গভীর অনুসন্ধিৎসা আছে এবং প্রবন্ধগুলো মন দিয়ে পড়েছেন। দুঃখ করলেন চাকুরির দায়ে নানা বাজে কাজে ব্যস্ত থাকাতে এবং বনে-জঙ্গলে ঘুরে বেড়াবার অভ্যাসের জন্য ইচ্ছা থাকলেও তিনি এ সব বিষয় ভাল করে পড়তে পারেননি। আমি বললাম বেশি মাথা ঘামালে তোমার নিজের কাজের ক্ষতি হত। স্কলার হয়ে যা করতে পারতে তার কোনও তুলনাই চলে না তোমার সাহিত্যকীর্তির সঙ্গে। তুমি creative artist নূতন genre নূতন style দিয়েছ বাংলা সাহিত্যকে। বিভূতি বললেন, না ভাই, অতৃপ্তি রয়ে গেছে মনে।

কথাবার্তা চলছে, আমার মেয়ে বাচ্চাটির হাত ধরে ভেতরে থেকে এল বিভূতির জন্য খাবার নিয়ে। ছেলেও এসে বসল কাছে, বলল আপনার "আরণ্যক" জীবনের কথা কিছু বলুন। একটু পরে বিভূতি গল্প আরম্ভ করলেন।

বনজঙ্গলে বেড়াবার কথাই বললেন বিভূতি। কথা আরম্ভ করবার কিছুক্ষণের মধ্যে তাঁর মুখচোখের চেহারা বদলে গেল লক্ষ করলাম। গভীর ধ্যান থেকে জেগে উঠে যথার্থ সাধক যেমন করে তাঁর অতীন্দ্রিয় অভিজ্ঞতার কাহিনি বর্ণনা করেন তেমনই করে বনেজঙ্গলে ফুল ফোটা, ফুলের সৌরভ, বিস্তারিত বায়ুবেগে বৃক্ষের কম্পন, পাখির ডাক, কূজন, রোদের ঝিকিমিকি, ছায়া ও অন্ধকারের অবতরণ উপল-মুখর পার্বত্য জলধারার সঙ্গীত উচ্ছল গান, খরগোসের ভীরু চাহনি, বন্যবরাহের উদ্ধত ধাবন, বন্যহস্তীর বৃংহিতধ্বনি, শার্দূলের গভীর গর্জন, হরিণের চকিত চঞ্চল গতি, প্রহরে প্রহরে বনবালার রূপ পরিবর্তন, তার অজানা মায়া বিস্তার, তার মৌন বিষাদ—কত না কথা বলে যেতে লাগলেন বিভূতি, কবির ভাষায়। শ্রোতারা মন্ত্রমুগ্ধের মতো শুনছিল। প্রায় ঘণ্টা খানেক চলল অরণ্যকাব্যের আবৃত্তি। তারপর এক সময় আবিষ্টভাব কাটিয়ে জেগে উঠলেন বিভূতি শিশুপুত্রের উচ্চ আহ্বানে।

নিজের মনে বললাম, It is an experience! কোথায় রিপন কলেজের সহপাঠী সেই বিভূতি আর কোথায় এই অরণ্য-সংহিতার সূত্রকার।

বিভূতি তখন বেশির ভাগ সময় ঘাটশিলার বাড়িতে, মাঝে মাঝে নিউ ব্যারাকপুরের বাড়িতে থাকতেন। বিদায় নেবার আগে এই দু'জায়গাতে সবাইকে নিমন্ত্রণ করলেন। নিমন্ত্রণ গ্রহণ করলাম। নিমন্ত্রণ রক্ষা করবার সময় পাওয়া গেল না। বোধ হয় আরও বার তিনেক বিভূতি এসেছেন আমার বাড়িতে। প্রতিবারই আমার না যাওয়ার জন্য অভিযোগ করতেন। এই সময় তাঁর 'ইছামতি" উপন্যাস লেখা চলছিল। নীলবিদ্রোহের সময়কার গল্প। নীলবিদ্রোহ সম্বন্ধে অনেক গল্প হত। তখন আমার "রাজনগর" উপন্যাস প্রবাসীতে বেরচ্ছিল। বললাম, আমি গল্প লিখছি। লোকে বলে ওটা history হচ্ছে। বিভূতি জোকস করলেন, আমি history লিখতে চাই হয়ে যায় গল্প। তাঁর "দৃষ্টি-প্রদীপ" বইখানা নিয়ে কিছু আলোচনা হয়েছিল আমাদের মধ্যে। আলোচনার বিষয় আমার ভাষায় যে intuitive percepters-এর ক্রিয়াকে তিনি 'দৃষ্টি-প্রদীপ' নাম দিয়েছেন সে সম্বন্ধে। আলোচনা প্রসঙ্গে আবিষ্কার করলাম Divine existence সম্বন্ধে তাঁর আন্তরিক ও সহজ বিশ্বাস। বিশ্বাস কথাটা বোধহয় ঠিক হল না, অনুভূতি বলা যায়। জীবনে কয়েকবার এই অনুভূতি এসেছে তাঁর মধ্যে, বললেন।

তারপর একদিন বিকালে বাড়ি ফিরে জানলাম দু'জন ছেলে এসেছিল আমার কাছে। বলেছে বিভূতিবাবু সুইন হো স্ট্রিটের বাড়িতে এসেছেন এইমাত্র এবং পৌঁছেই তাঁদের

পাঠিয়েছেন সন্ধ্যাবেলা আমাকে ওই বাড়িতে যাবার জন্য তাঁর বিশেষ অনুরোধ জানাতে। সেদিন বিভূতির জন্মোৎসব হবে ওই বাড়িতে এবং বিশিষ্ট সাহিত্যিকরা আসবেন আগেই শুনেছিলাম। শুনলাম যুবকদুটি বলে গেছে আমি যেন অবশ্যই যাই, না গেলে বিভূতিবাবু দুঃখিত হবেন। সভাসমিতির ব্যাপার আমি তেমন পছন্দ করি না, তারপর একটু ক্লান্ত ছিলাম। ভাবলাম পরদিন সকালে গিয়ে দেখা করব। ছেলেমেয়ে বলল, এখানে পৌঁছানো মাত্র লোক দিয়ে বলে পাঠিয়েছেন ঘুরে এসো একবার। বললাম, কাল সকালে যাব এখন আর যেতে ইচ্ছা হচ্ছে না। পরদিন সকালে গিয়ে শুনলাম কিছুক্ষণ আগে বিভূতি ঘাটশিলা চলে গেছেন। আমার বাড়ির নম্বর শুনে ওঁরা আরও বললেন বিভূতিবাবু কয়েকবার দুঃখ প্রকাশ করেছেন আপনি আসেননি বলে।

মন খারাপ হল কথা শুনে। ভাবলাম একখানা চিঠি লিখব বিভূতিকে ঘাটশিলা গিয়ে তাঁর সঙ্গে দেখা করব বলে। গড়িমসি করে কিছুদিন সময় কাটল, কোনও একটা ছুটির জন্য অপেক্ষা করছিলাম, হঠাৎ একদিন সকালে কাগজে পড়লাম বিভূতি আর নাই। বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে বিভূতির আসন পাকা হয়ে গিয়েছে এর বেশি আর কিছু বলতে চাই না তাঁর সৃষ্ট সাহিত্য সম্বন্ধে।

এবার ফিরে যাওয়া যাক ১৯১৭-১৮র কথায়। বি.এ. পরীক্ষা দেবার আগের বছর ১৯১৭-তে রাশিয়ায় বিপ্লব ঘটল। বিপ্লবের ফলে প্রাচীন রোমানফ রাজবংশ শেষ হল। তার পরের বছর জার্মানির হোহেনজোলার্ন রাজবংশও গেল।

(২)

বি.এ. পরীক্ষার ফল বেরলে বাড়ি থেকে কলিকাতায় এলাম কলেজে ভর্তি হবার জন্য।

ইউনিভার্সিটির ইংরাজির ফিফ্‌থ ইয়ার ক্লাসে ভর্তি হলাম। থাকবার জায়গা পেলাম মেছুয়া বাজার ও কলেজ স্ট্রিটের মোড়ে ইউনিভার্সিটির হস্টেলে। এ বাড়ির এক তলাতে ছিল দোকান, দোতলা ও তেতলায় ছাত্ররা থাকত। এম.এ. পড়বার দু'বছর (১৯১৮-২৯) এই হস্টেলে কাটল।

এই সময় প্রথম মহাযুদ্ধের অবসান হল। যুদ্ধের কয়েক বছর ধনজন দিয়ে ইংরাজকে যুদ্ধজয়ের সাহায্য করবার পুরস্কার হিসাবে ভারতবাসীরা পেল 'রাউলাট অ্যাক্ট'। দেশে আন্দোলন আরম্ভ হল কালা কানুনের বিরুদ্ধে। আন্দোলনের পুরোভাগে এসে দাঁড়ালেন দক্ষিণ আফ্রিকার নাম করা ভারতীয় নেতা মো. কে. গান্ধী, সঙ্গে আলি ভ্রাতৃদ্বয়, ডা. আনসারি প্রভৃতি মুসলমান নেতারা। এঁদের লক্ষ্য ছিল খিলাফত আন্দোলন। কংগ্রেস থেকে পুরনো মডারেট ও লিবারেল দলের নেতারা সরে দাঁড়াতে লাগলেন। ১৯১৯ থেকে পরবর্তী কয়েক বছর তীব্র রাজনৈতিক উত্তেজনা ও চাঞ্চল্যের সময়। পরে এ সম্বন্ধে বলছি।

বিশ্ববিদ্যালয় হস্টেলে যাদের সঙ্গে নূতন আলাপ হল তাদের মধ্যে দু'জনকে পরে স্থায়ী বন্ধু ও প্রতিবেশীরূপে পেলাম। আরেকজন অন্য হস্টেলে থাকতেন, এক বছরের সিনিয়ার ছিলেন, তাঁর সঙ্গে বিশেষ আলাপ হয়েছিল এবং তিনিও আমাদের প্রতিবেশী হন। চতুর্থজন ওই হস্টেলে থাকতেন এবং ইংরাজির ছাত্র ছিলেন এবং এঁর সঙ্গে আলাপপরিচয় পরবর্তীকালেও বজায় ছিল। বি.এ. ক্লাসের সহপাঠী জানকী রায়ও এই হস্টেলে স্থান পেয়েছিলেন। আরেকজন ছাত্রও ওখানে থাকতেন। খুব বেশিদিন আলাপ হয়নি এঁর সঙ্গে। এঁর কথা মনে আছে এজন্য যে পরে তিনি সংসার ত্যাগ করে রামকৃষ্ণ মিশনে যোগ দিয়েছিলেন। ইনি বেলুড় বিদ্যাপীঠের অধ্যক্ষ স্বামী তেজ্যানন্দ।

যে দু'জনকে বন্ধু ও প্রতিবেশী রূপে পেয়েছিলাম তাঁদের নাম প্রবোধচন্দ্র বাগচী ও তারকচন্দ্র দাস। প্রবোধের দেশ যশোরের মাওরায়, তারকের ঢাকায়। তৃতীয় প্রতিবেশী হেমন্ত সরকার। যে ইংরাজি ছাত্রের কথা বলেছি তিনি বরিশালের লোক, নাম অমূল্যরতন গুপ্ত। প্রথম বিভাগে পাস করে ইনি কুচবিহার কলেজে যোগ দিয়েছিলেন এবং সে কলেজের অধ্যক্ষ হন। অবসরগ্রহণ করে কলকাতায় এসে তিনি আর্ট কলেজে যোগ দেন এবং আমাদের পুরনো আলাপ আবার জমে ওঠে। হেমন্তকুমার স্বরাজ পার্টির আমলে রাজনৈতিক আন্দোলনে যোগ দিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের চাকরি ছেড়ে দেন। পার্টির নেতা দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের সঙ্গে আগে তাঁর ঘনিষ্ঠতা হয়েছিল। স্বরাজ পার্টির ক্যান্ডিডেট হয়ে আইনসভাতে ঢুকেছিলেন এবং বেশ নামও হয়েছিল বক্তা হিসাবে। পরবর্তীকালে কিছু গোলযোগ ঘটে এবং কংগ্রেস ও রাজনৈতিক আন্দোলন থেকে সরে আসেন। হেমন্তবাবু সুভাষচন্দ্রের সহপাঠী ছিলেন এবং তাঁর সম্বন্ধে একখানা বই লিখেছিলেন।

এম.এ. পাস করবার পরে আমি যখন হরিপুরে বৈষয়িক কাজে ব্যস্ত প্রবোধ ও তারক তখন বিশ্ববিদ্যালয়ে চাকরি পান। বিশ্ববিদ্যালয়ে চাকরির আমলে প্রবোধ স্কলারশিপ পেয়ে ফ্রান্সে চলে যান। সেখানে প্রসিদ্ধ পণ্ডিত সিলভ্যাঁ লেভির সঙ্গে বিশেষ ঘনিষ্ঠতা হয়। পারি বিশ্ববিদ্যালয়ের Doctorate indethred হয়ে ফিরে এসে আগের চাকুরিতে যোগ দেন। এই সময় থেকে আমাদের মাঝখানে খণ্ডিত বন্ধুত্ব আবার জমে ওঠে। প্রবোধ ইউরোপে যাবার আগে বিয়ে করেছিলেন। তাঁর স্ত্রী পাবনার মেয়ে, শিশুকাল থেকে আমার পরিচিত। ইউরোপ থেকে ফিরে ওয়েলিংটন স্ট্রিটের যে বাড়িতে প্রবোধ

সস্ত্রীক বাস করতে আরম্ভ করলেন সে বাড়ি জমাট আড্ডার জায়গা হয়ে উঠল। তারক বিশ্ববিদ্যালয়ের নূতন স্থাপিত নৃতত্ত্ব বিজ্ঞান বিভাগে যোগ দিয়েছিলেন। তখন এই বিভাগের প্রধান ছিলেন প্রসিদ্ধ পণ্ডিত রাজেন্দ্রলাল মিত্রের পুত্র পঞ্চানন মিত্র। ছাত্রাবস্থায় তারক বিয়ে করেছিলেন, কিছুদিন পরে শানগরের শ্রীমোহন লেনে বাড়ি ভাড়া করে তিনি দেশ থেকে স্ত্রীকে নিয়ে এলেন। এই বাড়িও আমার একটি আড্ডার জায়গা হয়।

বিশ্ববিদ্যালয়ে যাঁদের কছে পড়েছি তাঁদের মধ্যে ছিলেন ডা. হরেন্দ্রকুমার মুখার্জি, প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ, সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, জয়গোপাল বন্দ্যোপাধ্যায়, মনোমোহন ঘোষ, সুশীলকুমার দে, জ্যোতিষ ঘোষ। এদের মধ্যে সুনীতিবাবু এবং জ্যোতিষচন্দ্র ঘোষের সঙ্গে কিছু ঘনিষ্ঠতা হয়েছিল।

ডা. হরেন্দ্র মুখার্জির সঙ্গে চেনাশোনা হয়েছিল, তাঁর ডিহি শ্রীরামপুর লেনের বাড়িতে দু'একবার গিয়েছি। তাঁর বেশভূষায় ও কথাবার্তায় চালচলনের সরলতা লক্ষ করার বিষয় ছিল। কনস্টিটুয়েন্ট অ্যাসেম্বলির সভাপতি এবং পশ্চিম বাংলার গভর্নর রূপে পরে তিনি বিশেষ খ্যাতিলাভ করেছিলেন। দানশীলতার জন্যও তাঁর নাম স্মরণীয়। ছাত্রাবস্থা পার হবার বছর কয়েক পরে একদিন ডালহৌসিগামী বাসে তাঁর সঙ্গে দেখা হয়েছিল। তাঁর চেনবার কথা নয়, কিন্তু আমিও চিনতে পারিনি। অর্ধমলিন পরিচ্ছদ, দাঁড়িগোঁফ কামানো হয়নি, চিন্তাগ্রস্তভাব। পাশে বসেছিলেন। কোথায় এঁকে দেখেছি মনে হচ্ছিল, ঘাড় ফিরিয়ে দু'তিন বার তাকিয়েছিলাম তাঁর মুখের দিকে। হঠাৎ মৃদুস্বরে বললেন, আপনার কিছু অসুবিধা হচ্ছে কি? বললাম, আমার অনুমান ঠিক কিনা বুঝতে পারছি না, বিশ্ববিদ্যালয়ে আপনার কাছে পড়েছি বলে মনে হচ্ছে। একটু হেসে বললেন, কোন বিষয়ে? বললাম ইংরাজি, ১৯১৮ থেকে ২০। আবার হাসলেন, বললেন, অনুমান ঠিক। তারপর দু'চারটে কথা হল, চাঁদনির কাছে নেমে গেলেন ডা. মুখার্জি। যে পরিমাণ অর্থ তিনি দান করেছেন, বিশ্ববিদ্যালয়ে ইংরাজির প্রফেসর, কলেজ ইন্সপেক্টর ইত্যাদি যে উচ্চপদ অধিকার করেছিলেন এবং পরবর্তীকালে যে দেশজোড়া খ্যাতি হয়েছিল তাঁর, তার কথা মনে রাখলে যে গল্পটি বললাম এখানে আসল মানুষটিকে বুঝতে সেটি একটু সাহায্য করতে পারে মনে হয়।

প্রফুল্ল ঘোষমহাশয় প্রেসিডেন্সি কলেজের নাম করা অধ্যাপক, ভাল পড়াতেন। চেনাশোনা হয়েছিল তাঁর সঙ্গে। সুনীতিবাবু আমি কলেজ ছাড়বার কিছুদিন পরে বিলাত যান। ফিরে আসবার পরে Comparative Philology-র খয়রা প্রফেসার হন, শুধু ছাত্র নয়, সবুজপত্রগোষ্ঠীর বৈঠকে দেখাসাক্ষাৎ হবার ফলে তাঁর সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা বৃদ্ধি পেয়েছিল। তাঁর কম্বুলিটোলার বাড়িতে এবং হিন্দুস্থান পার্কের বাড়িতে অনেকবার গিয়েছি। জয়গোপালবাবু ভাল পড়াতেন। মনোমোহন ঘোষের কবিখ্যাতির কথা জানা ছিল। অরবিন্দ ঘোষের ভ্রাতা বলে তাঁকে বিশেষ সম্মান করত ছেলেরা। গলার স্বর এত ক্ষীণ ছিল যে প্রথম দুটো বেঞ্চের পেছনে যারা বসত কিছু শুনতে পেত না কিন্তু গোলমাল হত না ক্লাসে। মনে আছে আমরা দু'তিনজন ছাত্র উঁচু প্ল্যাটফরমে ওঠাবার ও তা থেকে নামবার সময়ে তাঁকে সাহায্য করতাম। ডা. স্টিফেনসের অনেক বয়স হয়েছিল, একটা দাঁতও ছিল না, কিন্তু দেহখানা তখনও দেখবার মতো ছিল। কথা বোঝা যেত না তাই তিনি বোর্ডে লিখে যেতেন লেকচার না দিয়ে। ক্লাস থেকে বেরবার সময় হাতে, কোট প্যান্টে অনেক সময় মুখে চকখড়ির গুঁড়ো মেখে বেরতেন। সুশীলবাবু বোধহয় ফিফ্‌থ ইয়ারে পড়াতেন। তারপর বিলেত চলে যান ডক্টরেট নেবার জন্য। জ্যোতিষবাবু আমাদের মাত্র দু'বছরের সিনিয়ার ছিলেন, টিউটোরিয়াল ক্লাস নিতেন, চমৎকার মানুষ, চেহারাটিও ভাল ছিল। বেশ ঘনিষ্ঠতা হয়েছিল তাঁর সঙ্গে। কয়েক বছর পরে তিনি বিলাত চলে যান ডক্টরেটের জন্য। ফিরে আসবার পরে নিজেই দেখা করতে এসেছিলেন আমার সঙ্গে। বোধহয় এখানে চাকুরির চেষ্টা করছিলেন। তাঁকে প্রথম চৌধুরী মশায়ের বাড়িতে নিয়ে গিয়ে পরিচয় করিয়ে দিয়েছিলাম। কিছুদিন পরে আবার বিলাতে ফিরে যান এবং অক্সফোর্ডে চাকুরি করতে থাকেন। তাঁর সঙ্গে সংযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। বছর দুই হল এক সাংবাদিক বন্ধু আমেরিকা থেকে ফেরবার পরে সেখানকার অভিজ্ঞতার গল্প করছিলেন। তাঁর মুখে ডা. ঘোষের কাহিনি শুনে চিনতে পারলাম তিনি জ্যোতিষবাবু, ইংলন্ডের আবহাওয়া সহ্য হয় না বলে আমেরিকায় থাকেন। এখনও বিয়ে করেননি, দেশে ফিরতে ইচ্ছে হয় কিন্তু আত্মীয়স্বজনের সঙ্গে সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন হয়েছে দীর্ঘ প্রবাসের ফলে, সাহস পান না।

(৩)

বি.এ. পড়বার সময় কন্টিনেন্টাল সাহিত্য পড়বার নেশা আমাকে পেয়ে বসেছিল বলেছি ফলে পরীক্ষায় অনার্স পেলেও ফল ভাল হয়নি। এম.এ. ক্লাসে ভর্তি হয়ে তাই স্থির করলাম আর এই নেশার প্রশ্রয় দেব না, পাঠ্যপুস্তকে লেগে থাকবার একঘেয়েমি কাটাবার জন্য ফরাসি ভাষা শিখব।

এই ফরাসি শেখবার ব্যাপার নিয়ে ২/১ নং ব্রাইট স্ট্রিটে প্রমথ চৌধুরীমশায়ের বাড়িতে ঢুকলাম এবং তাঁর ও ইন্দিরাদেবীর সঙ্গে সাক্ষাৎভাবে পরিচিত হলাম। কয়েকখানা ফরাসি ব্যকরণের বই এবং ফরাসি ও ইংরাজি অভিধান কিনে

আগে থেকে কাজ আরম্ভ করেছিলাম। তাঁদের কাছে গিয়ে বললাম ফরাসি উচ্চারণের কায়দা শিখিয়ে দিন। তাঁরা উৎসাহ দিলেন উপদেশও দিলেন। মোটামুটি এই ধারণা হল যে হাতুড়ি পিটে পিটে অর্থাৎ অভিধান ঘেঁটে ঘেঁটে ফরাসি সাহিত্যের মধ্যে অগ্রসর হতে হবে। উৎসাহ এবং উপদেশ ছাড়া আরও বড় একটা জিনিস লাভ হল। সেটা হচ্ছে বড় ফরাসি বইয়ের সংগ্রহ। প্রিয়নাথ সেনের ফরাসি পুস্তকসংগ্রহ কিনেছিলেন ন'জ্যেঠামশাই, তা ছাড়া নিজে অনেক বই কিনেছিলেন। ফরাসি ছাড়া ইটালিয়ান, সংস্কৃত, ইংরাজি ও বাংলা বইও প্রচুর ছিল তাঁর লাইব্রেরিতে। এই বৃহৎ লাইব্রেরি হাতে এসে গেল এইটে বড় লাভ। ফরাসি সাহিত্য পড়তে গিয়ে ফরাসি বই কিনতে হয়নি আমাকে। অবশ্য অল্প বই-ই পড়েছি। ইংরাজি বইগুলির মধ্যে রুশ থেকে অনুবাদ, স্প্যানিশ থেকে অনুবাদ অনেক বই ছিল। সংস্কৃত সাহিত্য সম্বন্ধে ইংরাজিতে আমেরিকান পণ্ডিতদের বই ছিল। ইংরাজি বাংলা অনেক বই হাতে হাতে অন্তর্হিত হয়েছে, ফরাসি গ্রন্থ সংগ্রহ শেষে তিনি হিন্দু বিদ্যালয়কে দান করেছিলেন। বাকি বইগুলি বিশ্বভারতীকে দিয়েছিলেন অনেক পরে, কলকাতা থেকে শান্তিনিকেতন চলে যাবার কিছুদিন আগে।

ফরাসি সাহিত্য পড়বার অনুকূল আবহাওয়া ও সুযোগ-সুবিধা পাওয়া ছাড়াও আরেকটা লাভ হল ২/১ ব্রাইট স্ট্রিটে যাতায়াতের ফলে। তখন 'সবুজপত্র' বেরচ্ছে। 'সবুজপত্রে'র লেখক এবং প্রমথ চৌধুরীর অনুরাগী ব্যক্তিদের মধ্যে কয়েকজন শনিবারে শনিবারে এই বাড়িতে সমবেত হতেন। সাহিত্য আলোচনা, রাজনৈতিক আলোচনা, জলযোগ নিয়মিতভাবে হত। অনিয়মিতভাবে হত গানবাজনার বৈঠক। আসলে ভাল গাইয়ে ও বাজিয়ে ইন্দিরা দেবীই এই বৈঠকের ব্যবস্থা করতেন। যাঁরা সমবেত হতেন তাঁদের অনেকে যুবক সাহিত্য অনুরাগী ইন্টেলেকচুয়াল শ্রেণির এবং বিশিষ্ট পরিবারের। পরে এঁদের কেউ কেউ খ্যাতি লাভ করেছেন। 'সবুজপত্রে'র মজলিশে যাঁরা আসতেন তাঁদের অনেকে জোড়াসাঁকোর ঠাকুরভবনে বিচিত্রার অধিবেশনেও যেতেন। অর্থাৎ সে সময়কার কলকাতার ইয়ং ইনটেলেকচুয়াল শ্রেণি ঠাকুর-চৌধুরী axis-এর পাশে পরিভ্রমণ করতেন।

'সবুজপত্রে'র মজলিশে যাঁরা আসতেন তাঁদের মধ্যে ছিলেন অতুল গুপ্ত, কিরণশঙ্কর রায়, সত্যেন্দ্রনাথ বসু, সুনীতি চট্টোপাধ্যায়, ধূর্জটি মুখোপাধ্যায়, হারীতকৃষ্ণ দেব, সুসঙ্গের সুধীন্দ্র ও সুহৃদ সিংহ। দিলীপ রায়, সুধীন্দ্র দত্তও মাঝে মাঝে যেতেন। সবুজপত্রের লোকজনের মধ্যে সতীশ ঘটক, সুরেশচন্দ্র ভট্টাচার্যের কথা মনে পড়ছে। রবীন্দ্রনাথের জ্যেষ্ঠ জামাতা শরৎ চক্রবর্তীকে মাঝে মাঝে দেখেছি। গগনেন্দ্রনাথ ও অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর মাঝে মাঝে আসতেন। আরও অনেকে আসতেন যাঁদের কথা মনে করতে পারছি না এখন। রবীন্দ্রনাথকে ২/১নং ব্রাইট স্ট্রিটের বাড়িতে 'সবুজপত্রে'র মজলিসে দেখেছি কি না মনে পড়ছে না।

প্রতি শনিবার না হোক প্রায় শনিবারে এই মজলিসে উপস্থিত থাকতাম। কোনও আলোচনা হবার, গানবাজনা হবার কথা থাকলে চিঠি পেতাম যাবার তাগিদ দিয়ে। ধীরে ধীরে মজলিসের কয়েকজনের সঙ্গে আলাপ হল। আমি তখন ছাত্র, স্বভাবেও তেমন মিশুক ছিলাম না, পাড়াগেঁয়ে আড়ষ্টতা ভাল করে কাটেনি। ঘনিষ্ঠতা হতে সময় লেগেছিল।

এই বাড়িতে যাতায়াতের ফলে চৌধুরী পরিবারের যাঁদের সঙ্গে আগে তেমন আলাপ হয়নি তাঁদের সঙ্গে, ঠাকুর পরিবারের কারও কারও সঙ্গে আলাপ হল। এঁদের মধ্যে ঝাউতলার বাড়ির প্রসন্নময়ী দেবী ও প্রিয়ম্বদা দেবী, ইন্দিরা দেবীর পিতামাতা সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও জ্ঞানদানন্দিনী দেবী, তাঁর ভ্রাতা সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুরের পরিবার, ব্রাইট স্ট্রিটের বাড়ির পেছনের বাড়ির অমিয়নাথ চৌধুরীর পরিবার, ডাক্তার সুহৃদনাথ চৌধুরীর পরিবারের কথা বলা যায়।

(৪)

প্রথম মহাযুদ্ধ শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গে ইংরাজের মুখের চেহারা এবং দেশের আবহাওয়া বদলে গেল। রাউলাট অ্যাক্টের বিরুদ্ধে আন্দোলনের নেতৃত্ব গেল গান্ধীজির হাতে। সত্যাগ্রহ কমিটি গঠিত হল, আন্দোলন আরম্ভ হল ১৯১৯-এর এপ্রিলে। দিল্লি ও কলকাতায় গুলি চলল। দেশব্যাপী হরতাল হল ৬ই এপ্রিল। এই হরতাল থেকে গণজাগরণের সুস্পষ্ট আভাস পাওয়া গেল। নানা ঘটনার ফলে পাঞ্জাবের অবস্থা খারাপ হয়ে উঠল। মার্শাল ল জারি হল পাঞ্জাবে। তারপর ঘটল জালিয়ানাওয়ালাবাগের হত্যাকাণ্ড। মার্শাল ল-এর আমলে পাঞ্জাবে জঘন্য উৎপীড়নের কাহিনি এবং জালিয়ানাওয়ালাবাগের কথা "অভিযাত্রী" উপন্যাসে বিস্তারিত বর্ণনা করা হয়েছে। সত্যাগ্রহ আন্দোলনের সময় হিন্দু মুসলমান ঐক্যের ভাব প্রবল হয়েছিল। "অভিযাত্রী" উপন্যাসে কলকাতায় বড়বাজারের গুলি চালনার পরের একটা ঘটনার বর্ণনা আছে। ঘটনাটি আমার অভিজ্ঞতা থেকে বর্ণনা করেছি, হিন্দু-মুসলমান, বাঙালি, মাড়োয়ারি মিলে রক্ত তিলক পরাবার ব্যাপারটা সত্য। পাঞ্জাবের মার্শাল ল-এর আমলে অত্যাচারের প্রতিবাদে রবীন্দ্রনাথের উপাধি ত্যাগের চিঠি বিশেষ উত্তেজনার সৃষ্টি করেছিল ছাত্রসমাজে। সেই সময় শুনেছিলাম প্রেসে পাঠাবার আগে রবীন্দ্রনাথ চিঠিখানি তাঁর বন্ধু আশুতোষ চৌধুরী এবং "বাংলার বাঘ" আশুতোষ মুখোপাধ্যায়কে দেখিয়েছিলেন। সম্পূর্ণ চিঠিখানি অনেকদিন

পর্যন্ত আমার মুখস্থ ছিল। অর্থনৈতিক কারণেও, বিশেষ করে জিনিসপত্রের চড়াদামের ফলে দেশের চাষি-মজুর শ্রেণির মধ্যে অসন্তোষ ছড়িয়ে পড়েছিল। বাংলার বিভিন্ন জায়গায় হাট লুট এই অসন্তোষের ফল। সব মিলে গান্ধীজির অসহযোগ ও আইন অমান্য আন্দোলনের ক্ষেত্র তৈরি হচ্ছিল।

মেছোবাজার ও কলেজ স্ট্রিটের মোড়ে এই বিশ্ববিদ্যালয়ের হস্টেলে বসেই গুরুতর সাম্প্রদায়িক দাঙ্গাও দেখেছি ১৯১৮-১৯-এর মধ্যে। যতদূর মনে পড়ে দু'সপ্তাহের ওপর চলেছিল এই দাঙ্গা। মার্কাস স্কোয়ারের পাশে বস্তিতে পথচারীকে মাথায় লোহার ডান্ডা মেরে, ছুরি মেরে হত্যা করতে দেখেছি ছাদের ওপর থেকে। রাইফেল হাতে ইউরোপীয়ান ভলান্টিয়ার বাহিনী বেরিয়েছিল উপদ্রুত অঞ্চলগুলিতে পাহারা দিতে। আমাদের হস্টেলের পাশে পাহারাদারদের মধ্যে প্রেসিডেন্সি কলেজের তৎকালীন অধ্যক্ষ ব্যারোসাহেব ছিলেন।

খিলাফত আন্দোলনের সঙ্গে সত্যাগ্রহ আন্দোলনের গাঁটছড়া বেঁধে দেবার ফলে হিন্দু মুসলমান ঐক্যের যে ঢেউ এসেছিল দেশে তা স্থায়ী তো হয়ইনি বরং আফগান আক্রমণের গুজব রটে সাম্প্রদায়িক উগ্রতা কতটা বেড়ে গিয়েছিল মালাবারে মোপলা দাঙ্গা তার প্রমাণ। মনে পড়ে মোপলা হাঙ্গামাকে "বিদ্রোহ" আখ্যা দিয়ে হিন্দুদের প্রতি বীভৎস অত্যাচারের কাহিনিকে চাপা দেবার চেষ্টা হয়েছিল হিন্দু-মুসলমান ঐক্যবাদীদের পক্ষ থেকে।

সত্যাগ্রহ আন্দোলন, অসহযোগ আন্দোলন, দেশের জনসাধারণের ওপর গান্ধীজির ঐন্দ্রজালিক প্রভাব, ব্যাপক গণজাগরণের চেহারা, আইন অমান্য প্রচার, প্রিন্স অব ওয়েলস-এর আগমন উপলক্ষে সর্বাত্মক হরতাল—এ সব কথা বলা হয়েছে "অভিযাত্রী" এবং তার পরবর্তী "আবির্ভাব" উপন্যাসে। তখনকার দেশময় উত্তেজনা এবং আন্দোলনের সম্বন্ধে ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতাব সীমার মধ্যে যে সকল ঘটনা ঘটেছিল তার কয়েকটার কথা মনে আছে। মনে আছে সমাজের নিম্নশ্রেণিগুলির মধ্যে অদ্ভুত চাঞ্চল্য এসেছিল। এই চাঞ্চল্যের অর্থনৈতিক এবং সামাজিক রূপ চোখে পড়েছিল। ভদ্রলোক শ্রেণির প্রতি বিদ্বেষ, জমিদার ও মহাজন শ্রেণির প্রতি বিদ্বেষ স্পষ্ট হয়ে ফুটে উঠেছিল। শেষের দু' শ্রেণির প্রতি বিদ্বেষে সাময়িকভাবে হিন্দু ও মুসলমান কৃষক সম্প্রদায়ের মধ্যে ঐক্য বনে গিয়েছিল। মেয়েরা বহু সংখ্যায় সক্রিয় অংশ গ্রহণ করেছিলেন এই আন্দোলনে। মেয়েদের পিকেটিং, প্রভাত ফেরির কথা বেশ মনে আছে। বিলাতি কাপড়ের দোকানে, মাদকদ্রব্যের দোকানে, স্কুল কলেজে পিকেটিং-এর ব্যাপারে অনেক মেয়ে যোগ দিয়েছিলেন। অসহযোগের ফিলোজফি শিক্ষিত সম্প্রদায়ের কিছু লোকের অন্তর স্পর্শ করেছিল। ব্যবহারে, কথায়, কেউ কেউ নূতন মানুষ হয়ে গিয়েছেন মনে হয়েছিল। অহিংসার ওপর জোর দেয়া সত্ত্বেও সরকারবিরোধী ভাব জনসাধারণের মনে ছড়িয়ে পড়েছিল। আরেকটা কথা সেই সময়েই মনে হয়েছিল গান্ধীজির প্রবর্তিত আন্দোলনের মধ্যে একটা বড় রকমের অবাস্তবতা রয়েছে। অবশ্য তখন এই অবাস্তবতার প্রকৃতি বিশ্লেষণ করিনি, সে শক্তিও ছিল না, তবে অনুভূতি বেশ স্পষ্ট ছিল। তারপরে মনে হয়েছে এই feeling of unreality এসেছিল খিলাফত আন্দোলন নিয়ে বাড়াবাড়ি, ইচ্ছা করে দেশবাসীর রাজনৈতিক আন্দোলনের লক্ষ্য অস্পষ্ট করবার প্রয়াস; ধর্মতত্ত্ব ও দার্শনিক তত্ত্বের বুকনি মিশিয়ে রাজনৈতিক আন্দোলনের ব্যাখ্যাকে ঘোরালো করবার Swaraj within one year শ্রেণির স্তোক আশ্বাস ব্যবহার করবার ফলে।

(৫)

এম.এ. পরীক্ষা দেবার মাস তিন আগে আমার পিতৃবিয়োগ হল পাবনা শহরে আমাদের বাড়িতে। অসুখ নিউমোনিয়া। অসুখ হয়েছিল হরিপুরে, চিকিৎসার জন্য পাবনায় নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। অসুখের খবর পেয়ে আমি পাবনা পৌঁছবার আগেই তাঁর দেহান্ত হয়েছিল। তখন আমার মধ্যম ভ্রাতা কালাজ্বরের চিকিৎসার জন্য কলকাতায় আমার তত্ত্বাবধানে ছিলেন, কনিষ্ঠ ভ্রাতা রাজশাহি কলেজে আই এস সি পড়ছিলেন। কালাজ্বরের injection দিচ্ছিলেন ডা. ধীরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জি। এই ভদ্রলোকের সঙ্গে পরে আমার একটু ঘনিষ্ঠ আলাপ হয়েছিল। সে কথা বলব পরে। আমার মধ্যম ভ্রাতার থাকবার জায়গা নিয়ে একটু অসুবিধা হয়েছিল এই সময়। নামকরা সাংবাদিক সত্যেন্দ্রনাথ তখন বোধহয় 'আনন্দবাজার' কাগজের সম্পাদক। আনন্দবাজারের তখনও বিশেষ নামডাক হয়নি। সত্যেন্দ্রনাথের সঙ্গে এইভাবে যে আলাপ হল তাঁর মৃত্যুকাল পর্যন্ত তা বজায় ছিল।

পিতার মৃত্যুর পরে স্বাভাবিকভাবেই কিছু বৈষয়িক বিভ্রাট দেখা দিয়েছিল। আমার মধ্যম ভ্রাতার অবস্থা কিছু খারাপ হওয়ায় তাঁকে হাসপাতালে ভর্তি করতে হল। নানা রকম গোলযোগের মধ্যে এম এ পরীক্ষা দিতে হল। পরীক্ষা শেষ হতেই হরিপুরে রওনা হলাম। হাসপাতালের চিকিৎসায় মধ্যম ভ্রাতা ভাল হয়ে ছাড়া পেলে তাঁর রাঁচিতে চেঞ্জে যাওয়ার বন্দোবস্ত করতে হল।

বিষয়সম্পত্তি দেখাশোনা আমার পিতাই অল্প বয়স থেকে করে এসেছেন, তাঁর দুই ভ্রাতার এদিকে মনোযোগ দেবার প্রয়োজন হয়নি, হরিপুরে তাঁরা থাকতেন না, সব জিনিস

জানতেন না। পিতার মৃত্যুর পরে গোমস্তার ওপরে সব দায়িত্ব এসেছিল। কলেজ থেকে বেরিয়েই জমিদারির কাগজপত্র নিয়ে, প্রজাদের নিয়ে, গোমস্তাকে নিয়ে ব্যস্ত হতে হল। এই সময়ে একসঙ্গে পাঁচ ছটা মৌজায় সেটেলমেন্ট আরম্ভ হয়েছিল। কাজেই ব্যস্ত না হয়ে উপায় ছিল না।

সেটেলমেন্টের ব্যাপারে, এখন মনে পড়ছে, চারিদিক থেকে টানাটানির মধ্যে পড়ে গিয়েছিলাম। প্রজাদের চেষ্টা নিজেদের কোলে ঝোল টানবার। শরিকদের চেষ্টা আমার অনভিজ্ঞতার সুযোগ নিয়ে এজমালি দাগগুলি নিজেদের একার নামে লিখিয়ে নেওয়া, গোমস্তার চেষ্টা প্রজাদের কাছে কিছু খেয়ে তাদের দালালি করতে গিয়ে আমাকে বিভ্রান্ত করা, সেটেলমেন্টের কানুনগো-আমিন প্রভৃতির চেষ্টা নানা অজুহাতে যতটা পারা যায় আদায় করা। নিজের ন্যায্য স্বার্থরক্ষা করতে সর্বক্ষেত্রে সফল হতে পেরেছিলাম মনে হয় না। কানুনগোবাবুটি আমার পিতার আমলের ভাল ঘোড়ার জিনটি কয়েকদিনের জন্য ব্যবহার করবার জন্য চেয়ে নিয়ে আর ফেরত না দিয়ে সরে পড়েছিলেন। সেটেলমেন্টের সূত্রে আরও দু'চারটে অভিজ্ঞতা হয়েছিল। একটা অভিজ্ঞতা একাধারে করুণ ও হাস্যরসাত্মক।

গোমস্তা প্রভৃতি লোকজন অন্যত্র ব্যস্ত থাকায় মাইল পনেরো দূরে এক সেটেলমেন্ট ক্যাম্পে আমাকে যেতে হল। রেলে যেতে পারতাম, তা না গিয়ে রাত্রে আহারাদির পরে মহিষের গাড়িতে রওনা হলাম। গাড়ি আমাদের প্রজা সহোদরী প্রামাণিকের, সে নিজেই চালক। পৌষ মাসের শেষ, বেশ শীত। গাড়ির পথ রেল লাইনের সমান্তরালভাবে গিয়েছে কয়েক মাইল। গাড়ির পথের ডানদিকে নালা। রেলের উঁচু লাইন তৈরির জন্য মাটি কাটা হয়েছিল, তা থেকে এই নালা বা খালের উৎপত্তি। বৃষ্টির জলে নালা ভরে গিয়েছিল, সে জল তখনও শুকোয়নি। নালার ওপারে বিস্তীর্ণ ধানের খেত। মাঝরাত, সহোদরী কাঁথা মুড়ি দিয়ে ঝিমুচ্ছে তস্য মনিব লেপ মুড়ি দিয়ে গাড়ির মধ্যে নিদ্রিত। ঝমঝম শব্দে ঘুম ভেঙে গেল, মুখের ওপর থেকে লেপ সরাতে রেলের সার্চ লাইটের আলো চোখে পড়ল। তারপরেই গাড়ি নিয়ে মোষ ঊর্ধ্বশ্বাসে দৌড়তে শুরু করল এবং সার্চ লাইটের আলো সামনে পড়তে খালের মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়ল। পতনের বেগ সামলাবার আগেই টের পেলাম দড়ি ছিঁড়ে মোষ দুটি ধানখেতের মধ্যে দৌড় দিয়েছে এবং খালের জলে বিছানা প্রভৃতি ভিজে উঠেছে। কোনওমতে গাড়ি থেকে বেরিয়ে ধানখেতে দাঁড়ালাম। গায়ে গেঞ্জি ও পুলওভার থাকলেও খোলা মাঠে দাঁড়িয়ে কাঁপতে শুরু করলাম এবং বোধকরি কাঁপুনি থামাবার জন্য গরম হয়ে গাড়োয়ানের প্রতি তর্জনগর্জন করতে লাগলাম। এই হল করুণ রসাত্মক অংশ। হাস্যরসাত্মক দৃশ্য আরম্ভ হল এরপরে।

কয়েকদিন আগে মাঠের ধানকাটা হয়েছে। সারা মাঠে শুকনো ধানগাছের গোড়া, খালি পায়ে কতকটা কাঁটার মতো বেদনাদায়ক বটে। মোষ দুটো কিছু দূরে দাঁড়িয়ে হাঁপাচ্ছিল সহোদরী প্রামাণিক তাদের ধরবার জন্য এগোতে আবার ছুটতে শুরু করল তারা। শেষ পৌষের রাতের আলো-আঁধারিতে, কনকনে শীত, শুকনো তীক্ষ্ণ খড়-কণ্টকিত মাঠে মহিষযুগল এবং তাদের মালিকের মধ্যে ধরা ও পালানোর খেলা চলল অনেকক্ষণ। শীতে কম্পমান, নিরুপায় মনিব মাঝে মাঝে গর্জন করছেন, মহিষের মালিক দৌড়তে দৌড়তে হেঁকে বলছে মনিবের সঙ্গে এমন শয়তানি মজা দেখাব বজ্জাত মোষ। অদৃষ্টের ফের, মোষ ধরার খেলায় অবশেষে মনিবকেও যোগ দিতে হল সহোদরীর হতাশাব্যঞ্জক ডাকাডাকি শুনে। বয়সও হয়েছিল তার। খালের জলে অর্ধনিমজ্জিত গাড়ি টেনে তোলবার জন্য সাহায্য করতে হল। বিছানার খানিকটা ভিজে ছিল। সেই আধভেজা বিছানায় শুয়ে বসে বাকি পথটা অতিক্রম করে পর দিন সকালের জায়গায় দুপুরের আগে গন্তব্যস্থানে পৌঁছানো গেল। ক্যাম্প বসেছিল আমাদের ওই মৌজার পত্তনিদার এক বর্ধিষ্ণু অবস্থার সাহা ব্যবসায়ীর বহির্বাটিতে। তাঁর আদর-আপ্যায়নে পথের কষ্ট ভুলে গেলাম।

কিছুকাল পরের আরেকটা অভিজ্ঞতার কথা এখানে বলে নিই।

অগ্রহায়ণ মাসের শেষের দিকের ঘটনা, শীত পড়েছে, ধান কাটার মরশুম তখন। গিয়েছিলাম খিয়ের এক মৌজায়। চলন বিলের উত্তরে রাজশাহি জেলার মধ্যে খিয়ের মুলুক। এই খিয়ের মুলুকের বর্ণনা আমার উপন্যাসগুলিতে আছে দু'একটা গল্পেও ('তাল সোনাপুরের হাজি সাহেব') আছে।

মৌজার নাম খিরপোতা। বগুড়া স্টেশন থেকে টমটমে মুন্সি সেরপুর হয়ে ভবানীপুরে পৌঁছালাম দুপুরে। ভবানীপুর প্রসিদ্ধ তীর্থস্থান, নাটোরের মহারাজা রামকৃষ্ণের সাধনক্ষেত্র। দেবীর মন্দির আছে, উত্তম পূজার ব্যবস্থা ছিল, যাত্রীসেবার ব্যবস্থাও ছিল তখন দেবোত্তর সম্পত্তির আয় থেকে। নাটোরের ছোট তরফের শরিক দেবীর সেবাইত। ছোট তরফের কাছারি বাড়ি তসিলদার প্রভৃতি পূজারি এবং মন্দিরের পাহারাদার কয়েকজন ভোজপুরি দারোয়ান ছিল। এ অঞ্চলের অধিবাসীরা শতকরা ৯৫ জনের বেশি মুসলমান। আসপাশের গ্রামের মুসলমানরা দেবীর মন্দিরে "সিন্নি" দিত।

ভবানীপুরে সেদিন কাটিয়ে আট-ন' মাইল মেঠো পথ মহিষের গাড়িতে অতিক্রম করে খিরপৌতা গ্রামে পৌঁছলাম

পরদিন দুপুরে। থাকবার ব্যবস্থা হল মৌজার সব থেকে বড় এবং প্রতিপত্তিশালী জোতদারের গৃহে। এই জোতদারটি ছিল একটি character। হরিপুরের কথায় এর বিষয় কিছু বলা হয়েছে। "চালসোনাপুরের হাজি সাহেব" গল্পের নায়ক তো এই ব্যক্তি।

ধান কাটা, ধান মাড়াই, ধান গোলায় তোলা, চাষিজীবনের মস্ত বড় ব্যাপার। এ যাত্রায় চাষির গ্রামে বসে, চাষির বাড়িতে থেকে এই ব্যাপারের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা লাভ করবার সুযোগ হয়েছিল। দুপুরের আগে থেকে গাড়ির পর গাড়ি আসছে মাঠ থেকে ধান বোঝাই করে, বাড়ির সামনে খোলা জায়গায় ধান পালা করে রেখে ফিরে যাচ্ছিল মাঠে। রাত আটটা নটা পর্যন্ত গাড়ি চলাচলের বিরাম নাই। বাড়ির চারদিকে পাঁচ-ছটা চুল্লিতে বড় তামার ডেচকি ও লোহার কড়াতে রান্না চড়েছিল সকাল থেকে। ধান কাটায় নিযুক্ত পঞ্চাশ ষাট জনমজুরের খাদ্য তৈরির জন্য। খাদ্য মুসুরের বা খেসারির ডাল, ভাত ও মিষ্টি কুমড়ো ও আলুর ঘ্যাঁট। এর সঙ্গে কাঁচা পেয়াজ ও কাঁচা লঙ্কা। শুনলাম কোনও কোনও দিন ভাদুই নদীতে জাল ফেলে ধরা ফলুই মাছ, পুঁটি মাছও জুটে যেত তাদের বরাতে। সকালে ভিজে চিঁড়ে ও ঝোলাগুড় দিয়ে নাস্তা করে কাজে চলে যেত, দুপুরের খাবার যেত মাঠে। মজুররা অন্য জায়গা থেকে আসত দল বেঁধে, ধান কাটবার সময় হলে। তাদের প্রাপ্যের হিসাব হত ধানে। দু'বেলার খোরাকি জোতদারকে দিতে হত। রাত্রে শুয়ে শুয়ে ধানের পালার সোঁদা গন্ধ, মজুরদের কড়া তামাকের গন্ধ পেতাম। শেষ রাত্রে ঘুম ভেঙে যেত এই গন্ধে, অতগুলো লোকের কথাবার্তার গোলমালে। ডজন দুই মজুর আমি যে ঘরে থাকতাম তার খোলা বারান্দায় চাটাই পেতে, কাঁথা মুড়ি দিয়ে শীতের রাত কাটিয়ে দিত। সুস্থ সবল লোক ছিল এদের মধ্যে, আবার পেটজোড়া পিলে, শীর্ণকায় ম্যালেরিয়ার রোগীও ছিল। ধান কাটতে কাটতে প্রবল জ্বরে বেহুঁস হয়ে মাঠে পড়ে থাকত কেউ কেউ। ধানবোঝাই গাড়িতে তুলে সন্ধ্যার আগে তাকে বাড়িতে আনা হত। পরদিন সকালে নাস্তা করে কাস্তে নিয়ে আবার মাঠে ছুটত। রোজগার করতে বেরিয়েছে, শুয়ে থেকে রোজগার মাটি করা কি পোষায়?

দু'দিন পরে হাটবার। মাইল ছয় দূরে রানির হাটে হাট বসে। রানির হাট এ অঞ্চলের বড় বিখ্যাত হাট। যেতে হয় রানির জাঙ্গালের পাশ দিয়ে হেঁটে বা ঘোড়ায়। রানির জাঙ্গাল ছিল নাটোর থেকে নবাবি আমলের রাজধানী মুরশিদাবাদ যাবার সড়ক। রানির হাট ও রানির জাঙ্গালের রানি নাটোরের রানি ভবানী। রানির জাঙ্গাল গ্রামের মাইল চার দূর দিয়ে চলে গেছে। এই চার মাইল ধান খেতের মধ্যে দিয়ে পায়ে চলার সরু পথ ধরে যেতে হয়। বেলা তিনটে নাগাদ ঘোড়ায় চেপে মেঠো পথ ধরলাম, সঙ্গে জোতদারের এক ছেলে ঘোড়ায় চড়ে পথপ্রদর্শক হয়ে চলল।

রানির হাট ব্যাপারিদের হাট, অর্থাৎ পাইকারদের হাট; ধান, চাল, কলাই, সরিষা বিক্রি হয় বেশিরভাগ। পাট, গুড় প্রভৃতিও বিক্রি হয়। খুচরা বিক্রির দোকানও অনেক, মায় চায়ের দোকান পর্যন্ত। আমার সওদা করবার মতো কোনও জিনিস পেলাম না। হাট দেখা শেষ করে ফেরবার জন্য যখন ঘোড়ায় চাপা গেল সূর্য তখন অস্তোন্মুখ। খানিকটা পথ গিয়ে জোতদারের ছেলে বলল, আপনি আস্তে আস্তে এগোন, আমি কাছেই একটা বাড়ি থেকে খবর নিয়ে এখনই ফিরে আসছি। ঘোড়া ছুটিয়ে সে চলে গেল।

কিছুক্ষণ তার জন্য অপেক্ষা করে অস্তগামী সূর্যের দিকে একবার চেয়ে চলতে শুরু করলাম ধীরে ধীরে। চারদিকে যতদূর দৃষ্টি চলে মাঠ, সবে ধান কাটা হয়েছে। মাঝে মাঝে দু'একটা খেজুর গাছ, বেঁটে বাবলা গাছ। গ্রামের বনানীরেখা দৃষ্টিতে পড়ে না, কোনও মানুষ চোখে পড়ে না। ছায়া নেমে এল ক্রমে। ঘোড়া ছুটিয়ে দিয়েছি কখন নিজের অজ্ঞাতসারে। ছায়া ঘন হয়ে আঁধার হল, আঁধারে আচ্ছন্ন হল চারদিক। এই সীমাহীন মাঠে, শীতের সন্ধ্যায় দিগভ্রষ্ট একাকী ঘোড়া-সওয়ারির মন আচ্ছন্ন হল অজানা ভয়ে। চলেছি তো চলেছি। সময়ের জ্ঞান চলে গেছে, পথের চিহ্ন কখন মুছে গেছে, দৃষ্টি সূচিভেদ্য অন্ধকারে অবরুদ্ধ। ঘোড়া ছুটতে ছুটতে হোঁচট খাচ্ছে, সওয়ারির কপাল বেয়ে ঘাম ঝরছে দরদর করে। ভয় মূর্তিমান হয়ে কণ্ঠনালী চেপে ধরছে মনে হল। কোথায় চলেছি? কতক্ষণ চলেছি? এ যাত্রা কি শেষ হবে? কীভাবে শেষ হবে? যদি ক্লান্ত ঘোড়া পড়ে যায় হুমড়ি খেয়ে। যদি খানাডোবায় উলটে পড়ে? তার জোরে জোরে নিশ্বাস টানবার শব্দ শুনছি। গতি শ্লথ হয়ে এসেছে। আমারও ক্লান্তির অবধি নাই, শিরদাড়া টনটন করছে, ঘোড়ার পিঠে আর বসে থাকতেও যে পারছি না। এই অন্ধকার, জনশূন্য তেপান্তরের মাঠে ঘোড়া থেকে নেমেই বা কোথায় যাব? ছাড়া পেয়ে ঘোড়া যদি ছুটে পালায় তা হলে? ভয়ে অজ্ঞান হয়ে পড়ব না তো? মনের গভীর দেশে কী ক্রিয়া চলছিল বলতে পারি না হঠাৎ অনুভব করলাম একেবারে শান্ত হয়ে গেল মন, ভয়শূন্য হয়ে গেল। লাগাম টেনে ঘোড়াকে দাঁড় করালাম। বসে কী আর হবে? ঘোড়া থেকে নেমে সারারাত এই নির্জন অন্ধকার মাঠে কাটিয়ে দেব ধান খেতে বসে। বাঘ-ভাল্লুক নাই এ অঞ্চলে, সাপখোপ থাকতে পারে। চোর ডাকাত আছে শুনেছি। কী আর করা যাবে? ঘোড়া থেকে নামতে যেটুকু দেরি, চোখে পড়ল সামনে অনেক দূরে একটা আলোর ক্ষীণ

আভাস। ওই তো গ্রামের নিশানা। কোন গ্রাম কে জানে, তবু লোকালয় তো বটে। মানুষের সঙ্গ, একটু আশ্রয়ের তখন বড় প্রয়োজন। হয়ত এই আলো কিছুক্ষণ ধরে দেখেছি, মানসিক উত্তেজনার বশে খেয়াল করিনি। আকাশে ধ্রুবতারার মতো দিকনির্ণয়ের সহায়ক ওই ক্ষীণ আলোকরেখার প্রতি লক্ষ্য রেখে লাগাম আলগা হাতে ধরে ঘোড়াকে চলবার ইঙ্গিত করলাম। বেশ এক খেলা আরম্ভ হল। কখনও আলো দেখতে পাচ্ছি, কখনও কাঁপতে কাঁপতে নিভে যাচ্ছে, আবার কিছুক্ষণ পরে ফুটে উঠছে। কতদূর থেকে ওই আলোটা আসছে বোঝবার উপায় নেই। বলতে পারতাম উপনিষদের ঋষির মতো, 'তম' থেকে আলোকে নিয়ে যাও আমাকে, কিন্তু কথাটা মনে পড়ল না, যদিও মন তমসাবৃত, পৃথিবী যে কী দুঃসহ বস্তু, আলোকের জন্য প্রাণ যে কত আকুল হতে পারে সে দিন হাড়ে হাড়ে বুঝেছিলাম।

ঘোড়াকে চালিয়ে যাচ্ছিলাম দূরবর্তী আলোকের দিকে দৃষ্টি রেখে। কতক্ষণ চলেছি জানি না, শুধু মনে হচ্ছিল আলোর নাগাল বোধহয় জীবনে আর পাব না। অনেকক্ষণ চলার পরে মনে হল চারদিকের ঘন অন্ধকারের মধ্যে এক ঘনতর অন্ধকারের দেয়াল সামনে দাঁড়িয়ে আর সেই দেয়াল ভেদ করে আলো আসছে। ঝোপঝাড়, গাছপালার দেয়াল। এই দেয়ালের এক ফাঁকের মধ্যে দিয়ে ঘোড়া নিজের মনে ঢুকে পড়ল।

প্রদীপের নয়, লণ্ঠনের নয় কাঠের ধুনি জ্বালিয়ে সেটা ঘিরে কয়েকজন লোক কাঁথা গায়ে দিয়ে বসে গল্প করছে, তামাক খাচ্ছে। হঠাৎ অশ্বারোহী মূর্তির আবির্ভাবে তারা ত্রস্ত হল। উঠে দাঁড়াল সবাই। প্রশ্ন করে জানলাম খিরপোতা ছেড়ে তার পাশের গ্রামে এসে পড়েছি, তবে যে বাড়িতে উঠেছিলাম সেটা বেশি দূরে নয়। ঘর থেকে লণ্ঠন এনে একজন আমাকে পথ দেখিয়ে বলল সোজা এই পথে চলে যান। এতক্ষণে লক্ষ করলাম ঘোড়ার মুখ হতে ফেনা গড়াচ্ছে। নেমে পড়লাম ঘোড়ার পিঠ থেকে। বললাম লণ্ঠন নিয়ে একজন চলো আমার সঙ্গে, পথ দেখিয়ে না দিলে এই অন্ধকার রাতে চিনে যেতে পারবে না। বিকেল থেকে ঘোড়ার পিঠে রয়েছি। একজন বলল, ভারি হয়রান হয়েছেন বাবু একটু জিরিয়ে নেন, একটা মোড়া নিয়ে আসব? জিরিয়ে নেবার নিমন্ত্রণ নিতে পারলাম না, বললাম, এখন বসলে আর উঠতে পারব না, সারা গায়ে ব্যথা হয়েছে। একজন কেউ চলো লণ্ঠন নিয়ে।

ঘোড়ার লাগাম ধরে হেঁটে চললাম লণ্ঠনধারীর সঙ্গে কথা বলতে বলতে। মিনিট দশেক হাঁটবার পরে লণ্ঠন ও লাঠি হাতে কয়েকজন লোকের সঙ্গে সাক্ষাৎ হল। তাদের কাছে শুনলাম আমার ফিরতে দেরি দেখে মোল্লা লোক পাঠিয়েছে চারদিকে। ভিন গায়ের যে লোকটি আলো দেখিয়ে সঙ্গে আসছিল মিষ্ট কথায় তাকে বিদায় দিলাম। বখশিশ দিলাম না, দিতে গেলে গেঁয়ো গরিব চাষি নিজেকে অপমানিত বোধ করত।

একটুখানি ভুতুড়ে ব্যাপারের অবতারণা করে গল্পটাকে রোমহর্ষক করা যেত। রানি ভবানীর নামের সঙ্গে যুক্ত রানির হাট, রানির জাঙ্গাল হাতের কাছে ছিল, সিরাজদৌল্লার ভূতকে নামানো যেত। বাংলার হিন্দু জমিদারদের কাছ থেকে উৎপীড়ন করে টাকা আদায় করবার জন্য "বৈকুণ্ঠের" কল্পনা যার মাথায় এসেছিল সেই মুরশিদকুলি খাঁর নতুন জামাই রেজা খাঁর ভূতকেও নামানো যেত। 'রাজস্ব প্রদানে জমিদারগণকে বাধ্য করিবার নিমিত্ত তিনি একটি পুষ্করিণী খনন করাইলেন এবং সর্বপ্রকার অপ্রীতিকর পদার্থের দ্বারা উহা পূর্ণ করিলেন। উহার পূতিগন্ধ এত তীব্র হইয়াছিল যে, যে কেহ উহার নিকটবর্তী হইত তাহারই যেন শ্বাসরোধ হইয়া যাইত। হিন্দুদিগের প্রতি তাচ্ছিল্যবশত তিনি কদর্য স্থানের নাম দিয়েছিলেন 'বৈকুণ্ঠ'। সাধারণ শাস্তিপ্রাপ্ত হইয়াও জমিদারগণ যখন দেয় রাজস্ব তৎক্ষণাৎ প্রদান করিতেন না, তখন তাহাদের বাহুতে এক গাছা দড়ি বাঁধিয়া এই নরকতুল্য জলাশয়ের মধ্য দিয়া টানিয়া লওয়া হইত' (Charles Stewart's History of Bengal) অন্ধকার রাতে পথ হারানোর কাহিনিটি রোমান্টিক হয়ে উঠত রানির জাঙ্গাল দিয়ে তঞ্জাম বাহিত কোনও বোরখা পরা বেগমের পেত্নিকে নামালে।

বিচিত্র অভিজ্ঞতার কাহিনি যখন বলছি আরেকটা অভিজ্ঞতার কথা বলে নিই এখানে।

কচুয়া মহালে যেতে হত ঈশ্বরী সিরাজগঞ্জ লাইনের দ্বিতীয় স্টেশন মুলিভুলিতে নেমে গো বা মহিষ যানে। বেশি দূরের পথ নয়। প্রজাদের অর্ধেকের বেশি নমশূদ্র ও বাকি মুসলমান। নমশূদ্র প্রজাদের অনেকে লেখাপড়া জানে, অবস্থা ভাল কিন্তু তারা দাঙ্গাবাজ ও মোকদ্দমাবাজ। গোটা মহল "বিদ্রোহী" হয়েছিল কয়েক বছর আগে থেকে অর্থাৎ জমা-বৃদ্ধিতে আপত্তি তুলে দল বেঁধে সবাই বৃদ্ধি জমাতে খাজনা দিতে অস্বীকার করেছিল। নির্দেশ না পেয়ে গোমস্তারা সাবেক জমায় খাজনা নেয়নি। নিজে যাবার উদ্দেশ্য ছিল একটা মিটমাটের চেষ্টা করা।

মামলাবাজ বা দাঙ্গাবাজ যাই হোক ব্রাহ্মণ ও নবাগত জমিদারের আপ্যায়নের জন্য তারা যে আয়োজন করেছিল তার কথা ভুলিনি। তাদের ব্যবহারের সহজ নিষ্ঠা ও শ্রদ্ধা খুব ভাল লেগেছিল। আমার পাতে দুধ ও মাছের পরিমাণ দেখে

বিব্রত হতে দেখে কয়েকজন বলল, আমাদের একটু করে প্রসাদ দিতে হবে যে ঠাকুরমশাই।

সারাদিন কাজের কথা কিছু হল না, আলাপ-পরিচয়, আহারের আয়োজন ও আহারে কেটে গেল। রাতে সামান্য কিছু জলযোগ করে শুতে গেলাম। আমার সঙ্গে এসেছিলেন আমার এক জ্ঞাতি ভাই সুরনাথ চৌধুরী পরামর্শদাতা হয়ে। একসঙ্গে দু'খানা তক্তপোষে আমাদের দু'জনের বিছানা হয়েছিল। দু'জনেই ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। মাঝরাতে ঘুম ভেঙে গেল কার হাতের স্পর্শে। নিচু স্বরে সুরনাথদা বললেন, কথা বলো না টোটা কোথা রেখেছ? বালিশের পাশে বন্দুক-টোটাগুলি ছিল, অন্ধকারে হাতড়ে কয়েকটা গুলি তাঁর হাতে দিলাম। বন্দুকে গুলি ভরলেন তিনি। মৃদু স্বরে বললেন, উঠোনে অনেক লোক জড় হয়েছে। অনেকক্ষণ ধরে ফিসফিসে কথাবার্তা হচ্ছে, "খুন" কথাটা কয়েকবার শুনেছি। কী ব্যাটাদের মতলব বুঝতে পারছি না। সঙ্গে টাকা পয়সা কিছু নাই জানে তো ব্যাটারা।

চমকে উঠলাম তাঁর কথা শুনে। শুনেছিলাম এখানকার নমশূদ্র ও মুসলমান উভয়েই দাঙ্গাবাজ। ডাকাতি খুন-জখমের ঘটনাও মাঝে মাঝে ঘটে। ডাকাতি হয় পয়সার লোভে। খুন জখ্ম হয় জমি নিয়ে আর মেয়েমানুষ নিয়ে। তাদের গৃহে অতিথি জমিদারকে খুন করে কী সুবিধা হবে? মূল্যবান জিনিস বেশি কিছুই সঙ্গে নাই বন্দুকটি ছাড়া। তবে পাইক ও গোমস্তাটির কী হবে? ওদের সঙ্গে শুরুতে দেখা হয়েছিল জানি। ওদের কি শেষ করে দিয়েছে না বেঁধে রেখেছে?

ভয় পেয়েছিলাম কিন্তু আমাদের খুন করবার জন্য প্রজারা অন্ধকার রাতে জড় হয়েছে বিশ্বাস করতে পারছিলাম না। সকালে পায়ের ধুলো নিতে যারা কাড়াকাড়ি করেছে, কলসি কলসি দুধ, গোটা কুড়ি ইলিশ মাছ, ঘি, ছানা, সন্দেশ জুগিয়েছে নানা জায়গায় দৌড়োদৌড়ি করে, রাতে তারা ঘাড়ে দা বসাবে? কেন বসাবে?

বললাম, সুরনাথদা, দোরটা খুলে একবার টর্চ ফেলে দেখা যাক?

না, না, দোর খুলো না। এগিয়ে আসছে বুঝতে পারলে মাথার দিকের জানালা খুলে ফায়ার করব। দোর খুললে হুড়মুড় করে ঢুকে পড়বে দলবেঁধে, আত্মরক্ষার চান্স পাব না।

ভয়ে কাঁটা দিল গায়ে। কথাটা ঠিক। কী বলতে যাচ্ছিলাম উঠোনের বিপরীত দিকে জানালার নীচে একটা শব্দ কানে এল। বললাম, সুরনাথদা, ব্যাটারা দু'দিক থেকে আক্রমণ করবে না কি?

তাই তো মনে হচ্ছে, তিনি বললেন। ক্লিক করে শব্দ হল। বুঝলাম বন্দুকে গুলি ভরে সেটির লক সরালেন।

গুলি চালাবেন না দেখি কী ব্যাপার—বলে বিপরীত দিকের জানালা খুলে টর্চের আলো ফেললাম। মাথায় মুখে কাপড় জড়ানো একটা লোক দাঁড়িয়ে ছিল জানলার নীচে, আলো ফেলতে সে দৌড় লাগাল। টর্চের আলোতে দেখলাম কয়েকজন লোক ছুটে গিয়ে ধরে ফেলল, তারপর টেনে নিয়ে চলল।

রাতের অন্ধকার ভেদ করে দূর থেকে হল্লার ক্ষীণ শব্দ কারণ উঠোনে যারা জড় হয়ে ফিসফিস করে আলাপ করছিল এতক্ষণ, তাদের গলা স্পষ্ট হয়ে উঠল।

বন্দুকের দরকার হবে না মনে হচ্ছে, —বলে দোর খুলে বারান্দায় দাঁড়িয়ে টর্চের আলো ফেললাম। আমাদের গোমস্তা ফণী সরকারকে ঘিরে কতকগুলো লোক উঠোনে দাঁড়িয়ে আলোচনা করছে।

বন্দুক রেখে সুরনাথদা বেরিয়ে এলেন। বললেন, কি হয়েছে সরকার? মুখে মাথায় কাপড় জড়ানো লোকটিকে টানতে টানতে উঠোনে নিয়ে এসেছে ততক্ষণে।

এ লোকটা কে সরকারমশায়? প্রশ্ন করলাম।

বলছি সব, আপনারা ঘরে যান, বলল ফণী সরকার।

আবার দূরের হল্লার শব্দ কানে এল। হাতের ইশারা করে লোকটাকে ফণী সরকার বলল, যা বললাম তাই করো, দেরি করো না বাপু।

তারপর বারান্দায় উঠে এল। তার সঙ্গে এল আমাদের পাইকটি। এতক্ষণ লক্ষ করিনি তাকে।

লণ্ঠন জ্বেলে ফণী সরকার চাটাই পেতে বসলেন মেঝেতে। সেই স্তিমিত আলোতে তাঁর মুখে এক রোমহর্ষক কাহিনি শোনা গেল।

কচুয়ার অন্য একটি পাড়াতে সন্ধ্যা রাতে এক জোড়া খুন হয়েছে। মুখে মাথায় কাপড় জড়ানো লোকটি খুন করেছে তার বিধবা ভগ্নি ও তার উপপতিকে দা দিয়ে কুপিয়ে। বাড়ির কাছে এক ডোবার ধারে ঝোপের পাশে দু'জনকে দেখতে পেয়ে প্রথমে উপপতিকে কেটে ফেলে। উলঙ্গ অবস্থায় বিধবা ভগ্নি পালিয়ে যাচ্ছিল, তাকে ধরে গলা টিপে মেরে কুপিয়ে কেটে ফেলে। ডোবার মধ্যে দুটি শব ফেলে দিয়ে লোকটি পালিয়ে এ পাড়ায় তার ভায়রার বাড়িতে এসেছিল থানায় যাবে কি না পরামর্শ নিতে। থানায় স্বীকারোক্তি দিলে ফাঁসি অবধারিত, ভায়রা পরামর্শ দিয়েছে ফেরারি হতে। ইতিমধ্যে খুনের কথা পাড়ায় জানাজানি হয়ে গিয়েছিল। লোক জমতে শুরু করেছিল ভায়রার বাড়িতে। একদল খুনিকে ধরে থানায় দিতে চায়, অন্য দল বলে পালিয়ে যেতে। নিজেদের মধ্যে গোলযোগ দেখে আমাকে ঘুম থেকে তুলে পরামর্শ চাইল। (ক্রমশ)

ভাঙা পথের রাঙা ধুলায়

সুখরঞ্জন সেনগুপ্ত

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

নতুন সদস্যেরা হকসাহেবের কাছে এসে তাঁদের পরিচয় দিলেন। প্রায় আধঘণ্টা হকসাহেব হাউসে ছিলেন। ওই দিনই বিকালে ফজলুল হকসাহেব এক সাংঘাতিক কাণ্ড করে বসলেন। তিনি এলগিন রোডে সুভাষচন্দ্রের পৈতৃক বাড়িতে গেলেন। তিনি 'ড্রাইভওয়ে' দিয়ে হেঁটে বাড়ির একতলার সিঁড়িতে পা দিতেই শরৎচন্দ্র বসুর পত্নী বিভাবতী বসু তাঁকে পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করলেন। বিভাবতী বসুকে তিনি এই প্রথম বিধবার বেশে দেখে একবার চোখ কচলালেন। তারপর এই পরিবারের অন্যান্য বউ ও মেয়েরা হকসাহেবকে প্রণাম করার জন্য হুড়োহুড়ি করতে লাগলেন। তারপর তিনি গেলেন সুভাষচন্দ্রের সেই কক্ষটিতে, যেখান থেকে ১৯৪১ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে 'অসুস্থ' সুভাষচন্দ্রের 'নিষ্ক্রমণ' হয়েছিল এক কাবুলিওয়ালার ছদ্মবেশে। সুভাষচন্দ্রের ঘরে গিয়ে তিনি স্মৃতির ভারে ভেঙে পড়লেন। সেই ১৯৪১ সালে শেষবারের মতো ত্যাগ করা শয্যা, তার ওপরে বালিশে হেলান দিয়ে রাখা মায়ের সঙ্গে সুভাষচন্দ্রের একটি ফোটোগ্রাফ। হকসাহেব অশ্রুজলে আপ্লুত হলেন। এলগিন রোডের দু'দিকের ফুটপাথে তখন সহস্রাধিক লোকের ভিড়। নীচে যখন নেমে এলেন, তখন সন্ধ্যা হয়ে আসছিল। সমবেত জনতার উদ্দেশে হকসাহেব তাঁর বক্তৃতায় জিন্না ও মুসলিম লিগের দ্বিজাতিতত্ত্ব নীতির আদ্যশ্রাদ্ধ করলেন। দেশভাগের জন্য মুসলিম লিগের হিংসা ও বিদ্বেষকে দায়ী করলেন। তারপর বললেন, 'এই কলকাতাই আমার আসল জন্মভূমি, আমার তীর্থক্ষেত্র, আমার যৌবনের উপবন, বার্ধক্যের বারাণসী।' এই অনুষ্ঠানে কলকাতার সমস্ত খবরের কাগজের ও নিউজ এজেন্সির লোকেরা উপস্থিত ছিলেন। হকসাহেব চলে যাওয়ার পর সুভাষচন্দ্রের তিন ভ্রাতুষ্পুত্র অমিয়, শিশির ও অরবিন্দ সব রিপোর্টারদের চা খাওয়ার জন্য ডাকলেন। চা খাওয়ার সময় তিন ভাই করজোড়ে রিপোর্টারদের এই অনুরোধ করলেন—'হকসাহেব এমনিতেই ভয়ানক আবেগপ্রবণ লোক। তারপর আমাদের বাড়ির সঙ্গে তাঁর দীর্ঘদিনের সম্পর্ক। আবেগের বশে তিনি অনেক কিছু বলেছেন। আপনারা ওঁকে বাঁচিয়ে রিপোর্ট করবেন, এই আমাদের অনুরোধ।' কিন্তু একটি সংবাদপত্র ও একজন রিপোর্টার ছাড়া আর সকলে এই অনুরোধ রেখেছিলেন। যিনি এই অনুরোধ রাখেননি, তিনি ছিলেন 'হিন্দুস্থান স্ট্যান্ডার্ড' (The Hindusthan Standard) পত্রিকার রিপোর্টার অমিতাভ দাশগুপ্ত। হকসাহেব ঢাকায় ফিরেই রাজনৈতিক সংকটের মুখে পড়লেন। করাচি, লাহোর ও ঢাকার মুসলিম লিগ প্রভাবিত খবরের কাগজগুলি তাঁর বিরুদ্ধে 'দেশদ্রোহিতার' অভিযোগ আনল। এইরূপ অবস্থাতেই কলকাতার 'হিন্দুস্থান স্ট্যান্ডার্ড' পত্রিকায় প্রকাশিত এলগিন রোডে সুভাষচন্দ্রের বাড়িতে দেওয়া হকসাহেবের বক্তৃতা পুনর্মুদ্রিত হল। এই উত্তপ্ত পরিস্থিতির মধ্যে 'নিউইয়র্ক টাইমস' পত্রিকার সেই সময়কার বিখ্যাত এক সাংবাদিক (নামটা এখন মনে নেই) ঢাকায় হকসাহেবের একটি 'ইন্টারভিউ' নিলেন। এই 'ইন্টারভিউ'র প্রেক্ষাপট ছিল হকসাহেবের কলকাতা সফর ও তাঁর বক্তৃতা। ওই সাক্ষাৎকারে হকসাহেব যা বলেছিলেন, তা আমার স্মৃতি থেকে বলছি। তাঁর বক্তব্য ছিল এরকম ঃ 'ভারতের সঙ্গে সম্পর্কের ক্ষেত্রে পূর্ববঙ্গের প্রাদেশিক সরকারকে আলাদা অধিকার দিতে হবে। সেটা সামগ্রিকভাবে পাকিস্তানের পররাষ্ট্র নীতির দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হলে চলবে না যেহেতু পাকিস্তান ভারতের মতোই কমনওয়েলথের সদস্য, সেহেতু কমনওয়েলথ সম্পর্কটি পররাষ্ট্র দফতর থেকে আলাদা করে পূর্ববঙ্গের অধিকারে দিতে হবে। মনে রাখতে হবে পূর্ববঙ্গের ভৌগোলিক অবস্থান। তার তিনদিকে ভারত, আর একদিকে সমুদ্র। পূর্ববঙ্গ থেকে তেরশো মাইল ভারতীয় ভূখণ্ডের ওপার থেকে পাকিস্তানের কেন্দ্রীয়সরকার প্রদেশের যোগাযোগ ব্যবস্থাও নিয়ন্ত্রণ করতে পারবে না। যোগাযোগ ব্যবস্থাকেও প্রাদেশিক সরকারের এক্তিয়ারে দিয়ে দেওয়া উচিত। ক্ষমতা হস্তান্তর ও দেশবিভাগের সময় যে প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন ছিল, তা পূর্ববঙ্গের ক্ষেত্রে বিশেষভাবে প্রযোজ্য এবং মনে রাখতে হবে যে পাকিস্তানের কোনও নিজস্ব সংবিধান নেই।' 'নিউইয়র্ক টাইমস' (The New York

Times) পত্রিকার সঙ্গে ফজলুল হকসাহেবের এই সাক্ষাৎকারের বিবরণ সে সময় এই উপমহাদেশের সমস্ত খবরের কাগজে ব্যানার হেডলাইনে ছাপা হয়েছিল। 'রয়টার', 'নিউইয়র্ক টাইমস' এরা এই সাক্ষাৎকারের বিষয়কে সবিস্তারে সারা পৃথিবীতে প্রচার করেছিল। হকসাহেবের ওই ঐতিহাসিক সাক্ষাৎকারের বাংলা তর্জমা করতে আমার টানা তিন ঘণ্টারও বেশি সময় লেগেছিল।

হকসাহেবের কলকাতার বক্তৃতা ও তার দু'সপ্তাহের মধ্যে 'নিউইয়র্ক টাইমস' পত্রিকায় তাঁর ওই সাক্ষাৎকার প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে পাকিস্তানের দ্বিতীয় বাঙালি প্রধানমন্ত্রী বগুড়ার নবাব মহম্মদ আলি হকসাহেবকে করাচিতে জরুরি তলব করলেন। তখনও পাকিস্তানের নিজস্ব বিমানকোম্পানি 'পাকিস্তান ইন্টারন্যাশনাল এয়ারলাইনস' চালু হয়নি। ফলে ঢাকা ও করাচির মধ্যে কলকাতা বিমানঘাঁটি দিয়ে যাতায়াত করতে হত। ঢাকা থেকে করাচি যাওয়ার পথে হকসাহেব দমদম বিমানঘাঁটিতে সাংবাদিকদের কিছুই বললেন না। প্রধানমন্ত্রী মহম্মদ আলির সঙ্গে হকসাহেবের দু'দিন বৈঠক হয়। মহম্মদ আলির সঙ্গে তাঁর খরতপ্ত বৈঠক সম্পর্কে 'টাইমস অব ইন্ডিয়া'র (The Times of India) ও 'স্টেটসম্যান' (The Statesman) পত্রিকার করাচির সংবাদদাতারা খুব চমৎকার রিপোর্ট করেছিলেন। 'টাইমস অব ইন্ডিয়া'র করাচির সংবাদদাতা মনজুরুল হক (Manzural Huq) সবচেয়ে ভাল রিপোর্ট করেছিলেন। ওই দুটি পত্রিকার যে-বিবরণ আমার স্মৃতিতে আছে, তা হল—প্রথমদিকের বৈঠকে মহম্মদ আলি এলগিন রোডে সুভাষচন্দ্রের বাড়িতে তাঁর বক্তৃতার প্রসঙ্গ তোলেন। ওই সময় মহম্মদ আলি কলকাতার The Hindusthan Standard পত্রিকাটি হকসাহেবের সামনে তুলে ধরেন। হকসাহেব জবাবে বলেন, 'একথা ঠিক যে, সুভাষের বাড়িতে গিয়ে আমি আবেগবিহ্বল হয়ে পড়েছিলাম। তবে একথাও ঠিক যে, আমি কখনও দ্বিজাতিতত্ত্বের নীতি বিশ্বাস করিনি। এখনও করি না ও কখনওই করব না।' পরের দিন মহম্মদ আলির সঙ্গে তাঁর বৈঠকটি ছিল সাংঘাতিক বাকবিতন্ডাপূর্ণ। সেদিন মহম্মদ আলি তাঁর ঘরে The New York Times-এর সংশ্লিষ্ট সাংবাদিককে বসিয়ে রেখেছিলেন। একজন বিদেশি বাইরের লোকের সামনে মহম্মদ আলি হকসাহেবকে তাঁর সাক্ষাৎকারের বয়ান নিয়ে জেরা করতে আরম্ভ করলেন। ৭৮ বছর বয়স্ক হকসাহেব খেপে গিয়ে মহম্মদ আলিকে নাকি বাংলায় এই কথা বলেছিলেন, 'বাপের বয়সি লোকের সঙ্গে কীভাবে কথা বলতে হয়, তা তুমি ভুলে গিয়েছ। অন্তত এটা তোমার মনে রাখা উচিত ছিল যে তোমার কাকা আমার ব্যক্তিগত বন্ধু ছিলেন।' মহম্মদ আলির সঙ্গে দ্বিতীয় দিনের বৈঠকেই ফজলুল হক বুঝে নিয়েছিলেন যে, তিনি বরখাস্ত হচ্ছেন। পরের দিন তিনি ঢাকার পথে দুপুরবেলা কলকাতা পৌঁছুলেন। দমদমে তাঁর আত্মীয়স্বজনেরা তাঁর সঙ্গে দেখা করতে গেলেন। কলকাতার রিপোর্টারদের তিনি বললেন, 'মহম্মদ আলি আমার মুখ সেলাই কইরা দিছে।' বিকালে ঢাকা পৌঁছে তিনি জানতে পারলেন, তাঁকে বরখাস্ত করার প্রস্তুতি চলছে। কিন্তু বাদ সাধলেন গভর্নর চৌধুরি খালিকুজ্জামান। তিনি পাকিস্তানের গভর্নর গোলাম মহম্মদ ও প্রধানমন্ত্রী মহম্মদ আলিকে সাফ জানিয়ে দিলেন যে তিনি ফজলুল হকের বরখাস্ত করার কাগজে সই করবেন না। হকসাহেবকে বরখাস্ত করার আগে তাঁকে গভর্নরের পদ থেকে অব্যহতি দেওয়া হোক। ফলে হকসাহেবকে বরখাস্ত করার শাসনতান্ত্রিক পদ্ধতি দু'দিন পিছিয়ে গেল। পাকিস্তানের প্রতিরক্ষা দফতরের সচিব মেজর জেনারেল ইস্কান্দার মির্জা পূর্ববঙ্গের গভর্নর হতে রাজি হলেন। ইস্কান্দার মির্জাকে নিয়ে পাকিস্তান বিমানবাহিনীর বিমান ঢাকা এল। মির্জাসাহেব ঢাকা পৌঁছনোর সঙ্গে সঙ্গে চৌধুরী খালিকুজ্জামানকে অব্যাহতি দিয়ে ইস্কান্দার মির্জাকে গভর্নর হিসাবে নিয়োগের ঘোষণা করা হল করাচি থেকে। ইস্কান্দার মির্জা ঢাকায় গভর্নরহাউসে পৌঁছনোর সঙ্গে সঙ্গে খালিকুজ্জামান পদত্যাগ করলেন। বিকালে কলকাতার রিপোর্টাররা খবর পেল চৌধুরি খালিকুজ্জামান দমদম বিমানঘাঁটিতে ট্রানজিট লাউঞ্জে অপেক্ষা করছেন করাচিগামী কোনও একটি বিমান ধরবার জন্য। রিপোর্টাররা ছুটে গেল দমদমে। কিন্তু খালিকুজ্জামান সাহেব কিছুই বলতে চাইলেন না। তিনি পাল্টা জানতে চাইলেন 'বিধান কেমন আছে?' খালিকুজ্জামানসাহেব দেশবন্ধুর স্বরাজ্য দলের সদস্য হিসাবে ডা. বিধানচন্দ্র রায়ের সহকর্মী ছিলেন। কলকাতার খবরের কাগজগুলিতে সন্ধ্যাবেলা খবর এল যে পাকিস্তান সরকার হকসাহেবকে বরখাস্ত করে পূর্ববঙ্গের মন্ত্রিসভা ভেঙে দিয়েছেন। হকসাহেবের বিরুদ্ধে 'দেশদ্রোহিতা ও পাকিস্তানের মূল কাঠামোকে বিদেশি রাষ্ট্রে গিয়ে নিন্দা' করার অভিযোগ আনল পাকিস্তান সরকার। তবে যেহেতু হকসাহেব বৃদ্ধ, তাই তাঁকে 'গ্রেফতার না করে গৃহবন্দি' করে রাখল পাকিস্তান সরকার। গভর্নর ইস্কান্দার মির্জা সারা পূর্ববঙ্গে ১৪৪ ধারা জারি করে সভা-সমাবেশ নিষিদ্ধ করে দিলেন। কিন্তু তেমন করে বিক্ষোভ-প্রতিবাদ দানা বাঁধতে পারল না। কারণ ওই সময়ে মৌলানা ভাসানি "বিশ্ব শান্তি কংগ্রেসে" যোগ দিতে পূর্ব জার্মানিতে ছিলেন। আর সুরাবর্দীসাহেব চিকিৎসার জন্য সুইজারল্যান্ড পাড়ি দিয়েছিলেন।

অবিভক্ত বঙ্গের আমল থেকেই বাংলার রাজনীতিতে হকসাহেব ও সুরাবর্দীর ব্যক্তিগত সম্পর্ক খুবই খারাপ ছিল। সুইজারল্যান্ড রওনা হওয়ার মুখে করাচি বিমানঘাঁটিতে রিপোর্টাররা পূর্ববঙ্গের পরিস্থিতি নিয়ে সুরাবর্দীকে এই প্রশ্ন করেছিলেন, Have you disowned Huq Saheb? সুরাবর্দী সরাসরি জবাব এড়িয়ে মন্তব্য করলেন, When did I own him? কিন্তু ইতিহাসের প্রয়োজনে গত অর্ধশতাব্দীতে The New York Times-এর সাংবাদিকের সঙ্গে সাক্ষাৎকারে ফজলুল হকসাহেব পূর্ববঙ্গের স্বায়ত্তশাসন ও ভারতের সঙ্গে সম্পর্কের বিষয়ে যা যা বলেছিলেন, তার যথার্থ বিশ্লেষণ হয়নি। কেবলমাত্র শেখ মুজিবর রহমান ১৯৬৬ সালে পূর্ববঙ্গের স্বায়ত্তশাসনের জন্য তাঁর বিখ্যাত প্রচারপুস্তিকা "আমাদের বাঁচার দাবি—৬ দফা দাবি"-তে হকসাহেবের ওইসব উক্তির আংশিক উল্লেখ করে হকসাহেবকে "বাঙালির নয়নমণি" আখ্যা দিয়েছেন। হকসাহেবের ওই ঐতিহাসিক ইন্টারভিউতে ইংরাজদের ক্ষমতা হস্তান্তরের পর ও পরবর্তীকালের রাজনৈতিক পরিস্থিতি যেভাবে বিধৃত হয়েছে, তা যদি পাকিস্তানের শাসকেরা অনুসরণ করতেন, তাহলে পাকিস্তান ভেঙে যেত না এবং এই উপমহাদেশের কোটি কোটি মানুষকে বাংলাদেশের অভ্যুত্থানের ট্রাজেডির সম্মুখীন হতে হত না।

পূর্ববঙ্গে বলতে গেলে এক আধা-সামরিক শাসন কায়েম করে ও হকসাহেবকে গৃহবন্দি রেখে গভর্নর ইস্কান্দার মির্জা করাচি যাওয়ার পথে হঠাৎ একদিন বিকালে দমদম বিমানঘাঁটিতে নামলেন ঢাকা থেকে। তাঁর সঙ্গে ছিলেন পূর্ববঙ্গের পাকিস্তানি বাহিনীর জি-ও-সি মেজর জেনারেল উমরাও খান। কড়া নিরাপত্তার মধ্যে কলকাতার রিপোর্টাররা মির্জাসাহেবের মুখোমুখি হলেন। ইস্কান্দার মির্জাকে এই প্রথম দেখলাম। জন্মসূত্রে মুর্শিদাবাদ নবাব পরিবারের সন্তান হলেও তাঁর নীল চোখ ও তাঁকে একেবারে সাহেবের মতো দেখতে। তিনি স্যান্ডহার্স্টের ট্রেনিং পাওয়া সামরিক অফিসার হলেও অবিভক্ত ভারতবর্ষে খোদ ভাইসরয়ের নিয়ন্ত্রণাধীন পলিটিক্যাল ডিপার্টমেন্টের অফিসার ছিলেন। বেশিরভাগ সময়েই ছিলেন ওড়িশার বিভিন্ন দেশীয় রাজ্যের 'পলিটিক্যাল এজেন্ট'। কলকাতার সাংবাদিকেরা তাঁকে বিভিন্ন উত্তপ্ত প্রশ্ন করেছিলেন। একটি এরকম প্রশ্ন ছিল যে যেহেতু তিনি মিলিটারি অফিসার, সেহেতু তিনি পূর্ববঙ্গে এক "ভীতির রাজত্ব" কায়েম করেছেন। ইস্কান্দার মির্জা জবাব দিয়েছিলেন, Do I look less peaceful than you? পাকিস্তানি ঐতিহাসিকেরা ইস্কান্দার মির্জাকে কীভাবে বিশ্লেষণ করেছেন আমার জানা নেই। তবে এটা ঘটনা যে ১৯৫৪ সাল থেকে ইস্কান্দার পাকিস্তানি রাজনীতিতে প্রায় ছ'বছর আধিপত্য বিস্তার করেছিলেন। এই ছ'বছরে ভারতের সঙ্গে উন্নততর সম্পর্ক গড়ে তুলতে তাঁর উল্লেখযোগ্য অবদান ছিল। তাঁরই উদ্যোগে সীমান্ত গান্ধী খান আবদুল গফফর খান ও তাঁর দাদা ডা. খানসাহেবের কারামুক্তি ঘটেছিল ১৯৫৪ সালের শেষদিকে। ভারতীয় পার্লামেন্ট তুমুল হর্ষধ্বনির মধ্যে পাকিস্তান সরকারের এই সিদ্ধান্তকে অভিনন্দিত করেছিল। সে সময় প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহরু অত্যন্ত আবেগের সঙ্গে লোকসভায় একটি বিবৃতি দিয়েছিলেন। ইস্কান্দার পাকিস্তানি রাজনীতিতে আসার জন্য খান ভ্রাতৃদ্বয়কে সনির্বন্ধ অনুরোধ করতে লাগলেন। সীমান্ত গান্ধী ওই অনুরোধ অগ্রাহ্য করলেন। কিন্তু অগ্রজ ডা. খানসাহেব সাড়া দিলেন। ১৯৫৫ সালের শেষদিকে গভর্নর জেনারেল গোলাম মহম্মদের নির্দেশে প্রধানমন্ত্রী বগুড়ার মহম্মদ আলি তাঁর মন্ত্রিসভার পুনর্গঠন করে ইস্কান্দার মির্জা, ডা. খানসাহেব ও শাহিদ সুরাবর্দীকে মন্ত্রিসভায় অন্তর্ভুক্ত করলেন। মির্জাসাহেব স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী, সুরাবর্দী আইন ও বিচার এবং ডা. খানসাহেব রেল ও যোগাযোগ মন্ত্রী হলেন।

কাশ্মীর নিয়ে বিরোধ যে অবস্থায়ই থাকুক না কেন, ভারত-পাকিস্তান সম্পর্কের এক নতুন উন্মেষ ঘটানোর জন্য জওহরলাল তাঁর ব্যক্তিগত বন্ধু পাকিস্তানের গভর্নর জেনারেল গোলাম মহম্মদকে ১৯৫৬ সালের ২৬ জানুয়ারি ভারতের প্রজাতন্ত্র দিবসের অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি হিসাবে বরণ করার সিদ্ধান্ত নিলেন। গোলাম মহম্মদ তখন খুবই অসুস্থ। হাঁটতে পারেন না ও বেশিক্ষণ দাঁড়িয়েও থাকতে পারেন না। দিল্লি বিমানঘাঁটিতে পাকিস্তান বিমানবাহিনীর বিমান থেকে ধরাধরি করে নামিয়ে হুইল চেয়ারে বসানো হল। তাঁর সঙ্গে এলেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ইস্কান্দার মির্জা ও রেলমন্ত্রী ডা. খানসাহেব। ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের এক দুর্ধর্ষ সেনানী ডা. খানসাহেবের কাছে গিয়ে দাঁড়াতেই রাষ্ট্রপতি ড. রাজেন্দ্রপ্রসাদ ও নেহরুর চোখের জল গড়িয়ে পড়ল। চোখের জলের মধ্যেই তাঁরা একে অপরকে আলিঙ্গন করলেন। নেহরু নিজে গোলাম মহম্মদের হুইল চেয়ার টেনে বিমানঘাঁটির 'স্যালুটিং বেস'-এ (saluting base) নিয়ে এলেন। হুইল চেয়ারে বসে গোলাম মহম্মদ তাঁর সম্মানার্থে তোপধ্বনি শুনলেন ও ভারতের তিন বাহিনীর সেনানীদের সামরিক অভিবাদন গ্রহণ করলেন। বিস্ময়বিস্ফারিত নেত্রে ইস্কান্দার মির্জা এই অভূতপূর্ব দৃশ্য দেখলেন। গোলাম মহম্মদ প্রায় এক সপ্তাহ দিল্লিতে ছিলেন। গোলাম মহম্মদ ও ডা. খানসাহেবের কাছে এই সফর ছিল এক পুনর্মিলন। দেশ বিভাগের আগে গোলাম মহম্মদ দিল্লি সেক্রেটারিয়েটে নর্থ

ব্লকে অর্থ দপ্তরে দীর্ঘদিন কাজ করেছেন। তাঁর অগণিত হিন্দু সহকর্মী সপরিবারে এসে তাঁর সঙ্গে দেখা করেছেন। বিভিন্ন রাজ্য থেকে স্বাধীনতাসংগ্রামের সহযোদ্ধারা এসে ডা. খান সাহেবের সঙ্গে দেখা করেছেন। ফরিদাবাদে আশ্রয় নেওয়া পাঞ্জাব ও সীমান্ত প্রদেশের শিখ ও হিন্দু শরণার্থীরা ডা. খান সাহেবদের ফরিদাবাদে নিয়ে গেলেন। সঙ্গে গেলেন ইস্কান্দার মির্জা। সেদিন 'স্টেটসম্যান' পত্রিকা দু' কলম জুড়ে এক অসাধারণ মর্মস্পর্শী রিপোর্ট করেছিল। ফরিদাবাদে ডা. খান সাহেবের সংবর্ধনা সভায় লাহোর, রাওয়ালপিন্ডি, মন্টগোমারি, লয়ালপুর, শেখপুরা, গুজরানওয়ালা, পেশোয়ার, কোহাটের শিখ ও হিন্দু পরিবারের মেয়ে বউরা ডা. খানসাহেবের পায়ে লুটিয়ে পড়েছিলেন। অশ্রুজলে তাঁরা তাঁকে স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন কীভাবে তিনি তাঁর পাঠান খুদা-ই-খিদমতগারদের নিয়ে ওই হাজার হাজার মানুষকে নিরাপদে ভারতসীমান্তে পৌঁছে দিয়েছেন। শিখ ও হিন্দুরা সম্মিলিতভাবে ডা. খানসাহেবের পা থেকে জুতো সরিয়ে তাঁর পদচুম্বন করেছেন, তাঁর পা কপালে ও বুকে স্পর্শ করেছেন। অপলক দৃষ্টিতে ইস্কান্দার মির্জা এই দৃশ্য দেখেছেন।

কিন্তু সুসম্পর্কের এই রেশ বেশিদিন স্থায়ী হল না। ১৯৫৬ সালের মার্চ-এপ্রিল নাগাদ গভর্নর জেনারেল গোলাম মহম্মদ খুবই অসুস্থ হয়ে পড়লেন। ইস্কান্দার মির্জা ডেপুটি গভর্নর জেনারেলের পদ পেলেন। এই টালমাটাল অবস্থায় প্রধানমন্ত্রী মহম্মদ আলি ঢাকায় ছুটে এলেন তাঁর পিতৃবন্ধু ফজলুল হকসাহেবের কাছে। হকসাহেবকে তিনি 'দেশদ্রোহিতার' অভিযোগ থেকে অব্যাহতি দিয়ে পাকিস্তানের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর পদে নিযুক্ত করলেন। কিন্তু এপ্রিল ও মে (১৯৫৬) এই স্বল্পসময়ের মধ্যে পাকিস্তানে তিনজন প্রধানমন্ত্রীর বদল হল। বগুড়ার মহম্মদ আলি প্রধানমন্ত্রিত্ব ছেড়ে দিয়ে আমেরিকা চলে গেলেন। নতুন প্রধানমন্ত্রী হলেন অর্থমন্ত্রী চৌধুরী মহম্মদ আলি। কিন্তু তিন সপ্তাহের মধ্যে তিনি পদত্যাগ করলেন। ইতিমধ্যে সুরাবর্দীসাহেব আইনমন্ত্রী হিসাবে পাকিস্তানের নতুন সংবিধান চূড়ান্ত করে ফেলেছেন। যদিও গণপরিষদে তার চূড়ান্ত অনুমোদন বাকি ছিল, তবু সংবিধানের বিধি অনুযায়ী গণপরিষদ ইস্কান্দার মির্জাকে পাকিস্তানের প্রথম প্রেসিডেন্ট মনোনীত করল। চৌধুরী মহম্মদ আলি পদত্যাগ করলে ইসমাইল ইব্রাহিম চুন্দ্রিগড় দেশের প্রধানমন্ত্রী হলেন। তিনিও স্বাস্থ্যের কারণে এক মাসের মধ্যে পদত্যাগ করে লন্ডন চলে গেলেন। এবার প্রধানমন্ত্রিত্বের শিকে ছিঁড়ে পড়ল শাহিদ সুরাবর্দীর ওপর। খুব ধৈর্যসহকারে সুরাবর্দীসাহেব এই দিনটির অপেক্ষায় ছিলেন। কিন্তু বাদ সাধলেন প্রেসিডেন্ট ইস্কান্দার মির্জা। তিনি সুরাবর্দীকে আটকাবার জন্য প্রকাশ্যে এই বিবৃতি দিলেন, 'I can allow H. S. Suhrawardy to become the Prime Minister only over my dead body'। কিন্তু শহিদ সুরাবর্দী এক সময়কার বঙ্গরাজনীতির চতুর খেলোয়াড়। ফলে প্রথম চালেই তিনি তাঁর প্রেসিডেন্ট ইস্কান্দার মির্জাকে কিস্তিমাৎ করে গণ পরিষদ-সদস্যদের সংখ্যাগরিষ্ঠের ভোটে পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী হলেন। ১৯৫৬ সালের জুন মাসে তিনি যখন প্রধানমন্ত্রী হলেন, তখন আমেরিকার Time ম্যাগাজিনে শাহিদ সুরাবর্দীর এক বৃহৎ ছবিসহ Cover Storyটি ছিল এই ভাষায় 'Prime Minister on the President's living body!' Time সাপ্তাহিকের ওই সংখ্যায় সুরাবর্দীসাহেবের করাচির বাড়ি 'লাখাম হাউস'-এর (Lakham House) ছবিও ছাপা হয়েছিল। লাখাম গ্রামটি মেদিনীপুর শহরের দু'তিন কিলোমিটারের মধ্যে। সুরাবর্দীর পিতৃপুরুষেরা ওই গ্রামে বসতি স্থাপন করেছিলেন। মেদিনীপুরের গ্রামের নামে তাঁর করাচির বাড়ির নাম রাখার ঘটনা তাঁর বাঙালিসুলভ মমত্ববোধ ও হৃদয়াবেগের পরিচয় বহন করে। ওই বাড়ির এক সুবৃহৎ হলঘরের ছবিও ছাপা হয়েছিল। এই হলঘরটি জমিদারি সেরেস্তার মতো গদি-ফরাসে সুসজ্জিত ছিল। দশ-বারোটি তাকিয়া ইতস্তত ছড়ানো। আট-দশটি টেলিফোন ছিল। বিস্তৃত ফরাসের ওপর পাজামা-পাঞ্জাবি পরা সুরাবর্দী সাহেব একটা বড় তাকিয়ায় হেলান দিয়ে জমিদারি স্টাইলে হাত-পা ছড়িয়ে ফোনে কথা বলছেন, এরকম একটি ছবি Time পত্রিকাটি ছেপেছিল। পরে ঢাকার লোকদের কাছে শুনেছি, ইংরাজি ও বাংলায় 'লাখাম হাউস' শব্দ দুটি খুব বড় আকারে বাড়ির গায়ে খোদাই ছিল। উর্দুর নামগন্ধ ছিল না। সুরাবর্দীসাহেবের নিজের নামও বাংলা ও ইংরাজিতে লেখা ছিল। করাচিতে কোনও বাঙালি নিরাপদ থাকার জায়গা না পেলে সুরাবর্দীসাহেবের বাড়িতে নিখরচায় এক সপ্তাহ থাকতে পারতেন। খাওয়ার ব্যবস্থা ছিল না। একমাত্র শর্ত ছিল অতিথিকে অবশ্যই বাংলাভাষী হতে হবে। যা হোক, সুরাবর্দী মাত্র তেরো মাস পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী ছিলেন।

প্রধানমন্ত্রী হিসাবে তিনিই পাকিস্তানকে প্রথম সংবিধান দিয়ে গিয়েছিলেন। ইতিহাসে যেটা ১৯৫৬ সালের সংবিধান নামে পরিচিত। তাঁর প্রধানমন্ত্রিত্বের তেরো মাসকাল এই উপমহাদেশের ও আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে খুবই গুরুত্বপূর্ণ ছিল। তিনি বঙ্গরাজনীতিতে তাঁর অনুগামী ময়মনসিংয়ের হামিদুল হক চৌধুরীকে দেশের পররাষ্ট্র মন্ত্রীর পদে নিযুক্ত করেন। ১৯৫৬ সালের অক্টোবরের শেষে মিশরের প্রেসিডেন্ট নাসের সুয়েজখাল নিয়ন্ত্রক ইঙ্গ-ফরাসি কোম্পানি

জাতীয়করণ করলে সুরাবর্দী এই জাতীয়করণের তীব্র বিরোধিতা করলেন। ভারতের পক্ষে জওহরলাল নেহরু জাতীয়করণকে সমর্থন করে নাসেরকে অভিনন্দন জানালেন। সুরাবর্দীর নির্দেশে পররাষ্ট্রমন্ত্রী হামিদুল হক চৌধুরী ওই সময় লন্ডনে সুয়েজ খাল ব্যবহারকারী ১৬টি দেশের সম্মেলনে মিশর সরকারের জাতীয়করণের পদক্ষেপের নিন্দা করলেন। কেবল তাই নয়, নভেম্বর মাসে (১৯৫৬) ব্রিটেন ও ফ্রান্স মিশর আক্রমণ করলে পাকিস্তান তাতে পূর্ণ সমর্থন জানাল। কিন্তু আওয়ামি লিগের সভাপতি হিসাবে মৌলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানি তাঁর দলেরই প্রধানমন্ত্রী সুরাবর্দীর পররাষ্ট্র নীতির বিরোধিতায় অবতীর্ণ হলেন। আওয়ামি লিগে ভাঙন দেখা দিল। একদিকে সুরাবর্দী ও তাঁর একান্ত বিশ্বস্ত শেখ মুজিবর রহমান। অন্যদিকে মৌলানা ভাসানি ও মশিউর রহমানেরা। আওয়ামি লিগে যাঁরা কমিউনিস্ট ছিলেন, তাঁরা মৌলানা ভাসানির নেতৃত্বে পাকিস্তানের পশ্চিমী-ঘেঁষা পররাষ্ট্র নীতির বিরুদ্ধে সোচ্চার হলেন এবং ঢাকার রাস্তায় সুরাবর্দীর বিরুদ্ধে বিক্ষোভ মিছিল চলতে থাকল। এর পালটা জবাবে আওয়ামি লিগের সাধারণ সম্পাদক শেখ মুজিবর রহমান ঢাকার রমনা ময়দানে শাহিদ সুরাবর্দী ও তাঁর পররাষ্ট্র নীতির সমর্থনে এক ঐতিহাসিক জনসমাবেশ ঘটিয়ে ছিলেন। ওই সভায় বক্তৃতা দিয়ে চমৎকৃত সুরাবর্দী আওয়ামি লিগের ওপর ভাসানির প্রভাবকে প্রকাশ্যে চ্যালেঞ্জ জানালেন। (কলকাতার 'স্টেটসম্যান' পত্রিকা পরের দিনই প্রথম পাতায় খুব বড় করে ওই জনসভার ছবি ও রিপোর্ট ছেপেছিল)। সুরাবর্দীসাহেবের ওই জনসভা এই উপমহাদেশের রাজনৈতিক ইতিহাসে খুবই তাৎপর্যপূর্ণ ছিল। কারণ এর কয়েক মাস পরেই ১৯৫৭ সালের ফেব্রুয়ারি মাসের শেষে মৌলানা ভাসানি ময়মনসিংহ জেলার সন্তোষের মহারাজের কাগমারি প্রাঙ্গণে পূর্ববঙ্গের কমিউনিস্টদের নিয়ে এক জাতীয় সম্মেলনের আয়োজন করলেন। এই সম্মেলনে ভাসানি ভারতের বিভিন্ন সংবাদপত্রের বহু সাংবাদিককে কাগমারিতে আনিয়েছিলেন। তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিল 'হিন্দুস্থান টাইমস', 'টাইমস অব ইন্ডিয়া', 'হিন্দু' ও 'স্টেটসম্যান'। আরও একটি তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা ঘটেছিল এখানে। ব্রহ্মপুত্রের তীর থেকে কাগমারির প্রধান পথে সুরেন্দ্রনাথ, দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন, রবীন্দ্রনাথ, বিপিন পাল, সুভাষচন্দ্রের নামে তোরণ নির্মাণ করা হয়েছিল। কাগমারিতে রিপোর্ট করতে যাওয়া ভারতীয় সাংবাদিকদের মনে হয়েছিল 'কাগমারি সম্মেলনকে বাঙালি জাতীয়তাবাদের মোড়ক পরাবার একটা চেষ্টা' যা থেকে কাগমারি সম্মেলনের মধ্য দিয়ে আওয়ামি লিগ ভেঙে গেল। পাকিস্তানের রাজনীতিতে জন্ম নিল নতুন পার্টি 'ন্যাশনাল আওয়ামি পার্টি', ইংরাজিতে যার সংক্ষিপ্তরূপ ছিল NAP। কিছুদিনের মধ্যেই এই পার্টিতে যোগ দিলেন সীমান্ত গান্ধী খান আবদুল গফফর খান। ফলে ন্যাশনাল আওয়ামি পার্টির রাজনৈতিক মর্যাদা অনেক গুণ বেড়ে গেল।

আওয়ামি লিগ ভেঙে গেল। কিন্তু শাহিদ সুরাবর্দী পাকিস্তানের রাজনীতিতে তাঁর আধিপত্য বিস্তারের জন্য কাশ্মীর প্রশ্নে ভারতকে কূটনৈতিক মরণ-কামড়ে ক্ষতবিক্ষত করে দিতে লাগলেন। সুয়েজ খাল জাতীয়করণের প্রশ্নে, আমেরিকার সমর্থন নিয়ে মিশরের ওপর ইঙ্গ-ফরাসি ও ইজরায়েলি আক্রমণ ও হাঙ্গেরির 'স্বাধীনতা' ঘোষণার বিরুদ্ধে সোভিয়েত রাশিয়ার সামরিক অভিযান কয়েক সপ্তাহের ব্যবধানে ঘটায় ভারতের পররাষ্ট্র নীতি এক সাংঘাতিক অগ্নিপরীক্ষার মধ্যে এসে পড়ল। একদিকে জওহরলাল নেহরু প্রকাশ্যে হাঙ্গেরিতে সোভিয়েত রাশিয়ার গণহত্যাকে সমর্থন করলেন এবং অন্যদিকে তিনি মিশরের ওপর ইঙ্গ-ফরাসি আক্রমণকে বললেন, '...An unabashed naked aggression on the people of Egypt, the kind of which I never came across in my long long Foreign office experience...'। অন্যদিকে হাঙ্গেরির ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে ভারতের অন্যতম সমাজবাদী জননায়ক জয়প্রকাশ নারায়ণ, রাষ্ট্রসংঘ থেকে অবিলম্বে ভারতীয় প্রতিনিধিদের নেতা কৃষ্ণ মেননকে প্রত্যাহারের দাবি জানালেন। দিল্লিতে জয়প্রকাশ ওই সময় এক স্মরণীয় রাজনৈতিক বিবৃতিতে বলেছিলেন 'India's U. N. representative V. K. Krishna Menon does not represent a single Indian'।

সুরাবর্দীর তৎপরতায় ১৯৫৭ সালের গোড়াতেই নিরাপত্তা পরিষদে কাশ্মীর বিতর্কের সূত্রপাত হল। ইতিমধ্যে সুরাবর্দী হামিদুল হক চৌধুরীকে সরিয়ে তাঁর জায়গায় পররাষ্ট্রমন্ত্রীর পদে আনলেন পাঞ্জাবের প্রভাবশালী রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব স্যার মালিক ফিরোজ খান নুনকে। ফিরোজ খান নুনের নেতৃত্বে সুরাবর্দী এক শক্তিশালী পাকিস্তানি প্রতিনিধি দল পাঠালেন রাষ্ট্রপুঞ্জে। এই প্রতিনিধি দলের অন্যতম সদস্য ছিলেন সুরাবর্দীর অসামান্যা সুন্দরী, খুড়তুতো বোন শায়েস্তা সুরাবর্দী ইক্রামুল্লা। এই প্রতিনিধি দলের দুরন্ত কূটনৈতিক-সাফল্যের সামনে ভারতীয় প্রতিনিধিদের নেতা কৃষ্ণ মেনন ম্লান হয়ে গেলেন। তিনি একটানা ৭২ ঘণ্টা বক্তৃতা করে ও বক্তৃতার মধ্যে অচৈতন্য হয়ে যাওয়ার 'কৌশল' নিয়েও নিরাপত্তা পরিষদে কোনও ছাপ ফেলতে পারেননি। এমনকী সোভিয়েত প্রতিনিধি জেকব মালিক পর্যন্ত কৃষ্ণ মেননের বক্তৃতার সময় ঘুমিয়ে পড়তেন।

(এসব চুটকি সে সময়কার খবরের কাগজগুলিতে ফলাও করে ছাপা হয়েছে)।

'ভারত কাশ্মীরে তার পূর্ব প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করেছে'—পাকিস্তানের এই অভিযোগ ও 'ভারত অবিলম্বে কাশ্মীরে গণভোট নিক রাষ্ট্রসংঘের তদারকিতে'—পাকিস্তানের এই দাবির পক্ষে নিরাপত্তা পরিষদে ভারতের বিরুদ্ধে প্রস্তাব পাশ হলেও তার কার্যকারিতা নিষ্ফল হল সোভিয়েত ইউনিয়নের ভিটো প্রয়োগে। নিরাপত্তা পরিষদের ওই প্রস্তাবের ভাষা ভারতের বিরুদ্ধে এতই তীব্র ছিল যে, বিচলিত জওহরলাল নেহরুকে ১৯৫৭ সালের নির্বাচনী জনসভাগুলিতে বারংবার এই কথা বলতে হয়েছে যে, '...if anybody can prove that I have gone back to my promises on Kashmir I shall lay down my office as Prime Minister of India...'। কাশ্মীর বিতর্কের ওই তিক্ততার দিনগুলিতেও কিছু সুখস্মৃতি, কিছু মধুর সম্পর্কের মুগ্ধ দৃশ্য ওই সময়কার সংবাদপত্র পাঠকদের নজর এড়ায়নি। রাষ্ট্রসংঘের নিরাপত্তা পরিষদে ও পরে সাধারণ পরিষদে কাশ্মীর-বিতর্কের মধ্যেও রাষ্ট্রসংঘের কাফেটোরিয়াতে ও কফি কর্নারে পাকিস্তানি প্রতিনিধি শায়েস্তাকে দেখা যেত ভারতীয় প্রতিনিধিদের নেতা কৃষ্ণ মেননের সঙ্গে একান্তে ঘনিষ্ঠভাবে বসে থাকতে। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের এক সময়কার ভাইস-চ্যান্সেলার স্যার আবদাল্লা সুরাবর্দীর কন্যা কলকাতাতে লেখাপড়া শিখেছিলেন এবং চৌখশ ইংরেজি বলিয়ে-কইয়ে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের গোড়ায় কলকাতায় চাকুরি করতে এসে আই সি এস মহম্মদ ইক্রামুল্লা তাঁকে বিয়ে করেন। স্বাধীনতার পর ইক্রামুল্লা সাহেব লন্ডনে পাকিস্তানের প্রথম হাইকমিশনার পদে নিযুক্ত হয়েছিলেন। আর কৃষ্ণ মেনন ছিলেন লন্ডনে ভারতের প্রথম হাইকমিশনার। ব্রিটেনে অবিভক্ত ভারত সরকারের বিভিন্ন সম্পদ ও সম্পত্তির ভাগাভাগির ব্যাপারে ইক্রামুল্লা ও কৃষ্ণ মেননের মধ্যে প্রতিনিয়ত যোগাযোগ থাকত। ফলে শায়েস্তার সঙ্গেও কৃষ্ণ মেননের সৌহার্দ্য গড়ে ওঠে। ইক্রামুল্লার মৃত্যুর পর শায়েস্তা লন্ডনেই পাকাপাকি-ভাবে বসবাস করতে থাকেন। এবং কৃষ্ণ মেননের সঙ্গে তাঁর ব্যক্তিগত সম্পর্ক অক্ষুণ্ণ থাকে। রাষ্ট্রসংঘের সাধারণ-পরিষদে ভারতীয় পক্ষের কোনও বক্তব্যের জবাবে শায়েস্তা পাকিস্তানি বক্তব্য পেশ করলে কৃষ্ণ মেনন সহাস্যে বলে উঠতেন '...then a lady is the last word...'। প্রৌঢ়া শায়েস্তা অর্ধেক চোখে কৃষ্ণ মেননের দিকে চেয়ে আরক্তিম মুখে বসে পড়তেন। ভারতীয় ও পাকিস্তানি সাংবাদিকদের চোখে এই দৃশ্য এড়িয়ে যেত না। তাঁরা এই ঘটনা রিপোর্ট করলেন।

ঠিক এই সময়ে যখন ভারত ও পাকিস্তান কাশ্মীর প্রশ্নে এক তিক্ততম বিতর্কে লিপ্ত, সেই সময়ে স্পেনের মাদ্রিদ বিমানবন্দরের একটি মধুর অন্তরঙ্গ ছবি ছাপা হয়েছিল 'স্টেটসম্যান' পত্রিকায়। বিজয়লক্ষ্মী পণ্ডিত সে সময় লন্ডনে ভারতীয় হাইকমিশনার। হাইকমিশনার হিসাবেই তিনি স্পেনে ভারতীয় রাষ্ট্রদূতের দায়িত্বও পালন করতেন। এই সময় স্পেনে পাকিস্তানের রাষ্ট্রদূত ছিলেন ড. শাহেদ সুরাবর্দী (প্রধানমন্ত্রী সুরাবর্দীর দাদা)। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের এক সময়ের 'বাগেশ্বরী অধ্যাপক' এবং স্যার আশুতোষ ও রবীন্দ্রনাথের স্নেহধন্য শাহেদ সুরাবর্দী ছিলেন জওহরলাল নেহরুর অন্যতম ঘনিষ্ঠ বন্ধু। বিজয়লক্ষ্মী লন্ডন থেকে মাদ্রিদ বিমানবন্দরে পৌঁছেছেন। ভারতীয় অফিসাররা তাঁকে বিমানবন্দর থেকে নিয়ে যেতে এসেছেন। হঠাৎ বিমানবন্দরে এসে উপস্থিত হলেন মাথাভরা তুষারশুভ্র চুল নিয়ে ড. শাহেদ সুরাবর্দী। বিজয়লক্ষ্মী শাহেদসাহেবকে দেখে দ্রুত তাঁর দিকে এগিয়ে যেতে তিনি বিজয়লক্ষ্মীর কাঁধে হাত রেখে তাঁকে কাছে টেনে নিলেন। এই অসাধারণ অন্তরঙ্গ ছবিটি সেদিন স্টেটসম্যান পত্রিকার প্রথম পাতায় অনেকখানি জায়গা জুড়ে ছাপা হয়েছিল।

১৯৫৬ সালের নভেম্বর মাসে বিশ্ব ইতিহাসের অন্যতম ট্র্যাজেডি হাঙ্গেরির ঘটনাবলির পর ১৯৫৭ সালের জানুয়ারি-ফেব্রুয়ারিতে কমিউনিস্ট পার্টি অব সোভিয়েত ইউনিয়নের (CPSU) বিংশতিতম সম্মেলন অনুষ্ঠিত হল। এই পার্টি কংগ্রেসে সোভিয়েত কমিউনিস্ট পার্টির ফার্স্ট সেক্রেটারি নিকিতা ক্রুশ্চেভ "মহান" স্তালিনকে 'বিশ্ব ইতিহাসের জঘন্যতম গণহত্যাগুলির নায়ক' বলে চিহ্নিত করলেন। ক্রুশ্চেভ ঘটনা দিয়ে, তথ্য দিয়ে, দলিল ও ছবি দিয়ে পৃথিবীর ইতিহাসের রোমহর্ষক হত্যাকাণ্ডগুলি বিশ্ববাসীর চোখের সামনে তুলে ধরলেন। পৃথিবী স্তম্ভিত ও শিহরিত হয়ে উঠল। ১৯২৮-৩০ সাল থেকে পশ্চিমী দেশগুলির বুদ্ধিজীবীরা ও পরবর্তীকালে ভারতের মানবেন্দ্রনাথ রায়, সৌম্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর, জয়প্রকাশ নারায়ণ, রাজা হাতি সিং, মিনু মাসানি, রামমনোহর লোহিয়ারা "কমিউনিস্ট সাম্যবাদের" ভয়াবহতার যে ছবি এঁকেছিলেন, ক্রুশ্চেভ সে সব কাহিনিকেই ঘটনা বলে প্রকাশ করে দিলেন। এর ফলে পশ্চিম ইউরোপে, আমেরিকায় ও এশিয়ায় কমিউনিস্ট চিন্তাধারা একটা বড় রকমের ধাক্কা খেল। তবে এশিয়ার সবচেয়ে বড় ও শক্তিশালী কমিউনিস্ট দেশ চীন কিন্তু ক্রুশ্চেভের "স্তালিনবাদ খতম অভিযানের" (DeStalinisation) সঙ্গে একমত হল না। বলতে গেলে এখান থেকেই বিশ্বের দুই কমিউনিস্ট শক্তিধর রাষ্ট্র সোভিয়েত রাশিয়া ও চীনের বৈরিতার সূচনা এবং যা প্রায় পরবর্তী বিশ বছরের বিশ্ব

রাজনীতিকে প্রভাবিত করেছে এবং পরিণতিতে চীনকে আমেরিকার খুব কাছে এনে দিয়েছে।

ক্রুশ্চেভের বক্তৃতায় বিশ্ব-কমিউনিস্ট আন্দোলনের underworld ও স্তালিনের নিষ্ঠুরতার যে চিত্র উন্মোচিত হয়েছে, তার সবচেয়ে শক্তিশালী প্রতিক্রিয়া প্রতিফলিত হয়েছে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ-পরবর্তী বিশ্বের অন্যতম কমিউনিস্ট চিন্তানায়ক ও ঔপন্যাসিক হাওয়ার্ড ফাস্টের Mainstream পত্রিকার সম্পাদনা পরিত্যাগের মধ্য দিয়ে। আমেরিকার নিউইয়র্ক শহর থেকে প্রকাশিত এই পত্রিকাটি প্রায় দুই যুগ ধরে আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট বুদ্ধিজীবীদের কাছে "উপনিষদ" হিসাবে সমাদৃত ছিল। নিকিতা ক্রুশ্চেভের বিংশতিতম পার্টি কংগ্রেসে বক্তৃতার পর হাওয়ার্ড ফাস্ট সোভিয়েত কমিউনিস্ট পার্টি ও কমিউনিস্ট ইন্টারন্যাশনালের সঙ্গে সকল সম্পর্ক ছিন্ন করে Mainstream পত্রিকার ১৯৫৭ সালের মার্চ মাসের সংখ্যায় My Decision নামে যে লেখাটি লিখলেন, সেটি হল এই ঃ—

AN EXCHANGE WITH HOWARD FAST

I: MY DECISION

HOWARD FAST

Several weeks ago the world-renowned progressive novelist, Howard Fast, granted an interview to Hary Schwartz of the *New York Times* declaring his wish no longer to consider himself a Communist. Among the factors determining his decision, most prominent was his disillusion because of past events in the Soviet Union and his disbelief that any radical change had taken place since the death of Stalin and the Khrushchev report.

Mr. Fast's announcement must be a blow to thousands of members of the Communist Party in whose minds he had been identified with every good cause for which they had fought as well as he. But many others, too, were disturbed by his act and particularly questioned the release of his statement through the medium of a newspaper which is surely no friend of the American progressive movement, of which Mr. Fast considers himself a part, as evidenced by the conclusion of his article. We, also, felt that he was most ill-advised to take this step and we therefore urged him, a former member of our editorial board, to state his position in our pages. We told him that we would, of course, comment on his declaration. Mr. Fast accepted our invitation. His article follows.—*The Editors.*

RECENTLY, I took the step of publicly severing my connections with the Communist Party of the United States; and in an interview with the *New York Times*, I presented some of the reasons for this decision of mine. Now I am asked by the editors of *Mainstream* to state my position more fully, and I have decided to do so in terms of communism and morality.

What follows is not a justification of my action, but an explanation. I took this action for two reasons; firstly, as the only extreme protest against the course of events in the communist world that I saw as being meaningful and purposeful; and secondly, because I feel that the Communist Party of the United States—mostly through events beyond its control—is compromised to a point where it can no longer make any effective contribution to the continuing struggle for democracy and social justice. I feel that I must state this as a beginning to make my position very plain.

Looking back at my life. I find two major forces that brought me to communism. The first was a maturing belief in the goodness and inevitable brotherhood of man—a brotherhood in peace and common creativity. In this belief, I learned my equalitarianism out of the Prophetic teachings of Judaism, the love and brotherhood of man preached by Isaiah, and the morality, in terms of the poor and oppressed, of Jesus Christ. My democratic understanding was based on the writings of Jefferson and Lincoln.

The second force was an understanding of the role of the working class in modern history. The working class I was born into, and I studied it well through the first eighteen years of my life. I began to understand its historic role through the works of George Bernard Shaw, Jack London, Upton Sinclair and C. Osborne Ward. Later, in the process of self-education, I was able to read and understand the work of not only Marx and Engels, but of Mill and Veblen and Darwin and Morgan—and many other related Marxist and non-Marxist social thinkers.

I became a Marxist within my own personal structure, as I think many people do. I have been characterized as a religious person, and while I will not deny this within a broad frame of reference, my religion does homage to man, not to the supernatural. If a deep and unshakable faith in the goodness and splendid destiny of man is religious, then I must own to that.

I joined the communist movement for two reasons. I believed that in the Communist Party was the beginning of a true brotherhood of man, working with devotion for socialism, peace and democracy. Secondly, I believed that the Communist Party offered the most effective resistance to fascism. As a part of this, I believed, as did millions of men of good will, that the only truth about the Soviet Union was the picture presented by friends of the Soviet Union.

In these beliefs I will not admit to being anyone's dupe. Hindsight is all very well, but let us also use it to recall that during the past generation, millions of the finest and clearest minds in the word shared these beliefs. If I was slow in recognizing certain facts, recall the savage persecution of Communists this past decade in America. Whatever the truth of Russian police rule, the Truman government seemed determined to create a police state that would outdo it. That was not a time when clear and objective thinking came easily.

Nevertheless, I and others within the Communist Party realized that something was tragically wrong in the world communist movement long before the *Khrushchev "secret speech"* appeared. We were asked to swallow such absurdities as the Soviet theory of "cosmopolitanism." We saw Jewish culture disappear in Russia, and all our pleas for an explanation brought only silence. We saw capital punishment reinstated with a vengeance.

We also witnessed many disturbing internal factors in the Communist Party of the United States, a destroying rigidity and unbendingness, a narrowing of approach and purpose that make it impossible for many good people to remain within it.

These things marked a process of development, both in myself and in many others. Yet it did not prepare us for the explosive and hellish revelations of the Khrushchev "secret report." The dimensions of this horror were not only beyond anything we could have dreamed of—but also beyond, far beyond, the worst accusations of the worst enemies of the Soviet Union.

My own reactions to this unspeakable document are a matter of public record, for I spelled them out in the New York *Daily Worker*. I was filled with loathing and disgust. I felt a sense of unmitigated mental nausea at the realization that I had supported and defended this murderous bloodbath, and I felt, as so many did then, a sense of being a victim of the most incredible swindle in modern times.

I also experienced for the first time the limitations of the man, Khrushchev, not only in his describing the hell he pictured as the work of one man, but in the cynicism of his definition and explanation of this as "the cult of the individual"—an explanation not only empty, but almost facetious in its unrelatedness to the events it describes.

A leading French communist intellectual, reading what I wrote in the *Worker* on this occasion, sent me a bitter letter (in English) charging me with playing into the hands of the enemy. "As you may have seen in the papers," he wrote, "following the publication by the bourgeois press of the report credited to Comrade Khrushchev, it (the French Communist Party) asked the Communist Party of the Soviet Union to give a more complete theoretical explanation of the serious wrongs attributed to Comrade Stalin. The Soviet Communist Party then issued a statement implying precisely this theoretical analysis, a statement which forms a document of major importance to every militant of the working cause and which has enabled the working class parties to make a sound appraisal of the ideas already involed."

Heaven help us!

I will not deny that I can never again be the person I was before I read that report. Then something broke inside of me and finished, but I waited nine months before I took the step I am explaining here. I waited because it was my whole life as well as the lives and hopes of so many dear friends that was involved; I also waited because friends whom I respected argued thus:

"Surely it is better to face the reality of this thing than to live in contented ignorance of it. Remember that the Soviet leaders themselves brought it into the open. Now things will change, Stalin is dead. New leaders are in power now. They must change."

It was at least a hope—a hope that the Soviet Union would pick up the banner of socialist democracy and perhaps begin to reclaim a world moral leadership, a leadership it had lost.

WHAT was the result of that nine months? I specify it, not as an indictment, but simply as a record of objective fact to which I reacted. First, there were the additions to the "secret report." We learned of the liquidation, in 1939, of the leading Communists of Poland—hundreds of the noblest and bravest men in Poland, murdered by Stalin and the men around Stalin. From a story in a Polish communist.-Yiddish paper, *Folkshtimme*, we received our first "valid" proof of what had happened to Jewish culture in the U.S.S.R.: the extinction of every Yiddish newspaper, magazine, school, printing press—and the legal murder of a host of Jewish writers and cultural leaders. From an eye-witness report in the *Manchester Guardian*, we got the story of how some twenty elderly Jews were sentenced to from three to ten years imprisonment—for the possession of Zionist literature. From a host of sources, we learned of the fear, the pervading terror among Soviet Jews.

How do we account for such behavior after six million Jews were murdered by Nazism?

To continue: from the Soviet Union itself we learned of two more executions, and the blood hardly dry on the Khrushchev report! From Khrushchev himself we were treated to a new mode of diplomacy—diplomacy by insult and vulgarity. From the crisis in Egypt we learned of the new brink-of-war tactics of Soviet foreign affairs. For the first time, in relation to Israel, we witnessed the elevation of anti-Semitism to foreign policy. In November, 1956, Premier Bulganin sent notes to Great Britain, France and Israel. The notes to Britain and France were both reasonable and conciliatory in tone; the note to Israel was couched as an ultimatum in a tone both shrill and insulting. Since Israel was the least culpable of the three, and the only of the three acting in terms of direct national security, the uncontrolled prejudice was both apparent and significant.

From Hungary and its tragedy we learned of a new kind of socialism—socialism by slaughter and terror.

From Poland, where a struggle within the Communist Party was being waged between the Gomulka forces and the Soviet-backed forces, we learned only recently of how the Russians had attempted to swing the election to their own adherents by the use of anti-Semitism.

I itemize only a little, for my space is limited, but there must be an itemization because this is a connected picture. In June, 1956, our expressed hope was that Russia would do away with capital punishment, not only because this was implicit in the "secret report," but because criminology and history have demonstrated the futility and senselessness of this barbaric process. It would have required only a decision of leadership, but instead, while the dead made dead unjustly were being reinstated, the heads of the living continued to roll, without any proof of their guilt presented publicly. And all this after Khrushchev's long and terrible revelation of the results of secret trial and execution.

So with habeas corpus, so with self-incrimination. We have had news recently that guilt by confession alone would no longer be part of the Soviet legal system; but this is a far cry from the meaning of our Fifth Amendment, which guarantees that no accused can be forced to give evidence against himself in any form. The contrast of a socialist state claiming to be the highest type of social organization on earth, yet lacking the rudimentary legal rights and protections which both the United States and England grant their citizens is thought-provoking, to say the least.

Friends point out that it is not to be expected that Russia should have the same legal procedures as the West. A communist lawyer said to me recently, "But these have never been part of their legal code in Russia or anywhere else in Europe." That is to the point, and neither has there been socialism in Europe before. The incredible thing is that this is a socialism which denies and derides the democratic process. Yet it is socialism. Economically, Russia cannot be regarded as anything else but a socialist state, and

economically, this Russian socialism works. No one can evade the evidence of production statistics; the growth of the Soviet Union as a socialist industrial force is beyond argument, and speaking economically and in a sense, socially as well, a miracle has been performed in forty years.

But one cannot discuss socialism economically and leave it at that. In Russia, we have socialism without democracy. We have socialism without trial by jury, *habeas corpus*, or the right against self-incrimination, which is no more or less than protection against the abuse of confession by torture. We have socialism without civil liberty. We have socialism without the power of recall of government. We have socialism without public avenues of protest. We have socialism without equality for minorities. We have socialism without any right of free artistic creation. In so many words, we have socialism without morality.

Perhaps the cruelest and strangest development of history is the appearance of socialism under the domination of totalitarianism. And unless this is seen and faced and dealt with by the Left, both Communists and Socialists, then the present agony of mankind will continue far longer than it has to.

A ruling class can give only lip-service to morality; a dictatorship must eschew it as the sinner eschews his conscience. Yet what is morality—in its truest, deepest sense—but the ideology of the oppressed? From whence came the prophetic writings of Israel, the preaching of Jesus Christ, but from the tortured lips of the oppressed? I speak not of the dogma of the Church, but of the ethical content itself; and was it not this same ethical content that provided the first revolutionary ideology for the struggle against feudalism? The positive side of an ethic is in an understanding of the togetherness of mankind; this never changes; the ethic is the plea for equalitarianism, the human embrace of brotherhood, love and tolerance. The other side of the ethic is against oppression, for there is no brotherhood without freedom and human love cannot flower without liberty.

It is said of Rabbi Akiba that a heathen came to learn the Talmud. The rabbi told him, "It is not difficult. The substance is thus—love thy neighbor as thy brother. All the rest is commentary." Yet it was this same gentle Akiba who supported Bar Kochba in his glorious, pre-doomed revolt against Rome. Seemingly, these qualities are opposites; actually, they are one, for there is no freedom without brotherhood and no brotherhood without freedom. This is the basis of the ethic, the core and heart of it; and tyranny is immoral precisely because it interdicts the freedom which is not only the bread and wine of man's dignity but also gives him access to the bread of life. It was no accident that Jesus Christ, like the earlier prophets, preached more against temporial tyranny than against codified sin; it was precisely this that made him Christ.

IT IS equally no accident that the Russians contribute so little on the question of ethics. Ethics, fostered by the men in the Kremlin, could only amount to an invitation to resist them in their power. And there is less importance in the fact that the "secret report" was an immoral document than that it imposed a moral necessity. It was a confession, not of sin, but of the vilest oppression—apart from fascism and colonialism—that the twentieth century has known; and the necessity it imposed was that the tyranny—call it a dictatorship of the proletariat or what you will, it remains tyranny—that had created and practiced this oppression should open the door to morality by removing itself from government.

It is also neither an explanation nor an excuse to quote the history of Russia under the Czar. We talk here of socialism, and if socialism is a science, such explanations only degrade the men who claim to lead it. There is nothing either racial, geographic or mystical about democracy; it is a stage in the development of civilized man within his social structure; and the Russian leadership's contempt for democratic process is only a commentary upon their own socialist understanding—or lack of understanding. Savage and intolerant "Puritanism" has never been a substitute for knowledge.

I remember well the violent moral judgment that the Soviet writer, Ilya Ehrenburg, delivered upon the Nazis and the hardly less violent denunciation of the Americans. But when Ehrenburg became aware of the content of the "secret speech," we waited in vain for his wrath,

his righteous anger or his moral indignation. Strangely, for a man who had seen and judged Nazism as he had during World War Two, he evidently found nothing in the murder of Jewish writers and poets and journalists to protest.

Though Jewish himself, Ehrenburg survived, for evidently a variation of the "honorary Aryan" exists in the Soviet Union.

I met Ehrenburg in Paris after that. I did not know that the Yiddish poet, Itzik Feffer, was dead; for me, he still existed as I had seen him in New York years before, handsome and tall and proud in his Red Army uniform. On this occasion, I was chewing gum, as I often do, and Ehrenburg characterized it boldly and bluntly, as a bestial practice. As a gum chewer, I was morally judged by him, and perhaps rightly so, for in a large degree, this judgment characterized his understanding of morality. The ridiculous and the terrible often walk hand in hand. That Howard Fast could indulge in this barbarism of chewing gum injured Ehrenburg's sensibilities, even as the man who remained seated when a Victorian English lady entered the room offended her sense of the decent and fitting. But the moral response was no deeper than the Victorian manner. In a popular Soviet novel, a leading novelist pursued this line in describing how two sex-starved people, a soldier and a nurse, each of them celibate for years, spent a tortured night in the same room, each yearning toward the other, each upholding the honor of a Soviet citizen through abstinence. When this writer, here in America, was challenged as to the validity of such a picture, he replied, "Our people like it that way."

Without begging the question of a writer's responsibility toward reality, is it true that any people like it that way? These are not petty examples; they are definitions of a fake prudery, a childish parade of virtueless virtue that is substituted for real ethic and real morality.

IT WOULD be both wrong and malicious to make any comparison between this Soviet tyranny and the tyranny of fascism; but my rejection and such a comparison does not lessen the culpability of a totalitarian socialist leadership. The Hitlerian state, which abandoned morality for racism and bestiality, embraced ignorance and the vilest medievalism, plunging headlong almost from the moment of its creation toward its final destruction in the holocaust of World War Two. The dynamic of the socialist state, even as it exists in Russia, is something else indeed. As much as the dictatorship at the top may reject and fear the truth in this area or that, the social and economic structure of the state itself propels toward an enlarging area of knowledge. A whole generation of engineers, atomic scientists, biologists, physicians, physicists, astronomers and a hundred other scientists and artists cannot be lulled or tranquilized forever with copybook maxims unrelated to the reality of life. The material concern for the health and welfare of the people, as demonstrated by the wonderful and amazing strides of the Soviet medical and health services must come into sharp conflict with the "Genghis Khan" attitude toward human life and humanism that was and still is exhibited by the leadership. And most sharply of all, the very teaching of a Marxist and materialist approach to history must inevitably challenge and unmask the crude corruption of Marxism that has taken place in the Soviet Party structure.

It is the brutalized and dehumanized practice of power that the theory of socialism has been most corrupted. But within the Soviet Union, an increasing contradiction between Communist Party leadership and practice and evolving socialist society exists; and in good time this contradiction will become intolerable to the Soviet people.

Where then does the duty of the man of good will, the progressive, the socialist, the communist lie? I answer this question only for myself. I say that it lies with socialism, with the ancient and enduring dream of brotherhood, with the Soviet people, who twice created out of ruins the fabric and potential of a good society, with the Poles, who so gallantly went their own way toward democratic socialism.

I say that it does not lie with the pretentious dogmatism of Soviet leadership, indicted not only for their acquiescence in the crimes of Stalin, but for their continuing record of intolerance and dogmatic bossism since the exposure of those crimes.

I HAVE come to believe that within the very structure and historical development of the Communist Parties, as we know them in recent years, there is an almost incurable antithesis to the socialist democracy which they name as their ultimate goal. In a struggle against fasism and colonial oppression, history has shown these parties to be magnificently disciplined and courageous, but in other circumstances, they fall prey to a tragic contradiction. Programmatically for freedom, their very structure denies freedom within itself; against oppression, their very structure oppresses within itself; and conceived as a liberating force, the monolithic power structure chokes both the democratic process and the liberating thought. Their historical development has been toward an ever increasing and ever more rigid bureaucracy—and this very process nurtures an egotistic and dehumanized stratum of leadership, which is perpetuated to a point where the threat of recall must be seen by leadership as a threat to the existence of the organization. The rationale of those in power can then turn into paranoiac hatred and corroding suspicion.

It is this development that is being fought by a great many American communists who remain within the organization of the Communist Party, and I acknowledge their integrity and purpose. But can one for a moment believe that a similar struggle is possible in the Soviet Union? It is the very lack of any operative channel for either free elections or free recall in the Soviet Union that has so far prevented the change—not of system but simply of government—that the society is ready for.

Since the appearance of the Khrushchev "secret report" nine months ago and since my initial written response to it, a number of things have happened to me personally. A flow of letters from the countries of Eastern Europe have pleaded heartbreakingly for succor—as if I had some power to intervene against the terrors and sufferings that beset them or some special persuasiveness to direct toward their leaders. I am afraid, however, that criticism of any validity is as abhorrent to the Kremlin leadership as social justice—in spite of their endless talk of criticism and self-criticism being a motive force in Soviet society. Where jail or death is the price of criticism directed at government, such claims are not only false, but even obscene.

I do not enjoy writing such things. I record them with distaste and soul-sickness. A life-long structure of belief lies shattered around me, and for nine long months I have paid the price for my own shortsightedness in mental anguish and turmoil. But I will not and cannot remain silent any longer. I judge no one else, but I know deeply that for me to hide my convictions would be despicable. If knowledge has unfolded for me a tragic and shoddy picture of the men who lead the Soviet Union, it has not lessened my faith and firm conviction in the ultimate brotherhood and basic goodness of man. Nor do I believe that mankind will be turned aside from socialist democracy and from the vision of the good world we will one day create. No power-clique of men of small soul and less humanity can long resist the tide of history.

As a postscript to the above, since it was written I received the inevitable summons from the House Committee on Un-American Activities to appear before them as a friendly witness. I made no bones about showing them, not only that I was an unfriendly witness, but that I utterly despised all they represented. Nothing I have said about injustice and petty tyranny here at home, or about the assorted madness of our foreign policy has been withdrawn in my mind. Let the issue not be confused. The fact that in the U.S.S.R. justice is so much of a stranger does not mean that justice walks uninhibited in our courts. I have written hundreds of thousands of words on the injustice that exists in my own country; I shall continue to write about it.

The fact that I have finally been able to spell out the facts above concerning injustice elsewhere does not close my eyes or my heart. It only opens both more.

I intend to continue my solidarity with all people of good will in America, communist and non-communist, who fight injustice and treasure the precious, the infinitely precious, traditions of Jefferson, Franklin, Lincoln and Douglass—to mention only four of the many great who built the

foundations of that most splendid thing, American Democracy.

আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট আন্দোলনে হাওয়ার্ড ফাস্ট ছিলেন এক গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিত্ব। ১৯৫২ সালে প্রকাশিত তাঁর 'SPARTACUS' উপন্যাস বিশ্বখ্যাতি অর্জন করেছিল। ওই উপন্যাসে যে মানবপ্রেম মানবাত্মার প্রতি যে মমত্ববোধ বিধৃত হয়েছে, 'My Decision'-এর মধ্য দিয়ে প্রতিফলিত হয়েছে তারই চূড়ান্ত পরিণতি। আশ্চর্যের বিষয় এই যে এই ঘটনা পশ্চিম ইউরোপ, আফ্রিকা, এশিয়ার বিভিন্ন দেশের কমিউনিস্ট বুদ্ধিজীবী মহলে প্রবল আলোড়নের সৃষ্টি করেছিল এবং বহু বুদ্ধিজীবী কমিউনিস্ট আন্দোলন থেকে সরে এসেছিলেন। কিন্তু একমাত্র ব্যতিক্রম ছিল ভারতবর্ষ। ভারতে মাত্র একজন বিশিষ্ট কমিউনিস্ট বুদ্ধিজীবী কমিউনিস্ট পার্টি থেকে পদত্যাগ করেছিলেন। তিনি হলেন ডেভিড কোহেন (David Cohen)। তিনি বোম্বাইয়ের The Times of India পত্রিকার News Editor ছিলেন। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় ভারতের এই 'ইহুদি কমিউনিস্ট' ডেভিড কোহেন আন্তর্জাতিক ফ্যাসিবাদ-বিরোধী আন্দোলনে খুব খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। People's War পত্রিকার সম্পাদক নিখিল চক্রবর্তী ও ডেভিড কোহেন ১৯৫৫/৫৬ সালে এই উপমহাদেশের প্রথম কমিউনিস্ট নিউজ এজেন্সি—Indian Press Agency (IPA)—স্থাপন করেছিলেন। কিন্তু ডেভিড কোহেনের পার্টি থেকে পদত্যাগের কিছুদিনের মধ্যেই IPA বন্ধ হয়ে যায়। কমিউনিস্ট দুনিয়ার প্রতি বীতশ্রদ্ধ ডেভিড কোহেন ভারত ছেড়ে ইজরাইলে গিয়ে বসতি স্থাপন করেন।

এরকম একটা সময়ে তিন ব্যক্তিত্বের সঙ্গে আমার পরিচয় ঘটে। এদের মধ্যে একজন হলেন অবিভক্ত বাংলার প্রবীণ রাজনীতিবিদ, প্রথিতযশা বাগ্মী ও পণ্ডিত সৈয়দ বদরুদ্দোজা, নবনাট্য আন্দোলনের পুরোধা ও সংগঠক বিজন ভট্টাচার্য ও ছাত্রনেতা রথীন মিত্র। রথীন মিত্র একজন অসাধারণ কমিউনিস্ট। মানুষের প্রতি তাঁর তীব্র মমত্ববোধ এবং ক্রোধদ্বেষবিহীন অমন একজন দরদী কমিউনিস্ট আমি তেমন একটা দেখিনি। ল্যান্সডাউন মার্কেটের কাছে থাকতেন। বাবা অমরেন্দ্রমোহন মিত্র হাইকোর্টের খুব নামকরা উকিল ছিলেন। ১৯৪৮ সালে কমিউনিস্ট পার্টি বেআইনি ঘোষিত হলে ছাত্রাবস্থায় আত্মগোপন করেন। গুপ্তস্থান থেকেই কমিউনিস্ট ছাত্র আন্দোলনের মুখপত্র 'The Student' সম্পাদনা করতেন। ১৯৫০-৫৫ সালে তিনি জ্যোতি বসুর রাজনৈতিক বিবৃতির খসড়া করে দিতেন। জ্যোতিবাবুর রাজনৈতিক ও ট্রেড ইউনিয়ন সংক্রান্ত বিবৃতির মুসাবিদা রথীন নিজেই করতেন। ১৯৫৩ সালের ট্রাম ভাড়া বৃদ্ধি প্রতিরোধ আন্দোলন পর্যন্ত। এই আন্দোলনের সময় রথীনবাবু কারারুদ্ধ হন। এই সময় প্রেসিডেন্সি জেলে সৈয়দ বদরুদ্দোজাসাহেবের পাশের কুঠরিতে তাঁর স্থান হয়েছিল। বদরুদ্দোজাসাহেব ১৯৫০ সালের কোনও এক সময় থেকে নিরাপত্তা আইনে আটক ছিলেন। পাশাপাশি থাকার ফলে দু'জন দু'জনের প্রতি আকৃষ্ট হন এবং রথীন মিত্রের কথায়,—বদরুদ্দোজাসাহেব 'চিত্তের ঐশ্বর্য দিয়ে আমাকে চিরদিনের মতো মুগ্ধ করেছেন।' ১৯৫৭ সালের কোনও এক সময়ে রথীনবাবু আমাকে নিয়ে যান পার্কসার্কাস অঞ্চলে বদরুদ্দোজা সাহেবের বাড়িতে। দরজা খুলে রথীনবাবুকে দেখে জড়িয়ে ধরে চিৎকার করে বদরুদ্দোজাসাহেব বলেছিলেন 'My friend, philosopher and guide'। রথীনবাবু আমার সঙ্গে ওঁর পরিচয় করিয়ে দিলে, ওই দুপুরে আমরা বদরুদ্দোজাসাহেবের বাড়িতে খেতে বাধ্য হলাম।

এবার বদরুদ্দোজাসাহেবের কথা একটু বলি। প্রকৃতই তিনি 'চিত্তের ঐশ্বর্যের' অধিকারী একজন মানুষ এবং বোধহয় এজন্যই তিনি অবিভক্ত বাংলার রাজনীতিতে ফজলুল হকসাহেবের ঘনিষ্টতম ব্যক্তি ছিলেন। অবিভক্ত বাংলার রাজনীতিতে মুসলমানদের সংখ্যাগরিষ্ঠতার প্রশ্নে বদরুদ্দোজা সাহেব মুসলমানদের বিশেষ অধিকারের পক্ষে থাকলেও তিনি কখনওই মুসলিম লিগে যোগ দেননি। মুসলিম লিগের রাজনীতি তাঁকে কখনওই আকৃষ্ট করেনি তাই দেশ বিভাগের পর তিনি পূর্ব পাকিস্তানে গেলেন না। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গের রাজনীতিতে তিনি নিজেকে খুব নির্বান্ধব মনে করতেন। তাঁর আমলের মুসলমান রাজনীতিকরা সকলেই পূর্ববঙ্গে চলে গিয়েছেন। হিন্দু রাজনীতিবিদদের মধ্যে তাঁর মনের কাছের মানুষের মধ্যে কিরণশঙ্কর রায় ও শরৎচন্দ্র বসুর দ্রুত লোকান্তরগমন তাঁকে একেবারেই নিঃসঙ্গ করে দেয়। তাঁর এই নিসঙ্গতা আমি দেখেছি ১৯৫৭ সালের বিধানসভায়। তিনি সেবারের নির্বাচনে এম এল এ হয়েছিলেন। বিধানসভায় বিশেষ কথা বলতেন না। তিনি যখন বক্তৃতা করতেন তখন আমাদের রিপোর্টারদের যেন 'দুর্গেশনন্দিনী' বা 'কপালকুণ্ডলা'র শব্দ-নৈপুণ্যের মতো তাঁর অনবদ্য বাচনভঙ্গি আবিষ্ট করে রাখত। বিধানসভার লবিতে বহুদিন একান্তে তাঁর কাছে বসে ১৯৩৭ থেকে ১৯৪৩ পর্যন্ত বঙ্গ রাজনীতির অনেক অন্তরালের ঘটনা শুনেছি (সে সব কথা আমার লেখা 'বঙ্গসংহার এবং' গ্রন্থে সন্নিবেশিত করেছি)। বদরুদ্দোজাসাহেবকে নিয়ে পূর্ববঙ্গের (পূর্ব পাকিস্তানে) রাজনীতিতে একটি ভয়ানক ঘটনা ঘটেছিল।

(ক্রমশ)

অন্নদাশঙ্করের রবীন্দ্রনাথ

স্বপন মজুমদার

গত শতাব্দীর তৃতীয় ও চতুর্থ দশকে তরুণ ও অনতি-তরুণ বাঙালি সাহিত্যযশঃপ্রার্থীর কাছে রবীন্দ্রনাথ যখন হয়ে উঠেছিলেন এক অনতিক্রম্য প্রতিবন্ধক, যখন তাঁর অনুসারী হওয়ার ভবিতব্য ছিল চোরাবালিতে ডোবা আর তাঁর প্রতিস্পর্ধিতা ছিল প্রায় ইকারুসের মতো দগ্ধপক্ষ আত্মঘাতী হওয়া, ঠিক তখন—সেই স্বভাবত উদ্ধত যৌবনের দিনে অন্নদাশঙ্কর রায় (1904-2002) খুঁজে নিয়েছিলেন এক মঝ্‌ঝিম পন্থা। সে-মধ্যপথ সন্ধান তাঁর কাছে উভয় পন্থার উদ্বৃত্ত সুযোগলাভের অছিলা ছিল না, ছিল না কোনও অব্যবস্থচিত্ত উভমুখিতা। অন্নদাশঙ্কর প্রথম থেকেই সম্পূর্ণ সজাগ ছিলেন তাঁর মহাজন পূর্বসূরি নির্বাচনে।

তারুণ্যের চিহ্ন হয়ত ততটাই ছিল যার ফলে প্রমথ চৌধুরীর শব্দবৈখর্য আর বিপ্রতীপের শ্লেষাভাস তিনি মনে করেছিলেন অনুসরণীয়। কিন্তু গুরুর মতো শব্দসন্ধানে তিনি বক্তব্যকে ভাসিয়ে দেননি, কথার ঝোঁকে চিন্তাকে বিপথী হতে দেননি। বরং বলা যায়, প্রথম থেকেই তিনি সেই সৎ সেঙাৎ যিনি গুরুর অত্যুক্তি আর চিন্তার অতিচার সযত্নে পরিহার করে অম্বু থেকে শুধু ক্ষীরটুকুই গ্রহণ করেছিলেন গণ্ডুষ ভরে। অন্নদাশঙ্করের ছোটগল্পে আর ব্যক্তিগত গদ্যে নীললোহিতের ইয়ারিকথা প্রচ্ছন্ন থাকেনি।

তবে চেলা লায়েক হয়ে না লায়েক হবার জন্য ভিন্‌গুরুর সন্ধানী হলেন, বলা যাবে না নির্দিষ্ট তথ্যের অভাবে। কিন্তু এমন ভাবা বোধহয় সত্যের পরিপন্থী হবে না যে কৃষ্ণনাগরিক বচনে কথার মাদক তিনি যতটা পেলেন, চিন্তার আহার ততটা পেলেন না। মাদক তিনি ততটাই সেবন করলেন যা তাঁর প্রকাশস্বাস্থ্যের পক্ষে বলবর্ধক, বক্তব্যের বিস্তারে সুবহ। আর ভাষা যখনই তাঁর আয়ামের অনুকূল হয়ে উঠল, তখনই দেখা গেল ভাবনায় তাঁর ব্যাপ্তবিহার শুরু হয়েছে রবীন্দ্রনাথকে অনুসরণ করে। ক্রমে রবীন্দ্রনাথ থেকে তিনি পৌঁছে যাবেন রলাঁয় আর রাসেলে, গান্ধী তাঁকে পৌঁছে দেবেন তলস্তয়ে।

২

যে-কোনও অনাপ্লুত কিন্তু নিবিষ্ট পাঠকই লক্ষ করবেন, হয়ত ঈষৎ অস্বস্তিও বোধ করবেন, অন্নদাশঙ্করের লেখা ও চিন্তার কেন্দ্রে আছেন এক সর্বত্রচারী আমি এবং সেই আমিকে কোনও আবরণ দিয়ে বা নেপথ্যে রাখেন না তিনি। এই আত্মবোধই একদিকে তাঁকে প্রেরণা দেয় তাঁর চিন্তাতরঙ্গের সমভাবুকদের আবিষ্কারে। অন্যদিকে রচনা করে অনাবিষ্ট এক ব্যবধান, যার ফলে দুর্লভ এক তটস্থতা তৈরি হয় তাঁর অবস্থানে। সমর্পণের জন্য যে একশরণ প্রত্যাশিত ভক্তের স্বভাবে, তার একান্ত অভাব তাঁর ভাবুকসত্তায়। তিনি নিজেও জানেন তাঁর এই চারিত্র্য : 'আমি লোকটা গুরুবাদী নই। বরং গুরুবাদবিরোধী।... আমি যদি উত্তরসাধক হয়ে থাকি তবে শুধু একজনের কেন? আর আমার একার কি কোনো সাধনা থাকতে নেই? যা একান্তই আমার?' ("প্রথম চৌধুরী, সবুজপত্র ও আমি", 'প্রবন্ধ', ১৯৬৪, পৃ ৪৭৫-৭৬।) আমাদের সমাজে একটু অহংকারী, অন্তত অহংম্মন্য, শোনাতে পারে এমন অকপট আত্মভাষ; 'সাধনা'র মতো এমন অধ্যাত্মগন্ধী শব্দ ব্যবহারেও তাঁর দ্বিধা ছিল না। বিলেত-ফেরৎ আই. সি. এস. পাঠকবন্ধুদের সম্ভাব্য কৌতুকের পরোয়াও করলেন না। করলেন না, কারণ তিনি সত্যিই বিশ্বাস করেন তাঁর একান্ত আপন সাধনায়। এই আত্মতাই স্বতন্ত্র করে অন্নদাশঙ্করকে। তাই কোনও বিশেষ মহাজনের সম্পূর্ণ অনুসারী হতে পারেন না তিনি। এই আত্মতার ব্যবধান যতটা তাঁর স্বভাবে, ততটাই বিগতকালের সঙ্গে তাঁর স্বকালের সচেতনভাবে স্বীকার করে নেওয়া পার্থক্যে। তাঁর উপমাবিরল গদ্যেও আকস্মিক তুলনা এনে 'একদল বসন্তের ফলকে আর-এক দল বসন্তের ফুলের উত্তরসাধক বা উত্তরসূরী বলে নামাঙ্কিত করা ভুল' মনে করেন তিনি। তফাত এখানে শুধু এক বসন্তের সঙ্গে অন্য বসন্তের নয়, ফলের সঙ্গে ফুলেরও। অন্নদাশঙ্করের চিন্তাপ্রস্থানে আমির মতো সময়ও একটি অনিবার্য মাত্রা, সে-সময় নিয়ত পরিণতিমুখী। 'দেশের ধারা'কে স্বীকার করে নিলেও 'যুগের ধারা' শেষ পর্যন্ত তাই উত্তরাধিকারকেও অনুমত করে নেবে তার নিজের আদর্শে ও প্রয়োজনে। উত্তরসাধকের ধারণাটিই তাই অন্নদাশঙ্কর সূত্রায়িত করবেন একটু ভিন্নভাবে : 'রবীন্দ্রনাথ যে কাজ সারা করে যেতে পারলেন না, যে কাজে হাত দিতে সময় পেলেন না, সে কাজ আমার উপরেও পড়েছে।... এর মানে এ নয় যে আমি এ-সব কাজ পারব। খুব সম্ভব পারব না। কিন্তু সেই না পারাটা সমসাময়িকদের বা পরবর্তীদের পারার সোপান হবে।' ("প্রমথ চৌধুরী, সবুজপত্র ও আমি", 'প্রবন্ধ', ১৯৬৪, পৃ

৪৭৬।) বলা বাহুল্য, শুধু রবীন্দ্রনাথেরই নয়, যাঁদের কাজ 'যুগের ধারা'য় পূর্ণ করে তোলা প্রয়োজন, তাঁদেরই উত্তরসূরি হিসাবে নিজেকে চিহ্নিত করতে সম্মত হবেন অন্নদাশঙ্কর। ঠিক ততটাই অবশ্য যতটা তাঁর একান্ত নিজস্ব সাধনার দাবি। সে-সাধনার অভীষ্ট, 'ইলুমিনেশন', 'প্রেম' ও 'সৃষ্টিশক্তি'। সে-পথ তাঁকে নিয়ে যায় 'ইন্টেলেক্ট' থেকে 'ইন্ট্যুইশনে', মানবিক বিশ্বাস থেকে জীবনদেবতায়। এখানেও তিনি, রবীন্দ্রনাথ।

৩

স্কুলেই রবীন্দ্রনাথের 'মুকুটে' ধুরন্ধর সেজেছিলেন অন্নদাশঙ্কর। 'চয়নিকা' তাঁর প্রথম বিস্ময়। কিন্তু নিয়মিত পরিচয়ের শুরু 'বলাকা'-'পলাতকা'র পর্যায়ে : 'বিনুর জগতে রবীন্দ্রনাথের প্রবেশ যেমন আকস্মিক তেমনি বিলম্বিত। কিন্তু বিলম্বে এসেও তিনি সকলের সামনের আসনখানি অধিকার করে বসলেন। বন্ধুদের পরিহাস, মাস্টার মহাশয়ের উপহাস, আত্মীয়দের উপেক্ষা তাকে বিচলিত করল না, সে তার অবিকশিত বুদ্ধি ও অনিয়ন্ত্রিত রুচি দিয়ে আপন করে নিল তাঁকে — তিনি এশিয়ার পোয়েট লরিয়েট বলে নয়, তিনি বিনুর মতো অবোধ জনের সমবয়সী বলে।' ("রবীন্দ্রনাথ : বিনুর সাক্ষ্য", 'প্রবন্ধ', ১৯৬৪, পৃ ৩৮২।) সমবয়সি কথাটায় বিবক্ষিত যে-ব্যঞ্জনা লুকিয়ে আছে, তা যে শুধু বয়সের নয়, 'সর্বব্যাপী জ্যাঠামির মারী'র বিরুদ্ধে দাঁড়াতে বলেছিলেন যে-রবীন্দ্রনাথ, তাঁর সঙ্গে সমমনস্কতায়, বুঝতে সময় লাগে না পাঠকের। মনের সেই অলিন্দ দিয়েই রবীন্দ্রনাথের প্রবেশ অন্নদাশঙ্করের জগতে। তিনি এসেছেন বলেই, তাঁর কাছে ধরা দিতে পেরেছেন অন্নদাশঙ্কর; না-হলে হয়ত অপরিচয়ের কুণ্ঠা কাটিয়ে তাঁর কাছে পৌঁছতেন না তিনি।

কিন্তু প্রথম দেখার—না, দেখায় আগ্রহ নেই অন্নদাশঙ্করের, তাঁর রুচি কথায়—অভিজ্ঞতা কিছুটা অস্বস্তিই রেখে যায় তাঁর মনে। রবীন্দ্রনাথ আর অন্নদাশঙ্করের মিলিত বয়ান থেকে স্পষ্ট হয়ে ওঠে সেই প্রশ্নের অভিপ্রায় আর উত্তরের অসমাঞ্জস্য। 'অল্প কিছুদিন হল একটি ছাত্র—ভারতেরই একটু পশ্চিমের কোনও কলেজের ছাত্র—একদিন আমার প্রভাত-ভ্রমণের সময় আমার সঙ্গ ধরলেন। তিনি বললেন, একটি প্রশ্ন আছে। বলে ইংরেজিতে শুরু করলেন : Is Art too good to be human nature's daily food? বুঝলেম এই প্রশ্নের মূলে বহুলোকের মধ্যে প্রচলিত একটি তর্ক আছে। সে তর্কটিই এই যে,...কেবলমাত্র চিত্তবিনোদনই আর্টের উৎকর্ষের আদর্শ কি না।' ("সাহিত্য", 'সাহিত্যের পথে', র-র ২৩, পৃ ৫৪৭-৪৮।) 'এখন পড়ছি আর ভাবছি আমি বোঝাতে চাইলুম কী আর তিনি বুঝলেন কীঙ্গ তর্কটা চিত্তবিনোদন বা জীবনযাত্রার আনুকূল্য বা মঙ্গলবিধান বা সমস্যাপূরণ নিয়ে নয়। প্রশ্নটা হলো, আর্ট কি এমন মূল্যবান সামগ্রী যে তাকে নিত্য ব্যবহার করা যায় না, এমন শখের জিনিস যে তাকে আটপৌরে করতে নেই, এমন এক ভোজ যা শুধু উৎসবের জন্যে বা শুধু বিদগ্ধদের জন্যে?' ("কবির সঙ্গে দ্বিতীয় সাক্ষাৎকার", 'রবীন্দ্রনাথ', ১৯৬১, পৃ ৭০-৭১।) প্রশ্নের উত্তর হয়তো পাওয়া গেল না, তৈরি হয়ে উঠল না কোনও সংলাপের সেতু বা পরম্পরা। একজন তাকে অবলম্বন করে যেমন বলে গেলেন তাঁর নিজের কথা, অন্যজন সেই প্রশ্নেরই উত্তরসন্ধান করলেন সারাজীবন। উত্তরও একটা তৈরি করে নিলেন নিজের মতো করে, তাঁর লেখা বা বলা থেকে নয়, তাঁরই জীবনশিল্প, তাঁরই সৃজনশিল্প থেকে।

৪

তেইশ বছরের অন্নদাশঙ্কর নিজস্ব পাঠের অভিজ্ঞতার মধ্য থেকে দেখেছিলেন রবীন্দ্রনাথকে। তত্ত্ব রূপক সাংকেতিক কোনও সাহিত্যগোত্রের ধাঁচে ফেলে দেখা নয়, যে-'রক্তকরবী'কে নাট্যকার দেখাতে চেয়েছিলেন এক মানবীর ছবির মতো করে, অন্নদাশঙ্কর ঠিক তেমনটিই দেখাতে পেরেছিলেন তাঁর " 'রক্তকরবী'র তিনজন" ('প্রবন্ধ', ১৯৬৪, পৃ ৬৮৭-৯২) প্রবন্ধে। ভালবাসার এক নাটক হিসাবেই 'রক্তকরবী' পড়েন অন্নদাশঙ্কর। প্রকৃতির রঙে, ফসলের রঙে, অনুরাগের রঙে, রক্তের রঙে, যৌবনের রঙে ভালবাসারই এক প্রতিসরণ দেখেন তিনি : 'নন্দিনীকে সবচেয়ে ভালোবাসে কে? রঞ্জন নয়। সে আপনাকেই ভালোবাসে, প্রাণের নেশায় প্রাণকেই বিলিয়ে বিলিয়ে যায়, হারিয়ে হারিয়ে পায়। বিশু নয়। তার চাওয়া অসামান্য চাওয়া, এই চাওয়াকেই সে ভালোবাসে, এরই মর্যাদা রাখবে বলে সে যেটুকু পায় নেয় না। নন্দিনীকে সবচেয়ে ভালোবাসে কিশোর। তারই প্রেমে পথ চলার সুরটি বাজে, সে সুর চিরকালের চিরনতুন সুর। সে ডাকে,... শুধু নাম ধরে ডেকেই তার আনন্দ। চেয়েও নয়, পেয়েও নয়, শুধু ভালোবেসেই তার তৃপ্তি।' জীবনের সঙ্গে যোগ করে নিয়ে, জীবন থেকে সাহিত্যের অভিজ্ঞতাকে মিলিয়ে পড়ার এক আশ্চর্য নিদর্শন হয়ে থাকে প্রবন্ধটি।

কিন্তু অবাক লাগে, এই একটি, রবীন্দ্রনাথের একটিমাত্র সৃজনশীল সাহিত্য নিয়ে আলোচনা করেছেন অন্নদাশঙ্কর। তাঁর ভাবনার, বলবার কথা যে ছিল না তা নয়। 'নৌকাডুবি'র প্রতিপাদ্য আর 'ঘরে-বাইরে'র পরিণতি নিয়ে শিল্পগত আপত্তি ছিল অন্নদাশঙ্করের। পুনর্লেখের ভাবনাও এসেছিল একসময়ে। 'গোরা' তাঁকে ভাবিয়েছিল বক্তব্যের সঙ্গে আখ্যানের সম্পর্ক প্রসঙ্গে। জীবনশিল্পী রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে

সৃজনশিল্পী রবীন্দ্রনাথের স্বরূপতা নিয়ে কি প্রশ্ন বা তর্ক ছিল তবে তাঁর? কিন্তু আমরা তো দেখেছি, প্রশ্ন বা তর্ক থাকলেই খুলে যায় তাঁর মন, চিন্তার দরোজা। তাহলে কি ভাবুক অন্নদাশঙ্কর ভাববার মতো, ভাবাবার মতো প্রসঙ্গ পাননি তাঁর সাহিত্যে? যা তিনি পাবেন রবীন্দ্রনাথের চিন্তামূলক প্রবন্ধে আর তার অনুষঙ্গী সমস্যায়? রবীন্দ্রশতবর্ষে কিছু লিখতেই হবে কেন, এমন একটি অবস্থান সত্ত্বেও তাই কি প্রকাশ হতে পারল 'রবীন্দ্রনাথ' নামে চিন্তাভরা একটি সংকলনগ্রন্থ? এ-কৌতূহলের সঙ্গত এক সমাধান পাই আমরা বিনুর জবানিতে। রবীন্দ্র-অনুসারীদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ হওয়ার শিরোপা-সম্ভাবনা পীড়া দিতে থাকে তাকে। 'না, সে তাঁর প্রভাব স্বীকার করবে না। সে তাঁর প্রভাবের বাইরে ছিটকে পড়বে। সে তাঁর সৌরমণ্ডলের বৃহস্পতি হবে না। সে উল্কার মতো ছুটে বেরিয়ে যাবে।... ফল হলো এই যে সে কবির প্রভাব এড়াতে গিয়ে কাব্যের প্রভাব এড়াল। কাব্য পড়তে স্পৃহা রইল না, সাহিত্যেও অরুচি ধরল। সে অর্থনীতি, রাজনীতি ও বিজ্ঞান পড়ে। ইতিহাস তো তার পুরাতন বন্ধু।... সাহিত্যচর্চা তখন শিকেয় তোলা।' ("রবীন্দ্রনাথ : বিনুর সাক্ষ্য", 'প্রবন্ধ', ১৯৬৪, পৃ ৩৮৪-৮৫।)

অল্প কিছুকালের জন্য হলেও অত্যন্ত সমীচীন ছিল এই সিদ্ধান্ত। বহু পথ ঘুরে, লোকসাহিত্যে বাঙলা সাহিত্যের প্রাণময় সম্ভাবনা—এই বিশ্বাস নিয়ে আবার তিনি ফিরলেন সমে : 'কাণ্ডজ্ঞান ফিরল।... রবীন্দ্রনাথের প্রভাব অস্বীকার করতে যাওয়া মূঢ়তা। বরং কৃতজ্ঞচিত্তে স্বীকার করে নেওয়াই সিদ্ধির শর্ত। হাঁ, পড়েছে তাঁর প্রভাব আমার রচনায়ঙ্গ হাঁ, আমি অনুসরণই করেছি তাঁকে। অনুকরণও করেছি। তা সত্ত্বেও ... আমি নিজের কক্ষায় ধাবমান জ্যোতিষ্ক। আমি তাঁকে স্বীকার করলেই তাঁকে অতিক্রম করবার ছাড়পত্র পাব।' (তদেব, পৃ ৩৮৫-৮৬।) এ কি 'রাজা' নাটকে সুরঙ্গমার সংলাপ শুনছি আমরা? অভিজ্ঞতা আর কল্পনা মিলে যাচ্ছে জীবনশিল্পের সরগমে।

৫

অন্নদাশঙ্করের কাছে রবীন্দ্রনাথের 'চরম উত্তরাধিকার' "কীভাবে বাঁচব" এই জিজ্ঞাসার নিঃশব্দ উত্তর।' এই বাঁচা শুধু নিজের বাঁচা নয়, অন্যকেও বাঁচিয়ে তোলা। রাজপুরুষ অন্নদাশঙ্কর লক্ষ করেছিলেন জমিদার রবীন্দ্রনাথকে : 'ভাণ্ডারে'র যুগ থেকে ত্রিশের দশক পর্যন্ত কীভাবে চলছিল কল্যাণবৃত্তি তহবিল, কীভাবে কৃষিজীবী প্রজাদের আর্থিক অনির্ভরতা থেকে গড়ে উঠতে পারে নাগরিক সমাজ। শ্রীনিকেতন নিরীক্ষাও একই কারণে টানে অন্নদাশঙ্করকে। এখানে পরীক্ষা বৃত্তিনির্ভর সমাজ গড়ার সংকল্পে। বাঁচিয়ে তোলা আর জাগিয়ে তোলার এই কর্মকাণ্ড থেকেও অন্নদাশঙ্করকে আরও বেশি হয়ত আকর্ষণ করে রবীন্দ্রনাথের চিন্তাজীবন : একইসঙ্গে চিন্তা আর জীবনের মধ্যে তৈরি হয়ে-ওঠা আর তৈরি করে তোলা চলাচলের এক প্রশস্ত রাজপথ।

'রবীন্দ্রনাথ' বইয়ের প্রসঙ্গগুলি লক্ষ করলে আমরা দেখব, প্রচ্ছন্ন এক বিপ্রতীপতার দৃষ্টিকোণ থেকে রবীন্দ্রনাথকে বুঝতে চাইছেন অন্নদাশঙ্কর। ভারতবর্ষ ও ইউরোপ, রনেসঁস ও আধুনিকতা, সংহতি ও সংকট : এমনই সব আপাত-বিরুদ্ধ চিন্তাধারার মধ্যে রবীন্দ্রনাথকে যেন যাচাই করে নিচ্ছেন তিনি। সমাজচ্যুত পীরালি পরিবারের যে-ছেলে ব্রাহ্ম হয়েও ব্রাহ্মণত্ব ভুলতে পারেন না, ভারতীয়ত্বের সঙ্গে মিলিয়ে দেন হিন্দুত্ব, গোরার মধ্য দিয়ে কীভাবে তিনি পৌঁছন অভীষ্ট ভারতবর্ষে, আবিষ্কার করেন তাঁর কল্যাণপ্রতিমা, সেই সমুন্নতির, আত্মসংকটমোচনের ইতিহাস ব্যাখ্যা করেন অন্নদাশঙ্কর। সঙ্গে-সঙ্গে এ-কথাও মনে করিয়ে দেন, এ-ভারতবর্ষ আবহমান, তার গতি সামনের দিকে; সনাতন নয়, যার গতি চক্রাকার।

কিন্তু অন্নদাশঙ্কর ভাবতে ভালবাসেন, এ-ভারতবর্ষ ইউরোপকে বাদ দিয়ে নয়, বিশ্বাস করেন, তার চিন্তার দীপায়ন ইউরোপেরই প্রদীপে। যদি তার ফলে সংখ্যাগুরু স্বদেশীয়ের সঙ্গে বিযুক্ত হবার আশঙ্কাও থাকে, অন্নদাশঙ্কর তাকেই মানবেন গণকল্যাণ বলে, অন্যদিকে সেই সংখ্যাগুরুর সঙ্গে সংযুক্তির বাসনা তাঁর কাছে পিছুটান, আন্‌রিয়াল। অন্নদাশঙ্কর মনে করেন, রবীন্দ্রনাথও তাঁর সহমত। তাঁরা চাইবেন, 'জনগণেরও উপনয়ন হোক্।' অন্নদাশঙ্করের কাছে তার গায়ত্রীমন্ত্র ইংরাজি শিক্ষা, তার উপবীত ইউরোপের কলের সুতোয় তৈরি। রবীন্দ্রনাথ সম্ভবত একটু ভিন্নভাবে ভেবেছিলেন সমাধানের পথ। 'স্বদেশী সমাজে'র উল্লেখমাত্র যে করলেন না অন্নদাশঙ্কর, সে কি নিছকই বিস্মরণ? তা যদি হত তবে স্বদেশি যুগের কবির কর্মসাধনাকে 'দুর্বলতা' মনে হত কি অন্নদাশঙ্করের?

অন্নদাশঙ্করের কাছে সমাজ ব্যক্তির সমবায়। সেই ব্যক্তিমানুষের সবটুকু রাখাই মানবিকতা। রনেসঁস মানবিকতাকে যদি গতিশীল করে থাকে, অন্নদাশঙ্কর মনে করেন, প্রটেস্টান্ট আর নন্-কন্‌ফর্মিস্টরা করেছে ধর্মকে। শেষের দলের ইউনিটেরিয়ান ভাবনার রামমোহন ও তাঁর ব্রাহ্মসমাজ তেমনই করেছে হিন্দু ধর্মকে, ভারতীয় সমাজকে। আধুনিক যুগে ধর্মকে গতি দিতে পারে, দিয়েছে, বিজ্ঞান। অন্নদাশঙ্কর মনে করেছেন, চীন-রাশিয়ায় ধর্মকে বাদ দিয়েও একটা জাতি ধার্মিক ও নীতিশীল হতে পারল, এই নজির থেকেই রবীন্দ্রনাথ বস্তুবাদকে ধর্মের সঙ্গে মিলিয়ে নিতে চেষ্টা

করেন। 'মানুষের ধর্ম' আর 'ল্যাবরেটরি' মনে পড়েছে অন্নদাশঙ্করের। কিন্তু প্রশ্নের উত্তরে কবির অর্জুনের মতো যুদ্ধপথের নির্দেশ অন্নদাশঙ্করের মনোমতো হয়নি। তিনটি সংশয় বাক্যের পরে চতুর্থ বাক্যেই তাঁকে অবশ্য স্বীকার করতে হয়েছে : 'না, মানবিকবাদও যথেষ্ট নয়।' সম্ভবত সরল অঙ্কের সিঁড়িভাঙা পদ্ধতিতে এমন চিরপ্রশ্নের সমাধান করা যায় না; বিশেষত আমাদের দেশে, আমাদের কালে, এমনকী ইউরোপের ইতিহাসেও।

আসলে অন্নদাশঙ্করের মনের কাঠামো ইউরোপীয় চিন্তায়, হয়ত মুগ্ধতায়ও, গড়া। রবীন্দ্রনাথের স্বদেশ, তাঁর যুগের ধারা অনেক ব্যাপ্ত, অনেক গভীর। অন্নদাশঙ্কর ভাবতে চাইলেও, তাঁর সময়ের অন্য অনেকের মতো রবীন্দ্রনাথের কাছে তাঁর কালের রাজধানী ছিল না লন্ডনে বা প্যারিসে, তাঁর দেশের রাজধানীও সীমাবদ্ধ ছিল না কলকাতায়। না-মেনে উপায় থাকে না, অন্নদাশঙ্করের দেশ তাঁর যুগের ফ্রেমে আঁটা। একা চণ্ডীদাস আর দ্বিজু রায় তাঁকে দেশের ধারার হদিশ দিতে পারেন না। তত্ত্বে শাঁস ছিল, কিন্তু তাঁর তত্ত্বপ্রয়োগের পাত্রটি দুর্বিনীত, কোনও বাঁধনেই তাঁকে ধরা যে সুকঠিন। তা সত্ত্বেও, সিদ্ধান্তের বয়ানে এক প্রণিধেয় সত্য উচ্চারণ করেন অন্নদাশঙ্কর : 'রবীন্দ্রনাথের উপর পাশ্চাত্য প্রভাব পড়েছে এটা আধখানা সত্য। বাকি আধখানা সত্য হচ্ছে পশ্চিমের উপরেও রবীন্দ্রনাথের প্রভাব পড়েছে।' ("পাশ্চাত্ত্য প্রভাব ও রবীন্দ্রনাথ", 'রবীন্দ্রনাথ', ১৯৬১ পৃ ৬৯।) কিন্তু বিশদ করেন না তাঁর বক্তব্য।

সমকালীন এক সাহিত্য-বিতর্কেও অন্নদাশঙ্করের এই দ্বৈধ সত্তা প্রকাশ পায়। যিনি মনে করেন, রবীন্দ্রনাথের ধাতটা রোমান্টিক আর এই রোমান্টিকতা প্রতীচ্যের দান ভারতবর্ষে, তাঁর কিন্তু মেনে নিতে বাঁধে 'নিরুদ্দেশ যাত্রা'য় পাওয়া যেতে পারে বদলেয়র বা র‍্যাঁবোর ছায়া। সে কি তাঁরা ফরাসি বলে? নাকি রলাঁ তলস্তয় সত্ত্বেও তাঁর ইউরোপ আসলে ইংরেজিরই আরশিতে দেখা বলে? কিন্তু আমার কাছে অন্নদাশঙ্করের অসামান্যতা সেখানেই, যখন প্রায় সমগ্র সাহিত্যসমাজ সেই প্রবন্ধকারের নিন্দাসাধে মুখর, অন্নদাশঙ্করই প্রকাশ্য চিঠিতে লিখেছিলেন, 'শতবার্ষিকীর বছরটা কোনো দেশেই কারো বেলাতেই নিছক স্তাবকতার জন্যে নয়। সত্যকে উদ্‌ঘাটন করতে হবেই।... শতবার্ষিকীর দোহাই দিয়ে কাউকে নিরস্ত করা উচিত নয়। করলে নতুন সত্যের আবিষ্কার বাধা পাবে।... বুদ্ধদেববাবুকে নিরস্ত করলে নতুন সত্য আবিষ্কৃত হবে না। আমি তাঁকে উৎসাহ দেবার পক্ষপাতী।' ("চায়ের পেয়ালায় তুফান", 'রবীন্দ্রনাথ', ১৯৬১, পৃ ১৪৭-৪৮।) স্রোতের উজানে কথা বলার স্বাভাবিক তেজ ছিল অন্নদাশঙ্করের। তার পরিচয় বহুবার পেয়েছি আমরা।

রবীন্দ্রনাথের আলোচনায়, এমনকী দীর্ঘকালের ব্যবধানেও নয়, অন্নদাশঙ্করের অবস্থানে কিছু অস্থিরতা লক্ষ করতে পারি আমরা। ১৯২৮-২৯-এ যিনি লিখতে পেরেছিলেন : 'রবীন্দ্রনাথের বাণী সর্বদেশের ও সর্বকালের মর্মের বাণী।... এ বাণী যদি খুব ছোটো হতো, যদি আমাদের উপস্থিত সমস্যাগুলোকে এক নিঃশ্বাসে সমাধান করে দিত, তবে আমরা খুশি হতুম...। আমাদের খুশি করা তো বিদূষকের কাজ। ইনি যে রাজা, এঁর আহ্বান আমাদের রাজ্যভার গ্রহণ করতে,... এঁর বাণী—"আপন মাঝারে গোপন রাজারে প্রাণ যেন তোর পায় রে"। ("রবীন্দ্রাদিত্য", 'প্রবন্ধ', ১৯৬৪, পৃ ৩২০।) ১৯৪১-এ তাঁরই মনে হয়, 'কিন্তু তাঁর ট্র্যাজেডি হচ্ছে এই যে তিনি কারিকরদের সমাজে কক্ষে পাননি। অর্থাৎ কুমোর কামার তাঁতি ছুতোর স্যাকরা শাঁখারি রাজমিস্ত্রিরা তাঁকে সমান ভেবে আপন করে নেয়নি...।' ("রবীন্দ্রনাথ : বিনুর সাক্ষ্য", 'প্রবন্ধ', ১৯৬৪, পৃ ৩৯০।) এর মধ্যে প্রগতির চিন্তা থাকতে পারে, কিন্তু চিন্তার প্রগতি নেই।

৬

আসলে বাঙালি লেখকসমাজের অবস্থানেই ছিল, এখনও আছে, গভীর এক দ্বন্দ্ব : 'যে সমাজে আমাদের কাব্যকলার প্রচার সে সমাজ আমাদের সমাজ নয়, যদিও ঘটনাচক্রে আমরা তার অন্তর্ভুক্ত। আর যে সমাজে আমাদের প্রকৃত স্থান সে সমাজে আমাদের হুঁকো বন্ধ।' (তদেব।) রাজার কাছে আর বিদূষকের কাছে তাই আমাদের প্রত্যাশা হতে থাকে একইরকম। এই চিন্তাবিক্ষেপ অন্নদাশঙ্করকেও বিব্রত করেছিল। তাঁর তর্ক আর তত্ত্ব সর্বত্র না-মিললেও তার থেকে বিচ্ছুরিত হয়েছে উজ্জ্বল বহু বাক্য, প্রণিধানযোগ্য বহু ইঙ্গিত, মান্য বহু সিদ্ধান্ত। সিদ্ধান্তে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই নির্ভুল মনে হয় অন্নদাশঙ্করকে। মনে হয়, সিদ্ধান্ত সামনে রেখে যেন অবরোহ ন্যায়ে যুক্তিবিস্তার করেন তিনি প্রবন্ধে। যুক্তি? শুধু যুক্তি? বাহির কাঠামোয় যাকে অভ্রান্ত প্রমাণ বলে প্রতিষ্ঠা করতে চান তিনি, তারও গভীরে আছে এক নৈতিকতার আবেগ, আর্টের আবেগ, প্রেমের, জীবনের। তাহলে সংকটের দিনে রবীন্দ্রনাথকে রনেসঁসের পক্ষে দাঁড় করিয়ে রনেসঁস = সেকুলার = প্রাকৃতিক = মানবিক = যুক্তি ≠ হৃদয়াবেগ এ-সমীকরণমালা তিনি রচনা করেন কোন বিশ্বাসে? রনেসঁস কি শুধু যুক্তির স্থাপত্য দিয়ে গড়া? ভাস্কর্যে-চিত্রে—রাফেলের মাদোনা, বতিচেল্লির ভিনাসের জন্ম, দা ভিঞ্চির মোনালিসা বা মেদুসা, মিকেলাঞ্জেলোর আদমের জন্ম বা গ্যেটে যাকে বলেছিলেন করুণার মহত্তম প্রতিমা সেই পিয়েতা কি রনেসঁসেরই সৃষ্টি নয়? অন্নদাশঙ্কর রবীন্দ্রনাথকে বলেছেন 'অবাধ্য সন্তান', রনেসঁস যেমন ছিন্নবাধা। বিনু নিজেকে যেমন

বলে পলাতক। কোনও বাঁধন তাঁদের ধরে রাখতে পারেনি। রনেসঁসের ঋত্বিকেরা সৃষ্টির ক্ষেত্রে স্বাধীন, যদিও তাঁদের জীবনের রাশ ধরা ভ্যাটিকানের হাতে। রবীন্দ্রনাথ বা অন্নদাশঙ্করের তেমন কোনও আদেশকর্তা ছিল না। এখানেই রনেসঁসের ওপর আধুনিকের জিৎ। তাহলে যে-অন্নদাশঙ্কর সর্বৈবভাবে স্বকালমগ্ন, আধুনিকসত্তম, কেন তিনি রনেসঁসকেই করে তুলবেন এক সব পেয়েছির দেশ? নাকি রবীন্দ্রনাথের আয়নায় তিনি দেখতে চাইছিলেন নিজেকেই, নিজেরই বাসনার সোনায় রচনা করে তুলছিলেন রবীন্দ্রনাথকে?

প্রতিবেশী সাহিত্য

স্বাধীনতা-পরবর্তী অসমিয়া কবিতা

আশিস সান্যাল

এক ভয়ঙ্কর মাত্রায় চঞ্চল যুগপরিবেশের মধ্যেই শুরু হল অসমিয়া কবিতার নতুন যাত্রা। প্রখ্যাত কবি ও রাজনীতিবিদ হেম বরুয়ার সম্পাদনায় প্রকাশিত হল 'পছোয়া' (West Wind)। কিন্তু দু'বছর পরেই পত্রিকাটির অপমৃত্যু ঘটল। ১৯৫১ সালে প্রকাশিত হল 'রামধনু' পত্রিকা। এই পত্রিকাকে কেন্দ্র করে সূচিত হল অসমিয়া সাহিত্যে নবযুগ। এই যুগের কবিতার বৈশিষ্ট্য আলোচনা করতে গিয়ে বিশিষ্ট কবি ঔপন্যাসিক প্রাবন্ধিক এবং সাহিত্য অকাদেমির প্রাক্তন সভাপতি বীরেন্দ্রকুমার ভট্টাচার্য লিখেছেন—

'জনতার নির্জনতার, প্রগতিশীল-প্রতিক্রিয়াশীল ভাবের অথবা নন্দনতাত্ত্বিক গুণে বা তার অভাবে বিপরীত দ্বন্দ্বের পরিচয় পাওয়া যায় এই সময়ের কবিতায়।' [দেড়শো বছরের অসমিয়া সাহিত্য, ১৯৭৫]

স্বাধীনতার পরবর্তী অসমিয়া কবিতার স্বরূপ বিশ্লেষণে উপরুক্ত অভিমতটি খুব তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে হয় না। এই বিশ্লেষণ যে কোনও সময়ের কবিতা সম্পর্কে করা যেতে পারে। তবে এই সময়ের কবিতাকে যাঁরা বুদ্ধিনিষ্ঠ বলে উল্লেখ করেছেন, তাঁদের অভিমত অধিকন্তু যুক্তিযুক্ত বলে মনে হয়। ১৯৬২ সালে "সঙ্গম" পত্রিকায় হেম বরুয়া 'অসমিয়া সাহিত্যের সমসাময়িক ধারা' প্রবন্ধে এই সময়ের কবিতাকে 'বুদ্ধিজীবী' কবিতা হিসাবে উল্লেখ করেছেন। প্রায় একই মন্তব্য করেছেন নলিনীধর ভট্টাচার্য। তিনি 'অসম সাহিত্য সভা'র মুখপত্রে স্বাধীনতার পরবর্তী অসমিয়া কবিতাকে 'যুক্তিনিষ্ঠ' আখ্যা দিয়েছেন। যুক্তিবাদ আধুনিকতার অন্যতম বৈশিষ্ট্য। আবু সয়ীদ আইয়ুব বাংলায় তাঁর 'আধুনিক কবিতা সংকলন'-এ (১৯৪৭) কবিতার আধুনিকতার বৈশিষ্ট্য নির্ণয়ে মননধর্মিতাকে একটি লক্ষণ হিসাবে উল্লেখ করেছেন। সময়ের যন্ত্রণাকে প্রজ্ঞার আলোকে উপলব্ধি করার মতো বোধ ও বুদ্ধি কবির পক্ষে একান্ত প্রয়োজনীয়। স্বাধীনতার পরবর্তী অসমিয়া এবং বাংলা কবিতাও এই লক্ষণাক্রান্ত। প্রখ্যাত কবি, ঔপন্যাসিক, অনুবাদক ও প্রাবন্ধিক নবকান্ত বরুয়া এই সময়ের কবিতা সম্বন্ধে বলতে গিয়ে বলেছেন, এই কবিতা সমাজ-সচেতন ও মানবতাবাদী। ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবোধ এই সময়ের কবিতার অন্যতম বৈশিষ্ট্য। বিশ্ববোধের সঙ্গে ঐতিহ্যের সমন্বয় ঘটেছে এই সময়ের কবিতায় অর্থাৎ 'রামধনু' যুগের অসমিয়া কবিতায়। তাঁর ভাষায় ঃ 'The new wave may be called socio-humanist in nature, the emphasis being on the individual existence in a geo-historical set up. Their emphasis was a general human values and rejection of readymade solutions supplied by any political and mystical philosophy. Technically, they tried to take up their work with various world movements and trends, at the same time, trying to find a Niche in their own tradition.' [Assemese Literature Since Independence', Indian Literature, 1973]

মানুষকে বাদ দিয়ে সাহিত্য নিরর্থক। স্বাধীনতা-উত্তর অসমিয়া সাহিত্যে এর কিছুটা অভাব লক্ষ করে চন্দ্রপ্রসাদ শইকিয়া অসম সাহিত্য সভার প্রথম বিশেষ অধিবেশনে বলেছিলেন ঃ 'যেহেতু সাহিত্যের মূল বিষয় হল মানুষ, মানুষের প্রতি ধারণা গাঢ়তর করাই হল সাহিত্যের মূল লক্ষ্য অথবা আবেদন, সেজন্য সমগ্র পৃথিবীর মানুষের সম্পর্ক

আবার গাঢ় করতে হবে। বিশ্ব সাহিত্যের সঙ্গে আমাদের সম্পর্কে ঐতিহাসিক পুনরাবৃত্তি ঘটাতে হবে।' [যোড়হাট, কৃষ্ণকান্ত খন্দিকে ক্ষেত্র, অসম ঃ ৩.২.২০০০] স্বাধীনতা পরবর্তী রামধনু যুগের কাব্যে মানবধর্মিতা একটি বিশেষ স্থান অধিকার করে আছে। বীরেন্দ্র ভট্টাচার্যের কবিতায় এই মানবতাবাদের প্রতিধ্বনি শোনা যায়।

হাজার হাজার বছর পরে
আজ মাত্র একটা উতলা অনুভূতি,
অতীতের সব মানব-কীর্তি একটি মধুর প্রেরণা,
মহানগরীর আজ নেই দেবলোক
পথে পথে মানুষের আরাধনা। [ভাত]

রামধনু-যুগের সমাজসচেতন মানবতাবাদী কাব্যধারার এক আশ্চর্য নিদর্শন ছড়িয়ে আছে নবকান্ত বরুয়ার কবিতায়। মানব-প্রীতি এবং বিশ্বের প্রতি ভালবাসা তাঁর কবিতায় সঞ্চার করেছে মানুষের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে এক স্বতন্ত্র বিশ্বাস। অতীত হারিয়ে গেছে। বর্তমানও একদিন অতীত হবে। বর্তমানের জঠর থেকে জন্ম নেবে ভবিষ্যৎ। কবি সেই ভবিষ্যতে রেখে যেতে চান নিজের উত্তরাধিকার। 'মোর আরু পৃথিবীর' (১৯৭৩) কাব্যগ্রন্থের সপ্তম কবিতায় এক সুন্দর উপমার সাহায্যে তিনি ফুটিয়ে তুলেছেন এই উপলব্ধি।

'অণুর সন্তান হল। আমার সন্তান হল। অণু আরু মোর মরম
চেমেহবোর
থূপ খালে ভবিষ্যর স্বপ্নর বুকুত। আমি রই যাম। আম যাম
নবজাতকর স্নায়ুরে স্নায়ুরে, শিরাই শিরাই।'

কেশব মহন্ত স্বাধীনতা-উত্তর অসমিয়া কাব্যজগতে এক বিশিষ্ট কবি। তিনি মানুষের উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে নিশ্চিত। শ্রেণিহীন সমাজব্যবস্থা কায়েম হবেই এবং মানুষ পাবে তার যোগ্য অধিকার। মার্কসীয় দর্শনের প্রভাবে তিনি মনে করেন—একদিন জন্ম হবে নতুন পৃথিবীর। সেখানে শোষিত, লাঞ্ছিত এবং অপমানিত মানুষ হয়ে উঠবে আলোকে উজ্জ্বল।

'যদিও বা তুচ্ছ আমি একবিন্দু শিশিরের মতো
তবুও অসীম ব্যাপ্ত বিরাট সূর্যকে
আলিঙ্গন করে নেওয়া ইতিহাস
আছে সীমিত গর্ভে আমার।'
[শিশিরের দরে অহঙ্কারী]

হেম বরুয়া রাজনীতিবিদ হিসাবে বেশি পরিচিতি অর্জন করলেও রামধনু যুগের সূচনাপর্বে খুবই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছেন। তাঁর মধ্যে এলিয়টের প্রভাবও কিছুটা পরিলক্ষিত হয়। এলিয়টের মতো তিনিও লক্ষ করেন এক বন্ধ্যাভূমিকে। যুদ্ধবিধ্বস্ত পৃথিবীতে সর্বত্র ছড়ানো রয়েছে এক সংশয়। সদ্যসমাপ্ত দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরবর্তী সময়েও এই সংশয় ছিল বর্তমান। হেম বরুয়া লিখেছেন—

'খোলা ডিমে সেঁকা
ওমলেটের মতো
রোদে পোড়া নগ্ন গন্ধ এই পৃথিবীর।'
[জীবনের রং]

'একমুঠি কবিতা'য় অনেকটা বাংলার কবি সুকান্ত ভট্টাচার্যের মতো তাঁর কণ্ঠেও ধ্বনিত হয়—

'চাঁদটাকে সব সময়েই আমার
বিধবা বিধবা বলে মনে হয়।'

প্রফুল্ল ভূঞার কবিতায় এই সময়ের কবিতার কিছু বাস্তব অভিজ্ঞতা ধরা পড়েছে। বিচ্ছিন্নতাবাদ, সাম্প্রদায়িকতা এবং আঞ্চলিকতা যেন গ্রাস করতে থাকে ভারতীয় সমাজকে। কবি তার বিরুদ্ধে লিখলেন—

'অম্লান উন্মাদ মানুহর
অন্তহীন যার ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল রাত্রির দরে।
বিস্মৃতির অন্ধারত আমার অতীত লীন
বিলীন বিস্মৃতি
ভবিষ্যৎ স্বপনোর—যার ভাল পাওঁ মরমর দরে
লীন হৈ থাক, ম্লান হৈ থাক মোর গান।

অবশ্য মনে রাখা দরকার, রামধনু-যুগের কবিতার একমাত্র পরিচয় মানবধর্মিতা নয়। রামধনু-যুগের কবিতার মূল সুরই হল রোমান্টিক। এক্ষেত্রে স্মরণীয় যে, রোমান্টিকতা কোনও একটা বিশেষ সময়ে সীমাবদ্ধ থাকতে পারে না। কবিতার অগ্রগতির ইতিহাসের সঙ্গে রোমান্টিকতা জড়িয়ে আছে। প্রখ্যাত প্রাবন্ধিক লরেন্স ডুরেল বিষয়টির সুন্দর ব্যাখ্যা করে বলেছেন—

'To us living in the fifties, it seems that the pendulum has swing out very far in the direction of romantic or the mystical.'
[Key to Modern Poetry]

কিন্তু অসমিয়া কবিতার পরিপ্রেক্ষিতে এই রোমান্টিকতার নতুন উজ্জীবন বিশেষ প্রয়োজন ছিল। যুদ্ধোত্তর যুগের কবিতা বা 'জয়ন্তী যুগের' কবিতা সম্বন্ধে একটা সময়ে অসমিয়া বুদ্ধিজীবী সমাজে একটা ধারণা প্রচলিত ছিল যে এই কবিতা রোমান্টিকতার বিরোধী। হেমন্ত শর্মা তো স্পষ্টতই লিখেছেন ঃ 'এই কবিতা "রোমান্টিক ভাবধারার পরিপন্থী।" আসলে জয়ন্তী-যুগে অনেকে বস্তুবাদী কবিতা রচনায় উদ্যোগী হয়েছিলেন এবং ইচ্ছে করেই স্বাভাবিক কবি-স্বভাবকে অস্বীকার করে রোমান্টিকতাকে অস্বীকার করতে সচেষ্ট হয়েছিলেন। এতে কবিতা অনেকটাই কৃত্রিম হয়ে যায়। রামধনু যুগ বলা যেতে পারে, এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ।'

কবিতায় আমরা বিশ্বজনীনতা প্রত্যাশা করি। হেম বরুয়া বিষয়টি খুব সুন্দরভাবে উপস্থাপিত করে বলেছেন ঃ 'অনেকেই সাহিত্যিকের কাছে জীবনসত্য প্রকাশকেই প্রত্যাশা করেন। এ হল বিষয়বস্তুর কথা। কেবল বিষয়বস্তু সাহিত্য হয় না। ...সাহিত্যে একটা বিশ্বজনীন সত্য আছে। এই সত্যকে অস্বীকার করার অর্থ হল সাহিত্যে বিশ্বজনীনতা অস্বীকার করা।' [আমার সাহিত্যের স্বরূপ] আসলে কবিতা হল কবির আত্মগত হবার মাধ্যম। দৃশ্যমান বস্তুজগতের আলো-অন্ধকার কবির মনের বীণায় যখন ঝঙ্কার তোলে, তখন তার রূপময় প্রকাশ ঘটে সাহিত্যে—বিশেষ করে কবিতায়। রামধনু-যুগের কবিতার অন্যতম বৈশিষ্ট্য হল এই রোমান্টিকতা—কবিতাকে কবিতার দিকে ফিরিয়ে আনার প্রয়াস।

নিসর্গপ্রীতি রোমান্টিক কবিতার অন্যতম বৈশিষ্ট্য। বিশ্বের সমস্ত সাহিত্যেই রয়েছে এর নিদর্শন। প্রকৃতির বিভিন্ন রূপের মধ্যে বসন্তকে বিশেষ স্থান দিয়েছেন কবিরা। কণকচন্দ্র শর্মা তাঁর 'সাহিত্য সংবাহন' গ্রন্থে 'বসন্তর কবিতা' শীর্ষক আলোচনায় বিষয়টিকে বিস্তারিত করেছেন। তাঁর ভাষায়—

> 'প্রকৃতির বিভিন্ন রূপর মাজত বসন্তকালের রূপও চিরদিন কবি সকলক আকর্ষণ করি আহিছে। লোকসাহিত্য আরু লোকগীতসমূহর মাজত বসন্তর বর্ণনা আরু চিত্রকল্প বর্ণই বিদ্যমান। ...সাম্প্রতিক অসমিয়া কবিতাত বসন্তর ওপরত পরিবর্তিত-ভাবধারাই প্রচুরভাবে প্রভাবান্বিত করা যাই। কিন্তু দুই এজন কবির চিন্তাধারাত এই যুগর সামাজিক পরিবেশর বারে বসন্তর পূর্বর রোমান্টিক আবেদন হেরাই যোবার কথা প্রকাশ পাইছে।'
>
> [কণকচন্দ্র শর্মা ঃ সাহিত্য সংবাহন]

কেশব মহান্তর কবিতায় যেন বসন্ত অবসিত হয়েছে—এরকম একটি ভাব ফুটে উঠেছে। নবকান্ত বরুয়া কিন্তু বসন্তের ভিন্ন রূপ দেখেছেন।

'সই যে ফাগুন, হায়, সই জানো খবর আনিব পারো
নতুন খবর বুলি হয়তো আনো সই
সনাতন আদিম খবর
যি খবর লেখা আছে বরিষার চকুলোত
শরতর ব'রাগী মেঘত
হেমন্তর খোলা আকাশত
একোটি খবর সেই আদিমতম প্রথম প্রেমের...

[চকুপানী ঃ ফাগুনর]

রাম গগৈ দিয়েছেন শরতের বর্ণনা। তিনি শরতের বর্ণ নয়, বৃত্তিকে স্পর্শ করেছেন। তাঁর ভাষায়—

'পরে একদিন শরতের এক রাতে আবার দেখলাম
কাঁচা হলুদ রঙের একটি চাঁদ
আকাশে ছিল ঝুলে।
অনেক নক্ষত্র-স্বপ্ন, স্বপ্নের শিখায় পুড়ে
সোনালি উজ্জ্বল হয়ে ফুটেছিল সেখানে
যেখানে আমার হৃদয় আকাশ—
আকাশ হয়ে গেল সেদিন।'

সমাজ-জীবনের এই সংকটময় মুহূর্তে কয়েকজন কবির রচনায় ফুটে উঠেছে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবোধ, যা অস্তিত্ববাদী দর্শনের প্রায় অনুরূপ। এর পাশাপাশি এলিয়ট, পাউন্ড, বোদলেয়র প্রমুখ বিদেশি কবিদের প্রভাবও লক্ষ করা যায়। এর প্রতিক্রিয়ায় অবিশ্বাস ও নৈরাশ্যবাদী চিন্তা-ভাবনা প্রকট হয়ে ওঠে অসমিয়া কবিতায় স্বাধীনতার পরবর্তী সময়ে। দীনেশ গোস্বামীর কবিতায় এই অনুভূতির প্রকাশ লক্ষণীয়। একটি কবিতায় তিনি লিখেছেন—

'অরণ্যে জন্ম এটা হৈছিল বিস্ময়,
কিন্তু কি সেই পথ?
জীবমৃত এক মাংসখণ্ড প্রসব করি
জননী মূর্ছিত হই মরিছিল আতঙ্কিত লজ্জাত।' [শবযাত্রা]

প্রতীকীবাদী শুদ্ধ কবিতা স্বাধীনতার পরবর্তী অসমিয়া কবিতার একটি উজ্জ্বল ধারা। এই ধারার অন্যতম প্রধান কবি হলেন নীলমণি ফুকন। সমাজ-জীবন থেকে রসদ সংগ্রহ করেই তাঁর কাব্যচর্চা। প্রতীকী উচ্চারণে তিনি তাঁর কবিতাকে প্রতিষ্ঠা করেন। নিজের কবিতা সম্বন্ধে তিনি বলেছেন ঃ 'আধা আলো, আধা অন্ধকারের মধ্যে উদ্যোগী রসিকজন অভিজ্ঞতার আলোকে সন্ধান করে সেই কবিতার ভাব-সুষমার মর্ম—তার অন্তর্নিহিত অনাবিল সঙ্গীতের লহরী।' [আমার কবিতা ঃ নেপথ্যের কথা—হীরেন গোঁহাই সম্পাদিত 'সাগর তরঙ্গ শঙ্খ' থেকে।] তাঁর কবিতায় সৃষ্টি হয় সুরের ঝঙ্কার। ফরাসি প্রতীকী কাব্য আন্দোলনে এরকম একটা উপলব্ধির কথা শোনা গিয়েছিল। তাঁর কবিতার নিদর্শন হিসাবে একটি কবিতার কিছু অংশের বাংলা অনুবাদ উল্লেখ করছি।

'আমার শূন্যতায়
তোমার বিহার
মধ্যরাতে ক্ষণমুহূর্তের জন্য ফোটা ফুলের মতো
তোমার অস্তিত্ব
মৃতের নিমীলিত চোখ বেয়ে আসা যেন
এক বিন্দু অশ্রু।'

অব্যক্ত অথচ প্রকৃতিশোকে প্রকাশিত মানুষ তখনই একে অন্যের সঙ্গে পরিচিত হয় যখন কোনও অলৌকিক আশ্চর্য

অনুভূতির প্রকাশ ঘটে মনের মণিকোঠায়। সময় এবং ইতিহাসকে স্পর্শ করে নির্মলপ্রভা বরদলৈয়ের কবিতায় এ রকম অনুভূতির প্রকাশ লক্ষ করা যায়।

'বন্দুকের শব্দে/কখনও ভোর হয়!
কখনও না—
ভোর হয় পাখির কাকলিতে/যে পাখিরা
সমস্ত রাত/অন্ধকারে ঠুকরেছে।'

হেমেন বরগোহাঞিঁর কবিতায় লক্ষ করা যায় নগরজীবনের যান্ত্রিকতার বাইরে এক কাঙ্ক্ষিত শান্তি। সেই কাঙ্ক্ষিত শান্তি খুঁজে পান না কবি। তাঁর মনে হয়—

'শান্তির আশ্বাস নাই, জীবনের ধ্রুপদী বিশ্বাস
আত্মার ঐতিহ্য প্রেম, বিষ যন্ত্রণায় জর্জর
বুদ্ধির আলোক ব্যর্থ, অর্থহীন কর্মের প্রেরণা।'

স্বাধীনতা-উত্তর অসমিয়া কবিতার আর একটি সমৃদ্ধ ধারা হল প্রগতিশীল কবিতার ধারা। বাংলা কবিতার মতোই এই কাব্যধারার কেউ-কেউ ছিলেন মার্কসবাদে দীক্ষিত। 'জয়ন্তী' (১৯৪৩) পত্রিকাকে কেন্দ্র করে এই কাব্যধারার সূত্রপাত। সামাজিক সাম্য এবং অর্থনৈতিক সমতাকে আদর্শ করে রচিত হতে থাকল কবিতা। এই কাব্যধারার কবিরা বাংলার প্রগতিশীল কবিদের মতোই মনে করতেন ঃ 'বর্তমান জগতর যি সাহিত্যত মানুহর সমস্যা নিয়ে আলোচনা ও সংগ্রাম ধ্বনি আছে, তাকে প্রগতিমূলক সাহিত্য বোলে।' কিন্তু এই কাব্যধারার গতি কিছু সময় বাদেই তার তীব্রতা হারায়। কারণ হিসাবে বলা হয়ে থাকে যে, কবিতায় ব্যঞ্জনা সৃষ্টির পরিবর্তে বক্তব্য প্রাধান্য পাওয়াই এর কারণ। তাছাড়া অনেকেই মার্কসবাদের অন্তর্নিহিত সত্যকে অনুধাবন না করে কেবলমাত্র সমাজ-বদলের ভাবনায় ভাবিত ছিলেন। সৈয়দ আবদুল মালিকের কথাই ধরা যাক। তিনি সেই সময় লিখেছিলেন—

'মই বুজি পাওঁ ডাবার বচন
হিরা মাণিক থাকয় এপার,
খুদ নহযে মরণেই সার;
বাকি সব বাজে কথা।'

এর মধ্যে মার্কসবাদের চেয়ে উদারনৈতিক মানবতাবাদ বেশি স্পষ্ট। সৈয়দ আবদুল মালিক যে মানুষের মুক্তির প্রেরণা গান্ধীবাদের মধ্যেও খুঁজেছিলেন, তার পরিচয় রয়েছে তাঁর পরবর্তী কবিতায়।

স্বাধীনতার পরবর্তী এই ধারার বিশিষ্ট কবিদের মধ্যে অমলেন্দু গুহ, বিষ্ণু রাভা, কেশব মহন্ত, রাম গগৈ, হীরেন গোহাঁই, হেমাঙ্গ বিশ্বাস প্রমুখ উল্লেখ্য। অমলেন্দু গুহের কবিতায় মার্কসীয় চেতনায় উদ্বুদ্ধ আন্তর্জাতিকতা-বাদের পরিচয় পাওয়া যায়। 'লুইত পারর গীত' কবিতায় তিনি হোয়াংহো থেকে মিসিসিপি এবং ব্রহ্মপুত্র থেকে ভল্গা পর্যন্ত শোষিত জনতার সঙ্গে একাত্মতার কথা বলেছেন।

'ভাই বুলি মাত শুনি দেশে দেশে হব জন-সমুদ্র উদ্বেল
যুদ্ধর রসদ লৈ ন চালিব রে।'

কবীন্দ্র সরকারের উপলব্ধি—

'বৈশখর ভয়ঙ্কর অন্ধকার
টুকুরা টুকুরা করি
জেনারেল, তোমার বুকুত বাজি উঠক
বিউগল আরু ঘোড়ার খুরার শব্দ।'
[নাগরিক]

ষাটের দশকের মধ্যভাগ থেকে এই মার্কসবাদী চেতনাসম্পন্ন কাব্যধারা অসমিয়া কাব্যজগতে অপর এক আন্দোলনের সৃষ্টি করেছে—যা মূলত মানবিক। এই কাব্যধারার অবদান সম্পর্কে হেম বরুয়ার বক্তব্যই তুলে ধরছি। তিনি বলেছেন ঃ 'This progressive party tried to vindicate the rights of the toiling masses in field and factory from capitalist exploitation'. মনে রাখতে হবে, স্বাধীনতা পরবর্তী অসমিয়া কাব্যধারায় এই প্রগতিশীলতা স্তিমিত হলেও অস্তমিত হয়নি। গোবিন্দপ্রসাদ শর্মা এই কাব্যধারায় বিভিন্ন ভাবাদর্শের সমন্বয়ের কথা উল্লেখ করে যা বলেছেন, তা প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যেতে পারে। তাঁর ভাষায়—

'In the progressive school itself in Assam, we find...not only the writers with pure Marxist commitment but also those who with Gandhian nationalist ideal, even through Marxism or Communism does not seem to go hand in hand with Gandhian or bourgeosis nationalism'.
[Contribution of Assemes Writers to National Freedom Movement]

স্বাধীনতার পরবর্তীকালেও সক্রিয় ছিলেন কবি অম্বিকাগিরি রায়চৌধুরী। তাঁর কবিতায় সাম্প্রদায়িকতা ও বিচ্ছিন্নতাবাদের বিরুদ্ধে শোনা যায় সুতীব্র প্রতিবাদ। 'সাগর দেখিছা' গ্রন্থের কবি দেবকান্ত বরুয়া রাজনীতিবিদ হিসাবেই বেশি পরিচিত। গ্রন্থটি ত্রিশের দশকে প্রকাশিত হলেও, তার দ্বিতীয় সংস্করণে, যা স্বাধীনতার বহু পরে প্রকাশিত, তাতে যে চারটি কবিতা অতিরিক্ত সংযোজিত হয়েছে, সেগুলি সমাজ-চেতনা ও দেশপ্রেমের নিরিখে খুবই উল্লেখ্য। ভারতে চীনা আক্রমণের পরিপ্রেক্ষিতে রচিত তাঁর উক্ত গ্রন্থের 'মোর দেশ মনুহর দেশ' থেকে কয়েকটি পংক্তি উদ্ধৃত করা হচ্ছে।

'মোর দেশ মানুহর দেশ।
উত্তরে উত্তুঙ্গগিরি, দক্ষিণে সাগর
শত নদী বুকেরে বাগরে
পারে পারে সাজে ভাঙে কত ইতিহাস,
ব্রহ্মপুত্র, গোদাবরী, শিপ্রা আরু গঙ্গা-যমুনার।
সুন্দরী ভারতবর্ষ, রূপসী অসম।

এই দেশ রাখিব লাগিব।
এই খন আপোনার দেশ
এই খন মরমর দেশ
এই খন মানুহর দেশ।

সমকালীন বিশ্বের রাজনৈতিক ঘূর্ণাবর্তে আবর্তিত ঘটনাবলির উল্লেখও দেখতে পাওয়া যায় কারও কারও কবিতায়। ভিয়েতনাম, কঙ্গো, চিলি, কিউবা বা পৃথিবীর অন্যান্য স্থানে যেখানে অবনমিত হয়েছে মানবতা, সেখানকার প্রেক্ষাপটে ব্যথিত কবির কণ্ঠে শোনা যায় বলিষ্ঠ প্রতিবাদ। রাম গগৈ লিখেছেন—

'মেকং-এর বিস্তৃত উপকূলের ঘন অরণ্যে
রক্তমারা জাকর্তার পথে
এবং রুঙ্গোর সমর ক্ষেত্রে
অগ্নিস্নাতা ভিক্ষুনির সরল কণ্ঠে
মুখরিত সেই ধ্বনি আমার হৃদয়ে।'

ষাট দশক থেকে অসমিয়া কবিতার বৈচিত্র যে কোনও ভারতীয় ভাষায় রচিত কবিতার সমকক্ষ অথবা উন্নত। 'রামধনু' পত্রিকার প্রকাশ বন্ধ হয়ে যায় ১৯৬৬ সালে। কিন্তু অস্বীকার করবার উপায় নেই যে, এই সময়ের পরবর্তী কবিতাও রামধনু-যুগের অনুসৃতি এবং অসমিয়া কাব্যসাহিত্যে যোগ করেছে একটি নতুন মাত্রা। উত্তর-রামধনু-যুগের অসমিয়া কবিতার বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে আলোচনা করতে গিয়ে আনন্দ বরমুদৈ 'উত্তরায়ণ' পত্রিকায় বলেছেন ঃ

'এই যুগের কবিতা হয়ে পড়েছিল বুদ্ধিদীপ্ত, চিন্তা-অনুভূতি, আবেগের সংমিশ্রণে গড়ে ওঠা স্বয়ং-সম্পূর্ণ শাব্দিক নির্মাণ। চিত্রকল্প আর প্রতীকের কলাকৌশল কবিরা আয়ত্ত করে বিভিন্ন ধরনের রমব্যাসবাদী কবির শিথিল এবং অসংযত ভাবোচ্ছ্বাসকে নিয়ন্ত্রণ করে কবিতাকে ধীশক্তি নির্ভর আর সংযত করেছে।'

[প্রস্তাবনা সংখ্যা, মার্চ ২০০০ সাল]

উত্তর-রামধনু যুগের কবিতা অর্থাৎ ষাটের পর থেকে লেখা কবিতা আসলে রামধনু যুগের কবিতার সম্প্রসারিত রূপ। তাছাড়া এই সময়ের কবিতায় আঙ্গিকের প্রতি সচেতনতাও বৃদ্ধি পেতে দেখা যায়। নীলমণি ফুকন 'কুড়ি শতিকার অসমিয়া কবিতা' সংকলনের ভূমিকায় খুব সুন্দরভাবে বিষয়টি উপস্থাপন করেছেন। তিনি লিখেছেন ঃ 'জয়ন্তী যুগের কবিতায় একটা নতুন চেতনা ও বলিষ্ঠতা লক্ষ্য করা গিয়েছিল ঠিক, কিন্তু এই সময়ের কবিতা রসোত্তীর্ণ হতে পারেনি।' অবশ্য এর অর্থ এই নয় যে, উত্তর-রামধনু-যুগের কবিদের সকলেই ছিলেন আঙ্গিকের প্রতি যত্নহীন। 'রামধনু' যুগের শেষদিকে যাঁরা কাব্য রচনায় অগ্রসর হয়েছিলেন, তাঁরাই নির্মাণ করেছেন এই সময়ের কবিতার পটভূমি। নীলমণি ফুকন, নির্মলপ্রভা বরদলৈ, হীরেন ভট্টাচার্য এবং নবকান্ত বরুয়া এই নির্মাণ কাজের হোতা ছিলেন বলা যেতে পারে। নতুন কবিদের মধ্যে হরেকৃষ্ণ ডেকা, সৈয়দ আব্দুল হালিম, শিবপ্রসাদ বরুয়া, অজিত গগৈ, চেনিরাম গগৈ, আজিজ-উজ-জামাম, কৌস্তভমণি শইকিয়া, হীরেন্দ্রনাথ দত্ত, রবীন্দ্র সরকার, অবনী চক্রবর্তী, কবিন ফুকন, সনন্ত তাঁতী, রফিকুল হোসেন, লুৎফা হানুম সেলিনা বেগম, জ্ঞান পূজারী, সমীর তাঁতী, নীলম কুমার, প্রয়াগ শইকিয়া, হেমাঙ্গ দত্ত, অনুভব তুলসী, অতনু ভট্টাচার্য, বিপুলজ্যোতি শইকিয়া, জীবন নারা, প্রদীপ আচার্য, মোহনকৃষ্ণ মিত্র, গৌতমপ্রসাদ বরুয়া, অনুপমা বসুমাতারি, রাজীব বরুয়া, কাব্যশ্রী মহন্ত বিশেষ উল্লেখ্য। নিদর্শন হিসাবে আজিজ-উজ-জামালের কবিতা থেকে কয়েকটি লাইন তুলে ধরা হচ্ছে।

'অচিন যন্ত্রণার গড়াত
মোর চিন্তার সোঁতে ঠেকা খায় :
স্মৃতিয়ে তোমার আড়াল দিথয়।
শেষ নিশা তোমার মুখত
মোর প্রেমরেই সপনোর ছা।'

মোহনকৃষ্ণ মিশ্রের কবিতায় ফুটে উঠেছে সমাজমনস্কতা। বাংলার সমাজমনস্ক কবিদের মতোই তাঁর কবিতায় দেখতে পাই বর্তমান সামাজিক ও রাজনৈতিক পরিস্থিতির প্রতি ঘোর অবিশ্বাস। তবে এই অবিশ্বাসের মধ্যে কোনও ধ্বংসাত্মক চিন্তা নেই। রয়েছে নতুন জাগরণের প্রতি গভীর আস্থা।

'মানুহ শেষে গান গাইছিল
কাতর সৃষ্টিরে মারি আছিল
পাখি ডগা চরাইটো।
চরাইটোরে ধরকরাইছিল, আরু
মানুহবোরে এ কেদরেই গান গাই আছিল।

[চারিটি কবিতা]

সৌরভকান্তি শইকিয়ার কবিতায় শুনতে পাওয়া যায় উজ্জ্বল ভবিষ্যতের সঙ্গীত। তিনি বলেন—

'মোর পৃথিবীর দুখ কি
মোর কলিজারে শুনো হেজার বিজার কলিজার ধরনি
কবিতা, তোমার অস্ত্রেরে মই যে আনি পৃথিবী প্রেমর করি
অনন্ত জীবন স্মর উতলা করিছে আজি মোর বিরহী।'

[মোর পৃথিবীর দুখ কি]

গৌতমপ্রসাদ বরুয়া চারপাশের রুক্ষতার মধ্যে গেয়েছেন জীবনের জয়গান। তিনি আশাবাদী। এই আশাবাদের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে মানবতাবাদ। এই মানবতাবাদ কোনও বিশেষ রাজনীতির ছত্রছায়ায় গড়ে ওঠেনি। তাঁর উপলব্ধ চেতনায় উচ্চারিত হতে শুনি—

'আমার পৃথিবীখনো ঘুরি রল
সমাজর নেদেখা অক্ষ আরু দ্রাগিমাত
দীঘ আরু বাণীর রেখাত গরম
সূর্য নামি আহিব এতিয়া হৃদয়ত।'

[সূর্য নামি আহিব এতিয়া হৃদয়ত]

ষাটের পর অসমিয়া কবিতার বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে বিশিষ্ট অনুবাদক ও সমালোচক প্রদীপ আচার্যের মন্তব্য প্রসঙ্গত এখানে উল্লেখ করছি। তিনি লিখেছেন ঃ

'Recent Assemese poetry refuses stubbornly to be marginalised. The poets have readily emerged from the shell of quietism, a regionalist equivalent of the earlier escapism. The poety even participates in the current of history. This participation sidesteps totalizing structures and ideologies. The poets themselves do not admit of any categorization, but each of them, while out his separateness, is found to respond to the consequences of violences leading to the proliferation of elegiac responses and almost impersonal, long, narratives.'

[Indian Literature, Jan-Feb, 1997]

চতুরঙ্গ-এর পরবর্তী সংখ্যা বেরুবে মে '০৬-তে
পত্রিকা দপ্তরে যোগাযোগের সময়
প্রতি মঙ্গল ও শুক্রবার
বিকাল ৫টা থেকে রাত ৮টা

প্রসঙ্গ ইতিহাস ও সংস্কৃতি

নিখিলেশ্বর সেনগুপ্ত

ইতিহাস রচনার ইতিহাস জানা যেমন জরুরি, তেমনই ঐতিহাসিককে জানাও খুব জরুরি। অধ্যাপক দিলীপকুমার বিশ্বাস গবেষক ছিলেন। ইতিহাসের বই লিখেছেন। প্রবন্ধ লিখেছেন। সম্পাদনা করেছেন। তিনি ঐতিহাসিক ছিলেন। তাঁর ইতিহাস-চর্চার ক্ষেত্র কোনও সংকীর্ণ গণ্ডিতে সীমাবদ্ধ ছিল না। ইতিহাসের প্রাচীন-মধ্য-আধুনিক যুগ ভাগ করে চর্চার বা আরও সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিশিষ্টতার পাঠ সম্পর্কে যে উদ্দীপনা দেখা দিয়েছে তা অনেক ক্ষেত্রে অন্ধের হস্তিদর্শনে পর্যবসিত হচ্ছে। কিন্তু দিলীপকুমার বিশ্বাস বোধহয় ইতিহাস-চর্চায় সামগ্রিকতাকে এড়িয়ে খণ্ড বিশেষজ্ঞ হয়ে ওঠায় বিশ্বাসী ছিলেন না। সামগ্রিককালের ইতিহাস ও সংস্কৃতি তাঁর রক্তে মিশে গিয়েছিল। ধর্মের ইতিহাস তাঁকে অন্ধতার দিকে নিয়ে যায়নি, বরং মুক্ত করেছিল। সমস্ত কিছুর মধ্যেই তিনি সামাজিক কার্যকারণ খুঁজেছেন।

সম্প্রতি দিলীপকুমার বিশ্বাসের '*ইতিহাস ও সংস্কৃতি*' নামে একটি বই প্রকাশিত হয়েছে। এটি তাঁর বিভিন্ন সময়ে লেখা প্রবন্ধের সংকলন গ্রন্থ। প্রথম খণ্ড। এতে মোট আটটি প্রবন্ধ সংকলিত হয়েছে। এই প্রবন্ধগুলি মূলত ইতিহাস ও ঐতিহাসিকদের ওপর তত্ত্বগত আলোচনা। ঐতিহাসিকেরা ইতিহাসকে কোন দৃষ্টিতে দেখেছেন, তাঁদের আলোচনার ধারা, বিষয় নির্মাণ প্রভৃতিকে লেখক ফুটিয়ে তুলেছেন। এই বইটি পূর্ব-পরিকল্পিত 'থিম'-ভিত্তিক রচনা নয়, বিভিন্ন সময়ে লেখা বিচ্ছিন্ন প্রবন্ধের সংকলন; কিন্তু নির্বাচিত প্রবন্ধগুলি একটি সূত্রে গ্রথিত হয়ে ইতিহাস-সংস্কৃতি ভাবনার বিশেষ একটি দিককে উন্মোচিত করেছে। বইয়ের ভূমিকায় আছে ঃ দিলীপকুমারের 'জ্ঞানতপস্বী জীবনে তিনি ভারত-ইতিহাসের জটিল ও গভীরতর দিকগুলি নিয়ে নিরলসভাবে চর্চা করেছিলেন। তার ফসল তিনি রেখে গেছেন নানা সময় ও উপলক্ষে রচিত তাঁর মূল্যবান কিছু প্রবন্ধে। সেই প্রবন্ধগুলির বিষয় ও বিচার পদ্ধতির সঙ্গে পরিচয় না হলে ঐতিহাসিক দিলীপকুমার সম্পর্কে ধারণা শিক্ষিত পাঠকসমাজে খণ্ডিত থেকে যাবে। তাঁর জীবনাবসানের পর তাই সেই প্রবন্ধগুলিকে সংকলিত করে দুই খণ্ডে প্রকাশ করার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।'

এই বইয়ের প্রথম প্রবন্ধ 'ভারতবর্ষের ইতিহাসে ধর্ম-সমন্বয় ও সামাজিক সংযোগ' একটি কালোপযোগী রচনা। ইদানীং ভারতবর্ষের ধর্ম-বিশ্বাসী মানুষের মধ্যে ধর্মকেন্দ্রিক যে দ্বন্দ্ব বা উন্মাদনা সামাজিক ও রাজনৈতিক পরিস্থিতির জটিল আবর্ত সৃষ্টি করেছে তা থেকে মুক্তির উপায় কী সে সম্পর্কে ইতিহাস-সচেতন সমাজ-বিজ্ঞানীদের ভূমিকাকে অস্বীকার করা যায় না। একথা অনস্বীকার্য যে সামাজিক জীবনে ধর্মীয় শিকড় এত গভীরে চারিয়ে গেছে যা ভারতীয় সমাজে ভিন্ন মাত্রা এনে দিয়েছে। তথাকথিত কপট ধর্মনিরপেক্ষতার ধ্বজা সেখানে ভেঙে পড়ে। নিরন্তর ধর্মীয় দ্বন্দ্বের মধ্য দিয়ে বিকশিত সমাজ কোন সত্যকে আশ্রয় করে প্রতিষ্ঠা পাবে তা ধর্মাশ্রয়ী মানুষকে ভাবায়। বিভিন্ন ধর্মের ভিতরে ও বাইরের সম্পর্কই শুধু নয়, প্রত্যেকটি ধর্মের সহনশীলতা ও মৌলবাদী সংঘাতের যে চিত্র ভারতের ধর্মীয় ইতিহাসে দেখা যায় সেগুলি নিপুণ বিশ্লেষণের মধ্য দিয়ে দেখা দরকার ভারতীয় সমাজে ধর্মের অবস্থান কোথায়। দিলীপকুমার বিশ্বাস দেখিয়েছেন, আধ্যাত্মিক সত্যগুলি ব্যক্তিকেন্দ্রিক ও ব্যক্তিনির্ভর—এই দু'ভাবে উপস্থাপিত হয়। 'স্বাভাবিকভাবে গড়ে ওঠা ধর্মগুলির সূচনা ইতিহাসের কোনো কালবিন্দুতে নির্দিষ্ট করা সম্ভব নয়। দীর্ঘ বিবর্তন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে এগুলি পরিণত রূপ গ্রহণ করে, নানা সূত্র থেকে নানা বিচিত্র উপাদান আহরণ করে এদের ভাবশরীর ও বস্তুশরীর পুষ্ট হয় এবং স্বভাবত আদিম, স্থূল ও সময় সময় কিছুটা বর্বর সংস্কারের সঙ্গে সুমার্জিত সুগভীর আধ্যাত্মিকতা এবং সব ধর্ম একত্র সহ-অবস্থান করে এমনকি অনেক সময় পরস্পর মিলেমিশে জড়িয়েও থাকে।'—এর মধ্যেই দেখা যায় ধর্মীয় সহনশীলতা। অবশ্যই ধর্মীয় সহনশীলতা থেকে জন্ম নিতে পারে ধর্মনিরপেক্ষতা। লেখক খুব সুন্দর বিশ্লেষণের মধ্য দিয়ে ভারতীয় ও গ্রিকদের প্রায় একই ধরনের ধর্মীয় চরিত্রের বৈশিষ্ট্যগুলিকে তুলে ধরেছেন। আবার বৈসাদৃশ্যগুলিও দেখিয়েছেন অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে। শেষ পর্যন্ত গ্রিসে ধর্মসমন্বয় না হলেও 'ভারতবর্ষে ধর্মসমন্বয়ের প্রচেষ্টা বৈদিক আর্য সভ্যতার যুগ থেকেই শুরু হয়েছিল।' ধর্মের জন্য অসহিষ্ণুতা, রক্তক্ষয়ী সংগ্রাম যে প্রকৃত পথ হতে

পারে না; অন্য ধর্মের প্রতি সহনশীলতার মধ্য দিয়ে আত্মস্থ করে নেওয়ার যে প্রক্রিয়া তা তো ভারতীয় সংস্কৃতিরই অঙ্গ। দিলীপবাবু লিখেছেন, 'সর্ব সম্প্রদায়ের প্রতি এই সহিষ্ণু মনোভাবের জন্য ভারতভূমি এককালে ইতিহাসে নিপীড়িত বিদেশীদের আশ্রয়স্থল হওয়ার গৌরব অর্জন করেছিল। ...বিভিন্ন যুগে পৃথিবীর নানা প্রান্ত থেকে বহু বিদেশী গোষ্ঠী তাদের ভাষা সংস্কৃতি সমাজব্যবস্থা ও ধর্ম নিয়ে ভারতে প্রবেশ করেছে এরা ভারতীয় সংস্কৃতিকে প্রভাবিত করেছে, ভারতবর্ষের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছে।' আর অধ্যাত্মক্ষেত্রে 'সহনশীলতা' ও 'গ্রহণশীলতা' তো ছিলই। এর একটি উল্লেখযোগ্য উদাহরণ, আলোচ্য গ্রন্থের লেখকের ভাষায় ঃ 'ভারতবর্ষীয় ধর্মচিন্তার যে সমন্বয়মুখিনতা এবং পরধর্মসহিষ্ণুতা বৈদিককাল থেকেই আভাসিত তার একটি শ্রেষ্ঠ বিকাশ ঘটেছে অশোকের দৃষ্টিভঙ্গিতে এবং শাসন নীতিতে। বিভিন্ন সম্প্রদায়ের প্রতি তাঁর উদার ও অনুকূল মনোভাব, পারস্পরিক আলোচনার মাধ্যমে ধর্মের সারবস্তুর প্রতি অনুরাগ বৃদ্ধি ও কল্যাণবুদ্ধি সঞ্চারের জন্য আন্তরিক প্রচেষ্টা আজও আমাদের মনে বিস্ময় ও শ্রদ্ধা জাগায়।' কিন্তু পরবর্তীকালে বহিরাগত ও অভ্যন্তরীণ ধর্মের মিথষ্ক্রিয়ার ফলে যে ধর্মীয়-সামাজিক অবস্থার উদ্ভব হল তা সম্পূর্ণই আলাদা, নতুন; পূর্ব-পরিস্থিতির সঙ্গে মেলে না। ধর্মীয় সম্প্রদায়গুলির মধ্যে ফারাক বেড়েছে ক্রমশ। তবু সেখনে সমন্বয়ের চেষ্টা অব্যাহত থেকেছে। এই সমন্বয়সাধনের প্রচেষ্টার মূল ভিত্তি ছিল লৌকিক। 'লৌকিক স্তরের এই প্রয়াস মধ্যযুগের ভক্তি-আন্দোলনের মধ্যে পূর্ণ প্রতিফলিত এবং তা হিন্দু-মুসলমান ধর্মতত্ত্বের বিশেষত অনুভূতি মার্গের পারস্পরিক প্রভাবসঞ্জাত যুক্ত সাধনার ফল।' এই যুক্ত সাধনাই অসাম্প্রদায়িকতার জন্ম দিয়েছে। 'শাস্ত্রের শাসন এবং সমাজপতিদের রক্তচক্ষুকে তুচ্ছজ্ঞান করে সাম্প্রদায়িকতা ও সর্ববিধ সংস্কারের বেড়া ভেঙে' মানবিক ধর্মই মুখ্য আসন লাভ করেছে। দিলীপকুমার বিশ্বাস দীর্ঘদিন ধর্মের ইতিহাস চর্চা করেছেন। তাঁর স্বচ্ছ দৃষ্টিভঙ্গি ধর্মীয় সমস্যায় বিহ্বল মানুষকে মৌলবাদ অতিক্রম করে পরমত সহিষ্ণু ও সমন্বয়বাদী হতে শেখাবে আশা করা যায়।

'জাতিপ্রতিষ্ঠাতত্ত্ব ও বঙ্কিমচন্দ্র' এই বইয়ের দ্বিতীয় প্রবন্ধ। জাতীয়তাবোধ জাগিয়ে তোলার ক্ষেত্রে বঙ্কিমচন্দ্রের দান অনস্বীকার্য। কিন্তু লক্ষণীয়, গোটা ভারতবর্ষ জুড়ে বহু জাতি, বহু ধর্ম, বিচিত্র সংস্কৃতির অস্তিত্ব থাকলেও একই জাতিসত্তা ও ঐক্যবদ্ধ জাতীয়তাবোধ এদেশের মানুষকে একই সূত্রে বেঁধেছে। বঙ্কিমচন্দ্র স্বদেশীয় ইতিহাসের অনুসন্ধান করেছেন, অন্যদের অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হতে উৎসাহ জুগিয়েছেন, ইংরেজদের ভাবনার বিচ্যুতি সম্পর্কে সতর্ক করেছেন। ভারতীয় জাতিসত্তা ও জাতিপ্রতিষ্ঠাতত্ত্ব সম্পর্কিত আলোচনার ক্ষেত্রে অবশ্য তিনি নিজে পাশ্চাত্য বিশ্লেষণ-পদ্ধতি ব্যবহার করেছেন। তিনি এদেশের মানুষের মনে জাতীয়তাবোধ জাগিয়ে তুললেও 'ব্রিটিশ ইন্ডিয়ান এসোসিয়েশন, ইন্ডিয়া লীগ, ভারতসভা বা ইন্ডিয়ান এসোসিয়েশন, জাতীয় কংগ্রেস ইত্যাদি—এগুলির কোনোটির সঙ্গেই তিনি প্রত্যক্ষ সংস্রবে আসেননি, যদিও হয়তো এদের প্রতি তাঁর সহানুভূতির অভাব ছিল না।' তাঁর রচিত বন্দেমাতরম জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের মন্ত্রে পরিণত হয়েছিল। কিন্তু তা খণ্ডিত। জাতি সম্পর্কে তাঁর ধারণা ছিল অস্বচ্ছ। হিন্দু-মুসলমান সহাবস্থানের কথা কখনও কখনও—যেমন 'বঙ্গদেশের কৃষক'-এ—উচ্চারিত হলেও হিন্দু জাতীয়তাবাদের প্রতি বঙ্কিমচন্দ্রের আকর্ষণ ছিল গভীর এবং তা তাঁর জাতিতত্ত্ব-জাতিসত্তা ব্যাখ্যাতেও প্রতিফলিত হয়েছে। হিন্দু-মুসলমান উভয়েই যে এই একই দেশের অধিবাসী এবং তাদের ঐকান্তিক মিল রয়েছে তা নির্মোহ দৃষ্টিতে ব্যাখ্যা করে দিলীপবাবু প্রকৃত ইতিহাসের প্রতি সুবিচার করেছেন।

বঙ্কিমচন্দ্রের জাতিসত্তা-ভাবনা, যা তাঁর ইতিহাস-চিন্তার অন্যতম দিক, পাশ্চাত্য দর্শন ও ভাবধারা দ্বারা পরিপোষিত। ভারতের ঐক্য ও জাতীয়তাবাদের মূলে ব্রিটিশ প্রশাসনের যে বিশেষ ভূমিকা ছিল সে ব্যাপারে তাঁর মতাদর্শ কংগ্রেসের নরমপন্থীদের সঙ্গে বেশ মিলে যায়; কিন্তু এ ব্যাপারে রবীন্দ্রাথের দৃষ্টিভঙ্গি ছিল সম্পূর্ণ বিপরীতমুখী। ইতিহাসের পশ্চিমী দৃষ্টিভঙ্গি দ্বারা রবীন্দ্রনাথ চালিত হননি, যেমন বঙ্কিমচন্দ্র চালিত হয়েছিলেন। রবীন্দ্রনাথের ইতিহাস-ভাবনার স্বাতন্ত্র্য বিশেষভাবে ধরা পড়েছে দিলীপবাবুর 'রবীন্দ্রনাথের ইতিহাস-চিন্তা' প্রবন্ধে। 'স্বাজাত্যবোধজনিত একটি আবেগ' ভারতবর্ষের ইতিহাসকে যে চালিত করে তা রবীন্দ্রনাথের ইতিহাস-দৃষ্টিতে ধরা পড়েছে। তা ছাড়া 'প্রভেদের মধ্যে ঐক্যস্থাপন', 'পরস্পরের সমাজ ও ধর্মের সামঞ্জস্যসাধন' করে 'পরস্পরের স্বাতন্ত্র্য একেবারে বিলুপ্ত না' করে বৃহৎ সমাজ গড়ে তোলার যে প্রচেষ্টা সুদূর অতীত থেকে ভারতীয়দের মধ্যে দেখা গেছে সেটাই রবীন্দ্রনাথের মতে ভারত ইতিহাসের মূল সূর। কোনও সংকীর্ণ পরিধি ইতিহাসকে বেঁধে রাখতে পারে না, ব্যাপ্তির মধ্যেই ইতিহাস-চর্চার মুক্তি। রাষ্ট্রীয় বিবর্তনের ইতিহাস অপেক্ষা সামাজিক ইতিহাস তাঁর কাছে বেশি গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে হয়েছে। দিলীপবাবু রবীন্দ্রনাথের 'জাতীয় ঐক্য'র দৃষ্টিভঙ্গি বিশ্লেষণ করে দেখিয়েছেন যে তাঁর ইতিহাস-চিন্তা 'স্বাদেশিকতার দ্বারা উদ্দীপিত, কিন্তু স্বাদেশিকতার সুরটি সেখানে অনেক সূক্ষ্ম,

পরিমার্জিত এবং রূপান্তরিত। ঊনবিংশ শতকের মধ্যভাগের সেই চড়া গলার দেশভক্তি তাঁর রচনায় নেই। অন্তর্দৃষ্টি সহকারে স্বদেশী সংস্কৃতির মূল প্রকৃতিটি আবিষ্কার করে তার ভিত্তিতে ভারতবর্ষের সমগ্র ইতিহাস তিনি ব্যাখ্যা করেছেন এবং বিদেশী ইতিহাসের সঙ্গে তার স্বাতন্ত্র্য প্রদর্শন করেছেন।'

এই বইয়ের চতুর্থ প্রবন্ধ 'চৈতন্য পরিমণ্ডল'। সমাজ-সংস্কারক চৈতন্যদেব ও তাঁর পরিমণ্ডল সম্পর্কে দিলীপবাবু খুঁটিয়ে বিশ্লেষণ করে দেখিয়েছেন চৈতন্যদেব 'এদেশের চিরাচরিত ঐতিহ্যসম্মত পন্থাই অনুসরণ করেছিলেন, সামাজিক প্রশ্নের স্বতন্ত্র বিচার না করে সমাজকে ধর্মসংস্কারের আলোকে যতটুকু পরিমার্জিত করা যায় ততটুকু অগ্রসর হয়েছিলেন। তাঁর ব্যক্তিগত উদারতা কোনো কোনো ক্ষেত্রে তাঁর অনুবর্তীদের চেয়ে হয়ত বেশি ছিল, কিন্তু প্রকাশ্যে সচেতনভাবে বর্ণাশ্রমবিধিকে তিনি নিজেও আঘাত করেননি, তাঁর শিষ্যদেরও আঘাত করতে উৎসাহ দেননি।' উচ্চ ও নিম্নবর্ণের মধ্যে যে প্রভেদ তিনি মানতেন না তা তাঁর কর্মকাণ্ড ও আচরণবিধিতে প্রতিফলিত। সুশীলকুমার দে-র অভিমতের সঙ্গে সুর মিলিয়ে দিলীপবাবু যথার্থই বলেন, 'চৈতন্যধর্মমতে যেটুকু সামাজিক উদারতা দেখা যায়, তা তাঁর সংকীর্তন ও কৃষ্ণনাম গানের ভিত্তিতে সর্ববর্ণকে একটি ভূমিতে মেলাবার আধ্যাত্মিক প্রয়াসেরই আনুষঙ্গিক পরিণতি; সামাজিক বর্ণবৈষম্যের বিরুদ্ধে প্রত্যক্ষ সংগ্রাম নয়।' আধ্যাত্মিক সাম্যবাদে বিশ্বাসী মহাপুরুষেরা লক্ষ করেছেন ভারতীয় বর্ণাশ্রম ব্যবস্থাকে আঘাত করা অসম্ভব। তবু চৈতন্যের নেতৃত্বে গড়ে ওঠা সংঘ সামাজিক অত্যাচারের বিরুদ্ধে কখনও কখনও প্রতিবাদে মুখর হয়ে উঠেছে। সেই প্রতিবাদ সামাজিক অত্যাচারের হাত থেকে অনেক সময়ে অত্যাচারিতকে রক্ষা করেছে সন্দেহ নেই। চৈতন্য ও তাঁর পরিমণ্ডল বাঙালি মননে কীভাবে স্থায়িত্বলাভ করেছে তা দিলীপবাবুর বিশ্লেষণে ধরা পড়েছে।

বাংলার তিনজন ঐতিহাসিককে নিয়ে বিভিন্ন সময়ে তিনটি প্রবন্ধ লিখেছিলেন দিলীপবাবু। সেই তিনটি প্রবন্ধ—১. 'ঐতিহাসিক যদুনাথ সরকার', ২. 'রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় : প্রত্নতাত্ত্বিক ও ঐতিহাসিক', এবং ৩. 'আচার্য প্রবোধচন্দ্র বাগচী : শতবর্ষের শ্রদ্ধাঞ্জলি'—এই বইতে সংকলিত হয়েছে।

যদুনাথ সরকার ১৯০১ সালে *ইন্ডিয়া অব আওরঙ্গজেব* নামে যে বইটা প্রকাশ করেন সেটি তাঁর প্রেমচাঁদ-রায়চাঁদ বৃত্তির থিসিস। এরপর আরও গভীর গবেষণার ফসল *হিস্ট্রি অব আওরঙ্গজেব* (৫ খণ্ড) ১৯১২ থেকে ১৯২৪-এর মধ্যে প্রকাশিত হয়। আওরঙ্গজেব এবং মুঘল যুগ ছিল তাঁর গবেষণার অন্যতম বিষয়। ১৯৩২ থেকে ১৯৩৮ সালের মধ্যে তিনি চার খণ্ডে *ফল অব দ্য মুঘল এম্পায়ার* প্রকাশ করেন। শিবাজির ওপরেও লেখেন তথ্যনিষ্ঠ ইতিহাস। তাছাড়াও এই সময়কালের ওপর তিনি বাংলা ও ইংরাজিতে আরও অনেক বই ও বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় প্রবন্ধ লিখেছিলেন। মূল আকর-গ্রন্থ, দলিল দস্তাবেজ, মারাঠি বখর, শকাবলি এবং ডিঙ্গল-সংস্কৃত-হিন্দি প্রভৃতি ভাষায় লেখা নানা উপাদান তিনি ব্যবহার করেছেন তাঁর গবেষণা কর্মে। তাঁর সম্পর্কে দিলীপবাবু লিখেছেন, 'যদুনাথের প্রধান ইতিহাস গ্রন্থগুলি পর্যায়ক্রমে সজ্জিত করলে আমরা যা পাই তা হল সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শতকের ভারতবর্ষের রাজনৈতিক ও সামাজিক ইতিহাস।' এই সময়ের ইতিহাস রচনার যে পদ্ধতি তিনি ব্যবহার করেছেন তার দ্বারা 'অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষার্ধে কেন্দ্রীয় রাষ্ট্রবন্ধন প্রায় অবলুপ্ত' হলেও 'রাষ্ট্রীয় ঐক্যবিহীন যুগের ধারাবাহিক ইতিহাস প্রণয়নে' যে কোনও অসুবিধা হয়নি তা তাঁর মুঘল সাম্রাজ্যের পতন নিয়ে লেখা সুবৃহৎ গ্রন্থটিই সাক্ষ্য দেবে। আর একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে দিলীপবাবু পাঠকদের সচেতন করেছেন : যদুনাথের সঙ্গে গিবনের যে তুলনা করা হয় তার একমাত্র কারণ, গিবন রোমান সাম্রাজ্যের পতন ও যদুনাথ মুঘল সাম্রাজ্যের পতন নিয়ে বিস্তৃত ইতিহাস লিখেছিলেন; কিন্তু তাঁদের দু'জনের মধ্যে মতাদর্শগত বা দৃষ্টিভঙ্গিগত কোনও সম্পর্ক ছিল না। দিলীপবাবুর ভাষায় 'গিবন ছিলেন প্রাচীন গ্রীক-রোমান সংস্কৃতির একান্ত ভক্ত এবং রোমক সাম্রাজ্য তার নিকট ছিল মানব-সভ্যতার এক মহান কীর্তি...। কীভাবে নানা প্রতিকূল ও বর্বর শক্তির আঘাতে এবং খ্রিস্টধর্মের ক্রমবিস্তারমান প্রভাবের ফলে, এই গৌরবময় সৃষ্টি ধ্বংস হয়ে গেল তাই ছিল তাঁর আলোচ্য বিষয়। ...কিন্তু মোগল যুগ সম্পর্কে যদুনাথের এই সশ্রদ্ধ মনোভাব ছিল না।... মধ্যযুগের তমিস্রার অবসানে নতুন যুগের প্রভাতকেও অভিনন্দন জানিয়েছেন ঐতিহাসিক তাঁর ইতিহাসের সর্বশেষ খণ্ডে।... আমাদের শুধু মনে রাখা প্রয়োজন যে কেবলমাত্র বিষয়বস্তুর বাহ্য সাদৃশ্যের উপর নির্ভর করে গিবন বা যদুনাথের উদ্দেশ্য ও দৃষ্টিভঙ্গির তুলনা করলে উভয়ের কীর্তিকেই ভুল বোঝার সম্ভাবনা থাকে।'

রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় প্রত্নতত্ত্ববিদ ছিলেন। ঐতিহাসিকও ছিলেন। প্রাক-ইতিহাস এবং প্রাচীন ও মধ্যযুগের ভারত ইতিহাস ছিল তাঁর সহজ বিচরণক্ষেত্র। সাহিত্যিক উপাদান ও কিছুটা অনুমানের উপর নির্ভর করে যে প্রাচীন ভারতীয় ইতিহাস রচনার প্রয়াস লক্ষিত হয়েছিল রাখালদাস সেই স্রোতকে ভিন্ন খাতে বইয়ে দিয়েছিলেন।

মহেঞ্জোদাড়োর আবিষ্কারক প্রত্নতত্ত্ববিদ রাখালদাস মুদ্রা, লেখমালা, লিপিতত্ত্বের সাহায্যে বৈজ্ঞানিক ইতিহাস রচনা করেছেন। দিলীপকুমার বিশ্বাস লিখেছেন, রাখালদাসের বহুমুখীপ্রতিভা 'গবেষণা কর্মকাণ্ড এত বিচিত্র ও বহুমাত্রিক এবং রচনা এমন অসংখ্য যে এর পরেও মনে হয় তাঁর ইতিহাস-চর্চা ও গবেষণা সম্পর্কে সব কথা যেন বলা হল না।' দিলীপবাবুর এই আক্ষেপ অমূলক। তিনি এই দীর্ঘ প্রবন্ধে রাখালদাসের গবেষণামূলক সমস্ত কাজের যে নিখুঁত বিশ্লেষণ করেছেন তা থেকে রাখালদাস এবং তাঁর কাজকর্ম সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা লাভ কার সম্ভব।

প্রাচীন সভ্যতা-সংস্কৃতির ইতিহাসচর্চার ক্ষেত্রে প্রবোধচন্দ্র বাগচীর অসাধারণ দান অনস্বীকার্য, কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় এই যে তথাকথিত শিক্ষিত সমাজেও তাঁর পরিচিতি অস্পষ্ট। এজন্য আমাদের শিক্ষা ও সংস্কৃতি-চর্চার ত্রুটিকেই দায়ী করা যায়। বহুভাষাবিদ প্রবোধচন্দ্র সিলভ্যাঁ লেভির সংস্পর্শে এসে নিজের গবেষণাকর্মকে আরও এগিয়ে নিয়ে গেছেন। চীন, তিব্বত, ভারতবর্ষ তথা দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার ধর্ম-সংস্কৃতি নিয়ে তিনি রচনা করেছেন গবেষণামূলক গ্রন্থ ও প্রবন্ধাবলি। সবসময়েই তিনি নিজেকে নিয়োজিত রাখতেন মূলানুসন্ধানে। দিলীপবাবু একসময় তাঁর কাছে গবেষণা করেছেন, ফলে তাঁর গবেষণার পদ্ধতি ও ধারা দিলীপবাবুর কাছে স্পষ্ট, তাই তিনি প্রবোধচন্দ্রের গবেষণাকর্মের যথার্থ চিত্র এঁকেছেন অন্তরঙ্গভাবে।

এই বইটির দ্বিতীয় খণ্ডের জন্য অপেক্ষায় রইলাম।

ইতিহাস ও সংস্কৃতি—দিলীপকুমার বিশ্বাস/সারস্বত লাইব্রেরি, কলকাতা-৬/১৬০.০০।

বিশ্বজনীন পাণ্ডিত্যের 'শেষ প্রতিনিধি'

চিন্ময় গুহ

বিশ্বজনীন পাণ্ডিত্যের—যাকে রনেসাঁস বলা যায়—'শেষ প্রতিনিধি' রবীন্দ্রকুমার দাশগুপ্তের কথা বলতে গিয়ে মুখবন্ধকার তপন রায়চৌধুরী ১৯১৭ সালে স্যাডলার কমিশনের মন্তব্য দিয়ে শুরু করেছেন। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের জ্ঞানাকাঙ্ক্ষা ও কৌতূহল সম্পর্কে রিপোর্টে কমিশন জানায় যে এরা ভারতবর্ষের ঘটনাপ্রবাহ জানার সঙ্গে সঙ্গে জ্ঞানের জগতে বিশ্বচরাচরের খবর রাখতে সমানভাবে আগ্রহী। তপনবাবু তাঁর ছোটবেলায় দেখা এমন কয়েকজন মানুষের ছবি তুলে ধরেছেন যাঁরা সীমাহীন পড়াশোনা থেকে আহরণ করে নেওয়া আনন্দকেই জীবনের চূড়ান্ত সুখ বলে মেনে নিয়েছিলেন। জ্ঞানের প্রতি তাঁদের সম্পূর্ণ আনুগত্য চরম দারিদ্র ও পার্থিব দুঃখকষ্টকে ভুলে যেতে সাহায্য করেছিল। পাশ্চাত্যের এক মহান শিক্ষাকেন্দ্রে দীর্ঘকাল বাস করেও সেই অপার ও নির্মোহ জ্ঞানতৃষ্ণার সঙ্গে পাল্লা দেওয়ার মতো খুব বেশি লোক ওদেশেও তপন রায়চৌধুরী দেখেননি।

ওই হারিয়ে যাওয়া অন্বেষণের জগৎ সুব্রত দাশগুপ্তের লেখা রবীন্দ্রকুমার দাশগুপ্তের এই মনন-জীবনীর এক অসাধারণ পশ্চাৎপট তৈরি করে। রবিবাবুর জ্ঞানতৃষ্ণার গভীরতা ও বিস্তারের এক অতি চমৎকার সংক্ষিপ্তসার মিলবে বরিশালের আরেক কৃতী সন্তান তপন রায়চৌধুরীর মুখবন্ধে। যেটি বইয়ের সামগ্রিক গঠনের পক্ষে অপরিহার্য ছিল। রবীন্দ্রকুমারকে তিল তিল করে পুনর্নির্মাণের আগে সম্পূর্ণ মূর্তিটাকে একবার দেখে নেওয়া প্রয়োজন ছিল। সেদিক থেকে তপনবাবুর এই রচনাটি প্রকৃত অর্থেই মুখবন্ধের ভূমিকা পালন করেছে। তাঁর যে চাবি-বাক্যটি বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ সেটি হল ঃ '(His scholarship) is the product of *a pattern of dedication* which is in danger of disappearing from our life.' রবীন্দ্রকুমারের এই মাননিক বিকাশের কাহিনি সেই "pattern of dedication"-কেই গভীর নিষ্ঠা ও পরিশ্রমের সঙ্গে মেলে ধরতে চেয়েছে।

অনেক দিন হল নানা দিক থেকে রবীন্দ্রকুমার দাশগুপ্ত বাঙালি জীবনে এক অভিভাবক হয়ে আছেন। তিনি যেন মহাসময় ও খণ্ড সময়ের মধ্যে এক স্বর্ণসেতু, আমাদের পিছল ও অধারাবাহিক সময়ে সেই সেতু একটা দিকনির্দেশ দিতে পারে। চতুর্দিকে যখন বলির বাজনা, গোটা অ্যাকাডেমিক জগৎ জুড়ে পশ্চিমের নতুন নাচের সঙ্গে পা মেলানোর করুণ চেষ্টা, তখন তিনি হয়ে উঠতে থাকেন এক প্রতীক। আর সেই প্রতীককে বোঝবার জন্যই রবীন্দ্রকুমারের এই বিকাশ-কাহিনিকে তন্নতন্ন করে পড়তে ইচ্ছে করে আমাদের। যে কাজ অন্য কেউ করতে পারেনি, সে কাজ সম্পন্ন করতে যখন এগিয়ে এলেন রবীন্দ্রকুমারকে খুব কাছ থেকে দেখা

এক আপনজন, তখন প্রতীক-কাহিনিতে লাগল ভালবাসার কোমল রঙ। গবেষণার কাঠিন্য ও নীরসতাকে আড়ালে রেখে এক বিরল সহজতায় মূর্তিটি পুনর্নির্মিত হল আমাদের চোখের সামনে।

শুরুতে শুরু না করে বর্তমান থেকে শুরু করেছেন সুব্রত দাশগুপ্ত। 'সবুজে ভরা গল্‌ফ্‌ গ্রীণের এক দোতলার ফ্ল্যাটে' ২০০৩ সালের জানুয়ারি মাসে শুরু হচ্ছে এই বই। বিছানায় আধশোয়া অবস্থায় বসে আছেন প্রবীণ রবীন্দ্রকুমার, পরনে অনেক বছর আগে মেয়ের কিনে দেওয়া গাঢ় কমলা রঙের পুলওভার। মাথায় কানঢাকা টুপি, গলায় মাফলার, বুক অবধি টানা বাদামি শাল। যেন একটি তথ্যচিত্রের প্রথম দৃশ্য। রবীন্দ্রকুমারের বর্তমান শারীরিক অসুস্থতার পাশাপাশি সুব্রত দাশগুপ্ত তুলে ধরেছেন 'স্টেটস্‌ম্যান' প্রকাশিত তাঁর একটি সজীব নিবন্ধের কথা। যে-সজীবতা শত অসুবিধার মধ্যেও অব্যাহত আছে। নিবন্ধটির শিরোনাম ছিল ঃ 'Promoting English : Creating a World Mind'. শিরোনামের দ্বিতীয় অংশটিকে প্রস্থানভূমি হিসাবে ধরে নিয়ে রবীন্দ্রকুমার দাশগুপ্তের ক্রম-উন্মোচনকে অনুধাবন করতে চেয়েছেন লেখক। শুধু বইয়ের নামপত্রে নয়, প্রতিটি পৃষ্ঠায় 'বিশ্বমন' এক চাবি-শব্দ হয়ে আছে। লেখক একদিকে যেমন বিশ্বমনের প্রকৃতিকে বিশ্লেষণ করতে চেয়েছেন, অন্যদিকে মানবতাবাদ, ধর্ম, দর্শন ও সাহিত্যের ক্ষেত্রে বিশ্বজনীনতার ধারণার প্রতি তাঁর দায়বদ্ধতাকে বুঝতে চেয়েছেন। যে-ভারতীয় ও ইউরোপীয়দের কথা তিনি বারবার বলেন—রবীন্দ্রনাথ, রামমোহন, বঙ্কিমচন্দ্র, মাইকেল মধুসূদন, স্বামী বিবেকানন্দ এবং মিলটন, গ্যোয়েটে, রম্যাঁ রলাঁ, ইয়েট্‌স্‌, গিলবার্ট মারে—তাঁদের সকলেরই জীবনভাবনা ওই 'বিশ্বমন' শব্দবন্ধে ধরা আছে বলে মনে করেছেন সুব্রত দাশগুপ্ত।

১৯১৫ সালের ১১ জুলাই ইতিহাসের যে রক্তঝরা সময়ে রবীন্দ্রকুমারের জন্ম, তাকে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে অসাধারণ কয়েকটি রেখায় : দক্ষিণ আফ্রিকা থেকে গান্ধীর প্রত্যাবর্তন, একই বছরে অ্যানি বেসান্ট ও লোকমান্য তিলকের হোম রুল লিগস্‌, নতুন স্বরাজ-ভাবনা, জুন মাসে দু'বছর আগে প্রথম নোবেল পুরস্কার বিজয়ী অশ্বেতাঙ্গ রবীন্দ্রনাথকে ব্রিটিশ সাম্রাজ্য কর্তৃক নাইটহুড প্রদান। বরিশালের মাহিলরা গ্রামের ছেলেটির কাছে গ্রাম মানে 'দেশ', দরিদ্র ছোট গ্রামটির বিদ্বজ্জনদের কথা রবীন্দ্রকুমারের মনে পড়ে আজও। শুধু বাবা নলিনাক্ষ ও ঠাকুর্দা পূর্ণচন্দ্র (রবীন্দ্রকুমারের চার বছর বয়সে তাঁর মৃত্যু হয়) নয়, গ্রামের অশ্বিনীকুমার মুখোপাধ্যায়, সুরেন্দ্রনাথ সেন, সুধীরকুমার দাশগুপ্ত, বিনয়ভূষণ দাশগুপ্ত, শশিভূষণ দাশগুপ্ত (যাঁর মামাবাড়ি ছিল মাহিলরায়), সবাই যেন জ্ঞানচর্চার এক বিদ্যালয়ে রবীন্দ্রকুমারকে তৈরি করে নিচ্ছেন, গড়ে তুলছেন, যাকে পরে বিশ্বমন বলেছেন তিনি। L'Uomo Universale-এর ধারণার এক অবিচ্ছিন্ন ধারার সঙ্গে এরাই হয়ত সংযুক্ত করে দিয়েছিলেন রবীন্দ্রকুমার দাশগুপ্তের মন। আর ছিলেন ইংরেজির মাস্টারমশায়েরা ঃ পাঠশালার বীরেন্দ্রনাথ সেন, নিউ ইন্ডিয়ান স্কুলের নরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য, স্কটিশ চার্চ কলেজের বি. বি. রায়।

বাবা নলিনাক্ষ শিখিয়েছিলেন কেরিয়ারিজমকে ঘৃণা করতে। আত্মীয়স্বজন তিনি বড় হয়ে কী হবেন জিগ্যেস করায় চিন্তিত রবীন্দ্রকুমার বাবাকে শুধোলেন কী উত্তর দেবেন। নলিনাক্ষ বললেন, 'বল গে বড় হয়ে আলুপটল বেচব।' পরে শিক্ষাজগতের অনেক সম্মানই পেয়েছেন রবীন্দ্রকুমার, কিন্তু আত্মম্ভরিতা তাঁকে স্পর্শ করেনি। খুব ছোট ছোট মানুষের সঙ্গে গভীর স্নেহে ছোট ছোট ভালবাসার কথা বলতে তাঁর কোনও অসুবিধা হয় না।

অনেক তথ্যসাবুদ, অসংখ্য গুরুত্বপূর্ণ উদ্ধৃতির সঙ্গে এই বইকে সমৃদ্ধ করেছে সুব্রত দাশগুপ্তের সঙ্গে ব্যক্তিগত কথোপকথনের এক অপরূপ অন্তর্বয়ন। হঠাৎ লেখকের কথনকাঠামো ভেঙে যখন কথা বলে উঠেছেন রবিবাবু তাঁর নিজের জবানিতে, যা কখনও 'পরিচয়' পত্রিকায় ২০০২ সালে প্রকাশিত 'সেকালের কথা' থেকে উদ্ধৃত, কখনও ব্যক্তিগত সাক্ষাৎকার থেকে, জীবনীর ভাঁজে ভাঁজে আত্মজীবনীর অংশ গেছে মিশে। তা এই বইকে বাড়তি এক বিশ্বাস্যতা দিয়েছে, বইটি আর নিছক বই থাকেনি, হয়ে উঠেছে জীবনের এক দলিল।

রবীন্দ্রকুমারের নানা চিন্তাভাবনা ও বিশ্বাস এইভাবে তাঁর নিজের কাছ থেকে শুনে নিই আমরা। যেমন,

> Greek history and mythology when they are used by the modern poets are made to have a deeper sense and wider bearing than they usually had in the minds of those who created it. It is not actually the Greece of history which we admire; it is the Greece of our own mind, the Greece which never was, nor even will be, but which might have been. (P. 32)
>
> ...There is a hierarchy of man's intellectual activities, an order of intellectual progress which begins with information and reaches wisdom through the purgatory of knowledge. (P. 155)

এগুলি তাঁর অগাধ পাণ্ডিত্য ও দর্শনকে বুঝতে কাজে লাগবে। কিন্তু বর্তমান আলোচকের ভাল লাগে সেইসব স্বগত কথন যা এক চুরমার হতে থাকা পৃথিবীর আসল অসুখকে চিহ্নিত করতে চায়।

> If someone asks me what was the greatest trait of the Bengalis of that time...I would say that they possessed heart (*hriday*)—and it is this that is the root of the all that is good in a human being. Without heart there is no conscience. Without heart there is no compassion.

Where is compassion in this age? In my schooldays I witnessed it in Kolkata, I saw it in my school, at home, in my village. I saw the Bengali shed tears in those days; I see no tears in Bengali eyes in this age. (P. 28)

অতীতকে কি তিনি খুব বেশি আদর্শায়িত করছেন? না, তা মনে করেন না তিনি।

Such greed—greed for money, greed for position, greed for power—I did not see so much of it in those days. (P. 28)

যা তিনি আজ আর সমাজজীবনে খুঁজে পান না, সেই সমগ্রের জীবন, the life of community, তার সজলতা নিয়ে এই বইয়ের প্রতিটি পৃষ্ঠায়, বাক্যে, অক্ষরে অন্তঃস্যূত হয়ে থাকে।

এ-বইতে শুধু একটি জিনিসের অভাব বোধ করেছি যেটি না উল্লেখ করলেই নয়। সে হল রবীন্দ্রকুমার দাশগুপ্তের অসাধারণ রৌদ্রোজ্জ্বল হাস্যরস। 'অলীক সংলাপ' নামে ব্যঙ্গ রচনার বইটির কথা থাকলে ভাল হত, যেটি তাঁর আধুনিক মনের এক শ্রেষ্ঠ উদাহরণ। থাকা প্রয়োজন ছিল একটি বিশদ নির্ঘণ্ট। অক্সফোর্ডে হেলেন গার্ডনারের সঙ্গে বহুবার শুনে উপভোগ করা তাঁর সরস কথোপকথনটি এখানে খুঁজে পাইনি আমি। রবিবাবুর সূক্ষ্ম হাস্যরসও তো তাঁর বিশ্বমনের এক অপরিহার্য উপাদান। সেটিকে বাদ দিলে তাঁর সম্পর্কে অনেকটাই অকথিত রয়ে গেল বলে মনে হয়।

Twilight of the Bengal Renaissance : R K Dasgupta and His Quest for a World Mind ■ Subrota Dasgupta/ Dey's Publishing, Kolkata-73/ 256.00.

ফজলুল হক ঃ এক বর্ণাঢ্য ব্যক্তিত্ব

চিত্ততোষ মুখোপাধ্যায়

অবিভক্ত বাংলা প্রদেশে তথা ভারতবর্ষে একদা আবুল কাসেম ফজলুল হকসাহেবের নাম অতি পরিচিত ছিল। দেশভাগের পরে তৎকালীন পূর্ব-পাকিস্তানেও তিনি অন্যতম শীর্ষস্থানীয় নেতা হয়েছিলেন। পূর্ব-পাকিস্তানের অবলুপ্তি ও স্বাধীন বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার বীজ যেসব নেতা রোপণ করেছিলেন তিনি তাঁদের মধ্যে অন্যতম।

কিন্তু আজকের দিনে পশ্চিমবঙ্গে ফজলুল হকসাহেবের নাম প্রায় বিস্মৃত। তাঁর প্রকৃত মূল্যায়নও হয়নি। শ্রীহিরণ্ময় ভট্টাচার্য 'রসিক ফজলুল হক' বইটি রচনা করে হকসাহেবকে বর্তমান প্রজন্মের পাঠকদের সম্মুখে উপস্থাপিত করেছেন। বিভিন্ন ঘটনার মাধ্যমে তিনি ফজলুল হকসাহেবের বর্ণাঢ্য ব্যক্তিত্বের সঙ্গে পরিচিত করার প্রয়াস করেছেন। লেখকের এই প্রচেষ্টা অনেকটা সফল হয়েছে। কেবলমাত্র তাঁর আকৃতি বিশাল ছিল তা-ই নয়, সবদিক দিয়েই হকসাহেব বড়মাপের মানুষ ছিলেন। মেধাবী ছাত্র, কুশলী আইনজীবী, সুদীর্ঘকাল বাংলার আইনসভার দক্ষ বিধায়ক, বাংলার দুইবার মুখ্যমন্ত্রী হয়েছিলেন ও আরও অনেক কারণে তিনি বিখ্যাত ছিলেন। কিন্তু এইসব কৃতিত্ব হকসাহেবের প্রকৃত পরিচিতি বহন করে না।

তিনি মনেপ্রাণে একশোভাগ খাঁটি বাঙালি, তাঁর হৃদয় প্রশস্ত, দরিদ্র কৃষক ও নিপীড়িত প্রজার জন্য গভীর দরদ, পাকিস্তান প্রস্তাবের প্রবক্তা হওয়া সত্ত্বেও হকসাহেব ছিলেন অসাম্প্রদায়িক। হকসাহেব অনেক গুণসম্পন্ন ছিলেন কিন্তু তাঁর কোনও কোনও বিষয়ে দুর্বলতাও ছিল। কিন্তু এইসব দুর্বলতা সত্ত্বেও হকসাহেব আকর্ষণীয় ব্যক্তিত্ব ও অগণিত মানুষের ভালবাসা ও আনুগত্য প্রভূত পরিমাণে অর্জন করেছিলেন।

পরিতাপের বিষয় যে ফজলুল হকসাহেবের সম্পর্কে তথ্যনির্ভর নিরপেক্ষ লেখা বেশি নেই। তাঁর প্রকৃত মূল্যায়ন হয়নি। অধ্যাপক অমলেন্দু দে "পাকিস্তান প্রস্তাব ও ফজলুল হক" সম্বন্ধে সটীক আলোচনা করেছেন ও অনেক নির্ভরযোগ্য তথ্য দিয়েছেন।

শ্রীহিরণ্ময় ভট্টাচার্যের স্বাভাবিক কারণেই হকসাহেব সম্বন্ধে প্রত্যক্ষ ও ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা থাকার কথা নয়। তিনি তাই তথ্যের জন্য বিভিন্ন বইয়ের ওপর নির্ভর করেছেন। হকসাহেব তাঁর জীবিতকালে প্রায় কিংবদন্তিপুরুষ হয়ে উঠেছিলেন। হকসাহেব নিজে রসিক ছিলেন। কথাবার্তায় কখনও কখনও অত্যুক্তি করতেন। এইসব কারণে হিরণ্ময়বাবু কোনও কোনও ঘটনার বর্ণনায় অতিশয়োক্তি করেছেন বলে মনে হয়। যেমন এক চুমুকে অর্ধসের ঘি খাওয়া, মধ্যরাত্রে এক কলসি খেজুররস পান ইত্যাদি। বোধহয় অসাবধানতার জন্য কিছু কিছু প্রমাদও ঘটেছে। হিরণ্ময় ভট্টাচার্যের বইটির গুরুত্ব আছে—অতএব এই ত্রুটিগুলি পরের সংস্করণে বর্জন করার প্রয়োজন হবে।

হকসাহেব আমাদের পিতামহ আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের অত্যন্ত স্নেহভাজন ছিলেন। পিতামহ ও তাঁর পরিবারের সঙ্গে হকসাহেব অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ ছিলেন।

তাঁর চতুর্থবার ভাইস-চ্যান্সেলরের কার্যকাল শেষ হওয়ার পূর্বে তৎকালীন গভর্নর লর্ড লিটন কতকগুলি অসম্মানজনক শর্তাধীনে আশুতোষকে পুনরায় নিযুক্ত করার প্রস্তাব দেন। স্যর আশুতোষ তা প্রত্যাখ্যান করে যে চিঠি লিখেছিলেন তা বিখ্যাত হয়ে আছে। সরকার পিতামহের পরে স্যর ভূপেন্দ্রনাথ বসুকে ভাইস-চ্যান্সেলর নিযুক্ত করেন। স্যর ভূপেন্দ্রনাথ বসু যখন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস-চ্যান্সেলর তখন স্যর আশুতোষের মৃত্যু হয়—বিশ্ববিদ্যালয়ের বিশেষ সেনেট সভায় লর্ড লিটন ও ভূপেন্দ্রনাথ বসু আশুতোষের প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেন। ভূপেন্দ্রনাথ বসু স্বল্পদিন পরে পরলোকগমন করলে বিচারপতি Ewad Greanes কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস-চ্যান্সেলর হয়েছিলেন।

ফজলুল হক কেমন করে আশুতোষের সঙ্গে পরিচিত হন আমার জানা নেই। বোধকরি হকসাহেব মেধাবী ছাত্র হিসাবে স্যর আশুতোষের নজরে আসেন ও তাঁকে Articled Clerk বা শিক্ষানবিশ করে নিয়েছিলেন। এরপরের দু'জন articled clerk-এর নাম (স্যর) চারুচন্দ্র ঘোষ ও নরেন্দ্র কুমার বসু। লেখক এই দু'জনের নাম সঠিক লেখেননি। একস্থানে লেখক রমেশচন্দ্র দত্তের নাম ভুল করে রমেশ মিত্র লিখেছেন।

আমাদের মধ্যম পিতৃব্য শ্যামাপ্রসাদের সঙ্গে ফজলুলসাহেবের অন্তরঙ্গতা অব্যাহত ছিল। প্রথম ফজলুল হক মন্ত্রিসভার আমলে সরকার Secondary Education Bill উত্থাপন করেছিলেন। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে সরকারের অনুদান যথেষ্ট ছিল না। বিশ্ববিদ্যালয় মেট্রিক পরীক্ষার ফি-এর ওপর নির্ভর করত। এ সময়ে শ্যামাপ্রসাদের নেতৃত্বে Secondary Education Bill-এর প্রতিবাদ হয়েছিল ও প্রচণ্ড বিতর্ক হয়েছিল। কিন্তু এ সময়েও শ্যামাপ্রসাদ ও ফজলুল হকসাহেবের মধ্যে ব্যক্তিগত সম্পর্ক কখনওই খারাপ হয়নি। ১৯৪১-৪৩ সালে প্রগ্রেসিভ কোয়ালিশন সরকার গঠিত হলে হকসাহেব ও শ্যামাপ্রসাদ ব্যক্তিগতভাবে ও রাজনৈতিক মতবাদে ঘনিষ্ঠ হন। সে সময়ে সরকার ও মুসলিম লিগ থেকে অভিযোগ করা হয়েছিল—শ্যামাপ্রসাদ ফজলুল হকসাহেবকে পরিচালনা করছেন। শ্যামাপ্রসাদের মৃত্যু অবধি হকসাহেব ও তাঁর মধ্যে ব্যক্তিগত সম্বন্ধ অটুট ছিল। শ্যামাপ্রসাদের মৃত্যুর পরে হকসাহেব আমাদের পিতাকে যে টেলিগ্রাম পাঠিয়েছিলেন, সেটিও সুবিখ্যাত হয়ে আছে।

উপসংহারে উল্লেখ করি—আমাদের পরিবারের সঙ্গে সুরাবর্দী পরিবারেরও একসময়ে ঘনিষ্ঠতা ছিল।

হিরণ্ময় ভট্টাচার্যকে বইটি প্রকাশ করার জন্য অভিনন্দন জানাই। একটি অনুরোধ তিনি যেন ভবিষ্যতে দ্বিতীয় সংস্করণ বের করলে একটি পুস্তকপঞ্জিও সংযোজন করেন।

রসিক ফজলুল হক—হিরণ্ময় ভট্টাচার্য/প্রকাশক—উৎপল ভট্টাচার্য, কলকাতা—১২/৬০.০০

ভিন্ন ধারার সাধক আজহারউদ্দীন খান

আমজাদ হোসেন

বাঙালি আত্মবিস্মৃত বা ইতিহাস-অসচেতন জাতি—এই রকম বঙ্কিমি বিচার আজকাল আর খুব যুক্তিযুক্ত মনে হয় না। বঙ্গদেশ, বাঙালি জাতি, বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের অনেক খণ্ড বিশিষ্ট মোটা মোটা ইতিহাস বই এখন সহজলভ্য। অবশ্য দেখা যায় যে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের ইতিহাস-রচয়িতারা—ড. দীনেশচন্দ্র সেনের মতো দু'একজন ব্যতিক্রম ছাড়া—প্রায় সকলেই বাংলা ভাষা ও সাহিত্যে মুসলমান লেখকদের কৃতিত্ব ও অবদান বিস্মৃত হয়ে থাকতেই ভালবাসেন। আজহারউদ্দীন খানের গবেষণা, মনন ও লেখালেখি এই selective amnesia-র বিরুদ্ধে এক রকম প্রতিবাদ।

অশোক পাল তাঁর 'সাহিত্যসাধক আজহারউদ্দীন' বইটিতে এই বিবেকী লেখকের বিপুল সাহিত্যচর্চার একটি সংক্ষিপ্ত অথচ সামগ্রিক পরিচয় দেবার চেষ্টা করেছেন। কাজী নজরুল ইসলামের জীবন ও সাহিত্যের নানা দিক নিয়ে গ্রন্থ রচনার মধ্য দিয়ে আজহারউদ্দীনের সাহিত্যচর্চার শুরু এবং এ বিষয়ে তাঁকেই পথিকৃৎ বলা যায়। নজরুল সম্বন্ধে তথ্যনিষ্ঠ ও বিশ্লেষণী গ্রন্থের অভাববোধ থেকেই তিনি তাঁর বহুপঠিত 'বাংলা সাহিত্যে নজরুল' গ্রন্থটি প্রথম প্রকাশ করেন ১৯৫৪ সালে। পরবর্তীকালেও বিভিন্ন সংস্করণে তিনি তাঁর গ্রন্থটিকে পরিবর্ধন ও পরিমার্জন করেছেন নতুন নতুন তথ্যের সন্নিবেশ ঘটিয়ে। তাই বর্তমানেও নজরুল বিষয়ক গ্রন্থের ভিড়ে

আজহারউদ্দীনের রচনাটি উজ্জ্বল ব্যতিক্রম। ঠিক একই কথা বাল যায় আজহারউদ্দীনের মোহিতলাল বিষয়ক গ্রন্থটি সম্পর্কেও।

আজহারউদ্দীনের তৃতীয় গ্রন্থ 'বিলুপ্ত হৃদয়' (১৯৫৬) আটজন প্রায়-বিস্মৃত সাহিত্য-সাধকের জীবন ও কর্ম নিয়ে আলোচনা। মীর মোশারফ হোসেন, কায়কোবাদ, আবদুল করিম সাহিত্য বিশারদ, এস ওয়াজেদ আলী, গোলাম মোস্তফা ও জসীমউদ্দীন—এঁদের মূল্যায়ন করে তিনি এক সাংস্কৃতিক দায়িত্ব পালন করেছেন। নন্দগোপাল সেনগুপ্ত এই বইয়ের আলোচনা প্রসঙ্গে মন্তব্য করেছিলেন : 'অখণ্ড বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে স্মরণীয় হয়ে থাকবে এঁদের নাম।' এঁদের সম্পর্কে আজহারউদ্দীনের আলোচনাগ্রন্থটি পরবর্তী গবেষকদের কাছে তাই মূল্যবান আকরগ্রন্থ হিসাবেই গণ্য হয়।

আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদকে নিয়ে তিনি পরে পূর্ণাঙ্গ গ্রন্থ 'মাঘ নিশীথের কোকিল' রচনা করেছেন (১৯৮৬)। এটি আজহারউদ্দীনের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কাজ। এই বিস্মৃতপ্রায় ব্যক্তিত্ব বিপুল পরিশ্রম ও ত্যাগ স্বীকার করে মধ্যযুগের প্রায় ১১০০ পুঁথি সংগ্রহ করেছিলেন। আলাওলের 'পদ্মাবতী' কাব্য তাঁরই আবিষ্কার এবং তাঁর সম্পাদনায় প্রকাশিত হয়। বঙ্গীয় সাহিত্যপরিষৎ তাঁর সম্পাদিত নয়খানি প্রাচীন পুঁথি প্রকাশ করে। বাংলার প্রাচীন সাহিত্যের এই অমূল্য সম্পদকে উদ্ধার ও রক্ষা করে তিনি যে অবদান রেখেছেন তা ভাবলে শ্রদ্ধায় আপ্লুত হতে হয়। তিনি এই সব পুঁথির আলোচনা করে প্রায় ছ'শো প্রবন্ধ রচনা করেছিলেন। এইসব প্রবন্ধ তখন অক্ষয়চন্দ্র সরকার সম্পাদিত 'পূর্ণিমা' থেকে শুরু করে 'যমুনা', 'সাধনা', 'নারায়ণ', 'সাহিত্য' (সুরেশচন্দ্র সমাজপতি সম্পাদিত), 'মানসী', 'ভারতবর্ষ' (মোট ৯টি প্রবন্ধ), 'মোহম্মদী', 'বুলবুল', 'সওগাত', 'মর্মবাণী', 'বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা', প্রভৃতি প্রায় ১১৪টি পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। অসাধারণ কবিত্ব-সম্পদে সমৃদ্ধ এই প্রাচীন সাহিত্যের প্রতি এক শ্রেণির মানুষের অবজ্ঞা লক্ষ করে দীনেশচন্দ্র সেন মন্তব্য করেন 'বঙ্গ সাহিত্যর এই সংখ্যাগরিষ্ঠ ও গুণগরিষ্ঠ শাখা বাদ দিয়ে এই সাহিত্যকে দাঁড় করাইবার চেষ্টায় আমরা যে মূর্তি গড়িতেছি, তাহা আমার নিকট কবন্ধের মত মনে হয়।' ('প্রাচীন বাঙলা সাহিত্যে মুসলমানের অবদান')। বঙ্গ সাহিত্যের ইতিহাসের এই খণ্ডিত রূপ দূর করে তার সম্পূর্ণ ইতিহাস রচনার উপাদান সংগ্রহে আবদুল করিম সাহিত্য-বিশারদের প্রয়াস চিরস্মরণীয়। আজহারউদ্দীন তাঁর 'মাঘ নিশীথের কোকিল' গ্রন্থে একথা আমাদের স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন।

বাংলা ভাষা ও সাহিত্যে মুহম্মদ শহীদুল্লাহ ও মুহম্মদ আবদুল হাই—এই দু'জনের কৃতিত্বের কথা তিনি আলোচনা করেছেন অন্য দুটি গ্রন্থে। বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী মুনীর চৌধুরীর জীবন ও কর্ম নিয়েও আজহারউদ্দীন রচনা করেছেন 'রক্তাক্ত প্রান্তর : বিষণ্ণ নায়ক।' তাঁর আর একটি ব্যতিক্রমী গ্রন্থ বাংলা সাহিত্যে গ্যেটে বিষয়ক আলোচনা ও অনুবাদের একটি রূপরেখা। এছাড়া তিনি লিখেছেন নানা প্রবন্ধ—বসন্তরঞ্জন রায়, কুমুদরঞ্জন মল্লিক প্রমুখ স্বল্প আলোচিত, প্রায়-উপেক্ষিত ব্যক্তিত্বদের নিয়ে। বস্তুত তাঁর সমস্ত লেখালেখির মধ্যে যে প্রবণতা প্রায় প্রেরণার মতো তাঁকে চালিত করেছে, তা বোধ হয় এই যে তিনি বাংলা ভাষার প্রতিভাবান অথচ অনাদৃত সাহিত্যসেবীদের বিস্মৃতির অন্ধকারে হারিয়ে যেতে দেবেন না। তাঁর এই মহৎ জেদ আজহারউদ্দীনকে লেখক হিসাবে অন্যন্যতা দিয়েছে। তাঁর অন্য একটি বড় গুণ বাহুল্যবর্জিত, প্রাঞ্জল গদ্যে তাঁর বিষয়বস্তুর উপস্থাপনা। রচনাকে অনাবশ্যক পাদটীকা কণ্টকিত করে তিনি পণ্ডিতম্মন্য সাজতে চাননি। অথচ প্রয়োজনীয় সব তথ্যই তিনি গ্রন্থে অন্তর্ভুক্ত করেছেন। এজন্য বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস-জিজ্ঞাসু পাঠক তাঁর কাছে কৃতজ্ঞ থাকবেন।

অশোক পাল তাঁর পুস্তকটিতে আজহারউদ্দীনের প্রতিটি গ্রন্থের বিষয়বস্তুর সংক্ষিপ্ত পরিচয়, গ্রন্থ পরিকল্পনা, অধ্যায় বিভাগ, গ্রন্থগুলি সম্পর্কে সমসাময়িক সমালোচকদের প্রাসঙ্গিক মন্তব্য স্বল্পপরিসরে আলোচনা করেছেন। গ্রন্থগুলি সম্পর্কে অশোক পাল তাঁর নিজের মন্তব্য, বিশ্লেষণ ও মূল্যায়নও উপস্থাপিত করেছেন। এছাড়া তিনি সংযোজন করেছেন আজহারউদ্দীন খানের সংক্ষিপ্ত জীবনকথা, প্রাপ্ত সাহিত্যপুরস্কার, তাঁর রচিত ও সম্পাদিত গ্রন্থের তালিকা, কয়েকটি চিঠি ও বিভিন্ন গ্রন্থে আজহারউদ্দীন-লিখিত ভূমিকা। শেষোক্ত ক্ষেত্রে সাম্প্রতিক সংযোজন হয়েছে হরফ প্রকাশনী প্রকাশিত জসীমউদ্দীনের 'সুচয়নী' গ্রন্থের ভূমিকা, যা ২০০৪ সালে প্রকাশিত হয়েছে। বলতেই হয়, অশোক পালের পুস্তকটি ক্ষুদ্র, কিন্তু তাঁর প্রয়াস মহৎ।

তবে অশোক পালের দু'একটি অসাবধানী মন্তব্য স্ববিরোধী মনে হয় বলে এ বিষয়ে তাঁর দৃষ্টি আকর্ষণ করা যায়। বাংলা সাহিত্য ও সংস্কৃতি যে হিন্দু মুসলমানের সম্মিলিত সাধনায় নির্মিত এই ধারণার সঙ্গে তিনি একমত (পৃ: ৩০)। অথচ মোজাম্মেল হক সম্পর্কে অশোক পালের মন্তব্য 'তিনি মুসলমান হলেও খাঁটি বাংলা গদ্য লিখতেন।' বা অন্যত্র 'ধর্মমতে মুসলমান হলেও কায়কোবাদ-এর সাহিত্য বাঙালি সংস্কৃতিরই পরিচয়বাহী।' এই ধরনের উৎস সেই

'বাঙালি=হিন্দু' এবং 'মুসলমান=অবাঙালী' জাতীয় সমীকরণ। 'খাঁটি বাংলা'র ধারণাটিও তো অস্পষ্ট। বাংলা একটি মিশ্র ভাষা। বাংলা ভাষাভাষীদের সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ মুসলমান। সুতরাং তাদের ভাষা খাঁটি বাংলা বলে গণ্য হবে না? বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের ইতিহাসই বা কী বলে? প্রাচীন বাংলার আদি নিদর্শন চর্যাপদ বৌদ্ধদের সৃষ্টি। সেন রাজত্বে সংস্কৃতের অত্যধিক আদরে রাজসভা থেকে মাতৃভাষা বিতাড়িত হয়। রামায়ণ বা পুরাণের কথা বাংলা ভাষায় যে প্রচার করবে বা শুনবে—সে রৌরব নরকে যাবে—এই রকম অনুশাসন চালু হয়। কিন্তু সেন রাজত্বের অবসানে গৌড়ের পাঠান রাজদরবারে বাংলা ভাষা ধীরে ধীরে পুনরায় প্রতিষ্ঠা পায়। বাংলার সুলতানরা সকলেই বাংলা ভাষার অনুরাগী ও পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। আরাকানের রাজ্যে বৌদ্ধ রাজদরবারের ভাষাও ছিল বাংলা। এখানে বৌদ্ধ ও যাঁরা ইসলাম ধর্মগ্রহণ করেছিলেন তাঁরা উভয়েই আদরের সঙ্গেই বাংলা ভাষায় সাহিত্যচর্চা করেছেন। দীনেশচন্দ্র সেন এবং নীহাররঞ্জন রায়ের লেখা থেকেই এইসব তথ্য পাওয়া যায়। তাই মুসলমানদের ক্ষেত্রে বাংলা ভাষা তো তাঁদের স্বাভাবিক উত্তরাধিকার। একথাটা অবচেতনে লালিত প্রাক-ধারণার কারণে মাঝে মাঝে বিস্মৃত হওয়াটা বেদনাদায়ক।

সাহিত্যসাধক আজহারউদ্দীন খান—অশোক পাল/সৃজন প্রকাশনী, ঘাটাল, পশ্চিম মেদিনীপুর/২০.০০

মহান সাঁওতালি পরম্পরার পুনরাবিষ্কার

সৌমিত্রশঙ্কর সেনগুপ্ত

তখন পৃথিবীতে ছিল কেবল জল। স্থল বলতে কিছুই ছিল না। স্বর্গ থেকে দেবতারা এখানে স্নান করতে আসতেন। সৃষ্টিকর্তা ঠাকুর জিউ স্নান করতে নেমে ঘাটে বসে গায়ের ময়লা ছাড়ালেন, তারপর তা দিয়ে দুটো পাখি বানালেন। তাদের মধ্যে প্রাণের সঞ্চার করে নাম দিলেন হাঁস ও হাঁসিল। তাদের বসার কোনও জায়গা ছিল না। ঠাকুর জিউয়ের কথায় কেঁচো জলের নীচ থেকে মাটি তুলে কচ্ছপের পিঠে জমা করল। এভাবে তৈরি হল ডাঙা। ডাঙায় মই দিলেন ঠাকুর জিউ। তৈরি হল সমভূমি, পাহাড়, নদী, জন্মাল গাছ।

ডিম থেকে জন্ম নিল দুই মানব-মানবী। তারা বড় হল, তারপর একদিন লিটগোডেৎ (বার্তাবাহক) এসে তাদের হাঁড়িয়ার নেশা ধরালেন। শেখালেন জীবনরহস্য। সাত ছেলে, সাত মেয়ে হল তাদের। সাতটি ক্ষেত্র তৈরি হল। তারা বাস করত হিহিডি পিপিডতে। সেখান থেকে এল খোজ কামানে। সংখ্যা বাড়ল, আচারআচরণ খারাপ হল। ঠাকুর জিউ তখন একজন আদর্শ দম্পতিকে হারাতা বুরুর গুহায় নিরাপদে রেখে অগ্নিবর্ষণে আর সবাইকে মেরে ফেললেন। এরপর তারা এল সাসাংবেড়ায়—বংশ বাড়ল। এবার গোত্র বেড়ে হল বারো। তারপর জারপি দেশ হয়ে চাইবাসায় এসে তারা থিতু হলেন। এখানে অনেকদিন কাটানোর পর তোড়ে পুখুরি, শিখরভুঁই, তারপর সাঁওত দেশ। এখানে তাদের জাতি নাম হল সাঁওতাল। এরপর আবার বাসাবদল। টুন্ডি হয়ে সাঁওতাল পরগণা।

পৃথিবীর অসংখ্য নৃগোষ্ঠীর সঙ্গে মিলে যায় এমন একটি সৃষ্টিকাহিনি এবং তারপর ক্রমাগত ঠাঁইনাড়া হওয়ার ঘটনা পরম্পরা। ভারতের বৃহত্তম উপজাতি গোষ্ঠী সাঁওতাল। ছড়িয়ে আছে, বিহার, ঝাড়খণ্ড, পশ্চিমবঙ্গ ও উড়িষ্যাতে। আলোচ্য কাহিনিটি সাঁওতাল পরগণা থেকে সংগৃহীত, তাই শেষ হয়েছে সাঁওতাল পরগণাতে এসে। নাহলে ভাগলপুর, হাজারিবাগ, বীরভূম কিংবা কেওনঝোড়ে—অক্ষরে অক্ষরে একই কাহিনি শোনা যাবে। ক্রমাগত অধিকার হারাতে হারাতে উনিশ শতকের মধ্যভাগে তারা বিদ্রোহী হয়। ফলে উনিশ শতকের শেষে এবং বিশ শতকের শুরুতে তাদের জীবনযাত্রা, রীতিনীতি, ভাষা ও জীবনচর্যা নিয়ে ব্যাপক আগ্রহ সঞ্চারিত হয়—বিশেষত ব্রিটিশ রাজপুরুষ, ধর্মপ্রচারক ও পণ্ডিতদের মধ্যে। ইংরাজি ও বাংলায় একাধিক উপন্যাসও রচিত হয়েছে সাঁওতাল বিদ্রোহ 'হুল' নিয়ে। পরবর্তীকালে তাদের আরণ্যক—জীবন, মহুয়া ও হাঁড়িয়ার নেশা, মাদল ও নাচ নিয়ে যতটা রোমান্টিক আবেগ বাঙালি দেখিয়েছে, তাদের জীবন ও সংগ্রাম অনুধ্যানের নিবিড় কৌতূহল দেখায়নি তার ছিটেফোঁটাও।

কথাগুলো মনে এল বুদ্ধেশ্বর টুডুর 'অথ সাঁওতাল কথা' বইটি পড়ে। বইটি বাংলাভাষায় লেখা অর্থাৎ বাংলাভাষী পাঠক এ বইটির লক্ষ্য। প্রকাশকাল বইমেলা ২০০৪। সাঁওতাল বিদ্রোহের দেড়শো বছর পূর্তির প্রাককাল।

প্রসঙ্গত ২০০৫ সালে বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের শতবর্ষ পূর্তি হয়। সারা বছর এ উপলক্ষে যে সংখ্যায় গ্রন্থ ও আলোচনা

প্রকাশিত হয়েছে, সমধিক গুরুত্বপূর্ণ সাঁওতাল হুল বিষয়ে বাংলা ভাষায় তার এক-দশমাংশ লেখালেখিও হয়নি। এর মধ্যে অভিনবত্ব খোঁজার কোনও কারণ নেই। এই ommission-এরও ঐতিহ্য আছে। সাঁওতাল বিদ্রোহের অব্যবহিত পরবর্তীকাল থেকে বিদ্যাসাগর কার্মাটাড়ে বাস করতে থাকেন। সাঁওতাল উপজাতির মানুষের সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ নিয়ে বেশ কিছু কাহিনিও আমরা সকলেই জানি। কিন্তু তাঁর মতো সচেতন, সংবেদনশীল মানুষের কোনও লেখায় সাঁওতাল বিদ্রোহের প্রসঙ্গ আসেনি। রাজনারায়ণবাবু ১৮৭০ সালে স্বাস্থ্যোদ্ধারের জন্য দেওঘর যান ও বেশ কিছুকাল বাস করেন। হরপ্রসাদ শাস্ত্রী ১৮৭৮ সালে কার্মাটাড়ে বিদ্যাসাগরের কাছে কিছুকাল বাস করেন। সাঁওতাল অভ্যুত্থানের অব্যবহিত পরে মাইকেল মধুসূদনের জীবনচরিতকার যোগীন্দ্রনাথ বসু দেওঘরের সরকারি স্কুলের প্রধান শিক্ষক ছিলেন। সাঁওতাল হুল সম্পর্কে এঁরা সকলেই নীরব। সখারাম গণেশ দেউস্করের জন্ম সাঁওতাল পরগণার কঁরো গ্রামে। জাতীয় চেতনায় উদ্বুদ্ধ, স্বদেশপ্রেমিক ইতিহাস অনুসন্ধিৎসু এই মানুষটির রচনাতেও সাঁওতাল অভ্যুত্থান প্রসঙ্গ অনুপস্থিত। এ নীরবতা দুর্বোধ্য।

অথচ প্রায় একই সময়ে, হাজার মাইল দূরে বসে কার্ল মার্কস তার 'Notes on Indian Histroy'-তে লিখছেন, '1855-56 out-break of the Santals, a half savage tribe of the Rajmahal Hills in Bengal put down, after seven months guerilla warfare, in February, 1856' একদিকে নীরবতা, অন্যদিকে সশ্রদ্ধ উল্লেখ। কিছুকাল পরে, সম্ভবত হান্টারের লেখার অনুপ্রেরণায় যে বাঙালি চিন্তানায়ক প্রথম সাঁওতাল অভ্যুত্থান নিয়ে লিখছেন তিনি রবীন্দ্রনাথ। ১৩০০ বাংলা সনে 'ইংরাজের আতঙ্ক' এবং ১৩০৪ সালে 'প্রসঙ্গকথা-৪' নামক প্রবন্ধে।

বুদ্ধেশ্বর টুডুর বইটি বাংলাভাষী পাঠকের জন্য লেখা বলেই মূল প্রসঙ্গ থেকে সরে এসে এতগুলো কথা বলতে হল। পবিত্র সরকার যথার্থই বলেছেন বইটির ভূমিকায়—এ ধরনের বইকে দু'দিক থেকে লড়াই চালাতে হয়। এক তথাকথিত 'উন্নত' সম্প্রদায়ের অজ্ঞতার বিরুদ্ধে আর দুই, তাদের দীর্ঘপোষিত অবজ্ঞার বিরুদ্ধে।

বইটিতে সাঁওতাল জনসমাজের বেশ কয়েকটি প্রসঙ্গ আলোচিত। উৎপত্তির পৌরাণিক আখ্যান, সাঁওতালদের গণনাপদ্ধতি, নারীর মর্যাদা, সামাজিক অনুষ্ঠান, সাঁওতালি ভাষা, সাঁওতালি ভাষায় সাহিত্যচর্চা, বাপলা বা বিবাহ-পদ্ধতি, সাঁওতাল গানে সমাজতত্ত্ব, সাঁওতাল জাতি, সমাজ ও জীবনচর্যাকে যারা জানতে-বুঝতে চান, বইটি তাদের কৌতূহল মেটাবে। কিন্তু আগ্রহীর কৌতূহল নিবৃত্তি শ্রীটুডুর রচনার উদ্দেশ্য নয়। পৌরাণিক কাহিনি ও বিভিন্ন সামাজিক অনুষ্ঠান ও রীতিনীতির পিছনে যে বৈজ্ঞানিক ভিত্তি, ঐতিহাসিক সত্য, সমাজতাত্ত্বিক পটভূমি ও অর্থনৈতিক সম্পূর্ণতার কাঠামো আছে তার ওপর সচেতন আলোকপাত করতে চেয়েছেন তিনি। পূর্বভারতের বিস্তীর্ণ অংশে ছড়িয়ে থাকা এই বিপুল জাতিগোষ্ঠী এ অঞ্চলের জনজীবনকে তার ঐতিহ্য ও কৃষ্টি দিয়ে কতদূর প্রভাবিত করতে পেরেছে, সামান্য হলেও তা এ আলোচনায় এসেছে। সাঁওতাল জাতি তার প্রাপ্য মর্যাদা ব্রিটিশ শাসনকালে পায়নি, স্বাধীনতার পঞ্চাশ বছর পরেও কেবলমাত্র সংরক্ষণের সুবিধা ছাড়া এই সম্ভাবনাময় জাতিগোষ্ঠীর জন্য সামগ্রিক ভাবনার পরিচয় দেখা যায়নি। অথচ ভারতবর্ষের প্রকৃত ইতিহাস লুকিয়ে আছে এদের ভাষায়, আচার আচরণে। এই অবজ্ঞাই বুদ্ধেশ্বর টুডুকে অনুপ্রাণিত করেছে অথ সাঁওতাল কথা বইটি লিখতে।

এই আলোচনার শুরুতে উৎপত্তি-কাহিনিটি সংক্ষেপে বর্ণিত। ঠাকুর জিউ প্রথম দুটি পাখি তৈরি করেছিলেন মাটি দিয়ে। সাঁওতালি গানে আছে—এই মাটির দেহ দু'দিনের জন্য। তাদের বিশ্বাস শরীর মাটি দিয়ে তৈরি এবং মাটিতেই মিশে যাবে। পাখি দুটির থাকার ব্যবস্থা করতে কেঁচোকে দিয়ে জলের নীচ থেকে মাটি তোলানো হয়েছিল এবং ঠাকুর জিউ তাতে মই দিয়েছিলেন। মই একটি পরিচিত কৃষি উপকরণ। অর্থাৎ এ কাহিনি রচনার সময় সাঁওতালরা কৃষিজীবনে প্রবেশ করেছে—তাঁদের স্মৃতিলোকে সজীব উৎপত্তি কাহিনিরও অঙ্গীভূত হয়েছে কৃষিজীবনচর্যা, প্রসঙ্গ এসেছে তাদের প্রিয় উদ্ভিদের—দূর্বা ঘাস, শাল, মহুয়া, করম। অরণ্য-নির্ভর জীবনের নির্যাস। এসেছে শ্রমবিভাজনের অনুমান। মেয়ে পাখিটি ডিমে তা দেয়, পুরুষ পাখি ব্যস্ত থাকে বাইরের কাজে। এরপর দুটি মানবশিশুর জন্ম, গোত্র ভাগ, সংখ্যা বৃদ্ধি এবং দীর্ঘ প্রব্রজন।

দুমকার বেনাগড়িয়া মিশনের উদ্যোগে সাঁওতাল সমাজের ঐতিহ্য ও প্রতিষ্ঠানের প্রথম পূর্ণাঙ্গ পরিচয় সংকলিত হয়। প্রকাশনাটির নাম 'মারে হাপড়াম কো রিয়া:ক্ কথা' অর্থাৎ পূর্বপুরুষদের কথা। এর সবথেকে বড় বৈশিষ্ট্য হল সাঁওতাল গ্রামবৃদ্ধেরা যেভাবে কাহিনিমালা ও রীতি-পদ্ধতি বর্ণনা করেন সাঁওতালি ভাষাতে ঠিক তেমনভাবেই তা লেখা হয়। অশোক মিত্র লিখেছিলেন, "The account is fairly 'uninhibited'. It has, perhaps, a more positive virtue in that it makes a conscious effort not to slur over customs which do not come up to 'civilised standards" অশোক মিত্রেরই উদ্যোগে

উপজাতি কল্যাণ দপ্তরের আধিকারিক শ্রীবৈদ্যনাথ হাঁসদা সাঁওতালি ভাষার শব্দবৈশিষ্ট্য ও ছন্দের কথা মাথায় রেখে একটি চমৎকার বঙ্গানুবাদ করেন এবং শ্রীমিত্র সম্পাদিত জনগণনা, ১৯৫১ প্রকাশমালার অন্যতম ডিস্ট্রিক্ট হ্যান্ডবুক, বাঁকুড়া খণ্ডে (১৯৫৩) তা সংযোজিত হয়। এখনও পর্যন্ত রচনাটি বহুপঠিত এবং সম্ভবত সাঁওতালি রীতি-নীতি প্রসঙ্গে আলোচনায় সর্বাধিক ব্যবহৃত।

সাঁওতাল জাতির প্রাচীনতম উল্লেখ পাওয়া যায় স্যার জন গোরের 'Some Extraordinary Facts, Customs, and Practices of the Hindue' প্রবন্ধে (১৭৯৫)। কোম্পানির শাসনাধীন অপেক্ষাকৃত কম সভ্য এলাকা রামগড়ে বসবাসকারী 'সাওন্তার' নামে একটি বর্বর অশিক্ষিত জাতির কথা লেখেন তিনি। ১৮১৮ সালে 'দামন-ই-কো' সংক্রান্ত সাদারল্যান্ডের প্রতিবেদনে দ্বিতীয়বার উল্লেখিত হয় এই জাতির অস্তিত্ব। এ অঞ্চলের দক্ষিণ প্রান্তে পরিশ্রমী 'সাওন্তার' কৃষকদের দেখা পেয়েছিলেন তিনি। তাঁর প্রতিবেদন অনুসারে মালপাহাড়িয়াদের নিয়মিত আক্রমণ থেকে উর্বর নিম্নভূমিকে বাঁচানোর জন্য বীরভূম, মুর্শিদাবাদ ও ভাগলপুরের ১৩৩৬ বর্গ মাইল পাহাড়, জঙ্গল ও আবাদি জমিকে চিহ্নিত করে তার নাম দেওয়া হয়েছিল দামন-ই-কো। ওই এলাকা ছিল পাহাড়িদের জন্য সংরক্ষিত কলোনি। সুপারিনটেন্ডেন্ট জন পেটি ওয়ার্ড ও সার্ভেয়র ট্যানারের নেতৃত্বে ওই এলাকা পাকা পিলার দিয়ে ঘিরে দেওয়া হয়। মালপাহাড়িয়া কোনও ভাবেই জঙ্গল হাঁসিল করে চাষবাসে আগ্রহী হবে না বোঝার পর ওয়ার্ড, সরকারি নীতির বিরুদ্ধে গিয়ে এই কলোনিতে সাঁওতালদের এনে বসান। কঠোর পরিশ্রমী সাঁওতালদের হাতে জঙ্গল মুছে জন্ম নেয় উর্বর আবাদি জমি। ১৮৩৬ সালে গ্রামের সংখ্যা হয় ৪২৭ এবং ১৮৬১ সালের মধ্যে পত্তন হয় দেড় হাজার গ্রাম। নতুন আবাদি জমিতে হৈমন্তিক ফসলের সোনালি রঙ ডেকে আনে বিপন্নতা। দামন-এর সীমানা ঘিরে গড়ে ওঠে বিহার ও বাংলা থেকে আসা হিন্দু মহাজন ব্যবসায়ীদের বসতি। নতুন শোষণ চক্র। পরিণতিতে দামন-ই-কো-র দ্বিতীয় প্রজন্মের সাঁওতালেরা সামিল হয় অভ্যুত্থানে, আরও একবার প্রব্রজনের পথে মালদা থেকে উত্তরবঙ্গ পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়ার আগে।

পৌরাণিক কাহিনির একটা বড় অংশ জুড়ে আছে প্রব্রজন। তার পিছনে জনসংখ্যা বৃদ্ধি, সামাজিক রীতিনীতি থেকে বিচ্যুতি, নারীর মর্যাদার প্রতি গুরুত্ব। (মাধো সিং-এর বৃত্তান্ত) ইত্যাদি কারণগুলি শ্রীটুডু তুলে ধরেছেন। অপ্রত্যাশিতভাবে বাদ পড়ে গেছে জমির অধিকার থেকে বারবার বঞ্চিত হওয়ার মতো গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। অথচ 'হাপড়াম কো রিয়া:ক্ কথা'-র কাহিনি-কথকেরা কিন্তু এ প্রসঙ্গ তোলেননি—"পূর্বপুরুষগণ বলিয়াছেন, জানা যায়, পুরাকালে রাম রাজা থাকিবার সময় সমস্ত খেরওয়াল (আদিম) লোক তাহার সঙ্গে লঙ্কায় গিয়া রাবণ রাজাকে পরাজিত করিবার জন্য যোগ দিয়াছিলেন, সেই জন্য বহুদিন পর্যন্ত দেকোদের (হিন্দু) সহিত কোনও লড়াই ছিল না। তাঁহারা ফাঁকা অঞ্চলে থাকিতেন আমরা পাহাড় জঙ্গলে থাকিতাম। কিন্তু পরে দেকোদের (হিন্দু) সহিতঅনেক লড়াই হইল; তাহাদের সহিত আজ পর্যন্ত মিল (সুখ) নাই। আমরা কোনও জায়গা পরিষ্কার করিলে দেকোরা (হিন্দু) আসিয়া কাড়িয়া লয়। তবুও বর্তমানে সাহেবরা তাহাদের সাহায্য না করিলে গঙ্গার পরপারে তাড়াইয়া দিতাম। বিদ্রোহের সময় গঙ্গাকে সীমানা করিব ঠিক করিয়াছিলাম, তারপর সাহেবরা সাহায্য করে। পূর্বে গঙ্গার এপার ওপার আমাদের দখল ছিল।" এককালে নৃতত্ত্ববিদদের এমন ভাবনাও ছিল, সাঁওতালেরা এক জায়গায় থিতু হতে চায় না, ঝুম চাষের পদ্ধতির সঙ্গে এটি সম্পর্কিত, জঙ্গল হাসিল করার পর আবাদি জমিতে কিছুকাল কাটানোর পর নতুন বনাকীর্ণ অঞ্চল তাদের টানে। "A country denuded of the primeval forests which affords them the hunting grounds they delight in and the virgin soil they prefer, does not attract them; and when, through their own labour, the spread of cultivation has effected its denudation, they select a new site, however prosperous they may have been on the old, and retire into the back woods, where their harmonious flutes sound sweeter, their dream find deeper echos, and their bows and arrows may once more be utilised" (Statistical Account of Santal Parganas).

ভূমির ইতিহাস কিন্তু অন্য কথা বলে। ১৮৬০ সাল নাগাদ জেমস গ্যাসট্রেল যখন বাঁকুড়া জেলায় জরিপ করছিলেন তখন সাঁওতালরা তাদের জমি জরিপ করানোর জন্য ভীষণ আগ্রহ দেখায়। জমির অন্য মালিকরা জরিপের উদ্দেশ্য নিয়ে সন্দিহান হওয়ায় এ কাজে প্রায়ই অসহযোগিতা করত। 'It is intersting that the Santals were not only anxious that the surveyors should survey their village boundaris but begged them to survey and lay down their small internal holdings also, pulling up marks for this purpose most carefully. (Gastrell : Statistical and Geographical Report of Bancoorah, 1863) এ ঘটনা ভূমির বিদ্রোহের অব্যবহিত

পরের—যখন জঙ্গলমহল অঞ্চলে বিশৃঙ্খলার জন্য পুনরায় ঠাইনাড়া হওয়ার আতঙ্কের শিকার হয়েছিল তারা। জঙ্গলমহলের সাঁওতালদের বিপুল অংশ অপেক্ষাকৃত 'সম্মানিত' বসতি হিসাবে দামন-ই-কোর দিকে চলে যায় এবং সুখের দিনের অবসানে সামিল হয় সাঁওতাল অভ্যুত্থানে। সাঁওতাল পরম্পরার অনুসন্ধান কি ভূমি-প্রশ্নকে বাদ দিয়ে হতে পারে? সাঁওতাল অভ্যুত্থানও তো একই মৌলিক প্রশ্নই উত্থাপন করেছিল, যে-জমি তারা হাসিল করেছে, চাষোপযোগী করেছে, তার মালিক তারা। যে-দেশে তারা বাস করে, যার সঙ্গে তাদের সম্পর্ক নিবিড়—সেই দেশের মালিকও তারা।

প্রসঙ্গত একটি খুব গুরুত্বপর্ণ রীতিও বুদ্ধেশ্বর টুডুর বইটির আলোচনার পরিধির বাইরে থেকে গেছে। গ্রাম পত্তনের রীতি। যে-উপজাতির স্মৃতিলোক জুড়ে এক স্থান ছেড়ে অন্য স্থানে যাওয়ার কাহিনি তাদের গ্রাম পত্তন রীতি অবশ্যই আলোচ্য। বিশেষত তা যখন কৃষি ও বাস্তুজমির গোষ্ঠী মালিকানার কথা বলে। আগ্রহীরা হাপড়াম কো রিয়া:ক্ কথার ২৪-৩০ অধ্যায় পড়তে পারেন।

গণনার সাঁওতালি-পদ্ধতি নিয়ে চমৎকার আলোচনা করেছেন বুদ্ধেশ্বর। দিন, মাস, বছর গোনা, মাস ও ঋতু ভাগ, সাধারণ গণনা এবং তার সঙ্গে বিভিন্ন রীতি, অনুষ্ঠান ও অর্থনৈতিক ক্রিয়াকর্মের সম্পর্কের ব্যাখ্যা অত্যন্ত সুপাঠ্য। সামাজিক অনুষ্ঠান বিশেষত বিবাহপদ্ধতির আলোচনা কৌতূহলী পাঠককে তৃপ্ত করবে। প্রতিটি আলোচনায় শ্রীটুডু বারবার ধরিয়ে দিয়েছেন সাঁওতালি জনসমাজের নিজস্ব বৈশিষ্ট্যগুলিকে যা কেবল তাদের স্বতন্ত্রই করেনি, যে মূল্যবোধগুলি ক্রমাগত হারিয়ে গিয়ে অবক্ষয়কে জায়গা করে দিচ্ছে, সেই মূল্যবোধ, পারস্পরিক সম্পর্ক, সুখ-দুঃখ ভাগ করে নেওয়ার সমাজ-রীতির কথা তিনি আমাদের স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন।

বইটির আয়তনের অনুপাতে অনেকটা স্থান বরাদ্দ হয়েছে সাঁওতালি ভাষা বিষয়ক আলোচনায়। বাইরের অভিঘাত, ক্রমাগত ঠাঁইনাড়া হওয়ার মধ্যেও যে দুটি বিষয়কে সাঁওতাল সমাজ বাঁচিয়ে রেখেছে তার একটি হল সামাজিক অনুশাসন, দ্বিতীয়টি ভাষা। ডবলু ডবলু হান্টারও তার The Annals of Rural Bengal-এ অনেকটা জায়গা দিয়েছিলেন সাঁওতালি ভাষার আলোচনায়, কারণ "The language of the Santals, that intangible record on which a nation's past is graven more deeply than on brass tablets or in rock inscriptions, is as rich a field of enquiry as their traditions are meagre and barren."। ভাষার মূল সম্পদ শব্দভাণ্ডার। একটি ভাষার শব্দ ভাণ্ডারের সমৃদ্ধি ভাষাটির উন্নতির পরিচায়ক। সাঁওতালি ভাষার শব্দভাণ্ডার সম্পর্কে চমৎকার আলোচনা করেছেন শ্রীটুডু। আলোচনাটি দীর্ঘ হলেও, তা বিরক্তি উৎপাদন করে না, আমার মতো যাদের সাঁওতালি ভাষার জ্ঞান নেই, তাদের পাতা উলটে পরবর্তী পাঠ্য অংশে যেতে প্ররোচিতও করে না। ব্যাকরণের কিছু বিষয়, একবচন ও বহুবচনের সঙ্গে সংস্কৃতের ধাঁচে দ্বিবচনের অস্তিত্ব, শব্দব্যবহারের সূক্ষ্মতা সুন্দরভাবে আলোচিত। যেমন—বাংলায় বসা (to sit)-এর প্রকারভেদ না থাকলেও সাঁওতালি ভাষায় আছে। মানুষের বেলায় 'দুড়ুপ', চতুষ্পদের ক্ষেত্রে 'বুরুম', আবার পাখির ক্ষেত্রে 'আক'। প্রসঙ্গত সাঁওতাল কৃষিজীবনের কথা আলোচনা করতে গিয়ে হান্টার ভাষার আলোচনা করেছিলেন ধান চাষের প্রতিটি প্রক্রিয়ার জন্য সাঁওতালি ভাষায় সম্পূর্ণ নিজস্ব আলাদা আলাদা শব্দ আছে। আবার ধান চাষের প্রতিটি ধাপের উৎসব হয় আলাদা। প্রাতিষ্ঠানিক বাংলা ভাষায় কৃষি পরিভাষা এসেছে প্রধানত সংস্কৃত ভাষা থেকে। কিন্তু রাঢ়বাংলার গ্রামের প্রান্তিক চাষিরা কৃষিবাচক বহু শব্দ ব্যবহার করেন যার উৎস সাঁওতালি শব্দভাণ্ডার।

সাঁওতালি ভাষার আর একটি বৈশিষ্ট্যের প্রতি হান্টার আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলেন। প্রসঙ্গটি বুদ্ধেশ্বর টুডুর বইতে অনালোচিত বলে এখানে উল্লেখ করার তাগিদ অনুভব করছি। একটি ভাষার বর্ণমালা দিয়ে অন্য কোনও ভাষার যে কোনও শব্দকে উচ্চারণ করা সম্ভব নয়—দ্বিতীয় ভাষাটিতে কোনও না কোনও ধ্বনি থাকবে যা প্রকাশ করতে প্রথম ভাষাটি অক্ষম। আশ্চর্যের কথা, হান্টার লিখছেন, সংস্কৃত বর্ণমালা সাঁওতালি ভাষার সমস্ত ধ্বনিকে প্রকাশ করতে পারে। ফলে হান্টারের সিদ্ধান্ত—"It appears likely that the aboriginal race whom the Aryan immigrants chiefly dealt with, and from whom they supplemented their consonat sounds, were either the ancestors or a cognate tribe of the ancestors of the Santals." প্রাচীন প্রাকৃত ভাষাতেও ব্যবহৃত হয়েছে বহু সাঁওতালি শব্দ। সাঁওতালি শব্দভাণ্ডারেও এমন কিছু শব্দ আছ যার উৎস সংস্কৃত ভাষা—কিন্তু শব্দগুলি বাংলা বা হিন্দি ভাষাতে ব্যবহৃত নয়। অর্থাৎ সাঁওতালি ভাষাভাষী ও সংস্কৃত-প্রাকৃত ভাষাভাষী মানুষ পরস্পরের সংস্পর্শে এসেছে প্রাচীনতর কোনও সময়কালে। সুতরাং বুদ্ধেশ্বর টুডু যখন সাঁওতালি ভাষার মানদণ্ডে সভ্যতার বিচার করতে চান বা দাবি করেন 'বেদ, উপনিষদ পুরাণে উল্লিখিত ঘটনা যদি প্রাচীন ইতিহাস রচনার উপাদান হিসেবে গ্রহণীয় হয় তবে

একটি জাতির জীবনশৈলী, যেটা তার নিজস্ব, যেটা সম্পূর্ণভাবে অন্যের প্রভাবমুক্ত, সেটা কেন ইতিহাস রচনার উপাদান হবে না' তাঁর কথার যৌক্তিকতাকে উড়িয়ে দেওয়া যায় না।

১৮৫৫-র অভ্যুত্থানের পর সাঁওতাল জনজীবনচর্চার ব্যাপক ঢেউ উঠেছিল। ছোট কিন্তু ধ্রুপদী রচনার কৃতিত্ব দেখিয়েছেন পি. ও. বোডিং, এল. ও. স্ক্রেফস্রুড, ম্যাকফারসন, উডফোর্ড। লিখেছেন রেভা: জি. ফিলিপস্ এবং সারেঙ্গার মিশনারিরা। আগেই উল্লিখিত হয়েছে বেনাগড়িয়া মিশনের অবদানের কথা। লিখেছেন ব্র্যাডলে বার্ট, রবার্ট কারস্টেয়ার্স এই দুই রাজপুরুষ। সংবেদনশীল তথ্যনিষ্ঠ গ্রন্থ রচনা করেছেন হান্টার 'অ্যানালস্ অব রুরাল বেঙ্গল' যা ধ্রুপদী রচনা রূপে স্থান পেয়েছে। তুলনায় বাংলা ভাষায় আলোচনা হয়েছে কম। সাঁওতাল অভ্যুত্থান অবশ্য বহু আলোচিত বাংলা ও ইংরাজিতে। সে হিসাবে একটা বড় শূন্যস্থান পূরণ করবে শ্রীবুদ্ধেশ্বর টুডুর 'অথ সাঁওতাল কথা' বইটি। এখানে একটি অপ্রিয় সত্য না বললে চলছে না—'আজ এমন কিছু বলব যেটা ইতিপূর্বে কেউ বলেনি, এখনও পর্যন্ত, আজ পর্যন্ত কেউ বলেনি' এ জাতীয় শিশুসুলভ মন্তব্য, কিংবা 'হরপ্পা-মহেঞ্জোদরোর সভ্যতা সাঁওতালদের তৈরি'—এ ধরনের প্রমাণোর্ধ্ব, আকস্মিক সিদ্ধান্ত ঘোষণা না করলে বইটির গুরুত্ব বাড়ত বই কমত না।

মুদ্রণপ্রমাদ অত্যন্ত কম। শালগাছের মতো ঋজু বর্ণমালার গতিময় বিন্যাসে ছিমছাম, সরল, অসামান্য প্রচ্ছদ রচনা করেছেন সুব্রত গঙ্গোপাধ্যায়। এমন প্রচ্ছদ বইটিকে হাতে তুলে নিতে প্ররোচিত করে।

অথ সাঁওতাল কথা—বুদ্ধেশ্বর টুডু/বিজয়ন প্রকাশনী, কলকাতা-৫/৭০.০০

বিয়ের গীতের একটি দলিল

বুলবুল আহমেদ

বিয়ের গান আমাদের সংস্কৃতির একটি বিশেষ উপাদান বলে গণ্য হত। সে সব গান করতেন মূলত মহিলারা, তাতে বিয়েকে কেন্দ্র করে যে যে আচার পালন করা হত তার কথা থাকত রঙ্গে-ব্যঙ্গে-আনন্দে। একই বিষয়কে কেন্দ্র করে বিভিন্ন জেলার গানের ভাষা ও গায়কী পৃথক হতে দেখা যায়। বিয়ের আসর জমে উঠত সমবেত গানে, বাজনায়, নাচে, রসিকতায়। এইসব গানের মূল রচয়িতা কে বা কারা তার হদিস পাওয়া সহজ নয়, একই গানে বহুজনের সংযোজনা থাকতে পারে। গ্রামীণ মহিলারা গান বেঁধেছেন, পরিবেশন করেছেন। আর তাতে নানা সংস্কার, প্রথা-পদ্ধতি, অন্তরের বেদনা, ব্যাকুলতা প্রতিফলিত হতে দেখা যায়। তবে সেদিন আর নেই। একান্নবর্তী পরিবার ভেঙে গেছে, মানুষের জীবন থেকে অবসর কমে গেছে, বিজ্ঞান সমাজকে গতিশীল করেছে কিন্তু অন্তর্হিত হয়েছে আবেগ। আর সাহিত্য ও সংস্কৃতিতে আজ বাঙালির লোকজ উপাদানসমূহ প্রায় বিলুপ্তির পথে। এর জন্য কেউ কেউ ভুবনায়নকে দায়ী করতে পারেন। তবুও মানুষের ঐতিহ্যের অন্বেষণ থেমে থাকে না। একদম হারিয়ে যাবার আগে মানুষ তৎপর হয় নিজেদের লোককথা, গৌরবকথা লিপির মধ্যে ধরে রাখতে। এক অন্তর্গত তাগিদ ও দায়বদ্ধতা থেকে এই কাজ করে মানুষেরা।

মনোয়ারা খাতুন একই সমাজভাবনা থেকে "মুসলিম বিয়ের গানে বাঙালি মুসলিম সমাজ" বইটি লেখেন। এ তাঁর অনেক পরিশ্রমের ফসল। শুধুমাত্র প্রচলিত গানের একটি সংকলন করে তিনি তৃপ্ত নন। তিনি গানগুলোর প্রেক্ষাপট বিশ্লেষণ করেছেন, তার অনুষঙ্গ ব্যাখ্যা করেছেন। গানের পাঠ (text) ছাড়াও গ্রন্থিত হয়েছে বাংলার বিভিন্ন ধর্মীয় সম্প্রদায়ের আচার-অনুষ্ঠানের কথা। এই কাজ ঘরে বসে কোনও একজনের পক্ষে সম্ভব হয় না। নিশ্চয়ই তিনি বিভিন্ন জায়গায় ঘুরে নানা জনের কাছে থেকে গান সংগ্রহ করেছেন, গান সম্পর্কে নানা রকম প্রচলিত ধারণা জেনেছেন।

তবে গানগুলি ছাড়াও এই গ্রন্থের বেশ কয়েকটি লেখা—বাঙালি মুসলিম সমাজের উৎপত্তি, পির-পিরানি কথা, বাঙালি মুসলিম সমাজের বৈশিষ্ট্য, বঙ্গবাসী কয়েকটি সমাজের বিবাহ পদ্ধতি—বিশেষভাবে উল্লেখের দাবি রাখে।

লেখিকার গভীর সমাজবোধের পরিচয় পাওয়া যায় যখন তিনি লেখেন—' "গায়ে হলুদ" বা "লগন ধরা" দিন থেকে বিয়ের দিন পর্যন্ত মেয়েরা বিবাহ সম্পর্কিত এবং জীবনমুখী গান করে। গানে গানে ফুটে ওঠে একটি নারীর পূর্ণাঙ্গ জীবন, তার সমগ্র মানসজগৎ, তার সুখ-দুঃখ, প্রাপ্তি-অপ্রাপ্তি, মান-অভিমান, আনন্দ-বেদনার ঝরনাধারা। তেমনই অন্দর মহলে

সমগ্র নারীসমাজের চিত্র ফুটে ওঠে। গানে গানে যত না খুশি, স্ফূর্তি, মজা, মস্করা থাকে তার চেয়ে অনেক থাকে অতি আপনজনের কাছে পাওয়া—"অতি গোপন না বলা বেদন"—অতি আপনজনের কাছে গোপনে কিল খেয়ে কিল হজম করার সংগোপন কৌশল। গানে জায়গা করে নিয়েছে পল্লীজীবনের জীর্ণ, দীর্ণ কুটির, গরীবের আঙ্গিনা, আমিরের দর-দালান, খাট-পালঙ্ক, দেশের পুরাণ থেকে বিদেশের কিস্যা, সমাজের নানান ব্যাধি—পণপ্রথা, অসমধর্ম বিবাহ, সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা, বাবরি মসজিদ ভাঙাজনিত দাঙ্গার ভয়াবহতার চিত্র, ভোটের রাজনীতি, গুজরাটের দাঙ্গা, অক্ষরধাম মন্দিরে নিরীহ ধর্মউপাসকদের উপর বোমা নিক্ষেপ, কাশ্মীরে রক্তপাত, সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি, বিধবা নারীর দ্বিতীয় বিবাহের ক্ষেত্রে সন্তানদের আকুল মিনতি, অসহায়তা, বিধবার যন্ত্রণা, সতীন জ্বালা ইত্যাদি ব্যক্তিগত ভাবনা জাগিয়ে গান সম্প্রসারিত হয় সমাজ ভাবনায়। সামাজিক নানান ঘটনা মূর্ত হয়ে ওঠে—রাজনীতি, দাঙ্গা, সরকারি আইনকানুনের প্রতিক্রিয়া, যুদ্ধের ভয়াবহতা। আর বাংলার মুখ ফুটে ওঠে গানে।'

একটি সামাজিক বিয়ের নানা আচার—পাত্র-পাত্রী দেখা, লগন ধরার সময়কাল, গায়ে হলুদ, ঢোল মঙ্গলা, ক্ষীর খাওয়ানো, ঢেঁকি মঙ্গলা, থুবড়া খাওয়া, মেহেদি রসম, মশাল নাচ, বর সজ্জা, বিবাহ যাত্রা, বিবাহ বাসর, গিঁট বাঁধা, কড়িখেলা, কন্যা বিদায়, ফুলশয্যা, জোড়ে গোসল, বউভাত, অষ্টমঙ্গলা ইত্যাদি সম্পর্কিত গান এখানে সংযোজিত হয়েছে।

আজকের দিনে সকালবেলা খবরের কাগজ খুলে পণের কারণে বধূনির্যাতন বা বধূহত্যা দেখতে পাওয়া প্রায় অভ্যাসে পরিণত হয়েছে। ভাবতে অবাক লাগে এমন একটা সময় গেছে যখন কন্যাপণ দেবার প্রথা ছিল। বিয়ের সময় বরপক্ষ কন্যাপক্ষকে অর্থ, গহনা, খাদ্যসামগ্রী প্রদান করত। কন্যা তখন অনাকাঙ্ক্ষিত ছিল না সংসারে। বর পছন্দ করার সময় দেখা হত সে যেন মেয়ের মর্যাদা রক্ষা করতে এবং যথার্থ দায়িত্ব নিতে সক্ষম হয়। এ সম্পর্কে একটি গানে আমরা দেখি 'উত্তর হনে আইলেন গো ছেলেলাল—ওই জোড় বাঁশি বাজায়ে/কার বা জন্যে করলাম গো মানুষ—ওই তেল কাজল পরিয়ে।/কেবা লয়ে যাবে গো বেটিকে—ওই হারা পালকি সাজায়ে।/যারা দিয়েছে এগনে ভরা লগন মা—তারা নিয়ে যাবে বেটিকে।/যারা দিয়েছে আড়ি মাপা টাকা মা—তারা নিয়ে যাবে বেটিকে।/যারা দিয়েছে বাক্স ভরা জেওর মা—তারা নিয়ে যাবে বেটিকে/যারা দিয়েছে খাঞ্চা ভরা পাকান মা—তারা নিয়ে যাবে বেটিকে।/যারা দিয়েছে রসি ধরে খাসি মা—তারা নিয়ে যাবে বেটিকে।'—সমাজে নারীর স্থান বা মর্যাদা কেমন ছিল তা অনুধাবন করা যায় এই গানের মধ্য দিয়ে।

গ্রামের কৃষিজীবী সমাজে ধর্মসম্প্রদায়-নির্বিশেষে বাড়ির উঠোনের একপ্রান্তে থাকত ঢেঁকিশাল। ঢেঁকির পাড় দেবার শব্দে ঘুম ভাঙত পাড়ার লোকেদের। কৃষিপ্রধান বাংলাদেশের প্রধান ফসল তথা খাদ্যশস্য ধান। ঢেঁকিতে ধান ভেনে চাল তৈরি করা হত। বাড়ির মহিলাদের চাল ঝাড়ার ঝমর ঝমর শব্দে চমকিত হয় চারিদিক। অনেক সময় থুবড়ার ক্ষীর তৈরি করার জন্যও ঢেঁকিতে ধান ভেনে চাল করা হয়। চাল ঝাড়ার কুলো, তাকে নানা রঙে রঙিন করার প্রথা প্রচলিত ছিল। পাড়ার অভিজ্ঞ মহিলারা ঢেঁকি মঙ্গলায় অংশ গ্রহণ করে থাকেন। এই অনুষ্ঠানে যে গান গাওয়া হয় তার নমুনা লেখিকা দিয়েছেন—'চন্দন কাঠের ঢেঁকি আমার তাতে সোনার গুলো/রহমান লালের চাল পাছুড়াতে—আম্মাজানের হাতে কুলো।/ঢেঁকি তুমি থাকো কুন্ ঠাঁই?/আমরা থাকি চাষি ভায়ের চালায়/ঢেঁকি তুমি লাগো কুন্ কুন্ বাগে/আমি লাগি সকল লোকের পেটের বাগে/আমি লাগি ছেলেলালের বাগে।'

নারী ও পুরুষের মধ্যেকার ভালবাসা, মিলনাকুতি, পূর্বরাগ, প্রেমবঞ্চনা, প্রতারণা, বিরহ ইত্যাদিও প্রকাশ পেয়েছে সংকলিত অনেক গানে। ভালবাসার কথা ব্যক্ত হলে আমরা শুনি—'কে যাবি আয় তোরা—পানসি লেগেছে ঘাটে/পানসি লেগেছে ঘাটে—তরী লেগেছে ঘাটে/বন্ধুর ওই মায়াতরী—ভেসে বেড়ায় ঘাটে ঘাটে।/বন্ধুর ওই মায়াতরী—ও মায়াজাল ভুলতে নারি/বন্ধুর ওই নৌকা চাপিতে—পয়সা লাগে না তাতে/বন্ধুর ওই মায়াতরী—ঘুরে বেড়ায় ঘাটে ঘাটে।' আবার প্রেমে প্রতিবন্ধকতাও রয়েছে। সে বাধার কথাও এসেছে—'হায়, আমবাগানে যাবো দুখের সুখের কথা কব/আম পেড়ে আঁটি ফেলে খাবো দুজনে।/কে কাঁটা দিলে আমার আম বাগানে।/...হায়, ফুলের বাগানে যাব—দুখের সুখের কথা কব/ফুল তুলে মালা গেঁথে পরব দুজনে/কে আগুন দিলে আমার ফুলের বাগানে।'

মানোয়ারা খাতুন "মুসলিম বিয়ের গানে বাঙালি মুসলিম সমাজ" গ্রন্থে চারশো ছত্রিশখানা গান সংকলিত করেছেন। তাঁর এই কাজে অনেকে নানাভাবে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন। সে সবের স্বীকৃতি রয়েছে মুখবন্ধে, পটভূমিকা কথনে এবং কৃতজ্ঞতা পত্রে। তবে পরিবার ও আত্মীয়স্বজনের কথা এতবার করে বলার প্রয়োজন ছিল বলে মনে হয় না। আর মুসলিম চিত্র আঁকার সময় আরও বেশি পর্যালোচনা ও সমাজসংলগ্নতা দাবি করেন কোনও কোনও পাঠক। একটা

অভাব থেকে যায় ওপার বাংলায় প্রচলিত বিয়ের গানের জন্য। মনোয়ারা তাঁর পরবর্তী বইতে হয়ত সে অভাব পূরণ করবেন।

আজকের এমন একটা সময়ের মধ্যে দিয়ে আমরা যাচ্ছি যখন ভুলে যাওয়া ও ভুলিয়ে দেওয়া প্রাত্যহিক অভ্যাসের মধ্যে পড়ে।তখন একটা লুপ্তপ্রায় লোকসংস্কৃতি সম্পর্কে কেউ আগ্রহী হলে পরম আনন্দ হয়। আজ বৈদ্যুতিন মাধ্যমের দৌরাত্ম্যে বিয়ের গান রচনা করা ও গাওয়া দ্রুত কমে আসছে। অথচ এইসব গানের মধ্যেই ধরা পড়েছিল মানুষের অন্তরের নিগূঢ় পরিচয়। এই বই তারই একটি দলিল।

মুসলিম বিয়ের গানে বাঙালি মুসলিম সমাজ—মনোয়ারা খাতুন/হরফ প্রকাশনী, কলকাতা-৭/১২০.০০

রবিজীবনে নতুন বউঠান

রবীন্দ্রনাথের জীবনে তাঁর নতুন বউঠান কাদম্বরী দেবীর ভুমিকা নিয়ে আমাদের কৌতূহলের শেষ নেই। এক মহাকবির জীবনে এই নারীর প্রেরণা আর প্রভাব কত দূর বিস্তৃত হয়েছিল তার খুঁটিনাটি তথ্য জানতে অবিরাম প্রয়াস চলেছে। জল্পনা-কল্পনা-অনুমান-ইশারার আবছায়া সরিয়ে, মনগড়া রহস্যময়তা দূর করে সত্যকে জানার আর প্রতিষ্ঠা করার উদ্যোগ নিয়েছেন পণ্ডিতজন আর জীবনীকারেরা। কবি আর ঔপন্যাসিকেরাও তাতে শামিল হয়েছেন। সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় তো তাঁর বৃহৎ উপন্যাস 'প্রথম আলো' উৎসর্গই করেছেন কবির প্রেরণাদাত্রী নতুন বউঠান কাদম্বরী দেবীর স্মরণে। তা থেকেই বোঝা যায় বাঙালিজীবনে রবীন্দ্রনাথের মতোই কাদম্বরী দেবীও কেমন অবিচ্ছেদ্য আর উচ্চস্থান অধিকার করে নিয়েছেন। কবির সারা জীবনে আসা কয়েকজন নারী আলোচনার বিষয়। কবিকে জানার জন্য, বোঝার জন্য এঁদেরকেও আমরা জানতে-বুঝতে চেয়েছি। নতুন বউঠান, রাণু আর ওকাম্পো তাঁদের মধ্যে প্রধানতমা।

সকলের কৌতূহলের মূলে হল একটি শব্দ—'সম্পর্ক'। জীবনের বিভিন্ন পর্বে কবির সঙ্গে এঁদের একটা 'সম্পর্ক' গড়ে উঠেছিল। পরস্পর কাছে আসা মানুষে মানুষে তো সম্পর্ক থাকতেই পারে। কিন্তু ঠিক কেমন ছিল এই 'সম্পর্ক'? কীরকম ছিল সেই সম্পর্কের ধরন? সবটাই কি স্পষ্ট, উজ্জ্বল? লোকচক্ষুর গোচর? অগোচর নিভৃত কিছুই ছিল না? অপ্রকাশ্য কিছু? আর এই 'সম্পর্ক' কীভাবে প্রভাবিত করেছিল কবির ব্যক্তিজীবন আর শিল্প-সাহিত্যের জীবনকে? তাঁর চেতনালোকে কীরকম ছাপ রেখে গিয়েছিল?

অনেক বই পড়ে, পত্রপত্রিকা ঘেঁটে প্রচুর তথ্য আহরণ করে সেগুলি পর্যায়ক্রমে-প্রসঙ্গক্রমে সাজিয়ে, সাল-তারিখ-ঘটনা-অনুযায়ী বিন্যস্ত করে রবিজীবনে কাদম্বরী দেবীকে নিয়ে গড়ে ওঠা রহস্যের একটা রূপরেখা দিতে চেয়েছেন সুমিত্রা দত্ত। তিনি যে এ যাবৎ অনাবিষ্কৃত কোনও তথ্য আবিষ্কার করেছেন তা নয়। সে দাবি করেননি। রহস্যের তথা প্রচলিত বদ্ধমূল ধারণার মীমাংসা করার পথে পা বাড়িয়েছেন। অন্য রকম ইঙ্গিতগুলির বিচার করে লিখেছেন একটি সম্পূর্ণ বই 'নতুন বৌঠান—রবীন্দ্রজীবনে ও মননে'। এক পরিশ্রমী অধ্যবসায়ী জেদি উদ্যোগ। অনেক সময় তিনি তথ্যগুলি বিশ্লেষণ করেছেন আবার কখনও তা করেননি—শুধু পর পর সাজিয়ে গেছেন। তার থেকেই পাঠকের আপন সিদ্ধান্তে পৌঁছতে অসুবিধা হয় না। তিনি দেখাতে চেয়েছেন যে কবি-দেবরের সঙ্গে তাঁর সমবয়সি বউদির এমন কোনও 'সম্পর্ক' ছিল না, যে-সম্পর্কের আগে 'অবৈধ' শব্দটি বসিয়ে দেওয়া যায়। তাঁদের উভয়ের এই সম্পর্ক ছিল সুস্থ স্বাভাবিক রুচিশীল। একই পরিবারে-পরিবেশে বাস করা দুটি সমমনস্ক তরুণ-তরুণীর স্বাভাবিক সম্বন্ধ। এর মধ্যে রস গেঁজিয়ে তোলার কোনও প্রয়োজন নেই। এ ছিল এক উঁচু দরের বন্ধুতা-সখ্যতা, নিশ্চয় বিরল গোত্রের, কিন্তু অবৈধ প্রণয় মোটেই নয়। অনেকে বলতে পারেন, বলে আসছেন যে নারী-পুরুষের নির্ভেজাল সখ্যতা এক সময় এমন একটা মাত্রা অর্জন করে বা এমন একটা পর্যায়ে বা উচ্চতায় পৌঁছয়—যেমন পৌঁছেছিল তাঁদের বেলায়—যে তখনই তো তাকে বলে প্রেম বা প্রণয় বা সোজাসহজ ভাষায় ভালবাসা। আর সেখানেই যত রহস্যের অবতারণা—যত কৌতূহল, ঔৎসুক্য আর খোঁজ খোঁজ রব।

শিলচরবাসিনী অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষিকা সুমিত্রা দত্ত উভয়ের সম্পর্কটিকে চেনার জন্য তন্ন তন্ন করে সন্ধান করেছেন। তাঁর ভাষা ও কথনভঙ্গিমা আকর্ষণীয়। তিনি বিশাল কবিজীবনকে ছুঁতে চেয়েছেন। কবিজীবনে আগ্রহীরা বরাক উপত্যকা থেকে প্রকাশিত এ-বইটি অবশ্যই পড়ে দেখতে পারেন।

নতুন বৌঠান রবীন্দ্রজীবনে ও মননে—সুমিত্রা দত্ত/বরাক নন্দিনী প্রকাশনী, শিলচর/১১০.০০

মে.মু.

ক্রিস্তোফ বারাতিয়ে-র দ্য কোরাস

মেঘ মুখোপাধ্যায়

কোনও চলচ্চিত্র-উৎসবের উদ্বোধনী ছবিটি বিষয়ে সকলেরই বিশেষ আগ্রহ থাকে। গত দু-এক বছরের মধ্যে সারা বিশ্বে নির্মিত অসংখ্য ভাল ছবির ভিতর থেকে কোনও একটিকে উদ্বোধনী ছবি হিসাবে বেছে নেওয়ার মধ্যে উৎসবের ছবির নির্বাচকমণ্ডলীকে যথেষ্ট বিবেচনার পরিচয় দিতে হয়। কারণ উদ্বোধনী ছবি হিসাবে আগাম ঘোষণা হওয়া আর দেখানো মাত্র ছবিটি সারা উৎসবের আকর্ষণের কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত হয়ে যায়। বলতে বাধা নেই যে এদিক দিয়ে একাদশ কলকাতা চলচ্চিত্র উৎসবের কর্মকর্তারা সম্পূর্ণ সফল। ১০ নভেম্বর ২০০৫ সন্ধ্যায় এবারের উৎসবের উদ্বোধন হয়েছিল ২০০৪ সালে ফ্রান্স-সুইজারল্যান্ড-জার্মানির যৌথ প্রযোজনায় নির্মিত ক্রিস্তোফ বারাতিয়ে-র ছবি দ্য কোরাস (বা কয়ার) দিয়ে। ৯৬ মিনিটের ছবিটি যাঁরা দেখতে পেয়েছেন তাঁদের সকলেরই মনোযোগ কেড়ে নিয়েছে। সাম্প্রতিককালে নির্মিত একটি উঁচুমানের ছবি দেখতে পাওয়ার আনন্দে মন ভরে গিয়েছে।

দ্য কোরাসের মূল উপাদান সঙ্গীত—পাশ্চাত্য উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত। সঙ্গীতকে জড়িয়ে গড়ে উঠেছে ছবিটি আর এর ভিত্তি হল মানবিকতা—মানুষের প্রতি মানুষের বা বরং আরও নির্দিষ্ট করে বলা যাক শিশুদের প্রতি বড়দের অপার স্নেহ-মায়া-মমত্ববোধ—আর যে স্নেহের উৎস হল গভীর দায়িত্ববোধ। ছবিটিকে এক আদর্শ শিক্ষকের জীবনীও বলা চলে, যিনি আসলে এক মানুষ গড়ার কারিগর। দুষ্টু ছেলেদের এক আবাসিক স্কুল, স্কুলের ছাত্রাবাস আর সেই ছাত্রাবাসের কেয়ারটেকার তথা প্রৌঢ় শিক্ষক ক্লেমেন্ট ম্যাথিউয়ের জীবনের কয়েক বছর হল এ ছবির বিষয়। দুরন্ত, ডানপিটে সাংঘাতিক চরিত্রের সব শিশু-কিশোর যাদের আমরা বলি 'বখাটে'। এরা বন্য, দুর্দম, অসভ্য, অপরিশীলিত। লেখাপড়ায় মন নেই। সবসময় ফন্দি আঁটছে কোনও না কোনও বিপজ্জনক কাণ্ড ঘটানোর। শিক্ষকদের আর তাদের দেখাশোনা করার দায়িত্বে থাকা লোকগুলোকে যারপরনাই নাজেহাল করে তোলায় ওদের পরম আনন্দ। কর্তৃপক্ষকে অপ্রস্তুত আর নাস্তানাবুদ করাটা যেন ওদের ধর্ম। কর্তৃপক্ষের ওপর ওদের আক্রোশ আর ক্রোধ মজ্জাগত। এদের অধিকাংশই অনাথ কিংবা পিতামাতার পরিত্যক্ত, সংসার এদের বাতিল করে সমাজ পরিধির বাইরে দুরন্ত ছেলেদের জন্য নির্দিষ্ট আবাসিক স্কুলে ছুঁড়ে ফেলেছে। এই স্কুল তথা ছাত্রাবাসের প্রধান শিক্ষক রাসিন অত্যন্ত কড়া প্রকৃতির লোক—কাঠখোট্টা, নির্দয় এক প্রশাসক। ছেলেদের বাগে রাখতে বেতের ভাষাই তাঁর একমাত্র সম্বল। দুরন্তপনা, শাসন না মানার বিরুদ্ধে শাস্তি আর প্রহারই তাঁর অস্ত্র। তিনি কোমল হৃদয়বৃত্তির ঘোরতর বিরোধী। এরকম এক অমানবিক পরিবেশে চাকরি নিয়ে আসেন ম্যাথিউয়ের মতো এক সদয় প্রৌঢ়। সংবেদনশীল হৃদয়ই হল তাঁর শক্তির উৎস। দুরন্ত-বন্য কিশোর ছাত্রদের সঙ্গে তাঁর মোলাকাৎ ঘটে। দিনের পর দিন তিনি তাঁদের দুরন্তপনার পরিচয় পেতে থাকেন। প্রথম প্রথম হকচকিয়ে যেতেন, কষ্ট পেতেন কিন্তু কখনওই নিরাশায় ডুবে যাননি। হাল ছেড়ে দেননি। এই ছেলেদের জীবন ফুরিয়ে গিয়েছে, এদের দ্বারা আর কিছুটি হবে না বলে তিনি মনে করেন না। একসময় তিনি সঙ্গীত শিখেছিলেন, কন্ডাক্টার হবার স্বপ্ন দেখতেন কিন্তু হতে পারেননি। এই ছেলেগুলিকে মানুষ করে তোলার জন্য তিনি এবার আশ্রয় করলেন সঙ্গীতের। ছেলেগুলিকে সঙ্গীতের রসে মজাতে লাগলেন। সাধারণ লেখাপড়ার ফাঁকে ফাঁকে তাদের জন্য বরাদ্দ করলেন সঙ্গীতের পাঠ। তাদের সুরের পাঠ দিতে লাগলেন। এমনকী এই স্বর্গভ্রষ্ট বালকদের নিয়ে একটি কয়ার গড়ে তুললেন। সুর দিয়ে কীভাবে তিনি একপাল দুর্দান্ত দাঙ্গাবাজ ঝকমারি পাকানো কিশোরের মনোজগৎ আমূল বদলে দিলেন—এ তারই ছবি। সুরের পথ বেয়ে এক মহানুভব শিক্ষকের হাত ধরে বিপথগামী বিভ্রান্ত বালকের দল সুন্দর জীবনের স্বাদ পেল। জীবনকে সুন্দর আর পৃথিবীকে বেঁচে থাকার উপযুক্ত মনোরম জায়গা বলে তারা বিশ্বাস করতে শিখল। তাদেরই একজন পরবর্তী জীবনে প্রসিদ্ধ কন্ডাক্টার হিসাবে প্রতিষ্ঠা পেয়েছিল—সেই পিয়ের মোরহাঞ্জের সূত্র ধরেই পরিচালক এই ছবির অবতারণা করেছেন। আমাদের নিয়ে গিয়েছেন আবাসিক স্কুলের দিনগুলিতে।

ছোটো ছোটো অনেক দৃশ্যের খুঁটিনাটি দিয়ে বারাতিয়ে ছবিটি নির্মাণ করেছেন। ছেলেদের দুরন্তপনা, রাসিনের নিষ্ঠুরতা আর ম্যাথিউয়ের সঙ্গে তাদের আচরণের অনেক

দৃশ্য আমাদের মনে থেকে যাবে। ম্যাথিউ কীভাবে ওদের আক্রোশপরায়ণ হিংস্র মনগুলোকে ক্রমে ক্রমে বদলে দিচ্ছেন, ওদের মধ্যে সুরের ছোঁয়ায় মনুষ্যত্বের বিকাশ ঘটাচ্ছেন—ওরা আবেগপ্রবণ স্বাভাবিক বুদ্ধিমান কিশোরদের মতো আচরণ করতে শিখছে, নিজেদের বোধের আর রসানুভূতির প্রকাশ ঘটাতে সফল হচ্ছে দেখানোর জন্য পরিচালক স্মরণীয় দৃশ্য নির্মাণ করেছেন। রাসিনের সঙ্গে তাঁর দ্বন্দ্ব এ ছবির অনেকটা জুড়ে রয়েছে এবং ছবিটির কৌতূহল বাড়িয়ে দিয়েছে। ম্যাথিউ শেষ পর্যন্ত জিতবেন তো? এক সময় নির্দয় রাসিনকেও তিনি প্রভাবিত করতে পারেন। শাস্তি আর প্রহার ছাড়াও যে অন্য 'অস্ত্র' আছে যা দিয়ে দুরন্তকে বাগ মানানো যায়—একথা ম্যাথিউ রাসিনকে বিশ্বাস করিয়ে ফেলেছিলেন। রাসিনকেও সুরের স্রোতে ভাসিয়ে নিয়েছিলেন। কিন্তু কতক্ষণ? এ ধরনের মানুষদের মস্তিষ্ক এমন অসাড় পাথর হয়ে থাকে যে তাদের আর শোধরানো যায় না। রাসিনও তাই শেষ পর্যন্ত তাঁর নীতিতে অনড় থাকেন আর ম্যাথিউকে বিতাড়ন করে ছাড়েন কারণ ম্যাথিউ এই বিদ্যালয়টিকে নষ্ট করে ফেলছিলেন। তাঁর বিদায়কালের দৃশ্যটি মনকে নাড়া দিয়ে যায়।

যে-হৃদয়বান সুরসাধকের আসলে এক প্রতিষ্ঠিত কন্ডাক্টার হবার কথা ছিল জীবনের প্রতিকূল অবস্থায় পড়ে তিনি তা হতে পারেননি। সঙ্গীত সাধনা করে বড়মাপের শিল্পী হবার সুযোগ তিনি পাননি কিন্তু যেটুকু সঙ্গীতের পাঠ গ্রহণ করতে সমর্থ হয়েছিলেন উপযুক্ত জায়গায় তার মোক্ষম প্রয়োগ ঘটাতে সফল হয়েছিলেন—এইখানেই সঙ্গীতের জয়, সুরের সার্থকতা। 'দ্য কয়ার'-এর তরুণ পরিচালক নিজে একোল নর্মাল দ্য ম্যুজিক দ্য পারি থেকে ধ্রুপদী পাশ্চাত্য সঙ্গীতের পাঠ নিয়েছেন। তিনি সঙ্গীত জগতেরই মানুষ। প্রযোজকের প্রেরণায় ছবি করতে এসেছেন। এটিই তাঁর প্রথম পূর্ণ দৈর্ঘের কাহিনিচিত্র। এই ছবিটি করতে গিয়ে তিনি ১৯৪৫-য়ে নির্মিত জাঁ দ্রাভিলের বিখ্যাত ছবি এ কেজ অব নাইটিংগেল্‌স দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়েছেন। ছবিটিতে কিশোর আর প্রৌঢ় অভিনেতারা অসাধারণ অভিনয় করেছেন। দৃশ্য বিন্যাস আর দৃশ্য গ্রহণের নৈপুণ্য মনে রাখার মতো। সবার উপরে রয়েছে অসামান্য সঙ্গীত প্রয়োগ।

এ.জাতের একটি উৎকৃষ্ট মানের চলচ্চিত্র দেখার আশা নিয়ে আগামী কলকাতা চলচ্চিত্র উৎসবের অপেক্ষায় এক বছর কাটিয়ে দেওয়া যায় বললে অত্যুক্তি হবে কি?

চতুরঙ্গ দপ্তরে জমা পড়া পত্রপত্রিকা

চতুরঙ্গ দপ্তরে যে অসংখ্য পত্রপত্রিকা জমা পড়ে তার থেকে কয়েকটি উল্লেখযোগ্য সাম্প্রতিক সংখ্যার নাম এখানে দেওয়া হল—

দীপন-সৈয়দ মুজতবা আলী সংখ্যা—(সেপ্টেম্বর ০৪-মার্চ ০৫)—সম্পা : এন জুলফিকার/ঠাকুরানিবেড়িয়া, দঃ ২৪ পরগণা/১০০.০০

স্যাস, নাট্যপত্র সংকলন ২২—(অক্টোবর ০৫)—সম্পা : সত্য ভাদুড়ি/ঘোলাবাজার, উত্তর ২৪ পরগণা/৮০.০০

কালপ্রতিমা—(অক্টোবর ০৫)—সম্পা : নলিনীকুমার চক্রবর্তী/কলকাতা-৫৩/৪০.০০

সুইনহো স্ট্রিট—(বৈশাখ ১৪১২)—(একটি অসম্পাদিত কবিতার কাগজ)/কলকাতা-৭৮/৫০.০০

মধুপর্ণী—(নভেম্বর ০৫)—সম্পা : অজিতেশ ভট্টাচার্য/ বালুরঘাট, দঃ দিনাজপুর/১০০.০০

কবিপত্র—(সেপ্টেম্বর-নভেম্বর ০৫/৪৮ সংকলন)—সম্পা : পবিত্র মুখোপাধ্যায়/কলকাতা-২৬/৩০.০০

বাংলার আভাষ—(শারদ ১৪১২)—সম্পা : আশিস পাণ্ডে/প্রতাপবাগান, বাঁকুড়া/৩০.০০

অথ ধরিত্রী কথা—(শারদীয় ১৪১২)—সম্পা : প্রণব সেন/ডেকার্স লেন, কলকাতা-৬৯/৪০.০০

গল্প সরণি—(শীত-বসন্ত ১৪১২)—সম্পা : অমর দে ও অমর মিত্র/সিউড়ি, বীরভূম/৫০.০০

MOTIF (English Weekly/Dec. 12, 05)—Vidyarthy Chatterjee/Jamshedpur/4.00

সংস্কৃতি—(এপ্রিল ০৫)—সম্পা : যদরুদ্দীন উমর/ পুরানাপল্টন, ঢাকা/১৫.০০

With best compliments

From



MANGANESE ORE (INDIA) LIMITED

(A Government Undertaking)

3, Mount Road Extension

NAGPUR 440 001



ওঠো - জাগো, আত্মনির্ভর হও।

মহান ভারতীয় দার্শনিক স্বামীজির অগাধ বিশ্বাস ছিল দেশের যুবশক্তির ওপর। তাঁরা জাগবে, উঠে দাঁড়াবে, আত্মনির্ভর হবে। আজ ভারতবর্ষ পৃথিবীর সবচেয়ে তরুণ দেশ, কারণ এর লোকসংখ্যার ৫৪ শতাংশই ২৫ বছরের নীচে। পিয়ারলেস স্বামীজির আদর্শেই অনুপ্রাণিত হয়ে যুবশক্তিকে সম্মানের সঙ্গে নিজের পায়ে দাঁড়াবার ও ভবিষ্যৎ গড়ে তোলার পথ দেখাচ্ছে। 'পিয়ারলেস স্বরোজগার যোজনা'-র মাধ্যমে ইতিমধ্যেই লক্ষ লক্ষ ভারতীয় স্বনির্ভরতার সুযোগ পেয়েছেন। তাঁদের মাঝে আত্মশক্তি জাগরিত হয়েছে। ভারতমাতার এই কৃতী সন্তানকে আমরা জানাই আন্তরিক শ্রদ্ধা। তাঁর স্বপ্ন ও আদর্শকে করব সাকার, এই আমাদের অঙ্গীকার।

পিয়ারলেস ভারতের তরুণদলকে স্বনির্ভরতার পথে এগিয়ে যেতে আহ্বান জানাচ্ছে।

The Peerless General Finance & Investment Co. Ltd.
Peerless Bhawan, 3 Esplanade East, Kolkata 700 069,
Phone : 033 22403247, 22483001, 22203740, 22436758,
Fax :033 22485197, E-mail: peerless@cal3.vsnl.net.in
Website:www.peerless.co.in

Peerless™
Smart solutions

JANUARY 2006 Registered with the Registrar of Newspaper for India under R.N. No. 5480/57 প্রতি সংখ্যা ১৫ ডাকযোগে ২০

Arambagh Hatcheries Ltd.

The only fully integrated poultry organisation in India.

Feed



Breeding Farm



Retail Outlet



Hatching



Broiler Farm



Processing



There is full traceability of its branded Chicken products right through the supply chain

SGS

NQF stands for Safe Quality Food
HACCP stands for Hazard Analysis & Critical control Points

+91-9433016314

arambaghs chicken

য়ুন কবির এবং আতাউর রহমান প্রতিষ্ঠিত

চতুরঙ্গ

বর্ষ ৬৫ সংখ্যা ৩ বৈশাখ-আষাঢ় ১৪১

শতবর্ষ স্মরণ



য়ুন কবিরের মনীষা পর্যালোচনায়
দ্রকুমার দাশগুপ্ত।

ীন ভারতে বিজ্ঞানচর্চা সংক্রান্ত নীতি
রণে কবিরের ভূমিকা প্রসঙ্গে
দিলীপকুমার সিংহ।

বিরের রাজনৈতিক জীবন নিয়ে সুখরঞ্জন
নগুপ্তর তথ্যসমৃদ্ধ নিবন্ধ।

বিরের সম্পূর্ণ গ্রন্থপঞ্জি।
রঙ্গে প্রকাশিত তাঁর রচনাসূচি।

বিরের রবীন্দ্রচর্চা নিয়ে শঙ্খ ঘোষের
লোচনা।

ঘ ঘোষ নির্বাচিত কবিরের ৫টি কবিতা।

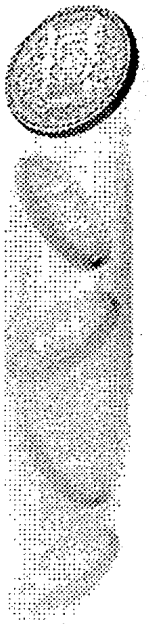
দিনব্যাপী হুমায়ুন কবির জন্মশতবর্ষ
লনের বিস্তারিত প্রতিবেদন।

টি ধারাবাহিক রচনা এবং অন্যান্য
য়মিত বিভাগ।

ISO 9001 : 2000

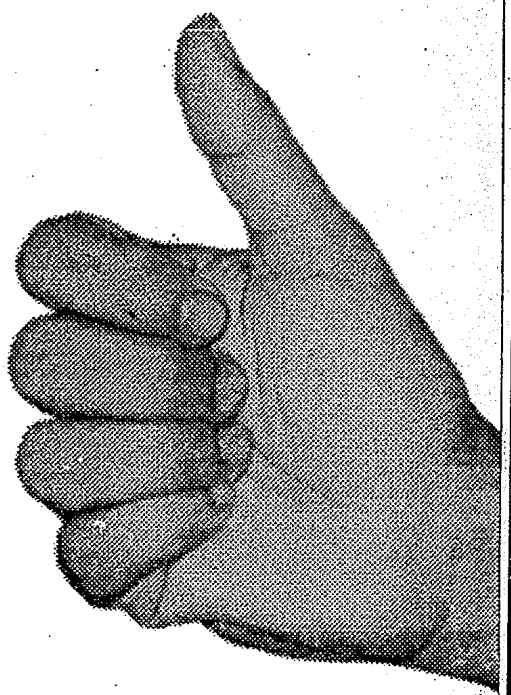
Heads you win Tails you win

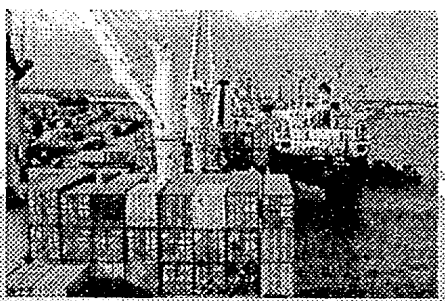
It's a win win situation. Anyway you get to win. The all new Kolkata Port Trust gives you the best advantage in the east-In price,In service.



- Primary focus on customer satisfaction
- Competitive pricing to suit customer need
- Widespread railroad network
- Single window system
- Certified ISO 90001:2000
- Extensive storage facilities for diverse cargo
- Modern computerised container terminal, VTMS and state-of-the-art oil jetties
- India's largest Dry Dock system for ship repair
- Ideal destination for Inland Water Transport
- 50 mtrs. draft available at sandheads - the highest amongst all major ports in the country

Major incentive for new & additional cargo





KOLKATA PORT TRUST
15, STRAND ROAD, KOLKATA-700001
Ph.: 2230-6645 (Direct) 2230-3451 (Extn. 214)
Fax : (033) 2230-4901, E-mail : calport@vsnl.com
Website : www.kolkataporttrust.gov.in

KoPT-Committed to Serve You Better

ডিভিসি বিদ্যুৎ উৎপাদন করে পরিবেশ সংরক্ষণেও গুরুত্ব দেয়

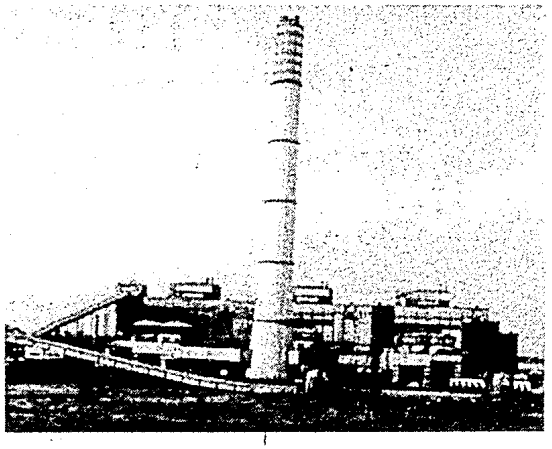


আরও বেশি বিদ্যুৎ উৎপাদনে সচেষ্ট হলেও ডিভিসি কখনই পরিবেশ সংরক্ষণকে অবহেলা করেনি।

বর্জ্যপদার্থ হিসেবে ফ্লাই অ্যাশ ও চিমনীর ধোঁয়ার দূষণ রোধ করায় ডিভিসি বাস্তবে সফল হয়েছে। দূষণের হার কমাতে ইতিমধ্যে অনেক বিদ্যুৎকেন্দ্রে বসানো হয়েছে 'ইলেকট্রোস্ট্যাটিক প্রেসিপিটেটর' (ইএসপি) এবং বাকি কেন্দ্রে বসানোর কাজও চলেছে। এছাড়াও বিদ্যুতকেন্দ্র এবং বাঁধগুলির পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে সবুজায়নের প্রয়াসে সামিল হয়েছে ডিভিসি।

ফ্লাই অ্যাশ থেকে ইট তৈরী, ছাই ফেলার পুকুর নির্মাণ, বর্জ্য পরিশোধনের জন্য 'নিউট্রালাইজিং পিট' তৈরীর কাজও হচ্ছে সমান গতিতে। বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে ভূমি, জল ও জলবিভাজিকার সদ্ব্যবহার করা, ভূমিক্ষয় রোধের জন্য 'চেক ড্যাম' নির্মাণ এবং মৃত্তিকা সংরক্ষণের কাঠামো তৈরী ও পরিকল্পিত বনসৃজনের কাজও চলেছে পাশাপাশি।

পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষায় ডিভিসি সতত যত্নশীল।



দামোদর ভ্যালি কর্পোরেশন

ডিভিসি উপত্যকায় আপনার শিল্প গড়ে তুলুন

IPB/DVC

THE BHUBANDHAR TEA CO LTD

14/2, CLIVE ROW
KOLKATA - 700 001
PHONE : 247-7583 / 7346
FAX : 22812310

Producers of :

Bhubandhar & Amranagar Brands

✣ GARDEN FRESH ✣ PREMIUM QUALITY
✣ MORE CUPS ✣ STRONG LIQUORING

CTC. TEAS FROM ASSAM

সাউথ অব পার্ক স্ট্রিটে একমাত্র বাঙালি রেস্তোরাঁ

পারিজাত

অপেক্ষাকৃত ন্যায্য মূল্যে এখানে পাওয়া যায়
মাছ ও মাংসের বিচিত্র উপাদেয় খাদ্যসম্ভার
বিড়লা তারামণ্ডলের বিপরীতে মাত্র
কয়েক সেকেণ্ডের পথ
থিয়েটার রোড ও চৌরঙ্গি রোডের সংযোগস্থল।

With best compliments from :

BESCO LIMITED

STEEL FOUNDERS TO THE NATION

RAILWAY EQUIPMENT BUILDERS

Works & Head office :
8, Anil Maitra Road, Ballygunge,
Calcutta 700 019
Phone : (91) (33) 2440 6364/ 6365/4666
Fax : (91) (33) 2440 4075

Designer, Manufacturer and Exporter of Cast Steel Bogies for Freight Cars, High Tensile Centre Buffer Couplers, Friction Draft Gears, Austenitic Manganese Steel Crossing for Railway Permanent Way and Railway Wagons. We also cater to the needs of Defence,Mining, Steel Plants, Thermal Power Plants, Ship Building & Heavy Engineering Industry.

Product range includes carbon, low alloy and high Manganese Steel castings to International specification viz. JUS, GOST, DIN, ASTM, BS etc. A single piece may weigh from 100 Kgs. to 5,000 Kgs.

With Best Compliments from :



Cookme Spice Powder



Krishna Chandra Dutta (Spice) Pvt. Ltd.

235, Maharshi Debendra Road
Kolkata-700 007
TEL : 2259-8432

চতুরঙ্গ

বর্ষ ৬৫ সংখ্যা ৩

বৈশাখ-আষাঢ় ১৪১৩

জন্মশতবর্ষের শ্রদ্ধার্ঘ্য

- সম্পাদকের কথা ১১১
- হুমায়ুন কবির ঃ এক চিরস্মরণীয় বাঙালি — রবীন্দ্রকুমার দাশগুপ্ত ১১৩
- হুমায়ুন কবিরের বিজ্ঞান-ভাবনা — দিলীপকুমার সিংহ ১১৯
- হুমায়ুন কবির ঃ রাজনৈতিক জীবন — সুখরঞ্জন সেনগুপ্ত ১২৩
- হুমায়ুন কবিরের একগুচ্ছ কবিতা ১৩৩
- হুমায়ুন কবিরের রবীন্দ্রচর্চা (গ্রন্থসমালোচনা) — শঙ্খ ঘোষ ১৭৫
- হুমায়ুন কবিরের গ্রন্থপঞ্জি — মোহাম্মদ শাকেরউল্লাহ ১৪১
- চতুরঙ্গে প্রকাশিত কবিরের রচনাসূচি ১৪৫
- হুমায়ুন কবির জন্মশতবর্ষ উদযাপন — আমজাদ হোসেন ১৪৮

ধারাবাহিক স্মৃতিচারণ

- আমার সময়ের কথা — ননীমাধব চৌধুরী ১৫৩
- ভাঙা পথের রাঙা ধুলায় — সুখরঞ্জন সেনগুপ্ত ১৬০

সন্দর্ভ

- স্বদেশি আন্দোলনে ভদ্রলোক নেতৃত্ব ঃ সাফল্য ও ব্যর্থতা — অমিয়কুমার সামন্ত ১৮৯

ছোটগল্প

- নস্টালজিয়া — সুব্রহ্মনিয়ণ কৃষ্ণমূর্তি ১৬৬

সাহিত্য-সমাজ-সংস্কৃতি

- 'গীতিচর্চ্চা' ঃ দিনেন্দ্রনাথ সম্পাদিত রবীন্দ্রনাথের গান — প্রবীর গুহঠাকুরতা ১৬৯
- ঢাকার আলিয়া মাদ্রাসা — আবদুশ শাকুর ১৯৪
- বাংলার বাইরে বাংলাচর্চা — মোহাম্মদ আবদুল হাই ২০১

গ্রন্থসমালোচনা ১৭৫-১৮৮

- দিলীপকুমার সিংহ ❖ শক্তিসাধন মুখোপাধ্যায়
- প্রণব সেন ❖ অতনুশাসন মুখোপাধ্যায়

চলচ্চিত্রসমালোচনা

- দুটি চলচ্চিত্র ঃ ডাউনফল এবং প্রাইভেট — মেঘ মুখোপাধ্যায় ২০৫
- চিঠিপত্র ২০৮

সম্পাদক : আবদুর রাউফ

শিল্পপরিকল্পনা : রণেন আয়ন দত্ত

সম্পাদনা সহকারী : মেঘ মুখোপাধ্যায়

উপদেষ্টামণ্ডলী

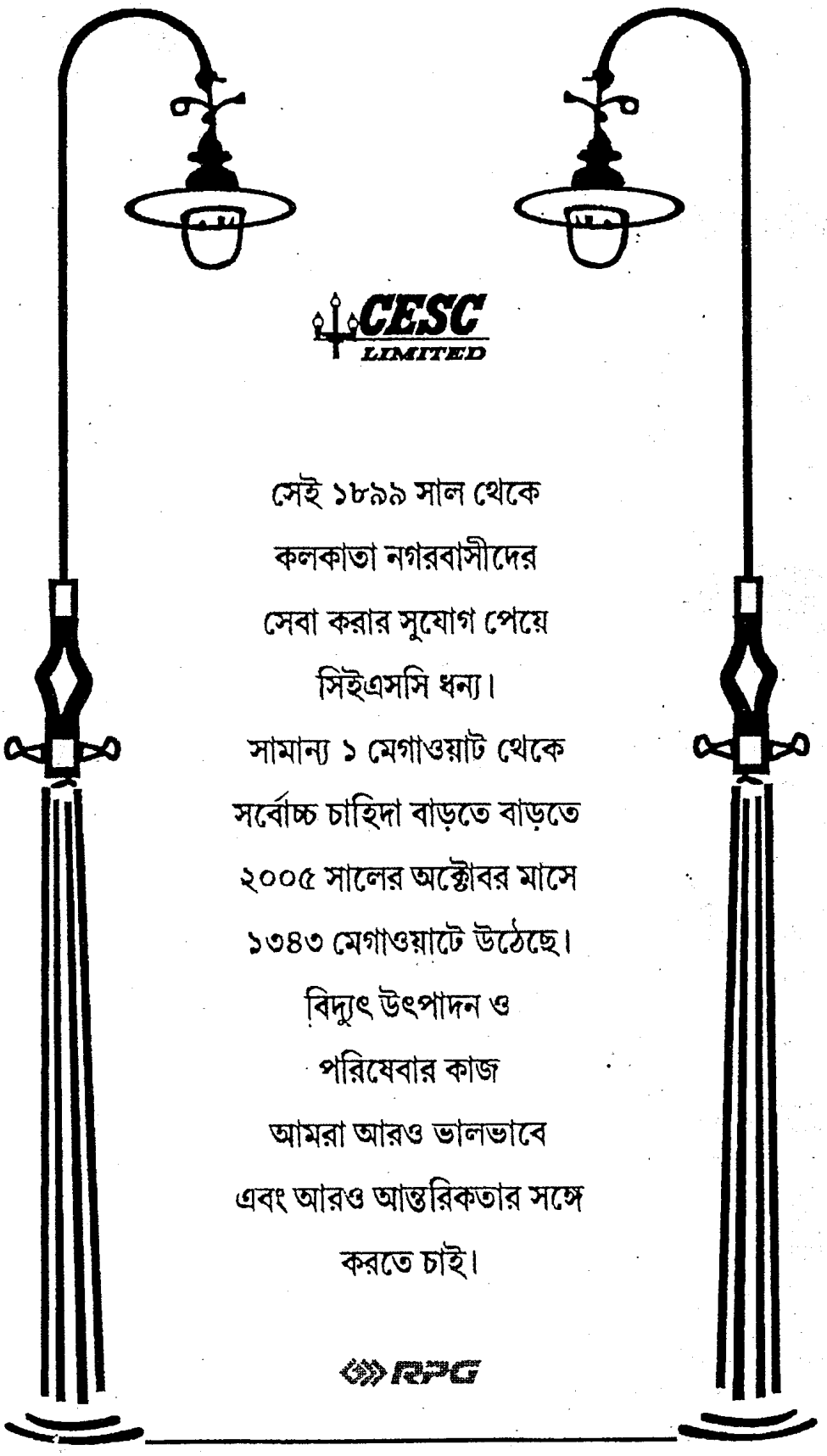
শঙ্খ ঘোষ
দেবব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়
সুখরঞ্জন সেনগুপ্ত
রণেন আয়ন দত্ত
তুষার তালুকদার

শ্রীমতী নীরা রহমান কর্তৃক ক্রান্তি প্রেস ৩৭ রিপন স্ট্রীট, কলকাতা-১৬ থেকে মুদ্রিত এবং ৫৪ গণেশচন্দ্র অ্যাভিনিউ, কলকাতা-১৩ থেকে প্রকাশিত

অক্ষর বিন্যাসে ক্রান্তি প্রেস ● ৩৭ রিপন স্ট্রীট, কলকাতা-১৬

মূল্য : ১৫ ডাকে : ২০

ISSN 0973-0710



CESC LIMITED

সেই ১৮৯৯ সাল থেকে
কলকাতা নগরবাসীদের
সেবা করার সুযোগ পেয়ে
সিইএসসি ধন্য।
সামান্য ১ মেগাওয়াট থেকে
সর্বোচ্চ চাহিদা বাড়তে বাড়তে
২০০৫ সালের অক্টোবর মাসে
১৩৪৩ মেগাওয়াটে উঠেছে।
বিদ্যুৎ উৎপাদন ও
পরিষেবার কাজ
আমরা আরও ভালভাবে
এবং আরও আন্তরিকতার সঙ্গে
করতে চাই।

RPG

সম্পাদকের কথা

হুমায়ুন কবিরের জন্ম ১৯০৬ সালের ২২ ফেব্রুয়ারি এবং মৃত্যু ১৯৬৯ সালের ১১ অগস্ট। আমরা তাঁর জন্মশতবর্ষের সূচনা করেছি চলতি বছরে ২২ এবং ২৩ ফেব্রুয়ারি দু'দিনব্যাপী অনুষ্ঠান করে। অনুষ্ঠানের বিস্তারিত প্রতিবেদন এই সংখ্যাতেই রয়েছে। 'চতুরঙ্গ' পত্রিকায় কোনও বিশেষ সংখ্যা বের করার রেওয়াজ না থাকলেও পত্রিকার বর্তমান সংখ্যাটির বৃহদংশ প্রতিষ্ঠাতার স্মরণেই নিবেদিত হয়েছে। তবুও একথা মানতেই হবে হুমায়ুন কবিরের ব্যক্তিত্ব এবং কৃতিত্বের বহুমুখিতার যথাযথ উপস্থাপনা সম্ভব হয়নি। মেধাবী ছাত্র হিসাবে তাঁর দুর্লভ কৃতি মুগ্ধ হওয়ার মতোই। আমরা কিন্তু তাঁর প্রজ্ঞা এবং চিন্তার গভীরতায় মুগ্ধ। যে-গভীরতার ছাপ রয়েছে তাঁর মুদ্রিত ভাষণে, প্রবন্ধে, কবিতায় এবং উপন্যাসে। তাঁর গভীর প্রজ্ঞাদীপ্ত মানসিকতার বাহন ছিল তাঁর সম্পাদিত পত্রিকাগুলি, বিশেষ করে 'চতুরঙ্গ'। সাহিত্য, দর্শন, ইতিহাস, সংস্কৃতি কিংবা শিক্ষাসমস্যা, এমনকী স্বাধীন ভারতের বিজ্ঞানসমস্যাও যখন যে বিষয়েই তিনি আলোকপাত করতে চেয়েছেন, সেই আলোচনা তাঁর গভীর মননের দীপ্তিতে অনুসন্ধিৎসুর কাছে নবদিগন্তের উন্মোচনকারী হিসাবে চিহ্নিত হয়ে গেছে।

ঘটনাক্রমে রাজনীতিতে জড়িয়ে পড়ায় দেশ স্বাধীন হওয়ার অব্যবহিত পরেই নিছক মননচর্চার গণ্ডির বাইরে বাস্তবের বৃহত্তর ক্ষেত্রে দেশ ও জাতির প্রতি দায়িত্ব পালনের যে সুযোগ হুমায়ুন কবিরের সামনে হাজির করেছিল তারও সদ্ব্যবহারে তাঁর ভূমিকা ছিল অনবদ্য। রাজনৈতিক ক্ষমতা করায়ত্ত ছিল বলেই সর্বভারতীয় স্তরে সাড়ম্বরে রবীন্দ্রজন্মশতবর্ষ পালনে উৎসাহ যোগানো তাঁর পক্ষে সম্ভব হয়েছিল। তখনকার দিনে এই কাজের জন্য তিনি সরকারি তহবিল থেকে এক কোটি টাকা অনুদানের বন্দোবস্ত করতে পেরেছিলেন। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে শিক্ষা ও সংস্কৃতিগত ভাবের আদান-প্রদানের জন্য তৎকালীন শিক্ষামন্ত্রী মৌলানা আবুল কালাম আজাদের আনুকূল্যে তাঁরই উদ্যোগে ইন্ডিয়ান কাউন্সিল ফর কালচারাল রিলেসন্স সংক্ষেপে আই সি সি আর-এর প্রথম সচিব হয়েছিলেন সৈয়দ মুজতবা আলী।

রাজনৈতিক ক্ষমতা হাতে থাকার সুবাদে বাঙালি লেখক-শিল্পীদের সহায়তা প্রদানে তিনি ছিলেন উদারহস্ত। তিনি সংস্কৃতি দপ্তরের মন্ত্রী থাকাকালে বাঙালি সাহিত্যিকরা কীরকম সরকারি আনুকূল্য পেয়েছিলেন তার স্বীকৃতি রয়েছে বুদ্ধদেব বসুর লেখায়।

কেন্দ্রীয় সরকারের মর্যাদাসম্পন্ন জাতীয় সাংস্কৃতিক সংস্থা সাহিত্য অকাদেমি, সঙ্গীত নাটক অকাদেমি এবং ললিতকলা অকাদেমি প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল হুমায়ুন কবিরের উদ্যোগে এবং পরিকল্পনায়। ভারতের প্রত্যেক রাজ্যে রবীন্দ্রসদন প্রতিষ্ঠা তাঁরই অক্লান্ত প্রয়াসের ফল। কলকাতায় গোলপার্কের রামকৃষ্ণ মিশন ইন্সটিটিউট, চৌরঙ্গির ইন্ডিয়ান মিউজিয়াম, পার্ক স্ট্রিটে এশিয়াটিক সোসাইটির নতুন ভবন—এসবের পত্তনের মূলেও রয়েছে তাঁরই অবদান। পেট্রোলিয়াম ও রসায়ন মন্ত্রী থাকাকালে হলদিয়ায় তৈল শোধনাগার প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল তাঁরই উদ্যোগে। রাজনৈতিক ক্ষমতাধর হিসাবে হুমায়ুন কবিরের এ ধরনের কর্মকাণ্ডের ফিরিস্তি বেশ দীর্ঘ।

কিন্তু এসব বাদ দিলেও কেবল মননশীল লেখক এবং শিক্ষাবিদ হিসাবে তাঁর কৃতি উত্তরসূরিদের কাছে কম গৌরবের বস্তু নয়। শিক্ষাবিদ হিসাবে তাঁর ছিল আন্তর্জাতিক খ্যাতি। ১৯৬০ সালে আমেরিকার চতুর্থ শিক্ষা সম্মেলন তিনি উদ্বোধন করেন। প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ্য, তৃতীয় শিক্ষা সম্মেলনের উদ্বোধক ছিলেন আমেরিকার তৎকালীন প্রেসিডেন্ট আইজেনহাওয়ার। বিশ্বের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে বক্তৃতা দেওয়ার জন্য তাঁর বারবার আমন্ত্রিত হওয়াটা চিন্তাবিদ হিসাবে তাঁর আন্তর্জাতিক স্বীকৃতির নজির। তিনি হচ্ছেন প্রথম এশিয় যিনি অক্সফোর্ড-হার্বার্ট স্পেনসার বক্তৃতা দেওয়ার সুযোগ পান। তাঁর আগে এই বক্তৃতা দিয়েছিলেন আইনস্টাইন, বারট্রান্ড রাসেল প্রমুখ মনীষীরা।

চিন্তাবিদ হিসাবে মৌলিকত্বের স্বাক্ষর বহন করে হুমায়ুন কবিরের বিভিন্ন বিষয়ে লেখা অজস্র প্রবন্ধ। যেসবের মধ্যে লিখিত বক্তৃতার সংখ্যাও অনেক। সাহিত্য-সংস্কৃতি, ইতিহাস, দর্শন ইত্যাদি বিষয়ে তাঁর অভিমতসমূহের প্রাসঙ্গিকতা আজও অনস্বীকার্য। কবি এবং ঔপন্যাসিক হিসাবে তাঁর সৃজনশীলতা আজও গভীর মনোনিবেশের দাবি রাখে। এতসব দিক থেকে বহুমাত্রিক হুমায়ুন কবিরকে জন্মশতবর্ষ স্মরণ উপলক্ষে চতুরঙ্গের বর্তমান সংখ্যায় উপস্থাপিত করা সম্ভব হয়নি। করা সম্ভবও নয়। কারণ তাঁকে নিয়ে চর্চা করেন এমন মানুষই ইদানীং খুঁজে পাওয়া মুশকিল। তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানে পৈতৃক আবাসভূমি হওয়া সত্ত্বেও ভারতকেই যিনি স্বদেশ হিসাবে গ্রহণ করেছিলেন, মৃত্যুর মাত্র পঁয়ত্রিশ-ছত্রিশ বছরের মধ্যেই তাঁর মতো মনীষী সম্পর্কে তাঁর স্বদেশবাসীর এতখানি ঔদাসীন্য বেদনাদায়ক। আমরা আশা করব, তাঁর নিজের হাতে প্রতিষ্ঠিত চতুরঙ্গের বর্তমান সংখ্যা এই ঔদাসীন্য নিরসনে কিছুটা সহায়ক হবে।

WITH BEST COMPLIMENTS

"TO BUILD A BETTER TOMORROW D.T.M OFFERS
A WIDE RANGE OF CIVIL ENGINEERING AND
DREDGING & DISILTING SERVICES UNDER ONE ROOF"

SPECIALISED IN THE CONSTRUCTION AND ERECTION OF :—

- MATERIAL HANDLING PLANTS
- LPG BOTTLING PLANTS
- 400 KV SUBSTATION & SWITCHYARD FOUNDATION
- MULTISTORIED BUILDING
- HOUSING COMPLEXES
- BRIDGE & ROADS
- FACTORY BUILDING & SHEDS
- GAS TURBINE PROJECTS
- MANUFACTURING OF PRE-STRESSED CONCRETE POLES
- DREDGING OF LAKES, CANALS, WATER RESERVOIR & RIVER BEDS
- HEAVY EQUIPMENTS FOUNDATION

D. T. M. CONSTRUCTION (INDIA) LIMITED

CIVIL/STRUCTURAL ENGINEERS and MASTER DREDGERS

Registered Office :

59B, CHOWRINGHEE ROAD, (3RD FLOOR)
CALCUTTA-700 020
PHONE : 2283 2538
TELE FAX : 22832545

35 Years' Dedicated Service to the Nation

বর্ষ ৬৫ সংখ্যা ৩ চতুরঙ্গ বৈশাখ-আষাঢ় ১৪১৩

জন্মশতবর্ষের শ্রদ্ধার্ঘ্য

হুমায়ুন কবির ঃ এক চিরস্মরণীয় বাঙালি

রবীন্দ্রকুমার দাশগুপ্ত

"সেই ধন্য নর কুলে
লোকে যারে নাহি ভুলে
মনের মন্দিরে সদা সেবে সর্বজন"

আমরা মনস্বী, রাজনীতিবিদ হুমায়ুন কবিরকে ভুলি নাই। কিন্তু তিনি যত বড় মানুষ ছিলেন আমরা তত বড় মানুষ হিসাবে তাঁহাকে এ পর্যন্ত আমাদের জাতির সামনে উপস্থিত করি নাই। ইহার কারণ বলি। একালের ভারতের রাজনীতিতে শিক্ষিত মানুষের বড় অভাব। হুমায়ুন কবিরকে চিনিতে হইলে কিছু শিক্ষার প্রয়োজন। সেইজন্য তাঁহার জন্মের শতবর্ষের মধ্যে এ পর্যন্ত তাঁহার একখানি জীবনীও বাংলা ভাষায় লিখিত হয় নাই।

১৯০৬ সালের ২২শে ফেব্রুয়ারি পূর্ববঙ্গের ফরিদপুর জিলার কোসারপুর গ্রামে তাঁহার জন্ম। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবেশিকা পরীক্ষায় ১৯২২ সালে প্রথম হন। প্রেসিডেন্সি কলেজে চার বছর পড়িয়া তিনি ইংরাজিতে বি. এ অনার্সে প্রথম শ্রেণিতে উত্তীর্ণ হন। ১৯২৮ সালে তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের এম এ পরীক্ষায় প্রথম শ্রেণিতে প্রথম স্থান লাভ করেন। ইহার পর সরকারি বৃত্তিলাভ করিয়া তিনি অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে লেখাপড়া করেন। কিন্তু দেশে ইংরাজির ছাত্র হইলেও তিনি অক্সফোর্ডে ইংরাজি পড়েন নাই। অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে ফিলসফি, পলিটিক্স এবং ইকনমিক্স লইয়া একটি অনার্স কোর্স আছে। কবির এই কোর্সের পরীক্ষায় প্রথম শ্রেণিতে উত্তীর্ণ হন। দেশে ফিরিয়া তিনি ১৯৩২ সালে রাধাকৃষ্ণানের আমন্ত্রণে অন্ধ্র বিশ্ববিদ্যালয়ে দর্শনের অধ্যাপক হিসাবে যোগ দেন। বঙ্গদেশে প্রত্যাবর্তন করিয়া কবির কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে ইংরাজির অধ্যাপক নিযুক্ত হন। এই সময়ই তিনি ফজলুল হকের কৃষক প্রজা পার্টিতে যোগ দেন এবং ১৯৩৭ সালের নির্বাচনে জয়লাভ করিয়া বঙ্গীয় প্রাদেশিক সভার সভ্য হন। এই সময় কবির তিনটি ট্রেড ইউনিয়ন সংস্থার সভাপতি ছিলেন। দেশভাগের কিছু পূর্বে কবির আবুল কালাম আজাদের ব্যক্তিগত সচিব রূপে কাজ করিতে আরম্ভ করেন। স্বাধীনতার পর আজাদ যখন কেন্দ্রীয় সরকারের শিক্ষামন্ত্রী তখন কবির ছিলেন ভারত সরকারের যুগ্ম-শিক্ষাউপদেষ্টা এই সময় মৌলানা আজাদ তাঁহার বিখ্যাত গ্রন্থ 'India Wins Freedom' প্রকাশ করেন। আজাদ উর্দুতে বইখানার কাহিনি বলিয়া যাইতেন এবং কবির তাহার ইংরাজি অনুবাদ করিয়া লিখিয়া লইতেন। ১৯৫৬ সালে তিনি রাজ্যসভার সদস্য নির্বাচিত হন। এবং ভারতের প্রধানমন্ত্রী নেহেরু তাঁহাকে মন্ত্রিসভার অসামরিক বিমান বিভাগের প্রতিমন্ত্রী নিযুক্ত করেন। আজাদের মৃত্যুর পর কবির কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভার শিক্ষামন্ত্রী নিযুক্ত হন।

কবির ছাত্র বয়সেই লিখিতে আরম্ভ করেন। প্রেসিডেন্সি কলেজ ম্যাগাজিনের সম্পাদক ছিলেন এবং অক্সফোর্ডে দুইটি ইংরাজি পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন। তিনি ছোটগল্প ও কবিতাও লিখিতেন। তাঁহার বিখ্যাত উপন্যাস 'নদী ও নারী' ১৯৪৫-এ প্রকাশিত হয়।

১৯৩৯ সালে কবির চতুরঙ্গ পত্রিকার প্রতিষ্ঠা করেন এবং ১৯৬৯ পর্যন্ত তিনি এই পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন। এই ১৯৩৯ সালেই কবিরসাহেবের সঙ্গে আমার প্রথম পরিচয়। আমি তখন কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে পোস্ট গ্র্যাজুয়েট ডিপার্টমেন্টে ইংরাজির টিউটর। তিনি একদিন আমাকে চতুরঙ্গ পত্রিকার জন্য একটি প্রবন্ধ লিখিতে বলিলেন। আমি বলিলাম আমি কি বাংলা লিখিতে পারি? উত্তরে তিনি বলিলেন আপনি ইংরাজি লিখিতে পারেন, বাংলা লিখিতে কেন

পারিবেন না। যাহা হউক চতুরঙ্গ পত্রিকার মতো একটি বিদগ্ধ পত্রিকার জন্য প্রবন্ধ লিখিবার সাহস হইল না।

কবিরের সাহিত্যকর্ম সম্বন্ধে দু'একটি কথা লিখিলাম। তাঁহার রাজনীতি সম্বন্ধে কিছু লিখিবার যোগ্যতা বোধহয় আমার নাই। রাজনৈতিক জীবনের প্রথম ভাগে তিনি কংগ্রেসের সদস্য ছিলেন। কিন্তু পরে তিনি কংগ্রেস ছাড়িয়া একটি নূতন পার্টি করিলেন। আমি ভাবিলাম ইহা কংগ্রেসের দুর্ভাগ্য। কবিরসাহেবের ব্যক্তিত্বের মাহাত্ম্য বুঝিতে হইলে তাঁহার সমগ্র রচনা পড়িতে হইবে। তিনি যদি রাজনীতিতে যোগ না দিতেন তাহা হইলে তিনি ভারতের এক শ্রেষ্ঠ মনীষী হিসাবে খ্যাতি লাভ করিতেন। তিনি যে কিরূপ প্রতিভাবান মানুষ ছিলেন তাহার প্রথম প্রমাণ অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র হিসাবে রচিত Kant-এর কিছু প্রবন্ধের ইংরাজি অনুবাদ। ওই প্রবন্ধগুলির সে পর্যন্ত কোনও ইংরাজি অনুবাদ ছিল না। কবির জার্মান ভাষা শিখিয়া এই অনুবাদ কার্য সম্পন্ন করিলেন। আমি যখন ওই বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্র ছিলাম তখন শুনিয়াছি কবিরের ওই অনুবাদ ইংল্যান্ডে বিশেষ আদৃত হইয়াছে। A.D. Lindsay নাকি এই অনুবাদের প্রশংসা করিয়াছিলেন। তাঁহার মনীষার এক শ্রেষ্ঠ নিদর্শন তাহার ইংরাজি গ্রন্থ 'Poetry, Monads and Society'। এই বইখানি পড়িলে বুঝিতে পারি যে তাঁহার মনের গড়ন ছিল এক দার্শনিকের মনের গড়ন। ডক্টর রাধাকৃষ্ণন একদিন তাঁহার কলিকাতার বাসস্থানে আমাকে বলিয়াছিলেন যে কবির প্রতিভাবান মানুষ। তিনি নাকি তাঁহাকে বলিয়াছিলেন রাজনীতি ছাড়িয়া সাহিত্যে ও দর্শনের সাধনায় তাঁহার সমস্ত সময় নিয়োগ করিতে। কিন্তু কবিরসাহেবের রাজনীতির দিকে একটা ঝোঁক ছিল। রাজনীতি করিয়াও তিনি বড় কম লেখেন নাই। ইংরাজি ভাষায় ও বাংলা ভাষায় লিখিত তাঁহার সমস্ত বই পড়িলে বুঝিতে পারি তিনি কত ভাষায় কত লিখিয়াছেন। তাঁহার সমস্ত রচনার আলোচনা এই প্রবন্ধে করা সম্ভব হইবে না। কিন্তু বইগুলির নাম উল্লেখ করি (১) Poetry, Monads and society (২) Mahatma and other poems, (৩) Men and Revers, (৪) Science, Democracy and Islam, (৫) Educaton in India, (৬) Britain and India, (৭) The Indian Heritage। বাংলা ভাষায় লিখিলেন (১) বাংলার কাব্য (২) মার্কসবাদ (৩) শরৎ সাহিত্যের মূল তত্ত্ব (৪) শিক্ষক ও শিক্ষার্থী। এই বইগুলি তাঁহার চিন্তার গভীরতার পরিচয় বহন করে।

আমি মনে করি হুমায়ুন কবিরের গভীর চিন্তাশীলতার এক বিশেষ দৃষ্টান্ত তাঁহার 'The Indian Heritage'—এই বইখানি ১৯৪৬ সালে প্রকাশিত। তাঁহার বয়স তখন চল্লিশ বৎসর। বইখানি সারা ভারতে এত আদৃত হয় যে ১৯৪৭ সালে ইহার দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশ করিতে হয়। ইহার মাত্র দুই বৎসর পরে ১৯৪৯ সালে বইখানি পুনর্মুদ্রিত হয়। ইহার তৃতীয় সংস্করণ বাহির হয় ১৯৫৫ সালে। ১৯৬০ সালে ইহা আবার মুদ্রিত হয়। এই বইখানি কবিরসাহেব জওহরলাল নেহেরুকে উৎসর্গ করেন। উৎসর্গ পত্রে লিখিলেন—"Who like Ashoka and Akbar has helped to discover and enriched the Indian heritage, in affectionate admiration in Indian heritage." বইখানির প্রকাশক ছিলেন Asia Publishing House। এখন এই বই বাজারে পাওয়া যায় কিনা জানি না। যদি পাওয়া না যায়, আমি বলি কবিরসাহেবের জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষে এই বছরেই ইহার পুনর্মুদ্রণ আবশ্যক। তাঁহার একটি ক্ষুদ্র জীবনী এই বইখানির এই নূতন সংস্করণের সঙ্গে যুক্ত করা বাঞ্ছনীয়। বইখানির তৃতীয় সংস্করণে গ্রন্থকার যাহা লিখিয়াছেন তাহা প্রনিধানযোগ্য 'It is however my conviction that the picture of Indian culture I have attempted to draw is by and large truer to the facts than the story of the conflicts of a few political personalities, which so often passes as Indian history. It is my earnest hope that more careful and competent historians will take up the study in greater detail and help in providing a true and comprehensive history of the Indian people.'

বাঙালির মনীষার দৈন্য দেখা দিয়াছে। আমাদের যে মনীষা ছিল তাহার এক স্মরণীয় দৃষ্টান্ত এই বইখানি। কবিরের স্বদেশভাবনার একটি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত এই বইখানি। তাঁহার স্বদেশ-সাধনার এক শ্রেষ্ঠ ফল এই যে তিনি তাঁহার জীবনে এবং সাহিত্যকর্মে দেখাইয়াছেন যে বঙ্গসংস্কৃতি হিন্দু মুসলমানের এক যৌথ সংস্কৃতি। ক্ষিতিমোহন সেন তাঁহার বাউল সম্বন্ধে রচিত গ্রন্থে ইহাই স্পষ্ট করিয়াছেন। আমাদের দেশের রাজনীতির কলরব বন্ধ হইলে আমরা এই যৌথ সংস্কৃতির মর্ম উপলব্ধি করিতে পারিব। আমরা অনেক কথা বলি। আমাদের কথাবার্তা এবং রচনায় বিচিত্র তত্ত্ব উপস্থিত করি। রাজনৈতিক বক্তৃতায় কত কথা শুনি, কিন্তু হৃদয়ের কথা শুনি না। ইহার কারণ—আমরা আমাদের হৃদয় হারাইয়াছি। কবিরের একটি হৃদয় ছিল। সেই হৃদয়ের পরিচয় তাঁহার প্রত্যেক রচনায়, সে কথা আমাদের আজ কে বুঝাইবে!

আমি মনে করি কবিরের রাজনৈতিক জীবন আলোচনা করিয়া এখন লাভ নাই। রাজনীতি বিচিত্র পথগামী। কোন

পথ আসল পথ তাহা অনেক সময় বুঝিতে পারি না। কিন্তু সকল সংস্কৃতির এবং সকল মানুষের একটি মর্মকথা আছে। সেই মর্মকথা সাহিত্যে বিধৃত হইয়া থাকে। কবিরের ইংরাজি এবং বাংলায় লিখিত গদ্যে এবং পদ্যে সেই মর্মকথা আমরা শুনিতে পাই। তিনি যখন ১৯৭০ সালে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন তখন আমি দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক। সংবাদটি শুনিয়াই আমি আমাদের উপাচার্য বীরেন গাঙ্গুলির কাছে ছুটিয়া যাইয়া বলিলাম, কবির রাজনীতির মানুষ কিন্তু আমরা তাঁহাকে একজন বিশিষ্ট বাঙালি বলিয়া মনে করে তাই আমি প্রস্তাব করি যে এই বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের কথা মনে রাখিয়া বিশ্ববিদ্যালয় তাঁহার মরদেহে একটি পুষ্পমাল্য অর্পণ করুক। তখন সন্ধ্যার পর অন্ধকার নামিয়াছে। ড. বীরেন গাঙ্গুলি কর্মচারীকে ডাকিলেন এবং তাহাকে বলিলেন হুমায়ুন কবিরের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া কাল অনুষ্ঠিত হইবে। আজ রাত্রেই বিশ্ববিদ্যালয়ের গাড়িতে দাশগুপ্তকে লইয়া বড় ফুলের দোকান হইতে একটি বড় মালা কিনিয়া আনিতে হইবে এবং কাল এই গাড়িতে করিয়া দাশগুপ্তকে কবিরসাহেবের বাড়িতে লইয়া যাইবে। তিনি এই মালাটি কবিরসাহেবের শবাধারে অর্পণ করিবেন। আমি এই কাজটি সম্পন্ন করিলাম।

কবিরসাহেবের সঙ্গে ব্যক্তিগত পরিচয় থাকিলেও তাঁহার সঙ্গে মিশিবার সৌভাগ্য বড় হয় নাই। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্টাফরুমে দেখা হইয়াছে কিন্তু কথা হইয়াছে কম। কিন্তু যখনই কথা হইয়াছে তখনই তাঁহার পাণ্ডিত্য এবং বিনয় আমাকে চমৎকৃত করিয়াছে। তাঁহার বিদ্যার বিস্তার এবং গভীরতা আমাকে মুগ্ধ করিত। লক্ষ করিতাম তাঁহার বিদ্যাভিমান বলিতে কিছু ছিল না। তিনি যে বইখানি পড়িয়াছেন, আমিও তাহা পড়িয়াছি ভাবিয়া বইখানির উল্লেখ করিতেন। বইখানি পড়ি নাই বলিয়া আমি একটু মুশকিলে পড়িতাম। আর লক্ষ করিয়াছি হাসিমুখ। কথা বলিবার সময়ে একটু পদচারণা করিতেন। ইহাই ছিল তাঁহার ব্যক্তিত্বের বৈশিষ্ট্য। তাঁহার রাজনীতির জীবন আলোচনা করি এমন সাধ্য আমার নাই। আজ কবিরকে এক মনস্বী বাঙালি বলিয়া চিনিতে হইবে। তাঁহার ইংরাজি ও বাংলা রচনা তাঁহার চিত্তের এক পূর্ণ পরিচয় বহন করে। একদিন দেখি তিনি আমার দিল্লির বাড়িতে উপস্থিত। তিনি আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাংলা উপন্যাস সম্বন্ধে বৃহৎ গ্রন্থখানি আমার আছে কি না। বুঝিলাম কেন্দ্রীয় মন্ত্রী হইয়াও তিনি নিয়মিত লেখাপড়া করেন। বইখানি আমার ছিল এবং কয়েকদিনের মধ্যেই বইখানি ফেরত দিলেন। বাঙালিদের সাহিত্যসভায় তিনি উপস্থিত থাকিতেন এবং বিষয় সম্বন্ধে সুন্দর বক্তৃতা দিতেন। কথাবার্তায় বুঝিলাম জীবনানন্দ দাশের তিনি এক অনুরক্ত পাঠক। শুনিয়াছি তিনি নানাভাবে কবির সহায়তা করিতেন। কিন্তু সে বিষয়ে আমাদের কিছু বলিতেন না। তাঁহার সঙ্গে কথাবার্তায় এক হৃদয়বান বাঙালির পরিচয় পাইতাম। যে-হৃদয় আজকাল আমাদের মধ্যে বড় দেখি না, সে-হৃদয় তাঁহার মধ্যে দেখিতাম।

আমি বলিয়াছি কবিরের রাজনীতি সম্বন্ধে আলোচনা করিতে আমি অক্ষম। কিন্তু অন্ততপক্ষে এই বিষয়ে একটি কথা বলিতে চাহিতেছি। কথাটি ডা. গোলাম মুরশিদ তাঁহার 'হাজার বছরের বাঙালি সংস্কৃতি' (২০০৬) নামক ৫৪৮ পৃষ্ঠার গ্রন্থে অনবদ্য ভাষায় বলিয়াছেন 'প্রকৃতপক্ষে, পাকিস্তানকে স্বাগত জানাননি অথবা কলকাতা থেকে পূর্ববঙ্গে চলে আসেননি, তেমন মুসলমান কমই ছিলেন। এই ব্যতিক্রমধর্মী মুসলমানদের মধ্যে হুমায়ুন কবির এবং কাজী আবদুল ওদুদই ছিলেন সবচেয়ে নামকরা।' অখণ্ড ভারতের তত্ত্ব হুমায়ুন কবির যেমন স্বচ্ছভাষায় উপস্থিত করিয়াছেন তেমন বোধহয় আর কেহ করেন নাই। এই তত্ত্ব তাঁহার মননশীলতার পরিচায় নহে। তাঁহার কাছে ছিল ইহা এক উপলব্ধির বস্তু। তাঁহার নানা গ্রন্থে এই অনুভবের প্রকাশ পাই। কিন্তু যে গ্রন্থখানিতে তিনি তাঁহার এই ভাবটি স্মরণীয় ভাষায় উপস্থিত করিয়াছেন সেই গ্রন্থখানির নাম 'The Indian Heritage'। মহারাজা সয়াজি রাও ১৯৪৩ সালে কবিরসাহেবকে এ বিষয়ে বক্তৃতা করিতে অনুরোধ করেন। সেই বক্তৃতাগুলি হইতে এই গ্রন্থের উদ্ভব। এই গ্রন্থে কবিরের মূল্যবান কথাগুলি তাঁহার অনবদ্য ইংরাজিতে উপস্থিত করিতে ইচ্ছা করি। এই গ্রন্থে দার্শনিক হুমায়ুন কবির এবং সাহিত্যিক হুমায়ুন কবির একাকার হইয়াছেন। ইহার প্রথম পরিচ্ছদের নাম 'Ariyan Synthesis'. এই Synthesis বা সমন্বয় কবিরের মননে এখনও বর্তমান এবং ইহাই ভারতবর্ষের ঐক্য ও সংহতির উৎস। এই গ্রন্থে কবিরের কথা এই যে অশোক একজন যথার্থ বৌদ্ধ ছিলেন এবং তিনি ভারতে এবং ভারতের বাহিরে বৌদ্ধধর্ম সার্থকভাবে প্রচার করিয়াছিলেন। অশোকই বৌদ্ধধর্মকে ভারতের বাহিরে ব্রহ্মদেশে, চীনদেশে এবং জাপানে প্রতিষ্ঠিত করেন। এই গ্রন্থখানির ভূমিকাটি প্রাচীন ভারতের একটি স্বচ্ছ এবং উজ্জ্বল চিত্র। গুপ্তযুগের হিন্দুসমাজ এবং বৌদ্ধসমাজ একটি ঐক্যবদ্ধ ভারতীয়সমাজ। ইহার পর ভারতে নানা জাতির আবির্ভাব। কিন্তু তাহারা ভারতীয় ঐক্যকে ক্ষুণ্ন করে নাই।

হুমায়ুন কবির মধ্যযুগের ভারত সম্বন্ধে বলিলেন যে, ইহা নৈতিক এবং আধ্যাত্মিক জীবনের এক নূতন ভারতের স্রষ্টা এবং ইহার স্রষ্টারা হইলেন কবির, নানক, চৈতন্য, তুলসীদাস এবং তুকারাম। উনি দেখাইলেন যে মধ্যযুগে

ভারতের অখণ্ডতা কেবল রক্ষিত হয় নাই উহা সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। আমরা যাকে আজ বলি অখণ্ড-ভারত সেই ভারতের সৃষ্টি এই মধ্যযুগে। পলাশির যুদ্ধের পর ইংরাজশক্তি যখন ভারতবর্ষ অধিকার করিল, এবং যে-ঐক্য প্রতিষ্ঠা করিল তাহা রাজনৈতিক ঐক্য। ভারত-আত্মার সৃষ্টি মধ্যযুগে। এবং এইখানেই আমরা দার্শনিক হুমায়ুন কবিরের পূর্ণ পরিচয় পাই। কবিরের Indian Heritage গ্রন্থের একটি পরিচ্ছেদের নাম 'Religion and Philosophy' এই পরিচ্ছেদেই আমরা দার্শনিক হুমায়ুন কবিরকে দেখিতে পাই। এই পরিচ্ছেদে কবিরসাহেব লিখিলেন : 'The unity of the religious outlook in India has thus been based upon a philosophic spirit which recognises the value of both form and spirit, of outward ritual and inner essence.' ভারতবর্ষের সামাজিক এবং সাংস্কৃতিক ইতিহাসের এমন গভীর চিন্তা এবং এমন স্বচ্ছ ভাষায় সেই চিন্তার প্রকাশ বিরল। এই বিষয়ে কবির রাধাকৃষ্ণনের এক যোগ্য শিষ্য। এ বিষয়ে কবির সাহেবের আর একটি সুন্দর মন্তব্য উপস্থিত করিতে পারি : 'It was the peculiar glory of the Aryan invaders Who came to this land that they could formulates a philosophical expression for this acceptance. The result has been that, in spite of the most baffling differences in form, there is a unity, continuity and strangest of all a unanimity in Indian thought which astonishes not only foreign observers but Indian students as well.'

কবিরসাহেবের 'The Indian Heritage' গ্রন্থের আর একটি অধ্যায়ের নাম "Medieval Reconciliation"। এই বিষয়ে অনেক কথা বলিতে হয়। মধ্যযুগে ভারতীয় সাধনা সম্বন্ধে আমাদের বাংলা ভাষায় আলোচনা বড় কম হয় নাই। কিন্তু আমরা বোধহয় সেই আলোচনার কথা আজ ভুলিয়া গিয়াছি। প্রথম এই বিষয়ে সার্থক আলোচনা করেন ক্ষিতিমোহন সেন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে Adhar Chandra Mukherjee যে বক্তৃতাগুলি দিয়াছিলেন তাহার বিষয় ছিল মধ্যযুগীয় ভারতীয় সাধনা। এই নামেই বক্তৃতাগুলি প্রকাশিত হইয়াছিল। অধ্যাপক মনমোহন ঘোষ কৃত ইহার ইংরাজি অনুবাদ ছাপা হইয়াছিল। শশীভূষণ দাশগুপ্ত এ বিষয়ে তাঁহার নানান গ্রন্থে মনোজ্ঞ আলোচনা করিয়াছেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলার অধ্যাপক চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় এই বিষয়ে একখানি গ্রন্থ লিখিয়াছেন। তবু বলি এই বিষয়ে আরও আলোচনা আমরা করিতে পারিতাম, কিন্তু তাহা আমরা করি নাই। কবিরসাহেবের মধ্যযুগের ভারতীয় সাধনার সম্বন্ধে শেষ কথাটি তাঁহার ভাষাতেই উপস্থিত করি : 'When two powerful currents meet, there is no question of the absorption of the one in the other. The streams join to create a new form. Their separate contributions can hardly be distinguished. The same thing happens when two living organisms unit. A new organism is born which shares the characteristics of the parents, and is yet a unique individuals. Inter-penetration is complete and no element can remain unchanged in the new synthesis.'

বিষয় সম্বন্ধে চিন্তা যেমন গভীর সেই চিন্তা প্রকাশ করিবার ভাষাও তেমনই স্বচ্ছ।

হুমায়ুন কবিরের উচ্চশিক্ষার ইতিহাসে তাঁহার পরিণত বয়সের চিন্তার স্বকীয়তার কারণ নিহিত। তিনি প্রেসিডেন্সি কলেজ ও কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে ইংরাজির ছাত্র ছিলেন এবং বি.এ. ও এম. এ. পরীক্ষায় তাঁহার অসামান্য মেধার প্রমাণ দিয়াছেন। অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে তাঁহার অধ্যয়নের বিষয় ছিল দর্শন, রাজনীতি এবং ইতিহাস। তাঁহার চিন্তায় এবং রচনায় যে ব্যাপকতা এবং গভীরতা লক্ষ করি তাহার সুষমা এই শিক্ষায়, তাঁহার দার্শনিকতায় বিচিত্র বিষয়ের সোচ্চার পরিচয় পাই। তাঁহার গভীর ইতিহাসবোধ তাঁহার এই বিচিত্র বিষয়ের অধ্যয়ন হইতেই উদ্ভূত। তাঁহার The Indian Heritage গ্রন্থে ইতিহাস এবং দর্শন একত্র হইয়াছে। তিনি যদি রাজনীতিকে পেশা হিসাবে গ্রহণ না করিতেন তাহা হইলে দর্শনে এবং ইতিহাসে তিনি পৃথিবীর এক শ্রেষ্ঠ লেখক বলিয়া গণ্য হইতেন। তবে রাজনীতি করিয়াও তিনি দর্শন এবং সাহিত্য সম্বন্ধে কয়েকখানি চিন্তাশীল গ্রন্থ লিখিয়াছেন। তাহার মধ্যে শ্রেষ্ঠ গ্রন্থখানির নাম 'Poetry, Monads and Society .' বইখানি এখন দুষ্প্রাপ্য। তাঁহার জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষে এই বইখানি ছাপা হইতে পারে। শতবার্ষিকী সভার বক্তৃতার মূল্য অবশ্যই আছে। কিন্তু তাঁহার শ্রেষ্ঠ গ্রন্থগুলির পুনর্মুদ্রণ বিশেষ বাঞ্ছনীয়।

হুমায়ুন কবিরের চিন্তাশীলতার শ্রেষ্ঠ ফল কী? আমার মনে হয় ভারতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতি সম্বন্ধে রচিত তাঁহার গ্রন্থগুলিই তাঁহার শ্রেষ্ঠ কীর্তি। এই গ্রন্থগুলি এই প্রজন্মের কাছে উপস্থিত করা প্রয়োজন। আমি একখানি গ্রন্থ সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করিতে পারি। সেই গ্রন্থখানির নাম আমি করিয়াছি। সেই গ্রন্থখানির বিষয় সম্বন্ধে আরও কয়েকটি কথা বলিতে ইচ্ছা করি। ১৯৬০ সাল পর্যন্ত এই গ্রন্থের ৫টি

সংস্করণ বাহির হইয়াছিল। এখন পাওয়া যায় কিনা জানি না। কবির, নানক, চৈতন্য, তুলসীদাস এবং তুকারাম সম্বন্ধে এই গ্রন্থে আলোচনা অনবদ্য। এই গ্রন্থের একটি উক্তি তাঁহার গভীর চিন্তাশীলতার ঐতিহ্য বহন করে। উক্তিটি কবির সাহেবের অনবদ্য ইংরাজিতেই উপস্থিত করি : 'We are too often inclined to think of religion in India in terms of asceticism and penance, of a lyric ecstasy of the mind in which the familiar landmarks of everyday experience are swept away. It is all this and yet this is not all. For we tend to forget the simple pieties of day to day, of the normal routine of devotions which are as much a part of daily life as the physiological functionings of the body. The story -teller of old never made this mistake and his stories were woven round the religious experience and expectations of the people. His tales of heroism centred round the mythical figures of traditional faiths , and their records of service and sacrifice were used to point a moral or illustrate a homily.'

উদ্ধৃতি দীর্ঘ হইল। ইহার কারণ বইখানি এখন বড় দুষ্প্রাপ্য।

সাধারণ বাঙালি বা ভারতীয়দের কাছে কবিরসাহেবের শ্রেষ্ঠত্ব কোথায়? আমি মনে করি তাঁহার গভীর ভারত-বোধই তাঁহাকে স্মরণীয় করিয়া রাখিবে। তিনি এক অখণ্ড ভারতের কল্পনা লইয়া সাহিত্য সৃষ্টি করিয়াছেন। আমার সঙ্গে তাঁহার এক নিবিড় সম্পর্ক ছিল। আমি দেখিতাম তিনি কখনও হিন্দু-ভারত ও মুসলমান-ভারত বলিয়া কিছু জানিতেন না। তাঁহার অসংখ্য বন্ধু হিন্দু। তাঁহাদের তিনি কখনও এক ভিন্ন সমাজের মানুষ বলিয়া ভাবিতেন না। তিনি যখন বাংলা সাহিত্য চর্চা করিতেন তখন তিনি এই সাহিত্যকে হিন্দু সাহিত্য বলিয়া ভাবিতেন না। তিনি ছিলেন এক অখণ্ড বঙ্গদেশের মানুষ। তাঁহার 'Indian Heritage' গ্রন্থে তিনি লিখিয়াছেন : 'The spirit of accommodation which united the different races into one social system also expresed itself in the literatures of India and softened the antagonism of races and tribes.'

কবিরসাহেব ভাবিতেন যে সংস্কৃতি এক অখণ্ড সমাজের সৃষ্টি। তাঁহার সাহিত্য ও সংস্কৃতি সম্বন্ধে প্রত্যেকটি রচনায় এই কথাটি তিনি বলিয়াছেন। তাঁহার "The Indian Heritate" গ্রন্থের একটি পরিচ্ছেদের নাম 'Medieval Reconciliation'—এই পরিচ্ছেদে তিনি লিখিয়াছেন 'Ramananda and Kabir, Nanak and Dadu, Chaitanya and Tukaram, all carried on the same tradition. The most significant Characteristics of these attempts at synthesis lies in the fact that there is no break or wrench from the past. The novel elements are skilfully and almost inperceptibly fused with the old and maintain the unity and continuity of the Indian spiritual outlook and endeavour.'

বঙ্গদেশে আজ যেন মনীষার দৈন্য দেখা দিয়াছে। চরিত্রেও আমরা এখন নিম্নগামী। কোথাও কোনও আদর্শের চিহ্ন নাই। মনে হয় রাজনীতি এই অবস্থার সৃষ্টি করিয়াছে। রামপ্রসাদ বলিতেন :

'মন, তুমি কৃষি কাজ জান না
এমন মানব-জমিন রইল পতিত
আবাদ করলে ফলত সোনা।'

এই সেদিন পর্যন্ত এই কৃষিকাজ প্রত্যক্ষ করিয়াছি। এখন অনেক কথা কানে আসে। ভাবের কথা শুনি না। এখন আমাদের চিন্তা কী পাইলাম। কী দিলাম সে কথা ভাবি না। কবিরসাহেবের মনীষা ছিল এবং সেই মনীষার ফল আমরা পাইয়াছি। তাঁহার সমস্ত রচনা চিন্তাশীলতায় সমৃদ্ধ। সেই চিন্তার এক পূর্ণ ইতিহাস আজ কে লিখিবে? আমাদের এখন আর কোনও নতুন ভাব নাই, কোনও নতুন চিন্তা নাই। এক কালে বাঙালির দুই-ই ছিল সে কথাও যেন ভুলিয়া গিয়াছি। কবিরসাহেবের জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষে সভা হইবে, বক্তৃতা হইবে, কিন্তু একালে আমাদের বক্তৃতায় সারবস্তু থাকে না। এখন এই বঙ্গদেশে অম্লান দত্ত বা শিবনারায়ণ রায়ের মতো চিন্তাশীল মানুষ আর কয়জন! সভা সমিতিতে এই মুষ্টিমেয় বাঙালি মনীষীদের বড় দেখি না। আমাদের একালের বক্তা হয় মন্ত্রী না-হয় কোনও উচ্চ-পদাধিকারী। দূরদর্শনে কখনও কখনও বক্তৃতার অংশ শুনি. তাহাতে সারবস্তু কিছু বড় পাই না। দুঃখের বিষয় এই অবস্থা যে কত দুঃখের তাহা যেন আমরা বুঝিও না। হুমায়ুন কবির বক্তৃতা বড় করিতেন না। তাঁহার গভীর চিন্তা ও ভাবনা তাঁহার রচনায় বিধৃত। তাঁহার প্রতিষ্ঠিত এবং সম্পাদিত 'চতুরঙ্গ' পত্রিকায় তিনি লিখিতেন। এই লেখাগুলির একটি সংকলন তাঁহার জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষে প্রকাশিত হইলে আমরা লাভবান হইতাম। কবির সাহেবের মনীষা সম্যকভাবে আলোচনা আজ কে করিবে? একখানি সার্থক স্মারকগ্রন্থ কে প্রকাশ করিবে? আমাদের রাজনীতিতে আজকাল কোনও মনীষার চিহ্ন দেখি না।

রাজনীতির বাহিরে চিন্তাশীল মানুষ অবশ্যই কিছু আছেন। কিন্তু তাঁহাদের এই ব্যাপারে কে প্রবুদ্ধ করিবে? একখানি সুন্দর স্মারকগ্রন্থ প্রকাশ করিতে কাহারা উদ্যোগী হইবেন? একটি সভা হইতে পারে, বোধহয় এখনও পর্যন্ত হয় নাই। টিভি-তে বা সংবাদপত্রে কোনও রিপোর্ট পাই নাই। তাঁহার জন্মদিন ২২শে ফেব্রুয়ারি। কই ২৩শে ফেব্রুয়ারি কোনও জন্মশতবার্ষিকীর সংবাদ দৈনিক পত্রিকায় বা দূরদর্শনে দেখিলাম না।

আমি বলি এখনও সময় আছে। কয়েকজন মননশীল বাঙালি একত্র হইয়া একটি সভার আয়োজন করিতে পারেন এবং একখানি সার্থক স্মারকগ্রন্থ প্রকাশ করিতে উদ্যোগী হইতে পারেন। হুমায়ুন কবির একজন স্মরণীয় বাঙালি মনীষী। পরিশেষে কবিরসাহেবের একটি উক্তি উদ্ধৃত করি "The Indian Heritage" গ্রন্থের তৃতীয় সংস্করণে ১৯৫০ সালে তিনি একটি স্মরণীয় কথা বলিয়াছিলেন : 'In village and town, the ancient people of India are again on the march towards a new goal of social security, social justice and individual self-realisation.'

এই উক্তি মনে রাখিয়া আমরা ইহার বিষয় সম্বন্ধে সম্যক আলোচনার জন্য একটি সর্বভারতীয় সেমিনারের আয়োজন করিতে পারি।

হুমায়ুন কবিরের বিজ্ঞান-ভাবনা

দিলীপকুমার সিংহ

আমরা এমন একটা সময়ে বাস করছি যে-সময়টিকে বিজ্ঞানীরা, সমাজবিজ্ঞানীসহ, 'বিশ্বায়নের যুগ' বলে অভিহিত করেন। এই যুগের স্থায়িত্ব ও বিপরীতমুখী আলাপ আলোচনা খুব জোরকদমেই চলেছে। কিন্তু একটা দিক আলোচনাসমূহ থেকে উদ্ভূত হয়েছে—এক ধরনের আন্তর্বিষয়কতা (interdisciplinarity), যার অন্য বর্ণনা অনেক সময় হয় বহুবিষয়কতা (multidisciplinarity) বা বিষয়োত্তরতা (transdisciplinarity)। শেষোক্ত কথা দুটি খুব বেশি চালু ছিল না কয়েক দশক আগে পর্যন্ত। প্রথমটি যে কোনও রকমের বৌদ্ধিক প্রকাশের বিশেষ অঙ্গ ছিল, তা বললে অত্যুক্তি হবে না। আন্তর্বিষয়কতা এক ধরনের মানসিকতা সৃষ্টিতে সাহায্য করত। নানা বিষয় থেকে সাধারণ তত্ত্ব ও তথ্য বলতে গেলে 'শোষণ' করাই সেই জাতীয় প্রকাশের মুখ্য অঙ্গ ছিল। বহু ব্যক্তিত্বের ভাবমূর্তি এই আন্তর্বিষয়ক মানসিকতা থেকে সমাজে প্রতীয়মান হত। অনেক উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে। সাধারণত্ব (commonality) ও পারস্পরিকতা (mutuality) যে অধুনা মুখ্য উপাদান যে কোনও গভীর অনুসন্ধানে, তার আগাম সংকেত পাওয়া যাচ্ছে।

'দুই সংস্কৃতি' যা পশ্চিমী মহলে বড় স্থান পেয়েছিল একসময়ে, এ দেশে তার প্রভাবের কথা কারও অজানা নয়। সামগ্রিকতা ও সার্বিকতা বা holistic, যার সম্বন্ধে আমরা খুব আপেক্ষিকভাবে এখন সোচ্চার তার ইংগিত কিন্তু নানা প্রকাশনের মাধ্যমে আমার দেখা পঞ্চাশের দশক থেকেই অনেককে আকৃষ্ট করেছিল। এই সম্পর্কে সেই ধরনের প্রকাশনার মধ্যে মুখ্য ভূমিকা গ্রহণ করেছিল কয়েকটি বিশিষ্ট পত্রিকা। 'চতুরঙ্গ' হল তার মধ্যে অন্যতম, কারণ তার সার্বিক নেতৃত্বে ছিলেন হুমায়ুন কবির। এই পত্রিকার অন্যতম বৈশিষ্ট্য হল সর্বাধুনিক বিষয়, তথ্য, তত্ত্ব ও পুস্তক সম্পর্কে পাঠককে অবহিত করা। ইংরাজি বা বাংলা ভাষা ও সাহিত্য সম্পর্কে পুস্তক বাছাই নিয়ে কোনও রকমের সংকীর্ণতা দোষে এ পত্রিকা দুষ্ট হয়নি। তখন সমসাময়িক অনেক পত্রিকাই ছিল, যেমন 'পরিচয়', 'বিশ্বভারতী পত্রিকা', 'শনিবারের চিঠি', 'সবুজপত্র', 'দেশ', 'কল্লোল' ইত্যাদি। এমনও দেখা গেছে যে প্রায় একইসময় একই বিদেশি বইয়ের সমালোচনা হিরণকুমার সান্যাল লিখেছেন চতুরঙ্গে, পরিচয়ে লিখেছেন নীরেন্দ্রকুমার রায় আর প্রেসিডেন্সি কলেজ পত্রিকায় লিখেছেন সুশোভন চন্দ্র সরকার। এমনও দেখা গেছে চারজন শেলির কবিতার অনুবাদ করেছেন এবং তা প্রকাশিত হয়েছে প্রেসিডেন্সি কলেজের পত্রিকায়, (যার সম্পাদকও কবিরসাহেব ছিলেন একসময়ে) যাঁদের মধ্যে ছিলেন হুমায়ুন কবির ও সোমনাথ মৈত্র। প্রায় একই কথা বলা যেতে পারে 'Lolita' বইটির প্রকাশনার পরই আলোচনা সম্পর্কে। মনে পড়ে যায় আরও অনেকের লেখা এবং আরও পুস্তকের সমালোচনা যা চতুরঙ্গে বা সমগোত্রীয় অন্যান্য পত্রিকায় প্রকাশিত হত। ইংরাজি ভাষায় প্রকাশিত পুস্তকের সমালোচনা আজকাল নানা পত্রিকায় অগ্রাধিকার পাচ্ছে; সেদিকে সত্যিকারের অন্যতম পুরোধা ছিলেন হুমায়ুন কবির। শোনা যায় যে নতুন কোনও বই বিশেষ করে বিদেশি ভাষায়, হাতে পড়লেই তিনি সমালোচনার জন্য ব্যস্ত হয়ে পড়তেন।

আপাতদৃষ্টিতে মনে হতে পারে, কবিরসাহেবের বিজ্ঞান সম্পর্কিত দৃষ্টিভঙ্গি আলোচনা করতে গিয়ে তার এক জাতীয় সাংস্কৃতিক দিকের কথা এত বলা কেন? কবিরসাহেব ছিলেন মৌলানা আবুল কালাম আজাদের অত্যন্ত কাছের লোক। "India Wins Freedom" প্রকাশের আলো দেখত না ইংরাজি ভাষায়, যদি না কবিরসাহেব মৌলানা আজাদের খুব নিকট সাথী হতেন। তাঁদের আত্মিক নৈকট্য বোধকরি অনুধাবিত হতে পারে একটি বিশেষ দিক থেকে ভাবলে। মৌলানা আজাদের "আল হিলআল" পত্রিকার কথা ইতিহাসের এক সম্পদ, তার মুখ্যতম কারণ হল এতে প্রতিফলিত হত ইসলামীয় তত্ত্বের যুক্তিসম্মত অনুসন্ধান ও স্বর্চ্ছায়ন বা আদি ইংরাজিতে যাকে বলা যেতে পারে rational উপস্থাপনা। মৌলানাসাহেবের একটি বংশগত ঐতিহ্য এদিকে ছিল। কবিরসাহেবের পিতামহ খান বাহাদুর আমির উদ্দীন আহমেদ ছিলেন আরবি ও পারসি ভাষা বিশেষজ্ঞ আর পিতা ছিলেন খান বাহাদুর কবীর উদ্দীন আহমেদ, যিনি ছিলেন নানা বিষয়ে ওয়াকিবহাল হয়েও যে কোনও ধরনের সাম্প্রদায়িক ও ধর্মীয় স্পৃহা ও সংস্কার থেকে সম্পূর্ণভাবে

মুক্ত। হুমায়ুন কবির মুক্তমন ও পাণ্ডিত্য পেয়েছিলেন বোধহয় তাঁর পিতা ও পিতামহর থেকে। কবিরসাহেব যে অত্যন্ত কৃতী ছাত্র ছিলেন, তার কথা কে না জানে? কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে খুব কমই অধ্যাপনায় নিয়োগ করা হত যুগপৎ দুটি বিভাগে বা এক বিভাগে নিযুক্তি হলেও অন্য বিভাগে সক্রিয় পড়ানোর সুযোগ দেওয়া হত। স্যার আশুতোষের আমলে সত্যেন বসু ও মেঘনাদ সাহাকে মিশ্র (ফলিত) গণিত বিভাগে নিযুক্ত করা হলেও পদার্থবিদ্যা বিভাগেও পড়ানোর সম্পূর্ণ অধিকারে এখনকার মতো কোনও প্রাতিষ্ঠানিক বাধা কেউ আরোপ করেনি। অধ্যাপক কবির ইংরাজি ও দর্শন বিভাগে পড়াতেন অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অসাধারণ কৃতিত্বের সঙ্গে এম এ পাশ করে ফেরার পর। স্মৃতিতে জেগে ওঠে আমার পিতৃদেবের কথা যিনি কবিরসাহেবের পাণ্ডিত্য ও পাঠন সম্বন্ধে এতই মুগ্ধ ছিলেন যে আমার একবার সুযোগ ঘটেছিল বালিগঞ্জ সারকুলার রোডে মৌলানা আজাদের বাড়িতে কবিরসাহেবকে দেখার। আর একজনের কথা মনে পড়ে, অধ্যাপক সতীন্দ্রনাথ চক্রবর্তীর কথা, যাঁর কবির সম্পর্কে উচ্ছ্বসিত প্রশংসা আজও মনে জাগরূক আছে।

প্রশাসনিক স্তরে স্বাধীনতার পর অধ্যাপক কবির হয়েছিলেন ভারত সরকারের যুগ্ম শিক্ষা উপদেষ্টা, আর মুখ্য শিক্ষা উপদেষ্টা ছিলেন অধ্যাপক কে. জি. শায়দান। তাঁদের যৌথ নেতৃত্বে বিশেষ করে অধ্যাপক কবিরেরই প্রচেষ্টায় প্রকাশিত হত নানা বিষয়ের ওপর বিবরণী, বিশেষ করে কবির কর্তৃক প্রণীত ছোট ছোট পুস্তিকা, যা ছিল মূলত শিক্ষানীতি নিয়ে, শিক্ষকদের নেতৃত্ব ও শিক্ষাব্যবস্থা রূপায়ণ নিয়ে। এইরকম প্রয়াস এখন প্রায় দুর্লভ। মূল্যবোধ, জাতীয় সংহতি, সদ্ভাবনা ইত্যাদির কথা আমরা শুনতে প্রায় অভ্যস্ত হয়ে গেছি নানা পর্যায় থেকে, কিন্তু প্রকৃত পর্যালোচনা ও দায়িত্ব সম্পর্কে নির্দেশ বা ঔচিত্যসর্বস্ব ভাষণ কোনও দিনও অধ্যাপক কবিরের লেখায় প্রতিফলিত হয়নি। ওঁদের নেতৃত্বে এখনকার যতীনদাস পার্কে প্রথম ভারতীয় শিক্ষা সম্মেলনের অনুষ্ঠান, বয়ঃকনিষ্ঠ হলেও মনে আজও রেখাপাত করে আছে।

বিজ্ঞান সম্পর্কে নীতি ও কর্মসূচি প্রণয়নে স্বাধীনতার কিছু পরেই প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহরু ছাড়াও যাঁরা যাঁরা অগ্রণী হয়েছিলেন, তাঁর মধ্যে সরাসরি বিজ্ঞানের ছাত্র না হলেও ছিলেন অধ্যাপক হুমায়ুন কবির। জওহরলাল নেহরুর মন্ত্রিসভায় তিনি ছিলেন দুটি বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী—একটি হল পেট্রোলিয়াম ও রসায়ন, আর বেশ কিছু আগেই আর একটি দপ্তরের ভার দেওয়া হয়েছিল, তা হল বৈজ্ঞানিক গবেষণা (Scientific Research), যার পুনরুজ্জীবন প্রয়োজন থাকলেও কোনও মন্ত্রিসভায় আজ পর্যন্ত দেখা যায়নি। শিক্ষামন্ত্রকের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক ছিল অত্যন্ত সুদৃঢ়। একসময় সচিব তো ছিলেনই, ইউ জি সি-র চেয়ারম্যানও হয়েছিলেন ১৯৫৫ সালে। 'বিজ্ঞান গবেষণা ও সংস্কৃতি' যে এক মন্ত্রক হতে পারে, তা ভাবতে আজকে কিরকম অদ্ভুত ঠেকতে পারে এবং তারই ভার পেয়েছিলেন কবিরসাহেব। দর্শনচর্চা থেকে তিনি কখনও অব্যাহতি পাননি। আজও মনে পড়ে বিখ্যাত দার্শনিক বসন্তকুমার মল্লিকের স্মৃতির উদ্দেশ্যে প্রণীত প্রকাশনায় তাঁর বিশেষ উদ্যোগের কথা।

অধ্যাপক কবিরের সঙ্গে সাহিত্যের বা সাহিত্য সম্পর্কিত বিষয়ের এবং দর্শন সম্পর্কিত সংগঠনের যে যোগাযোগ ছিল, তা বললে বেশি বলা হবে না। বিজ্ঞানীদের সঙ্গেও তাঁর সম্পর্ক নানা দিক থেকে সুদৃঢ় এবং বিশেষ করে কলকাতা বিশ্ববিদ্যায়ের চত্তরে সাহা ইন্সটিটিউট অফ নিউক্লিয়ার ফিজিক্স গঠনে তাঁর দান ছিল অপরিসীম। স্বাভাবিকভাবেই মেঘনাদ সাহার সঙ্গে তাঁর এক স্থায়ী সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল। ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেস কবিরসাহেবের বিজ্ঞান সম্পর্কিত কর্মশৈলীকে মুগ্ধ ও আকৃষ্ট করেছিল। ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেসের ইতিহাস খুঁজলে পাওয়া যায় দু'জন ব্যতিক্রমী ব্যক্তিত্ব—এক জওহরলাল নেহরু আর দুই, অধ্যাপক হুমায়ুন কবির—যাঁরা বিধিবদ্ধভাবে বৈজ্ঞানিক প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে জড়িত ছিলেন না। জওহরলালের সঙ্গে এই সংগঠনের সম্পর্ক বহুদিনের। বিজ্ঞান ও উন্নয়ন, বিজ্ঞান ও সামাজিক সম্পর্ক ইত্যাদি সম্পর্কে আলোচনা ও সমীক্ষা বহুদিনের। জওহরলাল নেহরু ১৯৪১ সালে অর্থাৎ স্বাধীনতার আগে সাধারণ সভাপতি হিসাবে নির্বাচিত হলেও ১৯৪২-এ আন্দোলনের মুখে সভাপতিত্ব করতে পারেননি, করেছিলেন পরে ১৯৪৭ সালে। অধ্যাপক কবির হলেন আর এক ব্যক্তি, যিনি ১৯৬৪-৬৫ সালে ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেসের অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেছিলেন। এই সংগঠনের প্রথা অনুযায়ী দু'বছর আগে নির্বাচন হয়, যখন তিনি পেট্রোলিয়াম ও রসায়ন দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী ছিলেন। বিজ্ঞান কংগ্রেসের বিবরণীর পাতা ওলটালে দেখা যাবে তাঁর নেতৃত্বে বেশ কিছু কর্মসূচির কথা। উল্লেখ্য হল সে সময়ের Council Meeting-এর বিবরণী। আরও মূল্যবান হল সেই সময়ের বিজ্ঞান ও সামাজিক সম্পর্ক (Science and Social Relations) উপসমিতির বিবরণী যার কর্ণধার ছিলেন অধ্যাপক নির্মলকুমার বসু (গান্ধীবাদী ও নৃতত্ত্ববিদ হিসাবে তিনি বিশেষ খ্যাতিসম্পন্ন)।

১৯৬৪-৬৫ সালের বিজ্ঞান কংগ্রেস হবার কথা ছিল চণ্ডীগড়ে। কিন্তু ওই বছর স্যার আশুতোষের জন্মশতবার্ষিকী হওয়ায় কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের আমন্ত্রণে ওই সময় বিজ্ঞান

কংগ্রেসের অধিবেশন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে হয় অধ্যাপক হুমায়ুন কবিরের সভাপতিত্বে। তাঁর বক্তব্যের শিরোনাম ছিল "Science and the State in India"; স্বভাবতই বিজ্ঞান কংগ্রেসের তখন মুখ্য আলোচ্য বিষয় আগাম ঠিক করা হত না, কিন্তু বিজ্ঞান ও রাষ্ট্র, ভারতের পরিপ্রেক্ষিতে কোন দিকে বা কী রূপ পরিগ্রহ করতে পারে তার ইঙ্গিত এই ভাষণে পাওয়া যায়।

অধ্যাপক কবির নানা জায়গায় প্রকাশ্যে স্বীকার করেছেন যে তিনি বিজ্ঞানের ছাত্র নন। কিন্তু বিজ্ঞানচর্চা, অনুশীলন এবং নীতি সম্পর্কে তাঁর গভীর অনুসন্ধিৎসা ছিল। বিজ্ঞানের সর্বজননীতা সম্পর্কে তাঁর পরিচিতি এবং বিজ্ঞান সম্পর্কে পৃথিবীব্যাপী নানা ধরনের সমস্যা ও তাদের সম্ভাব্য সমাধান সম্পর্কে নিজেকে অবহিত করতে সচেষ্ট থাকতেন। বিজ্ঞান জগতের লব্ধপ্রতিষ্ঠ বিজ্ঞানীদের সঙ্গে তাঁর ভাবনাচিন্তার লেনদেন ছিল, যেমন অধ্যাপক হাইসেনবার্গ। হাইসেনবার্গ তাঁকে যা বলেছিলেন তা এখনও প্রযোজ্য যে এত যুবা বিজ্ঞনীরা যে মার্কিন মুলুকে বা বিদেশে পাড়ি দিচ্ছে, তার মূল কারণ হল যে বিদেশে সব জায়গায় তারা কাজ করতে পারে বিশেষ বৈজ্ঞানিক গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত হয়ে, যার মাধ্যমে তাদের প্রতিষ্ঠা লাভ করতে তো অসুবিধা হয় না, কোনও প্রতিবন্ধকতাও দেখা যায় না। বরঞ্চ নিত্যনতুন যন্ত্রপাতি ও প্রয়োগ সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল হতে পারে। প্রযুক্তি এত দ্রুত এগোচ্ছে যে অত্যাধুনিক প্রযুক্তিগত অভিনবত্ব না থাকলে প্রথম সারির কাজ অসম্ভব। কবিরসাহেব হাইসেনবার্গের কথা নানা জায়গায় উদ্ধৃত করেছেন এবং এ সম্পর্কে পরিকল্পনা সমন্বয় রাষ্ট্র ও বৈজ্ঞানিক সংগঠনের মধ্যে যে প্রয়োজন, তা তিনি বারবার উল্লেখ করেছেন। হাইসেনবার্গের কথা আবার শুনিয়েছেন, যার নির্যাস হল যে তরুণ বিজ্ঞানীদের যদি অন্তত দু'বছর অন্তর প্রতিষ্ঠিত বিজ্ঞানীদের সঙ্গে interaction স্থায়ীভাবে করা যায়, তাহলে হয়ত বিজ্ঞানীদের মধ্যে, বিশেষ করে তরুণ প্রজন্মকে হয়ত দেশছাড়া হতে হবে না। বিশ্বায়নের যুগে আশা করা যায় কবিরসাহেবের দূরদৃষ্টি অনুসারে এক ধরনের সহযোগী উদ্যোগ গড়ে উঠবে। সৃজনমুখী বৈজ্ঞানিক অনুশীলন বা উৎকর্ষ কখনওই হতে পারে না; তাঁর মতে, পদাধিকার বা বয়ঃক্রম হবার ফলে, যার সম্পর্কে উগ্র সচেতনতা আজও এ দেশে বিদ্যমান। বিজ্ঞানজগতে, তাঁর মতে বড় সংকট হল নেতৃত্ব; যোগ্য ও বয়ঃকনিষ্ঠ সহকর্মীদের অনুপ্রেরণা জোগাতে সহযোগী নেতৃত্ব এখনও পর্যন্ত স্থায়ী বাতাবরণ সৃষ্টির কাজে দেখা যায়নি। হয়ত রাষ্ট্র আনুষঙ্গিক পরিবেশ যান্ত্রিকভাবে তৈরি করে দিতে পারে, কিন্তু বিজ্ঞানীদের মধ্যে সৃজনশীলতা সম্পর্কে কখনওই রাষ্ট্র কোনও পদক্ষেপ নিতে পারে না। রাষ্ট্র অনুদান ও আংশিকভাবে সম্পদ সীমিতভাবে সরবরাহ করতে পারে, এমনকী একাধিক বিজ্ঞানচর্চার কেন্দ্রও স্থাপন করতে পারে। হয়ত অনুশীলনের পৌনঃপুনিকতা আপাতদৃষ্টিতে দেখা যেতে পারে নানা কারণে। কিন্তু রাষ্ট্রের সেখানে হস্তক্ষেপ করার কিছুই নেই, যদি দু'জন বিজ্ঞানী একই সমস্যা অনুশীলনে রত থাকেন, কারণ তাঁদের দৃষ্টিভঙ্গি ভিন্ন হতেই পারে। কবিরসাহেব এ কথা বলতে ইতস্তত করেননি যে কেউ যদি নিউটন ও লাইবনিৎসদের অনুশীলন সম্পর্কে এই পৌনঃপুনিকতার দায়ে হস্তক্ষেপ করত, তাহলে সারা জগৎ differential ও integral calculus-এর চর্চার বিভিন্ন রূপ থেকে বঞ্চিত হত।

বিশ্ববিদ্যালয়ে গবেষণা ও সরকার সমর্থিত বিজ্ঞানাগারের গবেষণা সম্পর্কে তাঁর এক বিশেষ বক্তব্য ছিল। এই দুই রকমের সংগঠনের মধ্যে নিশ্চয়ই যোগসূত্র প্রয়োজন, কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞানানুশীলনে যদি অগ্রাধিকার না দেওয়া যায় তাহলে তার দীর্ঘমেয়াদি ফল বিপজ্জনক হবেই এবং উভয়তই। কবিরসাহেব জার্মানির হাইসেনবার্গ ও লন্ডনের ব্ল্যাকেট যা বলেছেন, তাঁদের বক্তব্য বার বার উল্লেখ করেছেন, যাতে বিশ্ববিদ্যালয়ে পঠনপাঠন সময়োপযোগী সম্পূর্ণ ও সজীব হয়। জাতীয় বিজ্ঞানাগার বা গবেষণাগারে এমনকী শিল্পজগতে এই রকমের পুনরুজ্জীবনী উপাদান হয়ত প্রয়োজন নয়, কিন্তু দেখা যাচ্ছে কোথাও যেন এক গরমিলের মধ্যে "scientific inbreeding" প্রশ্রয় পাচ্ছে। ভাবনাচিন্তার ও বিজ্ঞান গবেষণা কর্মীর আদানপ্রদান না হলে কখনওই বিশ্ববিদ্যালয় এবং আনুষঙ্গিক সংগঠনগুলি সমৃদ্ধ হতে পারে না। কবিরসাহেব বিশ্ববিদ্যালয়-ব্যবস্থার সঙ্গে জড়িত থাকার জন্য এবং সমৃদ্ধ হওয়ার ফলে বার বার বিশ্ববিদ্যালয়গুলির সম্পদের দিক থেকে আপেক্ষিক বিচ্ছিন্নতার সম্পর্কে খেদ প্রকাশ করতেন। পরমাণু শক্তি কমিশন হোক বা প্রতিরক্ষা বিজ্ঞান সংগঠন হোক, এমনকী জাতীয় গবেষণাগার হোক, তাদের লক্ষ্য ফলিত/ব্যবহারিক বিজ্ঞান, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির দিক থেকে একপেশে হলেও শিক্ষিত লোকবল সৃষ্টি ও মৌলিক গবেষণা বিশ্ববিদ্যালয় ছাড়া যে হতে পারে না, তাঁর অনেক ভাষণে তিনি দৃঢ়ভাবে জানিয়েছেন।

ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেসকে উনি একটু স্বতন্ত্র দৃষ্টিতে দেখতেন এবং ওঁর আশা ছিল যে ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেস সংগঠনটি বিজ্ঞানসমাজের একটি বলিষ্ঠ নেতৃত্ব দিতে সক্ষম হবে। ভারতের ইতিহাসে অনেক বিজ্ঞানী গণিতজ্ঞদের নাম করা যায়। কিন্তু বিজ্ঞানের ambience বা বাতাবরণ

ভারতবর্ষে বলিষ্ঠভাবে দেখা যায়নি। বিজ্ঞান কংগ্রেস সংগঠনটির লক্ষ্য হওয়া উচিত ভারতের বৈজ্ঞানিক উৎকর্ষের ঐতিহ্য বজায় রেখে দেশ যেন সরকারি অনুদানে পুরোপুরি নির্ভরশীল না হয়ে সমাজের অন্যান্য সংগঠনের সঙ্গে যোগসূত্র প্রতিষ্ঠা করে বয়ঃজ্যেষ্ঠ ও বয়ঃকনিষ্ঠ বিজ্ঞানীদের মধ্যে ভাবনাচিন্তা বিনিময়ে ও উত্তরণে যেন সমর্থ হয়। অধ্যাপক কবিরের জন্মশতবর্ষে আশা করা একেবারেই অনুচিত নয় যে তাঁর মতাদর্শ অনুযায়ী, সাহিত্য বিজ্ঞান দর্শন এবং প্রযুক্তির মৌলিক ও গবেষণাযোগ্য দিকগুলির সমন্বয় ঘটবে। ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেস সংগঠনটির শতবর্ষ আর বছর সাত/আট পরেই। স্যার আশুতোষের প্রতিষ্ঠিত আর এক সংগঠন কলকাতা গণিত সমিতির আর বছর দু'য়েক পরেই। আশুতোষের জন্মশতবর্ষে উনি বিজ্ঞান কংগ্রেসে ভাষণ দিয়েছিলেন। আশা করতে দোষ কী যে আশুতোষ প্রতিষ্ঠিত সংগঠনগুলির শতবর্ষ অনুষ্ঠানে কবিরের আশা ও আদর্শ রূপায়িত হবে?

পত্রিকা সংক্রান্ত ঘোষণা

কেন্দ্রীয় সংবাদপত্র রেজিস্ট্রেশন (১৯৫৬)
নিয়মাবলির ৮ নং ধারা অনুযায়ী

পত্রিকার নাম	:	চতুরঙ্গ
প্রকাশের স্থান	:	৫৪ গণেশচন্দ্র এভিনিউ, কলকাতা-৭০০ ০১৩
প্রকাশের কাল	:	ত্রৈমাসিক
প্রকাশক ও সত্ত্বাধিকারী	:	শ্রীমতী নীরা রহমান ৫৪ গণেশচন্দ্র এভিনিউ, কলকাতা-৭০০ ০১৩
জাতীয়তা	:	ভারতীয়
সম্পাদক	:	শ্রী আবদুর রাউফ ৫৪ গণেশচন্দ্র এভিনিউ, কলকাতা-৭০০ ০১৩
জাতীয়তা	:	ভারতীয়

আমি, শ্রীমতী নীরা রহমান, এতদ্বারা ঘোষণা করিতেছি যে উপরোক্ত তথ্যগুলি আমার জ্ঞান ও বিশ্বাস মতে সত্য।

তারিখ : ৫.৩.২০০৬ নীরা রহমান

প্রকাশক : চতুরঙ্গ

গ্রাহকদের স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে গ্রাহক চাঁদা পাঠিয়ে দেবার জন্য অনুরোধ। নতুন গ্রাহক করা হচ্ছে। প্রত্যেক সংখ্যার মূল্য ডাক খরচসহ ২০ টাকা হিসাবে ৪ বা ততোধিক সংখ্যার মূল্য এম.ও. যোগে বা CHATURANGA নামে চেক পাঠিয়ে নতুন গ্রাহক হওয়া যাবে। কলকাতার গ্রাহকরা কুরিয়ার-যোগে পত্রিকা পাবেন।

মূল হাতে লেখা বা ডি.টি.পি.-করা পাণ্ডুলিপি জমা দেবার জন্য লেখকদের কাছে অনুরোধ। জমা দেওয়া লেখা সম্বন্ধে সিদ্ধান্ত জানতে ছ'মাস অপেক্ষা করতে হবে।

হুমায়ুন কবির ঃ রাজনৈতিক জীবন

সুখরঞ্জন সেনগুপ্ত

বাঙালির সমাজ ও রাজনৈতিক জীবনে মাত্র চল্লিশ বছর আগেও এমন একটা সময় ছিল যখন আমরা বাঙালির বৈশিষ্ট্যকে বিচার করতাম তাঁর ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবোধ, নির্ভীকতা ও অনুভূতির বিচ্ছুরণ প্রক্ষেপ যাচাই করে। গড্ডালিকা প্রবাহে ভাসমান তৃণখণ্ড দেখে নয়। আমার বিশ্লেষণে অধ্যাপক হুমায়ুন কবির সেই প্রথমোক্ত সারির বাঙালি ব্যক্তিত্ব। আমার অর্ধশতাব্দীরও বেশি সময়ের সাংবাদিক জীবনে বহু অবিস্মরণীয় জাতীয় ও প্রাদেশিক ব্যক্তিত্বের সংস্পর্শে এসেছি এবং তার মধ্যে যাঁদের কাছ থেকে অফুরন্ত স্নেহ এবং বিশ্বাস ও আস্থা অর্জন করতে পেরেছি অধ্যাপক হুমায়ুন কবির ছিলেন তাঁদের অন্যতম। খবরের কাগজের রিপোর্টার হিসাবে আমি তাঁর রাজনৈতিক জীবনের একেবারে শেষ ধাপে অর্থাৎ ১৯৬০ থেকে ১৯৬৯ সালে তাঁর ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যে এলেও আমি কবিরসাহেবকে প্রথম দেখেছিলাম ১৯৪৫ সালের নভেম্বর মাসে, যখন আমার বয়স মাত্র তেরো বছর। ওই সময়টাকে বলা যেতে পারে উত্তাল চল্লিশের যুগের চূড়ান্ত সময়। যখন বল্গাহীন তুরঙ্গের খুরের আঘাতে উৎক্ষিপ্ত ধূলিরাশিতে বাঙালির জাতীয়জীবন আচ্ছন্ন। ওই সময়ে যুক্তবঙ্গের প্রাদেশিক আইনসভার (Legislative Assembly) শেষ নির্বাচনের তোড়জোড় চলছে। হুমায়ুন কবির তাঁর নেতা আবুল কাশেম ফজলুল হক (বাংলার কৃষক প্রজা পার্টির প্রতিষ্ঠাতা) সাহেবের নির্বাচন কেন্দ্র পিরোজপুর (Perojpur) মহকুমার কোনও এলাকায় প্রচারে গিয়েছিলেন। বরিশাল জেলায় কাউখালি (Kaukhali) নামে সে সময় একটি স্টিমার স্টেশন ছিল। বরিশাল থেকে খুলনা আসার স্টিমার (যার নাম ছিল Barisal Express) কাউখালি স্টিমার ঘাটে থামত।

শীতের সন্ধ্যা অনেক আগেই উত্তীর্ণ হয়ে গিয়েছে। প্রচণ্ড দাপটের ওই স্টিমারটি কাউখালি ঘাটের ওপর তার শক্তিশালী সার্চলাইট ফেলতেই আমি কেবিনের জানালা দিয়ে পন্টুন জেটির (Pontoon Jetty) ওপর অসংখ্য লোকের ভিড় দেখলাম। ওই লোকেরা শ্লোগান দিচ্ছিল হকসাহেব ও কবিরসাহেব এবং তাঁদের কৃষক প্রজা পার্টির পক্ষে। অভিভাবকের নির্দেশকে আমল না দিয়ে আমি দ্রুত স্টিমারের নীচের ডেকে (Deck) নেমে এলাম। স্টিমারটি ভাঁটিতে আসছিল। কিন্তু সেটি যখন ঘাটে ভিড়ল, তখন নোঙর ফেলে পুরো উজানমুখী হয়ে ভিড়ল। আমি গ্যাংওয়ের (Gangway) কাছে রেলিং ধরে দাঁড়িয়ে। স্টিমারটি ভিড়লে পরে দেখা গেল পন্টুনের ওপর হকসাহেবের সঙ্গে বেঁটে-খাটো ফুলপ্যান্ট ও সাদা গলাবন্ধ কোট গায়ে এক ব্যক্তি দাঁড়িয়ে। হকসাহেবকে আমার চিনতে অসুবিধা হয়নি। কারণ, প্রায় দু'বছর আগে এই বরিশাল এক্সপ্রেস স্টিমারে হকসাহেবকে আমি প্রথম দেখি। (পূর্ববঙ্গের স্টিমারের খালাসিরা Gangway কথাটির একটি চমৎকার বাংলা প্রতিশব্দ ব্যবহার করে থাকে। ওই শব্দটি হল 'গাংমারি'।) ফজলুল হকসাহেবকে পন্টুনের ওপর দেখতে পেয়েই প্রধান সারেং ও ড্রাইভার-ইঞ্জিনিয়ার ছুটে এলেন। স্টিমারের খালাসিরা তাড়াতাড়ি গাংমারি (Gangway) খুলে দিয়ে স্টিমারের ভিতরের পাটাতন সিঁড়ি পন্টুন জেটির ওপর নামিয়ে দিল। শীতের আকাশ বিকাল থেকেই মেঘাচ্ছন্ন ছিল। থেমে থেমে ঝিরঝিরে বৃষ্টি হচ্ছিল। সিঁড়ি পেতে দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বহু লোকের জয়ধ্বনির মধ্যে হুমায়ুন কবির হকসাহেবকে নিয়ে স্টিমারে উঠে পড়লেন। তাঁরা দু'জনে স্টিমারের সম্মুখভাগের ডেকের ওপর দাঁড়িয়ে। কাউখালি ঘাটে হকসাহেবের সমর্থকেরা অসংখ্য হ্যারিকেন হাতে অপেক্ষমান। স্টিমার চলার ফলে যে ঢেউ উঠছে তাতে হ্যারিকেনের আলোর ছায়া পড়ে নাচছে। হকসাহেব হুমায়ুন কবিরকে জানালেন তিনি আর স্টিমারের দোতলায় উঠবেন না। কারণ একটু পরেই তিনি ঝালকাঠি (Jhalakathi) স্টেশনে নেমে যাবেন। ঝালকাঠি হকসাহেবের গ্রামের (গ্রামের নাম 'চাঘার') স্টেশন। হকসাহেবের এই উক্তি শোনামাত্র স্টিমারের কর্মচারীরা দু'খানা টুল এনে দিলেন। ওই টুল দুটিতে তাঁরা দু'জনে বসে কিছু কথাবার্তা বলছিলেন। রাত আটটার কিছু পরে স্টিমার ঝালকাঠি স্টেশনে এসে ভিড়ল। ঝালকাঠি বেশ বড় স্টেশন। বেশ কয়েকটা হ্যাজাক নিয়ে বহু লোক স্টেশনে দাঁড়িয়ে আছে। নদীর বুকে অসংখ্য ছোট-বড় নৌকার মাঝিরা লণ্ঠন হাতে নিয়ে হকসাহেবের পক্ষে শ্লোগান তুলছে। হকসাহেব ঝালকাঠিতে নেমে গেলেন। স্টিমার ঘাট ছেড়ে

খুলনার পথে এগিয়ে চলল। কবিরসাহেব দোতলার ডেকে তাঁর জন্য নির্দিষ্ট কেবিনে চলে গেলেন। ঘটনাটি আমার স্মৃতিতে ছবির মতো আঁকা রয়েছে। আমি আরও কয়েক মিনিট ডেকের ওপর দাঁড়িয়ে এই দুরন্ত স্টিমারের চলা দেখছিলাম। নদীর বুকে ভাঁটিতে চলা নৌকাগুলির হারিকেনের ছোট্ট আলোগুলির কাছে এসে দ্রুত মিলিয়ে যাওয়া, সার্চলাইটের তীব্র আলোকছটায় অনেকটা দূরবর্তী গ্রামগঞ্জ, হাটবাজার, আবার কখনও ধু ধু করা বিস্তীর্ণ মাঠ, বালির চর, স্তিমিত কাশফুলের ঝাড়, আবার কখনও নদীর খুব কাছের ঘরবাড়িতে শোবারঘরের মশারি টানানোর দৃশ্য, মাছ ধরার নৌকাগুলির মাঝিদের স্টিমারের সারেঙের কাছে কাতর প্রার্থনা—'খোদার কশম আস্তে চালাও সারেং ভাই', সারেং কর্ণপাত না করলে নদীর বুক থেকে নৌকা সামলাতে সামলাতে তার বাপ-বাপান্ত করা—এই অভিজ্ঞতা, এই অনুভূতি অনির্বচনীয়। নিছক শব্দচয়ন করে আর কাব্যিক ভাবালুতা দিয়ে এই অনুভূতি বোঝানো যায় না।

কাউখালি-ঝালকাঠির এই ঘটনার ঠিক বিশ বছর পর ১৯৬৬ সালের জানুয়ারি মাসের এক মধ্যদিনে 'বাংলা কংগ্রেসের' জন্মলগ্নে কৃষ্ণনগর শহরের সাবেক কংগ্রেস নেতা ও এম এল এ জগন্নাথ মজুমদারের বাড়িতে অধ্যাপক হুমায়ুন কবিরকে বলেছিলাম আমি তাঁকে প্রথম কবে দেখেছি। কবিরসাহেব ও অজয় মুখার্জি পাশাপাশি বসে খাচ্ছিলেন। কবিরসাহেবের মুখোমুখি আমি। আমি যখন ১৯৪৫ সালের নভেম্বরে কাউখালি স্টিমার ঘাটের ঘটনা বলছিলাম অজয়দা ও কবিরসাহেব খাওয়া থামিয়ে তা শুনছিলেন। আমি থেমে গেলেও কবিরসাহেবের বিস্ময়ের ঘোর কাটছিল না। এর মধ্যে অজয়দা মন্তব্য করে ফেললেন, 'কী সাংঘাতিক ছোকরারে বাবা!' তখন কবিরসাহেব বলে উঠলেন, 'এখানে তো আমরা সবাই নিরামিষ খাচ্ছি। নইলে তোমাকে অনেকগুলো মাছ ও মাছের মুড়ো খেতে দিতাম। তবে তোমার অফুরন্ত স্মৃতির জন্য এয়ারপোর্ট রেস্টুরেন্টে তোমার একটা বড়াখানা পাওনা রইল আমার কাছে।' কারণ কবিরসাহেবের সঙ্গে আমার বেশি দেখাসাক্ষাৎ হত দমদম এয়ারপোর্টেই। কবিরসাহেব কথা রেখেছিলেন।

এটুকু তো গেল পুরনো স্মৃতির প্রলেপ, যৎকিঞ্চিৎ আত্মস্মৃতিও বটে। অধ্যাপক হুমায়ুন কবিরকে বলতে গেলে ১৯৫১ সাল থেকেই দেখেছি। ওই সময় তিনি কেন্দ্রীয় শিক্ষা দপ্তরের জয়েন্ট সেক্রেটারি। প্রায়শই কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে আসতেন। ১৯৫১ থেকে ১৯৫৭ এই ছ'বছরে আমি তাঁকে বেশ কয়েকবার সেনেটের সভায় উপস্থিত থাকতে দেখেছি। আমার যতদূর মনে পড়ে সে সময়কার কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় আইনে তিনি চ্যান্সেলরের মনোনীত সেনেট সদস্য ছিলেন। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক হিসাবে তিনি ওই বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসনিক বিভাগ সম্পর্কে বিশেষ ওয়াকিবহাল ছিলেন। ১৯৫৫ সালের শেষদিকে কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী চিন্তামন দেশমুখ পৃথক বিদর্ভ রাজ্য গঠনের প্রশ্নে কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভা থেকে পদত্যাগ করার পর প্রধানমন্ত্রী নেহরুর অনুরোধে চিন্তামন দেশমুখ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের চেয়ারম্যানের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের পত্তন থেকে এই সংস্থার প্রশাসনিক কাঠামো গড়ে তোলার ক্ষেত্রে অধ্যাপক কবিরের ভূমিকা ছিল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। যাদবপুরের জাতীয় শিক্ষা পরিষদকে বিশ্ববিদ্যালয়ের মর্যাদা দেওয়ার ব্যাপারে ডা. বিধানচন্দ্র রায়ের উদ্যোগের পাশাপাশি অধ্যাপক কবিরের অক্লান্ত পরিশ্রম ছিল। কারণ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের চেয়ারম্যান চিন্তামন দেশমুখ কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভাকে এরকম নোট দিয়েছিলেন যে 'কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বারো মাইলের মধ্যে সর্ব বিষয়ের জন্য একটি সাধারণ বিশ্ববিদ্যালয় গড়ে তোলার যৌক্তিকতা কতখানি? বরং যাদবপুরকে ইঞ্জিনিয়ারিং কিংবা অন্য কোনও ফ্যাকাল্টির Specialised বিশ্ববিদ্যালয়ে রূপান্তরিত করলেই ভাল।' কেন্দ্রীয় শিক্ষা দপ্তরের পদস্থ অফিসার হিসাবে অধ্যাপক কবির এই ধরনের নোট আগে থেকে জানতে পারতেন এবং তিনি তা সঙ্গে সঙ্গে মুখ্যমন্ত্রী ডা. বিধানচন্দ্র রায়কে জানিয়ে দিতেন। মানে ডা. বিধানচন্দ্র রায়ের পক্ষে আগে থেকে পালটা কৌশল গ্রহণ করা সহজ হত। বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের পত্তনের গোড়া থেকে স্কটিশ চার্চ কলেজ ও আশুতোষ কলেজের দু'জন অধ্যাপক ওই সংগঠনে ডেপুটি সেক্রেটারি নিযুক্ত হয়েছিলেন। এঁদেরকে কবিরসাহেবই দিল্লিতে নিয়ে যাওয়ার ব্যবস্থা করেছিলেন। এছাড়া কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রার বিভাগ থেকে তিনজনকে তিনি অ্যাসিস্ট্যান্ট সেক্রেটারির মর্যাদা দিয়ে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনে নিয়োগের ব্যবস্থা করেছিলেন। এর ফলে কেবল কলকাতা ও যাদবপুর নয় পরবর্তীকালের বর্ধমান ও উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ও বিভিন্নভাবে উপকৃত হয়েছিল।

অবিভক্ত বাংলার জাতীয়তাবাদী ছাত্র রাজনীতি ও আন্দোলনের মধ্য দিয়ে অধ্যাপক কবিরের রাজনৈতিক জীবনের উন্মেষ। তবে বাংলার বৃহত্তর রাজনীতিতে তাঁর আত্মপ্রকাশ বলতে গেলে ১৯৩০-এর যুগের মাঝামাঝি সময়ে ফজলুল হকসাহেবের নেতৃত্বে। তখন তিনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক। ওই সময়ে হকসাহেবের কৃষক প্রজা পার্টির একটি পৃথক ছাত্র সংগঠন ছিল। প্রকৃতপক্ষে

হুমায়ুন কবিরই ছিলেন ওই সংগঠনের প্রতিষ্ঠাতা। সে সময় বিশেষ করে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের শেষ লগ্নে আবদুশ সবুর খান ও শেখ মুজিবর রহমানের নেতৃত্বাধীন মুসলিম লিগের ছাত্র সংগঠনের সঙ্গে হুমায়ুন কবিরদের ছাত্র সংগঠনের প্রতিনিয়ত সংঘর্ষ ঘটত এবং কবিরসাহেব লিগের ছাত্র নেতাদের হাতে বহুবার লাঞ্ছিত ও প্রহৃত হয়েছেন। ১৯৪৬ সালের প্রাদেশিক আইনসভার নির্বাচনে অধ্যাপক হুমায়ুন কবির বাংলার সংবাদপত্রের সংবাদ-শিরোনামে বারংবার স্থান পেতে থাকেন। ওই নির্বাচনে অধ্যাপক হুমায়ুন কবির সৈদপুর রেলওয়ে কর্মীদের নির্বাচন কেন্দ্রে (Saidpur Railway mens' Constituency) ফজলুল হকসাহেবের কৃষক প্রজা পার্টির প্রার্থী হন। ওই কেন্দ্রে কমিউনিস্ট প্রার্থী ছিলেন জ্যোতি বসু। মুসলিম লিগ ওই কেন্দ্রে কোনও প্রার্থী না দেওয়ায় প্রকারান্তরে জ্যোতি বসু বঙ্গীয় প্রাদেশিক মুসলিম লিগেরও সমর্থন পেলেন। ১৯৪৬ সালের জানুয়ারি কিংবা ফেব্রুয়ারি মাসে ভৈরববাজার রেলজংশনে (ঢাকা ও ময়মনসিংহ জেলার মধ্যবর্তী) নির্বাচনী প্রচারের সময় অধ্যাপক কবির অপহৃত হন। অপহরণ কাণ্ডের ১৮ দিন পরে একেবারে ভোটের মুখে পুলিশ তাঁকে উদ্ধার করে। এই কেন্দ্রে কংগ্রেস প্রার্থী থাকার ফলে কৃষক প্রজা পার্টি, কমিউনিস্ট ও কংগ্রেসের মধ্যে ভোট ভাগাভাগি হয় এবং কমিউনিস্ট প্রার্থী জ্যোতি বসুর কাছে অধ্যাপক হুমায়ুন কবির পরাজিত হন।

এই ঘটনায় বাংলার মানুষের কাছে কবিরসাহেবের ব্যাপক পরিচিতি ঘটলেও ১৯৪৭ সালে দেশবিভাগের সময় থেকে প্রায় দশ বছর তিনি রাজনৈতিক জগৎ থেকে স্বেচ্ছানির্বাসন নিয়েছিলেন। রাজনীতির প্রাঙ্গণ থেকে সরে এসে তিনি অফিসার-শিক্ষাবিদের ভূমিকা নিয়েই সন্তুষ্ট ছিলেন প্রায় এগারো বছর। কিন্তু কখনওই রাজনীতির বোঝা পিঠ থেকে নামিয়ে ফেলেননি। কিংবা কখনও বলেননি '...বোঝার ভারেতে চলিতে পারি না, এ যাত্রা তোমার থামাও...' তাই মৌলানা আবুল কালাম আজাদের মৃত্যুর (ফেব্রুয়ারি, ১৯৫৮) অব্যবহিত পরেই প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহরু তাঁকে কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভার সদস্য করে নিলেন। কিন্তু কেন্দ্রীয় শিক্ষা দপ্তরের রাষ্ট্রমন্ত্রী হওয়ার আট থেকে দশ মাসের মধ্যে অধ্যাপক হুমায়ুন কবির এই উপমহাদেশের স্বাধীনতা ও তৎসহ ভারত-বিভাগের দায়দায়িত্ব সংক্রান্ত এক সাংঘাতিক বিতর্কের পার্শ্বচরিত্রে পরিণত হলেন। এর কারণ মৌলানা আজাদের ঐতিহাসিক স্মৃতিচারণ গ্রন্থ 'India Wins Freedom'-এর শ্রুতিলিখন। বইটি মৌলানাসাহেবের Biographical narration অর্থাৎ মৌলানা আজাদ বলেছেন ও হুমায়ুন কবির লিখেছেন। বইটিতে দেশবিভাগ প্রসঙ্গে জওহরলাল নেহরুর ভূমিকা, সর্দার বল্লভভাই প্যাটেলের মুসলমান সম্প্রদায় বিরোধী কিছু মন্তব্য, বিশেষ করে ১৯৪৭ সালের জুন মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহে দিল্লিতে কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি ও এ আই সি সি-তে ভারতবিভাগ সংক্রান্ত মাউন্টব্যাটেন প্রস্তাব নিয়ে আলোচনাকালে সর্দার বল্লভভাইয়ের কিছু কথা নতুন করে বিতর্ক এনে দিল। তারপর আবার গোদের ওপর বিষফোঁড়ার মতো কমিউনিস্ট মতবাদে বিশ্বাসী ভি কে কৃষ্ণমেনন সম্পর্কে একটি অবিস্মরণীয় মন্তব্য। মৌলানা আজাদের বিতর্কিত মন্তব্যগুলি ছিল এই ঃ—

Lord Mountbatten was extremely intelligent and could read into the minds of all his Indian colleagues. The moment he found Patel amenable to his idea he put out all the charm and power of his personality to win over the Sardar. In his private talk, he always referred to Patel as a walnut—a very hard crust outside but soft pulp once the crust was cracked. Sometimes in a jocular mood he used to tell me that he had spoken to Walnut, and Walnut had agreed with him on every question.

When Sardar Patel was convinced, Lord Mountbatten turned his attention to Jawaharlal. Jawaharlal was not at first ready for the idea and reacted violently against the idea of partition. Lord Mountbatten persisted till Jawaharlal's opposition was worn down step by step. Within a month of Lord Mountbatten's arrival in India, Jawaharlal, the firm opponent of partition had become, if not a supporter at least acquiescent to the idea.

I have often wondered how Jawaharlal was won over by Lord Mountbatten. He is a man of principle but he is also impulsive and very amenable to personal influences. I think one factor responsible for the change was the personality of Lady Mountbatten. She is not only extremely intelligent but has a most attractive and friendly temperament. She admired her husband very greatly and in many cases tried to interpret his thoughts to those who would not at first agree with him.

There was one other person responsible for the change in Jawaharlal. An Indian named Krishna Menon had lived in London since the early twenties. Jawaharlal had met him first in

the late twenties and had found in him one who professed great admiration for Jawaharlal's views. We all like our admirers but perhaps Jawaharlal likes them a little more than others. Sometime later, in the early thirties, the Labour Party sent a delegation to India led by Miss Ellen Wilkinson. Krishna Menon was attached to the delegation and visited India. He had also been taking an interest in the activities of the India League in London. During this period, his contacts were mainly with people who were regarded as communists or fellow-travellers. When Jawaharlal went again to London, Krishna Menon renewed his contacts and reiterated his loyalty for Jawaharlal.

When war broke out, Krishna Menon suggested that he should be provided with funds so that he could carry on propaganda in London on behalf of India. When Hitler attacked Russia, he came in touch with the Soviet Embassy in London. He sent us many messages that he was meeting the Soviet Ambassador as Jawaharlal's personal representative. He sent all kinds of proposals for securing the help of interests friendly to India. He also prepared schemes asking for funds from the Congress. Jawaharlal was impressed by him and requested me to grant some money. I did so and placed the matter before the Working Committee. Gandhiji and Sardar Patel told me frankly that they did not like my action but they would say nothing since I had paid the money in good faith. They however asked me not to make any further payment. They pointed out that Indians in London were sharply divided in their judgement about Krishna Menon. He had some supporters but there was a strong body of opponents who brought all kinds of charges against him. The general impression I got was that his conduct was not above reproach. I could not therefore trust him fully. Later events proved that Gandhiji and Sardar were right in their suspicion of Krishna Menon. He was, to take a charitable view, unreliable and had little concern for the way public funds were spent. Most people took an even worse view and regarded him as downright dishonest.

When the Interim Government was formed, Jawaharlal wanted to appoint Krishna Menon as the High Commissioner in London. Lord Wavell did not agree. The British Government also advised that his appointment would not be appropriate as he was regarded a fellow traveller. Soon after Lord Wavell left, Krishna Menon came to India and stayed with Jawaharlal. Lord Mountbatten immediately perceived that Jawaharlal had a weakness for Krishna Menon and could be influenced by him. Lord Wavell had opposed Krishna Menon's appointment but Lord Mountbatten decided to become his patron and invited him to the Viceroy's House on several occasions. Krishna Menon had communist tendencies but when he saw that Lord Mountbatten was friendly to him and might help him to get a position, he became pro-British overnight. He impressed Lord Mountbatten with his friendly feelings for the British. Lord Mountbatten felt that Krishna Menon would be useful in persuading Jawaharlal to accept his scheme of partition of India. It is my belief that Krishna Menon did influence Jawaharlal's mind on this question. I was not surprised when some time later I learnt that Lord Mountbatten offered to support Jawaharlal if he wanted to appoint Krishna Menon as the High Commissioner in London.'

When I became aware that Lord Mountbatten was thinking in terms of dividing India and had persuaded Jawaharlal and Patel, I was deeply distressed. I realised that the country was moving towards a great danger. Partition of India would be harmful not only to Muslims but to the whole country. I was and am still convinced that the Cabinet Mission Plan was the best solution from every point of view. It preserved the unity of India and gave every community an opportunity to function with freedom and honour. Even from the communal point of view, Muslims could expect nothing better. They would have complete internal autonomy in provinces in which they were in a majority. Even in the Centre they would have more than adequate representation. So long as there were communal jealousies and doubts, their position would be adequately safeguarded. I was also convinced that if the Constitution for free India was framed on this basis and worked honestly for some time, communal doubts and

misgivings would soon disappear. The real problems of the country were economic, not communal. The differences related to classes, not to groups. Once the country became free, Hindus, Muslims and Sikhs would all realise the real nature of the problems that faced them and communal differences would be resolved.

মৌলানার ওই গ্রন্থের ১৯৮ থেকে ২৪৮ পৃষ্ঠার মধ্যে এক স্থানে তিনি কমিউনিস্ট কৃষ্ণমেনন সম্বন্ধে আর একটি কথা বলেছেন তার বাংলা তর্জমা হল এই—'আমি ও বল্লভভাই প্যাটেল আমাদের সমগ্র রাজনৈতিক জীবনে কোনও বিষয়েই কখনওই একমত পোষণ করিনি। কিন্তু এর ব্যতিক্রম ছিল মাত্র একটি ক্ষেত্রে এবং সেটি হল ভি কে কৃষ্ণ মেনন। সেটি ছিল জওহরলালের ওপর কৃষ্ণমেননের কুপ্রভাব (evil influence)। এই একটিমাত্র বিষয়ে আমি ও বল্লভভাই একমত ছিলাম।'

মৌলানা আজাদের মৃত্যুর এগারো মাস পরে (জানুয়ারি ১৯৫৯) ORIENT LONGMANS ১৯৫৯ সালের জানুয়ারি মাসে পুস্তকটি (India Wins Freedom) প্রকাশ করল। ভারতীয় রাজনীতির মৌচাকে এক মস্ত বড় ঢিল এসে পড়ল। তখন দেশবিভাগের মাত্র দশ-এগারো বছর অতিক্রান্ত। দেশবিভাগের প্রক্রিয়ার সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে জড়িত এবং Partition Council-এর অংশীদারদের মধ্যে তখন কংগ্রেসের তরফে জীবিত ছিলেন জওহরলাল নেহরু ও আচার্য কৃপালনি (সেই সময় তিনি পি এস পি পার্টির চেয়ারম্যান)। পাকিস্তানে অবশ্য জিন্না ও লিয়াকৎ আলিকে বাদ দিলে আর সকল নেতা যেমন আবদুর রব নিশতার, শাহিদ সুরাবর্দি, চৌধুরী খালিকুজ্জামান, রাজা গজনার আলি খান, মমতাজ দৌলতানা ও আয়ুব খুরো জীবিত। যাহোক মৌলানা আজাদের গ্রন্থটি উপমহাদেশে প্রচণ্ড বিস্ফোরণ ঘটাল। বিতর্কের প্রধান কেন্দ্রবিন্দু ছিলেন জওহরলাল এবং অনিবার্যভাবে পার্শ্বচরিত্রে এসে গেলেন অধ্যাপক হুমায়ুন কবির। কারণ বইটির শ্রুতিলিখনের দায়িত্বে ছিলেন তিনি। বইটি প্রকাশের পর জওহরলালকে প্রথম জবাবদিহি করতে হয়েছিল তাঁর মাসিক সাংবাদিক সম্মেলনে। তারপর কংগ্রেস পরিষদীয় দলে এবং অবশেষে ভারতীয় পার্লামেন্টে। লোকসভায় ওই বইটি নিয়ে দু'দিন ধরে বিতর্ক হয়েছিল। পার্লামেন্টের ইতিহাসে আর কোনও বই নিয়ে এমন বিতর্ক হয়নি। এই বিতর্কগুলিতে জওহরলাল তাঁর শেষ জীবনে আর একবার তাঁর অসাধারণ উদারতা ও মহত্ত্বের পরিচয় রেখেছিলেন। তিনি একটিবারও মৌলানা আজাদকে কটাক্ষ করেননি। ১৯৩০-৩১ সাল থেকে ১৯৪৭ সাল পর্যন্ত ঘটে যাওয়া যে সব ঘটনার উল্লেখ মৌলানা করেছেন সেগুলিকে জওহরলাল 'মৌলানার ঘটনাপ্রবাহের ওপর নিজস্ব বিশ্লেষণ এবং যার মধ্য দিয়ে আজাদের প্রদীপ্ত প্রজ্ঞার (luminus intellect) বিচ্ছুরণ ঘটেছে। ইতিহাসের স্রোতকে আমরা রোধ করতে পারি না। ইতিহাসের ঘটনাপ্রবাহ আমাদের ভাসিয়ে নিয়ে যায়। কিন্তু মৌলানা আজাদ এমনই একজন মানুষ এমনই নেতা যিনি ইতিহাসের তীব্র স্রোতের মুখে দাঁড়িয়ে তার গতিপথ পরিবর্তন করতে চেয়েছিলেন।' কংগ্রেস পরিষদীয় দলের সভায় ও লোকসভায় বিতর্কে কৃষ্ণমেননপন্থী কয়েকজন এম পি বিশেষ করে কেশব দত্ত মালব্য (কে ডি মালব্য) জওহরলালের কাছে জানতে চেয়েছিলেন যে মৌলানা আজাদের বয়ান বলে গ্রন্থটিতে যে সব কথা আছে, সেগুলি কি সবই আজাদসাহেবের? সেগুলির মধ্যে হুমায়ুন কবিরের নিজের কথা আছে কি না তা যাচাই করা হয়েছে কি? সে সময়কার খবরের কাগজগুলোতে তখন এমন রিপোর্ট বেরিয়েছিল ...Prime Minister Nehru warned those members not to advance such preposterous suggestion। এতে জওহরলাল পরিষ্কার বুঝিয়ে দিয়েছেন যে হুমায়ুন কবিরের ওপর তাঁর আস্থা ও বিশ্বাস কতখানি। কংগ্রেস পরিষদীয় দলের সভায় জওহরলাল জিদ করে বলেছিলেন '...এমন অনেক দিন হয়েছে আমি কোনও সন্ধ্যায় মৌলানার বাড়ি গিয়েছি। তিনি তখন হুমায়ুনকে ডিকটেশন দিচ্ছেন। আমার সামনেই কখনও কখনও ডিকটেশন চলত। মৌলানার মৃত্যুর পর হুমায়ুন ওই ডিকটেশনের ইংরাজি তর্জমা চূড়ান্ত করে আমাকে শুনিয়েছে। আমার সম্বন্ধে মৌলানার মন্তব্য এবং আরও কয়েকটি ক্ষেত্রে মৌলানার বয়ানে যা রয়েছে সেগুলি মূল গ্রন্থে থাকবে কি না তা চিহ্নিত করে হুমায়ুন আমার মতামত জানতে চেয়েছিল। আমি হুমায়ুনকে বারংবার একথা বলেছি যে মৌলানা আজাদ যা যা বলেছেন তা অক্ষরে অক্ষরে প্রকাশিত হোক এটাই আমি চাই।' মৌলানা আজাদের India Wins Freedom প্রকাশের পর ভারতীয় উপমহাদেশের আরও দু'জন স্মরণীয় ব্যক্তিত্ব নিখিল ভারত মুসলিম লিগের চৌধুরী খালিকুজ্জামান ও সীমান্ত গান্ধী খান আবদুল গফফর খান ওই সময়কার ঘটনাবলির ওপর নতুন আলোকপাত করেছেন। খালিকুজ্জমান তাঁর গ্রন্থে (Pathway to Pakistan) বেশ কয়েকটি ক্ষেত্রে মৌলানা আজাদের চেয়ে জওহরলাল নেহরুর বয়ানের সঙ্গে সহমত পোষণ করেছেন। গান্ধীজির সেক্রেটারি প্যারেলাল ১৯৬৪ সালে আফগানিস্তানের জালালবাগে গিয়ে সীমান্ত গান্ধী খান আবদুল গফফর খানের বয়ানে শ্রুতিলিখন নিয়ে একটি গ্রন্থ প্রকাশ করেন। বইটির

নাম 'Thrown to the Wolves' এই বইটিতে মৌলানা আজাদের গ্রন্থের কোনও কোনও অংশের বিরূপ সমালোচনা করেছেন সীমান্ত গান্ধী।

হুমায়ুন কবিরের বাংলা গদ্যরচনার সঙ্গে পরিচিত লোকেরা এখনও বাংলার সাহিত্যজগৎ থেকে একেবারে অপসৃত হননি। কিন্তু বাংলা অনুবাদে তিনি যে কতখানি দক্ষ ছিলেন তার নিদর্শন রয়েছে ১৯৫৫/৫৬ সালে "চতুরঙ্গ"-এর পৃষ্ঠায় Fabian Essays নামক রাজনৈতিক রচনাবলির বাংলা অনুবাদশৈলীতে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের আগে থেকে ব্রিটেনের কয়েকজন সমাজবাদী চিন্তানায়ক Lord Brailsford, Prof. Laski, Bivan, Richard Crossman কমিউনিজম ও মার্কসবাদের প্রতি আকর্ষণ অনুভব করছিলেন। কিন্তু জয়প্রকাশ নারায়ণ ওই চিন্তানায়কদের প্রতি গান্ধীবাদের চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দিয়েছিলেন। ওইসব লেখাগুলির বাংলা অনুবাদ করেছিলেন হুমায়ুন কবির। ওইরকম প্রাঞ্জল জোরালো অনুবাদশৈলী ও বাংলা শব্দচয়ন খুব বেশি মানুষের কলম থেকে নিঃসৃত হতে পারেনি। মৌলানা আজাদের উর্দু ডিকটেশন থেকে তিনি ইংরাজিতে অনুবাদ করেছেন। সেক্ষেত্রে এর যথেষ্ট সীমাবদ্ধতা ছিল উর্দুর সঠিক ইংরাজি প্রতিশব্দ ব্যবহার করার ক্ষেত্রে। কিন্তু তাঁর নিজের স্বাধীন ইংরাজি লেখায় তিনি যে কতটা স্টাইলিশ ও কতটা সাবলীল ছিলেন তার প্রমাণ India Wins Freedom গ্রন্থটির ভূমিকায়। তাঁর লেখা এই পুরো ভূমিকাটি আমি তুলে ধরছি বর্তমান প্রজন্মের বাঙালিদের জন্য যাঁরা অধ্যাপক হুমায়ুন কবিরকে দেখেননি।—

Preface to the 1959 Edition

When a little over two years ago I approached Maulana Azad with the request that he should write his autobiography, I never for a moment thought that it would be my melancholy duty to write a preface for the volume. He did not like to talk about his personal life and was at first reluctant to undertake the work. It was with great difficult that he could be persuaded that, as one of the principal actors in the transfer of power from British to Indian hands, he owed a duty to posterity to record his reading of those memorable times. His reluctance was also partly due to his shattered health. He felt that he needed all his energies to cope with the burden of work imposed on him by inescapable political and administrative tasks. He finally agreed on my assuring him that I would do my best to relieve him of the actual burden of writing. This would of course mean that the Indian people would be denied the privilege of reading his autobiography in his own words. Indian literature in general and Urdu in particular would be the poorer for this, but even a version in English written under his direction would be better than no record at all.

I think it necessary to describe in some detail how the work has been composed. During these last two years or so, I spent on an average an hour or more every evening with Maulana Azad, except on those occasions when I had to go out of Delhi. He was a wonderful conversationalist and used to describe his experience in vivid terms. I made fairly copious notes and also asked questions for clarification of a point or elicitation of further information. He consistently refused to speak on personal matters, but on all questions relating to public affairs, he spoke with the utmost frankness and sincerity. When I had collected sufficient material for a chapter, I prepared a draft in English which I handed over to him at the earliest opportunity. He read each chapter by himself and then we went over it together. At this stage, he made many amendments by addition and alteration, as well as by omission. We proceeded in this way till I was able to give him the first draft of the completed book in September 1957.

When he had the completed text in his hands, Maulana Azad decided that some thirty pages of the text dealing with incidents and reflections mainly of a personal character should not be published for the present. He directed that a copy each of the complete text should be deposited under sealed cover in the National Library, Calcutta, and the National Archives, New Delhi. He was, however, anxious that the exclusion of these passages should not in any way alter either the outline of his picture or his general findings. I carried out the changes according to his instructions and was able to present to Maulana Azad the revised and abridged draft towards the end of November 1957.

He went through it once again during the period when I was away in Australia. After my return we went through the manuscript chapter by chapter and indeed sentence by sentence. He

made some minor alterations, but there was no major change. In some cases, a chapter was thus revised three or four times. On Republic Day this year, Maulana Azad said that he was satisfied with the manuscript and it could now be sent to the printers. The book as now released represents the text as finally approved by him.

It was Maulana Azad's wish that the book should appear in November 1958 to synchronise with his seventieth birthday. Fate however willed otherwise and he will not be with us to see the book when it appears.

As I have already stated, Maulana Azad was not in the beginning very willing to undertake the preparation of this book. As the book progressed his interest grew. In the last six months or so, he rarely missed an evening for the preparation of the manuscript. He was extremely reticent about his personal life, but in the end he volunteered to write a first volume which would have covered the earlier phases of his life and brought the story up to 1937. He did in fact approve a synopsis which, according to his own wishes, is included in this volume as its first chapter. He had also intended to write a third volume to deal with events since 1948. Unfortunately for us, these volumes will now never be written.

The work in connection with this book has been for me a labour of love and I shall feel happy if it helps in forwarding an object that was very dear to Maulana Azad's heart. This is the promotion of greater understanding among the different Indian communities as a first step towards greater understanding among peoples of the world. He also wished that the people of India and Pakistan should look upon one another as friends and neighbours. He regarded the Indian Council for Cultural Relations as an instrument for the achievement of this object and in his Presidential Address to the Council—his last prepared and printed speech—he made a fervent appeal for the strengthening of the bonds of understanding and sympathy between the people of these two States which till only a decade ago had been one undivided country. I feel that there can be no better use of any income derived from this book than to make it available to the Council for promoting better understanding among the different communities which live in India and Pakistan. Apart from a share to be paid to his nearest surviving relatives, royalties from this book will therefore go to the Council for the annual award of two prizes for the best essay on Islam by a non-Muslim and on Hinduism by a Muslim citizen of India or Pakistan. In view of Maulana Azad's great love and consideration for the young, the competition will be restricted to persons of thirty or below on 22 February in any year.

Before I conclude, I wish to make one other thing perfectly clear. There are opinions and judgements in this book with which I do not agree, but since my function was only to record Maulana Azad's findings, it would have been highly improper to let my views colour the narrative. When he was alive, I often expressed my differences to him, and with the open-mindedness which was so strong an element in his nature, he has at times modified his views to meet my criticisms. At other times, he smiled in his characteristic way and said, 'These are my views and surely I have the right to express them as I will.' Now that he is no more, his views must stand in the form in which he left them.

It is difficult for any man to reflect with complete accuracy the views and opinions of another. Even when both use the same language, the change of one word may alter the emphasis and bring about a subtle difference in the shade of meaning. The difference in the genius of Urdu and English makes the task of interpreting Maulana Azad's thoughts still more difficult. Urdu like all other Indian languages is rich, colourful and vigorous. English, on the other hand, is essentially a language of understatement. And when the speaker is a master of Urdu like Maulana Azad, the plight of the writer who seeks to express his thoughts in English can easily be imagined. In spite of these difficulties, I have tried to reflect as faithfully as I could the views of Maulana Azad, and I regard myself as richly rewarded by the fact that the text had met with his approval.

New Delhi,
15 March 1958

HUMAYUN KABIR

১৯৪৭ থেকে ১৯৫৭—এই দশ বছর কবিরসাহেব একটানা সিভিল সার্ভেন্ট অর্থাৎ অফিসার হিসাবে কাজ করার পর ১৯৫৭ সালের নির্বাচনের পরে কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভায় তিনটি নতুন বাঙালি মুখ দেখা গেল, তাঁরা হলেন অশোক সেন, অরুণ গুহ ও অধ্যাপক হুমায়ুন কবির। তিনি তৎকালীন কংগ্রেস সংগঠনের Heavy weight নেতা এস কে পাতিলের দফতরে রাষ্ট্রমন্ত্রী হলেন। দু'-তিনটি দফতর পাতিলের অধীনে ছিল এর মধ্যে অসামরিক পরিবহন ছিল একটি। হুমায়ুন কবির এই দফতরটির সঙ্গে প্রথম মন্ত্রীজীবন কাটিয়েছেন। ১৯৬০ সালের কোনও এক সময়ে তিনি সংস্কৃতি দফতরের ভার পান। রবীন্দ্রনাথের আসন্ন জন্মশতবর্ষ (১৯৬১) উপলক্ষে জওহরলাল নেহরুর সভাপতিত্বে যে জাতীয় কমিটি গঠিত হয়েছিল, তিনি ছিলেন ওই কমিটির সম্পাদক ও আহ্বায়ক। দেশে ও বিদেশে ভারত সরকারের উদ্যোগে রবীন্দ্র জন্মশতবর্ষ কীভাবে পালন করা হবে, তার সমগ্র খসড়া কবিরসাহেব রচনা করেছিলেন। আমার সঙ্গে কবিরসাহেবের পরিচয় ও ঘনিষ্ঠতার সূত্রপাত ওই সময় অর্থাৎ ১৯৬০ সাল থেকে। আমি ওইসময় "জনসেবক" কাগজ থেকে "যুগান্তর" পত্রিকার Airport Reporter হিসাবে নিযুক্ত হই।

তখন দমদম বিমানঘাঁটিতে মন্ত্রী কবিরসাহেবের সঙ্গে আমার সপ্তাহে অন্তত দু'দিন করে দেখা হত। বাংলা ও ইংরাজি ভাষা সম্পর্কে কবিরসাহেবের দক্ষতা কতখানি সে পরিচয় আমার আগেই কতকটা হয়েছিল। কিন্তু তিনি যে আর একটি আন্তর্জাতিক ভাষা তাঁর মাতৃভাষার মতোই শিখেছিলেন, সেই পরিচয় ১৯৬১ সালের গোড়ার দিকে দমদম বিমানঘাঁটিতে বসে পাই। ইন্দো-চীনে ফরাসি উপনিবেশের অবসানের পর ওই অঞ্চলে লাওস (Laos) নামে একটি ক্ষুদ্র দেশের স্বাধীন আত্মপ্রকাশ ঘটে। সেই সময় অর্থাৎ ১৯৫৪-৫৫ সালে রাষ্ট্রসংঘের প্রস্তাব অনুযায়ী লাওসের জন্য একটি International Control Commission গঠিত হয়েছিল এবং ভারতীয় কূটনীতিবিদ আই সি এস সমর সেন ওই কমিশনের চেয়ারম্যান হয়েছিলেন। কমিশনের একজন সদস্য ছিলেন লাওস সম্রাটের এক পুত্র। ওই লাওস সম্রাটের বিবাহিত স্ত্রী ও রক্ষিতাদের সংখ্যা ছিল অর্ধ-শতাধিকের মতো। তাঁর বিবাহিত স্ত্রীদের গর্ভজাত পুরুষ সন্তানদের 'প্রিন্স' ও মেয়ে সন্তানদের 'প্রিন্সেস' খেতাব ছিল। ওই কন্ট্রোল কমিশনে সম্রাটের এক 'প্রিন্স' পুত্র প্রতিনিধিত্ব করতেন। তিনি মাসে বার দু'য়েক করে দিল্লি আসতেন। ভদ্রলোক বেশ সুন্দর দেখতে ও বুদ্ধিমান। ভাঙা ভাঙা ইংরাজি বলতে পারতেন। আমাদের রিপোর্টারদের কাজ ওতেই চলে যেত। সেই সময়ে প্রাচ্যের ওইসব অঞ্চলের লোকদের দিল্লি যেতে হলে দমদম বিমানঘাঁটিতে অন্ততপক্ষে দু'ঘণ্টার জন্য যাত্রা বিরতি করতে হত। ওইরকম একটা দিনে বিমানঘাঁটিতে ভি আই পি রুমে কন্ট্রোল কমিশনের ব্যাপার নিয়ে লাওস 'প্রিন্সে'র সঙ্গে ভাষার ধস্তাধস্তি চালাচ্ছি, সেই সময় কবিরসাহেব দিল্লির সন্ধ্যার বিমান ধরতে ওই রুমে প্রবেশ করলেন। আমাদের কাজ শেষ হওয়ার পর হুমায়ুন কবির আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, 'লোকটা কে'? আমি 'প্রিন্সে'র পরিচয় দিলাম। তিনি তৎক্ষণাৎ আমাকে বললেন, 'তাহলে তো লোকটা নির্ঘাৎ ফরাসিতে লেখাপড়া করেছে। আমার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দাও তো।' কবিরসাহেব সোফা থেকে উঠে এলেন। আমি কবিরসাহেবকে 'প্রিন্সে'র সামনে দাঁড় করিয়ে পরিচয় করিয়ে দিলাম। 'ভারত সরকারের মন্ত্রী' কবিরসাহেবের এই পরিচয় পেয়ে 'প্রিন্স' তাঁর আসন ছেড়ে উঠে কবিরসাহেবের দিকে হাত বাড়িয়ে দিলেন। অধ্যাপক কবির তারপর যে ভাষায় 'প্রিন্স'কে সম্বোধন করলেন, তা শুনে 'প্রিন্স' আনন্দে উদ্বেলিত। তখন দু'জনে পাশাপাশি বসে ফরাসি ভাষায় কথা বলতে লাগলেন। পরে ওই 'প্রিন্সে'র সঙ্গে কবিরসাহেবের বন্ধুত্ব হয়ে গিয়েছিল এবং তিনি লাওসে ব্যক্তিগতভাবে আমন্ত্রিত হয়েছিলেন।

রবীন্দ্র জন্মশতবর্ষ উপলক্ষে ১৯৬১ সালের এপ্রিল মাস থেকে কবিরসাহেব খুব ব্যস্ত ছিলেন। ওই ব্যস্ততার মধ্যেও তিনি মে মাসের গোড়ায় একদিন সন্ধ্যায় দমদম বিমানঘাঁটিতে একটু বিরক্তি প্রকাশ করে আমাকে বললেন, 'বাড়িতে ফোন নাওনি কেন?' এই বলেই গলা নিচু করে আমাকে জানালেন যে আলবার্তো মোরাভিয়া (Alberto Moravia) কলকাতায়। আমি আকাশ থেকে পড়ে প্রশ্ন করলাম, 'কী করে এল! by Air তো আসেনি?' কবিরসাহেব জানালেন, রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে আন্তর্জাতিক সেমিনারে বক্তৃতা করার জন্য তিনি মোরাভিয়াকে আমন্ত্রণ করে আনিয়েছেন। মোরাভিয়া ভারতের গরিব লোকদের জীবনযাত্রা বুঝতে চান। তাই তিনি বোম্বাই থেকে মোটর গাড়িতে করে মোরাভিয়াকে কলকাতায় আনার ব্যবস্থা করে দিয়েছেন। আমাকে বললেন, 'ওকে ইন্টারভিউ করে একটা ভাল রিপোর্ট লিখো। Grand Hotel-এ উঠেছে।' ওই রাতেই হোটেলে গিয়ে মোরাভিয়ার রুম নম্বর জেনে নিলাম। কিন্তু ওঁকে পেলাম না। খবর পেলাম রাতের কলকাতার জীবন দেখে নিতে বেরিয়েছেন আলবার্তো মোরাভিয়া। পরের দিন সকাল ন'টায় গিয়ে হাজির হলাম হোটেলে। কিন্তু তিনি নেই। হোটেলের Reception-এর লোকেরা আমার পরিচয় পেয়ে বেশ খাতির করলেন। দীর্ঘ ছয় ঘণ্টা অপেক্ষা করার পর যুদ্ধোত্তর ইউরোপীয় সাহিত্যের এই অসাধারণ ব্যক্তিত্বের মুখোমুখি হয়েছিলাম। আমি

মোরাভিয়ার exclusive interview পেয়েছিলাম। সেটি 'যুগান্তর' পত্রিকায় ছাপা হয়েছিল। এই বিষয়ে আমি বিশদে কিছু এখানে বলছি না। কারণ মোরাভিয়াকে নিয়ে আমার আলাদা একটা লেখার ইচ্ছা আছে। তবে এই সাক্ষাৎকারটি সম্ভব হয়েছিল আমার প্রতি কবিরসাহেবের বিশ্বাস ও ভালবাসার জন্যই। ওই সময় তিনি আমাকে আর একটি খবর দিয়েছিলেন। সেটি কবি জসিমউদ্দিন সম্পর্কে। জসিমউদ্দিনও রবীন্দ্রনাথের জন্মশতবর্ষে দিল্লির জাতীয় অনুষ্ঠানে অতিথি হিসাবে এসেছিলেন। কিন্তু ঢাকায় ফেরার পথে কলকাতায় পৌঁছে তিনি সামান্য হৃদরোগে আক্রান্ত হয়েছিলেন। কবিরসাহেব তাঁকে পি জি হাসপাতালে ভর্তি করে আমাকে খবরটি দিয়েছিলেন। আমি হাসপাতালে জসিমউদ্দিনকে দেখতে গেলাম। জসিমউদ্দিন খুব খুশি হয়ে বলেছিলেন, 'তুমিই আমারে প্রথম দেখতে আইলা।' পরের দিন 'যুগান্তর' পত্রিকায় "কলকাতায় জসিমউদ্দিন অসুস্থ"— এই খবরটি বের হতে তাঁকে দেখতে হাসপাতালে খুব ভিড় হয়েছিল।

জওহরলাল নেহরু অধ্যাপক হুমায়ুন কবিরকে কতখানি বিশ্বাস করতেন, তা ১৯৫৯ সালে মৌলানা আজাদের India Wins Freedom গ্রন্থটি নিয়ে পার্লামেন্টে ও কংগ্রেস পরিষদীয় দলের বিতর্ককালে প্রমাণিত হয়েছে। সেটা আর একবার নেহরু প্রমাণ করিয়ে দিলেন ১৯৬৪ সালের জানুয়ারি মাসে কলকাতার দাঙ্গার সময়। ওই সময় শ্রীনগরে 'হজরতবল' মসজিদ থেকে পবিত্র কেশ পাত্রটি অপহৃত হওয়ার ঘটনাকে কেন্দ্র করে পূর্বপাকিস্তানে ভয়াবহ হিন্দু বিরোধী দাঙ্গা শুরু হলে তার প্রতিক্রিয়ায় পশ্চিমবঙ্গের কয়েকটি সীমান্তবর্তী জেলায় ও কলকাতা শহরে মুসলমান বিরোধী পালটা দাঙ্গা আরম্ভ হয়। সে সময় ভুবনেশ্বরে জাতীয় কংগ্রেসের পূর্ণাঙ্গ অধিবেশন চলছিল। ওই অধিবেশনেই জওহরলাল অসুস্থ হয়ে পড়েন। কিন্তু ওই অবস্থাতেই তিনি পশ্চিম বাংলার মুখ্যমন্ত্রী প্রফুল্লচন্দ্র সেন ও অন্যান্য কংগ্রেস নেতাদের দ্রুত রাজ্যে ফিরে যেতে বলেন এবং নির্দিষ্ট সময়ের একদিন আগে কংগ্রেস অধিবেশন শেষ করে দেন। কিন্তু ১০-১১ জানুয়ারি থেকে কলকাতার অবস্থার অবনতি ঘটলে উদ্বিগ্ন নেহরু স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী গুলজারিলাল নন্দ ও মন্ত্রী অধ্যাপক হুমায়ুন কবিরকে কলকাতা পাঠিয়ে দেন। ওই সময় কলকাতা পুলিশের সাংগঠনিক দুর্বলতার প্রমাণ পাওয়া গেল। সেটা ছিল তখনকার পুলিশ কমিশনারের নেতৃত্বের প্রতি অধিকাংশ ডেপুটি-কমিশনারের আস্থাবোধের অভাব। ফলে আইনশৃঙ্খলার দ্রুত অবনতি ঘটে এবং কলকাতার সবকয়টি থানা সামরিক বাহিনীর হাতে তুলে দিতে হয়। ১৯৬৪ সালের ১২-১৩ জানুয়ারি মধ্যরাতে মুখ্যমন্ত্রী প্রফুল্ল চন্দ্র সেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী নন্দ ও হুমায়ুন কবিরের সঙ্গে দীর্ঘ বৈঠক করে কলকাতা পুলিশের পরিবর্তন ঘটান। কবিরসাহেবের সুপারিশে সেই সময়কার কলকাতা পুলিশ সম্পর্কে সবচেয়ে অভিজ্ঞ অফিসার প্রণব কুমার সেনকে (পি কে সেন) পশ্চিমবাংলা পুলিশের পদ থেকে সরিয়ে কলকাতার পুলিশ কমিশনারের পদে নিযুক্ত করা হয়েছিল। কলকাতার অবস্থা নিয়ন্ত্রণে ফিরে আসা পর্যন্ত মুখ্যমন্ত্রী প্রফুল্লচন্দ্র সেন কবিরসাহেবের সঙ্গে নিয়মিত পরামর্শ করতেন।

অধ্যাপক হুমায়ুন কবির তাঁর বৈচিত্রপূর্ণ রাজনৈতিক জীবনে ফজলুল হক, জওহরলাল নেহরু ও মৌলানা আজাদকে বাদ দিলে আর যে রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বের প্রতি আকৃষ্ট ও অনুগত ছিলেন তিনি হলেন মোরারজি দেশাই। ইন্দিরা গান্ধীর প্রথম মন্ত্রিসভায় স্থান না পাওয়ার এটা একটা অন্যতম কারণ ছিল। অবশ্য এইসঙ্গে তাঁর প্রকাশ্য অতুল্য ঘোষ বিরোধিতাও কাজ করেছিল। ১৯৫৭ সাল থেকে একটানা ১৯৬৫ সাল পর্যন্ত কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভায় কাজ করার পর কবিরসাহেবের সঙ্গে আর যিনি বাদ পড়েছিলেন তিনি অশোক সেন। ১৯৬৫ সালের শেষে পশ্চিমবঙ্গ প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি হিসাবে যখন অজয় মুখার্জিকে কংগ্রেস থেকে বহিষ্কার করা হয়েছিল, তখন কবিরসাহেব কেন্দ্রীয় মন্ত্রী হিসাবেই ওই বহিষ্কার প্রস্তাবের বিরুদ্ধে ভোট দিয়েছিলেন। ফলে অতুল্য ঘোষের ক্রোধ তাঁর প্রতি তীব্রতর হয়। কিন্তু অতুল্য ঘোষ তাঁকে বহিষ্কার করতে পারেননি যেহেতু তিনি কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভার সদস্য ছিলেন। কিন্তু ১৯৬৬ সালের জানুয়ারিতেই তিনি কংগ্রেস ছেড়ে দিয়ে 'বাংলা কংগ্রেস'-এ যোগ দিয়ে এই সংগঠনকে কংগ্রেসের একটি বিকল্প রাজনৈতিক শক্তি হিসাবে সংগঠিত করলেন। কেবল তাই নয়, তিনিই প্রথম প্রমাণ করেছিলেন যে কংগ্রেসের ভোট বাক্স থেকে মুসলমান ভোটের ৬০-৭০ ভাগ যে রাজনৈতিক দল কেটে নিতে পারবে, সেই দলই রাইটার্স বিল্ডিংস দখল করবে কিংবা রাইটার্স বিল্ডিংয়ের প্রধান প্রহরী হিসাবে কাজ করবে। ১৯৬৭ সালের রাজ্যের নির্বাচনে তিনি চব্বিশ পরগণা, নদিয়া, মুর্শিদাবাদ জেলার প্রায় ৮০ শতাংশ মুসলমান ভোট বাংলা কংগ্রেসের বাক্সে ভরতে পেরেছিলেন। এজন্যই তিনি কংগ্রেস বিরোধী সর্বভারতীয় রাজনীতিতে একটা বড় জায়গা পেয়েছিলেন। কিন্তু ১৯৬৭ সালের মাঝামাঝি সময় থেকে তরাই প্রান্তরে নকশালবাড়ি আন্দোলনের তীব্রতার মুখে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী হিসাবে অজয় মুখার্জির কমিউনিস্টদের কাছে আত্মসমর্পণ তাঁকে ক্রুদ্ধ করে তুলল। অধ্যাপক হুমায়ুন কবির, ড. প্রফুল্ল চন্দ্র ঘোষ ও নিশীথনাথ

কুণ্ডু এই তিন অকমিউনিস্ট বর্ষীয়ান নেতার বারংবার অনুরোধ সত্ত্বেও অজয়বাবু কমিউনিস্টদের বেষ্টনী থেকে বেরিয়ে আসতে পারলেন না। এমনকী ১৯৬৭-এর ২ অক্টোবর তারিখে পদত্যাগ করার যে রফাসূত্র 'বাংলা কংগ্রেসের' বৈঠকে স্থির হয়েছিল, তাও অজয় মুখার্জি শেষ মুহূর্তে বানচাল করে দিলেন। ফলে কবিরসাহেব প্রায় এক-তৃতীয়াংশ 'বাংলা কংগ্রেস' এম এল এ-দের নিয়ে দলে বিদ্রোহ ঘটালেন। পরিণতিতে অজয় মুখার্জি সংখ্যাগরিষ্ঠতা হারালেন এবং শেষ পর্যন্ত রাজ্যপাল ধর্মবীর নভেম্বরে (১৯৬৭) অজয়বাবুকে বরখাস্ত করলেন।

ড. প্রফুল্ল চন্দ্র ঘোষ নতুন মুখ্যমন্ত্রী হলেন। যে-সন্ধ্যায় রাজ্যপাল ধর্মবীর ড. ঘোষকে শপথ গ্রহণ করালেন, তখন রাজ্যপাল ও ড. প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষের মাঝখানে কবিরসাহেব দাঁড়িয়েছিলেন। পরের দিন এই ছবি সারা ভারতবর্ষের খবরের কাগজে প্রকাশিত হয়েছিল। বামপন্থীরা বিশেষ করে কমিউনিস্টরা তাঁদের যাবতীয় আক্রোশ হুমায়ুন কবির ও ড. প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষের ওপর উজাড় করে দিল। কলকাতার রাস্তায় রাস্তায় শ্লোগান উঠল 'হুমায়ুন কবির প্রফুল্ল ঘোষকে চিনে নিন—এই মাটিতে কবর দিন...' ১৯৬৭ সালের ডিসেম্বরের শেষভাগে বসিরহাট ও হাসনাবাদের মাঝখানে স্বাস্থ্যমন্ত্রী ড. আমির আলি মোল্লার গ্রামের এক জনসভায় মুখ্যমন্ত্রী ড. প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ ও অধ্যাপক হুমায়ুন কবির বক্তৃতা দিতে গিয়েছিলেন। "যুগান্তর" পত্রিকায় ওই জনসভার রিপোর্ট করার দায়িত্ব আমার ওপর পড়েছিল। আমি ফোটোগ্রাফার ও অমৃতবাজার পত্রিকার আর একজন রিপোর্টারসহ সেখানে গিয়েছিলাম আমাদের নিজস্ব গাড়িতে। সভা শেষ হওয়ার পর কলকাতার পথে রওনা দেওয়ার মুখে গোয়েন্দা রিপোর্ট এল—বসিরহাট শহরের সরু রাস্তায় কোনও একস্থানে হুমায়ুন কবির ও প্রফুল্ল ঘোষকে আক্রমণ করা হবে। পুলিশ সিদ্ধান্ত নিল যে গাড়ির কনভয় শহরের রাস্তায় না ঢুকিয়ে বাইরের এক বড় আমবাগানের মধ্য দিয়ে ঘুরিয়ে নেবে। আমাদের গাড়ির সামনের গাড়িতে কবিরসাহেব, এর আগের গাড়িতে মুখ্যমন্ত্রী ড. ঘোষ। বাগানের রাস্তা শেষ হওয়ার মুখে কনভয় আক্রান্ত হল প্রবল পাথর নিক্ষেপের মধ্য দিয়ে। মুখ্যমন্ত্রীর পুলিশ এসকর্ট (escort) জিপ থেকে গুলি বর্ষণের শব্দ পেলাম। রাত সাতটা-সাড়ে সাতটা। একটা বড় পাথরের খণ্ড আমাদের গাড়ির কাঁচ ভেঙে ফোটোগ্রাফারের মুখে আঘাত করল। ওর বাঁধানো দাঁতের দুটো পাটি ভেঙে গেল। আমি ওই অবস্থার মধ্যে আমাদের গাড়ির হেডলাইটে দেখতে পেয়েছি যে আগের গাড়িটি, যে গাড়িতে কবিরসাহেব আছেন তার ওপর অফুরন্ত পাথর বর্ষিত হয়েছে। আমাদের ফটোগ্রাফারের মুখ দিয়ে খুব রক্ত পড়ছিল দেখে আমি গাড়ি নিয়ে বারাসত হাসপাতালে যাব স্থির করেছি। কিন্তু বারাসত হাসপাতালের মুখে পুলিশের ওয়ারলেস গাড়ি আমাদের আটকে দিয়ে আমার নাম করে জানতে চাইল আমি এই গাড়িতেই আছি কি না। রাত দশটা নাগাদ "যুগান্তর" অফিসে পৌঁছে শুনলাম কবিরসাহেবের নাকের নীচে এবং থুতনিতে সাংঘাতিক আঘাত লেগেছে। তাঁকে পি জি হাসপাতালে চিকিৎসা করা হচ্ছে। তবে মুখ্যমন্ত্রী ড. ঘোষের আঘাত লাগেনি। আমি যখন রিপোর্ট লিখছি, তখন ড. প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ ফিরে ফোনে আমার সঙ্গে কথা বললেন। কিছুক্ষণ পরেই জাহাঙ্গির কবির ফোন করে আমাকে বললেন, 'মেজদা খুব উদ্বিগ্ন তোমার কোনও আঘাত লেগেছে কি?' (মেজদা অর্থাৎ হুমায়ুন কবির।)

হুমায়ুন কবির হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে যে বাঙালি যুগের প্রতিনিধিত্ব করতেন সেই যুগ আজ অপসৃত। তিনি যে দুটি বাঙালি প্রজন্মের প্রতিনিধিত্ব করতেন, সেই প্রজন্মও দ্রুত অপস্রিয়মাণ। তাঁর জীবনদর্শনে ও রাজনৈতিক তত্ত্বে কখনওই কোনও সময়ে কমিউনিয়ালিজম ও কমিউনিস্টদের স্থান ছিল না। আজকের বাঙালিপ্রজন্ম ওই দুই তত্ত্বের বেষ্টনীতে আবদ্ধ—দেখা যাক তার উত্তরণ হয় কোন পথে!

বিধানসভা নির্বাচন ('০৬)-এর কারণে প্রেস ব্যস্ত থাকার জন্য বর্তমান সংখ্যাটি প্রকাশে এক মাস বিলম্ব হল। মে-র বদলে জুনে বেরুল। এজন্য আমরা দুঃখিত। পরবর্তী সংখ্যা বেরবে অক্টোবরে।

—স: চ:

হুমায়ুন কবিরের একগুচ্ছ কবিতা

আকবর

হে সম্রাট বসে আছি আজি তব সমাধির পাশে
একান্ত বিজন,
দূর হতে অরণ্যের অন্ধকার হতে ভেসে আসে
বিহগ কূজন।
নীরব মধ্যাহ্নবেলা, শব্দহীন নিঃসাড় ভুবন
কেহ কোথা নাই,
অকস্মাৎ মর্মরিলে তরুশাখে মন্থর পবন
চমকিয়া চাই।

জীবনের গতি হেথা আসিয়াছে মন্দ হয়ে ধীরে
নাহিক স্পন্দন,
বন্দী হয়ে কেঁদে ফিরে সমাধির পাষাণ প্রাচীরে
স্মৃতির ক্রন্দন।
কত দিবসের ব্যথা জীবনের আবেগ উত্তাল
গিয়াছে নিভিয়া,
স্মৃতির কন্দরে মম শতাব্দির অন্ধকার জাল
উঠিছে কাঁপিয়া।

সমাধির পরে তবে আজি বৃষ্টিধৌত নীলাকাশ
হাসে স্মিত হাসি,
প্রভাতের মুক্ত আলো তারে ঘেরি করিছে উচ্ছ্বাস
ঢালি সুধারাশি।
শরতের পূর্ণা রাতে তোমার আকাশ চন্দ্রাতপ
কিরণ-উজ্জ্বল,
উন্মুক্ত অম্বরতলে উঠিতেছে সুগম্ভীর রব—
মানবমঙ্গল।

তোমার হৃদয় ভরি জেগেছিল যে-মহাস্বপন,
এ ভারতভূমি
এক ধর্ম, এক রাজ্য, এক জাতি, একনিষ্ঠ মন
বেঁধে দিবে তুমি।
সমাজ আচারভেদ ধর্মভেদ ভুলে যাবে সবে,
রহিবে স্মরণ,
এক মহাদেশে বাস, চিরদিন একসাথে হবে
জীবন মরণ।

বিজিত-বিজেতা ভেদ ভুলেছিল হে মহৎ প্রাণ
হিংসা ভুলেছিলে,

তোমার মহৎ প্রেমে দূর করি সর্ব অসম্মান
কোলে টেনে নিলে।
হিন্দু-মোস্লেমের দ্বেষ, রাজপুত-পাঠান-মোগল
সংঘাত জিনিয়া,
মহাভারতের স্বপ্ন মেলি স্থির আঁখি অচপল
দেখেছিল হিয়া।

হে সম্রাট জানে নাই ভয় কভু তোমার হৃদয়,
নিয়ত সম্মুখে
সন্দেহ-সংশয়-চিন্তা জয় করি চলেছে নির্ভয়
সব সুখে দুখে।
বিপদের দিনে বন্ধু দাঁড়াইল সরি পার্শ্ব হতে—
একান্ত একাকী
আপন জীবনব্রত সাধিবারে চলিয়াছ পথে
লক্ষ্য স্থির রাখি।

কে এল তোমার সাথে, কে তোমারে ছেড়ে গেল চলে,
চাহ নাই ফিরে,
আপন প্রাণের স্বপ্নে সকল জীবন তব জ্বলে
বিদারি তিমিরে।
হৃদয়ের রক্ত দিয়া পলে পলে আঁকিয়াছ ছবি
যে মহাভারত,
আজিও সম্ভ্রমভরে দেখে শুধু হে সম্রাট-কবি
বিস্মিত জগৎ।

"মোগল-পারশি-শিখ ভেদাভেদ রহিল না আর,
ঘুচিল কলহ।
নিখিল ভারত ভরি শিহরিয়া উঠিল আঁধার।
দ্বন্দ্ব অহরহ
নিশান্তের স্বপ্নসম অতীতের স্মৃতি শুধু আজি
মিলাইছে মনে,
নবীন প্রীতির মন্ত্র মুখরিয়া উঠিতেছে বাজি,
সকল জীবনে।"

হায় স্বপ্ন যায় টুটে কঠিন ধরার ধূলা লাগি।
দেখি আঁখি মেলি
হিংসা ক্রূর সর্পসম হিয়াতলে রহিয়াছে জাগি।
উঠিছে উদ্বেলি
বিদ্বেষ সমুদ্রসম আস্ফালিয়া করিয়া গর্জন,
ছাইয়া হৃদয়।
নীরব আকাশতলে প্রতি পলে বাজিছে ক্রন্দন
রক্তধারা বয়।

ধরণীর শ্যামশোভা ক্লিষ্ট আজি রক্তের ধারায়,
ভায়ের শোণিতে,

আকাশের শান্ত সৌম্য নীরবতা শুধু ভেঙে যায়
সংগ্রাম ধ্বনিতে।
স্বার্থে স্বার্থে দ্বন্দ্ব লাগে, রক্ত ঝরি পড়ে অহর্নিশি,—
ওঠে শূন্য পানে
ক্রন্দন-গর্জন-রোল অভিশাপ-হাহাকার মিশি
কাহার সন্ধানে?

তোমার সমাধিপাশে বসি আজ মোর পড়ে মনে
তোমার কীর্তি,
নিখিল ভারত ভরি উঠেছিল ধ্বনিয়া গগনে
মিলনের গীতি।
আপন বিজয়গর্ব ডালি দিলে একতার লাগি,
ভুলিলে গৌরব,
তোমার সমাধিপাশে বসে আজি আমি লব মাগি
স্মৃতির সৌরভ!

তোমার মহৎ হিয়া পুনর্বার আসুক ফিরিয়া
আমাদের মাঝে,
আত্মদ্বন্দ্ব-সর্বনাশ আমাদের রেখেছে ঘিরিয়া
অপমানে লাজে।
কল্যাণের পথ মোরা হারাইয়া আঁধারের মাঝে
ঘুরি দিশাহারা,
আমাদের দেশ তাই হতাদরে অপমানে লাজে
আমাদের কারা!

দেশের মহৎ স্বার্থ আপনার ক্ষুদ্র স্বার্থ লাগি
দিনু বিসর্জন,
হিংসা-দ্বেষ-দ্বন্দ্বমাঝে অহর্নিশি রহিয়াছে জাগি
অনন্ত মরণ।
ধর্মের কলহগানে আমরা ধর্মের করি গ্লানি,
নাহি জানি পথ,
অন্ধকার মায়াজাল মুখরি উঠুক তব বাণী
মঙ্গল শাশ্বত!

হে মহৎ, তব বাণী নিখিল ভারত ভরি আজি
জাগুক আবার,
উঠুক মিলনমন্ত্র সাম্যবাদে কম্বুকণ্ঠে বাজি
টুটিয়া আঁধার।
হিংসা দ্বেষ মন্ত্রশান্ত ভুজঙ্গের মতো শঙ্কা ভরে
হোক শান্ত হোক,
আঁধারের প্রাণী যত ফিরে যাক আঁধার বিবরে,
নামুক আলোক।

কার্তিক ১৩৩৩

শিল্পী

আপনার অন্তরের অন্তরালে বসিয়া একাকী
গহন গোপনে,
মায়ার প্রাসাদ রচি হৃদয়ের আশা দিয়া আঁকি
সোনার স্বপনে।
তাহারি নিভৃত কক্ষে সবাকার আঁখির আড়ালে
সযত্ন প্রয়াসে,
আপনার মানসীরে সাজাই কাঞ্চন-মণিজালে
অপরূপ বাসে।

দেখেছিনু পথে যেতে কবে কোথা নীল আঁখি দুটি,
কার হাসিখানি?
অশান্ত অলকচূর্ণ পড়িয়াছে আঁখিপরে লুটি
কেন নাহি জানি।
চকিত চোখের তারা চেয়েছিল বুঝি মোর পানে
কৌতূহল ভরে,
সকল জীবন মম স্মৃতি তার ভরি দিল গানে
গভীর অন্তরে।

আপনার মনে আমি রচি তারে নূতন করিয়া
যারে ভালবাসি,
সাজাতে মোহনবেশে খুঁজে ফিরি ভুবন ভরিয়া
সুধা-গন্ধ-হাসি।
যে হাসি স্বপন সম ভেসেছিল ক্ষণিকের তরে
অধরের কোণে,
আমার প্রিয়ারে ঘেরি সে হাসির সুধারাশি ঝরে
আমার ভুবনে।

মাঘ ১৩৩৩

জন্মদিনে

কেন জন্ম হল মম তাই বসি ভাবি আজি মনে।
ফাল্গুন উতলা প্রাতে পুষ্পসম কেন অকারণে
উঠেছিনু ফুটি মম জননীর কোলে? দুঃখে সুখে
দিবস রজনী শুধু অনিবার চলেছি সম্মুখে।

প্রভাত আলোক আজি অন্ধকার মেঘের মালায়।
বহিছে উত্তর বায়ু। সঙ্গীহীন এ বন্দীশালায়
কে নিষ্ঠুর ফেলেছিল অসহায় শিশুটিরে টানি
কিসের লাগিয়া? ধরণীর ধূলিতলে শির হানি
শুধাই উত্তর তার। কেহ কিছু কহে নাক আসি
কঠিন পাষাণে লাগি ফিরে আসে তিক্ত অশ্রুরাশি,
না বুঝিয়া ব্যথাভরে কেঁদে ওঠে সারা দেহমন,
জীবনে আঁধার নামে, নিভে যায় আকাশ তপন।

২

কেন জন্ম লভেছিনু নাহি জানি, শুধু জানি মনে—
জন্মিতে চাহিনি কভু। কেন অনাদরে অকারণে
ধরাতলে বিকশিল জীবন আমার? অর্থ খুঁজি
চিত্ত মম পরিশ্রান্ত। তবু জানি বুঝি নাহি বুঝি
আমারে চলিতে হবে দিবানিশি সম্মুখের পানে,
অনন্ত আঁধার ভেদি কোথা কোনো আলোর সন্ধানে।

আলো কি কোথাও আছে? তাই নাহি জানে হিয়া মোর,
শুধু জানে চারিদিকে অন্ধকার বহে অশ্রুলোর,
দারিদ্র্যযাতনারাশি, ক্ষুধিতের ক্ষুধার বেদনা,
বঞ্চিতের ক্ষুব্ধ রোষ, অন্যায়ের পুঞ্জ আবর্জনা
জমিয়াছে যুগে যুগে। এই মৃত্যু-নরকের মাঝে
স্বরগ আনিতে হবে, যে স্বপন-স্বরগ বিরাজে
সকল জাগ্রত-স্বপ্নে। সেই স্বর্গ কভু কি আসিবে,
তিমির রজনীশেষে পূর্বাচলে অরুণ হাসিবে?

ফাল্গুন ১৩৩৩

সমুদ্র ও আকাশ

এত কাছে তবু এত দূর?
সুদূর দিগন্ত শেষে, আকাশ সমুদ্রে মেশে,
হেথায় সাগরবেলা তরঙ্গ-বন্ধুর।
বিরাম বিশ্রান্তি নাই, নিমেষের ক্লান্তি নাই,
দিবানিশি আলোড়িয়া উদ্দাম আবেগে,
বর্ষ নাই, মাস নাই, কোনো অবকাশ নাই,
আদিম-অনন্ত সিন্ধু রহিয়াছে জেগে।

হেথায় সাগরবেলা তরঙ্গ মুখর।
আকুল তরঙ্গরাশি উচ্ছ্বসি পড়িছে আসি,
বাজিছে দিবসনিশি অনন্ত মর্মর।
সারাদিন আলোড়িয়া, বেদনায় গুমরিয়া,
এমন ব্যাকুল প্রাণে কাহারে সে চায়?
কাহার বিরহে ধরা এমন বেদনাভরা?
দিবানিশি অবিরাম লুটিছে বেলায়।

আকাশ চাহিয়া আছে মেলি স্মিত আঁখি।
সোনার তপন হাসে, আলোকে ভুবন ভাসে,
নিমেষে ঠিকরি ওঠে লক্ষ ঊর্মিরাশি।
চপল শিশুর মতো দিবানিশি অবিরত
সহস্র তরঙ্গরাশি গগনের পানে
প্রসারিয়া বাহু দুটি কোথা যেতে চাহে ছুটি?
আকাশ ছুঁইতে চাহে কিসের সন্ধানে?

ভাষা নাই, দিশাহারা, উদাসী পাগলপারা,
দিবস রজনী সিন্ধু গাহে এ কী গান?
হেথায় বসিয়া একা, অন্ধকারে ঊর্মিরেখা
নাহি দেখি, শুধু শুনি উন্মাদ আহ্বান।
অর্থ নাহি বুঝি কিছু, নাহি জানি আগুপিছু,
কেবল অবাক আঁখি সুদূরে প্রসারি
স্তব্ধ হিয়া অবিরল শুনি তার কলরোল,
নেহারি অনন্ত বারি উঠিছে বিথারি।

পুরী, বৈশাখ ১৩৩৪

শ্রান্তি

শোক নহে, দুঃখ নহে, শুধু গুরু পাষাণের ভার
নিষ্পেষিছে নিশিদিন বাক্যহীন অন্তরে আমার।
বক্ষোমাঝে চিত্ত মম স্তব্ধ যেন হল অকস্মাৎ,
টলিছে সকল দেহ লভি পথে কঠিন আঘাত,
অশ্রু গেছে শুকাইয়া—বেদনার কোমল প্লাবন—
কঠিন পাষাণ সম প্রাণহীন সর্ব দেহমন।

শুধু বড় ক্লান্ত লাগে। আলো বড় রূঢ় লাগে চোখে।
অবসাদ মায়াজাল ছড়াইছে দিনের আলোকে।
অর্থহীন, লক্ষ্যহীন মনে হয় সব কাজ মোর,
জীবন-যৌবন-স্বপ্ন এ জীবনে হল বুঝি ভোর।
মনে হয় ধূলিতলে এলাইয়া শ্রান্ত তনুখানি
মরণের অন্ধকারে শুনি স্তব্ধ তারকার বাণী।

চৈত্র ১৩৩৩

স্বপ্নশেষে

ভুলিব না কোনোদিন তোমারে যে বেসেছিনু ভালো,
তুমিও বেসেছ ভালো ভাবি গৃহে জ্বেলেছিনু আলো,
উৎসবের বাঁশি বাজি ছেয়েছিল সকল জীবন।
ভেবেছিনু জীবনের পথে যাব একলক্ষ্য-মন,
পেয়েছি পথের সাথী, অন্ধকার রাত্রি-পরপারে
আলোর সন্ধানে যাব। তুমি আসি জাগাবে আমারে
পথের বিপদে যদি আঁখি কভু ছেয়ে আসে ঘুমে,
শিহরিয়া উঠে যদি মৃত্যুর প্রলয়-বহ্নি-ধূমে।

সে স্বপ্ন টুটিয়া গেছে, তুমি গেছ দূরে সরে আজি,
আজি মোর সারা প্রাণে বিরহের বাঁশি ওঠে বাজি,
বারে বারে সাধ জাগে পরিশ্রান্ত শিশুর মতন
লুটায়ে ভূতলতলে বরি লব শীতল মরণ।
তারি মাঝে স্মৃতি তব জেগে থাক অগ্নিশিখাসম
করুক নিঃশেষ দহি জীবনের অবসাদ মম।

ফাল্গুন ১৩৩৩

হুমায়ুন কবিরের গ্রন্থপঞ্জি

মোহাম্মদ শাকেরউল্লাহ

'চতুরঙ্গ' পত্রিকার প্রতিষ্ঠাতা, চিন্তাবিদ, দার্শনিক, শিক্ষাবিদ, রাজনীতিবিদ, প্রশাসক, সম্পাদক ও সাহিত্যিক হুমায়ুন কবির (পুরো নাম হুমায়ুন জহিরউদ্দিন আমির-ই-কবির; জন্ম, ২২ ফেব্রুয়ারি ১৯০৬, বাংলাদেশের ফরিদপুরে; মৃত্যু ১৮ আগস্ট ১৯৬৯, ভারতের দিল্লিতে)-এর গ্রন্থপঞ্জিটি ঢাকা থেকে প্রকাশিত ত্রৈমাসিক সাহিত্যপত্রিকা 'ঊষালোকে', জানুয়ারি-মার্চ ২০০৪, নব পর্যায় তৃতীয় সংখ্যায় মুদ্রিত হয়। হুমায়ুন কবিরের একটি পূর্ণাঙ্গ গ্রন্থপঞ্জি তৈরি করতে গিয়ে ঢাকার 'বাংলা একাডেমী গ্রন্থাগার', 'এশিয়াটিক সোসাইটি লাইব্রেরি', সিলেটের 'কেন্দ্রীয় মুসলিম সাহিত্য সংসদ গ্রন্থাগার' ও কালকাতার 'ন্যাশনাল লাইব্রেরি' সহ বিভিন্ন লাইব্রেরিতে দীর্ঘকালব্যাপী নিবিড় অনুসন্ধান চালাতে হয়েছে। এসব লাইব্রেরিতে তাঁর অতিদুর্লভ কিছু গ্রন্থ দেখারও সুযোগ হয়। সংগৃহীত তথ্য অনুযায়ী হুমায়ুন কবিরের মোট সাতচল্লিশটি গ্রন্থের হদিশ পাওয়া যায়। এর বাইরেও তাঁর আরও গ্রন্থ প্রকাশিত হয়ে থাকতে পারে বলে অনুমান। এযাবৎকাল প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে প্রণীত হুমায়ুন কবিরের সম্পূর্ণ গ্রন্থপঞ্জি নিম্নরূপ :

১. *গান*। ১৯২৬।

২. *স্বপ্নসাধ* (কবিতা)। প্রথম প্রকাশ : ১৩৩৪ [১৯২৭]
দ্বিতীয় সংস্করণ : ১৯৪৭ [১৯৪০]। ডিমাই সাইজ, পৃষ্ঠা-সংখ্যা : ৪+১১৪।
তৃতীয় সংস্করণ : ১৩৬২ [১৯৫৫]। প্রকাশক : এম. সি. সরকার অ্যান্ড সন্স লিঃ, ১৪ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কলিকাতা ১২। মুদ্রক : শ্রীসৌরেন্দ্রনাথ মিত্র এম-এ, বোধি প্রেস, ৫ শঙ্কর ঘোষ লেন, কলিকাতা ৬। প্রচ্ছদ : [উল্লেখ নেই] মূল্য : দুই টাকা। ডিমাই সাইজ, পৃষ্ঠা-সংখ্যা : ৮+১১৪। উৎসর্গ : [উল্লেখ নেই]।

৩. *Poems*. 1932.

৪. *Kants on Philosophy in General*. 1935.

৫. *ইমানুয়েল কান্ট* (দর্শন)। প্রথম প্রকাশ : ১৯৩৬।
দ্বিতীয় সংস্করণ : ১৯৩৯।
কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক প্রকাশিত সংস্করণ : ১৯৩৯। মুদ্রক : এস, এন, গুহরায় বি-এ কর্তৃক শ্রীসরস্বতী প্রেস লিঃ, ১ রমানাথ মজুমদার স্ট্রিট, কলিকাতা। প্রচ্ছদ ও মূল্য : [উল্লেখ নেই]। ডিমাই সাইজ, পৃষ্ঠা-সংখ্যা : ১২+৯৪। উৎসর্গ : 'শ্রীযুক্ত শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় উদার চরিতেষু'।
প্রথম পর্যদ মুদ্রণ : এপ্রিল ১৯৭৮।
দ্বিতীয় পর্যদ মুদ্রণ : এপ্রিল জুলাই ১৯৮৯। প্রকাশক : পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্যদ (পশ্চিমবঙ্গ সরকারের একটি সংস্থা), আর্য ম্যানশন (নবম তল), ৬এ রাজা সুবোধ মল্লিক স্কোয়ার, কলিকাতা ১৩। মুদ্রক : দীপ্তি প্রিন্টার্স, ৪ রামনারায়ণ মতিলাল লেন, কলিকাতা ১৪। প্রচ্ছদ : বিমল দাশ। মূল্য : ছয় টাকা। ডিমাই সাইজ, পৃষ্ঠা-সংখ্যা : ১৪+৬৪। উৎসর্গ : কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক প্রকাশিত সংস্করণের অনুরূপ।

৬. *সাথী* (কবিতা)। প্রথম প্রকাশ : ১৯৩৮।
দ্বিতীয় সংস্করণ : ১৯৪০।
তৃতীয় সংস্করণ : ১৯৫৬। প্রকাশক : এম. সি. সরকার অ্যান্ড সন্স প্রাইভেট লিঃ, কলিকাতা। মূল্য : [উল্লেখ নেই]। ডিমাই সাইজ, পৃষ্ঠা-সংখ্যা : ৪+৭৬।

৭. *অষ্টাদশী* (কবিতা) প্রথম প্রকাশ : ১৯৩৮। প্রকাশক : নওরোজ পাবলিশিং, কলিকাতা। মূল্য : আট আনা, নম্বরযুক্ত ও স্বাক্ষরিত : এক টাকা।

৮. *Poetry monads and Society*. 1941.

৯. *বাঙলার কাব্য* (প্রবন্ধ)। প্রথম সংস্করণ : আশ্বিন ১৩৪৯ [সেপ্টেম্বর ১৯৪২]। প্রকাশক : গুপ্ত হুমায়ুন রহমান অ্যান্ড গুপ্ত, কলিকাতা।
দ্বিতীয় সংস্করণ : আশ্বিন ১৩৬৫ [সেপ্টেম্বর ১৯৫৮]। প্রকাশক : আতাউর রহমান, চতুরঙ্গ, ৫৪ গণেশচন্দ্র এভেনিউ, কলিকাতা, ১৩। মুদ্রাকর : শ্রীশৈলেন্দ্রনাথ গুহরায়, শ্রীসরস্বতী প্রেস লিমিটেড, ৩২ আপার সারকুলার রোড, কলিকাতা ৯। প্রচ্ছদপট : সত্যজিৎ রায়। মূল্য : তিন টাকা। ডিমাই সাইজ, পৃষ্ঠা-সংখ্যা : ৯৩। উৎসর্গ : 'আবু সয়ীদ আইয়ুব বন্ধুবরেষু'।

নলেজ হোম সংস্করণ : ১৯৭২। প্রকাশক : মজলিশ খান, নলেজ হোম, ১৪৬ গভর্নমেন্ট নিউ মার্কেট, ঢাকা ৫। মূল্য : চার টাকা।

আহমদ ছফা-সম্পাদিত সংস্করণ : ১৪ আগস্ট ১৯৭০। প্রকাশিত : কে. এম. ফারুক খান, খান ব্রাদার্স অ্যান্ড কোং, ৬৭ প্যারীদাস রোড, ঢাকা ১। মুদ্রাকর : এম. জেড. আলী খান, খেয়ালী প্রেস, ১৯/২০ সৈয়দ হাসান আলী লেন, ঢাকা ১। মূল্য : চার টাকা। ডিমাই সাইজ, পৃষ্ঠা-সংখ্যা : ৮+১০২। উৎসর্গ : [উল্লেখ নেই]। মুখবন্ধ : আহমদ ছফা।

প্রথম অনির্বাণ সংস্করণ : ভাদ্র ১৩৯৯/সেপ্টেম্বর ১৯৯২। প্রকাশক : তাছনীম আহমদ, অনির্বাণ প্রকাশনী, ৩৮ বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০। মুদ্রণ : মেছবাহউদ্দীন আহমদ, আহমদ প্রিন্টিং ওয়ার্কস, ৭ জিন্দাবাহার প্রথম লেন, ঢাকা ১১০০। প্রচ্ছদ : সরদার জয়নুল আবেদিন। মূল্য : চল্লিশ টাকা। ডিমাই সাইজ, পৃষ্ঠা-সংখ্যা : ৮+৬৯। উৎসর্গ : 'শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রনাথ দত্ত বন্ধুবরেষু'।

প্রথম বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র সংস্করণ : পৌষ ১৩০৮, জানুয়ারি ২০০২। গ্রন্থমালা সম্পাদক : আবদুল্লাহ আবু সায়ীদ। প্রকাশক : হুমায়ুন কবির, বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র, ১৪ কাজী নজরুল ইসলাম এভিনিউ, ঢাকা ১০০০। মুদ্রণ : মিম প্রিন্টার্স, ২৭ বাবুপুরা, নীলক্ষেত, ঢাকা প্রচ্ছদ : মিলন রায়। মূল্য : পঞ্চাশ টাকা। ডিমাই সাইজ, পৃষ্ঠা-সংখ্যা : ৬২। উৎসর্গ : [উল্লেখ নেই]। মুখবন্ধ : আবদুল মান্নান সৈয়দ।

১০. *ধারাবাহিক* (প্রবন্ধ)। প্রথম প্রকাশ : পৌষ ১৩৪৯। [ডিসেম্বর ১৯৪২]। প্রকাশক : শ্রীগোপালদাস মজুমদার, ডি. এম. লাইব্রেরি, ৪২ কর্নওয়ালিস স্ট্রিট, কলিকাতা। মুদ্রাকর : শ্রীপ্রভাতচন্দ্র রায়, শ্রীগৌরাঙ্গ প্রেস, ৫ নং চিন্তামনি দাস লেন, কলিকাতা। প্রচ্ছদ : [উল্লেখ নেই]। মূল্য : আড়াই টাকা। ডিমাই সাইজ, পৃষ্ঠা-সংখ্যা : ৮+২০৪। উৎসর্গ : 'শ্রীযুক্তা অশোকলতা দেবী ও শ্রীযুক্ত হৃদয়চন্দ্র দাসকে সশ্রদ্ধ উপহার'।

দ্বিতীয় সংস্করণ : ১৯৪৩।

১১. *Sarat Chandra Chatterjee*. First edition : 1942.

New edition : First published 17th September 1963, Copyright : Humayun Kabir. Published by Robin Chatterjee, For Silpee Sangstha. 163 Ahiritola Street, Calcutta 5. Printed by K. C. Chatterjee at the Eton Press Private Ltd., Calcutta 5. Cover design : Barun Das Gupta. Price : Indian Rs. 3.00nP., Foreign 6*s*. Demy size, Page : 60. Dedication : 'For Yusuf Meherally'.

১২. *Muslim Politics (1906-1942)*. First edition : August 1943.

Second edition : March 1944. Published by K. C. Banerjee, Gupta Rahman and Gupta, 1/2 Durga Pituri Lane, Calcutta. Printed by K. C. Banerjee, Modern Art Press, 1/2 Durga Pituri Lane, Calcutta. Cover design : [not mentioned]. Price : Rupee One and Annas Four. Demy Size, page : 8+61. Dedication : 'To the memory of Muhammad Umar Allah Bakhsh'.

১৩. *মোসলেম রাজনীতি* (প্রবন্ধ)। প্রথম সংস্করণ : ভাদ্র ১৩৫০ [আগস্ট ১৯৪৩]। পূর্বাশা লিমিটেড থেকে সত্যপ্রসন্ন দত্ত কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত। প্রচ্ছদ : [উল্লেখ নেই]। মূল্য : আট আনা। ক্রাউন সাইজ, পৃষ্ঠা-সংখ্যা : ৪+৫৮। উৎসর্গ : 'স্বাধীন বাঙলার অগ্রদূত মরহুম আবদুর রসুল, মরহুম মুজিবর রহমান ও মরহুম আবদুল করিমের স্মারক'।

দ্বিতীয় সংস্করণ ঃ চৈত্র ১৩৫২ [মার্চ ১৯৪৫]। পূর্বাশা লিমিটেড, পি-১৩ গণেশচন্দ্র এভিন্যু, কলিকাতা থেকে সত্যপ্রসন্ন দত্ত কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত। প্রচ্ছদ : [উল্লেখ নেই]। মূল্য : বারো আনা। ডিমাই সাইজ, পৃষ্ঠা-সংখ্যা : ৮+৭৬। উৎসর্গ : প্রথম সংস্করণের অনুরূপ।

১৪. *মসদ্দসে হালী* (অনুবাদ)। ১৯৪৩।

১৫. *Mahatma and other poems*. 1944.

১৬. *Men and Rivers* (Novel). First edition : 1945. Published by Hind Kitabs. Calcutta.

১৭. *The Indian Heritage*. First edition : 1946. Second edition : 1947. Second edition (Reprinted) : 1949. Third edition : 1955. Third edition (Reprinted) : 1960.

Third edition (Reprinted) : 1962. Copyright : Humayun Kabir. Published by Asia Publishing House, Bombay. Printed by Z. T. Bandukwala at Leaders Press Private Limited, Bomnay. Cover design & Price : [not mentioned]. Demy size, page : 12+142. Dedication : 'To Jawaharlal Nehru, who like Asoka and Akbar, has helped to discover and enrich the Indian heritage, in affectionate admiration'.

১৮. *Our Heritage*. 1947.
১৯. *Three Stories*. 1947.
২০. *মার্কসবাদ* (প্রবন্ধ)। প্রথম সংস্করণ : বৈশাখ ১৩৫৫ [এপ্রিল ১৯৪৮]। প্রকাশক : আতাওয়ার রহমান, গুপ্ত রহমান অ্যান্ড গুপ্ত, পি ১৩ গণেশচন্দ্র এভেনিউ, কলিকাতা। মুদ্রাকর : প্রভাতচন্দ্র রায়, শ্রীগৌরাঙ্গ প্রেস, ৫ চিন্তামণি দাস লেন, কলিকাতা। প্রচ্ছদপট : সত্যজিৎ রায়। মূল্য : ২॥ টাকা। ডিমাই সাইজ, পৃষ্ঠা-সংখ্যা : ৪+১০৭। উৎসর্গ : 'সুশীলকুমার দে বন্ধুবরেষু'।
২১. *Of Cabbages and Kings*. 1948.
২২. *নদী ও নারী* (উপন্যাস)। প্রথম সংস্করণ : [১৯৫২]। প্রকাশক : ওরিয়েন্ট লংম্যানস্ লিমিটেড, ১৭ চিত্তরঞ্জন এভিনিউ, কলিকাতা ১৩। মুদ্রাকর : মডার্ন আর্ট প্রেস, ১/২ দুর্গা পিতুরি লেন, কলিকাতা ১২। প্রচ্ছদ : [উল্লেখ নেই]। মূল্য : ॥ (ভারতীয়) ; ৩॥ (পাকিস্তানি)। ক্রাউন সাইজ, পৃষ্ঠা-সংখ্যা : ৮+২৯৬। উৎসর্গ : 'পূর্ণেন্দুনাথ ঠাকুর বন্ধুবরেষু'।
২৩. *A National Plan of Education in India*. 1953.
২৪. *Student Indiscipline*. 1954.
২৫. *Two Studies on Education*. 1955.
২৬. *Science Democracy and Islam and Other Essays*. First edition : 1955. Copyright : George Allen and Unwin Limited, Published by George Allen & Unwin Ltd., Ruskin House, Museum Street, London, Printed in Great Britain by Unwin Brothers Limited, Working and London. Cover design : [not mentioned]. Price, 12*s* 6*d* net. Demy size, page : 6+128. Dedication : 'for Henry Habberley Price, fearless and untiring seeker of truth'.
২৭. *Education in New India*. 1956.
২৮. *An Indian Looks at American Education*. 1956.
২৯. *Letters on Discipline*. 1956.
৩০. *শিক্ষক ও শিক্ষার্থী* (প্রবন্ধ)। প্রথম প্রকাশ : বৈশাখ ১৩৬৪ [এপ্রিল ১৯৫৭]। প্রকাশক : বেঙ্গল পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলিকাতা। মূল্য : দুই টাকা। ডিমাই সাইজ, পৃষ্ঠা-সংখ্যা : ৬+১১৪।
দ্বিতীয় সংস্করণ : অগ্রহায়ণ ১৩৬৬ [নভেম্বর ১৯৫৯]। প্রকাশক : শ্রীশচীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, বেঙ্গল পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ১৪ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কলিকাতা ১২। মুদ্রাকর : শ্রীভোলানাথ হাজরা, রূপবাণী প্রেস, ৩১ বাদুড়বাগান স্ট্রিট, কলিকাতা ৯। প্রচ্ছদ : [উল্লেখ নেই]। মূল্য : তিন টাকা পঞ্চাশ ন.প.। ডিমাই সাইজ, পৃষ্ঠা-সংখ্যা : ৬+১৮৫। উৎসর্গ : 'আতাউর রহমান কল্যাণীয়েষু'।
৩১. *শরৎ-সাহিত্যের মূলতত্ত্ব* (মূল ইংরাজি গ্রন্থ *Sarat Chandra Chatterjee*-র বিশু মুখোপাধ্যায়-কৃত বঙ্গানুবাদ)। প্রথম সংস্করণ : ৭ পৌষ ১৩৬৪ [১৯৫৭]। প্রকাশক : ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েট পাবলিশিং কোং (প্রাঃ) লিঃ। মূল্য : দেড় টাকা। ডিমাই সাইজ, পৃষ্ঠা-সংখ্যা : ২+৬১।
উত্তরণ সংস্করণ : ফেব্রুয়ারি ১৯৯৯। প্রকাশক : উত্তরণ, ৩৮/৪ বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০। মুদ্রণ : বসুন্ধরা প্রেস অ্যান্ড পাবলিকেসন্স লিমিটেড, ৫১/৫২ বনগ্রাম লেন, ঢাকা ১১০০। প্রচ্ছদ : ধ্রুব এষ। মূল্য : পঞ্চাশ টাকা। ডিমাই সাইজ, পৃষ্ঠা-সংখ্যা : ৫৮। উৎসর্গ : [উল্লেখ নেই]।
ঘাস ফুল নদী সংস্করণ : ফেব্রুয়ারি ১৯৯৯। প্রকাশক : ঘাস ফুল নদী, ৮৪ আজিজ সুপার মার্কেট, শাহবাগ, ঢাকা ১০০০। অক্ষর বিন্যাস : সমাজ চেতনা কম্পিউটার্স, ৭৫ আজিজ মার্কেট (নীচতলা), শাহবাগ, ঢাকা ১০০০। প্রচ্ছদ ও চিত্রণ : মাহবুব কামরান। মূল্য : পঁচিশ টাকা। ডিমাই সাইজ, পৃষ্ঠা-সংখ্যা : ৬+৪২। উৎসর্গ : [উল্লেখ নেই]।
অবসর সংস্করণ : ফাল্গুন ১৪০৮ [ফেব্রুয়ারি ২০০২]। প্রকাশক : এফ রহমান, অবসর প্রকাশনা সংস্থা, ৪৬/১ হেমেন্দ্র দাস রোড, সূত্রাপুর, ঢাকা ১১০০। মুদ্রণ : নিউ পূবালি মুদ্রায়ণ, ৪৬/১ হেমেন্দ্র দাস রোড, সূত্রাপুর, ঢাকা ১১০০। প্রচ্ছদ : জাকির আহমেদ। মূল্য পঞ্চাশ টাকা। ডিমাই সাইজ, পৃষ্ঠা-সংখ্যা : ৬৪। উৎসর্গ : [উল্লেখ নেই]।
৩২. *Student Unrest*. 1958.
৩৩. *Green and Gold* (ed. Collection of Bengali Short Stories & Poems). First edition : 1958. Published by Chapman & hall Ltd. London.
৩৪. *Britain and India*. 1960.
৩৫. *Indian Philosophy of Education*. 1961.
৩৬. *Lessons of Indian History*. 1961.
৩৭. *Mirza Abu Talib Khan* (The Russell Lecture). First edition : 1961. Published by Patna University, Patna. (All rights reserved). Cover Design & Price : [not mentioned]. Demy Size, Page : 8+28. Dedication : 'In Memory of Prafulla

Chandra Ghosh, a great teacher who first discovered to me the delights of the byways of literature and history'.

৩৮. *Rabindranath Tagore* (Tagore Lectures, 1961). First edition : 1962. Published by the School of Oriental and African Studies, University of London. Double crown size, Page : 72.

৩৯. *নয়া ভারতের শিক্ষা* (প্রবন্ধ)। প্রথম প্রকাশ : অক্টোবর ১৯৬২। প্রকাশক : শ্রীপ্রহ্লাদকুমার প্রামাণিক, ওরিয়েন্ট বুক কোম্পানি, ৯ শ্যামাচরণ দে স্ট্রিট, কলিকাতা ১২। মুদ্রাকর : শ্রীধনঞ্জয় প্রামাণিক, সাধারণ প্রেস, ১৫এ ক্ষুদিরাম বসু রোড, কলিকাতা ৬। প্রচ্ছদ : [উল্লেখ নেই]। দাম : আট টাকা। ডিমাই সাইজ, পৃষ্ঠা-সংখ্যা : ৮+২৯৬। উৎসর্গ : [উল্লেখ নেই]।

৪০. *Studies in Bengali Poetry.* First edition : August 1962. Copyright and rights of translation and reproduction reserved by the Publishers. General Editors : K. M. Munshi, R. R. Diwakar. Published by S. Ramakrishnan, Executive Secretary, Bhavan's Book University, Bharatiya Vidya Bhavan, Chaupatty, Bombay. Printed in India by P. H. Raman at Associated Advertisers & Printers, 505 Tardeo Arthur Road, Bombay 34. Cover design : [not mentioned]. Price : Rs. 2.00 per volume (Sh. 3/6; $ 0.90) ; Rupee price (outside India) Rs. 2.25. Crown size. Page : 16+128. Dedication : 'For S F R'.

৪১. *কংগ্রেস মতবাদ* (প্রবন্ধ)। প্রথম সংস্করণ : ১৩৭১ [১৯৬৪]। প্রকাশক : বুকল্যান্ড প্রাইভেট লিমিটেড, কলিকাতা। মূল্য : এক টাকা। ডিমাই সাইজ, পৃষ্ঠা-সংখ্যা : ৫১।

৪২. *দিল্লী ওয়াশিংটন মস্কো* (প্রবন্ধ)। প্রথম সংস্করণ : আষাঢ় ১৩৭১ [জুন ১৯৬৪]। প্রকাশক : শ্রীসুপ্রিয় সরকার, এম. সি. সরকার অ্যান্ড সন্স প্রাইভেট লিমিটেড, ১৪ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কলিকাতা ১২। মুদ্রক : শ্রীসৌরেন্দ্রনাথ মিত্র, বোধি প্রেস, ৫ শঙ্কর ঘোষ লেন, কলিকাতা ৬। প্রচ্ছদ : [উল্লেখ নেই]। মূল্য : তিন টাকা। ডিমাই সাইজ, পৃষ্ঠা-সংখ্যা : ৮+১৩৬। উৎসর্গ : 'শ্রীমনোজ বসু প্রিয়বরেষু'।

৪৩. *Gandhian Philosophy.* 1964.

৪৪. *The Bengali Novel.* First edition : 1968. Copyright : Humayun Kabir, Published by Firma K. L. Mukhopadhyay, 6/1A, Banchharam Akrur Lane, Calcutta 12, Printed by A. C. Ghosh at Ghosh Printing House Private Ltd., 17A, British India Street, Calcutta 1. Cover design & Price : [not mentioned]. Demy size, page : 12+128. Dedication : 'For Lalbhai Patal'.

৪৫. *Minorities in Democracy.* 1968.

৪৬. *Education For Tomorrow.* First edition : 1969. Copyright : Humayun Kabir. Published by Firma K. L. Mukhopadhyay, 6/1A, Dhiren Dhar Sarani, Calcutta 12, Printed by Bholanath Hazra at Rupabani Press, 31 Biplabi Pulin Das Street, Calcutta 9. Cover design & Price [not mentioned]. Royal size, page : 8+72. Dedication : 'For President Gemal Abdel Nasser, Patriot and Humanist'.

৪৭. *Muslim Politics (1906-1947).* First edition : 1969. Copyright : Humayun Kabir. Published by Firma K. L. Mukhopadhyay, 6/1A, Banchharam Akrur Lane, Calcutta 12, Printed by B. N. Hazra at Rupabani Press, 31 Badur Bagan Street, Calcutta 9. Cover design & Price : [not mentioned]. Demy Size, Page : 10+134. Dedication : 'For Khan Abdul Gaffar Khan, a life dedicated to freedom, unity and peace'.

চতুরঙ্গে প্রকাশিত প্রতিষ্ঠাতা-সম্পাদক হুমায়ুন কবিরের রচনাসূচি

প্রবন্ধ

বাংলার কাব্য	১ম বর্ষ, ১ম সংখ্যা, আশ্বিন, ১৩৪৫
উইলিয়ম বাটলার ইয়েটস	১ম বর্ষ, ৩য় সংখ্যা, চৈত্র, ১৩৪৫
বাংলার কাব্য	২য় বর্ষ, ২য় সংখ্যা, পৌষ, ১৩৪৬
সাহিত্যের উপাদান	২য় বর্ষ, ৩য় সংখ্যা, চৈত্র, ১৩৪৬
বাংলার কাব্য	৩য় বর্ষ, ৩য় সংখ্যা, চৈত্র, ১৩৪৭
রবীন্দ্রনাথ	৩য় বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা, আষাঢ়, ১৩৪৮
বাংলার কাব্য	৪র্থ বর্ষ, ৩য় সংখ্যা, চৈত্র, ১৩৪৮
বাংলার কাব্য	৪র্থ বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা, আষাঢ়, ১৩৪৯
মুসলীম রাজনীতির হেরফের	৫ম বর্ষ, ৩য় সংখ্যা, চৈত্র, ১৩৪৯
মুসলীম রাজনীতির হেরফের	৫ম বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা, আষাঢ়, ১৩৫০
ভারতবর্ষ ও সমাজতন্ত্রবাদ	৬ষ্ঠ বর্ষ, ১ম সংখ্যা, আশ্বিন, ১৩৫০
মার্ক্সবাদ ও ভবিষ্যৎ	৭ম বর্ষ, ১ম সংখ্যা, আশ্বিন, ১৩৫১
ঐতিহাসিক জড়বাদ	৭ম বর্ষ, ৩য় সংখ্যা, চৈত্র, ১৩৫১
ধনতন্ত্র ও শ্রেণীসংগ্রাম	৮ম বর্ষ, ১ম সংখ্যা, আশ্বিন, ১৩৫২
শরৎচন্দ্র	৮ম বর্ষ, ৩য় সংখ্যা, চৈত্র, ১৩৫২
শ্রমিকরাজ ও সাম্যবাদ	৯ম বর্ষ, ১ম সংখ্যা, আশ্বিন, ১৩৫৩
গণতন্ত্র ও শিক্ষা	১১ বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা, মাঘ-চৈত্র, ১৩৫৬
দর্শনের ইতিহাস	১৩ বর্ষ, ১-২ সংখ্যা, বৈশাখ-আশ্বিন, ১৩৫৮
ছাত্র-অসন্তোষ ও তার প্রতিকার	১৬ বর্ষ, ২য় সংখ্যা, শ্রাবণ-আশ্বিন, ১৩৬১
ছাত্র-অসন্তোষ ও তার প্রতিকার	১৬ বর্ষ, ৩-৪ সংখ্যা, কার্তিক-চৈত্র, ১৩৬১
ছাত্র-অসন্তোষ ও তার প্রতিকার	১৭ বর্ষ, ১ম সংখ্যা, বৈশাখ-আষাঢ়, ১৩৬২
ছাত্র-অসন্তোষ ও তার প্রতিকার	১৭ বর্ষ, ২য় সংখ্যা, শ্রাবণ-আশ্বিন, ১৩৬২
ছাত্র-অসন্তোষ ও তার প্রতিকার	১৭ বর্ষ, ৩য় সংখ্যা, কার্তিক-পৌষ, ১৩৬২
ছাত্র-অসন্তোষ ও তার প্রতিকার	১৭ বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা, মাঘ-চৈত্র, ১৩৬২
ছাত্র-অসন্তোষ ও তার প্রতিকার	১৮ বর্ষ, ১ম সংখ্যা, বৈশাখ-আষাঢ়, ১৩৬৩
আমেরিকার চিঠি	১৮ বর্ষ, ২য় সংখ্যা, শ্রাবণ-আশ্বিন, ১৩৬৩
আমেরিকার চিঠি	১৮ বর্ষ, ৩য় সংখ্যা, কার্তিক-পৌষ, ১৩৬৩
আমেরিকার চিঠি	১৮ বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা, মাঘ-চৈত্র, ১৩৬৩
আমেরিকার চিঠি	১৯ বর্ষ, ১ম সংখ্যা, বৈশাখ-আষাঢ়, ১৩৬৪
আঠারোশো সাতান্ন	১৯ বর্ষ, ২য় সংখ্যা, শ্রাবণ-আশ্বিন, ১৩৬৪
মস্কোতে পাঁচ সপ্তাহ	১৯ বর্ষ, ৩য় সংখ্যা, কার্তিক-পৌষ, ১৩৬৪
মওলানা আজাদের কাহিনী	১৯ বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা, মাঘ-চৈত্র, ১৩৬৪
মওলানা আজাদের কাহিনী	২০ বর্ষ, ১ম সংখ্যা, বৈশাখ-আষাঢ়, ১৩৬৫
মওলানা আজাদের কাহিনী	২০ বর্ষ, ২য় সংখ্যা, শ্রাবণ-আশ্বিন, ১৩৬৫
মওলানা আজাদের কাহিনী	২০ বর্ষ, ৩য় সংখ্যা, কার্তিক-পৌষ, ১৩৬৫
মওলানা আজাদের কাহিনী	২০ বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা, মাঘ-চৈত্র, ১৩৬৫

সোভিয়েট দেশে তিন সপ্তাহ	২১ বর্ষ, ২য় সংখ্যা, শ্রাবণ-আশ্বিন, ১৩৬৬	রবীন্দ্রনাথ	২২ বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা, মাঘ-চৈত্র, ১৩৬৭
সোভিয়েট দেশে তিন সপ্তাহ	২১ বর্ষ, ৩য় সংখ্যা, কার্তিক-পৌষ, ১৩৬৬	সোভিয়েট দেশে তিন সপ্তাহ	২৩ বর্ষ, ১ম সংখ্যা, বৈশাখ-আষাঢ়, ১৩৬৮
সোভিয়েট দেশে তিন সপ্তাহ	২১ বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা, মাঘ-চৈত্র, ১৩৬৬	সোভিয়েট দেশে তিন সপ্তাহ	২৩ বর্ষ, ২য় সংখ্যা, শ্রাবণ-আশ্বিন, ১৩৬৮
সোভিয়েট দেশে তিন সপ্তাহ	২২ বর্ষ, ২য় সংখ্যা, শ্রাবণ-আশ্বিন, ১৩৬৭	মির্জা আবু তালিব খাঁ	২৪ বর্ষ, ১ম সংখ্যা, বৈশাখ-আষাঢ়, ১৩৬৯
সোভিয়েট দেশে তিন সপ্তাহ	২২ বর্ষ, ৩য় সংখ্যা, কার্তিক-পৌষ, ১৩৬৭	কংগ্রেস মতবাদ	২৫ বর্ষ, ১ম সংখ্যা, বৈশাখ-আষাঢ়, ১৩৭০

আধুনিক সাহিত্য

তিলাঞ্জলী (সুবোধ ঘোষ)	৭ম বর্ষ, ১ম সংখ্যা, আশ্বিন, ১৩৫১	Discovery of India by Pandit Jawaharlal Nehru	৮ম বর্ষ, ৩য় সংখ্যা, চৈত্র, ১৩৫২
বাংলা, হিন্দি, উর্দু সাহিত্যের সংকট	৭ম বর্ষ, ২য় সংখ্যা, পৌষ, ১৩৫১	Socialist Economics (G.D.H. Cole)	১২ বর্ষ, ১-২ সংখ্যা, বৈশাখ-আশ্বিন, ১৩৫৭
Darkness at Noon by Arthur Koestler Cope	৭ম বর্ষ, ৩য় সংখ্যা, চৈত্র, ১৩৫১	জতুগৃহ—সুবোধ ঘোষ	
Cope Arrival and Departure by Koestler Cope		মনের ময়ূর—প্রতিভা বসু	১৪ বর্ষ, ২য় সংখ্যা, শ্রাবণ-আশ্বিন, ১৩৫৯
রূপান্তর (বুদ্ধদেব বসু)		নাগিনী কন্যার কাহিনী—তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়	
উত্তর তিরিশ (বুদ্ধদেব বসু)	৭ম বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা, আষাঢ়, ১৩৫২	Sociology of Communism (Jules Monnerot)	১৪ বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা, মাঘ-চৈত্র, ১৩৫৯
সুমিত্রার অপমৃত্যু (প্রতিভা বসু)		ইতিহাস (রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর)	১৭ বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা, মাঘ-চৈত্র, ১৩৬২

গ্রন্থসমালোচনা

রবীন্দ্ররচনাবলী—প্রথম খণ্ড (বিশ্বভারতী)	২য় বর্ষ, ১ম সংখ্যা, আশ্বিন, ১৩৪৬	রবীন্দ্ররচনাবলী—৭, ৯, ১০ খণ্ড (বিশ্বভারতী)	৪র্থ বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা, আষাঢ়, ১৩৪৯
রবীন্দ্ররচনাবলী—২, ৩ খণ্ড (বিশ্বভারতী)	৩য় বর্ষ, ১ম সংখ্যা, আশ্বিন, ১৩৪৭	The Cripps Mission by R. Coupland	
রবীন্দ্ররচনাবলী—৪, ৫ খণ্ড (বিশ্বভারতী)	৩য় বর্ষ, ২য় সংখ্যা, পৌষ, ১৩৪৭	The Cultural Problem by A. J. Appaswami	
ছড়া (রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর)	৪র্থ বর্ষ, ১ম সংখ্যা, আশ্বিন, ১৩৪৮	Indian States by K. M. Panikkar	৫ম বর্ষ, ১ম সংখ্যা, আশ্বিন, ১৩৪৯
রবীন্দ্ররচনাবলী—৬ খণ্ড (বিশ্বভারতী)	৪র্থ বর্ষ, ২য় সংখ্যা, পৌষ, ১৩৪৮	India and Freedom by L. S. Amery	

...e study of India
by F. R. Maraes — ৫ম বর্ষ, ৩য় সংখ্যা, চৈত্র, ১৩৪৯

...ষ্যতের বাঙালী
(এস ওয়াজেদ আলী)

...রচনাবলী—১১, ১২, ১৩, ১৪, ১৫ খণ্ড (বিশ্বভারতী) — ৬ষ্ঠ বর্ষ, ১ম সংখ্যা, আশ্বিন, ১৩৫০

...dern Islam in India
by W. Cantwell Smith — ৬ষ্ঠ বর্ষ, ৩য় সংখ্যা, চৈত্র, ১৩৫০

Reflection on the Revolution of our Time
by Harold J. Laski — ৬ষ্ঠ বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা, আষাঢ়, ১৩৫১

The Political Element in the Development of Economic Theory
(Gunnar Myrdal) — ১৭ বর্ষ, ২য় সংখ্যা, শ্রাবণ-আশ্বিন, ১৩৬২

কবিতা

...া — ১ম বর্ষ, ২য় সংখ্যা, পৌষ, ১৩৪৫

...ভিযান — ১ম বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা, আষাঢ়, ১৩৪৬

অভিযান — ৫ম বর্ষ, ১ম সংখ্যা, আশ্বিন, ১৩৪৯

মহাত্মা গান্ধী — ১১ বর্ষ, ৩য় সংখ্যা, কার্তিক-পৌষ, ১৩৫৬

গল্প

...া — ১২ বর্ষ, ৩য় সংখ্যা, কার্তিক-পৌষ, ১৩৫৭

পদ্মা — ১২ বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা, মাঘ-চৈত্র, ১৩৫৭

চিত্রকলা

ছবির কথা — ৪র্থ বর্ষ, ১ম সংখ্যা, আশ্বিন, ১৩৪৮

হুমায়ুন কবির জন্মশতবার্ষিকী উদযাপন

২২-২৩ ফেব্রুয়ারি-২০০৬

আমজাদ হোসেন

গত ২২ ও ২৩ ফেব্রুয়ারি বিশ্বকোষ পরিষদ ও চতুরঙ্গ পত্রিকার উদ্যোগে বিদ্যাসাগর বাটিতে বর্ষব্যাপী হুমায়ুন কবির জন্মশতবার্ষিকী উদযাপনের সূচনা হল। প্রথম দিন—হুমায়ুন কবিরের শততম জন্মদিনে সভাপতিত্ব করেন ড. প্রতাপচন্দ্র চন্দ্র। অন্যান্য বিশিষ্টজনদের মধ্যে হুমায়ুন কবিরের জীবন ও কর্মের নানা দিক নিয়ে বক্তব্য পেশ করেন বিশ্বভারতী ও উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন উপাচার্য অধ্যাপক অম্লান দত্ত, বিশিষ্ট সাংবাদিক—লেখক সুখরঞ্জন সেনগুপ্ত ও অধ্যাপক হিমাচল চক্রবর্তী। শ্রোতাদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন হুমায়ুন কবিরের পরিবারের সদস্যরাও।

অনুষ্ঠানের সঞ্চালক চতুরঙ্গ পত্রিকার সম্পাদক আবদুর রাউফ আলোচনার সূচনায় বলেন যে হুমায়ুন কবির—স্মরণ বর্তমান পরিস্থিতিতে নানা কারণে তাৎপর্যপূর্ণ, অথচ আমরা তাঁকে বিস্মৃত হতে বসেছি। হুমায়ুন কবির চর্চার প্রধান অসুবিধা এই যে তাঁর কোনও প্রামাণ্য জীবনীগ্রন্থ পশ্চিমবাংলায় নেই। বাংলাদেশে দুটি জীবনী থাকলেও তা সহজলভ্য নয়। সর্বোপরি হুমায়ুন কবিরের বইপত্র বেশির ভাগ আমাদের দেশে কোথায়ই প্রায় বাজারে মেলে না। হয়ত কারও কারও ব্যক্তিগত সংগ্রহে তাঁর একটি দুটি বই থাকতেও পারে। কেন এই রকম হল, তা-ও একটি আলাদা অনুসন্ধানের বিষয়। যাঁরা হুমায়ুন কবিরকে ব্যক্তিগতভাবে চিনতেন, সেইরকম মানুষজনের সংখ্যাও ক্রমশ কমে যাচ্ছে। এঁদেরই কয়েকজন আজকের অনুষ্ঠানে উপস্থিত আছেন। তাঁদের আহ্বান করা হয়েছে হুমায়ুন কবির সম্পর্কে তাঁদের স্মৃতি এবং মূল্যায়ন উপস্থাপিত করার জন্য।

বিশিষ্ট সাংবাদিক সুখরঞ্জন সেনগুপ্ত তাঁর অনিঃশেষ স্মৃতির সঞ্চয় থেকে কয়েকটি ঘটনার উল্লেখ করে হুমায়ুন কবিরের একটি অন্তরঙ্গ পরিচয় তুলে ধরেন। তিনি বলেন যে তিনি হুমায়ুন কবিরকে তাঁর জীবনের শেষ দশ বছর (১৯৬০-৬৯) ঘনিষ্ঠভাবে জানার সুযোগ পান। তাঁর মনে পড়ে মওলানা আবুল কালাম আজাদের 'ইন্ডিয়া উইনস ফ্রিডম' বইটি প্রকাশিত হবার পর তুমুল বিতর্ক শুরু হয়। মৌলানার উর্দু ডিকটেশন থেকে হুমায়ুন কবির বইটির ইংরাজি অনুবাদ করেন। মওলানার চোস্ত উর্দুর কোনও কোনও শব্দের nuance কে সঠিকভাবে কোনও ইংরাজি শব্দে প্রকাশ করা দুরূহ মনে হত। সেই সময় হুমায়ুন কবির প্রায়শই জওহরলাল নেহরুর সঙ্গে আলোচনা করে সঠিক শব্দটি নির্বাচন করতেন। মওলানা আজাদ মাউন্টব্যাটন, সর্দার বল্লভভাই প্যাটেল ও জওহরলাল সম্পর্কে যেসব বিস্ফোরক মন্তব্য করেছিলেন, সেগুলি প্রকাশ করা উচিত হবে কি না—সে নিয়ে কবির মাঝে মাঝে নেহরুর সঙ্গে আলোচনা করতেন। কিন্তু নেহরু এতে কোনও আপত্তি করেননি। এমনকী প্রুফ সংশোধনের সময়েও কবির নেহরুকে জিজ্ঞাসা করেন এ সবকিছুই ছাপার অক্ষরে প্রকাশ করা উচিত হবে কিনা। নেহরু বলেছিলেন প্রতিটি শব্দই অপরিবর্তিত থাকবে। কিন্তু গ্রন্থটি প্রকাশের পর কংগ্রেসের একাংশ হুমায়ুন কবিরকে দোষারোপ শুরু করেন, অনেকেই বলেন যে মওলানা আজাদের জবানিতে এসব হুমায়ুন কবিরের কথা, মওলানার কথাকে হুমায়ুন কবির বিকৃত করেছেন। কবিরের তখন এক সংকটময় অবস্থা। (নেহরুর ক্যাবিনেটে) কিন্তু এইসব বিরূপ মন্তব্যকে নেহরু কঠোর ভাষায় সমালোচনা করেছিলেন এবং কবিরের সমর্থনে এগিয়ে এসেছিলেন। কবিরের ইন্টেলেকচুয়াল সততার ওপর এতটাই ছিল নেহরুর আস্থা।

সাংবাদিকতার সূত্রে লাওসের এক রাজপুত্রের সঙ্গে সুখরঞ্জনবাবুর ঘনিষ্ঠতা ছিল। ওই ভদ্রলোক ভাল ইংরাজি জানতেন না। কিন্তু তবুও তাঁর ভাঙা ভাঙা ইংরাজির সাহায্যেই তাঁকে নানা বিষয়ে প্রশ্ন করে সুখরঞ্জনবাবু কিছু খবর করতেন। একবার বিমানবন্দরে যখন সুখরঞ্জনবাবু এই রাজপুত্রের সঙ্গে নানা বিষয় নিয়ে কথা বলছিলেন তখন এই রাজপুত্র তাঁর ভাঙা ইংরাজি নিয়ে খুবই অস্বস্তি বোধ করছিলেন। ঘটনাটি লক্ষ করে হুমায়ুন কবির সুখরঞ্জনবাবুর কাছে রাজপুত্রের পরিচয় জেনে তাঁর সঙ্গে আলাপ করতে

চান। সুখরঞ্জনবাবু যখন তাঁদের পরিচয় করিয়ে দিলেন, হুমায়ুন কবির এই রাজপুত্রের সঙ্গে বিশুদ্ধ ফরাসি ভাষায় কথা বলতে শুরু করলেন। ওই রাজপুত্র তো ফরাসি ভাষায় কথা বলতে পেরে আনন্দে ভারত সরকারের এই কেন্দ্রীয় মন্ত্রীকে জড়িয়ে ধরলেন। আসলে লাওসের রাজপুত্র প্যারিসে পড়াশোনা করেছেন, কারণ লাওস তো ফ্রান্সের কলোনি ছিল। হুমায়ুন কবির তা জানতেন। পরে তাঁদের খুব বন্ধুত্বও হয়, এবং এই রাজপুত্র হুমায়ুন কবিরকে লাওসে আমন্ত্রণ জানালে তিনি লাওস ভ্রমণ করেন, এবং ফিরে এসে সুখরঞ্জনবাবুকে লাওসের রাজপরিবারের অনেক মজার মজার গল্প শোনান।

সুখরঞ্জনবাবু তাঁর বক্তব্যের শেষ অংশে হুমায়ুন কবিরের জীবনের একটি অজানা ঘটনার উল্লেখ করেন। এটা সবাই জানেন যে ১৯৬১ সালে রবীন্দ্রজন্মশতবার্ষিকী ভারতব্যাপী উদ্‌যাপিত হবার পিছনে হুমায়ুন কবিরের বিরাট ভূমিকা ছিল এবং এজন্য তিনি সরকার থেকে এক কোটি টাকা মঞ্জুর করিয়েছিলেন এবং ভারতের প্রত্যেক রাজ্যে একটি রবীন্দ্রসদন প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ তিনিই নিয়েছিলেন। ওই বছর হুমায়ুন কবির সুখরঞ্জনবাবুকে ফোন করে বলেন : 'তুমি তো কোনও খবরটবর রাখ না আজকাল, তুমি কি জান আলবার্তো মোরাভিয়া এখন কলকাতায়?' সুখরঞ্জনবাবুর তখন দমদম বিমানবন্দর কভার করার ডিউটি। বলেলেন 'সে কি! মোরাভিয়া কোন ফ্লাইটে এলেন, তা তো জানতেই পারি নি।' হুমায়ুন কবির বললেন 'তিনি ফ্লাইটে এলে তো তুমি জানবে? তিনি বোম্বে থেকে গাড়ি নিয়ে এসেছেন কলকাতায়। মোরাভিয়া ভারতের গ্রামীণ জীবন দেখতে চেয়েছিলেন। তাই এই মোটরের ব্যবস্থা।' ১৯৬১ সালে একটি বক্তৃতা দিতে গিয়ে হুমায়ুন কবিরের সঙ্গে মোরাভিয়ার আলাপ হয়। কবির তখনই তাঁকে রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে বক্তৃতা দেবার জন্য ভারতে আসার আমন্ত্রণ জানান। কিন্তু মোরাভিয়া তাঁকে বলেন যে তিনি 'গীতাঞ্জলি' ছাড়া রবীন্দ্রনাথের আর কোনও রচনাই পড়েননি। কবির তাঁকে আরও কিছু বই পাঠিয়ে দেবার প্রতিশ্রুতি দেন। জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষে ওই সময় সারা পৃথিবী থেকে অনেকেই আসেন বক্তৃতা দিতে। ওই অনুষ্ঠানের পরে অনেকেই বলেছিলেন যে মোরাভিয়ার বক্তৃতাই সব থেকে ভাল হয়েছিল। অর্থাৎ মোরাভিয়া সত্যিই অত্যন্ত আগ্রহ নিয়ে হুমায়ুন কবিরের পাঠানো বইপত্র মন দিয়ে পড়েছিলেন। সুখরঞ্জনবাবুবাবু গ্র্যান্ড হোটেলে মোরাভিয়ার সাক্ষাৎকারও নিয়েছিলেন। কেন্দ্রীয় মন্ত্রী হবার সুবাদে বহু ব্যস্ততা এবং দৌড়ঝাঁপের মধ্যেই কবির খবর পেলেন যে জসীমউদ্দীন অসুস্থ হয়ে কলকাতার হাসপাতালে ভর্তি হয়েছেন। জসীমউদ্দীনও রবীন্দ্রশতবার্ষিকী অনুষ্ঠানে যোগ দিতে এসেছিলেন। হুমায়ুন কবির ও জসীমউদ্দীন দু'জনেই ছিলেন ফরিদপুরের লোক। তাঁদের মধ্যে ছিল গভীর বন্ধুত্ব। হুমায়ুন কবির ফোন করে সুখরঞ্জনবাবুকে সে খবর দিয়ে জসীমউদ্দীনকে দেখতে একবার হাসপাতালে যেতে বলেন। সুখরঞ্জনবাবু হুমায়ুন কবিরকে বলেন—'আপনি এতসব পারেনও। রাজনীতি, মন্ত্রিসভার কাজের দায়িত্ব, তার মধ্যেও মোরাভিয়া, জসীমউদ্দীন—কী করে এতসব সামলান।' শুধু জসীমউদ্দীন নন, সুখরঞ্জনবাবু বলেন যে তিনি মন্ত্রী থাকাকালীন প্রেমেন্দ্র মিত্র, বুদ্ধদেব বসুসহ আরও অনেক বাংলার কবিসাহিত্যিকদের আর্থিক ও অন্যান্য নানাভাবে সাহায্যের ব্যবস্থা করেছিলেন। সুখরঞ্জনবাবুর এ ধরনের বক্তব্যের মধ্য দিয়ে হুমায়ুন কবিরের নানামুখী প্রতিভার কয়েকটি দিক জীবন্ত ও সুন্দরভাবে প্রকাশিত হয়।

এরপর অধ্যাপক হিমাচল চক্রবর্তী হুমায়ুন কবির সম্পর্কে তাঁর মূল্যায়ন উপস্থাপিত করেন। তিনি বলেন যে প্রথমে একজন বামপন্থী কর্মী হিসাবে হুমায়ুন সম্পর্কে তিনি বিরূপ মনোভাবাপন্নই ছিলেন। বস্তুত যখন তিনি দেখেন যে নির্বাচনের সময়ে বসিরহাট কেন্দ্রে শম্ভু মিত্র উৎপল দত্তসহ অনেকে হুমায়ুন কবিরের সমর্থনে অনুষ্ঠান করতে গেছেন, তখন তিনি রীতিমত ক্রুদ্ধ হন। পরে হীরেন মুখোপাধ্যায়ের 'তরী হতে তীর' গ্রন্থ পড়ে জানতে পারেন যে তাঁর ও হুমায়ুন কবিরের মধ্যে গভীর বন্ধুত্ব ছিল। তাঁরা দু'জনেই কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ঈশান স্কলার ছিলেন। বস্তুত একবার এই স্কলারশিপের টাকা পাওয়ার পর হীরেনবাবু ও হুমায়ুন কবির আরও কয়েকজন বন্ধুর সঙ্গে পুরী বেড়াতে গিয়েছিলেন। পুরীর হোটেলে হুমায়ুন কবিরের ধর্মপরিচয় গোপন করে হিন্দু নামে থাকা কোনার্ক যাবার পথে মোটরে 'শালা নেড়ে' জাতীয় মন্তব্য হুমায়ুন কবিরকে কতটা ব্যথিত ও অপমানিত করেছিলেন হীরেনবাবু তার উল্লেখ করেছেন। ওই বইয়ের আরও কয়েকটি জায়গায় হুমায়ুন কবিরের কথা হীরেনবাবু বলেছেন। পরে হীরেনবাবু তাঁর অন্য কোনও লেখায় হুমায়ুন কবির সম্পর্কে মন্তব্য করেছেন যে নেহরু ছাড়া হুমায়ুন কবিরই ছিলেন 'the lone intellectual in the Nehru cabinet'। এরপর হিমাচলবাবু কবিরের লেখা 'মার্কসবাদ' গ্রন্থটির আলোচনা করে বলেন এই বই কবিরের সম্পর্কে তাঁর শ্রদ্ধা বহুগুণ বাড়িয়ে দেয়। কবির নিজে মার্কসবাদে বিশ্বাসী না হলেও মার্কসবাদকে বিকৃত না করেও যেরকম জ্ঞানগর্ভ ও নৈর্ব্যক্তিকভাবে মার্কসবাদ ব্যাখ্যা করেছেন তা পড়ে তিনি বিস্মিত হন। কবিরের পাণ্ডিত্য ও রচনাশৈলী যেভাবে তাঁর 'The Indian Heritage' গ্রন্থে বিধৃত রয়েছে, তাও তাঁকে মুগ্ধ করে। এত কম পরিসরে ভারতের সুদীর্ঘ ও

সমৃদ্ধ ঐতিহ্যকে যেভাবে তিনি আলোচনা করেছেন। তা বোধহয় হুমায়ুন কবির ছাড়া অন্য কারও পক্ষে সম্ভব ছিল না।

অধ্যাপক অম্লান দত্ত তাঁর স্বভাবজ মৃদু অথচ তীব্র অন্তর্ভেদী ভঙ্গিতে হুমায়ুন কবির সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত ও মহামূল্যবান বিশ্লেষণ উপস্থাপিত করেন। তিনি বলেন যে যদিও হুমায়ুন কবিরের সঙ্গে ছাত্রজীবন থেকে তাঁর ঘনিষ্ঠ পরিচয় ছিল, তবু শতবার্ষিকী উপলক্ষে বিশেষভাবে স্মৃতিচারণ করা তাঁর উদ্দেশ্য নয়। কারণ স্মৃতি মানুষকে পিছনের দিকে নিয়ে যেতে চায়। হুমায়ুন কবিরের জীবন ও কৃতি আজ আমাদের বর্তমান ও ভবিষ্যতের জন্য কী পথ নির্দেশ দিতে পারে, তাই আমাদের বিশেষভাবে আলোচ্য হওয়া উচিত। হুমায়ুন কবির প্রেসিডেন্সি কলেজ ও কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উজ্জ্বল ছাত্র ছিলেন, সেটা খুব বড় ব্যাপার নয়, উজ্জ্বল ছাত্র কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের থেকে আরও অনেকেই বেরিয়েছেন। কিন্তু তিনি তাঁর পরবর্তী জীবন ও কাজের মধ্য দিয়ে আমাদের সামনে যে উদাহরণ রেখে গেছেন তাকেই আমাদের বিবেচনা করতে হবে।

উত্তরে হিমালয় পর্বত আর দক্ষিণে সমুদ্র দিয়ে ঘেরা এই বিশাল দেশ আমাদের ভারতবর্ষ। এই মহাদেশসদৃশ ভূখণ্ডে বাস করছে নানা জনগোষ্ঠী, ধর্মগোষ্ঠী, ভাষাগোষ্ঠী। ভৌগোলিক কাঠামোও যেন নির্দেশ করছে এখানে আমাদের মিলেমিশেই থাকতে হবে। হয় আমরা মিলেমিশে থেকে বাঁচব, নয় আমরা পরস্পরকে মারব ও শেষ হয়ে যাব। এখানে সংখ্যাগুরু ও সংখ্যালঘুর সমস্যাও খুব প্রাসঙ্গিক নয়। কারণ সংখ্যাগুরু হিন্দুসম্প্রদায়ের মধ্যেও রয়েছে অনেক ভেদবিভেদ, দ্বন্দ্ব-সংঘর্ষ। সুতরাং টিকে থাকতে গেলে মিলেমিশে থাকাই আমাদের নিয়তি। হুমায়ুন কবির এই সত্য উপলব্ধি করেছিলেন। তাঁর কাজ ও সৃষ্টির মধ্যে সর্বত্র তিনি এই উপলব্ধিকেই ব্যক্ত করে গেছেন, এই বোধকে প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছেন। এজন্য তাঁকে বিরোধিতার সম্মুখীন হতে হয়েছে। এমনকী তাঁর বিরুদ্ধবাদীরা মেরে তাঁর মাথা ফাটিয়ে দিয়েছে। কিন্তু তাতে কী? যিনি মূল জার্মান থেকে কান্টের দর্শন বাংলায় অনুবাদ করেছেন, যিনি কান্টের যুক্তিবাদে বিশ্বাস করেন, তাঁকে মাথা ফাটিয়ে দিয়ে তাঁর মত পরিবর্তন করা যায় না। আজকে ভারতবর্ষে নানা ক্ষুদ্র সংকীর্ণ গোষ্ঠী, সম্প্রদায়, দলমত যে বিভেদের ও অনৈক্যের বিপদ আমাদের সামনে সৃষ্টি করে চলেছে, হুমায়ুন কবিরের জীবন ও চিন্তার চর্চা আমাদের সামনে কিছু পথ নির্দেশ উপস্থিত করতে পারে।

এরপর অনুষ্ঠানের সভাপতি প্রাক্তন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী শ্রী প্রতাপচন্দ্র চন্দ্র তাঁর বক্তব্যে কেন্দ্র ও রাজ্যস্তরের কংগ্রেসি রাজনীতিতে তাঁর দীর্ঘ অভিজ্ঞতা বর্ণনা প্রসঙ্গে হুমায়ুন কবিরের সঙ্গে তাঁর যোগাযোগের উল্লেখ করেন। বিশেষভাবে তিনি যখন কংগ্রেস ত্যাগ করেন, তখন তিনি হুমায়ুন কবিরের ভাই জাহাঙ্গির কবিরের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা-সূত্রে হুমায়ুন কবিরের কাছ থেকে অনেক পরামর্শ ও সহযোগিতা পান। হুমায়ুন কবিরের সঙ্গে বিভিন্ন আলোচনার সময়ে তখনকার রাজনৈতিক অবস্থার সঠিক বিশ্লেষণ তাঁকে বিস্মিত করে। ড. প্রতাপচন্দ্র চন্দ্রের বক্তৃতা থেকে রাজনীতিক হুমায়ুন কবিরের কিছুটা পরিচয় শ্রোতাদের সামনে স্বচ্ছ হয়ে ওঠে।

দ্বিতীয় দিনের অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন বিশিষ্ট বুদ্ধিজীবী আবদুর রাউফ। হুমায়ুন কবির স্মারক বক্তৃতা দেন বিশিষ্ট চিন্তাবিদ ও লেখক শ্রীশৈলেশকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়। এছাড়াও বক্তব্য রাখেন বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন উপাচার্য ও বিশিষ্ট বিজ্ঞানী শ্রীদিলীপকুমার সিংহ। অনুষ্ঠানের শুরুতেই আবদুর রাউফ হুমায়ুন কবিরের একটি সংক্ষিপ্ত জীবনপঞ্জি ও সংক্ষিপ্ত বিশ্লেষণাত্মক মন্তব্যসহ তাঁর প্রধান গ্রন্থগুলির একটি তালিকা শ্রোতাদের সামনে পেশ করেন।

ভারতের স্বাধীনতার পর প্রথম কয়েকটি দশকে ভারতের বৈজ্ঞানিক গবেষণার প্রসারে হুমায়ুন কবিরের একটি ভূমিকা ছিল। ড. দিলীপকুমার সিংহ স্বল্পজ্ঞাত বিষয়টি নিয়ে সংক্ষেপে অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে তথ্যাশ্রয়ী একটি উপস্থাপনা পেশ করেন। হুমায়ুন কবির মিনিস্ট্রি অফ সাইন্টিফিক রিসার্চ অ্যান্ড কালচার দপ্তরের মন্ত্রী হিসাবে, ও পরবর্তীকালে পেট্রোলিয়াম ও রসায়ন দপ্তরের মন্ত্রিত্বের দায়িত্ব পালন করেছিলেন। ১৯৬৪-৬৫ সালে তিনি ভারতের বিজ্ঞান কংগ্রেসের সভাপতিত্ব করেন। তাছাড়া তিনিই ছিলেন স্বাধীন ভারতের সদ্যপ্রতিষ্ঠিত বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের প্রথম চেয়ারম্যান। হুমায়ুন কবির শুধু lone intellectual in the cabinet ছিলেন না, তাঁর ছিল একটি বিজ্ঞানচেতনাসম্পন্ন মানসিকতা (scientific temper)। এই মানসিকতার জন্যই বিজ্ঞানী না হয়েও তিনি বিজ্ঞান কংগ্রেসের সভায় বিজ্ঞানের গুরুত্ব নিয়ে মনোমুগ্ধকর বক্তব্য উপস্থাপিত করতে পারতেন—প্রবীণ ও তরুণ বৈজ্ঞানিকরা তাঁর বক্তব্য শ্রদ্ধার সঙ্গে শুনতেন। মন্ত্রী হিসাবে তিনি সাহা ইনস্টিটিউট অফ নিউক্লিয়ার ফিজিক্সকে উদারহস্তে অর্থ বরাদ্দ করেছিলেন। সমাজ ও বিজ্ঞানের সম্পর্ক নিয়ে তাঁর বক্তব্য ছিল অত্যন্ত আধুনিক। এই বৈজ্ঞানিক মানসিকতার জন্যই হয়ত হুমায়ুন কবির ভারতের composite culture-এর প্রতি এত শ্রদ্ধাশীল হতে পেরেছিলেন। প্ল্যানিং কমিশনের সেক্রেটারি থাকার সময়ে তিনি নানা পুস্তিকা রচনা করেছিলেন। সেগুলির সন্ধান ও সংগ্রহ করা দরকার বলে ড. সিংহ মনে করেন। তিনি হুমায়ুন কবিরের এই ভূমিকা নিয়ে একটি প্রবন্ধ রচনা করে

'চতুরঙ্গ' পত্রিকা দপ্তরে পাঠিয়ে দেন; এ বিষয়টি উল্লেখ করে ড. সিংহ তাঁর কৌতূহলোদ্দীপক বক্তব্য সংক্ষেপে শেষ করেন।

শ্রদ্ধেয় লেখক শ্রীশৈলেশ বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর স্মারক বক্তৃতায় হুমায়ুন কবিরের বহুমুখী ব্যক্তিত্বের কয়েকটি দিকে আলোকপাত করেন। শৈলেশবাবু ছোটবেলা থেকেই তাঁর জীবনের অনেকটা বছর বাংলার বাইরে কাটিয়েছেন। তবু বাংলাভাষায় প্রকাশিত পত্রপত্রিকার মাধ্যমেই বাংলার সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ থাকত। সেইভাবে একবার 'মাস পয়লা' পত্রিকায় 'অক্সফোর্ডের জীবন' নামে হুমায়ুন কবিরের একটি লেখা পড়ে তিনি তাঁর নামের সঙ্গে পরিচিত হন। ওই লেখায় হুমায়ুন কবির অক্সফোর্ডের শিক্ষাব্যবস্থা, ছাত্র-শিক্ষক সম্পর্ক, অক্সফোর্ডের শিক্ষাজীবনের নানা খুঁটিনাটি নিয়ে অত্যন্ত আকর্ষণীয় ভঙ্গিতে লিখেছিলেন।

বেনারসে থাকার সময়ে 'উত্তরা' পত্রিকার সম্পাদক সুরেশ চক্রবর্তী ও লেখক মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়ের সঙ্গে তাঁর কর্মসূত্রে যোগাযোগ ছিল। সেই সময় তিনি জানতে পারেন যে হুমায়ুন কবির নিজের চেষ্টায় প্রেমেন্দ্র মিত্রসহ অনেক সাহিত্যিকের পেনশনের ব্যবস্থা করেছিলেন অত্যন্ত উদারভাবে। বাংলাভাষার লেখকশিল্পীদের জন্য হুমায়ুন কবির তাঁর সাধ্যমতো নানাভাবে সাহায্য করতেন। সর্বোপরি তিনি ছিলেন মুক্তবুদ্ধি, সংস্কৃতিবান সাহিত্যশিল্পপ্রেমী বুদ্ধিজীবী। এই জন্যই তাঁর নির্বাচনী কেন্দ্রে গণনাট্যের শিল্পীরা এবং উৎপল দত্তের মতো বামপন্থী মতের মানুষও গিয়ে তাঁর সমর্থনে প্রচার করেছেন, নাটক অভিনয় করেছেন।

আর আমরা হলদিয়া পেট্রোকেমিক্যালস নিয়ে অনেক কথা শুনছি। কিন্তু হুমায়ুন কবির কেন্দ্রে পেট্রোলিয়াম ও রসায়ন দপ্তরের মন্ত্রী থাকার সময়েই হলদিয়ায় তৈল শোধনাগারের সূচনা হয়েছিল। হলদিয়াকে শিল্পাঞ্চল হিসাবে গড়ে তোলার প্রচেষ্টার জন্য হুমায়ুন কবিরের কৃতিত্বকে অস্বীকার করা যায় না। তাঁরই চেষ্টায় দুর্গাপুরে সার কারখানা প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল এবং প্রধানমন্ত্রী নেহরুকে দিয়ে এই কারখানা উদ্বোধন করার কৃতিত্বও হুমায়ুন কবিরের।

শৈলেশবাবু বলেন যে হুমায়ুন কবিরকে তিনি একবারই দেখেছিলেন। গান্ধীজি বিষয়ক এক প্রবন্ধ লেখার জন্যে তিনি হুমায়ুন কবিরকে একবার অনুরোধ করেছিলেন। এই প্রসঙ্গেই তাঁর সঙ্গে কবিরের দেখা হয়। হুমায়ুন কবির যথাসময়ে তাঁর লেখা পাঠিয়ে দিয়েছিলেন।

হুমায়ুন কবিরের সত্যিই ছিল বহুমুখী প্রতিভা। চিন্তক, গবেষক, লেখক, অধ্যাপক, মন্ত্রী, রাজনীতিবিদ—সাহিত্যশিল্প, বিজ্ঞানচিন্তা—জীবনের কত দিকে যে তাঁর কর্ম ও শক্তি বিস্তৃত ছিল, পূর্ণতার সন্ধান করেছিল, তা ভাবলে বিস্ময়ের সীমা থাকে না। এই ধর্মনিরপেক্ষ, আদ্যন্ত বাঙালি, মানবদরদী কবিরকে শ্রদ্ধা জানিয়ে শৈলেশবাবু তাঁর বক্তব্য শেষ করেন।

এরপর অনুষ্ঠানের সভাপতি চতুরঙ্গ সম্পাদক আবদুর রাউফ সভাপতির ধরাবাঁধা সীমিত বক্তব্যের গণ্ডি ছাড়িয়ে একটু বিস্তৃত পরিসর নিয়ে বক্তব্য রাখার জন্য শ্রোতাদের প্রশ্রয় চান এবং শুরুতেই বলেন যে তিনি হুমায়ুন কবিরকে আবিষ্কার করার চেষ্টা করছেন নিজেকে আবিষ্কার করার তাগিদ থেকে। হুমায়ুন কবিরের লেখা বইপত্রের বর্তমান দুষ্প্রাপ্যতার জন্য এই প্রচেষ্টা মোটেই সহজ নয়। তিনি তথাপি এই অনুসন্ধান চালিয়ে যাচ্ছেন। তিনি বলেন যে হুমায়ুন কবিরের পূর্বপুরুষেরা মুঘল আমল থেকেই পরিবারের মধ্যে একটি শিক্ষা ও সংস্কৃতির ধারা চালু করেছিলেন। হুমায়ুন কবিরের পিতামহ-প্রপিতামহরা ফারসি শিক্ষায় শিক্ষিত ছিলেন। তাঁর পিতামহ কলকাতা মাদ্রাসায় লেখাপড়া শেষ করে ব্রিটিশ আমলে ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট হয়েছিলেন। তিনি সিপাহি বিদ্রোহীদের সাহায্য করেছিলেন এবং ইংরাজি শিক্ষা গ্রহণ করেননি। তিনি ফারসি ভাষায় বিচারের রায় লেখার বিশেষ অনুমতি ব্রিটিশ সরকারের কাছে চেয়ে নিয়েছিলেন। তিনি হুমায়ুনের পিতা কবিরউদ্দীন আহম্মদকেও প্রথম দিকে ইংরাজি পড়াতে চাননি। পরে এ. কে ফজলুল হকের হস্তক্ষেপে কবিরউদ্দীন ইংরাজি ভাষা শেখেন ও আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত হন। ইনিও সরকারি চাকরি করেন এবং ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট হন। প্রেসিডেন্সি কলেজের শিক্ষক আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় ছিলেন হুমায়ুন কবিরের পিতার ঘনিষ্ঠ পরিচিত ও শ্রদ্ধাভাজন এবং সেই সূত্রে তাঁদের পারিবারিক ঘনিষ্ঠতা ছিল। অর্থাৎ সেইসময় একটি ক্রমবিকাশশীল আধুনিক মনন ও পরিবেশ ছিল হুমায়ুন কবিরের পারিবারিক উত্তরাধিকার। অন্যদিকে কবিরউদ্দীনের মা অর্থাৎ হুমায়ুন কবিরের পিতামহী ছিলেন ফরায়েজি আন্দোলনের উদ্‌গাতা হাজি শরীয়তুল্লার পুত্র দুদু মিঞার কন্যা। তিনি নিয়মিত নামাজ রোজা পালন করতেন। অর্থাৎ মুঘল আমল থেকে চলে আসা এক সমৃদ্ধ ইসলামি সংস্কৃতি ছিল পারিবারিক সূত্রে হুমায়ুন কবিরের উত্তরাধিকার। এবং তিনি এই সমৃদ্ধ ইসলামি সংস্কৃতিকে কখনও অস্বীকার করেননি। আবার জন্মভূমি ভারতবর্ষের হিন্দুসংস্কৃতির সঙ্গেও হুমায়ুন কবির ছিলেন গভীরভাবে পরিচিত। অর্থাৎ হুমায়ুন কবিরের মধ্যে সার্থকভাবে সমন্বিত হতে পেরেছিল তিনটি সংস্কৃতির ধারা—ইসলামি সংস্কৃতি, হিন্দুসংস্কৃতি ও আধুনিক পাশ্চাত্য সংস্কৃতি। আধুনিক ভারতের ইতিহাসে তাই হুমায়ুন কবিরের ভূমিকা হতে

পেরেছিল সমসাময়িক হিন্দু বুদ্ধিজীবীদের তুলনায় কিছুটা স্বতন্ত্র। এখানে যে কোনও একজন হিন্দু দুটি সংস্কৃতির ধারা বহন করতে পারেন—হিন্দুসংস্কৃতি এবং আধুনিক পাশ্চাত্যসংস্কৃতি। কিন্তু আবদুর রাউফ সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজের প্রায়শ বলা একটি কথা উল্লেখ করে বলেন যে এদেশে একজন শিক্ষিত মুসলমানের পক্ষে তিনটি সংস্কৃতির ধারা বহন না করে উপায় থাকে না।

এ যুগের একজন আধুনিক শিক্ষিত ভারতীয় তথা বাঙালি মুসলমান হিসাবে হুমায়ুন কবির তাই তাঁর সমস্ত সৃষ্টিকর্মে একটি অনন্যতার ছাপ রেখে যেতে পেরেছেন। তিনি শুধু দেশজুড়ে রবীন্দ্রনাথের জন্মশতবার্ষিকী পালনে অক্লান্ত পরিশ্রম করেছিলেন তা-ই নয়—তিনি রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে ইংরাজিতে গ্রন্থ লিখেছেন—এবং তাঁর রবীন্দ্রমূল্যায়ন অনন্য হয়েছে তাঁর বিশিষ্ট মানসিক গঠনের জন্যই। অন্য সমালোচকদের যা দৃষ্টি এড়িয়ে যায়, হুমায়ুন কবির তা বিশ্লেষণ করতে পারেন অনায়াস মৌলিকতায়। এবং শুধু রবীন্দ্রনাথ নয়, মধুসূদন, বঙ্কিমচন্দ্র, শরৎচন্দ্র, আধুনিক বাংলা উপন্যাস ও বাংলা কাব্য নিয়ে তাঁর বিশিষ্ট আলোচনা এখনও মৌলিকতায় ভাস্বর। তিনি জানতেন কোথায় তাঁদের শক্তি, কোথায় অপূর্ণতা। স্বতঃস্ফূর্ত ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবোধের অভাবে আধুনিক সাহিত্য সৃষ্টি করা যায় না, এই ছিল তাঁর বিশ্বাস। তিনি মনে করতেন মীর মোসাররফ হোসেনের মধ্যে এই ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য এবং সমাজমানসের সঙ্গে আধুনিক দ্বন্দ্বচেতনার অভাব ছিল বলেই বঙ্কিমী ভাষা ও আঙ্গিকের সার্থক অনুকরণ করলেও তাঁকে আধুনিক ঔপন্যাসিক বলা যায় না।

হুমায়ুন কবির তাঁর উত্তরাধিকার সূত্রে পাওয়া সমৃদ্ধ মুসলমান ঐতিহ্যকে স্বীকার করতেন বলেই তিনি The Meaning of Islam গ্রন্থ লিখেছিলেন। 'ভারতবর্ষে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের সমস্যা' এবং 'Muslim Politics (1906-47) and other Essays' এসব গ্রন্থেও রয়েছে তাঁর অন্তহীন জিজ্ঞাসা, দ্বন্দ্বমুখর ব্যক্তিস্বতন্ত্রতার পরিচয়। হিন্দু ও ইয়োরোপীয় সাংস্কৃতিক চেতনার সঙ্গে সঙ্গে তাঁর মুসলিম ঐতিহ্যচেতনার প্রেরণাতে তিনি অনুবাদ করেছিলেন 'মসদ্দসে হালী'। প্রগতিপন্থী উর্দু কবি হালী স্যার সৈয়দ আহমদের সংস্পর্শে এসেছিলেন। তিনি তাঁর ধর্মীয় সত্তাকে অস্বীকার না করেও ভারতীয় সত্তা ও ইয়োরোপের সভ্যতার সদর্থক গুণগুলির দিকে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলেন। সাধারণত মুসলমানরা আধুনিক ইয়োরোপকে ধর্মহীন বলেই মনে করে। তিনি ধর্মহীন শব্দের পাশে প্রশ্নচিহ্ন দিয়ে 'ধর্মহীন? ইয়োরোপ' লিখেও দেখান যে কীভাবে ইয়োরোপে মানুষ একে অপরের জন্য দেশের জন্য, স্বধর্ম স্বজাতির জন্য প্রাণ দিতে প্রস্তুত থাকে। অর্থাৎ সত্যিই কি তারা তাহলে 'ধর্মহীন'? বাহ্যিক দৃষ্টিতে ধর্মহীন মনে হলেও তারা বোধহয় ধর্মের গভীর আদর্শগুলিকে মান্যতা দেন। কিন্তু বর্তমান সময়ের মুসলমানরা তাদের পূর্বগৌরব বিস্মৃত হয়েছে, ধর্মের উচ্চ আদর্শ থেকে সরে গিয়ে শুধু যান্ত্রিকভাবে ধর্মাচরণ করে যাচ্ছে এবং সেজন্যই বোধহয় মুসলমানরা সত্যের যুগোপযোগী স্বরূপ, শিল্প-প্রযুক্তি এবং সেই পথে বিত্তের জন্য তেমনভাবে সাধনা করতে পারছে না, সাফল্যলাভ করতে পারছে না। হালীর কাব্য অনুবাদ করে হুমায়ুন কবির বোধহয় এইভাবে তাঁর হৃদয়ের আবেগ ও যন্ত্রণাকে প্রকাশ করতে চেয়েছিলেন। প্রসঙ্গত আবদুর রাউফ উল্লেখ করেন যে হালীর এই অনুবাদ 'মসদ্দসে হালী' সম্প্রতি বিশ্বকোষ পরিষদ প্রকাশিত 'বুলবুল' সংকলনে পুরোটাই গৃহীত হয়েছে। তিনি তাঁর বক্তব্য শেষ করেন এই বলে যে নিজেকে বোঝার জন্যই তাঁর হুমায়ুন কবিরকে আবিষ্কারের প্রয়াস এখনও চলছে। তাঁর পরবর্তী উপলব্ধি হয়ত ভবিষ্যতে অন্য কোনও উপলক্ষে তিনি উপস্থাপিত করবেন। এরপর বিশ্বকোষ পরিষদ সম্পাদক পার্থ সেনগুপ্ত সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে এই দু'দিনব্যাপী অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

আমার সময়ের কথা

ননীমাধব চৌধুরী
সম্পাদনা ও টীকা—সুমিতা চক্রবর্তী

(পূর্বপ্রকাশিতের পর)

ভূমিকা

ননীমাধব চৌধুরীর লেখা আট খণ্ডে পরিকল্পিত বিশাল উপন্যাসের পাঁচটি খণ্ড প্রকাশিত হয়েছিল। ষষ্ঠ ও সপ্তম খণ্ড প্রকাশ করা সম্ভব হয়নি। লেখক নিজের উদ্যোগে অষ্টম খণ্ডটি প্রকাশ করেন। বিজ্ঞানী ও গভীর সংস্কৃতিমনস্ক ব্যক্তিত্ব সত্যেন্দ্রনাথ বসু ছিলেন ননীমাধব চৌধুরীর বন্ধুপ্রতিম। তিনি এই শেষ খণ্ডের একটি ভূমিকা লিখে দেন। সেই ভূমিকাটি এখানে পুনর্মুদ্রিত হল। লেখক ননীমাধব চৌধুরীর পরিচয় এখানে উজ্জ্বল হয়ে ফুটে উঠেছে। উপন্যাসটির আখ্যাপত্র ছিল নিম্নরূপ।

শেষ অধ্যায়

(ভারতবর্ষের স্বাধীনতা সংগ্রামের কাহিনী, ১৯৪৬-১৯৪৮)
ননীমাধব চৌধুরী
বাক্ সাহিত্য প্রাইভেট লিমিটেড
৩৩, কলেজ রো, কলিকাতা-৯
প্রথম প্রকাশ : বৈশাখ ১৩৮১

লেখক পরিচিতি

প্রবীণ লেখক ননীমাধব চৌধুরী সবুজপত্র গোষ্ঠীর অল্পসংখ্যক জীবিত সভ্যদের মধ্যে একজন।

ফরাসী ও স্প্যানিশ থেকে বাংলা অনুবাদ দিয়ে তাঁর সাহিত্যকর্ম আরম্ভ হয়। মোপাসাঁ ও আনাতোল ফ্রাঁসের কয়েকটি গল্পের ফরাসী থেকে বাংলা এবং নোবেল পুরস্কারপ্রাপ্ত স্প্যানিশ নাট্যকার যাসিন্তো বেনাভেন্তের একটি নাটিকার স্প্যানিশ থেকে বাংলা অনুবাদ সবুজপত্রে প্রকাশিত হয়েছিল। ভারতী, আত্মশক্তি, বিজলী ও প্রবাসীতে মোপাসাঁ, আনাতোল ফ্রাঁসের গল্প এবং বেনাভেন্তের আর একটি নাটিকার অনুবাদ এবং বের্গসঁর একটি সুদীর্ঘ প্রবন্ধের (La Science Francaise হতে গৃহীত) অনুবাদ নব্যভারতে প্রকাশিত হয়েছিল। মোপাসাঁর গল্পগুলির অনুবাদ "মোপাসাঁর গল্প" নামে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়েছে। এই গ্রন্থের ভূমিকা লিখেছেন প্রমথ চৌধুরী। ফ্রাঁস, বের্গসঁর ও বেনাভেন্তে হতে অনুবাদগুলি বিভিন্ন পত্রিকার পাতায় রয়ে গিয়েছে। অনুবাদ বিভাগে তাঁর বড় কাজ রুশোর বিশ্ববিখ্যাত রাজনৈতিক দর্শনের ক্লাসিক গ্রন্থ *Du Contrat Social*-এর ফরাসী থেকে বাংলা অনুবাদ, সামাজিক চুক্তি। এই গ্রন্থের দ্বিতীয় সংস্করণ সাহিত্য একাডেমী প্রকাশ করেছে (১৯৬৯)।

দ্বিতীয় পর্বে ননীমাধব চৌধুরী ইংরাজিতে ও বাংলায় গবেষণা-মূলক প্রবন্ধের লেখকরূপে দেখা দিয়েছেন। এই দুটি ভাষায় রচিত তাঁর প্রবন্ধের সংখ্যা একশত। ইংরাজিতে লিখিত প্রবন্ধগুলি Science and Culture, Journal of the Ascatic Society of Bengal, Indian Historical Quarterly, Indian Culture, Man the India, Calcutta Review-তে প্রকাশিত হয়েছে। বাংলায় লিখিত গবেষণা-মূলক প্রবন্ধগুলি জ্ঞান ও বিজ্ঞান, প্রবাসী, বঙ্গশ্রী, আনন্দবাজার পত্রিকায় রবিবাসরীয় সংখ্যায় প্রকাশিত হয়েছে।

এছাড়া সমসাময়িক ঘটনা বা প্রসঙ্গ নিয়ে লিখিত কতকগুলি প্রবন্ধ Modern Review, Hindusthan Standard, Amrita Bazar Patrika এবং Statesman-এ প্রকাশিত হয়েছে।

গবেষণা-মূলক প্রবন্ধগুলির বিষয়বস্তু ভারতবর্ষের অধিবাসীর জাতি-পরিচয় সম্পর্কে নৃ-বিজ্ঞানের গবেষণা, সিন্ধু সভ্যতার বাহকগণের জাতি-পরিচয় সম্পর্কে নৃ-বিজ্ঞানের গবেষণা-মূলক প্রবন্ধগুলি জ্ঞান ও বিজ্ঞান, প্রবাসী, বঙ্গশ্রী, আনন্দবাজার পত্রিকায় রবিবাসরীয় সংখ্যায় প্রকাশিত হয়েছে।

এছাড়া সমসাময়িক ঘটনা বা প্রসঙ্গ নিয়ে লিখিত কতকগুলি প্রবন্ধ Modern Review, Hindusthan Standard, Amrita Bazar Patrika এবং Statesman-এ প্রকাশিত হয়েছে।

গবেষণামূলক প্রবন্ধগুলির বিষয়বস্তু ভারতবর্ষের অধিবাসীর জাতিপরিচয় সম্পর্কে নৃ-বিজ্ঞানের গবেষণা, সিন্ধু সভ্যতার বাহকগণের জাতি-পরিচয় ও ধর্ম সম্বন্ধে নৃ-বিজ্ঞানী এবং প্রত্নতত্ত্ববিদ পণ্ডিতগণের মতবাদের আলোচনা, ঋগ্বেদীয় রাজকুল ও কবিকুলের জাতি-পরিচয় ও ঋগ্বেদীয় ধর্ম সম্বন্ধে আলোচনা, বৈদিক সাহিত্যে এবং প্রাচীন সুমের, ব্যাবিলোনিয়া, মিশর আনাতোলিয়া, ফ্রিজিয়া ইত্যাদি দেশের ধর্মে মাতৃ উপাসনা, আর্যজাতি তত্ত্ব ইত্যাদি। আর্যজাতির পরিচয় সম্পর্কে প্রচলিত মত ননীমাধববাবু গ্রহণ করেননি, তাঁর মতে আর্য কথাটির উৎপত্তি ভৌগোলিক। কথাটি এসেছে পূর্ব-ইরাণের প্রাচীর নাম আইরিয়ানা হতে এবং ঋগ্বেদ রচনার অনেক আগে থেকে আর্যজাতি ভারতবর্ষের অধিবাসী। বাংলায় লিখিত নৃ-বিজ্ঞান বিষয়ক কুড়িটি প্রবন্ধ "ভারতবর্ষের অধিবাসীর পরিচয়" নামে বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ কর্তৃক প্রকাশিত হয়েছে (১৯৬৯)। এই গ্রন্থ রবীন্দ্র স্মৃতি পুরস্কার লাভ করেছে। প্রাক্-ঐতিহাসিক ভারতবর্ষের অধিবাসীর জাতি ও সাংস্কৃতিক পরিচয়ের ওপর লিখিত কুড়িটি প্রবন্ধের সংকলন গ্রন্থাকারে প্রকাশের অপেক্ষায় আছে। ইংরাজিতে লিখিত প্রবন্ধগুলি বিভিন্ন পত্রিকার পাতায় রয়ে গিয়েছে।

তৃতীয় পর্বে ননীমাধববাবু দেখা দিয়েছেন গল্প লেখকরূপে। বিভিন্ন পত্র পত্রিকায় প্রকাশিত তাঁর গল্পের সংখ্যা অন্যূন পঞ্চাশ। গল্পগুলি প্রবাসী, মাসিক বসুমতী, শনিবারের চিঠি, দেশ, আনন্দবাজার পত্রিকা রবিবাসরীয় সংখ্যা, বসুধারা, গল্প ভারতী ইত্যাদি কাগজে প্রকাশিত হয়েছে। কয়েকটি গল্প দেশ বিভাগের সময়কার ঘটনা নিয়ে লিখিত। অধুনা লুপ্ত "ছোটগল্প"

নামক সাপ্তাহিকে প্রকাশিত কয়েকটি গল্প "লুপু ংগুটু" নামে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়েছে।

চতুর্থপর্বে ননীমাধব চৌধুরীকে বাংলা সাহিত্যের ঐতিহাসিক উপন্যাস বিভাগে একটি নতুন শাখার প্রবর্তকরূপে দেখা যায়। এই শাখা বাংলা সাহিত্যে documentary political novel বা প্রামাণ্য রাজনৈতিক উপন্যাস শাখা।

ঐতিহাসিক উপন্যাস বাংলা সাহিত্যে অনেকদিন থেকে রয়েছে, যার বেশীর ভাগ ঐতিহাসিক রোমান্স। ননীমাধববাবুর ঐতিহাসিক উপন্যাস সম্পূর্ণ নূতন জিনিস। আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রামের কাহিনী আশ্রয় করে বাংলা দেশের পঞ্চাশ বছরের জীবনে প্রধানত রাজনৈতিক হলেও অন্যান্য দিকে পরিবর্তনের একটি বিরাট চিত্র পাঠকগণের কাছে উপস্থিত করেছেন তিনি আট খণ্ডে লিখিত উপন্যাসের মাধ্যমে। এই সুদীর্ঘ কাহিনী আরম্ভ হয়েছে দেশের ইংরাজি শিক্ষিত মধ্যবিত্ত সমাজের ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা স্বদেশী আন্দোলনের (১৯০৫) সময় থেকে, তারপর ধাপে ধাপে এগিয়ে শেষ হয়েছে গান্ধী হত্যার চরম ট্র্যাজেডিতে পৌঁছে (১৯৪৮)।

আট খণ্ডে লিখিত উপন্যাসের মধ্যে রাজনগর (১৯০৫-৬), দেবানন্দ (১৯২৭-৯), স্ফুলিঙ্গ (১৯১০-১৪), অভিযাত্রী (১৯১৫-১৯) এবং আবির্ভাব (১৯২০-২৫), এই পাঁচ খণ্ড প্রকাশিত হয়েছে। প্রথম খণ্ড রাজনগরের ভূমিকা লিখেছেন দরদী পণ্ডিত অতুল গুপ্ত। রাজনগর ও দেবানন্দ প্রবাসীতে ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়েছিল।

আট খণ্ডে লিখিত বিরাট-উপন্যাসের পঞ্চম খণ্ড পর্যন্ত ছাপবার পরে ষষ্ঠ ও সপ্তম খণ্ডের প্রকাশ স্থগিত রেখে অষ্টম খণ্ড শেষ অধ্যায় (১৯৪৬-৪৮) কেন আগে প্রকাশ করতে হল তার একটা কৈফিয়ৎ লেখক ব্যক্তিগত ভাবে আমাদের কাছে দিয়েছেন। এখানে সে কৈফিয়তের উল্লেখ করা হল না।

কোটি কোটি দেশবাসীর জীবনে চরম বিপর্যয়ের মধ্যে দিয়ে স্বাধীনতা কেমন করে আমাদের করায়ত্ত হয়েছে সেই প্রায় বিস্মৃত কাহিনী মর্মস্পর্শী ভাষায় লেখক আমাদের শুনিয়েছেন "শেষ অধ্যায়ে"। দেশের পরবর্তী অবস্থায় কিছু ইঙ্গিত মেলে এই গ্রন্থে।

সংস্কারমুক্ত মন, ঐতিহাসিকের অন্তর্দৃষ্টি, সত্যের প্রতি গভীর নিষ্ঠা এবং গল্পকারের রসবোধ নিয়ে লেখক আমাদের জাতীয় জীবনের অতি গুরুত্বপূর্ণ পঞ্চাশ বছরের সমগ্র কাহিনী উপহার দিয়েছেন বাঙালি পাঠকগণকে তাঁর রাজনৈতিক উপন্যাসগুলিতে। বাংলা সাহিত্যে নতুন ধারার পরিচয়বাহী এই উপন্যাসগুলি তথ্যভিত্তিক, বাস্তবজীবন-ভিত্তিক এবং রসোত্তীর্ণ। আমরা আশা করি এগুলি কালোত্তীর্ণও হবে।

ননীমাধববাবুর সাহিত্যকর্ম এর পরেও অব্যাহত গতিতে চলেছে। গল্পের মধ্যে বিজ্ঞানের কথা এনে সুখপাঠ্য, Science-oriented বা বিজ্ঞানমুখী উপন্যাস লিখেছেন তিনি। প্রথম গ্রন্থ "প্রফেসর ইন্দ্রানী সান্যাল" প্রকাশিত হয়েছে, দ্বিতীয় উপন্যাস "তুলসীচরিত' একখানি নামকরা সাপ্তাহিকে বেরিয়েছে। এই শ্রেণীর আরও কয়েকখানি বই লিখেছেন তিনি। পূর্ব পাকিস্তানের বিদ্রোহ এবং বাংলাদেশের স্বাধীনতা লাভের কাহিনী নিয়ে লিখিত একখানি উপন্যাস সম্প্রতি শেষ করেছেন। উপন্যাসের ভিত্তি একটি সত্য ঘটনা। বইখানি প্রকাশের অপেক্ষায় আছে।

২৭ নভেম্বর, ১৯৭৩, সত্যেন বোস।

লেখকের কথা

এই "লেখক পরিচিতি" যাঁর স্নেহের নিদর্শন, দুর্ভাগ্যক্রমে প্রকাশিত বইখানি তাঁর হাতে দেওয়া সম্ভব হল না, মৃত্যু (৪ঠা ফেব্রুয়ারী ১৯৭৪) আকস্মিকভাবে তাঁকে আমাদের মধ্য থেকে সরিয়ে নিয়ে যাবার ফলে।

তুমি কী পরামর্শ দিলে? সুরনাথদা বললেন।

আমি চুপ করেছিলাম। ও পাড়ার হল্লার শব্দ আসতে এরা একমত হয়ে গেল দেখলাম। ও পাড়ার লোক খুনিকে ছিনিয়ে নিয়ে যাবে তাদের হাত থেকে, এ হতে পারে না। লাঠি-সড়কি নিয়ে এরা তৈরি হচ্ছে ও পাড়ার লোকদের রুখবার জন্য। তখন বললাম, তাহলে ফেরার হও। ও পাড়ার লোক এনে দাঙ্গা করো না, কারণ খবর দিয়ে কেউ আসেনি এখানে।

তারপর বলল, দু'দুটো খুন করে ব্যাটা দমে গিয়েছে। এলোমেলো কথা বলছে, দৌড়ে পালাবার চেষ্টা করছে। বলেছি ঘোড়ায় তুলে স্টেশনে যাও, রেল গাড়িতে তুলে দিয়ে ফিরবে। বোধহয় তাই করছে। ও পাড়ার ব্যাটারা এসে পড়বে একটু বাদে।

হাত দিয়ে হাই তোলা ঢেকে উঠে দাঁড়াল ফণী সরকার, কাঁচা ঘুম থেকে টেনে তুলেছে আহম্মকরা। অম্বল হয়েছে, দোর বন্ধ করে শুয়ে পড়ুন আপনারা, বাড়ির কাছে হল্লা আসলেও দোর খুলে বেরবেন না। দুর্গা দুর্গা। চল সর্দার শুয়ে পড়া যাক।

পরদিন সকাল থেকে প্রজারা আসতে শুরু করল ফণী সরকারের কাছে মিটমাটের প্রস্তাব শুনতে। দেখলাম কাগজপত্র নিয়ে সে তৈরি হয়ে বসেছে দরবারে। জোড়া খুনের কথা কেউ মুখে আনল না খবর পেলাম।

বিকালে ফণী সরকারের কাছে শুনলাম দারোগা এসেছে ও পাড়ায়। এ পাড়ার কয়েকজনকে ধরে নিয়ে গিয়েছিল, তারা নাকি বলেছে খুনের কথা তারা আগে শোনেনি।

ইতিমধ্যে এম. এ. পরীক্ষার ফল বেরিয়ে গেল। পরীক্ষার আড়াইমাস আগে অকালে পিতার মৃত্যু ভ্রাতার অসুখ এবং আরও নানা কারণে মানসিক অবস্থা যা হয়েছিল ও পড়াশোনার যে ব্যাঘাত ঘটেছিল তার ফলে ফার্স্ট ক্লাস পেলেও পরীক্ষার ফল সন্তোষজনক মনে করতে পারিনি।

পড়াশোনা শেষ হল। একটা চাকুরির চেষ্টা করতে হবে জানতাম, কিন্তু বৈষয়িক ব্যাপারে তখন এমন জড়িয়ে পড়েছি যে চাকুরির কথা ভাববার সময় ছিল না। আমার মধ্যম ভ্রাতা চমৎকার স্বাস্থ্য নিয়ে রাঁচি থেকে ফিরেছিল কিন্তু বছর না ঘুরতে আবার কালাজ্বর হল। তাকে কলকাতায় পাঠানো হয়েছিল এক বছর কাছে থেকে চিকিৎসার জন্য। তার অবস্থা

খারাপ খবর পেয়ে কলকাতায় যেতে হল। হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছিল তাকে। হাসপাতাল থেকে ছাড়া পেলে আবার তাকে রাঁচি পাঠাবার ব্যবস্থা করলাম। এবার প্রমথ চৌধুরী এবং ইন্দিরা দেবীর চেষ্টায় রাঁচিতে তাঁদের বাড়ি 'সত্যধামে' তার থাকার ব্যবস্থা হল। রাঁচিতে পৌঁছলে শ্রীযুক্ত জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর তাকে মোরাবাদি পাহাড়ের ওপর নিজের বাড়িতে নিয়ে গেলেন।

জ্যোতিরিন্দ্রনাথের সঙ্গে আলাপ পরিচয় হয়নি কখনও। তিনি কী প্রকৃতির মানুষ ইন্দিরা দেবী ও প্রমথ চৌধুরীর কাছে শুনেছিলাম। কিছু আরও অনেক কথা জানতে পারলাম আমার ১৫/১৬ বছরের ভ্রাতাকে লিখিত চিঠিপত্র থেকে। অপূর্ব চিঠি সেগুলি। দুঃখের বিষয় এই চিঠিগুলির মূল্য বোঝবার মত বয়স ছিল না ভ্রাতার, সবগুলি হারিয়ে গেছে।

আমার কনিষ্ঠ ভ্রাতা রাজশাহি কলেজ হতে আই এসসি পাস করলে তাকে মেডিকেল কলেজে (আর জি কর) ভর্তি করবার ব্যবস্থা করলাম কলকাতায়। সে ডাক্তার হবে পিতার এইরূপ ইচ্ছা ছিল।

বৈষয়িক কাজ এবং এই সকল কাজের অবসরে আমার সাহিত্যচর্চা চলছিল। সাহিত্যচর্চা মানে মোপাসাঁর গল্প ফরাসী থেকে বাংলায় অনুবাদ। গল্প অনুবাদ করে পাঠিয়ে দিতাম সম্পাদকের (প্রমথ চৌধুরী) কাছে, অনুবাদ দেখে দিতেন শ্রীযুক্তা ইন্দিরা দেবী। একটি একটি করে গল্প 'সবুজপত্রে' প্রকাশিত হতে থাকল। 'সবুজপত্রে' মোপাসাঁর অনুবাদ ছাপা হবার আগে বিখ্যাত ছেলেদের গল্প লেখক Perrant-এর লেখা একটি ছেলেদের গল্পের অনুবাদ একখানা কাগজে ছাপা হয়েছিল, কাগজের নামটা মনে পড়ছে না।

'সবুজপত্রে' মোপাসাঁর দু'টি গল্পের অনুবাদ প্রকাশিত হয়েছিল। শেষ যে গল্পটি প্রকাশিত হয়েছিল তার নাম Bowl de suif বা 'চর্বির গোলা'। মনে পড়ছে ফ্রাঙ্কো-প্রুসিয়ান যুদ্ধের সময়কার ঘটনা নিয়ে রচিত। এই বৃহৎ গল্পটি সবুজপত্রের চৌষট্টি পাতা নিয়েছিল। মোপাসাঁর একটি গল্প 'ভারতী'তে প্রকাশিত হয়েছিল। পরে মোপাসাঁর আরেকটি বিখ্যাত গল্পের Mad moiselle Fiti অনুবাদ নিয়ে সব শুদ্ধ আটটি গল্পের অনুবাদ "মোপাসাঁর গল্প' নাম দিয়ে মডার্ন বুক এজেন্সি প্রকাশ করেছিল ১৯৩৩ সনে।

মোপাসাঁর গল্প ছাড়া আনাতোল ফ্রাঁসের কয়েকটি গল্পের অনুবাদও 'সবুজপত্রে' ছাপা হয়েছিল। আনাতোল ফ্রাঁসের ছোট দু'তিনটি রচনার অনুবাদ বারীন্দ্র ঘোষ সম্পাদিত "বিজলী" কাগজে ছাপা হয়েছিল। ফরাসি ছাড়া বিখ্যাত স্প্যানিশ নাট্যকার Benavente-এর একটি নাটকের মূল স্প্যানিশ থেকে বাংলা অনুবাদ 'সবুজপত্রে' ছাপা হয়েছিল। 'সবুজপত্র' বন্ধ হয়ে যাওয়াতেই Benavente-এর আরেকটি ছোট নাটকের অনুবাদ 'প্রবাসী'তে ছাপা হয়েছিল। এসব অবশ্য অনেক পরের কথা।

অবসর সময় কাটত তাস খেলা ও শিকারচর্চায়। সময় কাটাবার জন্য তাস খেলা শিখেছিলাম একটু আধটুকু তখন, তারপর ভুলে গেছি তাস খেলা। বন্দুক চালনায় অব্যর্থ সন্ধানী হতে পারিনি, কিন্তু বন্দুক ঘাড়ে মাঠে ঘাটে, বনবাদাড়ে, বিলে ঘুরে বেড়ানো নেশার মতো হয়ে গিয়েছিল।

হরিপুরে বছর খানেক কাটাবার পরে ম্যালেরিয়ায় ধরল। মাঝে মাঝে জ্বর হত। কুইনাইন বড়ি বা মিক্সার খেতাম জ্বর বন্ধ করবার জন্য। মাঝে মাঝে বেরিয়ে পড়তাম হরিপুর থেকে। কয়েকটা জায়গা দেখা হয়েছিল এই সূত্রে। এর মধ্যে সিলেট, দার্জিলিং, কাশি ও দেওঘরের নাম করা যায়। সিলেট গিয়েছিলাম খাজাঞ্জি বাড়ি এস্টেটের মালিক নগেন্দ্রনাথ চৌধুরীর নিমন্ত্রণে। ইনি স্যার আশুতোষ চৌধুরীর জামাতা জিয়োলজিস্ট-উপেন্দ্রনাথ চৌধুরীর জ্যেষ্ঠভ্রাতা। বালিগঞ্জের সানি পার্কে নগেন্দ্রবাবুর বাড়ি ছিল। প্রমথ চৌধুরী মশায়ের সাথে সে বাড়িতে যেতাম মাঝে মাঝে। কাশিতে গিয়ে এ যাত্রায় মাসখানেক ছিলাম সোনারপুরের বাড়িতে। আমার মাতামহী, জ্যেষ্ঠা ভগ্নী, মাসিমা, মাসতুতো ভাই ও তাঁর স্ত্রী তখন এ বাড়িতে ছিলেন। কাশিতে থাকবার সময়ে পণ্ডিত মালবীয়ার সাথে একদিন সাক্ষাৎ করেছিলাম চাকুরির খোঁজে।

চাকুরি সম্বন্ধে মাথায় একটা ধারণা শিকড় গেড়েছিল। এমন চাকুরি করতে হবে যাতে পড়াশোনার অবসর মেলে, চাকুরি যেন পেয়ে না বসে। তাছাড়া চাকুরির জায়গা হবে কলকাতা, কারণ মফস্সলের atmosphere লেখাপড়ার পক্ষে ভাল নয়। এই বদ্ধমূল ধারণা থাকবার ফলে সরকারি চাকুরির সন্ধান করিনি, মফস্সলের কয়েকটা কলেজে চাকুরির সুযোগ পেয়েও যাইনি। ভাগ্যদেবতা তখন একটু বাঁকা হাসি হেসেছিলেন বোধহয়। ১৯২৩ নন-কোঅপারেশন আন্দোলনের সময়, নতুন কলেজ বয়কটের সময়। সরকারি কলেজগুলোর দোর বন্ধ বয়কটের ফলে, বেসরকারি কলেজগুলোর অবস্থা কাহিল। শিক্ষা বিভাগে চাকুরি সংগ্রহ করা অসুবিধার ব্যাপার হয়েছিল।

এদিকে পুনঃপুনঃ ম্যালেরিয়ার আক্রমণে স্বাস্থ্য খারাপ হয়ে পড়েছিল। একমাস দেওঘরে বাস করেও স্বাস্থ্য ভাল হল না। আমার মামি তখন দেওঘরে ছিলেন তাঁর অসুস্থ বড় ছেলের স্বাস্থ্য উদ্ধারের জন্য। বেশ আদর যত্নে একমাস তাঁদের কাছে ছিলাম। হরিপুরে ফিরে আসবার কিছুদিন পরে আবার জ্বর হতে আরম্ভ হল। তখন হরিপুর ছাড়বার কথা

মনে হল। একটা অসুবিধার কথা ভেবে মনস্থির করতে পারছিলাম না। কনিষ্ঠ ভ্রাতার মেডিকেল কলেজে পড়বার খরচ পাঠাতাম বাড়ি থেকে। আমি হরিপুর ছাড়লে এই টাকা নিয়মিতভাবে পাঠানো সম্ভব হবে কি না, অর্থাৎ যারা বিষয় দেখবেন এই দায়িত্ব তাঁরা যথাযথ পালন করবেন কি না সন্দেহ ছিল মনে। এই সময়ে আমার এক পিতৃব্য এসে বাড়িতে বসলেন। তিনি দায়িত্ব পালনের প্রতিশ্রুতি দিলেন। তাঁর হাতে সব ভার দিয়ে ১৯২২-এর ডিসেম্বর মাসে হরিপুর ছেড়ে কলকাতা চলে এলাম। তখন থেকে আমি কলকাতার স্থায়ী অধিবাসী।

খরচপত্রের কথা মাথায় ছিল। নিজের খরচপত্র নয়, কয়েকমাস চালাবার মতো হাতে ছিল। মাস মাস তখন বাজারে বাজারে মোটা টাকা দিতে হত, কনিষ্ঠ ভ্রাতাকে দামি ডাক্তারি বই কিনতে হত, দু'মাসের tution fee একসঙ্গে দিতে হত। প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলাম টাকা পাঠানো হবে, কিন্তু নিশ্চিন্ত হতে পারিনি। কাজেই ডিসেম্বর মাসেই বাংলা সরকারের অনুবাদকের অফিসে একটা চাকুরির খবর পেয়ে এবং অফিসের কাজের খবর নিয়ে সন্তুষ্ট হয়ে কর্তৃপক্ষের সঙ্গে সাক্ষাৎ করলাম। কাজটা জুটে গেল। বেতন ছিল ১৭৫। কলেজের চাকুরির বেতন তখন ১২৫ এর বেশি মিলত না। ভাগ্য বিধাতার বাঁকা হাসির কথা বলেছি আগে। এই চাকুরি নেবার সময় তিনি সম্ভববত আবার বাঁকা হাসি হেসেছিলেন। ইচ্ছামতো পড়াশোনা করবার স্বাধীনতা ও সময় যেমন পেয়েছি, চাকুরি জীবনের ব্যর্থতার আস্বাদ পুরোপুরি গ্রহণ করবার সুযোগও তেমনই পেয়েছি।

চাকুরি নেবার পর বৈঠকখানা রোডের এক মেস বাড়িতে দু'জনের থাকবার উপযোগী একটা কামরা একাই নিলাম। মেসের Lessee ছিলেন কুমিল্লা জেলায় বাড়ি ও পাবনা কলেজের সহপাঠী বন্ধু যাঁর কথা আগে বলেছি। এখানে কুমিল্লা, নোয়াখালি ও চট্টগ্রামের ছেলেরা থাকতেন। পড়ুয়া দু'তিন জন ছিলেন, বাকি সবাই চাকুরে। প্রায় পাঁচ বছর এই বাড়িতে ছিলাম (১৯২২-২৭)। এর মধ্যে বার দুই বড় রকমের সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা হয়েছিল। কাছেই পাটোয়ার বাগান এবং মির্জাপুর স্ট্রিটের এই অংশ (হ্যারিসন রোড ও সারকুলার রোডের মধ্যবর্তী) তখন মুসলমানপ্রধান এলাকা ছিল। কাজেই সাবধানে থাকতে হত দাঙ্গার সময়। এই পাড়ায় বি.এ. পড়বার দু'বছরও কাটিয়েছি।

এই সময়কার এবং পরবর্তী কয়েক বছরের দেশের রাজনৈতিক আন্দোলনের ইতিহাস, আমার পঞ্চম উপন্যাসে সবিস্তারে বলেছি। বরদৌলি সিদ্ধান্তের প্রতিক্রিয়া, কংগ্রেসি রাজনীতির গতি পরিবর্তন, কমিউনিস্ট আন্দোলনের সূত্রপাত, কৃষক-মজদুর আন্দোলন, বিপ্লবী আন্দোলনের পুনরাবির্ভাব। হিন্দু ধর্ম ও সমাজসংস্কার আন্দোলন, স্বরাজ্য দলের কাছে গান্ধীজির আত্মসমর্পণ ও স্বরাজ্য দলের আইনসভাগুলির অধিকার ইত্যাদি এই সময়কার ঘটনা। বারদৌলি সিদ্ধান্তের পর থেকে কংগ্রেসি আন্দোলনের গতি ফিরে গেল। এই গতির লক্ষ্যে পৌছতে অর্থাৎ কংগ্রেসি দলের মন্ত্রিসভা গঠনের সিদ্ধান্তে আসতে অবশ্য আরও কয়েকটা বছর সময় লেগেছিল।

আমার নিজের কথা বলতে গেলে বলতে হয় যে বারদৌলি সিদ্ধান্তের ফলে আমার মনে এই ধারণা বদ্ধমূল হল যে গান্ধীজির technique এর নতুনত্ব থাকলেও আসলে তিনি মডারেট, মোটেই revolutionary নেতা নন। তিনি ভীতু স্বভাবের, বিপ্লবের সাহায্যে স্বাধীনতা অর্জন করা তাঁর লক্ষ্য নয়। তিনি চান বিপ্লবের ভয় দেখিয়ে ইংরাজদের কাছে কিছু অধিকার আদায় করতে।

সবুজপত্র পর্ব

আবার নিয়মিতভাবে সবুজপত্রের মজলিসে যেতে শুরু করলাম। মজলিসের স্থান পরিবর্তন হয়েছিল ব্রাইট স্ট্রিটের বাড়ি থেকে মে-ফেয়ারের নতুন বাড়িতে। ব্রাইট স্ট্রিটের বাড়িতে সবুজপত্রের আড্ডায় আমি ছিলাম ছাত্রসভ্য। তখন যাঁরা সবুজপত্রের আড্ডায় আসতেন তাঁদের নাম আগে বলছি। এই বাড়ি নদীয়ার মহারাজাকে বিক্রি করে প্রমথ চৌধুরীমশায় মে-ফেয়ারের নতুন তৈরি বাড়িতে উঠে যান এবং সবুজপত্রের আড্ডা এই বাড়িতে বসত। কয়েক বছর পরে এই বাড়ি বিক্রি করে দিতে হয়। তারপর তিনি কিছুদিন ঝাউতলার "তারাবাসে" (প্রিয়ম্বদা দেবীর বাড়িতে) ছিলেন এবং শেষে ব্রাইট স্ট্রিটের তাঁর সেজদাদা কুমুদনাথ চৌধুরীর বাড়িতে ছিলেন। কুমুদনাথ তখন পাটনায় প্র্যাকটিস করতেন। ঝাউতলার বাড়িতে বাস করবার সময়ে সবুজপত্রের আড্ডা বন্ধ ছিল। কুমুদনাথের বাড়িতে আড্ডা অনিয়মিত ভাবে বসত। এই বাড়ি থেকে প্রমথ চৌধুরীমশায় শান্তিনিকেতন চলে যান, আড্ডার অবসান হয়।

মে-ফেয়ারের বাড়িতে পুরানো দলের সত্যেন্দ্রনাথ বসু, ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়কে দেখা যেত না, চাকুরি নিয়ে বাইরে চলে গিয়েছিলেন তাঁরা। অতুল গুপ্ত, কিরণশঙ্কর রায়, হারীতকৃষ্ণ, সোমনাথ মৈত্র, সিংহ-ভ্রাতৃদ্বয় এবং আরও কয়েকজন আসতেন। রবীন্দ্রনাথ কলকাতায় থাকলে আসতেন। তাঁর কয়েকখানা বই এই আড্ডায় পড়েছিলেন। "রক্তকরবী"-র কথা মনে আছে। তিনি আসবেন স্থির হলে প্রায়ই আগে থেকে চিঠি যেত সভ্যদের নামে এবং মুখে বা কানে খবর পেয়েও কেউ কেউ আসতেন। বেশ লোক

সমাগম হত রবীন্দ্রনাথের রচনা শোনবার জন্য। কুমুদনাথ চৌধুরীর বাড়িতে সবুজপত্রের আড্ডাতেও রবীন্দ্রনাথ কয়েকবার এসেছেন। এই আড্ডাতে সত্যেন্দ্রনাথ বসু, সুনীতি চট্টোপাধ্যায়, কালিদাস নাগ আসতেন। আমার বন্ধু ও প্রতিবেশী প্রবোধ বাগচীও আসতেন। ফ্রান্স থেকে ফেরবার পরে মে-ফেয়ারের বাড়িতে তাঁকে নিয়ে গিয়ে প্রমথ চৌধুরী এবং ইন্দিরা দেবীর সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিয়েছিলাম। প্রবোধের আলাপি সুবোধ মুখোপাধ্যায় নামে প্যারিস ইউনিভার্সিটির ডি.লিট উপাধিধারী এক ভদ্রলোকও আসতেন। সংস্কৃত নাট্যশাস্ত্র নিয়ে গবেষণা করে ডিগ্রি পেয়েছিলেন তিনি। বড় চাকুরি করতেন।

সবুজপত্রের আড্ডার সূত্রে পরিচয় হয়েছিল অনেকের সঙ্গে। যাঁদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা হয়েছিল তাঁদের মধ্যে দুজনের কথা কিছু বলব। এদের একজন অতুলচন্দ্র গুপ্ত, দ্বিতীয় জন সত্যেন্দ্রনাথ বসু।

অতুলবাবুর সঙ্গে আলাপ ১৯১৮/১৯ থেকে। তাঁর ল্যান্সডাউন রোডের বাড়িতে আর্ল স্ট্রিটের বাড়ি এবং রাসবিহারী অ্যাভিন্যুর বাড়িতে যাতায়াত করেছি। সবুজপত্রের মজলিস বন্ধ হবার এবং প্রমথ চৌধুরীমশায় শান্তিনিকেতনে চলে যাবার পর থেকে অতুলবাবুর রাসবিহারী অ্যাভিন্যুর বাড়ি আমার নিয়মিত আড্ডার স্থান ছিল। রবিবার বিকালে সেখানে যেতাম। কোনও কোনও দিন আরও পাঁচ দশজন আসতেন। আবার কোনও কোনও দিন আমরা দু'জনেই গল্প করতাম। রাজনীতি-সাহিত্য-সমসাময়িক ঘটনা ছিল আলাপের বিষয়। অতুলবাবুর সঙ্গে আলাপের tactics ছিল কোনও বিষয় উত্থাপন করে তাঁকে প্রশ্ন করে যাওয়া। তাঁর নিজস্ব একটা দৃষ্টিকোণ ছিল। সেই দৃষ্টিকোণ থেকে দেখে, বিচার করে তিনি যা বলতেন তার মধ্যে নূতনত্ব থাকত। আর থাকত Sincerity। তাঁর কথা শুনতে শুনতে অনেক সময় মনে হত একটা বন্ধ জানালা খুলে গেল, খোলা জানালা দিয়ে মুক্ত হাওয়ার স্পর্শ পাচ্ছি, দৃষ্টি বহুদূর প্রসারিত হচ্ছে। তাঁর গভীর পাণ্ডিত্যের কথা দেশের শিক্ষিত ব্যক্তিরা জানতেন, আমিও জানতাম কিন্তু আমাকে বেশি আকৃষ্ট করত যা সেটা হচ্ছে তাঁর মননশক্তির অনন্যসাধারণ বলিষ্ঠ সজীবতা।

ছাত্রাবস্থা থেকে অতুলবাবু স্বদেশিওয়ালা। স্বদেশি আন্দোলনের সময় ফুলারি আমলে বে-আইনি শোভাযাত্রায় যোগ দেবার জন্য তাঁর অর্থদণ্ড হয়েছিল। এই কালো ছাপ থাকবার জন্য কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতির পদ তাকে দেওয়া হয়নি। বরাবর তাঁকে খদ্দরের ধুতি পাঞ্জাবি পরতে দেখেছি। স্বদেশিযুগের পরে প্রকাশ্যভাবে কোনও রাজনৈতিক আন্দোলনে যোগ দেননি তিনি কিন্তু পরোক্ষভাবে অনেক প্রচেষ্টার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন এবং এই সূত্রে ব্যয়ও করতেন। রাজনৈতিক মতে তিনি বরাবর leftlist ছিলেন। মহাত্মা গান্ধীর ভক্ত হলেও তাঁর বিড়লা প্রমুখ capitalist দের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতার সমালোচনা করতেন। স্বদেশিযুগের মানুষ ছিলেন তিনি, বৃদ্ধ বয়সেও সেই যুগের ওপর টান কত প্রবল ছিল তাঁর একটা গল্প পরে বলছি।

আইন ব্যবসায়ী হিসাবে তাঁর যেমন খ্যাতি হয়েছিল তেমনই প্রচুর উপার্জনও ছিল। কাজেই অবসর ছিল খুব কম। এই বিরল অবকাশের মধ্যে তাঁর সাহিত্য আলোচনা চলত। নতুন বাংলা বই, মাসিক, সাপ্তাহিকপত্রাদি পড়তেন, সাহিত্যিকদের সঙ্গে আলাপ করতেন, সাহিত্যকর্ম ওজনে ভারি নয়, গুণে প্রথমশ্রেণির। (কাব্যজিজ্ঞাসা, নদীপথে, প্রবন্ধগুলি পুস্তকাকারে প্রকাশের অপেক্ষায় আছে) তাঁর রচনা শৈলীর ওপর সবুজপত্র সম্পাদক প্রমথ চৌধুরীমহাশয়ের প্রভাবের কথা তিনি স্বয়ং অনেক জায়গায় বলেছেন। সাহিত্যবিচারে তাঁর মতামতের উচ্চমূল্য শিক্ষিতসমাজে স্বীকৃত হয়েছিল। অনুরুদ্ধ হয়ে নয়, স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে তিনি দু'খানি বাংলাগ্রন্থকে বাংলাসাহিত্যের পাঠকসমাজের কাছে তুলে ধরেছিলেন। একখানি হচ্ছে সতীনাথ ভাদুড়ির "জাগরী", দ্বিতীয়খানি শ্রীমতী রানি চন্দের। তাঁর অভিমত অনুসারে দু'খানি বইয়ের লেখককে রবীন্দ্র-মেমোরিয়াল প্রাইজ দেওয়া হয়েছিল। মনে পড়ছে আমার সঙ্গে আলাপের মধ্যে "জাগরী" সম্বন্ধে বলেছিলেন 'wonderful creation' এবং শ্রীমতী চন্দের বই সম্বন্ধে বলেছিলেন 'first uninhibited woman's writing of quality in Bengali' অতুলবাবুর মতো খ্যাতিমান ও প্রভুত পশারওয়ালা হাইকোর্টের ও সুপ্রিম কোর্টের প্রথমশ্রেণির আইন ব্যবসায়ী সময় কত কম ও কত মূল্যবান সে জ্ঞান থাকা সত্ত্বেও তাঁর ওপর উপদ্রবের ত্রুটি করিনি। তাঁর সাহিত্যপ্রীতির নিদর্শন হিসাবে কিছু বলছি এ সম্বন্ধে।

সবুজপত্রের মজলিসে একদিন আলোচনা ওঠে বাংলায় Political Philosophy বইয়ের সম্বন্ধে। পরপর দু'তিনটি সভায় এই আলোচনা চলে। প্রমথ চৌধুরী, অতুলবাবু, সম্ভবত সুনীতি চট্টোপাধ্যায় এবং আরও কয়েকজন এই আলোচনায় যোগ দিয়েছিলেন। অবশেষে স্থির হয় Political Philosophy-র তিনখানা বিশ্ববিখ্যাত গ্রন্থের বাংলায় অনুবাদ করা হবে মূল ভাষা থেকে। বইগুলির নাম অ্যারিস্টটলের Politics, রুশোর Contract Sociale এবং মাকিয়াভেলির Prince। আমাকে অনুরোধ করা হল রুশোর গ্রন্থ অনুবাদ করবার জন্য। কী প্রকার দুঃসাধ্য কর্মে হাত দিতে

প্ররোচিত করা হচ্ছে ভাল করে তা না বুঝেই, আমি রাজি হয়ে যাই বিশেষ করে যখন ইন্দিরা দেবীও অনুরোধ করলেন। সে যা হোক, অনুবাদ শেষ হবার পরে বেশ কয়েক বছর সেটা পড়ে রইল আমার কাছে, ছাপানো হল না। তারপর যখন স্থির করলাম নিজেই ছাপাব তখন উঠল অনুবাদ সংশোধনের প্রশ্ন। অতুলবাবুর ওপরে এ ভার চাপাব সিদ্ধান্ত করলাম। প্রায় তিন চার মাস ধরে প্রতি রবিবার তিনটা থেকে চারটার মধ্যে মূল ফরাসি বই এবং অনুবাদের পাণ্ডুলিপি বগলে করে অতুলবাবুর আর্ল স্ট্রিটের বাড়িতে হাজির হতাম। প্রায় ঘণ্টা তিনেক কাজ হত এবং কাজের মধ্যে চা-যোগও হত। পাণ্ডুলিপি যখন বারোআনা সংশোধন করা হয়েছে তখন তাঁর বাড়িতে অসুখের জন্য এই উপদ্রব বন্ধ করলাম।

তারপর বলছি এর অনেকদিন পরের কথা। তখন তিনি রাসবিহারী অ্যাভিন্যুয়ের বাড়িতে, খ্যাতি ও পশার শিখর স্পর্শ করেছে। স্বদেশি আন্দোলন থেকে আরম্ভ করে দেশের স্বাধীনতা লাভের সকল প্রকার প্রচেষ্টার ইতিহাস আশ্রয় করে কয়েকখানি উপন্যাস লেখবার কথা মাথায় বাসা বেঁধেছে। কয়েকজনের সঙ্গে আলাপ করে বোঝবার চেষ্টা করছি কীভাবে অগ্রসর হওয়া যায়। আমার অধ্যাপক ডা. শ্রীকুমার বন্দোপাধ্যায়ের সঙ্গে দু'দিন আলাপ হল এ সম্বন্ধে। বঙ্কিমচন্দ্রের ঐতিহাসিক উপন্যাস এবং রবীন্দ্রনাথের "ঘরে বাইরে" ও "চার অধ্যায়"-এর কথা তুলে তিনি আমাকে সতর্ক করলেন। আমি তাঁকে বোঝাবার চেষ্টা করলাম যে আমি দেশের পঞ্চাশ বছরের রাজনৈতিক, সামাজিক, পারিবারিক বিবর্তনের কাহিনি গল্প করে লিখতে চাই objectively, historical roamance-এর লেখা বা কোনও আন্দোলন বা প্রচেষ্টাকে ঘটনা-পর্যায় থেকে বিচ্ছিন্ন করে নিয়ে বিশেষ দৃষ্টিকোণ থেকে তার বিচার করা আমার অভিপ্রায় নয়। বললাম, আমি বাংলায় ঐতিহাসিক উপন্যাস নয় বা রাজনৈতিক উপন্যাসও নয় documentary novel লিখতে চাই। বাংলা ভাষায় এই শ্রেণির উপন্যাসের কোনও নিদর্শন নাই, তাই পরামর্শ চাইছি কীভাবে অগ্রসর হব, নিরুৎসাহ করবেন না, suggestion দিন। মাথা নেড়ে তিনি হাসলেন, suggestion দিলেন না, নিরুৎসাহ করলেন না, বললেন, তাহলে লিখতে শুরু করো।

এরপর অতুলবাবুর কাছে কথাটা পাড়লাম। মন দিয়ে আমার কথা শুনে বললেন, গল্পকে গল্প এবং ইতিহাসকে ইতিহাস রেখে এ জিনিস দাঁড় করানো খুব শক্ত। মালমশলা যখন হাতে আছে ইতিহাস লিখুন। বললাম ইতিহাস লেখবার সময় আসবে আরও পরে। আমার চোখের সামনে জ্ঞানের মধ্যে যেসব ঘটনা ঘটছে তার বিবরণ দিয়ে লেখা হবে ইতিহাস কিন্তু সে ইতিহাসের মধ্যে Personal element এর স্থান কোথায়? স্বাধীনতালাভের আন্দোলনের পঞ্চাশ বছরের মধ্যে ঘটনা, কর্ম ও উক্তির প্রতিক্রিয়ায় দিনের পর দিন আমাদের মনে যে চিন্তাভাবনা আশানিরাশা এসেছে, ভয় ও স্বস্তি এসেছে, উত্তেজনা ও আনন্দ এসেছে সন্দেহ ও ঘৃণা এসেছে সে সবের স্থান কোথায় ইতিহাসের পাতায়? এই সব হবে আমার উপন্যাসের বিষয়বস্তু। ইতিহাস পটভূমি মাত্র।

অতুলবাবুর অফিসঘরের উত্তর দিকের সোফা কৌচ দিয়ে সাজানো যে ঘরে তিনি বিশ্রাম করতেন সেই ঘরে বসে চা খাবার খেতে খেতে তর্কযুদ্ধ চালালাম দু' তিন দিন, কিন্তু তাঁর অনুমোদন আদায় করতে পারলাম না, suggestion-ও পেলাম না।

উৎসাহ যাঁদের কাছে পেয়েছিলাম তাঁদের একজনের কথা এখানে একটুখানি বলে রাখছি। পরে তাঁর কথা ভাল করে বলবার ইচ্ছা রইল। আমি যে-অফিসে চাকুরি করতাম সেই অফিসের প্রধান সহকারী অনুবাদক ছিলেন তিনি। নাম কুঞ্জবিহারী রায়। এঁর পিতা কৃষ্ণবিহারী রায়(?) সেকালের সরকারি স্কুলের নাম করা হেডমাস্টার ছিলেন। এঁর এক ভ্রাতা ডা. রমেশচন্দ্র রায় স্বাস্থ্য, খাদ্য ইত্যাদি বিষয়ে প্রবন্ধ লিখতেন বিভিন্ন মাসিক পত্রিকায়। বাড়ি ছিল আমার আর্মহার্স্ট স্ট্রিটে ডা. কার্তিক বসুর ল্যাবরেটরির কাছে। গোড়া থেকে শেষ পর্যন্ত আমার এই পরম শ্রদ্ধেয় বন্ধু আমাকে উৎসাহ দিয়েছেন, পরামর্শ দিয়েছেন, উপকরণের সন্ধান দিয়েছেন। তাঁর প্রচুর পড়াশোনা ছিল বিশেষ করে ইতিহাসে, ইংরাজিতে খুব ভাল দখল ছিল এবং চমৎকার ইংরাজি লিখতেন। বিরাশি বছর বয়সে তাঁর যে mental alertness দেখেছি তা নিঃসন্দেহে অসাধারণ।

অতুলবাবুর কাছে উৎসাহ পেলাম না। মাস দুই পরে প্রথম উপন্যাস "রাজনগর"-এর চল্লিশ পঞ্চাশ পাতা পাণ্ডুলিপি নিয়ে তাঁর কাছে উপস্থিত হলাম। তাঁর বিশ্রাম কক্ষে বসে তিন চারটা রবিবার এই পাণ্ডুলিপি পড়ে শোনালাম তাঁকে। মন্তব্যগুলো নোট করে নিতাম পড়তে পড়তে। পড়া শেষ হলে বলতেন, আচ্ছা লিখুন। মোটের ওপর attitude খুব উৎসাহজনক বলে মনে হল না।

তারপর বছর দেড়েক এ সম্বন্ধে আর কোনও আলাপ হল না। "রাজনগর" উপন্যাস প্রবাসীতে ধারাবাহিকভাবে বেরতে শুরু করল। দশ সংখ্যায় বেরিয়ে বই যখন প্রায় শেষ হয়ে এসেছে একদিন রবিবার বিকালে দশ মাসের দশ কপি প্রবাসী নিয়ে অতুলবাবুর কাছে গেলাম। বললাম এই দশখানা প্রবাসী দিয়ে যাচ্ছি। পনেরো দিন পরে ফেরত নিয়ে যাব আর আপনার বক্তব্যও শুনব। নির্দিষ্ট দিনে আমি তাঁর অফিসঘরের

সামনের বারান্দায় (রবিবার ও ছুটির দিনে বিকালে তিনি এইখানে বসতেন, আগন্তুকরাও বসতেন) চেয়ার টেনে বসলাম। কী একখানা বই বা মাসিক পত্রিকা পড়ছিলেন তখন। সেখানা রেখে ভেতরে গেলেন এবং একটু পরে প্রবাসীগুলো নিয়ে ফিরলেন। কোনও প্রশ্ন করবার আগে নিজেই বললেন It is just the thing wanted। সেদিনকার রঙে মন এখনও রাঙিয়ে আছে। লক্ষ করলাম দু' এক মিনিটের জন্য তাঁর শান্ত মুখের চেহারা একটু অন্য রকম দেখাল। রাজনগর সম্বন্ধে আমি আর কোনও প্রশ্ন করা বাহুল্য মনে করলাম, তিনিও আর কিছু বললেন না।

রাজনগর পুস্তকাকারে বেরবার সময় ছোট একটি ভূমিকা লিখে দিয়েছিলেন তিনি। রাজনগরের পরের তিনখানা উপন্যাস তাঁর হাতে দিতে পেরেছি। আমার গল্প এবং প্রবন্ধও কিছু কিছু পড়েছেন তিনি।

মক্কেল, সহ-ব্যবসায়ী, বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের বিশিষ্ট ব্যক্তি, সাহিত্যিকগোষ্ঠীর লোক, নানা দলের চাঁদাপ্রার্থী ছেলে-ছোকরার দল, অধ্যাপক-শ্রেণির লোক অতুলবাবুর বাড়িতে আসতেন। মক্কেল ও সহ-ব্যবসায়ীরা সাধারণত week day-তে আসতেন। রবিবার সকালেও আসতেন। এঁদের সঙ্গে আমাদের দেখাসাক্ষাৎ কম হত। রাজনৈতিক দলের বিশিষ্ট ব্যক্তিদের মধ্যে কৃষকপ্রজা দলের অন্নদাপ্রসাদ চৌধুরীকে একসময়ে ঘনঘন আসতে দেখেছি। অন্নদাবাবুর সঙ্গে কিছু আলাপ হয়েছিল, ডা. প্রফুল্ল ঘোষের মন্ত্রিসভার Finance-এর ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী ছিলেন। অন্নদাবাবু একদিন আচার্য কৃপালনিকে অতুলবাবুর বাড়িতে এনেছিলেন। তিনি তখন কংগ্রেস থেকে বেরিয়ে এসেছেন এবং কংগ্রেসি সরকারের তীব্র সমালোচনা করছিলেন পার্লামেণ্টে এবং Vigil কাগজে। যে সন্ধ্যায় তিনি এসেছিলেন আমি উপস্থিত ছিলাম। মন দিয়ে কৃপালনিজির কথা শুনলাম, পার্লামেণ্টে effective opposition করা যায় কীভাবে তাই নিয়ে অনেক আলোচনা হল। অতুলবাবুকে রাজনীতির মধ্যে নামাবার কোনও আইডিয়া ওঁদের ছিল কি না জানি না। কৃপালনিজির কথার মধ্যে গভীর আন্তরিকতার সুর ছিল, personal emotion ছিল, কিন্তু আমার মনে হল it was beyond him to prove effective as a party leader.

অধ্যাপকদের মধ্যে সত্যেন্দ্রনাথ বসু প্রায়ই এবং যখন খুশি অতুলবাবুর বাড়িতে যেতেন। মাঝে মাঝে যাবার সময় আমাকে গাড়িতে তুলে নিয়ে যেতেন। অধ্যাপক প্রমথ বিশী, নীহার রায় দোতলায় অতুলবাবুর বড় ছেলে ডা. প্রতুল গুপ্তের আড্ডায় বেশি যেতেন, মাঝে মাঝে একতলায় অতুলবাবুর আড্ডাতেও হাজিরা দিতেন। প্রমথবাবু কিছু তর্ক প্রিয় এবং জোর গলায় নিজের মত প্রকাশ করতে অভ্যস্ত। তিনি উপস্থিত থাকলে মাঝে মাঝে তর্কযুদ্ধ লেগে যেত। অধ্যাপক প্রিয়রঞ্জন সেন যেতেন এবং আরও অনেকে যেতেন।

সবুজপত্রের মজলিসে চা, খাবারের ব্যবস্থা ছিল। অতুলবাবুর বাড়িতে কফি ও খাবারের ব্যবস্থা ছিল। মাঝে মাঝে এই খাবারের ব্যবস্থা প্রয়োজনাতিরিক্ত মনে হত। বিশেষ করে তাঁর বিশ্রাম কক্ষে বসে আলাপ করতে করতে তাঁর খাস পরিচারককে ডেকে যখন ভাল মিষ্টি কী আছে আনবার আদেশ করতেন। অর্ধেকের ওপর খাবার ফেরত দিতে হত।

শেষজীবনে অসুস্থ শরীরে অনেক শোক ও মানসিক কষ্ট পেয়েছেন অতুলবাবু। প্রচুর পরিশ্রম করতেন অসুস্থ দেহ নিয়ে। ঘনিষ্ঠতার সুযোগ নিয়ে দু' এক দিন বলেছি, কবে শুনব ব্রিফের ওপর মুখ থুবড়ে পড়ে আছেন আপনি। কাজ কমিয়ে ফেলুন। মুখ তুলে আমার দিকে চেয়ে একটু হাসতেন তিনি। দীর্ঘকাল অসুস্থ শরীরে কাজ করে গেছেন প্রথমে মেয়ে তারপর দুইটি উপযুক্ত ছেলের মৃত্যুশোক পেয়েছেন, অন্য রকমের পারিবারিক দুঃখও ভোগ করেছেন। দেহের সঙ্গে মনও ভেঙে গিয়েছিল মৃত্যুর আগে।

সত্যেন্দ্রনাথ বসুর সঙ্গে আলাপের সূত্রপাত সবুজপত্রের আড্ডায়। ঘনিষ্ঠতা হয় তিনি ঢাকা থেকে ফিরে আবার কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে কাজে যোগ দেবার পরে। মে ফেয়ারের বাড়িতে সবুজপত্রের সভায় বিশেষ যোগ দিতে পারেননি।

অতুলবাবু অনেক বয়োজ্যেষ্ঠ ছিলেন এবং আমার ছাত্রাবস্থায় তাঁর সঙ্গে আলাপ, কিন্তু আপনি ছেড়ে তুমি বলে কখনও সম্বোধন করেননি আমাকে। সত্যেন্দ্রনাথও কয়েক বছরের বয়োজ্যেষ্ঠ কিন্তু কবে থেকে তুই বলে ডাকতে আরম্ভ করেছেন এখন আর মনে পড়ে না। অতুলবাবুর সঙ্গে পরিচয় ছিল শুধু আমার। সত্যেন্দ্রনাথের সঙ্গে পরিচয় আমার বাড়ির সকলের। ছেলেমেয়েরা তাঁকে জ্যেঠামশায় বলে ডাকে।

মানুষের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা করতে ভালবাসতেন সত্যেন্দ্রনাথ। যাকে স্নেহ করেন তার ভালর জন্য অনেক কিছু করতে প্রস্তুত তিনি। এর প্রমাণ অনেকবার পেয়েছি। আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন বৈজ্ঞানিক তিনি, রয়াল সোসাইটির ফেলো, ন্যাশানাল প্রফেসর—এটা হল তাঁর বাইরের পরিচয়, ভেতরের পরিচয় মস্ত বড় হৃদয়ের মানুষ তিনি। মস্ত বড় হৃদয়, সহানুভূতিতে নরম হৃদয়, ভাবপ্রবণ হৃদয়। বিশ্ববিখ্যাত বৈজ্ঞানিক কিন্তু নিরাসক্ত বৈজ্ঞানিক নন, শ্রদ্ধাবান পুত্র, স্নেহাসক্ত পিতা, ছাত্রবৎসল অধ্যাপক, বন্ধুবৎসল মানুষ।

(ক্রমশ)

ভাঙা পথের রাঙা ধুলায়

সুখরঞ্জন সেনগুপ্ত

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

সেই প্রায়-বিস্মৃত ও অকথিত ঘটনাটি হল এই — ১৯৫৬ সালের শেষাশেষি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের এক ইংরেজ ভাইস-চ্যান্সেলার পদত্যাগ করে দেশে ফিরে গেলেন। সে সময় পূর্ববঙ্গের গভর্নর ছিলেন ফজলুল হকসাহেব এবং পদাধীকারবলে তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের চ্যান্সেলারও। সুরাবর্দিসাহেব তখন পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী ও তাঁর অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ আওয়ামি লিগের আতাউর রহমান খান প্রাদেশিক মুখ্যমন্ত্রী। গভর্নর ও চ্যান্সেলর হকসাহেব চাইলেন সৈয়দ বদরুদ্দোজাসাহেবকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস-চ্যান্সেলার করা হোক। মুখ্যমন্ত্রী আতাউর রহমান আপত্তি জানিয়ে বললেন, বদরুদ্দোজা ভারতীয় নাগরিক। হকসাহেব পালটা বললেন, ব্রিটিশ নাগরিক যদি ভাইস-চ্যান্সেলার হতে পারেন, তাহলে ভারতীয় নাগরিক কেন ভাইস-চ্যান্সেলার হতে পারবেন না। হকসাহেব বিশ্ববিদ্যালয়ের চ্যান্সেলার হিসাবে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কোর্টকে (সেনেটের সমতুল্য) সৈয়দ বদরুদ্দোজার নাম অনুমোদন করতে বললেন। এই অবস্থার মধ্যে বদরুদ্দোজা হকসাহেবের বার্তা পেয়ে কলকাতা থেকে ঢাকা পৌঁছলেন। কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয় কোর্ট বদরুদ্দোজাসাহেবের নামের পরিবর্তে অন্য একজনের নাম পরবর্তী ভাইস-চ্যান্সেলার হিসাবে সুপারিশ করলেন। হকসাহেব ওই নাম খারিজ করে চ্যান্সেলরের অফিস থেকে সৈয়দ বদরুদ্দোজাকে ভাইস-চ্যান্সেলার হিসাবে নিয়োগপত্র দিলেন। প্রাদেশিক সরকার ঢাকা হাইকোর্টে ওই নিয়োগ চ্যালেঞ্জ করলেন ও হাইকোর্ট চ্যান্সেলারের সেক্রেটারির ওপর রুল জারি করে ওই নিয়োগ আটকে দিলেন। ক্রুদ্ধ ফজলুল হকসাহেব গভর্নরের বিশেষ ক্ষমতাবলে মুখ্যমন্ত্রী আতাউর রহমান খানকে বরখাস্ত করে অবিভক্ত বঙ্গের প্রবীণ রাজনীতিবিদ দিনাজপুরের আবু হোসেন সরকারকে মুখ্যমন্ত্রী নিযুক্ত করলেন। ঢাকার রাজনীতি উত্তাল হয়ে উঠল। করাচিতে পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী শাহিদ সুরাবর্দি প্রচণ্ড খেপে গিয়ে গভর্নর জেনারেলকে দিয়ে পরবর্তী ৩৬ ঘণ্টার মধ্যে ফজলুল হকসাহেবকে গভর্নরের পদ থেকে অপসারিত করে চিফ সেক্রেটারি মামুদ আলিকে অস্থায়ী গভর্নরের পদে বসালেন। অস্থায়ী গভর্নর মুখ্যমন্ত্রী আবু হোসেন সরকারকে বরখাস্ত করে আবার আতাউর রহমান খানকে মুখ্যমন্ত্রীর পদে বহাল করলেন। এই নাটকীয় ঘটনাপ্রবাহের পরিণতিতে ফজলুল হকসাহেবকে রাজনৈতিক মঞ্চ থেকে চিরদিনের মতো বিদায় নিতে হয়েছিল। আর সৈয়দ বদরুদ্দোজাসাহেব আরও বেশি নিঃসঙ্গতা নিয়ে মুর্শিদাবাদে ফিরে এসেছিলেন।

এই লেখার গোড়ার দিকে আমি সাংবাদিক প্রভাত গাঙ্গুলির সংক্ষিপ্ত উল্লেখ করেছিলাম। কিন্তু তিনি যে মাপের মানুষ ছিলেন ও বাংলার সামাজিক বিপ্লবের অংশীদার যে পরিবার থেকে এসেছিলেন, তাতে তাঁর বিষয়ে আরও কিছু বলার দরকার। ঊনবিংশ শতাব্দীর বাংলার নারী আন্দোলন ও নারী শিক্ষার অন্যতম পথিকৃৎ ও বিদ্যাসাগর মহাশয়ের উত্তরসূরি দ্বারকনাথ গাঙ্গুলির পুত্র হলেন প্রভাত গাঙ্গুলি। তাঁর মা এ দেশের প্রথম মহিলা ডাক্তার কাদম্বিনী গাঙ্গুলি। ডা. কাদম্বিনী গাঙ্গুলি যেদিন কলকাতার মেডিকেল কলেজে প্রথম শব-ব্যবচ্ছেদ করেছিলেন সেদিন ফোর্ট উইলিয়াম থেকে তোপধ্বনি করে এদেশে নারী শিক্ষা প্রসারের জয়ধ্বনি করা হয়েছিল। বাংলার ব্রাহ্মসমাজে ও সংবাদপত্র জগতে প্রভাতদা তখন তাঁর ডাকনাম 'জংলু' গাঙ্গুলি নামেই বেশি পরিচিত ছিলেন। (কেউ কেউ অবশ্য 'জংলু'র অপভ্রংশ ঘটিয়ে 'জংলি' গাঙ্গুলি বলেও ডাকতেন।) প্রভাতদা ১৯৫৪ সালে যখন 'জনসেবক' পত্রিকায় এলেন, তখন তাঁর বয়স ৬৫/৬৬। যেদিন কাজের চাপ কম থাকত, সেদিন প্রভাতদার কাছে পুরনো দিনের কথা শুনতাম। প্রভাতদার ভগ্নিপতি উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী যখন তাঁর দিদি বিধুমুখীকে বিয়ে করেন (১৮৮৪ সালে), তার পাঁচ বছর পরে ১৮৮৯ সালে প্রভাত গাঙ্গুলির জন্ম। তাঁর ভাগ্নে সুকুমার রায় (জন্ম ১৮৮৭) তাঁর চেয়ে দু'বছরের বড় ছিলেন। প্রভাতদার যখন ৭/৮ বছর বয়স, তখন প্রথম তিনি দিদি ও জামাইবাবু উপেন্দ্রকিশোরের সঙ্গে তাঁদের বাড়ি ময়মনসিংহ জেলার মশুরা গ্রামে গিয়েছিলেন। প্রভাতবাবু সেই স্মৃতি মনে রেখেছিলেন

কয়েকটি কারণে। সেগুলি হল তাঁর প্রথম স্টিমারে ওঠা ও হাতির পিঠে চড়া। উপেন্দ্রকিশোর তাঁর এই শালাবাবুকে কোলে করে স্টিমার থেকে নামিয়েছিলেন। তারপর ব্রহ্মপুত্রের পাড় থেকে হাতির পিঠে চড়িয়ে মশুরা গ্রামে গিয়েছিলেন। হাতির পিঠে উপেন্দ্রকিশোর সারাক্ষণ প্রভাতদাকে কোলে করে বসেছিলেন। প্রভাতদার মনে পড়ে ভাগ্নে সুকুমারের ছোটবেলার কৌতূহল 'মামা কেন ভাগ্নের চেয়ে বয়সে ছোট?' যদিও সুকুমার রায় সব সময় তাঁর বয়সে ছোট মামাকে 'জংলু মামা' বলে ডাকতেন, তবে ইয়ার্কি ফাজলামিতে তাঁরা ছিলেন পরম বন্ধু।

প্রভাত গাঙ্গুলি ১৯২৫ সাল থেকে প্রায় আট-দশ বছর আনন্দবাজার পত্রিকার বার্তা ও সম্পাদকীয় বিভাগে কাজ করেছেন। এছাড়া বিভিন্ন সময়ে তিনি সে সময়কার অনেক সাহিত্যপত্রিকার সম্পাদনাও করেছেন। সে সময় ঠনঠনিয়া, হালসিবাগান ও গড়পাড় অঞ্চলে ব্রাহ্মসমাজের খুব দাপট ছিল। এই দাপটে যাঁরা নেতৃত্ব দিতেন তাঁদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন এই জংলু গাঙ্গুলি ও প্রেমাঙ্কুর আতর্থী। প্রেমাঙ্কুর আতর্থীর 'মহাস্থবির জাতক' উপন্যাসের প্রথম খণ্ডে বহুবার সে কথার উল্লেখ আছে। প্রভাত গাঙ্গুলির কাছে একদিন জানতে চেয়েছিলাম প্রথম মহাযুদ্ধ ও দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের মাঝখানে যে প্রায় পঁচিশ বছরের ব্যবধান রয়েছে, সেই সময়টাতে শিক্ষিত বাঙালি মেয়েরা খবরের কাগজে ও সাহিত্যপত্রিকাগুলিতে তেমন লেখালেখি করতেন না কেন? প্রভাত গাঙ্গুলি বলেছিলেন, সাহিত্যপত্রিকাগুলিতে মেয়েদের কিছু আনাগোনা ছিল ঠিকই কিন্তু খবরের কাগজে একেবারে না বললেই চলে। সাহিত্যপত্রিকাগুলিতে অনুরূপা দেবী, নিরুপমা দেবী, শৈলবালা ঘোষজায়া, প্রভাবতী দেবী সরস্বতী প্রায়শই লিখতেন। কখনও কখনও সরলাবালা সরকার লিখতেন। প্রভাতদার মতে 'মেয়েদের খবরের কাগজে লেখার আগ্রহ ছিল। কিন্তু আমরা ওদের সঙ্গে অসভ্যতা করেছি। আমি একটি ঘটনা নির্দিষ্টভাবে বলছি। আমি ১৯৩৪-৩৫ সালে আনন্দবাজারের সম্পাদকীয় বিভাগে কাজ করতাম। সে সময় ওই পত্রিকার রবিবাসরীয়তে গল্প নির্বাচনের দায়িত্ব ছিল একজনের ওপর। আমার যতদূর মনে পড়ে একটি মেয়ে, সম্ভবত মেয়েটির নাম ছিল কৃষ্ণা, গল্প লেখার হাত ভালই ছিল। রবিবাসরীয়তে তার গোটা তিনেক গল্প ছাপাও হয়েছিল। মেয়েটি বি-এ পড়ত। একদিন বিকেলে মেয়েটি পত্রিকার বর্মন স্ট্রিটের বাড়িতে এল। এসে বলল .....বাবু আমাকে দেখা করতে বলেছেন, আমি তার সঙ্গে দেখা করতে চাই। আমরা সেই ব্যক্তিকে দেখিয়ে দিলাম। আমি ও জগদানন্দ বাজপেয়ী তখনই বুঝে গিয়েছিলাম যে মেয়েটিকে কোনও এক অজুহাতে ডেকে আনা হয়েছে। মেয়েটি আমাদের সংশ্লিষ্ট সহকর্মীর মুখোমুখি বসে তার লেখার একটা অংশ নতুন করে লিখে দিয়ে চলে গেল। তারপর বেশ কয়েক মাস কেটে গিয়েছে। মেয়েটির কোনও লেখা আর 'রবিবাসরীয়'তে ছাপা হত না। হঠাৎ একদিন সুরেশ মজুমদার আমাদের সেই সহকর্মীকে তাঁর ঘরে ডেকে পাঠালেন। সুরেশবাবু সাধারণত উচ্চবাক্যে কথা বলতেন না। কিন্তু সেদিন আমরা পাশের ঘর থেকে তাঁর উচ্চকণ্ঠ শুনতে পেলাম। পরদিন শুনতে পেলাম আমাদের সেই সহকর্মী যিনি 'রবিবাসরীয়'র দায়িত্বে ছিলেন, তাঁকে 'আনন্দবাজার' কর্তৃপক্ষ বরখাস্ত করেছেন। খবরের কাগজের ভেতরের ঘটনাও কখনও গোপন থাকত না। এটাও তেমনই জানাজানি হয়ে গেল। আমাদের ওই সহকর্মীটি লেখিকা মেয়েটিকে কয়েকটি প্রেমপত্র লিখে তাকে অন্যত্র দেখা করতে বলেন। মেয়েটি প্রথমে কয়েকখানা 'প্রেমপত্র' পেয়ে চুপ করে ছিল। কিন্তু পরে সে ভয় পেয়ে গেল এই ভেবে যে যদি কখনও এরকম চিঠি তার মায়ের হাতে পড়ে যায়, তাহলে গল্প লেখা তো দূরের কথা, তার কলেজে পড়াও বন্ধ হয়ে যাবে! মেয়েটির মা ও বাবাকে নির্ঝরিণী সরকার (ওই পত্রিকার প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক প্রফুল্ল সরকারের স্ত্রী) চিনতেন। মেয়েটি সেই পরিচয়ের সুবাদে একদিন নির্ঝরিণীর কাছে গিয়ে কেঁদে ফেলল। একখানা 'প্রেমপত্র' সে নির্ঝরিণীর হাতে দিয়ে কাতর কণ্ঠে অনুরোধ করেছিল যেন তার মা-বাবা কিছু জানতে না পারেন। নির্ঝরিণীদেবী অত্যন্ত কড়া ধাতের মহিলা ছিলেন। তাই সুনাম রক্ষায় তিনি 'ক্ষমা-অনুশোচনা' ইত্যাদির মধ্যে যাননি। কিন্তু এর পরিণাম কী হল? ওই মেয়েটি আর কোন সাহসে কিসের ভরসায় নিজেকে মেলে ধরতে চেষ্টা করবে।' (প্রভাত গাঙ্গুলি তাঁদের ওই সহকর্মীর নামটি আমার কাছে গোপন করেননি। কিন্তু আমি ওই নামটি গোপন করলাম এই কারণে যে আমি তাঁকে চিনতাম এবং পরবর্তীকালে তাঁর পরিবারের অনেকেই খবরের কাগজের সঙ্গে যুক্ত হয়েছেন।)

প্রভাতদার একটা রাজনৈতিক জীবন ছিল। বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির দফতরে তিনি বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন পদে কাজ করেছেন। সত্যাগ্রহ আন্দোলন করে কারাবরণ করেছেন। রাজনৈতিক কার্যকলাপের সূত্রেই তিনি সংবাদপত্র জগতে এসেছেন। তিনি যে খদ্দর পরতেন তা হাঁটুর নীচে নামত না। তিনি ফতুয়ার মতো খদ্দরের একটা হাফ শার্ট গায়ে দিতেন। ফতুয়ার দুই পকেটে দু'প্যাকেট বিড়ি ও দুটো দেশলাই রাখতেন। মার্কস-এঙ্গেলসের মতো একমুখ অবিন্যস্ত দাড়ি ছিল। শীত-গ্রীষ্ম সর্বদাই বগলে একটা ছাতা

রাখতেন। প্রতিদিন সকালে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের উপাসনায় বসতেন ও উপাসনা পরিচালনা করতেন আচার্য হিসাবে।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের শেষলগ্নে ১৯৪৫ সাল নাগাদ ওয়েলিংটন স্কোয়ার অঞ্চল থেকে 'ভারত' নামে একটি দৈনিক খবরের কাগজের প্রকাশ ঘটলে প্রভাত গাঙ্গুলি তার সম্পাদক নিযুক্ত হন। ১৯৪৬ সালের কলকাতা ও নোয়াখালির দাঙ্গার সময় 'ভারত' সুরাবর্দি-বিরোধী বিভিন্ন রকমের সংবাদ প্রকাশ করে খুব দাপট প্রতিষ্ঠা করেছিল। ১৯৪৭ সালে দেশবিভাগের সময় ও দেশবিভাগের পর সুরাবর্দিসাহেব এই পত্রিকাটির বিরুদ্ধে অসংখ্য মানহানির মামলা দায়ের করেন। একসঙ্গে অনেকগুলো মামলার খরচ চালাতে গিয়ে 'ভারত' পত্রিকার মালিকগোষ্ঠীকে হিমসিম খেতে হয়েছিল। ফলে কাগজের আর্থিক অবস্থা দুর্বল হয়ে পড়ল এবং ১৯৪৮ সালের শেষে কিংবা ১৯৪৯ সালের গোড়ায় এই কাগজটির প্রকাশ বন্ধ হয়ে যায়। এর প্রায় ছ'বছর পরে প্রভাত গাঙ্গুলি 'জনসেবক' পত্রিকায় কাজ করতে আসেন। ১৯৭৩ সালের মার্চ মাসে ৮৪ বছর বয়সে প্রভাতদা লোকান্তরিত হন। প্রভাতদার মতো পরিচ্ছন্ন মনের মানুষ কেবল সংবাদপত্রজগতে কেন, সামগ্রিকভাবে সমাজজীবনেও বিরল।

আবার ফিরে এলাম ১৯৫৩ সালে। বিংশ শতাব্দীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ ভারতীয় বিপ্লবী মানবেন্দ্রনাথ রায় (এম এন রায়) তাঁর জীবনে শেষবারের মতো তাঁর জন্মভূমি বাংলায় এসেছিলেন সেই বছরে। সময়টা আমার যতদূর মনে পড়ে গ্রীষ্মকালে, স্টালিনের মৃত্যুর দু'এক মাস পরেই। তাঁর কলকাতা আগমন নিয়ে অকমিউনিস্ট বাঙালি বুদ্ধিজীবী মহলে সাড়া পড়ে গিয়েছিল। Radical Humanist নামে একটি রাজনৈতিক সংগঠনের প্রতিষ্ঠাতা এম এন রায়কে শিক্ষিত বাঙালি যতটা চিনেছে তাঁর অনন্য রাজনৈতিক মননশীল বইয়ের মধ্য দিয়ে, তার চেয়ে অনেক বেশি তাঁকে চিনতে পেরেছে 'স্টেটসম্যান' পত্রিকার মাধ্যমে। আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট আন্দোলনের দুই অসামান্য ব্যক্তিত্ব এম এন রায় ও আইজ্যাক ডয়েটসার পঞ্চাশের যুগের ওই সময়কার 'স্টেটসম্যান' পত্রিকার নিয়মিত লেখক ছিলেন। অধ্যাপক ডয়েটসার বার্মিংহাম বিশ্ববিদ্যালয়ের ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলন বিষয়ের প্রধান ছিলেন। তিনি পোলান্ডের কমিউনিস্ট পার্টির অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা, ১৯৪৪ সালে জার্মানির পতনের পর পোলিশ কমিউনিস্ট পার্টি যখন সম্পূর্ণভাবে স্টালিনের নিয়ন্ত্রণে চলে গেল, তখন যেসব বুদ্ধিজীবী এর প্রতিবাদে মুখর হয়েছিলেন, ডয়েটসার ছিলেন তাঁদের অগ্রগণ্য। এম এন রায় যেমন স্টালিনের নিষ্ঠুরতা থেকে পরিত্রাণ পাবার জন্য সোভিয়েত ইউনিয়ন থেকে পালিয়ে এসেছিলেন, আইজ্যাক ডয়েটসারও তেমনই পোলান্ড থেকে পালিয়ে এসে ব্রিটেনে রাজনৈতিক আশ্রয় নিলেন। ১৯১৭ সালের সোভিয়েট বিপ্লবের একমাত্র ভারতীয় অংশীদার এম এন রায়কে সংবর্ধনা জানাবার জন্য যাঁরা উদ্যোগ নিয়েছিলেন, তাঁদের অন্যতম ছিলেন রজনী মুখার্জি, অজিত রায় মুখার্জি ও অধ্যাপক অমল দত্ত। আরও দু'একজন ছিলেন, কিন্তু তাঁদের কথা আমার স্মরণে নেই। এম এন রায় বিংশ শতাব্দীর একেবারে গোড়ায় যখন এই বাংলার মাটিতে বিপ্লবমন্ত্রের দীক্ষা দিলেন, তখন যে 'অ্যালবার্ট হল' একদা সুরেন বাঁড়ুজ্যে, বিপিন পাল, অরবিন্দ ঘোষদের দখলে ছিল, কলেজ স্ট্রিটের সেই 'অ্যালবার্ট হলে' এম এন রায়কে সংবর্ধনা দেওয়া হয়েছিল। তিনি দক্ষিণ চব্বিশ পরগণার লোক ছিলেন। সে সময় তাঁর নাম ছিল নরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য। তাঁর ওই সংবর্ধনা সভায় তাঁর সময়কার ও পরবর্তী প্রজন্মের লোকেরা অনেকে এসেছিলেন। এই সভায় এম এন রায়ের বক্তৃতার মূল সুর ছিল যে এই কমিউনিস্ট পার্টি ও কমিউনিজম আর কখনওই বিশ্বের নিপীড়িত ও মেহনতি মানুষের মুক্তিদাতা হতে পারবে না। তিনি হুঁশিয়ারি দিয়েছিলেন যে সোভিয়েট ইউনিয়নের নেতৃত্বে বিশ্বের কমিউনিস্ট আন্দোলন নিষ্ঠুরতা ও অত্যাচারীর ভূমিকা গ্রহণ করেছে। এই সভাতেই তিনি বিশ্বের অন্যতম কমিউনিস্ট বুদ্ধিজীবী ও কমিউনিস্ট পার্টির প্রতিষ্ঠাতা সদস্য মিলোভান জিলাস (Milovan D'Jilus)-এর সদ্য প্রকাশিত 'New Clan' গ্রন্থটির উল্লেখ করেছিলেন।

এ দিনের অন্য একটি ঘটনার জন্য এন রায়ের কলকাতা আগমন আমার বেশি করে মনে আছে। ঘটনাটি হল, বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট পূর্ব দিকে যেখানে হ্যারিসন রোডে গিয়ে মিশেছে, সেখানে বিখ্যাত সার্জেন ললিত ব্যানার্জির বাড়ির পশ্চিমদিকের লাল রঙের দোতলা বাড়িটির দোতলার একটি ঘরে থাকতেন অগ্নিযুগের বিখ্যাত বিপ্লবী ও অনুশীলন সমিতির অন্যতম প্রবক্তা কিরণচন্দ্র মুখার্জি ও সে সময়কার বিধান রায় মন্ত্রিসভার সদস্য যাদবেন্দ্রনাথ পাঁজা। কিরণবাবু এম এন রায়ের কৈশোর ও যৌবন-প্রারম্ভের বিপ্লবী প্রেরণা ছিলেন। কিরণবাবু যখন আন্দামানে নির্বাসিত, এম এন রায় তখন বিদেশে পাড়ি দিয়েছেন। কিন্তু তিনি তাঁর বয়ঃজ্যেষ্ঠ কিরণবাবুকে ভুলে যাননি। কলেজ স্ট্রিটের কলরব মুখরিত প্রাঙ্গণ থেকে বেরিয়ে এসে তিনি তাঁর অনুগামী ও ভক্তদের জানিয়ে দিলেন যে তিনি কিছুক্ষণের জন্য নিরিবিলিতে একজনের সঙ্গে কিছু সময় কাটাবেন এবং সেখানে তিনি একাই যাবেন। প্রায় ঘণ্টাখানেক তিনি ওই বাড়িটিতে কিরণবাবু ও যাদব পাঁজামশাইর সঙ্গে কাটিয়ে বেরিয়ে এলেন। কিরণবাবুর ওই ঘরটিতে আমার মাঝেমধ্যে যাতায়াত

ছিল। পরের দিনই কিরণবাবুকে জিজ্ঞেস করেছিলাম, 'সাহেব' এম এন রায়কে কীভাবে ঘরে বসতে দিলেন? কিরণবাবু সবসময় হেসে কথা বলতেন। তিনি হেসেই জবাব দিলেন, 'কেন? 'সাহেব' মাদুরে হাত পা ছড়িয়ে দেয়ালে পিঠ দিয়ে বসে পড়ল। তারপর যাদব চা বানিয়ে দিল। তারপর চা খেয়ে চলে গেল।' এর মাস ছ'য়েক পরে ১৯৫৪ সালের জানুয়ারি মাসের কোনও একদিন মানবেন্দ্রনাথ রায় পরপারে চলে গেলেন তাঁর দেরাদুনের বাড়িতে। তাঁর মৃত্যুতে জওহরলাল নেহরু প্রকাশ্যে শোক জ্ঞাপন করে বলেছিলেন A giant among intellectuals।

এখন এই কিরণ মুখার্জি সম্পর্কে পাঠকদের কৌতূহল হতে পারে। কে এই কিরণ মুখার্জি? কেনইবা এম এন রায় কলকাতায় এসে এই লোকটির সঙ্গে দেখা করতে ছুটে গিয়েছিলেন। আমিও কিরণ মুখার্জি সম্বন্ধে খুব অল্পই জানতে পেরেছি। কিরণ মুখার্জি বাংলার অন্যতম বিপ্লবী সংগঠন অনুশীলন সমিতির একেবারে গোড়ার দিকের সক্রিয় সদস্য। দেশ ছিল যশোর জেলায়। যশোর শহরের দশ পনেরো মাইলের মধ্যে খুলনা যাওয়ার পথে রেললাইনের খুব কাছে। দীর্ঘ এক যুগের বেশি সময় আন্দামানের কারান্তরালে কাটিয়েছেন। দেশের মধ্যেও কারাজীবন ছিল আরও ১৫-২০ বছরের। আমি যখন ১৯৫১ সালে কিরণবাবুর সঙ্গে পরিচিত হই, তখন তাঁর বয়স ৭৫ থেকে ৭৭-এর মধ্যে। আন্দামানে বিপ্লবীদের ওপর কী ধরনের ব্রিটিশ বর্বরতা ছিল, তা মৃত্যুঞ্জয়ী বিপ্লবীদের স্মৃতিকথায় পড়েছি। কিন্তু সে অত্যাচার নিষ্ঠুরতা যে মানুষকে দৈহিক গঠনের দিক দিয়ে মানুষের ভগ্নাংশে রূপান্তরিত করতে পারে, এর দুটি দৃষ্টান্ত নিজের চোখে দেখেছি। এঁদের একজন কিরণ মুখার্জি, অন্যজন উল্লাসকর দত্ত। উল্লাসকর একেবারে চলৎশক্তিহীন অবস্থায় আন্দামান থেকে ছাড়া পেয়েছিলেন। আর কিরণবাবু বাঁকানো হাত, বাঁকানো পা নিয়ে মুক্তি পেয়েছিলেন। তিনি দুটি হাতের কোনওটাকেই সোজা রাখতে পারতেন না। তাঁর প্রতি পদক্ষেপে হাঁটু দুটো একটু নুয়ে পড়ত ও তাঁর দু'পায়ের পাতার মধ্যে ফারাক ছিল অন্তত ছ'ইঞ্চি। তিনি বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিটের পুব দিকের শেষ প্রান্তে যে বাড়িটিতে থাকতেন সেখান থেকে প্রেসিডেন্সি কলেজের পুব দিকের ফুটপাত পর্যন্ত কিরণবাবুর যাতায়াত সীমাবদ্ধ ছিল। তিনি যে ঘরটিতে থাকতেন, সেখানে মেঝেতে দু'খানা বিছানো মাদুরের পাশাপাশি দুটো বিছানা ভীষ্মের শরশয্যার মতো পাতা থাকত। একটিতে শুতেন কিরণ মুখার্জি ও অন্যটিতে থাকতেন যাদবেন্দ্রনাথ পাঁজা। যাদব পাঁজামশাই তখন ডা. বিধানচন্দ্র রায়ের মন্ত্রিসভার অন্যতম প্রবীণ মন্ত্রী। পাঁজামশাই এই বিপ্লবী কিরণ মুখার্জিকে যে কী নিবিড়ভাবে ভালবাসতেন, তার প্রমাণ মন্ত্রীর প্রাপ্য সুখস্বাচ্ছন্দ্য বিসর্জন দিয়ে এই ঘরটিতে কিরণবাবুর সান্নিধ্যে জীবনযাপন করা। ব্যতিক্রম ছিল কেবল একটি। সেটি হল বেলা দশটায় একটি সরকারি গাড়ি এসে পাঁজামশাইকে রাইটার্স বিল্ডিংয়ে নিয়ে যেত এবং বিকেলে পৌঁছে দিত। ১৯৫৬ কিংবা ১৯৫৭ সালে কিরণদার মৃত্যু পর্যন্ত পাঁজামশাই এখানেই থাকতেন। যাদব পাঁজার সঙ্গে কিরণ মুখার্জি দেশের মধ্যে কোনও কারান্তরালে ঘনিষ্ঠ হয়েছিলেন। আমি অনেকবার জানতে চেষ্টা করেছি যাদব পাঁজার সঙ্গে কিরণবাবুর ঘনিষ্ঠতা কোন সময়ে কোন জেলে হয়েছিল। এম এন রায়ের সঙ্গেও তাঁর সম্পর্ক কীভাবে গড়ে উঠেছিল। কিন্তু কিছু বলতেন না, কেবল মিষ্টি হেসে পাশ কাটিয়ে যেতেন। এখন যেখানে যে বাড়িটিতে 'দে'জ পাবলিশার্স'-এর বিপণন কেন্দ্র সেই বাড়িটি সে সময় পুরো বসতবাটি ছিল। শুনেছি এই বাড়িটি ছিল শরৎচন্দ্র বসুর শ্বশুর বাড়ি। পঞ্চাশের যুগের মধ্যভাগে এই বাড়ির গৃহকর্তা অপরাহ্নের সূর্যরশ্মি তির্যক হওয়ার মুখে মুখে বাড়ির সিংহদ্বারের লাগোয়া ফুটপাথে দুটি চেয়ার পেতে একটিতে বসতেন, আর একটি পাতা থাকত। কিছুক্ষণ পরে কিরণ মুখার্জি আসতেন। কিরণবাবু এলেই গৃহকর্তা তাঁকে চেয়ারে বসিয়ে দিতেন। এভাবে সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হওয়া পর্যন্ত এই দু'জন বসে থাকতেন। তাঁরা যেখানে বসতেন, তার পাশে ছিল তখন প্রজ্ঞানন্দ পাঠাগার ও আনন্দবাজার পত্রিকার কানাই সরকার মহাশয়ের ত্রিবেণী প্রকাশনা। আরও একটু পশ্চিমে একেবারে কোণের দিকের বড় বাড়িটাতে এম সি সরকার অ্যান্ড সন্স। ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে মহিমচন্দ্র সরকারমহাশয় এই প্রকাশনা সংস্থাটি প্রতিষ্ঠা করেন। এই সংস্থার অন্যতম সত্বাধিকারী সুধীরচন্দ্র সরকার তাঁর প্রতিষ্ঠানে ঢোকার আগে একটু পুব দিকে এগিয়ে এসে কিরণবাবুকে প্রণাম করে যেতেন। কানাই সরকারমশাই, যাঁর হাতে সবসময় জ্বলন্ত সিগারেট ঝুলত, তিনিও সিগারেটটি ফেলে এসে কিরণবাবুর পায়ের ধুলা নিয়ে ত্রিবেণী প্রকাশনীতে প্রবেশ করতেন। মাঝে মাঝে তুষারকান্তি ঘোষ আসতেন সুধীরচন্দ্র সরকারের কাছে। তিনিও যেদিন আসতেন সেদিন কিরণবাবুকে তাঁর শ্রদ্ধা জানিয়ে যেতেন।

আমি যে বছর ছয়েক ধরে কিরণ মুখার্জিকে দেখেছি সেই বছরগুলিতে অনেকদিন চেষ্টা করেছি তাঁর মুখ থেকে নিজের কথা শুনতে। প্রতিবারই তিনি হতাশ করেছেন। তখন বুঝতে পেরেছিলাম আন্দামানে তাঁর ওপর অপরিসীম নির্যাতনের আসল রহস্য। অর্থাৎ এই কিরণ মুখার্জির কাছ থেকে ইংরাজদের 'সিক্রেট সার্ভিসের' লোকেরা বিপ্লবীদের

গুপ্ত আন্দোলনের কোনও কথাই বের করতে পারেনি। আন্দামান থেকে ছাড়া পাওয়ার পর এই বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিটে কিরণবাবুর শেষ জীবনের সামান্য কিছু কথা বিক্ষিপ্তভাবে শুনেছি প্রথিতযশা বাঙালি সাংবাদিক চঞ্চল সরকারের কাছে। চঞ্চলদা 'এম সি সরকার অ্যান্ড সন্স'এর প্রতিষ্ঠাতা মহিমচন্দ্র সরকারমহাশয়ের নাতি ও সুধীরচন্দ্র সরকারের ভ্রাতুষ্পুত্র। চঞ্চলদার পিতা জুডিসিয়াল সার্ভিসের অফিসার ছিলেন। আমি তাঁকে দেখেছি, তাঁর সঙ্গে আমার পরিচয় হয়েছিল। কিন্তু তাঁর নাম স্মৃতি থেকে কীভাবে মুছে গেল বুঝতে পারছি না। চল্লিশের যুগে দেশের মুক্তি আন্দোলন যখন চূড়ান্ত পর্যায়ে, সে সময় কলেজ স্ট্রিট ও গোলপার্ক অঞ্চল ছিল একটি ঝটিকা কেন্দ্র। তখন বড়লোকদের পরিবারের মেধাবী ছাত্ররা যাঁরা প্রেসিডেন্সি কলেজে পড়তেন ও কলেজ স্কোয়ার অঞ্চলে ঘোরাফেরা করতেন, তাঁদের অনেকেই এই বিপ্লবী কিরণ মুখার্জিকে চিনতেন। কিরণবাবু এই ছেলেদের দেশকে ভালবাসার মন্ত্র শেখাতেন, কৃচ্ছ্রসাধন করতে বলতেন, খদ্দর পরতে না পারলে অত্যন্ত কম দামের জামা কাপড় পরতে বলতেন। আর একটা কথা বলতেন, 'ধূমপান করবে না, দেহের উদ্দাম শক্তি তাতে কমে যায়।' ৪২ সালের আগস্ট আন্দোলনের সময় যেদিন প্রেসিডেন্সি কলেজের ছাত্ররা 'ইউনিয়ন জ্যাক' পতাকা কলেজ ভবন থেকে নামিয়ে কংগ্রেসের জাতীয় পতাকা তুলে দিয়ে পুলিসবাহিনীকে আটকাবার জন্য কলেজের প্রবেশপথে অবরোধ অবস্থান আরম্ভ করল, কিরণ মুখার্জি তখন উলটো দিকের ফুটপাথে এক বাড়ির গায়ে হেলান দিয়ে তাঁর ভগ্নাংশ শরীর নিয়ে ঠায় দাঁড়িয়ে। আন্দামান পরবর্তী জীবনের দিনগুলি তাঁর অনেকটা এভাবেই কেটেছে। আমার যতদূর মনে পড়ে ১৯৫৬ সালে শীতের সময় কিরণ মুখার্জি ইউরোমিয়া রোগে আক্রান্ত হয়ে মেডিকেল কলেজে স্থানান্তরিত হলেন। আমি তাঁকে দেখতে গিয়েছিলাম। ডাক্তাররা তাঁর শেষ দিনগুলো যতটা আরামে রাখা যায় তার জন্য চেষ্টা করেছিলেন। চঞ্চল সরকার তখন দিল্লিতে 'স্টেটসম্যান' পত্রিকার সহকারী সম্পাদক, তিনি খবর পেয়ে তাঁকে দেখতে এলেন কলকাতায়। কিন্তু শেষ পর্যন্ত কিরণ মুখার্জি চলে গেলেন। তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর শেষকৃত্যাদির সব কাজ করেছিলেন আনন্দবাজার পত্রিকার কানাই সরকার ও এম সি সরকার অ্যান্ড সন্সের সুধীর সরকার। কানাইবাবুর উদ্যোগে বহু বিপ্লবী ও স্বাধীনতা সংগ্রামী নিমতলা শ্মশানঘাটে হাজির হয়েছিলেন কিরণদাকে শেষবিদায় জানাতে।

১৯৫০-এর দশকের মাঝামাঝি সময়ে চঞ্চল সরকার 'স্টেটসম্যান' (The Statesman) পত্রিকার Speaking generally শিরোনামে একটি কলম লিখতেন, সেটি আমার কাছে ছিল অবশ্যপাঠ্য। তিনি তাঁর ওই লেখায় স্যার ঊষানাথ সেনের স্মৃতিকথা জাতীয় একটি গ্রন্থের উল্লেখ করেছিলেন। বইটি আমি পড়তে পারিনি। স্যার ঊষানাথ সেন ভারতীয় সাংবাদিকতার এমন একজন ব্যক্তিত্ব ছিলেন, যাঁকে বিংশ শতাব্দীর ভারতীয় সাংবাদিকতার কুলচূড়ামণি অনায়াসেই বলা যেতে পারে। তিনি Associated Press of India নামে সেই সময়কার News Agency-এর অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা হলেও সামান্য রিপোর্টার হিসাবে তাঁর কর্মজীবন আরম্ভ করেছিলেন। পরবর্তীকালে তিনি ব্রিটিশ ভাইসরয়ের প্রথম ভারতীয় প্রেস সেক্রেটারি নিযুক্ত হয়েছিলেন। চঞ্চলদা তাঁর লেখায় খবরের কাগজের বা নিউজ এজেন্সির রিপোর্টারদের আচরণবিধি ও মূল্যবোধ সম্পর্কে স্যার ঊষানাথের কয়েকটি উদ্ধৃতির উল্লেখ করেছিলেন। সেগুলির মধ্যে অন্যতম ছিল সংবাদের উৎস বা সূত্রের সঙ্গে রিপোর্টারের 'Continuity of relationship'। স্যার ঊষানাথের উপদেশ ছিল সংবাদের সূত্র বা উৎসের যাতে কোনও অমর্যাদা না ঘটে ও কোনওপ্রকার বিব্রতকর অবস্থার সম্মুখীন হতে না হয়, সেটা সংশ্লিষ্ট রিপোর্টারকে অবশ্যই দেখতে হবে। এক্ষেত্রে প্রয়োজন হলে একটি বড় খবরকেও ছাপা থেকে বিরত থাকতে হবে। কারণ এর মধ্য দিয়েই বিশ্বাসযোগ্যতা জন্ম নেয় যা একজন সফল রিপোর্টারের পক্ষে অপরিহার্য। চঞ্চলদার লেখায় স্যার ঊষানাথের এই কথাগুলো আমার খুব মনে ধরেছিল। ওই রকম একটা সময়ে অর্থাৎ ১৯৫৫ সাল নাগাদ আমার রিপোর্টারি জীবনে একটি অনুরূপ পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছিল। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে রাষ্ট্রবিজ্ঞান বা 'Political Science' বিষয়ে পঠন-পাঠন শুরুর সময় থেকে অধ্যাপক দেবেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় (ডি এন ব্যানার্জি নামে সমধিক পরিচিত) ওই বিভাগের প্রধান ছিলেন। এই ডি এন ব্যানার্জি ১৯২০-এর দশকের কোনও এক সময়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে অর্থনীতি বিভাগের অধ্যাপক হিসাবে যোগ দেন। ওই সময়ে কলকাতা ও ঢাকা দুই বিশ্ববিদ্যালয়েই রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিষয়টি অর্থনীতিরও একটি পেপার হিসাবে এম এ ক্লাসের পাঠ্যসূচিতে ছিল। ইতিমধ্যে এলাহাবাদ ও লখনউ বিশ্ববিদ্যালয়ে Political Scienceকে আলাদা বিষয় হিসাবে প্রবর্তিত করা হলে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ ওই পন্থা অনুসরণ করে ১৯৩০-এর গোড়ার দিকে রাষ্ট্রবিজ্ঞানকে পৃথক বিষয় হিসাবে স্বীকৃতি দেন এবং অধ্যাপক ডি এন ব্যানার্জি এই নতুন বিভাগের প্রথম প্রধান অধ্যাপক নিযুক্ত হয়েছিলেন। দেশবিভাগের অব্যবহিত

পরে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে রাষ্ট্রবিজ্ঞান বা Political Science আলাদা বিষয় চালু হলে ঢাকা থেকে ডি এন ব্যানার্জিকে এই বিভাগের প্রধান হিসাবে নিয়ে আসা হয়।

অধ্যাপক ডি এন ব্যানার্জি আমাকে অতিশয় স্নেহ করতেন। বিভাগীয় প্রধানের পদাধিকারবলে তিনি সেনেট সদস্য ছিলেন। ১৯৫৪ সালের শেষ দিকে কিংবা ১৯৫৫ সালের গোড়ায় সেনেট সদস্যরা একদিন একটি বিষয় নিয়ে উদ্বিগ্ন হয়ে আলোচনায় বসেছিলেন। আলোচনার বিষয়টি ছিল এরকম—Political Science নিয়ে যাঁরা এম এ পাশ করছেন, তাঁদের কলেজ-শিক্ষকতার ক্ষেত্রটা খুব সংকুচিত। কারণ, তখনও এই রাজ্যের কলেজগুলিতে Political Science-এ অনার্স চালু হয়নি। ফলে ওই বিষয়ে এম এ পাশ করে কলেজগুলিতে গিয়ে তারা আই এ ক্লাসে কেউ সিভিকস (Civics) এবং কেউ ইতিহাস পড়াচ্ছেন। কারণ, তাঁরা বি এ পাশ করেছেন প্রধানত ইতিহাস ও অর্থনীতিতে। অথচ দিল্লি, এলাহাবাদ, লখনউ প্রভৃতি বিশ্ববিদ্যালয়ে ওই সময়ে রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিষয়ে অনার্স কোর্স চালু হয়েছে। সুতরাং কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়েও রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিষয়ে অনার্স কোর্স দ্রুত প্রবর্তনের কথা চিন্তা করতে হবে। এদিকে যাদবপুর জাতীয় শিক্ষা পরিষদকে বিশ্ববিদ্যালয়ের মর্যাদা দেওয়ার বিল বিধানসভায় পাশ হয়ে গিয়েছে এবং যাদবপুরে ওই বিষয়ে অনার্স কোর্স প্রবর্তন নিয়ে আলোচনা চলছে। শেষ পর্যন্ত সেনেটে এমন একটা সিদ্ধান্ত হল যে প্রধানত রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিষয়ে অনার্স কোর্স প্রবর্তনের কথা মাথায় রেখেই ইন্টারমিডিয়েট পর্যায়ে ইতিহাস ও সিভিকসের পাঠ্যসূচিতে বড় রকমের পরিবর্তন এখনই করতে হবে। কারণ, ১৯৩০-এর যুগে ইন্টারমিডিয়েটে (আর্টস) ইতিহাস ও সিভিকসে যে পাঠ্যসূচি ছিল, ১৯৫৩-৫৪ সালে সেই একই পাঠ্যসূচিই বলতে গেলে চলে আসছে। অথচ এই কুড়ি-বাইশ বছরের মধ্যে বিশ্বঅর্থনীতিতে ও ইতিহাসে বিপ্লবাত্মক পরিবর্তন হয়েছে। ঠিক হয় তিন-চারজন অধ্যাপকের একটি ছোট কমিটি এ বিষয়ে কিছু সুপারিশ Dean of the Faculty of Artsকে দেবেন। এই কমিটিতে অধ্যাপক ডি এন ব্যানার্জি ও অধ্যাপক নীরদ ভট্টাচার্য ছিলেন। অন্যদের নাম মনে নেই। এই কমিটি খুবই তাড়াতাড়ি একটা সুপারিশ করলেন। কিন্তু সুপারিশগুলি কী আমি জানতে পারছিলাম না। আমি একদিন বিশ্ববিদ্যালয়ে ডি এন ব্যানার্জির ঘরে গেলাম। তাঁর কাছে ব্যাপারটা জানতে চাইলাম। তিনি বললেন, 'বাড়িতে আসবে?' শেষে কী ভেবে বললেন, 'বেশ তাহলে এখনই শোনো'। তিনি আমাকে প্রথম মহাযুদ্ধ ও দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের মধ্যবর্তী সময়ের অর্থাৎ ১৯১৪ থেকে ১৯৩৯ সালের সময়কালের ইউরোপের রাজনীতি বোঝাচ্ছিলেন। তারপর জার্মানিতে হিটলারের উত্থান, ফ্রান্স ও ব্রিটেনের আতঙ্ক, ভার্সাই চুক্তির নিষ্ফলতা, লিগ অব নেশনস-এর নাভিশ্বাস, জার্মানির সমর সজ্জায় আতঙ্কিত অন্যান্য দেশগুলির 'লোকার্নো চুক্তি' (Locarno Treaty) ব্যাখ্যা করছিলেন। ওই সময়কার বিশ্ব রাজনীতির ইতিহাসের দুই সেরা গ্রন্থকার E. H. CARR ও MAITLANDকে আমার মগজে ঢুকিয়ে দিলেন। অন্যদিকে মধ্যপ্রাচ্যে মেসোপটেমিয়ার অবলুপ্তি, পরিণতিতে ইরাক ও জর্ডনের জন্ম, রাজা গ্রেট আবদাল্লার কূটনৈতিক পরামর্শদাতা স্যার জনগ্লাবের ক্রমবর্ধমান প্রভুত্ব বিশ্ব রাজনীতিকে কীভাবে তপ্ত করে তুলছিল তা তিনি আমাকে বলেছিলেন। সেই সময়কার আন্ডারগ্র্যাজুয়েট স্তরের ইতিহাসের পাঠ্যসূচিতে এসবের কোনও স্থান ছিল না। কিন্তু যে মুহূর্তে রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিষয়ে অনার্স চালু হবে, তখন ওই ইতিহাসগুলি ছাত্রদের ওপর হুড়মুড় করে এসে পড়বে। ফলে ছাত্ররা যাতে খেই হারিয়ে না ফেলে সেজন্য ইন্টারমিডিয়েট পর্যায়ে বিশ্ব রাজনীতির এই ঘটনা-প্রবাহের সংযোজন অপরিহার্য। আমি তন্ময় হয়ে ডি এন ব্যানার্জির ব্যাখ্যা শুনছিলাম। এই সময় একটি অত্যন্ত সুশ্রী মেয়ে সুইংডোর ঠেলে ক্রুদ্ধ ভঙ্গিতে ঘরে এসে ঢুকল। আমি চমকে মেয়েটির দিকে তাকিয়ে শুধু শাড়িপরার ঢং দেখেই বুঝলাম মেয়েটি অবাঙালি—রাজস্থানি বা গুজরাতি হতে পারে। ডি এন ব্যানার্জি রীতিমতো বিব্রতভাবে তার দিকে চাইতেই সে জবাব দিল, 'স্যার আমি আপনার...।' তিনি বাকিটা পূরণ করে বললেন 'বুঝতে পারছি তুমি আমার ছাত্রী। বলো কী ব্যাপার?' আমি নোটবই বন্ধ করে মেয়েটির দিকে তাকিয়ে; আমার মনে হচ্ছিল মেয়েটি আমার চলে যাওয়া চাইবে। ঠিক তাই। মেয়েটি রূঢ় ভঙ্গিতেই বলল, 'স্যার, আমি অন্য কারও সামনে বলতে চাইছি না।' আমি ততক্ষণে চেয়ার ছেড়ে উঠে পড়েছি। কিন্তু তিনি আমাকে বললেন, 'তুমি একটু পরেই আসবে কিন্তু। দেরি করবে না।' আমি ঘর থেকে বেরিয়েই দূরে না গিয়ে ঘরের বাইরের বেঞ্চে বসলাম। আমি ওখানে বসে বুঝতে পারছিলাম যে মেয়েটি অবাঙালি হলেও বাংলায় খুবই সড়গড়। ডি এন ব্যানার্জির কাছে অভিযোগ বলতে গিয়ে মাঝে মাঝে ফুঁপিয়ে কেঁদে ফেলছে। মেয়েটির অভিযোগটি ছিল এরকম ঃ রাষ্ট্রবিজ্ঞানের পাঠ্যসূচিতে একশো নম্বরের একটি পেপার আছে। পেপারটি হল Political Thoughts in Ancient India। কিন্তু এই পেপারটি পড়ানোর ও খাতা দেখার দায়িত্ব ছিল Ancient Indian History and Culture বিভাগের অধ্যাপকদের। সাধারণত ওই বিভাগের দু'জন অধ্যাপক ওই বিষয়টি পড়াতেন। (ক্রমশ)

নস্টালজিয়া

সুব্রহ্মনিয়ণ কৃষ্ণমূর্তি

(লেখকের মূল তামিল গল্পটি তিনি নিজেই বাংলায় অনুবাদ করেছেন। —সঃ চঃ)

বড় দিনের মরশুম। সেই ছোট জার্মান শহরের প্রধান রাস্তা বহুরঙ্গি আলোর সাজে ঝকঝক করছিল। চমৎকারভাবে সাজানো দোকানগুলিতে ক্রেতাদের ভিড়। রাস্তায় অসংখ্য যানবাহনের আনাগোনা। শহরবাসী উৎসবের আনন্দে মেতে আছে। আত্মমগ্ন প্রেমীযুগল এবং নতুন পোশাকপরা ছেলেমেয়ে গিজগিজ করছে ফুটপাথে। আনন্দ কোলাহলে মুখর সমস্ত অঞ্চলটা।

মূর্তি রোজ বিকেলে এই রাস্তায় হাঁটাহাঁটি করে অনেক সময় কাটায়। এই পরিবেশটা তার পক্ষে সম্পূর্ণ নতুন। সুতরাং খুবই উপভোগ্য। ভারতের সুদূর দক্ষিণের এক ছোট শহরে এক নিম্নমধ্যবিত্ত পরিবারে তার জন্ম। তার স্কুলশিক্ষাও সেখানেই। শুধু উচ্চশিক্ষার জন্য সে এক বড় শহরে বছর কয়েক বাস করেছিল। তখন সে থাকত হস্টেলে এবং সব সময় পড়াশোনায় ব্যস্ত থাকায় শহুরে জীবনের সঙ্গে তার তেমন পরিচয় ঘটেনি। পড়াশোনা শেষ হতেই সে এক কোম্পানিতে চাকরি পেল। কোম্পানিটা তাকে এবং তার মতো নবনিযুক্ত কয়েকজন যুবককে দু'বছর ব্যাপী প্রশিক্ষণের জন্য সেই জার্মান শহরে পাঠিয়েছে। প্রশিক্ষণের এক বছর কেটেছে, আর এক বছর বাকি।

রক্ষণশীল পরিবেশে মানুষ হওয়ার দরুন সে লাজুক ছিল, অপরিচিত লোকেদের সঙ্গে মিশত না। সে যদিও ইংরাজি ভালই জানে অভ্যাসের অভাবে সাবলীল গতিতে বলতে পারে না। তার সহকর্মীরা তার ঠিক বিপরীত স্বভাবের। তারা হইচই পছন্দ করে, অনর্গল কথা বলে সাহেবি ঢঙে। তারা ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলের লোক। তাদের মোড়ল ছিল কিরণ যোশী। সে ইংল্যান্ডে উচ্চশিক্ষা লাভ করেছে যার সুবাদে পশ্চিমী আদবকায়দায় রপ্ত হয়েছে। অন্য সহকর্মীরা তাকে খুব সম্মান করত এবং সব বিষয়ে তার পরামর্শ মেনে চলত। রোজ সন্ধ্যায় তারা দল বেঁধে চলে যেত কোনও বিয়ার-বারে বা থিয়েটারে বা নাইট ক্লাবে এবং অনেক রাত্তিরে আস্তানায় ফিরত। মূর্তি তাদের সঙ্গে যেত না বলে তারা তাকে ঠাট্টা করত, তাকে সেকেলে বলত। যোশী তাকে বার বার বলত 'তুমি এ যুগের উপযুক্ত নও, সাবেকি ধারণাগুলিকে আঁকড়ে ধরে জীবনের আনন্দ থেকে নিজেকে বঞ্চিত করছ। বহু পুরাতন সংস্কারমুক্ত এক পাশ্চাত্য দেশে থাকবার সুযোগ আমাদের হয়েছে, এর পুরোপুরি ব্যবহার করাটাই বুদ্ধিমানের কাজ। আমরা হইচই করে আনন্দে সময় কাটাই বলে তুমি আমাদের মন্দ ভাব আর একা একা রাস্তায় ঘোরো। কিন্তু বলে দিলাম, পশ্চিমী সংস্কৃতিকে তাচ্ছিল্য করতে পারবে না। তারও অনেক শক্তি আছে, তোমার চেয়ে নিষ্ঠাবান লোকদেরও সেটা কাবু করেছে শেষ পর্যন্ত। এক দিন দেখবে এই সংস্কৃতির প্রবল প্রবাহ তোমার অজান্তেই তোমাকে টেনে নিয়েছে।'

ছেলেটির উপদেশ মূর্তির মনে দাগ কাটল না, তার ব্যবহারে কোনও পরিবর্তন আনল না। সে আগের মতোই একা একা রাস্তায় ঘোরে। কিন্তু ইদানীং সে এই ঘোরাঘুরিতে আগের মতো আনন্দ পায় না। এক অস্পষ্ট অশান্তি তার মনে তোলপাড় করছে। এক বছর ধরে সে তার আত্মীয় স্বজনদের থেকে বিচ্ছিন্ন। তার এখনকার সহকর্মীদের মধ্যে তামিল ভাষী আর কেউ নেই। সুতরাং মাতৃভাষায় কথা বলার বা শোনার সুযোগই নেই। সে জার্মান ভাষা কিছুটা শিখেছে। ইংরাজি-মেশা ভাঙা ভাঙা জার্মানে কাজ চালাতে হচ্ছে তাকে। এক অদ্ভুত চিন্তা তাকে পেয়ে বসল। হয়ত দীর্ঘকাল অব্যবহারের ফলে সে তার মাতৃভাষাই ভুলে যাবে। তামিল ভাষায় কথা বলার এবং শোনার জন্য তীব্র আকুলতা জাগল তার মনে। এখন সে কারও সঙ্গে সাবলীল ভাবে কথা বলে নিজের মনের ভাব ব্যক্ত করতে পারে না, পদে পদে তার চিন্তাকে এক অনাত্মীয় ভাষায় তর্জমা করে বলতে হচ্ছে, আবার সে ভাষায় তার দখলও খুব অল্প। এর ফলে শুধু কথা বলাই এক শ্রমসাধ্য ব্যাপার হয়ে গেছে। এমন এক সুহৃদের অভাববোধ তাকে পীড়িত করছে যার সঙ্গে সে অবাধে তামিল ভাষায় কথা বলে স্বস্তি পেতে পারে।

এমনতর ধারণায় নিজেই আশ্চর্য হয়েছে মূর্তি। কারণ সে এতদিন তার মাতৃভাষাকে এত গুরুত্ব দেয়নি। তার মতে ভাষা ছিল মানুষের পরস্পর আদান-প্রদানের একটা আবশ্যক

বাহন মাত্র, তার বেশি নয়। মাতৃভাষার প্রতি কোনও বিশেষ আবেগ সে এতদিন বোধ করেনি। তার ছাত্রাবস্থায় হিন্দিবিরোধী আন্দোলনে সমস্ত তামিলনাড়ু তোলপাড় হচ্ছিল। 'হিন্দি-সাম্রাজ্যবাদে'র বিরুদ্ধে ছাত্রসমাজ স্কুল-কলেজ থেকে বেরিয়ে মিছিল করল তামিল ভাষার সমর্থনে এবং হিন্দির বিরুদ্ধে গরম গরম স্লোগানে আকাশ বাতাস মুখরিত হল। অনেক জায়গায় ছাত্র-ছাত্রী সমাবেশ পুলিশ ভেঙে দিল লাঠিচার্জ করে, অনেকে ঘায়েল হল। এই আন্দোলনকে বাড়াবাড়ি মনে করেছিল মূর্তি। তার মতে মাতৃভাষা নিয়ে এত আবেগ নিরর্থক। তার এই মনোভাবের জন্য তার বন্ধুরা তাকে নিন্দা করত তাকে ভাষাদ্রোহী বলত, কিন্তু মূর্তি তাদের নিন্দাবাদকে গ্রাহ্যই করত না।

এখন মাতৃদেশ থেকে অনেক দূরে এসে, মাতৃভাষায় কথা বলা বা শোনার সুযোগ থেকে মাসের পর মাস বঞ্চিত থেকে সে বুঝতে পারছে যে মাতৃভাষাটা তার অজান্তেই তার মনের অনেকখানি জায়গা জুড়ে আছে। মাতৃভাষার আবেগময় শক্তি সে অনুভব করছে। বিদেশি ভাষার একটানা ব্যবহারে সে অস্বস্তি বোধ করে। তার মনে হয় যে মাতৃভাষায় কারও সঙ্গে কথা বললে অথবা অন্তত কথা শুনলে তার এই অস্বস্তি কিছুটা কেটে যাবে। কিন্তু কার সঙ্গে তামিল কথা বলবে সে?

সেদিন মূর্তি আনমনা অবস্থায় অনেকক্ষণ হাঁটল। হঠাৎ বুঝতে পারল সে এক অপরিচিত অঞ্চলে এসে পড়েছে। পথ ছিল সরু তাকে গলি বলাই সঙ্গত। তার দু পাশে ছোট ছোট দোকান—সিগারেটের দোকান, খাবারের দোকান, মদের দোকান, সস্তা কাপড়ের দোকান...সেখানকার হতশ্রী পরিবেশ দেখেই সে বুঝতে পারল যে এক বস্তি জাতীয় অঞ্চলে এসে পড়েছে। কিছু কিছু দোকান থেকে সাবেকি গ্রামোফোন রেকর্ডের উচ্চস্বরে আওয়াজ ভেসে আসছিল।

মূর্তি অস্বস্তি বোধ করল, সঙ্গে সঙ্গে একটু ভয়ও পেল, কারণ অন্ধকার আস্তে আস্তে নামছিল। আর একটু সরে গাঢ় অন্ধকার ছেয়ে যাবে আর সে ফিরবার পথ খুঁজে পাবে না। তাকে তাড়াতাড়ি মেন রাস্তায় পৌঁছুতে হবে।

"পোহাদে পোহাদে এন্ কগবা
পোল্লাদ সোপ্পনম্ লানুম কান্ডন..."

[যেও না, যেও না আমার স্বামী
খারাপ স্বপ্ন দেখেছি আমি...]

মূর্তি চমকে উঠল। তামিল গান এখানে? সে কি স্বপ্ন দেখছে?

গানটা ছিল পুরনো যুগের বিখ্যাত লোকগীতি—দেশভক্ত বীর কট্টবোম্মনের কাহিনি। কট্টবোম্মন ছিলেন দক্ষিণ ভারতের এক ছোট অঞ্চলের শাসক। ইংরেজরা তাঁর শাসিত অঞ্চলকে গ্রাস করার চেষ্টা করলে তিনি তাদের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ালেন। উদ্ধত ইংরেজকে বললেন, 'আকাশ দেয় জল, ভূমি দেয় খাদ্য, আমরা কেন তোমাকে দেব কর?' কিন্তু ইংরেজদের বিরাট সৈন্যের বিরুদ্ধে তাঁর ক্ষুদ্র সেনা হেরে গেল। তিনি বন্দি হলেন এবং তাঁকে ফাঁসি দেওয়া হল। প্রকাশ্যে এক তেঁতুলগাছের ডালে তাঁকে ঝোলানো হল। তাঁর কাহিনি নিয়ে লেখা গান গ্রামেগঞ্জে বিশেষ জনপ্রিয়তা লাভ করল।

গানের যে কলি মূর্তি শুনেছিল সেটা হল কট্টবোম্মনের স্ত্রীর কথা। শেষ অভিযানে কট্টবোম্মন বাড়ি থেকে বেরচ্ছেন এমন সময় তাঁর স্ত্রী তাঁকে যেতে মানা করে বলেন যে তিনি দুঃস্বপ্ন দেখেছেন ফলে আশঙ্কা করছেন স্বামীর বিপদের। কিন্তু কট্টবোম্মন স্ত্রীর বারণ না মেনে চলে যান এবং তাঁর স্ত্রীর আশঙ্কা সত্যে পরিণত হয়।

মূর্তি অভিভূত অবস্থায় আত্মবিস্মৃত ভাবে এগিয়ে সেই দোকানটার সামনে দাঁড়িয়ে গেল যেখান থেকে গানটি ভেসে আসছিল।

'ইউ ইন্ডিয়ান?'

আচ্ছন্ন অবস্থা থেকে সংবিৎ ফিরে পেল মূর্তি। তার সামনে এক বৃদ্ধ জার্মান দাঁড়িয়ে। তিনিই বোধ হয় মদের দোকানটির মালিক।

ভদ্রলোকটি ইংরাজিতে আরও কিছু বলার চেষ্টায় হিমসিম খাচ্ছেন দেখে মূর্তি তাঁকে বলল, 'হ্যাঁ, আমি ইন্ডিয়ান...কিছু কিছু জার্মান জানি। আপনি জার্মান ভাষায় কথা বললে বুঝতে পারি।... এখানে তামিল গানের রেকর্ড শুনে আশ্চর্য হলাম। আপনি এটা কী করে পেলেন?'

ভদ্রলোক বললেন, 'আপনি তামিল? আপনাকে দেখে খুব ভাল লাগছে। আমার বাবা ব্যবসার সূত্রে দেশে দেশে ঘুরতেন। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় তিনি আটকে পড়লেন ভারতে। তামিল দেশের কোনও জায়গায় তাঁকে ইন্টার্ন করে রাখা হয়েছিল বছর কয়েক। সে সময় তিনি তামিল শিখেছিলেন। লোকগীতি খুব ভালবাসতেন তিনি। অনেক লোকগীতির রেকর্ড জোগাড় করেছিলেন—কট্টবোম্মন কাহিনি, তুক্কুত্তুক্কি, পবলক্কোডি, অল্লি-অর্জুন আরও অনেক। আপনার এসব গান ভাল লাগে? তাহলে ভেতরে আসুন...গান শোনাব...আমি তামিল বুঝি না, কিন্তু না বুঝেও এসব গানের সুর আমার ভাল লাগে, তার মর্ম বুঝতে পারি।'

মূর্তি তার পেছন পেছন দোকানটির ভেতরে গেল।

মূর্তির ছোটবেলায় কট্টবোম্মনের কাহিনি এবং অন্যান্য জনপ্রিয় কাহিনির যাত্রা হত গ্রামেগঞ্জে। এই যাত্রাকে তামিলে বলা হয় 'তেরুকুত্তু' (পথনাটক)। এতে আলোর জুলুস বা

পোশাকের জাঁকজমক থাকত না। অভিনেতা-অভিনেত্রীর সংখ্যাও অধিক নয়। কিন্তু কলাকুশলীদের অভিনয়ে দর্শকগণ অভিভূত হয়ে যেত। রাত দশটায় শুরু হয়ে পুরো রাত চলত কুত্তু।

মূর্ত্তি কুত্তু দেখতে ভালবাসত। আশেপাশে কোথাও কুত্তু অভিনীত হলে সে তাতে হাজির হয়ে যেত। একবার সে এক বিখ্যাত মন্দিরের উৎসব দেখতে গিয়েছিল তার বাবার সঙ্গে। মন্দিরের পাশে ময়দানে মেলা বসেছিল। বাবার সঙ্গে মন্দির থেকে ফিরবার সময় মূর্তি দেখল মেলায় কট্টবোম্মন কাহিনির কুত্তু হচ্ছে। সে সেখানেই দাঁড়িয়ে কুত্তু দেখতে লাগল। অনেকক্ষণ পরে সে বুঝতে পারল তার বাবা চলে গেছেন। হয়ত তিনি মনে করেছেন ছেলেটি তাঁর পেছন পেছনই আসছে। রাত্রিবেলায় একা পড়ে যাওয়ায় একটুও ঘাবড়ায় না মূতি। সে সোজা একজন স্বেচ্ছাসেবকের কাছে গিয়ে বলল, 'আমার বাবা ভিড়ের মধ্যে হারিয়ে গেছেন। তাঁকে একটু খুঁজে দেবে?" সে বুঝতেই পারল না স্বেচ্ছাসেবকটি কেন হা হা করে হেসে উঠল।

এই ঘটনাটা এখন তার মনে পড়তেই তার ঠোঁটে হাসি ফুটল।

'আপনি কি বিয়ার খাবেন? ...আমার দোকানটি ছোট অবশ্য, কিন্তু এখানে দেশেৰ প্রায় সব সেরা ড্রিংক্স পাওয়া যায়।'

'না আমি মদ খাই না...শুধু এক কাপ চা দিলেই হবে...আপনার কাছে কী কী গান আছে, দেখান তো।'

রেকর্ডগুলি বের করলেন হের স্মিড্‌ট্‌। লোকগীতির বিরাট সম্ভার দেখতে পেল মূর্তি। পল্লতঙ্গাল, দেশিঙ্গুরাজন, দ্রম্বাচারি, গুলেবকাবলি, অল্লি-অর্জুন, আরও অনেক কাহিনি।

বেজায় খুশি হল মূর্তি। হের স্মিড্‌ট্‌ রেকর্ডগুলি বাজিয়ে শোনাতে লাগলেন এবং মূর্তি তা শুনতে থাকল আত্মবিস্মৃত হয়ে। তার মনে কালের ব্যবধান মুছে গেল। সে আবার তার বাল্যে ফিরে গেল। এক হারানো যুগের মেদুর স্মৃতি তাকে আচ্ছন্ন করে দিল।

গানগুলি শুনতে শুনতে কোথা দিয়ে যে সময় কেটে গেল সে বুঝতেই পারল না। একসময় সংবিৎ ফিরলে দেখল চারিপাশ নিস্তব্ধ। রাত অনেক হয়েছে। সে তাড়াতাড়ি উঠে পড়ল। তাকে তার আস্তানায় ফিরতে হবে। তার জার্মান বন্ধুর কাছে বিদায় নিয়ে বলল, 'আমি রোজ আসব আর এই গান শুনব। আমি স্বপ্নেও ভাবিনি যে এই বিদেশ বিভুঁয়ে আমার দেশের আমার পুরনো সংস্কৃতির এক টুকরো পড়ে আছে। আমি এখানে যা পেয়েছি তা বড় পাওনা। গুড নাইট।'

জনচলাচলহীন রাস্তায় হাঁটতে হাঁটতে মূর্তি দেখল এক ঘিঞ্জি বস্তিঅঞ্চলের অভ্যস্ত দৃশ্য—রাস্তার ধারে গড়াগড়ি দেওয়া মাতাল, ঘরগুলি থেকে ঝগড়া-ঝাঁটি, মারামারির আওয়াজ...

পরের দিন সকালে প্রাতরাশের টেবিলে যোশী দুষ্টুমির হাসি হেসে মূর্তিকে বলল, 'কাল সন্ধ্যায় কোথায় গেছলে মাই ডিয়ার বয়? ...দেখলাম অনেক রাত্তিরে ফিরলে। ...কোন মোহিনীর কবলে পড়লে ভাই? ওদের পাল্লায় পড়লে আর নিস্তার নেই, তোমাকে সাবধান করে দিচ্ছি।'

অন্য সহকর্মীদের কৌতুকভরা দৃষ্টি মূর্তির ওপর।

কিন্তু মূর্তি যোশীর ঠাট্টায় একটুও অস্বস্তিবোধ করল না। সে একবার ভাবল সত্যি কথাটা তাদের বলে দেবে। কিন্তু তাতে তাদের ঠাট্টার মাত্রাটা আরও বাড়বে, কমবে না। তারা তাকে বিদ্রূপ করবে ছেলেমানুষ বলে, 'সেন্টিমেন্টাল ফুল' বলে।

কিন্তু এইসব ঠাট্টা বিদ্রূপে তার কিছু যায় আসে না। সে সত্যি কথাটাই বলবে। বুক ফুলিয়ে বলল সে, 'হ্যাঁ, আমি অমুক পাড়ায় গেছলাম। অনেকটা রাত সেখানেই কাটিয়েছি, আর সেখানে রোজ রোজ যাব...কারণ সেখামে আমার দেশের এবং মাতৃভাষার এক টুকরোকে আমি পেয়েছি'।

'গীতিচর্চ্চা' ঃ দিনেন্দ্রনাথ সম্পাদিত রবীন্দ্রনাথের গান

প্রবীর গুহঠাকুরতা

দুশো গান নিয়ে বিশ্বভারতী গ্রন্থন বিভাগ থেকে দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সম্পাদনায় 'গীতিচর্চ্চা' নামে একটি গীত-সংকলন প্রকাশিত হয় পৌষ, ১৩৩২ বঙ্গাব্দে (খ্রিস্টাব্দ ১৯২৫)। প্রকাশক ছিলেন করুণাবিন্দু বিশ্বাস। শান্তিনিকেতন প্রেস থেকে সংকলনটি জগদানন্দ রায়ের তত্ত্বাবধানে মুদ্রিত হয়। দিনেন্দ্রনাথ শান্তিনিকেতনে ছিলেন প্রায় ছাব্বিশ বছর, ১৯০৮ থেকে ১৯৩৩ সালের শেষ বা ১৯৩৪-এর প্রথম অবধি। এ সময়ে তিনি সেখানকার অধ্যাপনার কাজে যুক্ত ছিলেন, যার মধ্যে সঙ্গীত অধ্যাপনা ছিল প্রধান। রবীন্দ্রনাথের গানের প্রচার, প্রসার ও সংরক্ষণে তিনি ছিলেন কবির ঘনিষ্ঠতম সঙ্গী। 'গীতিচর্চ্চা'-র আখ্যাপত্রে সম্পাদক হিসাবে দিনেন্দ্রনাথ নিজে কোনও বক্তব্য রাখেননি, প্রকাশকের নিবেদনে বলা হয় ঃ

"গীতিচর্চ্চায় গানগুলি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের বিভিন্ন সময়ে রচিত গান হইতে সংগ্রহ করিয়া বিশেষভাবে আশ্রমবাসী ছাত্র ও ছাত্রীদের জন্য প্রকাশ করা হইল। আশ্রমের ছাত্র ও ছাত্রীগণ প্রতিদিন সকালে ক্লাশ আরম্ভের পূর্বে, রাত্রিতে শয়নের পূর্বে, বিভিন্ন ঋতুতে, উৎসব ও অনুষ্ঠান বিশেষে যে সকল গান গাহিয়া থাকে কেবলমাত্র সেই সকল গানই এই পুস্তকে সংগ্রহ করা হইয়াছে। এই জন্য পূজনীয় মহর্ষিদেবের ও পূজনীয় দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের দুইটি গান, তিনটি বেদগানও এই স্থানে সন্নিবেশিত করা হইল। গানগুলি বাছাই করিবার সময় সুর ও কথাতে যাতে শিক্ষার্থীদের পক্ষে উপযোগী হয় সে বিষয়ে দৃষ্টি রাখিবার চেষ্টা করা হইয়াছে।"

বইটিতে অন্তর্ভুক্ত গানের তালিকা এ রচনাটির শেষে দেওয়া হল। অতিরিক্ত, প্রথমে ক্রমিক সংখ্যা ও সূচনা-পাঠের শেষে বইটিতে গানটির পৃষ্ঠাঙ্ক উল্লেখ করা হয়েছে। বইটির একটিমাত্র সংস্করণ প্রকাশিত হয়েছিল। দুশোটি গানের মধ্যে সাতটি গানের রচয়িতা রবীন্দ্রনাথ নন—মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সংস্কৃত গান '১৩৬ পুণ্য পুঞ্জেন যদি প্রেম ধনং', দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের '৭৩ কর তাঁর নাম গান' ও '৯৩ জাগ সকল অমৃতের অধিকারী', জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের '১৫১ বিমল প্রভাতে মিলি একসাথে' এবং তিনটি বেদ ও উপনিষদের গান—'৯৮ তমীশ্বরানাং পরমং মহেশ্বরং' (শ্বেতাশ্বতর উপনিষদ), '১৭৪ যদেমি প্রস্ফুরন্নিব' (ঋকবেদ) ও '১৬১ যা আত্মদা বলদা যস্য' (ঋগ্‌বেদ)। বেদ ও উপনিষদের গান তিনটির সুরকার রবীন্দ্রনাথ। তালিকায় শেষের গানটির সূচনা-পাঠের শেষে বন্ধনীতে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের উল্লেখের তাৎপর্য বোঝা যায় না, সম্ভবত এটি একটি মুদ্রণ-ত্রুটি।

যতদূর তথ্য পাওয়া যায় বইটি প্রকাশের আগের বছর অর্থাৎ ১৩৩১ বঙ্গাব্দ (খ্রিঃ ১৯২৪) অবধি রবীন্দ্রনাথ ১৫২৯টি গান রচনা করেছিলেন। দিনেন্দ্রনাথ তার থেকে রবীন্দ্রনাথের ১৯৩টি গান বেছে নিয়েছেন। রবীন্দ্রনাথ রচিত গানগুলি এখন নিম্নোক্ত সূত্র থেকে পাওয়া যায় ঃ

'ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলী' (১২৯১), 'রবিচ্ছায়া' (১২৯২), 'গানের বহি ও বাল্মীকি প্রতিভা' (১৩০০), 'কাব্যগ্রন্থাবলী' (১৩০৩), 'কাব্যগ্রন্থ' (১৩১০ ও ১৩২৩), 'রবীন্দ্র গ্রন্থাবলী, হিতবাদি সংস্করণ' (১৩১১), 'স্বদেশ' (১৩১২), 'বাউল' (১৩১২), 'গান' (১৩১৫), 'গান' (১৩১৬), 'গীতাঞ্জলি' (১৩১৭), 'গান' (১৩২১), 'ধর্ম্মসঙ্গীত' (১৩২১), 'গীতিমাল্য' (১৩২১), 'গীতালি' (১৩২১); এবং স্বরলিপি সংকলন—'স্বরলিপি গীতিমালা' (১৩০৪), 'বীণাবাদিনী' পত্রিকা (শ্রাবণ, ১৩০৪-চৈত্র, ১৩০৫), 'শতগান' (১৩০৭), 'সঙ্গীত প্রকাশিকা' (চৈত্র, ১৩০৮,-জ্যৈষ্ঠ, ১৩১৮), 'ব্রহ্মসঙ্গীত স্বরলিপি' ৬ খণ্ড (১৩১১-১৩১৮), 'প্রায়শ্চিত্ত' (১৩১৬), 'আনন্দসঙ্গীত পত্রিকা' (আশ্বিন, ১৩২০-জ্যৈষ্ঠ, ১৩২৭), 'গীতলিপি' ৬ খণ্ড (১৩১৭-১৩২৫), 'গীতলেখা' ৩ খণ্ড (১৩২৪-১৩২৭), 'বৈতালিক' (১৩২৫), 'গীতপঞ্চাশিকা' (১৩২৫), 'কেতকী' (১৩২৬), 'কাব্যগীতি' (১৩২৬), 'শেফালি' (১৩২৬), 'গীতিবীথিকা' (১৩২৬), 'নবগীতিকা' ২ খণ্ড (১৩২৯) ও 'মায়ার খেলা' (১৩৩২)।

('মায়ার খেলা' গীতিনাট্যটির গানগুলি স্বরলিপি হয়ে ১৩৩২ বঙ্গাব্দে প্রকাশিত হলেও, এর গানগুলি যথেষ্ট প্রচলিত ছিল এবং পাঠরূপ প্রথম প্রকাশিত হয়েছিল 'গানের বহি ও বাল্মীকি প্রতিভা'-য়)।

উপরিউক্ত তথ্য থেকে বোঝা যায় যে 'গীতিচর্চা' বইটিতে নির্বাচনের উদ্দেশ্য সীমিত হলেও দিনেন্দ্রনাথের সামনে যথেষ্ট উপকরণ ছিল। বইটি প্রকাশিত হয় দিনেন্দ্রনাথের শান্তিনিকেতনে বসবাসের সতেরো বছর পরে। তাঁর বিচারে সেখানকার ছাত্র ও ছাত্রীদের 'চর্চা'-র জন্য 'উপযোগী' কোন গানগুলি সেরকম একটি ধারণা পাওয়া যায়। স্পষ্টতর হয় সেখানকার সম্মেলক গাইবার রীতি অনুসারে যে গানগুলি সমকালে প্রচলিত ছিল। নিম্নোক্ত গান চারটি বাদ দিলে দিনেন্দ্রনাথের তালিকার সবগুলি গানই সম্মেলক কণ্ঠে গাইবার 'উপযোগী' ছিল ঃ

২ অন্ধজনে দেহ আলো। ১৩২ নিশিদিন মোর পরাণে। ১৬১ মেঘের পরে মেঘ জমেছে। ২০০ হেরি তব বিমল মুখভাতি।

গানগুলি সাজাবার সময় শান্তিনিকেতনের সব অনুষ্ঠানের গান '৩৮ আমাদের শান্তিনিকেতন' বইটির প্রথম পৃষ্ঠায় স্থান পেয়েছে। গানটি রচিত হয়েছিল ১৯১১-তে, তখন দিনেন্দ্রনাথ শান্তিনিকেতন-আবাসী। দ্বিজেন্দ্রনাথের '৭৩ কর তাঁর নাম গান' ও রবীন্দ্রনাথ রচিত দুটি গান '৬ আগুনের পরশমণি ছোঁয়াও প্রাণে' ও '১৬৬ মোরা সত্যের পরে মন' শান্তিনিকেতনে ৭ই পৌষ উপাসনান্তে আশ্রম প্রদক্ষিণকালে গাওয়া হয়। '৬ আগুনের পরশমণি' গানটিও রচিত হয়েছিল শান্তিনিকেতনে দিনেন্দ্রনাথের বাসকালে। রবীন্দ্রজীবনকালে সূচিত বিশ্বভারতীর ও বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয় হবার পর (১৯৫১) বাৎসরিক সমাবর্তন উৎসবের দিন ধার্য ছিল ৭ই পৌষ উৎসবের মধ্যদিন—৮ই পৌষ। বর্তমানে এই সমাবর্তন 'অনুষ্ঠান-বিশেষ'-এর সঙ্গে জড়িত দুটি গান '৯৮ তমীশ্বরানাং পরমং মহেশ্বরং' ও 'বিশ্ববিদ্যাতীর্থপ্রাঙ্গণ করো মহোজ্জ্বল'। 'বিশ্ববিদ্যাতীর্থ' রচিত হয়েছিল ১৯৪০ সালে অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয় থেকে শান্তিনিকেতনে রবীন্দ্রনাথকে ডক্টরেট উপাধিতে ভূষিত করার অনুষ্ঠানের প্রাক্কালে, ১৯১৭ সালে প্রসিদ্ধ বিজ্ঞানী জগদীশচন্দ্র বসুর 'বসু বিজ্ঞান মন্দির' প্রতিষ্ঠা অনুষ্ঠানে পরিবেশিত 'মাতৃমন্দির পুণ্য অঙ্গন' গানটির সুরাবলম্বনে। সম্মেলক গাইবার উপযোগী হলেও 'মাতৃমন্দির' গানটি দিনেন্দ্রনাথ তাঁর বইয়ে স্থান দেননি, আর রচনার সময়কাল বিচার করলে 'বিশ্ববিদ্যাতীর্থ' স্থান পাবার অবকাশই ছিল না।

৭ই পৌষ উৎসবকালে শান্তিনিকেতনে আরও একটি 'অনুষ্ঠান বিশেষ' প্রচলিত—৯ই পৌষ দিনটি প্রয়াত আশ্রমবাসীদের স্মরণে উদযাপিত হয়। এ স্মরণসভায় সম্মেলক গাইবার জন্য দুটি গান নির্ধারিত—'১৭৪ যদেমি প্রস্ফুরন্নিব' এবং তারই বাংলায় ভাবানুবাদ '১৭৩ যদি ঝড়ের মেঘের মত'। শেষোক্ত গানটি যে বছরে লেখা হয় (১৯০৮), সে বছরই দিনেন্দ্রনাথ শান্তিনিকেতনে বসবাস শুরু করেন। দুটি গানই দিনেন্দ্রনাথের তালিকায় স্থান পেয়েছে।

যাঁরা বর্তমানে শান্তিনিকেতনের বিভিন্ন 'অনুষ্ঠান বিশেষ'-এর সঙ্গে পরিচিত, তাঁরা দিনেন্দ্রনাথের তালিকায় কয়েকটি গানের অভাব দেখবেন। গানগুলি হল ঃ 'মরুবিজয়ের কেতন উড়াও' ও 'আয় আমাদের অঙ্গনে' (উভয়ই 'বৃক্ষরোপণ'), 'ফিরে চল মাটির টানে' ('হলকর্ষণ') এবং 'ওরে গৃহবাসী, খোল্ দ্বার খোল্' ('বসন্তোৎসব')। এ গানগুলি রচিত হয়েছিল শান্তিনিকেতনে যখন দিনেন্দ্রনাথ ছিলেন তখনই। প্রয়োগ শুরু হয় তাঁরই অবস্থানকালে। 'মরুবিজয়ের' গানটি লেখা হয়েছিল ১৯২৫-এ উত্তরায়ণের প্রাঙ্গণে 'পঞ্চবটি' প্রতিষ্ঠা উপলক্ষে। বৃক্ষরোপণ অনুষ্ঠানে 'আয় আমাদের অঙ্গনে' ও 'মরুবিজয়ের কেতন উড়াও'-এর প্রয়োগ শুরু হয় ১৯২৮ সাল থেকে। তার পরের বছরই 'হলকর্ষণ' অনুষ্ঠানের সূচনা হয় শ্রীনিকেতনে। সে অনুষ্ঠানে 'ফিরে চল মাটির টানে' গানটির সঙ্গে '২৪ আমরা চাষ করি আনন্দে' সম্মেলক গাওয়া আজও প্রচলিত। শেষোক্ত গানটি 'অচলায়তন' (১৯১১) নাটকের, দিনেন্দ্রনাথ তাঁর নির্বাচনে স্থান দিয়েছেন। 'ওরে গৃহবাসী' 'নবীন' (১৯৩০) গীতিনাট্যের গান; বসন্তোৎসবে (দোল-পূর্ণিমার দিন) নৃত্য-গীত-রত ছেলে-মেয়েদের পরিবেশন ঠিক কবে থেকে শুরু হয় তা সঠিকভাবে বলা যায় না, তবে রবীন্দ্রজীবনকালেই এটি হয়েছিল।

ওপরের তথ্য থেকে একথা ধরে নেওয়া যেতে পারে যে 'গীতিচর্চা' প্রকাশের (১৯২৫) পরে বেশ কয়েকটি গান শান্তিনিকেতনে 'বিশেষ অনুষ্ঠানে' স্থান করে নিয়েছিল। হয়ত 'গীতিচর্চা'-র দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হলে দিনেন্দ্রনাথ রবীন্দ্রনাথের অনুমোদিত এই গানগুলিকে তাঁর নির্বাচনে স্থান দিতেন।

'গীতিচর্চা' সংকলনের আগে রবীন্দ্রনাথ তাঁর তরুণ বয়সে তিনটি গীতিনাট্য রচনা করেছিলেন—'বাল্মীকি প্রতিভা', 'কালমৃগয়া' ও 'মায়ার খেলা'। প্রথম দুটিতে দস্যু ও শিকারিদের ও তৃতীয়টিতে বনকুমারীদের চরিত্রে বেশ কয়েকটি গান আছে যেগুলি সকলে মিলে গাইবার যথেষ্ট উপযোগী, কিন্তু একটি বাদে এ গীতিনাট্য তিনটির কোনও গানই দিনেন্দ্রনাথ তাঁর সংকলনে স্থান দেননি। যে গানটি নিয়েছেন সেটি হল 'বাল্মীকি প্রতিভা'-র '১৭৯ রিম ঝিম ঘন ঘন রে' ('কালমৃগয়া'-য় 'ঝম্ ঝম্ ঘন ঘন রে')। বস্তুত এ গানটির ইতিহাস বেশ দীর্ঘ। গানটি প্রথমে 'কালমৃগয়া'-র (১৮৮৩) জন্য লেখা হয়, পরে পাঠান্তরে 'বাল্মীকি প্রতিভা'-র দ্বিতীয় পর্যায়ে (১৮৮৫) অন্তর্ভুক্ত করার আগে

জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর, স্বর্ণকুমারী দেবী (ঘোষাল), অক্ষয়চন্দ্র চৌধুরী ও রবীন্দ্রনাথ কর্তৃক যৌথভাবে রচিত 'বিবাহ উৎসব' (১৮৮২) গীতিনাট্যেও ব্যবহার করা হয়েছিল। সাধারণভাবে একথা বলা যেতে পারে যে তিনটি গীতিনাট্যের সংলাপ—গানগুলি দিনেন্দ্রনাথ স্বতন্ত্র গান হিসাবে বিচার করেননি।

মূলত কিশোর বয়সের রচনা 'ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলী'-র গানগুলির এক বিশেষ স্থান আছে। ২২টি গান/কবিতা, কিন্তু সুর সংযোজিত মাত্র ৯টি। 'মরণ রে তুঁহু মম' ও 'বজাও ওরে মোহন বাঁশি' ছাড়া অন্য ৭টি গানই সকলে মিলে গাইবার উপযোগী। গানগুলি হল ঃ 'শাঙন গগনে ঘোর ঘনঘটা', 'শুন লো শুন লো বালিকা', 'হৃদয়ক সাধ মিশাওল হৃদয়ে', 'সজনি সজনি রাধিকা লো', 'গহন কুসুম কুঞ্জ মাঝে', 'সতিমির রজনী, সচকিত সজনী' ও 'আজু, সখী মুহু মুহু'। রচনা বৈশিষ্ট্য থাকলেও দিনেন্দ্রনাথ একটি গানও তাঁর নির্বাচনে বাছেননি।

তরুণ বয়সের অনেকগুলি গান রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন আদি ব্রাহ্ম সমাজের ১১ই মাঘে অনুষ্ঠিত বাৎসরিক 'মাঘোৎসব' উপলক্ষে। বিগত উনিশ শতকের শেষ দুই দশকের প্রায় প্রতি বছরই মাঘোৎসব-উপাসনা রবীন্দ্রনাথের গানে সমৃদ্ধ হয়েছে। পরে আদি ব্রাহ্ম সমাজের গায়ক কাঙ্গালীচরণ সেন মাঘোৎসবে পরিবেশিত অনেকগুলি গান ছয় খণ্ডের 'ব্রহ্মসঙ্গীত স্বরলিপি'-তে (১৩১১-১৩১৮/ইং ১৯০৪-১৯১১) ধরে রাখেন। সে গানগুলি 'স্বরবিতান সূচীপত্রে' (বিশ্বভারতী, মে ২০০৩) 'ব্রহ্মসঙ্গীত' বলে চিহ্নিত। দিনেন্দ্রনাথ ৪২টি 'ব্রহ্মসঙ্গীত' তাঁর সম্পাদনায় স্থান দিয়েছেন ঃ

১ অন্তর মম বিকশিত কর ২ অন্ধজনে দেহ আলো ৩ অল্প লইয়া থাকি তাই ১৩ আজি প্রণমি তোমারে চলিব নাথ ১৫ আজি যত তারা তব আকাশে ১৬ আজি বহিছে বসন্ত পবন ১৮ আনন্দ তুমি স্বামী ১৯ আনন্দলোকে মঙ্গলালোকে ২৮ আমার মাথা নত করে দাও ৩০ আমার এ ঘরে আপনার করে ৪২ আমি বহু বাসনায় প্রাণপণে চাই ৬২ এস আশ্রমদেবতা (এস হে গৃহদেবতা) ৭৭ কোন শুভখনে উদিবে নয়নে ৯৬ তব অমল পরশ রস ১০৩ তুমি বন্ধু, তুমি নাথ ১১০ তোমার পতাকা যারে দাও ১১২ তোমার অসীমে প্রাণমন লয়ে ১১৬ তোমারি ইচ্ছা হউক পূর্ণ ১১৮ তোমারি নামে নয়ন মেলিনু ১১৯ তোমারি গেহে (গৃহে) পালিছ স্নেহে ১২০ তোমারি রাগিণী জীবনকুঞ্জে ১২১ (তাঁহারে) আরতি করে চন্দ্রতপন ১২৩ দাঁড়াও আমার আঁখির আগে ১২৪ দুয়ারে দাও মোরে রাখিয়া ১২৮ নয়ন তোমারে পায় না দেখিতে ১৩০ নিবিড় অন্তরতর বসন্ত ১৩৪ পান্থ এখন কেন অলসিত অঙ্গ ১৩৫ পাদপ্রান্তে রাখ সেবকে ১৪১ প্রেমানন্দে রাখ পূর্ণ ১৪৩ বল দাও, মোরে বল দাও ১৪৪ বহে নিরন্তর অনন্ত আনন্দধারা ১৪৬ বাজে বাজে রম্য বীণা ১৫০ বিপদে মোরে রক্ষা করো ১৬৫ মোরে ডাকি লয়ে যাও ১৭০ যদি এ আমার হৃদয় দুয়ার ১৭৭ যে কেহ মোরে দিয়েছ সুখ ১৮২ শান্ত হ রে মম চিত্ত নিরাকুল ১৮৩ শান্তি কর বরিষণ ১৮৬ শুনেছে তোমার নাম ১৯২ সংসার যবে মন কেড়ে লয় ১৯৭ হে সখা, মম হৃদয়ে রহ ২০০ হেরি তব বিমল মুখভাতি

সম্পাদকের নিবেদনে উল্লিখিত বিভিন্ন ঋতুতে গীত গানের তালিকা (মোট গান ৩০) এরকম ঃ

গ্রীষ্ম ১২২ দারুণ অগ্নিবাণে রে **বর্ষা** ৮ আজ বারি ঝরে ঝর ঝর ১৭ আজি শ্রাবণ ঘন ৫৬ এই শ্রাবণের বুকের ভিতর ৬৩ এস হে এস সজল ঘন ১৩৭ পূব সাগরের পার হতে ১৪৭ বাদল মেঘে মাদল বাজে ১৪৮ বাদল বাউল বাজায় রে ১৪৯ বাদল ধারা হল সারা ১৬০ মেঘের কোলে কোলে যায় রে ১৬১ মেঘের পরে মেঘ জমেছে **শরৎ** ৭৮ কোন ক্ষ্যাপা শ্রাবণ ছুটে এল ১৮০ শরৎ তোমার অরুণ আলোর ১৮১ শরতে আজ কোন অতিথি **হেমন্ত** ১৯১ হেমন্তে কোন বসন্তেরি বাণী **শীত** ১৮৪ শিউলি ফোটা ফুরালো যেই ১৮৫ শীতের হাওয়ায় লাগল নাচন **বসন্ত** ১২ আজ খেলা ভাঙার খেলা ৪০ আমি পথভোলা এক পথিক ৫৯ এতদিন যে বসেছিলেম ৬০ এনেছ ঐ শিরীষ বকুল ৬৭ ওগো দখিন হাওয়া ৭১ ওরে ভাই ফাগুন লেগেছে ১০৬ তুমি কোন পথে যে এলে ১১৫ তোমার বাস কোথা যে ১৪২ ফাগুন হাওয়ায় রঙে রঙে ১৪৫ বসন্তে আজ ধরার চিত্ত হল ১৫৯ মাধবী হঠাৎ কোথা হতে ১৮৯ সব দিবি কে, সব দিবি পায় ১৯১ সহসা ডালপালা তোর

ওপরের তালিকাভুক্ত গানগুলির রচনাকাল ১৯০৯ থেকে ১৯২২-এর মধ্যে, যখন দিনেন্দ্রনাথ শান্তিনিকেতনে ছিলেন।

নাটকের গান নির্বাচনের ক্ষেত্রেও দিনেন্দ্রনাথ বেছে নিয়েছেন মূলত সেই নাটকগুলি যেগুলি রবীন্দ্রনাথ রচনা করেছিলেন দিনেন্দ্রনাথের শান্তিনিকেতন অবস্থানকালে। এই নাটকগুলির মধ্যে আছে 'অচলায়তন' (১৯১১), 'ফাল্গুনী' (১৯১৫), 'অরূপরতন' (১৯১৯), 'ঋণশোধ' (১৯২১) ও 'বসন্ত' (১৯২৩)। দিনেন্দ্রনাথের গৃহীত গানগুলি হল ঃ

অচলায়তন (মোট গান ২৪)

২৪ আমরা চাষ করি আনন্দে ৪৫ আলো আমার আলো ওগো ৪৯ উতলধারা বাদল ঝরে ৫০ এ পথ গেছে কোনখানে গো ৭৪ কঠিন লোহা কঠিন ঘুমে ৮৬ ঘরেতে ভ্রমর এল ১৫৩ বুঝি এল, বুঝি এল ওরে প্রাণ ১৭৬ যিনি সকল কাজের কাজী ১৮৮ সব কাজে হাত লাগাই মোরা ১৯৬ হা রে রে রে রে

ফাল্গুনী (মোট গান ৩০)

৫ আকাশ আমায় ভরল আলোয় ২৩ আমরা নূতন প্রাণের চর ৪০ আমাদের ক্ষেপিয়ে বেড়ায় যে ৪১ আমাদের ভয় কাহারে ৪৮ আয় রে তবে মাতরে সবে ৫৯ এতদিন যে বসেছিলেম ৬৭ ওগো দখিন হাওয়া ৭১ ওরে ভাই ফাগুন লেগেছে ৮৭ চলি গো, চলি গো, যাই গো ১৬৭ মোদের যেমন খেলা ১৭৫ যা ছিল কালো ধলো

অরূপরতন (মোট গান ২৪)

২৬ আমরা সবাই রাজা ৭৬ কোথা বাইরে দূরে যায়রে ১৫৭ মম চিত্তে নিতি নৃত্যে ১৬৪ মোর বীণা ওঠে কোন সুরে

ঋণশোধ (মোট গান ১৪)

১০ আজ ধানের ক্ষেতে রৌদ্রছায়ায় ৩২ আমার নয়ন ভুলানো এলে ১৬২ মেঘের কোলে রোদ হেসেছে

বসন্ত (মোট গান ২৪)

১২ আজ খেলা ভাঙার খেলা ৬৫ ও আমার চাঁদের আলো ৮১ গানগুলি মোর শৈবালেরি দল ১১৫ তোমার বাস কোথা যে পথিক ১৮৯ সব দিবি কে, সব দিবি পায় ১৯১ সহসা ডালপালা তোর

'ফাল্গুনী' নাটকটি রবীন্দ্রনাথ দিনেন্দ্রনাথকে উৎসর্গ করেছিলেন। উৎসর্গে লেখেন ঃ

"যাহারা ফাল্গুনীর ফল্গুনদীটিকে বৃদ্ধ কবির চিত্তমরুর তলদেশ হইতে উপরে টানিয়া আনিয়াছে তাহাদের এবং সেই সঙ্গে বালকদের সকল নাট্যের কাণ্ডারী আমার সকল গানের ভাণ্ডারী শ্রীমান দিনেন্দ্রনাথের হস্তে এই নাট্যকাব্যটিকে কবি-বাউলের একতারার মতো সমর্পণ করিলাম"। রবীন্দ্রনাথ এখানে নিজেকে কবি-বাউল হিসাবে চিহ্নিত করেছেন, 'ফাল্গুনী'-র ২৪টির মধ্যে ১৪টি গানই বাউলাঙ্গিক।

বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের (১৯০৫) প্রেক্ষিতে রবীন্দ্রনাথ যে দেশাত্মবোধক গানগুলি লিখেছিলেন স্বাভাবিকভাবেই সে গানগুলির একটি বিশেষ স্থান আছে। সে বছরই দেশাত্মবোধক গানের দুটি সংকলন প্রকাশিত হয় 'স্বদেশ' ও 'বাউল' গীত-সংকলন দুটিতে। দিনেন্দ্রনাথ '৯০ জনগণমন অধিনায়ক'সহ ৮টি গান তাঁর সম্পাদনায় বেছে নিয়েছেন। অন্য ৭টি হল ঃ

২৬ আমরা সবাই রাজা ৩৯ আমাদের যাত্রা হল শুরু ৪৪ আমি ভয় করব না ৬৬ ও আমার দেশের মাটি ১২৫ দেশ দেশ নন্দিত করি ১৭১ যদি তোর ডাক শুনে ১৭২ যদি তোর ভাবনা থাকে

পূর্বোক্ত গানগুলির মধ্যে '৯০ জনগণমন অধিনায়ক', '১২৫ দেশ দেশ নন্দিত করি' ও '২৬ আমরা সবাই রাজা' ছাড়া অন্য গানগুলি তিনি বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের প্রেক্ষাপটে লিখেছিলেন। তবে উল্লেখযোগ্যভাবে বাদ পড়েছে তিনটি গান, যে তিনটি 'রাখী সঙ্গীত' হিসাবে সুপরিচিত। বঙ্গভঙ্গ রদ হবার পরে রবীন্দ্রনাথ বাঙালিদের মিলনমেলায় রাখীবন্ধনের দিনে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেছিলেন। গান তিনটি হল ঃ ওদের বাঁধন যতই শক্ত হবে/বাংলার মাটি বাংলার জল/ বিধির বাঁধন কাটবে তুমি।

১৩১৭ (১৯১০) থেকে ১৩২১ (১৯১৪) সময়কালে প্রকাশিত হয়েছিল তিনটি কাব্যগ্রন্থ—'গীতাঞ্জলি' (১৩১৭), 'গীতিমাল্য' (১৩২১) ও 'গীতালি' (১৩২১)। কাব্যগ্রন্থ বলা হলেও নীচের তালিকাটি থেকে দেখা যাবে যে এ তিনটি কাব্যগ্রন্থের অধিকাংশ কবিতাই গীতরূপ পেয়েছে।

	মোট কবিতার সংখ্যা	গীতরূপ সংখ্যা
গীতাঞ্জলি	১৫৭	৮৯
গীতিমাল্য	১১১	৯২
গীতালি	১১৯	৭৭
গীতাঞ্জলি, গীতিমাল্য ও গীতালি সংযোজন	১০	৫

এ তালিকাটি দেখলে কাব্যগ্রন্থ তিনটিকে গীতগ্রন্থ হিসাবে পরিচয় দিলেও অত্যুক্তি হবে না। যে সময়ে লেখা তা রবীন্দ্রনাথ-দিনেন্দ্রনাথের যুগলবন্দির সময়। 'গীতালি'-র অনেকগুলি গান রবীন্দ্রনাথ লেখেন শান্তিনিকেতন থেকে আড়াই মাইল দূরে সুরুল গ্রামে বসে। সেখানে পুত্র-পুত্রবধূ রথীন্দ্রনাথ-প্রতিমা অস্থায়ী আস্তানা গেড়েছিলেন, রথীন্দ্রনাথের কৃষি-প্রকল্পের উদ্দেশ্যে। দিনেন্দ্রনাথ তখন থাকেন শান্তিনিকেতনের 'বেণুকুঞ্জে'। রবীন্দ্রনাথ গানগুলি লেখেন আর প্রতিদিন গরুর গাড়ি চড়ে ভাঙা মেঠো পথ অতিক্রম করে দিনেন্দ্রনাথের কাছে আসেন। তাঁকে গানগুলি শিখিয়ে তবে রবীন্দ্রনাথ নিশ্চিন্ত হন। এর বিবরণ লিখেছেন প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় তাঁর 'রবীন্দ্রজীবনী'-র দ্বিতীয় খণ্ডে। উৎসুক পাঠক বিবরণটি অনুধাবন করতে পারেন।

এই তিনটি কাব্যের এ গানগুলি দিনেন্দ্রনাথ তাঁর 'গীতিচর্চা'য় অন্তর্ভুক্ত করেছেন ঃ

গীতাঞ্জলি ১ অন্তর মম বিকশিত কর ৮ আজ বারি ঝরে ঝর ঝর ২০ আনন্দেরি সাগর হতে ২৮ আমার মাথা নত করে দাও ৩২ আমার নয়নভুলানো এলে ৪২ আমি বহু বাসনায় ৪৬ আলোয় আলোকময় করে হে ৫২ এই করেছ ভালো নিঠুর হে ৬৩ এস হে এস সজল ঘন ৭৯ কোন আলোতে প্রাণের প্রদীপ ৮৫ গায়ে আমার পুলক লাগে ৮৯ জগৎ জুড়ে উদাস সুরে ৯৫ জানি জানি কোন আদিকাল হতে ৯৭ তব সিংহাসনের আসন হতে ৯৯ তাই তোমার আনন্দে ১০১ তুমি

নব নব রূপে এস প্রাণে ১৩১ নিশার স্বপন ছুটল ১৫০ বিপদে মোরে রক্ষা কর ১৫২ বিশ্বসাথে যোগে যেথায় ১৬১ মেঘের পরে মেঘ জমেছে ১৮১ শরতে আজ কোন অতিথি ১৯৪ সীমার মাঝে অসীম তুমি

গীতিমাল্য ৯ আজ প্রথম ফুলের ২২ আপনাকে এই জানা ৩৪ আমার মুখের কথা ৫৩ এই তো তোমার আলোকধেনু ৬৯ ওদের সাথে মেলাও ৮৪ গাব তোমার সুরে ১১৭ তোমারি নাম বলব ১২৭ নয় এ মধুর খেলা ১২৯ নৃত্য তোমার যে ফুল ফোটে ফুলবনে ১৪০ প্রাণ ভরিয়ে তৃষা হরিয়ে ১৪৫ বসন্তে আজ ধরার চিত্ত ১৬৩ মোর সন্ধ্যায় তুমি সুন্দর বেশে

গীতালি ৬ আগুনের পরশমণি ছোঁয়াও প্রাণে ১৪ আজি নির্ভয় নিদ্রিত ভুবনে ২১ আপন হতে বাহির হয়ে ২৯ আমার সকল রসের ধারা ৫৪ এই যে কালো মাটির বাসা ৫৭ এক হাতে ওর কৃপাণ আছে ৮০ ক্লান্তি আমার ক্ষমা করো প্রভু ৯৪ জাগ নির্মল নেত্রে ১১১ তোমার এই মাধুরী ছাপিয়ে ১৮০ শরৎ তোমার অরুণ আলোর

'স্বরবিতান' স্বরলিপি-সংগ্রহ থেকে দেখা গেছে যে 'গীতিচর্চা'-য় রবীন্দ্রনাথের মোট ১৯৩টি গানের মধ্যে দিনেন্দ্রনাথ স্বরলিপিকার ছিলেন ৯৮টি গানের। '৩৩ আমার ঘুর লেগেছে' গানটি এখনও 'স্বরবিতানে' স্থান পায়নি, যদিও এর সুরের সন্ধান আছে।

পরিশেষ

কাঙ্গালীচরণ সেন দ্বারা স্বরলিপি-কৃত রবীন্দ্রনাথের জীবনের প্রথমার্ধের ৪২টি ব্রহ্মসঙ্গীত স্থান পেলেও দিনেন্দ্রনাথ তাঁর সম্পাদনায় মূলত সেই গানগুলিকে স্থান দিয়েছেন যেগুলি তাঁর শান্তিনিকেতন বাসকালে ১৯০৮ থেকে ১৯২৪ সময়কালে রচিত। এর মধ্যে অধিকাংশ গানই দিনেন্দ্রনাথের স্বরলিপি-ধৃত। এর থেকে মনে হয় রবীন্দ্রনাথ ও দিনেন্দ্রনাথের যৌথ প্রচেষ্টার যথার্থ পরিচয় রেখে যেতে চেয়েছিলেন দিনেন্দ্রনাথ তাঁদের শান্তিনিকেতনের ছাত্র ছাত্রী ও শিক্ষার্থীদের মাধ্যমে।

পাঠককে এখানে স্মরণ করিয়ে দেওয়া প্রয়োজন যে 'গীতিচর্চা' নামেই তিন খণ্ডে রবীন্দ্রনাথের গানের স্বরলিপি সংগ্রহ প্রকাশিত হয়েছিল ১৩৬৮, ১৩৭৩ ও ১৩৮৫ বঙ্গাব্দে। এ স্বরলিপি সংগ্রহের উল্লেখ আছে 'গীতবিতানে'র স্বরলিপি পঞ্জি তালিকায়। আর দিনেন্দ্রনাথ সম্পাদিত 'গীতিচর্চা' উল্লিখিত হয়েছে 'জ্ঞাতব্যপঞ্জী' রবীন্দ্রনাথের গানের সংকলন তালিকায়। কোনও ব্যাখ্যা ছাড়াই ভিন্ন উদ্যোগে প্রকাশিত দুটি গ্রন্থের একই শীর্ষক পাঠককে বিভ্রান্ত করে (দ্রষ্টব্য অখণ্ড 'গীতবিতান', ১৩৮০ সংস্করণ)।

পরিশিষ্ট ঃ 'গীতিচর্চা'র গানের তালিকা

('গীতিচর্চা' অনুসারে সূচনা পাঠ এবং সূচনা পাঠান্তে পৃষ্ঠাঙ্ক)

১ অন্তর মম বিকশিত কর ২। ২ অন্ধজনে দেহ আলো ২। ৩ অল্প লইয়া থাকি তাই ৫৭। ৪ আকাশ জুড়ে শুনিনু ঐ বাজে ৭৬। ৫ আকাশ আমায় ভরল আলোয় ১০৯। ৬ আগুনের পরশমণি ছোঁয়াও প্রাণে ৫২। ৭ আছে দুঃখ আছে মৃত্যু ৩। ৮ আজ বারি ঝর ঝর ৮৬। ৯ আজ প্রথম ফুলের ৯০। ১০ আজ ধানের ক্ষেতে রৌদ্রছায়ায় ৯৩। ১১ আজ সবার রঙে ১৬। ১২ আজ খেলা-ভাঙার খেলা ১৪১। ১৩ আজি প্রণমি তোমারে চলিব নাথ ৩। ১৪ আজি নির্ভয় নিদ্রিত ভুবনে ৫৮। ১৫ আজি যত তারা তব আকাশে ৫৮। ১৬ আজি বহিছে বসন্ত পবন ৭৬। ১৭ আজি শ্রাবণ ঘন ৮৬। ১৮ আনন্দ তুমি স্বামী ৪। ১৯ আনন্দ-লোকে মঙ্গলালোকে বিরাজ ৫৯। ২০ আনন্দেরি সাগর হতে ৯৪। ২১ আপন হতে বাহির হয়ে ২৪। ২২ আপনাকে এই জানা ২২। ২৩ আমরা নূতন প্রাণের চর ১০৭। ২৪ আমরা চাষ করি আনন্দে ১২৭। ২৫ আমরা তারেই জানি ১২৯। ২৬ আমরা সবাই রাজা ১৩৪। ২৭ আমার যে সব দিতে হবে ২৩। ২৮ আমার মাথা নত করে দাও ৩২। ২৯ আমার সকল রসের ধারা ৫১। ৩০ আমার এ ঘরে আপনার করে ৬০। ৩১ আমার নিশীথ রাতের বাদলধারা ৮০। ৩২ আমার নয়ন ভুলানো এলে ৯৫। ৩৩ আমার ঘুর লেগেছে ১৩১। ৩৪ আমার মুখের কথা ১৫৬। ৩৫ আমায় বাঁধবে যদি কাজের ডোরে ১৪৫। ৩৬ আমারে ডাক দিল কে ৯৭। ৩৭ আমারে দিই তোমার হাতে ১৫৭। ৩৮ আমাদের শান্তিনিকেতন ১। ৩৯ আমাদের যাত্রা হল সুরু ২৬। ৪০ আমাদের ক্ষেপিয়ে বেড়ায় যে ১৫৯। ৪১ আমাদের ভয় কাহারে ১৩৩। ৪২ আমি বহু বাসনায় ৩৩। ৪৩ আমি পথ ভোলা এক ১০১। ৪৪ আমি ভয় করব না ১২০। ৪৫ আলো আমার আলো ওগো ১৩০। ৪৬ আলোয় আলোকময় করে হে ৪। ৪৭ আসনতলের মাটির পরে ৩৭। ৪৮ আয়রে তবে মাতরে সবে ১১০। ৪৯ উতল ধারা বাদল ঝরে ৮৯। ৫০ এ দিন আজি কোন ঘরে গো ২৫। ৫১ এ পথ গেছে কোনখানে গো ১২৬। ৫২ এই করেছ ভালো, নিঠুর ৪১। ৫৩ এই তো তোমার আলোক ধেনু ৫০। ৫৪ এই যে কালো মাটির বাসা ৫৪। ৫৫ এই যে তোমার প্রেম ওগো ৫। ৫৬ এই শ্রাবণের বুকের ভিতর ৫৩। ৫৭ এক হাতে ওর কৃপাণ আছে ১৪৫। ৫৮ এত আলো জ্বালিয়েছ ৬। ৫৯ এতদিন যে বসেছিলেম ১০৮। ৬০ এনেছ ঐ শিরীষ বকুল ১১৫। ৬১ এল যে শীতের বেলা ৯৮। ৬২ এস আশ্রম দেবতা ৭। ৬৩ এস হে এস সজল ঘন ৭৮। ৬৪ ঐ পোহাইল তিমির রাতি ৭। ৬৫ ও আমার চাঁদের আলো ১১২। ৬৬ ও আমার দেশের মাটি ১২৩। ৬৭ ওগো দখিন হাওয়া ১০৫। ৬৮ ওঠ ওঠ রে—বিফলে প্রভাত ২৭। ৬৯ ওদের সাথে মেলাও ৪৯। ৭০ ওরে আগুন আমার ভাই ১৪৭। ৭১ ওরে ভাই ফাগুন লেগেছে ১০৬। ৭২ কবে আমি বাহির হলেম ৪০। ৭৩ কর তাঁর নাম গান ১৫৫। ৭৪ কঠিন লোহা কঠিন ঘুমে ১২৭। ৭৫ কান্নাহাসির দোল দোলানো ১৪২। ৭৬ কোথা বাইরে দূরে যায় রে ১১১। ৭৭ কোন শুভখনে উদিবে নয়নে ৬০। ৭৮

কোন ক্ষ্যাপা শ্রাবণ ছুটে এল ৮০। ৭৯ কোন আলোতে প্রাণের প্রদীপ ১৫৪। ৮০ ক্লান্তি আমার ক্ষমা করো প্রভু ১৫৪। ৮১ গানগুলি মোর শৈবালেরি দল ১৪১। ৮২ গানের সুরের আসনখানি ৭৯। ৮৩ গানের ভিতর দিয়ে যখন ১৪৬। ৮৪ গাব তোমার সুরে ৮। ৮৫ গায়ে আমার পুলক লাগে ৪৩। ৮৬ ঘরেতে ভ্রমর এল ১২৯। ৮৭ চলি গো, চলি গো, যাই গো ১৩৩। ৮৮ চিরবন্ধু, চিরনির্ভর ৯। ৮৯ জগৎ জুড়ে উদাস সুরে ৩৫। ৯০ জনগণমন অধিনায়ক জয় হে ১১৭। ৯১ জয় তব বিচিত্র আনন্দ ১০। ৯২ জাগ জাগ রে জাগ ৬১। ৯৩ জাগ সকল অমৃতের অধিকারী ১৫৭। ৯৪ জাগ নির্মল নেত্রে ৬২। ৯৫ জানি জানি কোন আদিকাল হতে ৩৬। ৯৬ তব অমল পরশরস ১০। ৯৭ তব সিংহাসনের আসন হতে ৩৮। ৯৮ তমীশ্বরাণাং পরমং মহেশ্বরং ১৫৮। ৯৯ তাই তোমার আনন্দ ৪৪। ১০০ তিমির দুয়ার খোলো ১১। ১০১ তুমি নব নব রূপে এস প্রাণে ১১। ১০২ তুমি আমাদের পিতা ২৭। ১০৩ তুমি বন্ধু, তুমি নাথ ২৮। ১০৪ তুমি কেমন করে গান কর ৩৬। ১০৫ তুমি এবার আমায় লহ ৩৯। ১০৬ তুমি কোন পথে যে এলে ১০৩। ১০৭ তুমি যে চেয়ে আছ ৪৮। ১০৮ তুমি যে সুরের আগুন ১৪৪। ১০৯ তোরা যে যা বলিস ভাই ১৩৫। ১১০ তোমার পতাকা যারে দাও ২৯। ১১১ তোমার এই মাধুরী ছাপিয়ে ৫৫। ১১২ তোমার অসীমে প্রাণ মন লয়ে ৬৩। ১১৩ তোমার কাছে শান্তি চাব না ৭৫। ১১৪ তোমার মোহন রূপে ৯১। ১১৫ তোমার বাস কোথা যে পথিক ১১৪। ১১৬ তোমারি ইচ্ছা হউক পূর্ণ ১৩। ১১৭ তোমারি নাম বলব নানা ছলে ৪৫। ১১৮ তোমারি নামে নয়ন মেলিনু ১২। ১১৯ তোমারি গৃহে পালিছ স্নেহে ৬৪। ১২০ তোমারি রাগিণী জীবনকুঞ্জে ৬৫। ১২১ (তাঁহারে) আরতি করে ১০। ১২২ দারুণ অগ্নিবাণে রে ৭৭। ১২৩ দাঁড়াও আমার আঁখির আগে ৬৫। ১২৪ দুয়ারে দাও মোরে রাখিয়া ৬৬। ১২৫ দেশ দেশ নন্দিত করি ১১৫। ১২৬ নমি নমি চরণে ৩০। ১২৭ নয় এ মধুর খেলা ৪৬। ১২৮ নয়ন তোমারে পায় না দেখিতে ১৩। ১২৯ নিত্য তোমার যে ফুল ফোটে ৪৭। ১৩০ নিবিড় অন্তরতর বসন্ত ৭৭। ১৩১ নিশার স্বপন ছুটল ১৪। ১৩২ নিশিদিন মোর পরাণে ১৫। ১৩৩ নিশিদিন ভরসা রাখিস ১১৯। ১৩৪ পান্থ এখন কেন অলসিত অঙ্গ ১৬। ১৩৫ পাদপ্রান্তে রাখ সেবকে ৬৭। ১৩৬ পুণ্য-পুঞ্জেন যদি প্রেমধনং ১৫৯। ১৩৭ পূব সাগরের পার হতে ৮৫। ১৩৮ প্রভু তোমা লাগি আঁখি জাগে ৬৯। ১৩৯ প্রতিদিন তব গাথা ৬৮। ১৪০ প্রাণ ভরিয়ে তৃষা হরিয়ে ৪৫। ১৪১ প্রেমানন্দে রাখ পূর্ণ ৭০। ১৪২ ফাগুন হাওয়ায় রঙে রঙে ১১০। ১৪৩ বল দাও মোরে বল দাও ২২। ১৪৪ বহে নিরন্তর অনন্ত আনন্দধারা ৭০। ১৪৫ বসন্তে আজ ধরার চিত্ত হল ১০০। ১৪৬ বাজে বাজে রম্য বীণা ৭১। ১৪৭ বাদল মেঘে মাদল বাজে ৮১। ১৪৮ বাদল বাউল বাজায় রে একতারা ৮৩। ১৪৯ বাদল ধারা হল সারা ৮৪। ১৫০ বিপদে মোরে রক্ষা করো ৩৪। ১৫১ বিমল প্রভাতে মিলি এক সাথে ১৬। ১৫২ বিশ্বসাথে যোগে যেথায় ১৬। ১৫৩ বুঝি এল, বুঝি এল, ওরে প্রাণ ৮৭। ১৫৪ মধুর মধুর ধ্বনি বাজে ১২৫। ১৫৫ মন জাগো মঙ্গল লোকে ১৮। ১৫৬ মনোমোহন, গহন যামিনী শেষে ১৭। ১৫৭ মম চিত্তে নিতি নৃত্যে ১৩৮। ১৫৮ মহারাজ, এ কি সাজে এলে ৭২। ১৫৯ মাধবী হঠাৎ কোথা হতে ১০৪। ১৬০ মেঘের কোলে কোলে যায় রে ৮২। ১৬১ মেঘের পরে মেঘ জমেছে ৮৭। ১৬২ মেঘের কোলে রোদ হেসেছে ৯২। ১৬৩ মোর সন্ধ্যায় তুমি সুন্দর বেশে এসেছ ৫০। ১৬৪ মোর বীণা ওঠে কোন সুরে বাজি ১৪৩। ১৬৫ মোরে ডাকি লয়ে যাও ২১। ১৬৬ মোরা সত্যের পরে মন ১৫০। ১৬৭ মোদের যেমন খেলা ১৩২। ১৬৮ মোদের কিছু নাই রে নাই ১৩৬। ১৬৯ যা আত্মদা বলদা যস্য ১৪৯। ১৭০ যদি এ আমার হৃদয় দুয়ার ১৮। ১৭১ যদি তোর ডাক শুনে ১২০। ১৭২ যদি তোর ভাবনা থাকে ১২২। ১৭৩ যদি ঝড়ের মেঘের মত ১৪৮। ১৭৪ যদেমি প্রস্ফুরন্নিব ১৪৮। ১৭৫ যা ছিল কালো ধলো ১৩৮। ১৭৬ যিনি সকল কাজের কাজী ১৩১। ১৭৭ যে কেহ মোরে দিয়েছ সুখ ৭২। ১৭৮ রহি রহি আনন্দ তরঙ্গ জাগে ১৯। ১৭৯ রিম ঝিম ঘন ঘন রে বরষে ৮৬। ১৮০ শরৎ তোমার অরুণ আলোর ৯২। ১৮১ শরতে আজ কোন অতিথি ৮৯। ১৮২ শান্ত হ রে মম চিত্ত নিরাকুল ৭৩। ১৮৩ শান্তি কর বরিষণ ৭৪। ১৮৪ শিউলি ফোটা ফুরালো যেই ৯৯। ১৮৫ শীতের হাওয়ায় লাগল নাচন ৯৯। ১৮৬ শুনেছে তোমার নাম ৩১। ১৮৭ শ্রাবণের ধারার মত ৪৮। ১৮৮ সব কাজে হাত লাগাই মোরা ১২৮। ১৮৯ সব দিবি কে সব দিবি পায় ১৪০। ১৯০ সবার মাঝারে তোমারে স্বীকার ১৫৩। ১৯১ সহসা ডালপালা তোর ১১৩। ১৯২ সংসার যবে মন কেড়ে লয় ২০। ১৯৩ সারা জীবন দিল আলো ৫৬। ১৯৪ সীমার মাঝে অসীম তুমি ৪২। ১৯৫ সুন্দর হৃদিরঞ্জন তুমি ১২৬। ১৯৬ হা রে রে রে রে ৮৮। ১৯৭ হে সখা মম হৃদয়ে রহ ৭৫। ১৯৮ হে দে গো নন্দরাণী ১২৪। ১৯৯ হেমন্তে কোন বসন্তেরি বাণী ৯৭। ২০০ হেরি তব বিমল মুখ ভাতি ১৯।

[বানান-বিধি পরিবর্তন ও অন্যান্য কারণে 'গীতিচর্চা'র সূচনা পাঠের সঙ্গে 'গীতবিতান'-এর সূচনা পাঠে অনেক ক্ষেত্রেই পার্থক্য আছে।]

গ্রন্থ তালিকা

বিশ্বভারতী/রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর	মন্ত্র, কবিতা, গান, ১৩৯৭। স্বরবিতান, ১-৬৪ খণ্ড, ১৩২৫-১৪১০।
প্রবীর গুহঠাকুরতা	রবীন্দ্রসঙ্গীত মহাকোষ, ১ম ও ২য় ভাগ (প্রকাশিতব্য)।
প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়	রবীন্দ্রজীবনী ২য়, ১৩৯৭। গীতবিতান কালানুক্রমিক সূচী, ১৪১০।
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর	গীতবিতান, অখণ্ড, ১৩৮০।

হুমায়ুন কবিরের রবীন্দ্রচর্চা

শঙ্খ ঘোষ

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : হুমায়ুন কবির। অনুবাদ-ভূমিকা-টীকা : হায়াৎ মামুদ। একুশে পাবলিকেশনস, ঢাকা, ২০০০।
দাম : ১০০.০০।

স্বাধীনতার আগে, আমাদের কৈশোরের শেষ পর্বে, হুমায়ুন কবিরকে আমরা জেনেছিলাম কবি হিসেবে। আমাদের পড়তে হত তাঁর 'আকবর' নামের কবিতাটি, রবীন্দ্রনাথের 'শিবাজী-উৎসব'-এর সঙ্গে মিলিয়েই সেটা পড়াতেন মাস্টারমশাই, বুঝিয়ে দিতেন এই কবির মনের ওপর কতটাই ছড়ানো ছিল রবীন্দ্রনাথের প্রভাব। অবশ্য, শুধু শব্দ-ছন্দ-স্তবকগত প্রভাবটাই নয়, সে-বয়সেও খানিকটা আন্দাজ হত কীভাবে প্রচ্ছন্ন একটা সংলাপও কাজ করছিল সেখানে, কীভাবে শিবাজীর ভারতকল্পনার মুখোমুখি সাজিয়ে ধরা হয়েছিল আকবরের ভারতকল্পনাকে।

কিন্তু তার অল্প পর থেকেই হুমায়ুন কবিরের প্রধান পরিচয় হিসেবে আমাদের কাছে পৌঁছতে লাগল তাঁর রাজনৈতিক কাজকর্মের খবর। চল্লিশের দশক থেকে জীবনের শেষ মুহূর্ত (১৮ অগস্ট ১৯৬৯) পর্যন্ত রাজনীতির এতটাই বিস্তৃত চর্চায় নিজেকে তিনি ব্যস্ত রেখেছিলেন যে বাইরের লোকের চোখে সেটাই হয়ে উঠল তাঁর বড় ভূমিকা, তাঁর কবিপরিচয় প্রায় থমকেই গেল বলা যায়। 'চতুরঙ্গ' পত্রিকার প্রতিষ্ঠা আর তার ধারাবাহিক বিকাশ সত্ত্বেও, সে-পত্রিকার সম্পাদনাসূত্রে সাহিত্যজগতের সঙ্গে পরোক্ষ একটা যোগ সত্ত্বেও, অল্পে অল্পে তাঁর নিজস্ব সাহিত্যকাজ হয়ে এল গৌণ। লেখাতেও তাঁর ভাবনার কেন্দ্রে তখন চলে এল গণতন্ত্র-সমাজতন্ত্রর কথা, সম্ভাব্য নূতন ভারতবর্ষে শিক্ষার সমাজের বা সংখ্যালঘুর সমস্যার কথা।

তবু, এমনকী সেইসব সময়েও, একটা মূল প্রসঙ্গকে কখনওই ভোলেননি তিনি, সে প্রসঙ্গ রবীন্দ্রনাথ। বিশ্বভারতী থেকে 'ইতিহাস'-এর মতো কোনও রবীন্দ্ররচনা সংকলিত হলে তার আলোচনাতেও এগিয়ে আসেন তিনি ১৯৫৬ সালেও, তাঁর রাজনৈতিক ব্যস্ততার মধ্যেও, যেমন এক সময়ে নিয়মিতভাবেই রবীন্দ্ররচনাবলীর সদ্য প্রকাশিত খণ্ডগুলির কথা বলে গেছেন তিনি 'চতুরঙ্গ'র এক-একটি সংখ্যায়। আর তাই, এটা অপ্রত্যাশিত নয় যে রবীন্দ্রজন্মশতবর্ষে রচনা আলোচনা-সভা-সমিতির বিস্তর আয়োজনের মধ্যে তাঁর থাকবে অনেকখানি ভূমিকা।

সে-ভূমিকার বিশেষ একটা লক্ষ্যও ছিল বলে মনে হয়। 'চতুরঙ্গ'-র লেখাগুলিতে তাঁর উদ্দিষ্ট তো বাংলার পাঠকসমাজ। কিন্তু জন্মশতবর্ষে যেসব কাজের ভার তিনি নিলেন, তার সামনে এসে দাঁড়ালেন সেইসব পাঠক যাঁরা বাংলা জানেন না। ভারত এবং ভারতের বাইরে, রবীন্দ্রনাথের পরিচয় অনেকটা ঝাপসা হয়ে আসছে বলে ভাবছিলেন অনেকেই, এবং এর একটা কারণ হিসেবে ভাবা হচ্ছিল রবীন্দ্রনাথের লেখা থেকে অপুষ্ট অপূর্ণ অপরিকল্পিত অনুবাদ। তাঁর চিন্তাজগতের আর সৃষ্টিজগতের অনেকটাই যে অজানা থেকে গেছে বাইরের পৃথিবীতে, সেই অভাববোধ থেকে এ-সময়টায় এগিয়ে এলেন যাঁরা, তার মধ্যে হুমায়ুন কবির একজন। দু-দুটো বইয়ের সংকলন আর সম্পাদনার দায়িত্ব নিলেন তিনি : *Towards Universal Man* (১৯৬১), আর তার পাঁচ বছর পর *101 Poems of Rabindranath Tagore* (১৯৬৬), দুটি বইতেই রইল তাঁর দীর্ঘ দুই ভূমিকা। লন্ডনের স্কুল অব ওরিয়েন্টাল অ্যান্ড আফ্রিকান স্টাডিজ-এর আয়োজনে Tagore as a Humanist এবং Tagore and Modern India নামে দুটি ভাষণ দিলেন তিনি ১৯৫১ সালের জুন মাসে, Social and Political Ideas of Tagore নামে প্রবন্ধ লিখলেন ওই বছরেই নভেম্বরে প্রকাশিত সাহিত্য অকাদেমির সেন্টিনারি ভল্যুমে। এসব লেখা বা বক্তৃতার অংশবিশেষ ব্যবহার করে এবং সেইসঙ্গে নূতন দু-একটি লেখা জুড়ে দিয়ে ১৯৬২ সালেই *Rabindranath Tagore* নামে যে একটি বইও বেরিয়েছিল তাঁর (সে-বইয়ের লেখা থেকেই আবার তৈরি হয়েছিল *101 Poems of Rabindranath Tagore*-এর অবতরণিকা) অনেকেরই কাছে অবশ্য অজানা থেকে গিয়েছিল সেটা। বছর কয়েক আগে (২০০০) সে-বইয়ের ছিমছাম একটি অনুবাদ করেছেন হায়াৎ মামুদ, ছোট একটি ভূমিকা আর বেশ কিছু টীকাটিপ্পনীর সংযোজন করেছেন তিনি, ক্ষীণকায় সেই বইটি পৌঁছে দিয়েছেন পাঠকসমাজে। তাঁর কাছে আমরা কৃতজ্ঞ।

এই লেখাগুলির একটা লক্ষ্য, আগেই বলেছি, অবাঙালি পাঠকের মনের দিকে রবীন্দ্রজগৎকে পৌঁছে দেওয়া। সেইসঙ্গে আরও একটা নিহিত লক্ষ্যের কথা কখনও কখনও মনে হতে পারে। হুমায়ুন কবির তখন গোটা দেশের শাসনব্যবস্থার সঙ্গে জড়িত। সরকারি পরিকল্পনা আর রূপায়ণের অনেকটা সমীপতায় তাঁর অবস্থান। সেই অবস্থার থেকে তিনি হয়তো এটাও দেখাতে চান যে দেশের নূতন কর্মকল্পনা চলছে রবীন্দ্রনাথেরই ভাবনার অনুসরণে, তাঁরই মনোমতো। আধুনিক ভারত আর রবীন্দ্রনাথের একটা সংযোগ তিনি এইভাবে তৈরি করে দেখাতে চান।

ভারতবর্ষের মূল সমস্যা যে পল্লীর পুনর্গঠন, গ্রামাঞ্চলে সমবায়-ব্যবস্থা আর আধুনিক উপকরণ-পদ্ধতির প্রচলন, এ বিষয়ে রবীন্দ্রনাথের বক্তব্যের পরিচয় দিয়ে হুমায়ুন কবির বলতে পারেন : 'সাধারণ যে-কোনও পাঠক দেখে চমকে উঠবেন যে স্বাধীন ভারতে গৃহীত অর্থনৈতিক পরিকল্পনা তো এগুলোই।' এ তো কেবল সাদৃশ্যের কথা, ভাবনাগত সামীপ্যের কথা। কিন্তু সাদৃশ্য বা সামীপ্যই শুধু নয়, তারও চেয়ে একটু বেশি বলতে চান তিনি। বলতে চান : 'দেশের ভবিষ্যৎ অর্থনৈতিক বিকাশের নক্সা তৈরিতে ভারতীয় চিন্তাকে রূপদানের ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথের ভূমিকা এমনকি ভারতবর্ষেও বেশি লোক উপলব্ধি করতে পারেন নি।' সমকালীন ভারতের ধনবণ্টনের ছাঁচটিও রবীন্দ্রনাথকে মনে করিয়ে দেয় বা স্বাধীন ভারত কাউকে দখলচ্যুত করেনি আর তার ফলে যাদের সুযোগসুবিধে খর্ব হয়েছিল তাদেরও আনুগত্য পাওয়া গিয়েছে, এসব জানাবার পর একটু জোর দিয়েই হুমায়ুন কবির লেখেন : 'এক্ষেত্রে ভারত রবীন্দ্রনাথের উপদেশই অনুসরণ করেছে যে "property is a medium for the expression of our personality"।' ভারতের অর্থনৈতিক বিকাশের ওপর 'রবীন্দ্রভাবনার অভিঘাত' বা কমিউনিটি ডেভেলপমেন্ট প্রোগ্রাম 'রবীন্দ্রনাথের অভিজ্ঞতা ও পরীক্ষানিরীক্ষা থেকে উদ্ভূত', সমবায়ের ওপর গুরুত্বারোপ 'সরাসরি তাঁর বাণী থেকে উৎসারিত', সমাজের ধনবণ্টন বিষয়ে ভারত 'রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টিভঙ্গি মান্য করেছে', 'আধুনিক ভারতের রাজনৈতিক চেতনায় রবীন্দ্র-আদর্শেরই অভিঘাত নানা দিকে প্রত্যক্ষ করা সম্ভব' —এসব কথার উচ্চারণে শুধু যে রবীন্দ্রনাথের পরিচয়ই বলা থাকে তা নয়, সরকারি ব্যবস্থাকেও একটা মান্যতা দেবার আয়োজন থাকে। আমরা মনে রাখতে পারি যে এই একই সময়ে অর্থনীতিবিদ ভবতোষ দত্ত বলছিলেন ('আর্থিক উন্নতি ও রবীন্দ্রনাথ') : 'যদি সরকারী নির্দেশে এবং সরকারী ব্যবস্থাপনায় এইসব পন্থা [কম্যুনিটি প্রজেক্ট ও সমবেত চাষ] অবলম্বন এবং পরিচালন করতে হয়, তাহলে মূলনীতির অনেকখানিই ত্যাগ করতে হবে...ব্যয়াধিক্যই বড় সমস্যা হয়ে দাঁড়াবে' বা 'সবটাই বা অনেকটাই যদি চাষীদের হাতে ছেড়ে দেওয়া হয় তাহলে হয়তো কাজই আরম্ভ হবে না এবং আরম্ভ হলেও কয়েকজন স্বার্থান্বেষীর হাতে গিয়ে পড়বে।' স্বভাবতই, এইসব জটিল প্রশ্নে যেতে চাননি হুমায়ুন কবির। ভবতোষ দত্তের কিন্তু সেই সূত্রেই মনে হয়েছিল : 'আজকালকার বিরাটকায় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনাগুলি সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ জীবিত থাকলে কি মত পোষণ করতেন সেটা বলা শক্ত, কিন্তু অনেক দিকে তাঁর নৈরাশ্য সম্ভবতঃ ঘনতর হত।' হুমায়ুন কবির নিশ্চয় তা ভাবেননি।

'প্রারম্ভকথা' আর 'প্রেক্ষাপট'-এর কথা ছেড়ে দিলে বলা যায় বইটিতে আছে চারটি আলোচনা : শিল্পের স্রষ্টা রবীন্দ্রনাথ, মানবতাবাদী রবীন্দ্রনাথ, রবীন্দ্রনাথ ও আধুনিক ভারত, রবীন্দ্রনাথ এবং বিশ্ব। অল্প পরিসরে অনেকখানি পরিচয় জানাতে হচ্ছে বলে চেনাজানা কয়েকটা সাধারণ কথাই উঠে আসে এখানে, নিরুপায়ভাবে। কিন্তু তারও মধ্যে দু-একটি ইশারা লেখাগুলিকে কখনও কখনও স্বতন্ত্র একটা মর্যাদা দেয়। যেমন ধরা যাক ছবির প্রসঙ্গ। শিল্পের স্রষ্টা হিসেবে পরিচয় দিতে গিয়ে পরম্পরায় তাঁকে বলতে হয়েছে কবিতার কথা গানের কথা গল্প-উপন্যাসের কথা (স্থানাভাবের দোহাই দিয়ে এড়িয়ে গেছেন অবশ্য নাটকের কথা) আর সেই সঙ্গে ছবিরও কথা। রবীন্দ্রনাথের ছবি যে একেবারে অপ্রত্যাশিত এক চমক, 'জাগরণ ও স্বপ্নের মাঝখানে এক গোধূলিজগতের বাসিন্দা' কিংবা তা যে 'প্রায়শই রুক্ষ, ধারালো, রাগী এবং অচরিতার্থ বাসনার ইঙ্গিতবহ' এ নিয়ে অনেকেই কথা বলছিলেন তখন, অনেকেই ব্যাখ্যা করছিলেন এর রহস্যমূল। কিন্তু কম সমালোচকই বলতে পেরেছেন যে ওসব 'ভলক্যানিক ইরাপশন' ওসব 'বিক্ষুব্ধ ও যন্ত্রণাকাতর চিত্রকলা শুধু তাঁর মনের অবস্থাই প্রতিবিম্বিত করে না, জাতির মনোভাবও তাতে বিধৃত।' এর বিশ্লেষণসূত্রে তাঁর এই কথাগুলি বিশেষভাবে স্মরণযোগ্য আর বিবেচনাযোগ্য বলে মনে হয়:

> এক অর্থে সেগুলো ভারতের উত্তুঙ্গ-হতে-থাকা স্বাধীনতা-সংগ্রামের প্রতি রবীন্দ্রনাথের প্রতিক্রিয়া এবং বিদেশী শাসন প্রতিরোধের জন্য দৃঢ় অসহিষ্ণু আহ্বান। কাটা-কাটা, হঠাৎ আসা রেখা এবং কম্পোজিশানের আকস্মিক উল্লম্ব গতিবেগ যেন ঘোষণা হাঁকে যে এখন আমরা আমাদের অবস্থান নিয়ে নিয়েছি এবং কোনও কিছু সেখান থেকে আমাদের নড়াতে বা আমাদের মন পাল্টাতে পারবে না। তাঁর নিজের মনোজগতের অন্তর্লীন বিভাজন—ভারতের স্বাধীনতার জন্য আকুল তৃষ্ণা এবং

> ক্রমশ জোরালো হতে থাকা স্বাধীনতা-সংগ্রামের বহু দিক মেনে নিতে তাঁর অপারগতার মধ্যে পড়ে তাঁর ছিন্নভিন্ন অবস্থা—ধরা পড়ে যায় তাঁর আর্তির মধ্যে যে, জীবনকে মূলগতভাবে জানতে হলে তার যাবতীয় কার্কশ্য ও স্থূলতা মেনে নিয়েই তার কাছে যেতে হয় এবং রূপের (form) সৌন্দর্য আরোপ করতে হয় তার ওপরে। তাঁর চিত্রকলা তাই সমান্তরালভাবে তাঁর ব্যক্তিস্বরূপের যেমন তেমনই তাঁর স্বাধীনতারও ঘোষণা।

এই কথাটি থেকে, এই ব্যক্তিস্বরূপ আর স্বাধীনতা শব্দদুটির উচ্চারণ থেকে, অন্য অধ্যায়গুলির সঙ্গে যুক্ত হতে থাকি আমরা। ওই স্বরূপের সন্ধানই চালিত করছে তাঁর 'রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি ও বিশ্বাসকে'। (পৃ: ১২১), 'অস্তিত্বের অপরিহার্য অংশ' হিসেবে তাঁর ধর্মের বোধকে (পৃ: ১২১) তাঁর 'শিক্ষাকর্মসূচিকে' (পৃ: ১০৮), 'সকল জাতি ও সকল দেশের' সঙ্গে তাঁর 'একাত্মতা সন্ধানের তৃষ্ণা'কে (পৃ: ৫২)। এইভাবে, তাঁর সমস্ত কাজের মধ্যে একটা ঐক্যসন্ধানের সূত্রে হুমায়ুন কবির যখন বলেন : 'রবীন্দ্রনাথের জীবনের সমুদয় দিক, তাঁর চিন্তা ও কর্ম গভীর ধর্মভাবনার দ্বারা পরিচালিত হয়েছিল', তখন 'ধর্ম' শব্দটি একটা নূতন শরীর পেয়ে যায়, পৌঁছে যায় জীবনের সমগ্রতার বোধে।

খুবই অল্প পরিসরে, সেই সমগ্রতার একটা ছবি তৈরি করতে চেয়েছিলেন হুমায়ুন কবির তাঁর বইটিতে। ধর্মচিন্তা শিক্ষাচিন্তা রাজনীতি সমাজসংস্কার বা অর্থনৈতিক পুনর্গঠন, এই সবকিছুরই মধ্যে যে 'আত্মশক্তি বিকাশ' আর 'জীবনের ঐক্যচেতনা'র উপলব্ধি আছে, তারই থেকে যে জেগে ওঠে রবীন্দ্রনাথের শিল্প—'প্রেক্ষাপট'-এর শেষাংশে এই মন্তব্যটির কাছে পৌঁছে দেন তিনি, আর সেইসঙ্গে বলেন : 'কবির ধর্ম তাই রবীন্দ্রনাথের জন্য হয়ে দাঁড়ায় মানুষের ধর্ম।' রবীন্দ্রনাথের শতবর্ষকে কেন্দ্র করে এই-যে কথাগুলি তিনি ভেবেছিলেন একসময়ে, তাঁর শতবর্ষ উদ্‌যাপন উপলক্ষে সেদিকে আরেকবার আমরা তাকিয়ে দেখতে পারি।

যুক্তিপন্থী ভারতীয়ত্ব : ইতিহাস ও সংস্কৃতি

দিলীপকুমার সিংহ

বেশ অনেকদিনই হল আলোচ্য গ্রন্থটি ইংরাজিতে প্রকাশিত হয়েছে। বেশকিছু পত্রপত্রিকায় যে আলোচিত হয়নি তা কোনও ক্রমেই বলা যাবে না। পুস্তকটির অবস্থান সপ্তাহান্তের ঘোষিত পুস্তকতালিকায় যে শীর্ষে, তা প্রায় সর্বজনবিদিত। বইটি চারটি অংশে বিভক্ত এবং ভূমিকায় যা বলা আছে, তার থেকে প্রতীয়মান হবে যে এটি হল এক দশকে রচিত প্রবন্ধের সংকলন। প্রত্যেক অংশের বিশেষ বিশেষ শিরোনাম আছে। বইটির শিরোনাম যদি দেওয়া যায় 'যুক্তিপন্থী ভারতীয়' তাহলে চারটি অংশের প্রত্যেকটিরই উপসংকলনের মধ্যে যুক্তি না থাকা কোনও ভাবেই অসমীচীন নয়।

ভারতদর্শন নানা দৃষ্টিভঙ্গি থেকে নানাভাবে অভিনবত্ব অর্জন করেছে। পশ্চিমী দৃষ্টিভঙ্গি থেকে ভারতীয়ত্ব অনুসন্ধান কর্মে অনেক বিরাট মাপের ব্যক্তিত্বের নজির আছে। অনেক সময়ই দেখা গেছে তা হল যুগপন্থী বা কালোপযোগী। এই জাতীয় পুস্তক যতই সুখপাঠ্য হোক না কেন, পুস্তকটির ওপর নানা ধরনের সাড়া ও প্রতিক্রিয়া অনিবার্যভাবে লেখককে ঝুঁকির সম্মুখীন করে দিয়েছে। তার মূখ্য কারণ এটি : ভারতের বৈচিত্র। এই সত্তা গর্বের বস্তু হলে, এর ব্যাপ্তি এতখানি অসীম যে যেভাবেই ভারতীয়ত্ব বিশ্লেষণ করি না কেন, বিশেষ করে যুক্তিতর্কসাপেক্ষে, কোথাও না কোথাও কোনও না কোনও দিক অজ্ঞাতসারে বা অনবধানবশত নজর এড়িয়ে যেতে পারে। 'যুক্তিপন্থী ভারতীয়' আখ্যা স্বাভাবিকভাবেই চাইবে ভারতীয় ঐতিহ্য বিশ্লেষণের তর্ক, যুক্তি, ন্যায় ইত্যাদির উপস্থাপনা। তর্করত্ন, তর্কবাগীশ, তর্কচূড়ামণি, তর্কতীর্থ, তর্কাচার্য, তর্কালঙ্কার, তর্কপঞ্চানন, ন্যায়তীর্থ, ন্যায়রত্ন ইত্যাদি উপাধির উল্লেখ, বিশেষকরে এগুলির আকর যে ভারতীয় যুক্তিবাদকে সমৃদ্ধ করেছিল তা এখন কারুরই অজানা নয়। এই উপাধিগুলির উল্লেখ করার অর্থ এই নয় যে সংস্কৃতায়ন (sanskritization) একমাত্র অন্যতম প্রক্রিয়া সবই যুক্তিপন্থাকে মদত জুগিয়েছে বা জোগাবে। প্রাসঙ্গিকভাবে বলা যেতে পারে সংস্কৃতায়ন-প্রক্রিয়া নিঃসন্দেহে, বিনা দ্বিধায় স্বীকৃতিলাভও করেনি, যদিচ বিগত ষাট দশকের প্রথমে এম এন শ্রীনিবাসন কর্তৃক তত্ত্বটি উপস্থাপিত হয়েছিল। জাতপাত সম্পর্কে যতই না আমরা সোচ্চার হই, আমরা কখনওই বিস্মৃতিতে ভুগব না চৈতন্যদেব

সম্পর্কে। তাঁর মতো বিপ্লবী এখনও কি এদেশের ইতিহাস আমাদের জোগাতে পেরেছে? আর এই শ্রীচৈতন্যই নবদ্বীপ ঘরানার যুক্তিবাদের অনন্যতা প্রতিষ্ঠা করতে অনগ্রসর হননি। যে কোনও আলোচনায় তাঁর কথা উল্লেখ না করলে অসম্পূর্ণতা দোষে দুষ্ট হবে। ভারতীয় যুক্তিপন্থার সার্থকতা হবে কোন স্থানে, তার উত্তর আবার সেই ভারতীয় বিচিত্রতাই জোগাবে। যুক্তিবাদী হলেই যে আত্মসমর্পণ, ত্যাগ, দাস্যভাব, সখ্যভাব থেকে নিজেকে মুক্ত রাখব, এমনটা ভারতীয় ঐতিহ্যপ্রবাহ সম্মতি দেয় না।

ভারতীয় বৈচিত্র যে বিবর্তনীয়, তা বোধকরি কোনও ভাবেই বিতর্কিত হবে না। নবজাগরণের শুরু থেকে রামমোহন, বিদ্যাসাগর, বিবেকানন্দ প্রমুখ পথিকৃৎবর্গ মামুলিভাবে যুক্তির সাহায্য গ্রহণ করেননি। সবসময়ই সচেষ্ট হয়েছেন বিকল্পের সন্ধানে, যেখানে মানবত্ব অগ্রাধিকার পেয়েছে। ধর্মীয় ও আধ্যাত্মিক প্রয়াস যেমন গ্রাহ্য হয়েছে, চার্বাকের দর্শনও আলোচিত ও বিশ্লেষিত হয়েছে। বেশ কয়েক দশক আগেই 'পরিচয়' পত্রিকায় ত্রিপুরাশঙ্কর সেনশাস্ত্রীর অসাধারণ ভাষ্য বহু পড়ুয়াকে এই দিকে আকৃষ্ট করেছিল। আরও সত্য যে গণিতবিদ অধ্যাপক ডি ডি কোসাম্বি ইতিহাসের গাণিতিকীকরণ দেখিয়ে গেছেন; দার্শনিকদ্বয় ব্রজেন্দ্রনাথ শীলের প্রামাণ্যগ্রন্থ, ইতিবাচক বিজ্ঞানের ওপর বা বসন্তকুমার মল্লিকের অসাধারণ পুস্তক 'The real negative' কি এক রকমের যুক্তি এবং যুক্তি-উত্তর পর্যায়গুলির নিশানা দেয় না? বিমূর্তন বোধ করি সব ভারতীয় অনুশীলনেরই এক অনবদ্য প্রচেষ্টা, অনেক সময় এক ধরনের পূর্ণতা। যুক্তিপন্থী ভারত যে এখনও দৃশ্যমান, তার উল্লেখ হাল আমলের বিশ্ব অর্থনৈতিক শীর্ষ সম্মেলনেও আলোচিত হয়েছে; হয়ত তা অধুনা-চালু বিশ্বায়নের পরিপ্রেক্ষিতে রাজনৈতিক মাত্রা পেয়েছে। যুক্তি যেমন আছে, তেমনই এ মহাদেশে সহাবস্থান করেছে মিথ (myth), যেখানে বিশ্বাসই হল একমাত্র হাতিয়ার। যুক্তি ও ঘটনার অনুসন্ধানে সাধুভাবে প্রয়াসী হতে হলে এমন এক মানসিকতা চাই, যাতে প্রতিপক্ষের যুক্তি তুড়ি মেরে উড়িয়ে না দিয়ে তা অনুধাবন করা—যা আহরণ করতে পারলে এক নতুন ধরনের যুক্তি উদ্ভূত হতে পারে। তা জানতে বা বুঝতে প্রতিবন্ধকতা কোথায়? য়ুরোপীয় ধাঁচে এই দিকে ভাবনাচিন্তা করলে, সেখানকার ঐতিহ্য থেকে আলাপ আলোচনা বা dialogue-এর নমুনা পাওয়া যাবে না। ভারতীয় ঐতিহ্যের বিরাট পুরুষ, সম্রাট হলেও. অশোক প্রকাশ্যে এই বাদানুবাদ বা আলোচনার ব্যবস্থা করেছিলেন, যাতে সংযমী হয়ে কথোপকথনে এবং শ্রদ্ধায় আমরা যুক্তিপন্থী হতে পারি। চালু তথ্যপ্রযুক্তির ভাষায় চালচলনের বা প্রচারের ঋজুতাকে হার্ডওয়্যার হিসাবে ভাবলেও বিচ্ছিন্নতা কিন্তু ভারতীয়ত্বকে গ্রাস করেনি, বরং যুক্তিপন্থাকে নতুন রূপ পরিগ্রহ করতে সমর্থ করেছে। তাই আবার তথ্যপ্রযুক্তির ভাষাতেই অংশগ্রহণ ও আলোচনা হল ভারতীয় যুক্তিপন্থার এক অনন্য সফটওয়্যার।

ফিরে আসা যাক আলোচ্য পুস্তকটির কয়েকটি বিশেষ অংশে, যেখানে পুরুষ ও নারী সম্পর্কে আলোচনা আছে। একটু পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে দেখলে এই অংশটির সঙ্গে আপাতভাবে পুস্তকটির শিরোনামে কোথাও যেন একটা ফাঁক রয়ে গেছে। যুক্তিপন্থী মহিলাশ্রেণির উল্লেখ বস্তুত অনুপস্থিত। ভারতবর্ষীয় পরিপ্রেক্ষিতে বিশেষ করে কৃষ্টিগত আপেক্ষিকতার পরিপ্রেক্ষিতে এবং মানবাধিকার সম্পর্কিত আলোচনায় নারীজাতির অবদান সম্পর্কে পশ্চিমী মহলে আলোচনা দুর্লভ নয়। এমনকী রমেশচন্দ্র দত্তমহাশয় তাঁর রচিত পুস্তক "A History of Civilizaton in Ancient India : Based on Sanskrit Literature"-এ, যা প্রকাশিত হয়েছিল ১৮৯৩ সালে লন্ডন থেকে, বলেছিলেন অনেক কথা মহিলাদের সম্পর্কে। বিশেষ করে সেই সময়ের অন্যান্য দেশের তুলনায় যে শ্রদ্ধার দৃষ্টিতে মহিলাদের দেখা হত। তাঁর কথায় ভারতে প্রাচীনকালে মহিলাদের বহির্ভুক্তি (seclusion) একেবারেই অজানা ছিল। সে সময়ে বেশ কয়েকটি কথা চালু ছিল যেমন আচার্যা, আচার্যানী, উপাধ্যায়া, উপাধ্যায়িনী, যাদের অর্থ যথাক্রমে ছিল মহিলা শিক্ষিকা, পুরুষ শিক্ষকের স্ত্রী, মহিলা গুরু এবং পুরুষ গুরুর স্ত্রী। উপাধ্যায়ার থেকে আচার্যাকে ধরা হত দশগুণ বেশি জ্ঞানবতী। প্রমথনাথ বসু এবং ব্রজেন্দ্রনাথ শীল তাঁদের নানা প্রবন্ধে পুস্তকে প্রাচীন ভারতে শিক্ষিতা মহিলা সম্পর্কে অনেক কথা বলেছেন, যেখান থেকে কোনও সিদ্ধান্তের অবকাশ থাকতে পারে না, যেখানে মহিলারা অযুক্তিপন্থী ছিলেন।

আলোচ্য পুস্তকটিতে গণিতজ্ঞের নাম বাদ পড়েনি। আনুষ্ঠানিকভাবে যুক্তিপন্থী না বললেও তাঁরা হলেন যুক্তিনিষ্ঠ। গণিতের ভারতীয় ইতিহাসে তার বহু নজির আছে। বিমূর্তন যে তাদের চিন্তনের পরিপূর্ণতার এক বিশেষ পর্যায় তা নতুন করে বলার প্রয়োজন বোধ করি নেই। বাস্তবতা অনুধাবন করা কোনওরকম প্রচ্ছন্নতার আওতায় তারা আনেন না। হয়ত তাঁরা বিশ্লেষণাত্মক বা জ্যামিতিক তত্ত্বের উপস্থাপনায় রত হয়েছেন। যাতে বাস্তবতা আংশিকভাবে অভিব্যক্ত হয়েছে, কিন্তু কখনও তারা কোনও বিশ্বাসে লিপ্ত থাকেননি যে তারা তত্ত্ব ও বাস্তবতাকে সঠিকভাবে যোগসূত্র স্থাপনে সমর্থ হয়েছেন। অর্ধ-সাফল্য তাদের কিন্তু যুক্তিনিষ্ঠা থেকে বিচলিত

করেনি; তত্ত্ববর্জন করেছেন, তত্ত্বের পরিবর্তনে বা নতুন তত্ত্বের সন্ধানে। আবার এও সত্য যে গাণিতিকীকরণের আতিশয্য অনেক সময়ে প্রয়োগকে সত্যের দিকে না গিয়ে, প্রায়-সংস্কৃতায়ন দোষে দুষ্ট করেছে।

পুস্তকটির শিরোনাম এবং চতুর্থ অংশের ভারতীয় অনন্যতা একত্রিত করলে আমরা কি খুঁজব না ভারতীয়দের সম্পর্কে যুক্তিপন্থী অনন্যতা? ভারতীয়ত্ব প্রতিষ্ঠা বা অনুসন্ধান করতে হলে কি আমরা প্রাচীন সমস্যাকে নতুনভাবে ঢেলে সাজাব? সমস্যার উপস্থাপনা যেভাবেই হোক না কেন, তার সূত্রায়ন কীভাবে হবে? সমস্যা কি ফল অর্জনের অভিমুখী? সমস্যা-সম্পর্কিত তাত্ত্বিকতা, সভ্যতার প্রাচীন যুগ থেকেই নানাভাবে তার বিবর্তন ঘটেছে। এই দিকে প্রশ্ন স্বাভাবিকভাবেই যুক্তিনির্ভর। তার পদ্ধতি কী হবে? ফরাসি ভাষায় এক শব্দ আছে আনুষঙ্গিক হিসাবে যাকে বলে problematique। তাহলেও তত্ত্বও কি সিদ্ধিলাভের অভিমুখী হতে পারে? প্রকৃত যুক্তিপন্থী হতে হলে এমনতর স্বচ্ছতা কি আশা করা যায় না? যুক্তিপন্থা কি বিজ্ঞানসম্মত? গণিত হয়ত অন্য চিন্তাধারার সাম্রাজ্যে ধাবিত করবে। তার জন্য প্রয়োজন হবে এক বিশেষ ধাঁচের গবেষণা ও তার প্রয়োগ। আর প্রমাণসাপেক্ষ বা প্রমাণযোগ্য হলেই তার সঠিক মূল্যায়ন হবে তখনই যখন তারা যুক্তিসম্মত আকারে অর্থবহ হয়। ফল অর্জন সম্পর্কে কোনও বৈশিষ্ট্যে কি আদৌ উপনীত হওয়া যায় কিংবা কিছু নির্ণয় করতে পারা যায়? হয়ত এক বৈশিষ্ট্য হতে পারে, চিন্তাশৈলী যার সম্পর্কে যারা একটু সংযত, আর একটি হতে পারে, কুসংস্কার বা ধোঁয়াশা বা অস্পষ্টতা যারা ধূলিস্যাৎ করতে উদ্যত। তৃতীয় বৈশিষ্ট্য হিসাবে ভাবা যেতে পারে কর্মশৈলীকে, যারা সেটির শক্তির জোগান দেন। হয়ত আরও অনেক বৈশিষ্ট্য থাকতে পারে, তবে বৃহত্তর দিক থেকে সেগুলি যে ইতিহাস, মনস্তত্ত্ব, বিশ্লেষণপদ্ধতি বিশিষ্ট epistemological ইত্যাদি থেকে উদ্ভূত—তা বললে অতিশয়োক্তি হবে না।

কৃষ্টি সম্পর্কে অনেক কথা স্বাভাবিকভাবেই আলোচ্য গ্রন্থে স্থান পেয়েছে। যুক্তিপন্থা, কৃষ্টির পরিপূরক বা পরিপন্থী তা সরাসরি আলোচিত হয়নি। কৃষ্টিগত সংবেদনশীলতা যা মূলত সৃষ্টি হয়ে থাকে কৃষ্টিগত বৈচিত্র থেকে, তা অপরিহার্য। কৃষ্টি সম্বন্ধে অনবধানতা বা অসংবেদনশীলতা মারাত্মক রূপ ধারণ করতে পারে যদি কৃষ্টিগত বিচ্ছিন্নতা (seperatism), কৃষ্টিগত আপেক্ষিকতা (relativism)-কে ক্ষুণ্ণ করে। নিশ্চয়তা সম্পর্কে এক ধরনের প্রত্যয় থাকতেই পারে কিন্তু স্বাস্থ্যকর সন্দিগ্ধতা যে বাঞ্ছনীয়, তা নানাভাবেই প্রতিভাত হয়েছে, বিশেষ করে নিজ বিশ্বাস বা সংস্কার সম্পর্কে। প্রশ্ন করা, সদুত্তর অনুসন্ধান করা এবং সম্ভাব্য বিকল্প নির্ণয় করা সন্দিগ্ধতার বিভিন্ন রূপ। এই অবস্থায় সমীচীন হল critical realism বা সংকটপূর্ণ বাস্তবতা যা হল বস্তুত এক ধরনের জ্ঞান-তত্ত্ব। তার কারণ তা না হলে সন্দিগ্ধচিত্ত হওয়া যায় না। এটি নির্ভর করে এক ধরনের স্বতঃসিদ্ধর ওপর, যা হল আমাদের জ্ঞানের পরিধি যা কখনওই নির্দিষ্ট এবং সম্পূর্ণ আকারসম্পন্ন হয় না অর্থাৎ তার পরিবর্তন ঘটে, যতই আমরা জানতে থাকি সময়ের সঙ্গে সঙ্গে। তথ্য ও যুক্তি ব্যবহার করেই আমরা প্রচলিত বিশ্বাসের মূল্যায়ন করে থাকি এবং নতুন তথ্য ও পরিবর্তনসুলভ অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে নতুন প্রত্যয় গড়ে তুলি। আর এই তো হল এক ধরনের দৃষ্টিভঙ্গি যা ভবিষ্যৎ অনুশীলন বা পরিকল্পনার জন্য প্রয়োজন। অন্যভাবে ভাবলে বাস্তবের Cognitive চিত্রায়ন (map) কোনওক্রমেই যদি ভুলভ্রান্তির শিকার হয়, তবে কখনওই তাদের ব্যবহার করতে পারব না, কোথাও বা কোনদিকে আমরা ধাবিত হতে পারি বা চাই। Critical realism-এর জন্য তাই আহ্বান করে এক ধরনের সমীহ ভাব বা হালকা ভাষায় ভদ্রতা, বিশেষ করে, যাঁরা বিরোধিতায় সচেষ্ট হয়ে থাকেন, অর্থাৎ সংকট বা সংঘাতের শান্তিপূর্ণ মীমাংসা হতে পারে একমাত্র অনুপ্রেরণামূলক অনুশীলন ও তথ্যালোচনার সহায়তায়। সমঝোতা ও সহিষ্ণুতা তো শিক্ষণীয় বটেই, তার কারণ এই ধরনের প্রয়োগশৈলী তথাকথিত সন্দেহহীন তথ্যের সন্ধান দেবে এবং যা নিশ্চিত বলে জানা আছে, তাও সম্পূর্ণ বদলে দিতে পারে, এমনকী দীর্ঘকাল সমর্থিত বিশ্বাসকেও। প্রকৃত সন্দিগ্ধ হতে হলে আনুষঙ্গিকভাবে দুটি নীতির কথা ভাবা যেতে পারে, যথা অন্তর্ভুক্তি ও সামাজিক নিয়ন্ত্রণ। বহির্ভুক্তি যে বিপজ্জনক তা কে না জানে? আর তাই প্রাচীন সভ্যতায়,যেখানকারই হোক না কেন, পাওয়া যায় নৈতিক মূল্যবোধের সাধারণত্ব (Commonality)। গোষ্ঠীগত সম্পর্ক, অন্তর্ভুক্তি বা বহির্ভুক্তির নিরিখে, বিপরীত আকার ধারণ করতে পারে। সামাজিক নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে তা বিধিবদ্ধ বা অবিধিবদ্ধ হোক না কেন বহু যুগ ধরেই মানুষ, সমাজ ও প্রতিষ্ঠান তা আত্মস্থ করেছে।

ভারতবর্ষ এমন একটি দেশ, যেখানে কৃষ্টির কখনওই একাকিত্ব স্বীকৃত হয়নি। মূল্যবোধগত, ভাষাগত, ধর্মগত বৈচিত্র যাই হোক না কেন, সার্থকতা কিন্তু রূপ ধারণ করতে পেরেছে এই নানা ধরনের পরিবেশ-উদ্ভূত সমস্যা ও সংকটের জন্য। তাই ঘুরে ফিরে আবার সেই আমরা কৃষ্টিগত সংবেদনশীলতায় ফিরে আসতে বাধ্য হচ্ছি। কিন্তু এটা কি এক ধরনের প্রতিকৃষ্টিগত (cross-cultural) সংবেদন-শীলতা নয়? আলোচ্য গ্রন্থে এই দিকে অসাধারণ আলোকপাত করা

হয়েছে। সত্যি কথা বলতে গেলে বইটি পাঠ করলে পরিবেশসমূহের কৃষ্টিগত শিকড় বা নোঙর এক অভিনবত্বর সঙ্গে এবং খোলা মনে অনুধাবন করা যায়। কৃষ্টির সূক্ষ্মতা বোধগম্য করা এবং বুদ্ধিমত্তা ও সৌষ্ঠবের সঙ্গে তার প্রতি সাড়া দেওয়া এবং মোকাবিলা করা বইটিতে নানাভাবে উল্লিখিত হয়েছে। প্রতি-কৃষ্টি সম্পর্কে অজ্ঞতা বা অসংবেদনশীলতা যে কত মারাত্মক হতে পারে, তার নমুনা আমরা সাম্প্রতিককালে দেখেছি এবং তার রেশ থেকে এখনও আমরা অব্যাহতি পাচ্ছি না। অসংখ্য তথ্য সরবরাহ করা যেতে পারে, যেখানে কৃষ্টিগত সংবেদনশীলতার অভাব কি অবাঞ্ছিত বেশ ধারণ করতে পারে তা আমরা দেখেছি রক্ষণশীল বাতাবরণে। ঘুরে ফিরে আবার সেই ডায়লগ বা আলাপ আলোচনার ভিতসূত্রে উপনীত হচ্ছি। গাণিতিক বা বৈজ্ঞানিক শব্দ ব্যবহার করলে এক ধরনের মডেল ভাবা যেতে পারে কৃষ্টিসমূহ সম্পর্কে। কৃষ্টির দৃষ্টিভঙ্গিতে মূলত কমপক্ষে চার ধরনের মাত্রার কথা ভাবা যেতে পারে। প্রথমেই উল্লেখ করা যায় বিশেষ করে ভারতের সামাজিক কাঠামোর পরিপ্রেক্ষিতে সমতা বা অসমতা সম্পর্কে। এটা হল এক ধরনের ক্ষমতা-দূরত্বের সূচক, যা বৃদ্ধি পায় অর্থ, বয়স ও জাতপাত ইত্যাদির জন্য। আত্মকেন্দ্রিকতা হল আর একটি মাত্রা যেখানে সমাজ—ব্যক্তিগত উদ্যোগ, উন্নতি এবং আন্তর্ব্যক্তিক সম্পর্ককে মদত জোগায়। যে-কৃষ্টিতে এই ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্য গুরুত্ব পেয়ে থাকে, তা আবার অনেক ফসকা বাঁধুনির শিকার হতে পারে। সঠিক সম্পর্ক তখনই গড়ে ওঠে যখন একত্রতা (collectivism) ব্যক্তিকেন্দ্রিকতার ঊর্ধ্বে স্থান পায়। পুরুষশাসিত অবস্থা আর এক ধরনের মাত্রা দিতে পারে যার উল্লেখ পুস্তকেও আছে এবং উপরোক্ত পংক্তিতে বলাও হয়েছে। অনিশ্চয়তা এড়ানোর সূচক যে একটি বড় ধরনের মাত্রা তারও ইঙ্গিত ওপরে করা হয়েছে। বিশেষ করে যখন critical বাস্তবতা রূপ পরিগ্রহ করেছে। যদি এই সূচক সমাজের একটু কমের দিকে হয়, তাহলে অবিসংবাদিতভাবে সমাজ হবে কম নিয়ন্ত্রিত এবং বড় ঝুঁকি বা বিপদ এড়ানোর জন্য সক্ষম। সম্পর্ক গঠন, কর্মশৈলী ইত্যাদি তো নানা দিক থেকে ওতপ্রোতভাবে ওপরের মাত্রাগুলির সঙ্গে জড়িত আছে।

এবার আসা যাক ভারতীয় কৃষ্টির স্থান কোথায় বা ইংরাজি ভাষায় আমরা কি তাকে বলতে পারি, status বা অবস্থান-সম্পন্ন? কোনও ব্যক্তির অবস্থান নির্ণীত হয় মূলত কয়েকটি কারণে যেমন বয়স, লিঙ্গ, অর্থ ও শিক্ষা। সামাজিক বিভিন্ন স্তরের মধ্যে গতায়াত (mobility) মূলত এগুলির দ্বারাই প্রভাবিত হয়, আর বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে অন্য উপাদানও দেখা যায়। এইটিই আশা করা সমীচীন যে লিঙ্গ, অর্থ, বয়স, শিক্ষা-নির্বিশেষে সমাজ কতখানি এই উঁচুর দিকে গতিকে প্রশ্রয় দিচ্ছে এবং তার অবস্থান যাই আকার ধারণ করুক না কেন, তা সংরক্ষিত করছে নানা সৎ উপায়ে। পশ্চিমী দুনিয়ায় যাই হোক না কেন, ভারতে আবার সেই কৃষ্টিগত ভূমিকাই স্বচ্ছ সামাজিক গতায়াতকে দীর্ঘমেয়াদি আকার ধারণ করতে পুষ্টি জোগায়। ভারতীয় সমাজের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হল পশ্চিমী সমাজের বিপরীতে, তার একত্রতা, যেখানে সৌভাগ্যক্রমে বা দুর্ভাগ্যক্রমে একটি স্থিতিশীল পরিবারগত ও পরম্পরাগত কাঠামোর সম্পর্ক আছে। তাই আমরা দেখতে অভ্যস্ত একই আস্তানায় তিন প্রজন্ম বাস করে চলেছে এবং সিদ্ধান্ত-নির্ভর হচ্ছে এক ধরনের পারস্পারিকতার মাধ্যমে, যার মধ্যে আবার সেই একত্রতার সুবাস আছে। সংক্ষিপ্তভাবে বললে, ভারতীয় সামাজিক বুননে বৈশিষ্ট্য হল নানা পরিবর্তনের ঢেউ, আর প্রাচীন মূল্যবোধ ও আধুনিক প্রয়োগপরিধির মধ্যে নিরন্তর সমঝোতা। পেশাগত মাত্রা উদ্ভূত হতে বাধ্য, পশ্চিমী অর্থে নয়, যাতে উদ্ভূত হবে ও বৃদ্ধি পাবে এক ধরনের ক্ষমতা, যেখানে বহু সাংস্কৃতিক অভিব্যক্তির সঙ্গে ভাল রকমের সমঝোতা তো চলবেই এবং সাফল্য নির্ভর করে, যেভাবে ব্যক্তিগতভাবে হোক বা সমষ্ঠিগতভাবে হোক, প্রতি-কৃষ্টির ও আন্তর্ব্যক্তিক সমস্যা স্বীকার করা, অনুধাবন করা এবং সঠিকভাবে মোকাবিলা করা।

এই আলোচনার উপসংহারে উল্লেখ করা সমীচীন যে ভারত সম্পর্কে ভাবনা, ধারণা, চিন্তা ও মূল্যায়নে মোটামুটিভাবে পুস্তকটি ব্যতিক্রমী আলোকপাত তো করবেই বিশেষ করে যখন পৃথিবীব্যাপী সৃষ্টি হচ্ছে এক ধরনের সন্দেহপ্রসূত সংস্কৃতি। বিশ্বাসযোগ্যতা (Credibility) প্রায়ই ক্ষয়িষ্ণু আকার ধারণ করতে চলেছে। বিশ্বাস করা একটা সমস্যার পর্যায়ে এসে গেছে, হয়ত তা সমস্যা নাও হতে পারত যদি না সন্দেহবাতিকতা, এমনকী বিশেষজ্ঞদের আওতায় স্থান পেত। বিশ্বাসযোগ্যতা যেহেতু যথার্থতা (validity) থেকে স্বতন্ত্র, বোঝানো এবং কারণ দর্শানো আরও কঠিন হয়ে পড়ছে। দুর্ভাগ্যক্রমে যা বিশ্বাসযোগ্য বলে দাবি করা যায় তা আনন্দপূর্ণ উদ্যোগ নাও হতে পারে, ফলে এমন কিছু সিদ্ধান্তে পৌঁছতে বাধ্য হতে হয় যা অনাস্বাদিত বা অভূতপূর্ব; কিন্তু তার সম্মুখীন আমাদের হতেই হবে। আলোচ্য পুস্তকটি এই কাজে অনেকখানি সুরাহা জোগাবে। বিশেষকরে পরিপ্রেক্ষিত ও উদ্যোগ সৃষ্টিতে।

The Argumentative Indian—Writings on Indian History, Culture and Identity by Amartya Sen/ Penguin India. Allen Lane/ 2005/650.00

অন্য ভাবনায় বঙ্কিমচন্দ্র

শক্তিসাধন মুখোপাধ্যায়

ঝামেলাটা বঙ্কিমচন্দ্রেরই পাকানো। নিজে ডেপুটি হয়েও এমন কাণ্ড করে গেছেন যে বারংবার তাঁকে কাঠগড়ায় দাঁড়াতে হচ্ছে। বিশিষ্ট সমালোচক আজহারউদ্দীন খান 'বঙ্কিমচন্দ্র অন্য ভাবনায়' নামে একটি বই লিখে আবারও তাঁর সেই ফাঁসির হুকুমই বহাল রাখলেন।

এত বছর বাদে বঙ্কিমের মামলা আবার উঠল কেন? উঠল সার্ধ জন্মশতবর্ষ উপলক্ষে। আমাদের দেশে বড়মাপের মানুষ যাঁরা, তাঁদের জন্ম-মৃত্যুর একশো-দেড়শো বছর এলেই সাময়িক পত্রিকা ও বিদ্বৎ প্রতিষ্ঠানগুলি একটি মহৎ কৃত্য পালন করে থাকে, তারা বুদ্ধিজীবীদের হাতে ফুল দিয়ে ছুঁড়ে মারার একটা ব্যবস্থা করে দেন। মেদিনীপুরের বিদ্যাসাগর বিশ্ববিদ্যালয় সেই উপলক্ষে আজহারউদ্দীন খানকে আহ্বান জানিয়েছিল 'সাম্প্রদায়িকতা ও বঙ্কিমচন্দ্র' বিষয়ে কিছু বলার জন্য। তিনি স্বনামখ্যাত, সত্যভাষী, এবং প্রগতিশীল মুসলিম বুদ্ধিজীবী হিসাবে পরিচিত। সুতরাং বিষয় যতই অগ্নিগর্ভ হোক না কেন অনিচ্ছা সত্ত্বেও নিজের জাতধর্মের কথা মনে রেখে পাথরের সঙ্গে কিছু ফুলও ছুঁড়বেন এটাই প্রত্যাশিত ছিল। কে জানত তিনি এক লাফে হিন্দু বুদ্ধিজীবীদের প্রগতিশীলতাকেও ছাপিয়ে যাবেন?

অনেক বছর হল তো! বঙ্কিম মূল্যায়নের একটা বাঁধা ছক দাঁড়িয়ে গেছে। তাতে আছে চারটে খোপ। ছকটা মোটামুটি এইরকম—১. প্রগতিশীল সেকুলার হিন্দু বুদ্ধিজীবীরা চুটিয়ে তাঁর নিন্দা করবেন সঙ্গে থাকবে অগত্যা সামান্য প্রশংসা। ২. সম্প্রদায়-সচেতন ও জাতীয়তাবাদী হিন্দু বুদ্ধিজীবীরা তাঁকে নিয়ে গর্বে ফেটে পড়বেন। ৩. প্রগতিশীল মুসলিম বুদ্ধিজীবীরা তাঁদের সেকুলারত্বের প্রমাণস্বরূপ বঙ্কিমের যথেষ্ট প্রশংসা করবেন, সঙ্গে অবশ্যই সামান্য নিন্দা। ৪. সম্প্রদায়-সচেতন মুসলিম বুদ্ধিজীবীরা তাঁকে পেড়ে ফেলবেন। সুতরাং হিসাব করেই 'সাম্প্রদায়িকতা' বিষয়টা কোনও প্রগতিশীল হিন্দু বুদ্ধিজীবীকে না দিয়ে আজহারউদ্দীন খানকে দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু 'উলটা বুঝিলি রাম'। আজহারউদ্দীন যে বুদ্ধিজীবী হিসাবে প্রগতিশীল হিন্দুদের ছাপিয়ে যাবেন এমনটা কে ভেবেছিল?

প্রগতিশীল মুসলিম বুদ্ধিজীবীদের কেউ কি বঙ্কিমের আদ্যশ্রাদ্ধ করেননি? নিশ্চয়ই করেছেন। তবে তাঁদের আক্রমণকে ব্যালান্স করতে হয়েছে বঙ্কিমের অন্য কীর্তিকে প্রশংসায় ভরিয়ে দিয়ে। দুঃসাহসী বদরুদ্দীন উমর ব্যালান্সের অন্য একটা ছক এনেছিলেন। সেটা হচ্ছে পাশাপাশি বিদ্যাসাগরের প্রশংসা। অস্যার্থ হিন্দুত্ব বা মুসলমানত্ব নয়, নিন্দা প্রশংসার মাপকাঠি প্রগতিশীলতা ও প্রতিক্রিয়াশীলতা। ব্যালান্সের সেই ছকটাই আজহারউদ্দীন রেখায় রেখায় ফিরিয়ে এনেছেন তাঁর 'বিদ্যাসাগর ও বঙ্কিমচন্দ্র' নিবন্ধে। এমনকী গ্রন্থের মূল নিবন্ধে 'সাম্প্রদায়িকতার উন্মেষ ও বঙ্কিমচন্দ্র' নিবন্ধে বঙ্কিমের গোলমেলে ভূমিকার পাশাপাশি ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের গ্রহণযোগ্যতার প্রসঙ্গ একটু বেশি করে আনা হয়েছে একই কারণে।

যাই হোক না কেন, প্রশ্ন হচ্ছে আজহারউদ্দীন কী বলেছেন? তাঁর সেই বক্তব্য ঠিক না ভুল? উত্তর হচ্ছে আজহারউদ্দীন নিজে প্রায় কিছুই বলেননি। পাক্কা বিচারকের মতো তিনি নামী-দামি সাক্ষীদের দিয়ে বলিয়েছেন, যাঁদের বিরোধিতা করতে হলে পাঠককে দশবার ভাবতে হবে। পাঠক যদি জানতে চান সাম্প্রদায়িকতার বিষবৃক্ষ রোপনে বঙ্কিমচন্দ্রের ভূমিকা নিয়ে এ-বঙ্গে ও-বঙ্গে কারা কী বলেছেন বা লিখেছেন তাহলে বেশি খোঁজাখুঁজি করতে হবে না, তাঁর ৬৮ পৃষ্ঠার এই মিতায়তন গ্রন্থটি পড়লে পাঠক সবই জানতে পারবেন। ঝেঁটিয়ে জড়ো করা এই নেতিবাচক বক্তব্যের মধ্যেই আজহারউদ্দীনের বক্তব্যও স্বতঃপ্রকাশিত। এই গ্রন্থের মূল প্রতিপাদ্যের নটে গাছটি তিনি মুড়িয়েছেন গোপাল হালদারের উদ্ধৃতি দিয়ে—'বঙ্কিমের সাহিত্য সৃষ্টির একটি ফল সংক্ষেপে এই—শতকরা ৫৪ জন বাঙালি মুসলমান তাতে ক্ষুব্ধ।... তিনি তাঁর সৃষ্টি দ্বারা বাঙালি জাতীয়তাবাদকে প্রেরণা জুগিয়ে পুষ্ট করেছেন, আবার তা খর্বিত করেছেন— মুসলমান বাঙালিকে প্রতিক্রিয়াশীলতার দিকে ঠেলে দিয়ে।'

এই গ্রন্থে 'বিদ্যাসাগর ও বঙ্কিমচন্দ্র' নিবন্ধটি সাদা কালো ব্রাস দিয়ে টানা অতিবৈপরীত্যমণ্ডিত ছবির মতো। একজন 'too good' আর একজন 'too bad'। ভাল-মন্দের প্রাচীন প্রকল্পে ঈশ্বর আর শয়তানের ছবি আঁকা হত যেরকম বিভাজিত রঙ তুলি দিয়ে প্রায় সেইরকম কনট্রাস্টে উনিশ শতকের দুই বড়মাপের মানুষকে একটি নিবন্ধে মুখোমুখি করে দেওয়া। ফাঁপরে ফেলার এই আয়োজনে পাঠকমাত্রেই বিহ্বল বা চমৎকৃত হবেন সন্দেহ নেই।

এ গ্রন্থে আছে প্রাসঙ্গিক আরও দুটি নিবন্ধ 'উনিশ শতকের জাগরণ ঃ রূপ ও প্রকৃতি' এবং 'বাংলাদেশে বঙ্কিম চর্চা'। উনিশ শতকের জাগরণ বিষয়ক প্রবন্ধটির মধ্যে পাওয়া যাবে বহুকথিত ও বঙ্গসংস্কৃতির দুর্ভাগ্যক্রমে অতি প্রতিষ্ঠিত নেতিবাদী বক্তব্যের একটি চুম্বক। পাঠকমাত্রেই উনিশ শতকের বঙ্গীয় রেনেসাঁসের (খুড়ি জাগরণের) এই মূল্যায়নের সঙ্গে একমত হবেন তা না-ও হতে পারে। তবে আজহারউদ্দীনের বক্তব্য চাবুকের মতো নির্মেদ এবং ছুরির মতো তীক্ষ্ণধার। গত শতকের ষাট-সত্তর দশকে মূর্তি ভাঙা আন্দোলনের নিশীথযাত্রীদের বুকপকেট হাতড়ালে এইরকমই বিশ্বাসের খসড়া পাওয়া যেত হয়ত।

'বাংলাদেশে বঙ্কিম চর্চা' নিবন্ধটি ছোট কিন্তু এ বিষয়ে এই বঙ্গের পাঠকরা জানেন না এমন অনেক তথ্য ও সংবাদ এর থেকে পেতে পারবেন। শুধু তথ্য, উদ্ধৃতি ও সংবাদ দিয়ে তো লেখা হয় না মাঝে মাঝে 'ফিলার' লাগে, লাগসই মন্তব্য, উসকে দেবার মতো সিদ্ধান্ত ব্যক্ত করতেই হয়। লেখক তাতে খামতি রেখেছেন বলা যাবে না। উৎসাহের চোটে তিনি এমন কিছু কথা বলেছেন যার সঙ্গে একমত হতেও পাঠককে দশবার ভাবতে হবে; যার বিরুদ্ধ-বক্তব্য তাঁর নিজের গ্রন্থেই প্রচুর পরিমাণে মজুত আছে। যেমন 'বাংলাদেশে বঙ্কিম চর্চা' নিবন্ধের শেষে এবং পরিসজ্জাক্রমে গ্রন্থটিরও শেষে তিনি মন্তব্য করেছেন—'শেষ কথা হচ্ছে বঙ্কিমের দোষ-ত্রুটি থাকলেও বাংলাদেশের বঙ্কিম-অনুরাগীরা ও বুদ্ধিজীবীরা নিরপেক্ষ বিচার-বিবেচনা করেছেন।... অন্ধ বিশ্বাস, ভক্তি কিংবা বিদ্বেষের দ্বারা তাঁরা চালিত হননি। এপারের অধিকাংশ বুদ্ধিজীবী বঙ্কিমের দোষ-ত্রুটি সম্পর্কে উচ্চবাচ্য করেননি। ভক্তিমিশ্রিত শ্রদ্ধাঞ্জলি দিয়ে দায়িত্ব সমাপন করেছেন। বঙ্কিমের বিরুদ্ধে যে অভিযোগ একটি সম্প্রদায় থেকে প্রবলভাবে উত্থাপিত হয়েছে, সে অভিযোগ আজ নতুন নয়, সেই অভিযোগের মধ্যে সারবত্তা থাকা সত্ত্বেও তার উপযুক্ত জবাব এপারের বঙ্কিম সমালোচকরা দিতে পারেননি। বাংলাদেশের বুদ্ধিজীবীরা বঙ্কিমের মন্তব্য ও দৃষ্টিভঙ্গিতে আহত হয়েও তাঁরা পক্ষপাতহীন সমালোচনা করেছেন এবং এই ধারাটি এপারেও যদি অনুসৃত হয় তাহলে বঙ্কিম সকলের কাছের মানুষ হতে পারতেন।' এই উপদেশাত্মক বক্তব্যে সঙ্গতি, নিরপেক্ষতা এবং দায়িত্বজ্ঞান সবকটিরই অভাব। এপারের সমালোচক বলতে কাদের বুঝিয়েছেন তিনি? তাঁদের সকলের বঙ্কিম বিষয়ক প্রবন্ধ-নিবন্ধ-গ্রন্থ-সমালোচনা সব কি ঝেঁটিয়ে পদ্মার জলে ফেলে দিতে হবে নাকি।

সত্যি কথা বলতে কি—বঙ্কিমচন্দ্রকে নিয়ে নিন্দা ও প্রশংসার বাকি কিছু নেই। সমকালে যাঁর গ্রন্থের পর গ্রন্থ নিয়ে প্যারডির পর প্যারডি লেখা হয়েছে বা ঘোষণা করে যাঁর রচনার বহ্ন্যুৎসব করা হয়েছে, এবং যাঁকে বলা হয়েছে 'নব যুগের জীবনমন্ত্রের দ্রষ্টা ঋষি' বা 'the greatest figure of the second phase of the Bengal Renaissance' পাথর এবং ফুল, নাম এবং বদনাম উভয়েরই ভাগীদার তিনি। অসিতকুমার ভট্টাচার্য বা কাজী আবদুল ওদুদের মূল্যায়নের সঙ্গে যাঁদের পরিচয় আছে তাঁরা জানেন ভারসাম্যযুক্ত মূল্যায়নেও খুব তেমন ঘাটতি নেই। সেই কবে অরবিন্দ পোদ্দার লিখেছেন—'বঙ্কিমের মন ছিল পশ্চাতে, কিন্তু চোখ ছিল সম্মুখে' বা কাজী আবদুল ওদুদ লিখেছেন—'শিল্পীরূপে বঙ্কিমচন্দ্রের মহত্ত্ব অবিসংবাদিত, চিন্তা নেতারূপে তাঁর ত্রুটি সত্যিই বড় রকমের।' 'There was a sharp conflict so it seems in the personality of Bankimchandra. He is sponteneously bent towards knowledge and humanism and at the same time passionately devotedly to propaganda for the Hindu' তাঁকে নিয়ে একতরফা ঢালাও প্রশংসা বা একতরফা নিন্দার আলকাতরা মাখানো দুই-ই খুব পরিণত সমালোচনার পর্যায়ে পড়ে না। এসব আমরা অনেক দিন পেরিয়ে এসেছি। ডেপুটি হয়েও বঙ্কিম নিজের ফাঁসির দড়িতে সম্প্রদায়চেতনার মোম এত ঘষে গেছেন তাঁকে বাঁচায় কার সাধ্য! কিন্তু কিছু মানুষ তো থাকেনই যাঁরা শত বিচারকের ফাঁসির রায় সক্লেশে পেরিয়ে যান। মনে হয় বঙ্কিমচন্দ্র সেই দলেই পড়েন। না হলে শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর বঙ্গ সাহিত্যে উপন্যাস বিষয়ক মহাগ্রন্থে বঙ্কিমচন্দ্রকে নিয়ে প্রায় ৮০ পৃষ্ঠা জুড়ে নান্দনিক আলোচনা করতে যাবেন কেন? কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে অরবিন্দ পোদ্দারকৃত 'বঙ্কিম মানস' সম্ভবত মার্কসবাদী সাহিত্যবিচারমূলক প্রথম পিএইচ ডি থিসিস (১৯৪৯)। বাংলা সাহিত্যের পঠন-পাঠন-গবেষণায় বঙ্কিমচন্দ্র অপরিহার্য তো অকারণে হননি। আজহারউদ্দীন খান সে কথা জানেন। জানেন বলে নেতিবাদী এই গ্রন্থটিও তাঁকে শেষ করতে হয় লাইন চারেকের আশ্চর্য প্রশংসাছত্র দিয়ে—'শতাব্দীর সমুদ্র পার হয়ে বঙ্কিম এখনও আমাদের মনে ঢেউ তোলেন। তাঁর শিল্পগুণ, রচনারীতি, সরল ভাষারীতি, প্রসাদগুণ এখনও আমাদের অনুকরণযোগ্য। রবীন্দ্রনাথের মতো বঙ্কিমচন্দ্রও আজ একটি অভ্রভেদী শিখর রূপে বাংলা সাহিত্যে কিছু নিন্দার সঙ্গে বন্দিত হয়ে জীবিত আছেন, এবং দীর্ঘকাল থাকবেনও।' কেন? তার উত্তর এ গ্রন্থে নেই। সে জন্য এ বই লেখাও হয়নি।

বঙ্কিমচন্দ্র ঃ অন্য ভাবনায়—আজহারউদ্দীন খান/সৃজন প্রকাশনী, ঘাটাল, পঃ মেদিনীপুর/৪০.০০

লোকসংস্কৃতি সমাজজীবনের দর্পণ

প্রণব সেন

'লোকেষু, আয়তো লোকায়তঃ। জনসাধারণের মধ্যে পরিব্যপ্ত বলেই নাম লোকায়ত।' লোকায়ত দর্শন গ্রন্থে দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় লোকায়ত শব্দের অর্থ নিয়ে আলোচনা করার প্রারম্ভিক পর্বে এই অভিমত ব্যক্ত করেছেন। লোকসংস্কৃতির স্বরূপ বিশ্লেষণের ক্ষেত্রেও যদি লোকায়ত শব্দটিকে তার অন্তর্নিহিত অর্থের ব্যাপকতাকে মর্যাদা দিয়ে ব্যবহার করা হয়, তাহলে লোকায়তসংস্কৃতি নামে অন্য এক পরিচিতি স্পষ্ট হয়ে ওঠে। লোকায়তসংস্কৃতি শব্দের সঙ্গে লোকসংস্কৃতি শব্দের দৃশ্যগত পার্থক্য আপাতদৃষ্টিতে প্রতীয়মান হলেও, ব্যবহারিক ও ভাবগত দিক থেকে কোনই পার্থক্য নেই। যদিও আলোচ্য গ্রন্থের লেখক সৌমেন সেন লোকসংস্কৃতির লোক কারা এই নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন। লোকসংস্কৃতির প্রচলিত ধারণাকে মর্যাদা দিতে গেলে এমন প্রশ্ন অত্যন্ত প্রাসঙ্গিকভাবে উঠে আসে। গ্রামীণ কৃষিসমাজের সংস্কৃতিই লোকসংস্কৃতি, এই সংজ্ঞাকে গ্রহণযোগ্য মনে করলেই বিভ্রান্তির সৃষ্টি হতে বাধ্য। তাহলে কি গ্রামীণ সমাজের অন্তর্ভুক্ত অন্যান্য জীবিকার সঙ্গে যুক্ত লোকেরা লোকসংস্কৃতির আয়ত্তাধীন নয়? এমন সিদ্ধান্ত যদি নেয়া হয় কৃষিসমাজের বাইরে থাকা মানুষেরা যে সংস্কৃতির ধারক-বাহক তাকে লোকসংস্কৃতি বলা যাবে না। তাহলে ভাটিয়ালি, বাউল গান, সাঁওতালি ও ছৌ নাচ, লোকসংস্কৃতির অনিবার্য অঙ্গ হিসাবে কীভাবে মর্যাদা পেয়েছে? এরা জীবিকার সূত্রে সকলে কৃষক নাও হতে পারে। সংস্কৃতির জন্ম যেভাবে এবং যেখানে হয়ে থাকুক, তার ধারক ও বাহক এক বিশেষ শ্রেণির মানুষরা হবে এমন সীমাবদ্ধতা মেনে নিতে চাইলে বাস্তব পরিস্থিতিকে অস্বীকার করা হবে। লোকসংস্কৃতির ধারা আজ শুধু গ্রামসমাজেই প্রবাহিত নয়, তার ঢেউ এসে আছড়ে পড়েছে শহুরে সমাজেও। শহরের এলিট সংস্কৃতি লোকসংস্কৃতির প্রভাব থেকে আদৌ মুক্ত নয়। সংস্কৃতির যে তিনটি স্তরের উল্লেখ করেছেন লেখক—আদিবাসী সংস্কৃতি, লোকসংস্কৃতি ও সংস্কৃতি—তাদের স্বতন্ত্র অস্তিত্বের চিহ্ন খুঁজে পাওয়া গেলেও তাদের বিভাজন রেখা কালের নিয়মেই অত্যন্ত অস্পষ্ট হয়ে উঠেছে। এই প্রসঙ্গে লেখকের যুক্তি বেশ আন্তরিকতার সঙ্গে গ্রহণযোগ্য। প্রায় পঞ্চাশ বছর আগেই কৃষক সম্মেলনে তিনি ম্যাকবেথ নাটকের অভিনয় দেখেছেন, শুনেছেন রবীন্দ্রসঙ্গীত ও নজরুলগীতি। চিৎপুরের যাত্রাপালার দর্শক এখন গ্রামের মানুষ।

'লোকসংস্কৃতি মৌখিক, স্মৃতি ও শ্রুতিবাহিত; ঐতিহ্য তার প্রাণশক্তি এবং তা বংশপরম্পরায় প্রবাহিত।' লেখকের এই উপলব্ধিকে মেনে নিতে কারোরই কোনও সংশয় থাকা উচিত নয়। দক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদার যে রূপকথার গল্পগুলি আমাদের উপহার দিয়েছেন সেগুলি তিনি সংগ্রহ করেছেন পশ্চিমবাংলার বিভিন্ন গ্রাম থেকে। রবীন্দ্রনাথের সংগৃহীত ছেলেভোলানো ছড়া ও খালেদ চৌধুরীর সংগৃহীত লোকসংগীত একই ঐতিহ্যের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। মুদ্রিত আকারে পাওয়া যায়নি, সেই কারণে রচয়িতাদের নামও অজ্ঞাত।

সামাজিক সংস্কৃতি নির্মাণে বুদ্ধির ভূমিকাই প্রধান। নিরক্ষর গ্রামীণ সমাজে উদ্ভূত লোকসংস্কৃতির নির্মাণে এক শ্রেণির মানুষের অবদানকে স্বীকার করে নিতে হয় যারা অন্যান্যদের তুলনায় বুদ্ধিশক্তিতে অগ্রণী ছিল। তাদের চিন্তাচেতনায় প্রতিফলিত হয়েছে সমসাময়িক সমাজজীবন, প্রকৃতির অফুরন্ত সৌন্দর্য, নান্দনিক বোধ। বর্তমানেও সেই বিশেষ শ্রেণির উপস্থিতি লক্ষ করা যায় যাদের বুদ্ধিজীবী হিসাবে মর্যাদা দেওয়া হয়। লেখক এই চিরন্তন সত্যকে প্রত্যক্ষ করেছেন ভারতের উত্তর-পূর্বাঞ্চলে মেঘালয় রাজ্যের আদিবাসী খাসিসমাজে। সেখানে পুরোহিতরা বুদ্ধিজীবীর ভূমিকা গ্রহণ করে। সামাজিক ক্রিয়াকাণ্ড, ধর্মাচরণ, পুরাণ, বিশ্বদর্শন ও আচারবিধি ইত্যাদি ক্ষেত্রে তাদেরই নিয়ন্ত্রণক্ষমতা স্বীকৃত। লেখক সৌমেন সেন সঙ্গত কারণেই প্রশ্ন তুলেছেন মঙ্গলকাব্য কি লোকসাহিত্য? যদিও আশুতোষ ভট্টাচার্য, মঙ্গলকাব্যের অন্তর্ভুক্ত মনসামঙ্গলকে লোকসংস্কৃতির মর্যাদা দিয়েছেন। তাঁর যুক্তি যেসব উপকরণের ভিত্তিতে সমগ্র বাংলায় একটি অখণ্ড লোকসংস্কৃতি গড়ে উঠেছিল, মনসামঙ্গল তাদেরই অন্যতম। এখানে 'সমগ্র বাংলা' ও 'অখণ্ড লোকসংস্কৃতি'—এই

শব্দগুলিকে লক্ষ করলে বোঝা যায় লোকসংস্কৃতি কোনও নির্দিষ্ট আঞ্চলিক সীমাবদ্ধতার মধ্যে আবদ্ধ হয়ে থাকেনি। সুতরাং মঙ্গলকাব্যের রচয়িতারা যদি উচ্চবর্ণের মানুষও হন, তা নিয়ে চিন্তার ক্ষেত্রে কোনও সংকট সৃষ্টি হওয়া অবধারিত নয়। যদিও লোকসংস্কৃতির প্রচলিত সংজ্ঞা অনুযায়ী সৌমেন সেন বলেছেন, নিরক্ষর নিম্নবর্ণের মানুষজন যদি 'লোক' হয়, জীবনযাপনের কথোপকথনের ভাষা যদি লোকসাহিত্যের প্রধান অবলম্বন হয়, তাহলে কোনও মঙ্গলকাব্যকে লোকসাহিত্যের মর্যাদা দেওয়া যায় না। কিন্তু এক্ষেত্রে প্রশ্ন একটাই লৌকিক উপকরণ নিয়ে যদি কোনও উচ্চবর্ণের মানুষ কাব্য রচনা করেন, বিশুদ্ধ বাংলা ব্যবহার করেন, তাহলেও কি তাকে লোকসাহিত্য বলা যাবে না? অত্যাচারী জমিদার হাসন রাজা রচিত বাউল গানগুলিকে কি লোকসংস্কৃতির পর্যায়ভুক্ত করা যাবে না? হেমাঙ্গ বিশ্বাস, নির্মলেন্দু চৌধুরী, আব্বাসউদ্দিন প্রমুখ কৃতী শিল্পীরা যে গানগুলি গেয়েছেন ও সুরসংযোজন করেছেন সেগুলি কি লোকসঙ্গীত নয়?

প্রবাদ প্রসঙ্গে সৌমেন সেন যে আলোচনা করেছেন তা অত্যন্ত হৃদয়গ্রাহী। অধিকাংশ প্রবাদের জন্ম দিয়েছে মেয়েরা তাদের দৈনন্দিন জীবনের অভিজ্ঞতাকে ভিত্তি করে, এ ধরনের প্রচলিত মতকে তিনি ভ্রান্ত প্রমাণ করেছেন। বেশ কিছু প্রবাদের উল্লেখ করে তিনি দেখিয়েছেন প্রবাদে কীভাবে প্রতিফলিত হয়েছে পুরুষপ্রাধান্যের ভূমিকা। দু'তিনটি উদাহরণও দেওয়া যেতে পারে লেখকের মতামতকে আরও গ্রহণযোগ্য করে তুলতে। 'মাগ জব্দ কিলে, হলুদ জব্দ শিলে' 'পুরুষের বল টাকা, নারীর বল শাঁখা' 'মরদের জিদে বাদশা, মেয়ের জিদে বেশ্যা।' এইসব প্রবাদগুলিই প্রমাণ করে দেয় সমাজে নারীরা কত অবহেলিত ছিল।

লোকসংস্কৃতি রাজনৈতিক মতাদর্শ প্রচারে ও সমাজ পরিবর্তনে ব্যবহৃত হয়েছে। এই সংস্কৃতিকে ভিত্তি করে গড়ে উঠেছে 'জাতিসত্তা, জাতীয়তাবাদ ও আঞ্চলিকতাবাদ'। আফ্রিকা-এশিয়ার বিভিন্ন অঞ্চলগুলিতে যেমন এর ব্যাপকতা লক্ষ করা যায়, তার প্রভাব পড়েছে ভারতবর্ষেও। সিপাহি বিদ্রোহের আমল থেকেই জাতীয়তাবাদী মতাদর্শ প্রচার করতে সৃষ্টি হয়েছে, লোককাহিনি ও লোকসঙ্গীত। রচয়িতাদের নাম অনেক সময়েই জানা যায়নি। চারণকবিরা সাধারণ মানুষের মধ্যে ছড়িয়ে দিয়েছেন এইসব সঙ্গীত প্রতিবাদী আদর্শে অনুপ্রাণিত করে তুলতে। বঙ্গভঙ্গ বিরোধী ও ফ্যাসিবাদ বিরোধী আন্দোলনে লোকসংস্কৃতি অন্যতম হাতিয়ার হয়ে উঠেছে। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদী শাসনের হাত থেকে দেশকে মুক্ত করার সংগ্রামেও এই সংস্কৃতির ভূমিকাকে অস্বীকার করা যায় না। নির্বাচনী রাজনীতিতে অংশগ্রহণকারী দলগুলি বিশেষ করে বামপন্থী মতাদর্শে বিশ্বাসী দলগুলি প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে লড়াই করতে একসময়ে ছড়াকেই অস্ত্ররূপে ব্যবহার করত। এইসব আন্দোলনে গণনাট্য সংঘের ভূমিকাকে উপেক্ষা করা যায় না।

রবীন্দ্রনাথ, দীনেশচন্দ্র সেন, লালবিহারী দে, শরৎচন্দ্র মিত্র প্রমুখকে বৈজ্ঞানিক অর্থে লোকায়নিকের মর্যাদা দিতে দ্বিধা করেছেন কেউ কেউ। কিন্তু এঁদের সংগ্রহ ভবিষ্যৎ গবেষণার ভিত্তি প্রস্তুত করেছে এ কথা কেউই অস্বীকার করতে পারেননি। তাঁরা যখন সংগ্রহকার্যে আত্মনিয়োগ করেছিলেন তখন তাঁদের একমাত্র লক্ষ্য ছিল অগোচরে থাকা সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যকে উদ্ধার করা। ভবিষ্যতে প্রকৃত লোকায়নিকের মর্যাদা পাবেন কি না এ নিয়ে ভাবার অবকাশ তাঁদের ছিল না। সুতরাং তাঁদের যোগ্য মর্যাদা দিতে কোনও দ্বিধা থাকা উচিত নয়।

বিশ্বায়নের প্রভাবে এলিট সংস্কৃতির অস্তিত্ব বিপন্ন হয়ে পড়েছে। ঐতিহ্য থেকে বিচ্যুত হয়ে যে সংস্কৃতির জন্ম হয়েছে তার মধ্যে বিকৃতিই প্রধান হয়ে উঠেছে। আর্য থেকে শুরু করে এদেশ যতবারই বিদেশি শক্তির দ্বারা আক্রান্ত হয়েছে ততবারই বদলেছে মূল সংস্কৃতির ধারা। কিন্তু লোকসংস্কৃতির ঐতিহ্যকে বাঁচিয়ে রেখেছিল গ্রামীণ মানুষেরা। তাদের কোনওভাবেই বিভ্রান্ত করা যায়নি। আজও সাধারণতন্ত্র দিবসে দিল্লির রাজপথে যে শোভাযাত্রা বেরয় সেখানে অংশগ্রহণকারী বেশ কয়েকটি রাজ্য লোকসংস্কৃতিকেই প্রাধান্য দেয়। বর্তমানে কিছু পরিবর্তন লক্ষ করা গেলেও লোকসংস্কৃতিই পারবে দেশের ঐতিহ্যকে রক্ষা করতে। সেখানেই বেঁচে আছে জাতির অস্তিত্ব। মূল্যবোধের চরম অবক্ষয়ের সময়ে লেখক সৌমেন সেন এই গ্রন্থখানি পাঠকসমাজকে উপহার দিয়ে লোকসংস্কৃতি সম্পর্কে ওয়াকিবহাল করার যে প্রচেষ্টা চালিয়েছেন তার প্রশংসা করতেই হয়।

লোকসংস্কৃতির আত্ম-অপর ও অন্যান্য—সৌমেন সেন/ পুনশ্চ, কলকাতা-৯/১০০.০০

সংগীত বিষয়ে কিছু ভাবনা

অতনুশাসন মুখোপাধ্যায়

আবদুশ শাকুর লিখিত "সংগীত সংগীত" বইটি পড়তে পড়তে বারেবারেই মনে হয়েছে লেখক তাঁর পূর্ব নির্ধারিত উপসংহারে পৌঁছতে গিয়ে সবসময় বিশ্লেষণ এবং যুক্তির প্রতি সুবিচার করেননি। সে কথায় যাবার আগে বইটি সম্বন্ধে আরও কতকগুলো ধন্দর কথা বলা দরকার। বইটিতে কোনও ভূমিকা বা ইঙ্গিত না থাকায় বোঝা গেল না এটা কোনও সংকলন জাতীয় গ্রন্থ কি না। অর্থাৎ বিক্ষিপ্তভাবে বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় প্রকাশিত কতকগুলি প্রবন্ধকে সংকলিত করে যেমন বই প্রকাশ করা হয়ে থাকে, এ বই সেই জাতীয় কি না। এ প্রশ্ন মনে আসে কারণ সংকলিত গ্রন্থে একই ধরনের একাধিক প্রবন্ধ স্থান পায় প্রায়ই, এবং একই বক্তব্য একাধিক প্রবন্ধে উপস্থাপিত হতে দেখা যায়। তাতে পুনরুক্তি দোষ সবসময় ধরা হয় না। কিন্তু আলোচ্য বইটি যদি সংকলন গ্রন্থ না হয়ে থাকে, তবে ত্রুটি হিসাবে বলতে হয় এ বইতে একই ধরনের পরিচ্ছেদের একাধিকবার উপস্থাপনা করা হয়েছে, একই ধরনের বক্তব্য ফিরে ফিরে এসেছে এবং বইয়ের মূল সুরের নিরিখে দু'একটা পরিচ্ছেদকে প্রয়োজনীয় বলেও মনে হয়নি।

রবীন্দ্রনাথ ও রবীন্দ্রসংগীত প্রসঙ্গে লেখক যেন রবীন্দ্রনাথকে বাকযুদ্ধে হারাতে বসেছেন। দিলীপকুমার রায় এবং ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় মাঝপথে রণে ভঙ্গ দিয়েছেন কিন্তু লেখক সন্ধি করতে রাজি নন (পৃষ্ঠা—১১)। রবীন্দ্রনাথের গানে গায়ককে আরও বেশি স্বাধীনতা দেবার সপক্ষে লেখক সরব। তাতে আপত্তি করার কিছু নেই, স্বাধীন ভাবনা-চিন্তায় অবশ্যই বাধা দেবার কোনও কারণ নেই। কিন্তু লেখকের কতকগুলো মন্তব্য এ বইয়ের ঠিক কী উন্নতিসাধন করেছে বোঝা গেল না। ২৩ পৃষ্ঠায় পাই, কুমারপ্রসাদের প্রতি কটাক্ষ। হিসাব মতো কুমারপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের বয়স তখন বছর আষ্টেক মাত্র, তাঁর পিতা ধূর্জটিপ্রসাদ ঘটনাটির উল্লেখ করেননি, উপরন্তু মুক্তবিহারী খেয়ালের পরে রাশভারি ধ্রুপদ জমে না, অতএব লেখকের কাছে মিলে যায় অকাট্য প্রমাণ—১০২ ডিগ্রি জ্বর নিয়ে রবীন্দ্রনাথ ধ্রুপদ গেয়ে সবাইকে অবাক করে দিয়েছিলেন, এটি অলীক কর্ণরোচক কাহিনি মাত্র। এ কথাটা কড়া ভাষায় ঘোষণা করার আগে লেখক মাথায় রাখলেন না, সে আসরে শ্রীকৃষ্ণ রতনজনকর ছিলেন নির্ধারিত শিল্পী এবং রবীন্দ্রনাথ একজন শ্রোতা। রতনজনকরের গান শেষ হলে রবীন্দ্রনাথকে গান গাওয়ার জন্য যে অনুরোধ করা, সেটি কি নিয়মিত গায়ক রবীন্দ্রনাথকে অনুরোধ করা? নাকি রবীন্দ্রনাথ তাঁর সামগ্রিক প্রতিভার জোরে রবীন্দ্রনাথ বলেই এমন অনুরোধ তাঁর কাছে? মানুষটা আর পাঁচজনের মতো হলে কি আদৌ তিনি গান শোনাবার জন্য অনুরুদ্ধ হতেন? তাহলে খেয়াল আগে হবে, না ধ্রুপদ আগে—এ ধরনের ব্যাকরণগত সূত্র ধরে কিছু প্রমাণ করার চেষ্টা এক্ষেত্রে নেহাত-ই নঞর্থক মনোভাবের পরিচায়ক নয় কি? আর তার থেকেই সাবধানবাণী, কুমারপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের স্মৃতিচারণ কেউ যেন বিশ্বাস না করেন! বিশেষত যখন চিঠিপত্রের ফাঁকে ধূর্জটিপ্রসাদ রবীন্দ্রনাথের গান গাওয়ার কথা উল্লেখ করেননি!

খেয়ালের ওস্তাদদের রবীন্দ্রনাথ শুধু তাঁর গানে ভিড়তে দেননি তাই নয়, লেখকের মতে খেয়ালের অলঙ্কার আসলে রবীন্দ্রনাথের মনে কমপ্লেক্স সৃষ্টি করেছিল। তাই শাবকের নিরাপত্তার জন্য আশঙ্কাতুর মাতার মতো রবীন্দ্রনাথ ধ্রুপদের সঙ্গে আত্মীয়তা পাতিয়েছিলেন, আর খেয়াল-টপ্পা-ঠুংরির কবলে পড়ার ভয়ে তাঁর গানকে আগলে রেখেছিলেন খেয়াল-টপ্পার অসামান্য রূপকারদের হাত থেকে (পৃষ্ঠা—২৭)। লেখক ভাবেন, তাই বুঝি আমির খাঁ হেমন্ত মুখোপাধ্যায়ের রবীন্দ্রসংগীতের তারিফ করলেন, নিজে সে গান গাইলেন না! দিলীপকুমার রায়ের মন্তব্য—"যে কারণে রবীন্দ্রসংগীত হয়ে যাবে মাঝারি শিল্পীর সম্পত্তি"—তুলে ধরে বোঝাতে চাইলেন রবীন্দ্রনাথ আর একটু খেয়ালপন্থী হলে এবং সুরের প্রয়োগে নিজে কম মাথা ঘামিয়ে শিল্পীকে সুযোগ দিলে ভাল করতেন। সত্যজিৎ রায় এবং সুধীর চক্রবর্তীর উক্তি তুলে লেখক জানান রবীন্দ্রসংগীতে জাতরক্ষা করার চেয়ে চরিত্ররক্ষা করাটাই বড় হয়ে দাঁড়িয়েছে। সত্যজিৎ রায়ের বক্তব্য স্বয়ং রবীন্দ্রনাথের ভাবনা নির্দেশক। "বঙ্কিমের উপন্যাস রচনার মতোই রবীন্দ্রনাথের গীতরচনার ধারণাটা আসলে ইউরোপীয়"—সত্যজিৎ রায় তাই রবীন্দ্রনাথের মধ্যে খুঁজে পান স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য। সেই স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যটুকু না থাকলেই বুঝি লেখক খুশি হন। তাই সুধীর চক্রবর্তীর যে উক্তির লক্ষ্য রবীন্দ্রসংগীতের ন্যাসরক্ষকগণ,

যাঁদের কারণে রবীন্দ্রসংগীত কোনও দিনই আপামর জনগণের সামগ্রী হতে পারে না বলে তাঁর বিশ্বাস, সেই উক্তি লেখক তুলে ধরেন রবীন্দ্রসংগীতের দুর্দশার কারণ বোঝাতে।

রবীন্দ্রসংগীতে কতটা কী সুর অতিরিক্ত আমদানি হলে উন্নততর রবীন্দ্রসংগীত মিলত এসব বিতর্ক নতুন নয়। সত্যজিৎ রায়ের কথাটাই ঠিক। এক-একটি বিশেষ ভাবকে বিশেষ কথা বিশেষ সুর-ছন্দে প্রকাশ করার দিকেই রবীন্দ্রনাথের লক্ষ্য ছিল, তাঁর গানের স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য তাতেই। গাইয়েকে খোলনোলচে সুর বদলে দেবার স্বাধীনতা রবীন্দ্রনাথ দেননি, সেটা তাঁর দূরদৃষ্টিরই পরিচায়ক। তাঁর জীবদ্দশাতেই কোনও কোনও শিল্পী কিছু কিছু স্বাধীনতা ভোগ করেছেন। রমেশ বন্দ্যোপাধ্যায়, জ্ঞানেন্দ্রপ্রসাদ গোস্বামী, মালতী ঘোষাল প্রমুখ শিল্পীদের পুরনো রেকর্ডে শোনা যায় কোথাও কোথাও তাঁরা ছোট আকারে আলাপ-বিস্তার পর্ব ঢুকিয়ে রবীন্দ্রসংগীত পরিবেশন করেছেন। ওটুকু না থাকলে গানগুলোর পরিবেশন মাঠে মারা যেত যদি কারুর মনে হয়, তিনি তা মনে করার স্বাধীনতা ভোগ করতেই পারেন। সাম্প্রতিককালে বিশ্বভারতী মিউজিক বোর্ডের বাড়াবাড়ি নিয়ে অনেক আলোচনা হয়ে গেছে। এর কতটা কম থাকলে ব্যাপারটা সুখকর হত তা নিয়ে অবশ্যই ভাবনা-চিন্তার অবকাশ ছিল। কিন্তু সাংগীতিক ধারাবাহিকতা রক্ষায় অনুশাসনের প্রয়োজনীয়তা দূরদর্শী রবীন্দ্রনাথ চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছেন। তাই এখনও পর্যন্ত রবীন্দ্রনাথের গান 'রবীন্দ্রসংগীত' আইডেনটিটি হারায়নি। আর এই অনুশাসনেরই অভাবে বাংলার অন্য এক উৎকৃষ্ট সৃষ্টি নজরুলগীতির আজকের আদত পরিচয় অমুক শিল্পীর গাওয়া অমুক নজরুলগীতি।

ওস্তাদরা অথবা পণ্ডিতেরা স্বচ্ছন্দে রবীন্দ্রসংগীত গাইতে পারেননি বলে কাতরতা কীসের? রবীন্দ্রসংগীত গাইতে পারেননি বলে ওস্তাদ বা পণ্ডিত হবার পথে বাধা পেয়েছেন কোনও শিল্পী এমন নজির আছে নাকি? তাহলে প্রয়োজনটা কোন পক্ষের? ওস্তাদ-পণ্ডিতের, নাকি রবীন্দ্রসংগীত জগতের? প্রথমে ওস্তাদ-পণ্ডিতের পক্ষ থেকে বিষয়টার বিচার করা যাক। রবীন্দ্রসংগীতে আসুন না তাঁরা। বাধা কোথায়। নাকি তাঁরা আসবেন বলে রবীন্দ্রসংগীতের চরিত্র বদলে তাঁদের পছন্দমতো অবস্থার সৃষ্টি করতে হবে? ব্যাপারটা যেন এইরকম—ফুটবল খেলোয়াড় ক্রিকেটের মাঠকে ধন্য করতে চেয়েছেন, তাই লেগ-বিফোর-উইকেট নিয়ম তুলে দাও, খেলোয়াড় যাতে প্রয়োজনে পা দিয়ে মেরে বাউণ্ডারি—নিদেনপক্ষে এক-আধটা সিংগল্‌স সংগ্রহ করতে পারেন। আমাদের প্রত্যাশিত বড়মাপের কোন শিল্পী রবীন্দ্রসংগীতে বাড়তি অলঙ্কার-গিটকিরির প্রয়োগের মধ্য দিয়ে কবে কোথায় রবীন্দ্রসংগীতকে সংগীতজগতের সর্বোচ্চ আসনে অধিষ্ঠিত করতে সমর্থ হতেন জানি না, তবে তাঁদের সম্ভাব্য প্রবেশপথে একটা জিজ্ঞাসার চিহ্ন স্থাপন করে রবীন্দ্রনাথ যে বিচক্ষণতার কাজটি করে গেছেন তার সুফল পাওয়া গেছে এইভাবে—বহু বেনোজল বড়মাপের শিল্পীর ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়ে রবীন্দ্রসংগীতকে একটি লীলাক্ষেত্রে পরিণত করতে পারত। যেটি ঘটেনি বলে আজও রবীন্দ্রনাথের গান 'রবীন্দ্রসংগীত' বৈশিষ্ট্য বহনকারী। এই মহান আদর্শ রক্ষায় দিলীপকুমার রায়ের মতো (অথবা আমির খাঁর মতো কল্পিত রবীন্দ্রসংগীত গায়ক) শিল্পীবৃন্দ না হয় শহিদই হলেন! দ্বিতীয় বিচার, রবীন্দ্রসংগীত-জগতের পক্ষ থেকে। সুধীর চক্রবর্তীর উক্তি তুলে লেখক স্মরণ করিয়ে দেন রবীন্দ্রসংগীত আপামর জনসাধারণের গান কোনও দিনই হবে না। প্রচ্ছন্নভাবে এর পিছনের কারণগুলির লেখক বিস্তারিত বর্ণনা দিয়েছেন। এক কথায় শিল্পীর অবাধ স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করাই এর জন্য দায়ী। প্রশ্ন একটাই, পামরজনকে খুশি রাখতে রবীন্দ্রসংগীতে শুধুমাত্র খেয়ালের ওস্তাদ বা পণ্ডিতদের প্রবেশাধিকারই কি যথেষ্ট ছিল? তাঁদের জন্য তানকর্তবের আর সুরবিহারের স্বাধীনতার অভাবই কি পামরজন থেকে রবীন্দ্রসংগীতকে সরিয়ে রাখল? "প্রণিধানযোগ্য" সুধীর চক্রবর্তীর এই মন্তব্যের সঙ্গে লেখক একমত হতে পারেন। কিন্তু ধন্দ তবু থেকেই যায়। পামরজনের কাছে ছড়িয়ে দিতে এরপর যদি কথা উঠত—কিছুটা বোম্বাই মশলা, রক, হাওয়াইয়ানেরও মিশেল হোক রবীন্দ্রসংগীতে! লেখকের কাছে শেখা কথাটাই বলা যাক—থামাটা কোথায়? নাকি থামার দরকার নেই? পানশালায় ঢুকে পড়ুক রবীন্দ্রসংগীত। তা বেচারা অনিচ্ছুক রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে টানাটানি কেন!

গানে সুরই প্রধান, বাণী নয় প্রমাণ করতে ৫৫ পৃষ্ঠায় লেখক বলেন—রবীন্দ্রবাণী আমরা ভুলে যাই, ভুলি না রবীন্দ্রসুর। প্রায়ই আমরা একে অন্যকে জিজ্ঞেস করতে থাকি—কথাগুলি কি-না ছিল? কথাগুলি যাঁদের জিজ্ঞেস করি—তাঁদের মধ্যে লেখক এমন কাউকে দেখেননি কি যাঁরা কুণ্ঠিত হয়ে বলেন—গলায় সুর নেই, এবং সোৎসাহে মুখস্থ বলে যান রবীন্দ্রবাণী এক গানের থেকে আরেক গানের? গানের কথা যাদের মুখস্থ থাকে না তাদের সুর কণ্ঠস্থ থাকে এমন উদাহরণও আছে বৈকি। তবে খেয়াল করলে দেখা যাবে বহু ব্যক্তির যে সুর কণ্ঠস্থ তা অনেকাংশে অশুদ্ধ। কিন্তু যেহেতু মোটামুটি একটা সুর হলেই অনেকের কানে সুর হচ্ছে বলে ঠেকে, তাই রবীন্দ্রসুর অশুদ্ধভাবে গলায় উঠে

এলেও সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির মগজে সেটি রয়েছে অভীধা পেতে পারে। কিন্তু রবীন্দ্র বাণীতে দু'একটা শব্দ এদিক-ওদিক হলে তার বিচারের মান অন্যরকম। কারণ এখানে পড়তে জানলেই বোঝা যায় সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি ভুলে বসেছেন কতটা। এই একই পরিচ্ছেদে (স্বর সুর শব্দ ও সংগীত) ৬৩ পৃষ্ঠায় লেখকের বক্তব্য—"রবীন্দ্রসংগীত এতখানি সুরবিরল শুধু এ-কারণে যে, রবীন্দ্র গীতিকাব্য বেজায় বেশি অর্থবহুল, সারগর্ভ ও সম্পন্ন। ফলে লোকে রবীন্দ্র-লিরিক উপভোগ করে দিবাস্বপ্ন দেখে যে সংগীত উপভোগ করল।" লেখক একবার বলেন, সুর ও বাণীর সেতুবন্ধ রবীন্দ্রসংগীতে ঘটেনি। সুরই প্রধান হয়ে দাঁড়ায় কারণ আমরা রবীন্দ্রসুর ভুলি না, ভুলে যাই বাণী। অন্যদিকে বলেন, সুরবিরল রবীন্দ্রসংগীত আসলে লিরিকসর্বস্ব। সুরবিরল সুরই অথচ মগজে থেকে গেল, বেমালুম ভুলে গেলাম বাণী!

সংগীতে তৃতীয় পক্ষ পরিচ্ছেদে—প্রাতিষ্ঠানিক নিয়ন্ত্রণ বাড়াবাড়ি রূপ গ্রহণ করতে পারে—লেখকের এই আশঙ্কা অবশ্যই ভেবে দেখার দাবি রাখে। প্রাতিষ্ঠানিক নিয়ন্ত্রণে রাজনীতি, মোড়লি, আমলাতন্ত্র (পৃষ্ঠা ৭৫) কমানোর প্রয়োজনও আছে নিশ্চয়ই। কিন্তু গায়ক আর নিয়ন্ত্রণের মধ্যে কোনও সমতা আনার চেষ্টা না করে লেখক মনে করেন গায়কের বন্ধনহীন স্বাধীনতার বাহুল্য শ্রোতৃহৃদয় থেকে আপনিই ঝরে গেছে। যেটুকু সাজাই-বঞ্চিত বোঝাই সেটুকু কালের পরম্পরায় জঞ্জাল বলেই বর্জিত হয়ে যাবে, উজ্জ্বলরূপে থেকে যাবে কেবল যেটুকু সাজাই-মণ্ডিত বোঝাই। লেখকের আশাই যেন মহাকালের হিসাবে ঠিক বলে প্রমাণিত হয়। কিন্তু বাস্তব কি লেখকের কথায় সায় দেয়? নজরুলগীতি নিয়ন্ত্রণহীন হয়ে সত্যিই কি সমৃদ্ধ হয়েছে? বরং গায়কদের তাড়নায় যথাযোগ্য প্রাপ্তি থেকে শ্রোতৃমনে বঞ্চিতই থেকে গেছে।

আলোচ্য গ্রন্থের 'গ্রন্থকার বনাম শাস্ত্রকার', 'সংগীতশাস্ত্রী দেবদেবী' ইত্যাদি পরিচ্ছেদগুলিতেও পূর্বনির্ধারিত উপসংহারে পৌঁছনোর লক্ষ্যে লেখকের সরাসরি পা চালিয়ে দেবার ইঙ্গিত স্পষ্ট। ঘুরে ফিরে লেখক প্রমাণ করতে চান আমির খসরু যেহেতু একটা 'নীরস শিল্পকে' 'সরস শিল্পে' রূপান্তরিত করলেন তাই শার্ঙ্গদেব ব্যতীত (যদিও তাঁর 'প্রগতিপন্থী' মতবাদের ফলে 'নীরস শিল্প' তখনও পর্যন্ত নীরসতা কাটিয়ে উঠতে পারেনি বলেই ধরে নিতে হয়) আগের কোনও কিছুই আর মনে রাখার প্রয়োজন নেই। সংগীতের আগের সবটাই পুরাকালীন এবং পৌরাণিক একথা কোনও নির্দিষ্ট মতে বিশ্বাসী ব্যক্তির কাছে যতটা গ্রহণযোগ্য, ইতিহাসের বিশ্লেষণে আগ্রহী ব্যক্তির কাছে ততটা নয়। ঠিক কী ধরনের পশ্চাদপট থেকে আমির খসরুর মতো এক ক্ষণজন্মা সংগীতজ্ঞ ভারতের মাটিতে বিকাশ লাভ করলেন তার যথাযথ বিচার না হলে আমির খসরুর ওপরই অবিচার করা হয় সবথেকে বেশি। আর সেই অবিচারের সূত্রপাত ঘটে লেখক কথিত ভারতীয় সংগীতের আদিপুরুষ শার্ঙ্গদেবের ক্ষেত্রেও। S. A. A. Rizvi লিখিত The wonder that was India, Part II গ্রন্থে নায়ক গোপালের সঙ্গে আমির খসরুর বহুবার মিলন ঘটেছিল এমন উল্লেখ আছে। Rizvi বলছেন, "Amir Khusraw seized the opportunity to study the Deccani music of the Karnataka school, which preserved the musical tradition of ancient India with greatest purity. Among the decanni migrants, the most prominent was Naik Gopal. The literary sources recount several stories of the encounter between him and Amir Khusraw. What emerges is the fact that Amir Khusraw could successfully copy and adapt the most difficult Deccani classical music to his own technique and style." স্বভাবত কৌতূহল জাগে, আমির খসরুপূর্ব সংগীত ঠিক কেমন ছিল এবং হিন্দুস্থানি সংগীতের আমির খসরুকৃত সংস্কার তাঁর পূর্বসূরিদের গানের তুলনায় বৈপ্লবিক পরিবর্তন ঘটিয়েছিল কতটা। প্রমাণ সংগ্রহ করা এক্ষেত্রে এত সহজ নয় যা থেকে নিশ্চিতভাবে কিছু বলা চলে। তবে বিষয়টির যথাযথ বিশ্লেষণ হওয়া প্রয়োজন। শিক্ষিত বাঙালির ঘরে ঘরে আদৃত নীহাররঞ্জন রায়ের বাঙালির ইতিহাস—আদিপর্বে লোচনের রাগতরঙ্গিনীর রচনাকাল সম্বন্ধে বলা আছে,

".....তাঁহার কালে অন্য পণ্ডিতদের রচিত আরও অনেক সংগীতশাস্ত্রের কথা লোচন ইঙ্গিত করিয়াছেন, কিন্তু সে-সব গ্রন্থের একটিও আজ পর্যন্ত আবিষ্কৃত হয় নাই। বস্তুত, লোচনের রাগতরঙ্গিনী এবং শার্ঙ্গদেবের সংগীত-রত্নাকরের চেয়ে প্রাচীনতর কোনও সংগীত-গ্রন্থের কথাই আমরা জানি না।

"লোচনের রাগতরঙ্গিনী-গ্রন্থে দেশী ভাষার গানের নমুনা হিসাবে মৈথিল অপভ্রংশে রচিত শ্রীবিদ্যাপতির মৈথিল গীতি উদ্ধার করা হইয়াছে। তাহা ছাড়া, এই গ্রন্থে আমীর খসরু (ত্রয়োদশ শতকের শেষ, চতুর্দশ শতকের গোড়ায়) বা তাহার কিছু পরে প্রচলিত ইমন্, ফির্‌দোস্ত্ প্রভৃতি রাগের নাম আছে। সেইহেতু পণ্ডিতেরা অনেকে মনে করেন, লোচন চতুর্দশ শতকের আগের লোক হইতে পারেন না। কিন্তু আচার্য ক্ষিতিমোহন সেন মহাশয় প্রমাণ করিয়াছেন, লোচন-পণ্ডিত

বল্লালসেনের আমলের লোক ছিলেন এবং ১০৮২ শকাব্দ = ১১৬০ খ্রীষ্ট বৎসরে বল্লালসেনের রাজত্বের প্রথম বৎসরে লোচন-পণ্ডিত রাগতরঙ্গিনী-গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন; বিদ্যাপতির গান বা ইমন্ ও ফির্‌দোস্ত-রাগের কথা প্রভৃতি পরবর্তীকালে এই গ্রন্থে প্রক্ষিপ্ত হইয়াছে। গ্রন্থের পুস্পিকা শ্লোকটি সুস্পষ্ট ঃ

ভূজবসুদশমিতশাকে শ্রীমদ্ বল্লালসেনরাজ্যাদৌ।
বর্ষৈকষষ্টিভোগে মুনয়স্ত্বাসন বিশাখায়াম্।।

এই হিসাবে বল্লালসেনের রাজ্যারম্ভে ১০৮২ শকে এই গ্রন্থ সমাপ্ত হইয়াছিল। ১০৮২ শক = ১১৬০ খ্রীষ্টাব্দে যে বল্লালসেনের রাজ্যারম্ভের কাল তাহা অন্য স্বাধীন ও স্বতন্ত্র সাক্ষ্য দ্বারাও সমর্থিত। আচার্য ক্ষিতিমোহন সেইসব সাক্ষ্যেরও বিশ্লেষণ করিয়াছেন।"

ফিরে আসি আলোচ্য বইয়ের কথায়। লেখক স্তূপীকৃত মেধাহীন সংকলনের তালিকায় ১৬৫০-১৬৭৫ সালের মধ্যে লিখিত বলে লোচন পণ্ডিতের যে রাগতরঙ্গিনীকে অন্তর্ভুক্ত করেন, সে গ্রন্থের মেধাহীনত্ব ইতিহাস সমর্থিত বলে নির্দ্বিধায় মেনে নেওয়া যাচ্ছে না। "স্বর ও স্বরসংস্থান" এবং "জনক ও জন্য-রাগ" শিরোনামে নীহাররঞ্জন রায় যা বলেছেন স্থানাভাবে তার সবটুকুর উদ্ধৃতি দেওয়া গেল না। কিন্তু লক্ষ করার বিষয়, লোচন পণ্ডিতের রাগতরঙ্গিনীর রচনাকাল সত্যিই যদি ১১৬০ খ্রিস্টাব্দ হয়ে থাকে, তবে লোচনের রচনায় মিশ্র ও সংকর রাগ সম্পর্কে আলোচনা, রাগের ঠাট-কাঠামো নিয়ে মতভেদ ইত্যাদি তথ্যাদির পরিপ্রেক্ষিতে অনুমান করা যায় শার্ঙ্গদেব-আমির খসরুপূর্ব সংগীতও যথেষ্ট মেধাপূর্ণ ও ব্যাকরণসম্মত ছিল। অতএব এ সবই পৌরাণিক আখ্যান এবং এ নিয়ে আর মাথা না ঘামালেই চলে এমন মনে করাটা নিতান্তই ব্যক্তিগত অভিরুচির ব্যাপার। A. L. Basham লিখিত The Wonder that was India বইয়ের অষ্টম পরিচ্ছেদে 'The Arts'-এর অন্তর্গত 'Music' বিষয়ের আলোচনায় বলা আছে, "There is some evidence to show that the Āryans knew the heptatonic scale, and the instructions for intoning the hymns of the Sāma Veda show that the style of liturgical singing in Vedic times was rather like that of medieval plain chant, and has been preserved fairly accurately by the brāhmaṇs down to the present day. Between this and the early centuries of the Christian era we have little knowledge of the progress of Indian music, but in the latter period an anonymous writer composed a textbook on drama, music and dancing, which, in accordance with the custom of the time, he attributed to the ancient sage Bharata, and which has survived to this day. The Bhārata Nāṭyaśāstra is our earliest Indian authority on these three arts, and shows that by this time India had a fully developed system of music, which differed little from that of present-day Indian "classical" music."

যে-ব্যক্তি প্রথা অনুযায়ী ভরতের নামে এই গ্রন্থ রচনা করেছিলেন বলে উল্লেখিত হচ্ছে তিনি কি রক্তমাংসের মানুষ ছিলেন? "তাঁহার কালে অন্য পণ্ডিতদের রচিত আরও অনেক সংগীতশাস্ত্রের কথা লোচন ইঙ্গিত করিয়াছেন"—নীহাররঞ্জন রায়ের এই উক্তিটি থেকে রক্তমাংসের সংগীতজ্ঞ ব্যক্তির থাকার সম্ভাবনা কি উড়িয়ে দেওয়া যায়? এখন Basham-এর উক্তিতে যে সংগীতের কথা বলা হল সেই সংগীতের ধারাই যে কর্ণাটী সংগীতে প্রবাহিত হয়েছে, আজকের হিন্দুস্তানি সংগীতে যা পাওয়া যায় তা সেই ধারা অনুযায়ী একেবারেই নয়, এমনটা ঘোষণা করার আগে আরও কিছু প্রামাণ্য ইতিহাসের পাতা উলটিয়ে দেখা দরকার। বিশেষত কর্ণাটী সংগীতকেও যখন প্রাচীন ধারায় পুরোপুরি পাওয়া যাচ্ছে না এবং পিঞ্জল ভি. এ. কে উদ্ধৃত করে আলোচ্য বইয়ের লেখকই যখন বলছেন—দ্রাবিড়ীয় কর্ষণের মিশ্রণ ঘটেছে সেই সংগীতে।

ইতিহাসের দিকে তাকালে লেখকের আরও একটা মন্তব্যে খোঁচা থেকে যায়। সেটি এইরকম—"আমীর খসরু শৃঙ্খলমুক্ত করে শাস্ত্রীয় সংগীতকে উড়ে বেড়ানোর সুযোগ এনে দিলেন, দেবকেন্দ্রিক সংগীতকে মানবকেন্দ্রিক করলেন, পুরোহিতের মন্দির থেকে তাকে নিয়ে এলেন সম্রাটের দরবারে, যেখান থেকে সে এ প্রক্রিয়ায় কালে কালে জনগণের সঙ্গী হতে পারল আমজনতার জলসাঘরেও।" প্রশ্ন এই, সম্রাটের দরবারে সংগীত এর আগে যদি প্রবেশ না করে থাকে তবে বীণা-বাদনরত সমুদ্রগুপ্ত (৩৩৫-৩৭৬ খ্রিস্টাব্দ) মুদ্রায় খোদিত থাকাটা কি নেহাতই একটা বিচ্ছিন্ন ঘটনা? সেটা মেনে নিতে হলেও তো ইতিহাসের সমর্থন চাই।

সংগীত সংগীত—আবদুশ শাকুর/মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা/ ২৫০.০০।

স্বদেশি আন্দোলনে ভদ্রলোক নেতৃত্ব ঃ সাফল্য ও ব্যর্থতা

অমিয়কুমার সামন্ত

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

(৩)

হিন্দু উচ্চবর্ণের বিরুদ্ধে তাদের আন্দোলন ব্যর্থ হওয়ার পর তাদের ক্ষোভ ভিন্ন পথের সন্ধান করছিল। ইতিমধ্যে জাতের নাম 'চণ্ডাল' থেকে নমঃশুদ্র করার চেষ্টাতেও বাধা দিল বর্ণহিন্দুরা। তাই বাধ্য হয়ে হিন্দুধর্মের নিয়ন্ত্রণের বাইরে একটি ভিন্নতর ধর্মমত প্রবর্তনের চেষ্টা করতে হল। বৈষ্ণবধর্মে হিন্দুশাস্ত্রানুযায়ী আচার ও প্রকরণের প্রয়োজনীয়তা নেই বললেই চলে; কেবলমাত্র ভক্তির দ্বারা ঈশ্বরের করুণা লাভ সম্ভব। হিন্দুধর্মের অন্ত্যজশ্রেণির মধ্যে তাই বৈষ্ণব ধর্মের প্রচলন বেশি। নমঃশূদ্রেরা বৈষ্ণব ধর্মের 'কর্তাভজা' সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত। ফরিদপুর জেলার গোপালগঞ্জের হরিচাঁদ বিশ্বাস যে ধর্মবিশ্বাসের প্রবর্তন করেন সেই 'মতুয়া' ধর্মমত বৈষ্ণব ধর্মের দ্বারা গভীরভাবে প্রভাবিত। সম্মিলিত সংকীর্তনের মাধ্যমে 'মতুয়া' মতের প্রচার ও প্রসার করা হয়। হরিচাঁদের পুত্র গুরুচাঁদের সময়েই মতুয়া ধর্মমতের বিস্তৃতি ঘটে।[৩৯] 'মতুয়া' ধর্মের মূল কথা হল, দীনতম ও হীনতম ব্যক্তিদের মধ্যেই ঈশ্বরের বাস। সাধারণভাবে বৈষ্ণব ধর্মে ভক্তি ও আত্মবিলোপকারী বিনতির দ্বারাই ঈশ্বরের করুণা লাভ ঘটে। বৈষ্ণবদের মতে, কলিতে নামই ধর্ম ও আধ্যাত্মিক সাধনার একমাত্র পথ। বৈষ্ণব ধর্মের এই পথনির্দেশক বাণীকে মতুয়া গুরুরা তাঁদের জীবনচর্যার সঙ্গে সঙ্গতি রেখে একটু বদলে নিয়েছেন। তাঁরা বলেন, 'হাতে কাম, মুখে নাম।' সেই সঙ্গে নমঃশুদ্রেরা 'মতুয়া' ধর্মকে সনাতন হিন্দুধর্মের বৃত্তের বাইরে প্রতিষ্ঠা করার উদ্দেশ্যে সেনসাস কমিশনারের নিকট আবেদন জানালেন। সেনসাস কমিশনার সেই অনুমতি দেয়নি। চণ্ডাল নাম ত্যাগ করে, নমঃশূদ্র নাম গ্রহণের আবেদন সরকার গ্রহণ করলেও বর্ণহিন্দুদের প্ররোচনায় পুরাতন 'চণ্ডাল' নামটিও প্রচলিত রাখা হয়।

এই সময়েই জাতের মধ্যে চেতনাবৃদ্ধি ও সংহতি আনার জন্য নমঃশূদ্র-সুহৃদ, নমঃশূদ্র-হিতৈষী, নমঃশূদ্র-সখা, পতাকা ইত্যাদি পত্রিকা প্রকাশিত হতে শুরু করে। এবং জাতের দাবির সমর্থনে ও হিন্দু উচ্চবর্ণের সামাজিক ঘৃণা ও অস্পৃশ্যতার বিরুদ্ধে রচনা প্রকাশিত হতে থাকে। এইটিই ছিল ভদ্রলোকশ্রেণির নেতৃত্বে জাতীয়তাবাদী স্বদেশি আন্দোলনের কাল। নমঃশূদ্রদের ক্ষোভ হিন্দু উচ্চবর্ণ তথা ভদ্রলোকশ্রেণির বিরুদ্ধে। কারণ তাদের হাতেই নমঃশূদ্রদের সামাজিক নিপীড়ন। তারা ১৮৭৩ সাল থেকে অবমাননাকর 'চণ্ডাল' নাম ত্যাগ করে সম্মানজনক নমঃশূদ্র নাম গ্রহণে বাধা সৃষ্টি করে চলেছে, ১৯০১ সালেও তারা বিরুদ্ধাচরণ করে সেনসাস কমিশনারের নিকট দরখাস্ত করেছে।[৪০] তাই হিন্দু ভদ্রলোক নেতৃত্বের প্রতি তাদের সন্দেহ ও সংশয়।

নমঃশূদ্ররা হিন্দু ধর্মের সঙ্গে সম্পর্কচ্ছেদ করতে উৎসাহী হলেও মুসলমানদের সঙ্গে বন্ধুত্বের সম্পর্ক বজায় রাখতে আগ্রহী ছিল। মুসলমানরাও ধর্মান্তর গ্রহণের আগে নমঃশূদ্র বা অনুরূপ সম্প্রদায়ভুক্ত ছিল—এইরূপ একটি ধারণা ছিল বহুল প্রচলিত। তাছাড়া মুসলমানরা প্রতিবেশী—দুই সম্প্রদায়ের জীবনযাত্রা ও জীবনসংগ্রামের ধারা এক এবং অভিন্ন। দুই সম্প্রদায়ই মূলত প্রান্তিক কিংবা ভূমিহীন চাষি। শুধু ভৌগোলিক বা অর্থনৈতিক অবস্থানের দিক থেকেই নয়, ভূস্বামী বর্ণহিন্দুর ঘৃণা তাদের উভয়কেই একাসনে বসিয়েছে। দুই সম্প্রদায়ই অস্পৃশ্য এবং সমান ঘৃণা ও অবজ্ঞার পাত্র। সেই সঙ্গে এই ধারণাও তাদের শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মনে গড়ে উঠেছিল যে ব্রিটিশ শাসন সামাজিক ন্যায় বিচার, আইনের শাসন প্রভৃতির জন্য তাদের পক্ষে অনেক বেশি মঙ্গলদায়ক।

এই পরিপ্রেক্ষিতেই ব্রজেন্দ্রনাথ মণ্ডল নামে এক নমঃশূদ্র ভূস্বামীর সভাপতিত্বে ফরিদপুরের নমঃশূদ্ররা সেক্রেটারি অফ স্টেটের ঘোষণাকে স্বাগত জানান। তিনি, স্বদেশি আন্দোলনের প্রতিবাদের মুখেই, ঘোষণা করেছিলেন যে বঙ্গভঙ্গ একটি অপরিবর্তনীয় সিদ্ধান্ত। সভায় সরকারকে ধন্যবাদ জানিয়ে মুসলমানদের ন্যায় নমঃশূদ্রদেরও শিক্ষা, চাকুরি, ইত্যাদি কয়েকটি ক্ষেত্রে বিশেষ সুবিধা দেওয়ার জন্য আবেদনও জানানো হয়। প্রস্তাবে বলা হয়েছিল যে কেবল ব্রাহ্মণ, বৈদ্য ও কায়স্থদের ঘৃণার জন্যই নমঃশূদ্র সম্প্রদায় পশ্চাদপর জাত হয়ে আছে। তাদের হিন্দু বলে গণ্য করা হলেও তাদের ধর্মমত হিন্দুধর্মের থেকে পৃথক।[৪১]

দু' বছর পরে ১৯০৮ সালের মার্চ মাসে বয়কটের বিরোধিতা করে নমঃশূদ্র সম্মেলন সরকারের নিকট আবেদন

জানাল যে প্রয়োজন মতো বিদেশি দ্রব্য কেনার অধিকারকে যেন সরকার সুরক্ষিত করে। ততদিনে মুসলমানরাও স্বদেশি আন্দোলন থেকে অনেকখানি সরে এসেছে। হিন্দুদের নিম্নবর্গও স্বদেশি আন্দোলন থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়েছিল। বিভিন্ন কারণে জমিদাররাও ধীরে ধীরে আন্দোলনের সঙ্গে সংস্রব ত্যাগ করেন।

মুসলমানদের সঙ্গে নমঃশূদ্রদের এই প্রতিবাদী অবস্থান সম্পর্কে জাতীয়তাবাদী নেতারা যে সম্পূর্ণ উদাসীন ছিলেন তা নয়। ব্যক্তিগতভাবে কিছু কিছু উদ্যোগ নেওয়া হলেও জাতীয় বা প্রাদেশিক স্তরে ধর্ম ও জাতের বিভাজনকে অতিক্রম করে কীভাবে ঐক্য স্থাপন করে জনগোষ্ঠীকে এক উদ্দেশ্যে পরিচালিত করা যাবে সে সম্পর্কে কোনও নির্দিষ্ট নীতি গ্রহণ করা হয়নি। রাখীবন্ধনের আবেগের নীচে ধর্মীয় ও জাত বিভাজনের ক্ষতচিহ্ন ঢাকা পড়ে যাবে এইরকম একটি ভাববাদী আশা পোষণ করতেন জাতীয়তাবাদী ভদ্রলোক নেতারা। স্বদেশি আন্দোলনের সময় প্রাদেশিক বা জেলা সম্মেলনে এই অসম্পূর্ণ ঐক্যের সমস্যা নিয়ে কোনও গভীর আলোচনার প্রমাণ পাওয়া যায় না। বস্তুতপক্ষে জেলা সম্মেলনগুলিতে নিম্নবর্ণের চাষাভুষো মানুষদের সভায় এনে একপ্রান্তে বসিয়ে দেওয়া হত। আলোচনার বিষয় বা ভাষা (১৯০৮ সালের আগে সাধারণত ইংরাজিতেই সভার বেশির ভাগ কাজকর্ম হত) কিছুই তাদের বোধগম্য ছিল না। তারা ছিল জননেতাদের নেতৃত্বকে সংখ্যা দিয়ে বিশ্বাসযোগ্য করার উপায়মাত্র।

জাতভেদ সম্পর্কে বিংশ শতাব্দীর প্রথমদিকে দুটি ধারণা প্রচলিত ছিল। প্রথমটি হল, ইউরোপীয় দৃষ্টিতে জাতব্যবস্থা নিন্দনীয় বলে প্রচারিত হলেও প্রকৃতপক্ষে শ্রমবিভাজন, সামাজিক শৃঙ্খলা ও পারস্পরিক নির্ভরতার জন্য জাতব্যবস্থা সমাজকে একটি স্থিতিশীলতা দান করে। বহুশতাব্দী ধরে প্রচলিত থাকার ফলে ব্যবস্থার মধ্যে অস্পৃশ্যতাসহ নানা বিকৃতি দেখা দিয়েছে। সেগুলিকে বাদ দিলে জাতব্যবস্থা নিতান্ত নিন্দনীয় নয়। দ্বিতীয় মতটি হল, জাতব্যবস্থা একটি বিশেষ উৎপাদন ব্যবস্থার সুপারস্ট্রাকচার মাত্র; একটি বিশেষ আর্থ-সামাজিক অবস্থার সৃষ্টি। ইতিহাসের নিয়মেই সেই সামন্ততান্ত্রিক উৎপাদন ব্যবস্থার পরিবর্তন ঘটলে জাতব্যবস্থারও অবসান ঘটবে—এর জন্য বিশেষ কোনও সামাজিক ও রাজনৈতিক উদ্যোগের প্রয়োজন হবে না।

(৪)

নমঃশূদ্রদের অবস্থান ঘোষণার পরে কোনও কোনও অঞ্চলে রাজনৈতিক নেতারা বিভিন্ন সমাজসেবামূলক কাজের সঙ্গে জাতভেদের বিরুদ্ধে প্রচার শুরু করেছিলেন। বরিশাল জেলায় অশ্বিনীকুমার দত্ত (১৮৫৬-১৯২৩) তাঁর "স্বদেশবান্ধব সমিতি"র ১৫০টির বেশি শাখার মাধ্যমে নমঃশূদ্রদের স্বদেশি আন্দোলনে শামিল করার চেষ্টা করেন।[৪২] নমঃশূদ্ররা হিন্দুদের ধোপা-নাপিতের সাহায্য পাবে বলে আশ্বাস দিয়েছিলেন, যদিও তা বাস্তবে সম্ভব হয়নি। স্বদেশি আন্দোলনে শামিল করার চেষ্টাও সফল হয়নি। অম্বিকাচরণ মজুমদার (১৮৫১-১৯২১) কংগ্রেস রাজনীতির প্রাদেশিক স্তরে সমস্যাটির আলোচনার প্রয়াস পেয়েছিলেন; সে চেষ্টাও নমঃশূদ্রদের অসহযোগিতা ভাঙতে সক্ষম হয়নি। বস্তুতপক্ষে অশ্বিনীকুমার দত্ত ও অম্বিকাচরণ মজুমদারের রাজনৈতিক সমর্থন ক্ষেত্রে ছিল নমঃশূদ্রদের সংখ্যাধিক্য। বাংলা প্রেসিডেন্সিতে হিন্দুজাতের মধ্যে দ্বিতীয় সংখ্যাগরিষ্ঠ জাত। ১৯০১ সালের সেনসাসে হিন্দু জনসংখ্যার শতকরা ৯.১৭ ভাগ ছিল নমঃশূদ্র; ১৯১১ সালে ৯.১১ ভাগ। পূর্ববঙ্গের জেলাগুলির মধ্যে ফরিদপুর, বাখরগঞ্জ (বরিশাল), যশোহর, ঢাকা, মৈমনসিং ও শ্রীহট্টে নমঃশূদ্রদের বাস ছিল সবচেয়ে বেশি। ফরিদপুরে হিন্দু জনসংখ্যার শতকরা ৫০ ভাগের বেশি ছিল নমঃশূদ্র। বরিশালে শতকরা ৪৫ ভাগ এবং যশোহর জেলায় শতকরা ২৫ ভাগ।[৪৩]

ভদ্রলোক নেতৃত্বের নিকট বিশেষভাবে আশঙ্কাজনক ছিল নমঃশূদ্র-মুসলমান সম্প্রীতি এবং উভয়ের রাজনৈতিক লক্ষ্যের। সেনসাস কমিশনার E.A. Gait ১৯০১ সালের সেনসাস রিপোর্টে (রিপোর্টটি ১৯০২ সালে প্রকাশিত হয়।) জানালেন যে বাংলা প্রেসিডেন্সিতে মুসলমানদের সংখ্যাবৃদ্ধির কারণ ধর্মান্তরকরণ। Gait এর মতে অন্তত নব্বই লক্ষ মুসলমান নমঃশূদ্র ও পোদ সম্প্রদায় থেকে ধর্মান্তরিত হয়েছে।[৪৪] (It would be probably safe to say that at least nine million Mohamedan of Bengal proper belong to this stock.) Gait অবশ্য কতদিনের মধ্যে এই ধর্মান্তর হয়েছে তার কোনও ইঙ্গিত দেননি। অনুমান করা যায় ত্রয়োদশ শতাব্দী থেকেই ঘটেছে এই ধর্মান্তরকরণ।

পাবনা প্রাদেশিক কনফারেন্সে (১৯০৮) অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি আশুতোষ চৌধুরী জানালেন যে বাংলা প্রেসিডেন্সিতে ধীরে ধীরে মুসলমানরা সংখ্যাগরিষ্ঠ হয়ে যাচ্ছে এবং হিন্দুরা অবক্ষয়ের পথে। জনগণনার সংখ্যাতত্ত্ব দিয়ে তিনি দেখালেন যে ১৮৭২ সালে হিন্দুর সংখ্যা ছিল ১৭, ১১২, ৯৮৫; ১৯০১ সালে হিন্দুর সংখ্যা দাঁড়ায় ১৯,০২৬,৯৭৪। অন্যদিকে ১৮৭২ সালে মুসলমানের সংখ্যা ছিল ১৬,৬৮০, ৬৪৩। ১৯০১ সালে সেই সংখ্যা হয়েছিল ২২,৪০৫,৯৮৫। অর্থাৎ ১৮৭২ থেকে ১৯০১ সালের মধ্যে হিন্দুর সংখ্যাবৃদ্ধি দুই লক্ষের কাছাকাছি; ওই সময়ে মুসলমানের সংখ্যাবৃদ্ধি ছয় লক্ষের কাছাকাছি। ১৮৮১ সালের সেনসাস থেকেই মুসলমানরা বাংলা প্রদেশে সংখ্যাগরিষ্ঠ।[৪৫]

১৮৭২ সাল থেকে মুসলমানদের সংখ্যাবৃদ্ধির কারণ ধর্মান্তরকরণ নয়। ব্রাহ্মণ্যধর্মের অত্যাচারের ফলে অপেক্ষাকৃত উদার ধর্ম গ্রহণ করার যে প্রবণতা তা ঊনবিংশ শতাব্দীর আবহাওয়ায় অনেক কমে এসেছিল। তবে ধর্মান্তরকরণ হত এবং বেশি হত খ্রিস্টধর্ম গ্রহণ। কিছু কিছু মুসলমান ধর্মেও ধর্মান্তরিত হয়েছে। ১৯৩১ সালের একটি খবরে দেখা যাচ্ছে, 'সুনামগঞ্জ মহকুমার পাটনি ও নমঃশূদ্র জাতি মুসলমান ধর্ম গ্রহণের জন্য প্রস্তুত হইয়াছে।' কারণ হিসাবে ওই খবরে বলা হয়েছে 'অনুন্নত জাতি ব্রাহ্মণের আসন চাহে না, তাহারা চাহে সুব্যবহার। ...মুসলমান ভ্রাতৃবৃন্দ এই পতিত হিন্দু ভ্রাতৃগণের দুঃখ দেখিয়া, ইসলাম সমাজের উদার দিক দেখাইয়া তাহাদের কার্য্যে আন্তরিক সাহায্য প্রদান করে।'[৪৬]

যাই হোক ১৯০১ সালের সেনসাস কমিশনারের ধর্মান্তরকরণের বক্তব্যকে আরও তীক্ষ্ণ করে পরিবেশন করলেন তৎকালীন হোম সেক্রেটারি Herbert Risley। তিনি লিখলেন (১৯০৩) '১৮৯১ সালের পর দশ বৎসরের মধ্যে মুসলমানদের সংখ্যাবৃদ্ধি ঘটেছে শতকরা ৯ভাগ এবং খ্রিস্টানদের সংখ্যাবৃদ্ধি ঘটেছে শতকরা ২৮ ভাগ। সেক্ষেত্রে মোট জনসংখ্যার বৃদ্ধি মাত্র শতকরা তিন ভাগ।' Risley হিন্দুদের কথা স্পষ্ট করে বুঝিয়েছেন যে হিন্দুদের বৃদ্ধি মুসলমান ও খ্রিস্টানদের থেকে কম। সুতরাং Risley আশাবাদী। তাই তিনি উসকানি দিলেন, 'গত জনগণনার রিপোর্ট থেকে কি অনুমান করা যায় যে ভারতে মুসলমান ও খ্রিস্টানদের পুনরুত্থান ঘটতে পারে?' এই মন্তব্যগুলি বহুল প্রচারিত হয়েছিল। ১৯০৯ সালের জুন মাসের Modern Review পত্রিকায় লালা লাজপত রায়ের "The Depressed Class" প্রবন্ধে Risley-র পুরো নোটটি উদ্ধৃত হয়েছিল। এইরূপ উসকানিমূলক সরকারি মন্তব্যের ফলে হিন্দুদের মধ্যে অস্তিত্বের আশঙ্কা ধীরে ধীরে প্রবল হয়ে উঠল—সেই সঙ্গে হিন্দু ভদ্রলোকদের রাজনৈতিক নেতৃত্বের সংকটও স্পষ্ট হয়ে উঠল। মুসলমানদের সংখ্যাবৃদ্ধি সম্পর্কে সচেতন হয়ে হিন্দুদের মধ্যে যে আশঙ্কা দেখা দিয়েছিল সেখানেই জন্ম নিল হিন্দুদের অবক্ষয়ের তত্ত্ব এবং সেই আশঙ্কাই ছিল হিন্দু সাম্প্রদায়িকতার উৎসভূমি। হিন্দু ভদ্রলোক নেতৃত্বের আশঙ্কা ছিল সমাজ ও রাজনীতিতে তাঁদের নেতৃত্বের স্থান হারানোর আশঙ্কা। এই অবস্থায় প্রাদেশিক নেতৃবৃন্দ ভয় ও সঙ্কীর্ণতার ঊর্ধ্বে উঠতে পারেননি।

ফরিদপুরে হিন্দু জনসংখ্যার শতকরা ৫০ জনের বেশি নমঃশূদ্র হওয়ার জন্য ফরিদপুরের নেতা অম্বিকাচরণ মজুমদারকে জাতভেদ ও অস্পৃশ্যতার প্রশ্নকে জাতীয় রাজনীতির মঞ্চে নিয়ে আসতে হয়েছিল। ১৯১০ সালে কলকাতায় অনুষ্ঠিত প্রাদেশিক সম্মেলনে অম্বিকাচরণ ছিলেন সভাপতি। তিনি নমঃশূদ্রদের ক্ষোভ ও ক্ষোভ নিরসনের পদ্ধতি নিয়ে আলোচনা করেন। কিন্তু প্রাদেশিক নেতৃত্বের ওপর তার কোনও প্রভাব পড়েনি। ১৯১১ সালে ফরিদপুরে অনুষ্ঠিত প্রাদেশিক সম্মেলনেও তিনি আরও বিস্তৃত আলোচনা করেন। কয়েকজন নমঃশূদ্র প্রতিনিধিও এই সম্মেলনে যোগ দিয়েছিলেন। কয়েকজন নেতা কটাক্ষ করে এই সম্মেলনকে "অম্বিকাচরণের নমো অধিবেশন" নাম দিয়েছিলেন এবং কলকাতার কয়েকটি পত্র-পত্রিকা এ নিয়ে ব্যঙ্গ বিদ্রূপও করেছিল।[৪৭] রাজনীতি ক্ষেত্রে এই বিষয়ে কোনও সক্রিয় পদক্ষেপ না নেওয়া হলেও ১৯০৯ সালের মর্লি-মিন্টো শাসন সংস্কারে মুসলমানদের জন্য আসন সংরক্ষণের নীতি গৃহীত হওয়ায় নেতারা এ বিষয়ে সমালোচনায় মুখর হয়ে ওঠেন। স্বাভাবিকভাবে নমঃশূদ্ররাও তাদের জাতের জন্য আসন সংরক্ষণ দাবি করে। অন্ত্যজ ও অস্পৃশ্য জাতের কয়েকটিকে এই সুবিধা দেওয়ার উদ্দেশ্যেই সেনসাস কমিশনার Gait তাদের নিয়ে Depressed Class নামে একটি নতুন শ্রেণি তৈরির পরিকল্পনা করে একটি সারকুলার জারি করেন। জাতীয়তাবাদী নেতারা এই পদক্ষেপকে জাতীয় আন্দোলনকে দুর্বল করার প্রয়াস হিসাবে অভিহিত করে প্রবল আলোড়ন সৃষ্টি করেন। শেষ পর্যন্ত সুরেন বন্দ্যোপাধ্যায়ের অনুরোধে ভাইসরয় ওই সারকুলার প্রত্যাহার করার নির্দেশ দেন।[৪৮] সারকুলার প্রত্যাহারের ফলে অন্য একটি জনগোষ্ঠীর রাজনীতি ক্ষেত্রে এগিয়ে আসার সম্ভাবনা যেমন ব্যাহত হল, তেমনই ভদ্রলোক নেতৃত্বের প্রতিদ্বন্দ্বী তৈরি হওয়ার পথও বন্ধ হয়ে গেল। বস্তুতপক্ষে ভদ্রলোক নেতৃত্বের রাজনৈতিক নেতৃত্ব ও ক্ষমতা হারানোর আশঙ্কা প্রদেশের রাজনীতিকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করেছে। Depressed Class-এর জন্য সংরক্ষণে বাধা দিলেও তাদের ওপর সামাজিক ন্যায় ও নিপীড়নের অবসান ঘটানোর জন্য ভদ্রলোক নেতৃত্ব কোনও প্রচেষ্টাই করেনি। তৎকালীন অবস্থায় ভদ্রলোক নেতৃত্বের সংকীর্ণতার পরিপ্রেক্ষিতে 'অস্পৃশ্যতাবিরোধী' বিলের কথা চিন্তা করাও যায় না; কিন্তু অনুন্নত শ্রেণির মধ্যে শিক্ষার প্রসার, চাকুরি ইত্যাদির সুবিধা ইত্যাদি বিষয়ে নেতৃত্বের পক্ষে সোচ্চার হওয়া সম্ভব ছিল।[৪৯] কিন্তু ভদ্রলোক নেতৃত্ব অনুন্নত ও অচ্ছুত জাতের স্বার্থবিরোধী অবস্থানেই অনড় ছিল।

রবীন্দ্রনাথ তখন প্রত্যক্ষ রাজনীতির জগৎ থেকে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করে নিয়েছেন। দেশের বিভিন্ন ধর্ম ও জাতের মানুষের মধ্যে যে ঐক্যসাধনার কথা তিনি বারবার বলেছেন, নেতাদের মধ্যে তার কোনও প্রয়াস তিনি দেখতে

পাননি। দেশের মধ্যে এই অনৈক্যের ও বিভেদের শক্তি যেভাবে প্রসার লাভ করেছিল তা তাঁকে অবশ্যই পীড়িত করছিল। তাই তিনি নিজের কথা নিজের মতো করেই বললেন। সেই সময় তিনি গীতাঞ্জলির গান রচনায় মগ্ন। তারই মধ্যে তিনদিন পর পর লিখলেন তিনটি কবিতা : মাতৃ অভিষেক বা ভারততীর্থ (১৮ আষাঢ়, ১৩১৮), যেথায় থাকে সবার অধম দীনের হতে দীন (১৯শে আষাঢ় ১৩১৮) এবং দুর্ভাগা দেশ (২০শে অষাঢ়, ১৩১৮)। এই তিনটি কবিতাই জাতীয়ঐক্য, জাতভেদ ও অস্পৃশ্যতার বিষয়ে কবির উপলব্ধির প্রকাশ। কবির জীবনীকার প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় এগুলিকেও কোনও এক কাদম্বরী দেবীর সঙ্গে পত্রালাপের ফলশ্রুতি বলে অভিহিত করেছেন।[৫১] রবি জীবনীকার প্রশান্তকুমার পাল বলেছেন এগুলি "কাব্যধারায় প্রক্ষিপ্ত"[৫০] এবং Marian Phelps নামক এক ভদ্রলোকের সঙ্গে বৎসরাধিক কাল আগের একটি চিঠিকে এর পটভূমি হিসাবে উল্লেখ করেছেন।[৫২]

কিন্তু একটু গভীরভাবে দেখলে এই দুটির কোনও বক্তব্যকেই মেনে নেওয়া যায় না। পরবর্তী একটি ঘটনায় বিশ্বাসযোগ্য তথ্য পাওয়া যায়। জালিয়ানওয়ালাবাগের ঘটনার পর তিনি বিক্ষুব্ধ চিত্তে প্রতিবাদের জন্য রাজনৈতিক নেতাদের অনুরোধ জানিয়েছিলেন। তাঁরা রাজি না হওয়াতে তিনি চিঠি লিখে সরকার-প্রদত্ত উপাধি ফেরত দিয়ে "লিপিকা"র রচনাগুলির মধ্যে মনোনিবেশ করেন। স্বদেশি আন্দোলনের সময় অনেক রচনাতে রবীন্দ্রনাথ হিন্দু-মুসলমান ঐক্য, হিন্দুদের মধ্যে ঐক্য ইত্যাদি বিষয়ে অনেকবার বলেছেন এবং লিখেছেন। তাছাড়া ১৯০৯-১০ সালে ধর্ম ও জাত নিয়ে একটা আলোড়ন চলছিল বাংলার রাজনীতি ও সামাজিক ক্ষেত্রে। নমঃশূদ্রদের দাবির প্রেক্ষিতে Modern Review পত্রিকায় লজপাত রায়ের লেখা এবং বিনোদ রায়ের "What can be done for the Namasudras"[৫৩] নামক রচনা রবীন্দ্রনাথের নজরে এসেছে। C.F. Andrews এই সময়েই লিখলেন ভারতের অস্পৃশ্য জাতগুলির অবস্থা জাতির পক্ষে অবমাননাকর। কর্নেল উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের "Hindu-A Dying Race"[৫৪] নামক পুস্তিকাটি ও দিগিন্দ্র নারায়ণ ভট্টাচার্যের 'জাতভেদ' নামক বইটি আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল। সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের নেতা শিবনাথ শাস্ত্রী (১৮৪৭-১৯১৯) নেতৃত্বে অস্পৃশ্যতার বিরুদ্ধে প্রচারের জন্য ১৯০৯ সালে স্থাপিত হয়। Depressed classes Mission এবং ১৯১৩ সালে এর নাম হয় Society for the improvement of Backward classes.[৫৬]। অনগ্রসর শ্রেণির জন্য ব্যবস্থা গ্রহণের উদ্দেশ্যে গঠিত কংগ্রেসের একটি কমিটিরও সদস্য ছিলেন রবীন্দ্রনাথ।[৫৭] কমিটি অবশ্য কোনও কাজই করতে পারেনি। গীতাঞ্জলি রচনা সমাপ্ত হওয়ার পর রবীন্দ্রনাথ শিলাইদহ অঞ্চলে গিয়েছিলেন। ফিরে এসে লিখলেন, "আমি পল্লীগ্রামে গিয়া দেখিয়া আসিলাম সেখানে নমঃশূদ্রদের ক্ষেত্র অন্য জাতিতে চাষ করে না, তাহাদের ধান কাটে না, তাহাদের ঘর তৈরি করিয়া দেয় না—অর্থাৎ পৃথিবীতে বাঁচিতে হইলে মানুষের কাছে মানুষ যে সহযোগিতা দাবি করিতে পারে আমাদের সমাজ ইহাদিগকে তাহার অযোগ্য বলিয়াছে; বিনা অপরাধে আমরা ইহাদের জীবনযাত্রাকে দুরূহ ও দুঃসহ করিয়া তুলিয়া জন্মকাল হইতে মৃত্যুকাল পর্যন্ত প্রতিদিন ইহাদিগকে দণ্ড দিতেছি।"[৫৮] কিন্তু রাজনৈতিক নেতৃত্বের নিকট এই সমস্যাবলি উপেক্ষিতই থেকে গিয়েছিল।

(৫)

কোনও কোনও ঐতিহাসিক রাজনৈতিক নেতাদের সঙ্গে সহমত পোষণ করেন যে ভারতের জনগণনা (১৮৭২ সালে শুরু), বিশেষ করে জাতভিত্তিক জনগণনা, ভারতীয় জনসমষ্টিকে বহুবিভক্ত করে জাতীয়তাবাদী আন্দোলনকে দুর্বল করার ঔপনিবেশিক কৌশল। মুসলমান ও Depressed class কে রাজনৈতিক ও অন্যান্য সুযোগসুবিধার টোপ দিয়ে তাদের Collaborator-শ্রেণি করার পরিকল্পনা করেছিল, কারণ মেকলের তৈরি পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত collaborator শ্রেণি ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়েছিল। জাতভিত্তিক জনগণনা শুরুর প্রায় চল্লিশ বৎসর পরে, ১৯১০ সালে জাতীয়তাবাদী নেতারা সরকারের জনগণনা ও মুসলমান এবং অনুন্নত সম্প্রদায়ের জন্য রাজনৈতিক ও কিছু শিক্ষা-দীক্ষার সুযোগ দেওয়ার চেষ্টাকে এইভাবে সমালোচনা করেছিলেন। এমনকী সেনসাস রিপোর্টে কোনও কোনও জাতকে low caste এবং unclean caste বলা হয়েছে বলে সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সরকারের নিকট ক্ষোভ ও আপত্তি জানান! এইরূপ ভাষা ব্যবহার নাকি ভারতবাসীর পক্ষে আপত্তিজনক। একদল ভারতবাসী যে আর একদল ভারতবাসীকে শুধু ওই নামে সম্বোধনই করে না, তাদের ছায়া মাড়ালে গঙ্গাস্নান করে, সে সম্পর্কে সুরেন বন্দ্যোপাধ্যায়ের কোনও বক্তব্য নেই!

১৮৭২ সালে জনগণনার প্রথম রিপোর্ট প্রকাশিত হয় এবং ১৮৯৩ সালে প্রকাশিত হয় Risley-এর Tribes and Castes of Bengal Presidency। ১৮৮১ ও ১৮৯১ সালের জনগণনার রিপোর্টে জাত সোপানের কোথায় কোন জাতের অবস্থান সেই তালিকাও অন্তর্ভুক্ত করা হয়। তখনও জাতীয়তাবাদী আন্দোলন দানা বাঁধেনি। কিন্তু সেনসাস

রিপোর্টে বিভিন্ন জাতের তুলনামূলক জনসংখ্যা (কিংবা শক্তি) এবং জাত-সোপানে আপেক্ষিক অবস্থান জানার পর অনেকগুলি জাত সোপানের অপেক্ষাকৃত উঁচু অবস্থানে আরোহণের চেষ্টা করে। এই আরোহণের স্বীকৃতির জন্য প্রয়োজন ছিল সংস্কৃতায়ন বা উঁচু জাতগুলি যে সমস্ত সামাজিক প্রথা এবং ধর্মীয় আচার-ব্যবহার পালন করে সেগুলির অনুসরণ করা। এই রক্ষণশীল প্রবণতা এই সময় প্রবল হয়ে উঠে হিন্দু পুনরুত্থানের আন্দোলনকে কিছুটা সাহায্য করেছিল। এই রক্ষণশীল প্রবণতা ছাড়াও উচ্চস্থানে আরোহণের প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বিতায় এমন একটি অস্বাস্থ্যকর আবহাওয়ার সৃষ্টি হয়েছিল যা জাতীয় ঐক্যের পক্ষে শুভকর ছিল না। সেই সময় বিভিন্ন জাতের মধ্যে বই লিখে, "কারিকা" প্রকাশ করে আপন আপন জাতের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করার উৎসাহে সত্য-মিথ্যার সীমারেখা মুছে গিয়েছিল।[৫৯] প্রাচ্যবিদ্যার্ণব নগেন্দ্রনাথ বসুর ন্যায় পণ্ডিতও কায়স্থ জাতির শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করার জন্য এমন সমস্ত বক্তব্য প্রামাণ্য হিসাবে পেশ করেছেন যা তাঁর পাণ্ডিত্যের ওপর কলঙ্কচিহ্ন হিসাবে বিরাজ করছে। এই 'ইঁদুর দৌড়ে' সরাসরি অংশ না নিয়ে নমঃশূদ্র সম্প্রদায় ১৮৮০ সাল থেকেই হিন্দুধর্মের বাইরে একটি ধর্মমতের প্রতিষ্ঠা করে নিজেদের অহিন্দু বলে পরিচিত হতে চেয়েছিল। বস্তুতপক্ষে হিন্দুধর্মের বাইরে না গেলে হিন্দু সমাজের জাত নামক ব্যবস্থা থেকে মুক্তি নেই—এই উপলব্ধি ড. ভীমরাও আম্বেদকরের আগে নমঃশূদ্রদেরই হয়েছিল। তাই তাঁরা তাঁদের 'মতুয়া' হিন্দুসমাজের বাইরে একটি পৃথক ধর্মমত হিসাবে প্রতিষ্ঠা করতে সরকারের নিকট বারবার আবেদন জানিয়েছিল। সেই সঙ্গে স্বদেশি আন্দোলনের ভদ্রলোক নেতৃত্বকে উপেক্ষা করে প্রতিবাদী মুসলমানদের কাছাকাছি এসেছিল। অম্বিকা মজুমদার ও অশ্বিনী দত্ত নমঃশূদ্রদের আন্দোলনে শামিল করতে চেয়েছিলেন কিন্তু সহকর্মী নেতাদের অসহযোগিতায় ও খবরের কাগজের ব্যঙ্গ বিদ্রূপে তাঁদের চেষ্টা সফল হয়নি।[৬০] ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ ছাড়াও, ভদ্রলোক নেতৃত্বের সঙ্গে সমঝোতা সফল হওয়া দুঃসাধ্যই ছিল।

(আগামী সংখ্যায় সমাপ্য)

সূত্রনির্দেশ

৩৯. M. Usuda : ওই Pp. 228-229 ও Sekhar Bandopadhaya, ওই P. 153.

৪০. শিপ্রা বিশ্বাস : ওই পৃ: ২৯২-২৯৩। Census Commissioner-কে লেখা চিঠিটি এইরূপ : "We are not allowed to join them in their social and religions ceremonies. They have been continually looking down upon us with contempt and malice and kept up under subjection and total ignorance. We have been smarting under their yoke and bondage. Thus we desire to be recognised by the Government entirely as a different community having separate claims to political privileges like the Mohammedans."

৪১. M. Usuda : ওই Pp. 232-233.

৪২. ওই Pp. 288.

৪৩. শিপ্রা বিশ্বাস : ওই পৃ: ৯৩।

৪৪. ওই পৃ: ২৪১।

৪৫. Nityapriya Ghosh etc. : ওই P. 177.

৪৬. শিপ্রা বিশ্বাস : ওই পৃ: ৮৯-৯০।

৪৭. M. Usuda : ওই P 234-235, ও Sekhar Bandopadhaya. ওই P. 156

৪৮. Sekhar Bandopachaya ওই P. 39-40

৪৯. লালা লাজপত রায় Modern Review পত্রিকায় "Depressed Class" শিরোনামে একটি প্রবন্ধে জাতীয় নেতাদের দায়িত্বের কথা বলেন, অস্পৃশ্যতা দূর করার জন্য সমস্ত সম্মেলনে আলোচনা করে কর্মসূচির কথা বলেন। কিন্তু আইন করে অস্পৃশ্যতাকে বে-আইনি করার কথা বলতে পারেননি।

৫০. প্রশান্তকুমার পাল : রবিজীবনী, ষষ্ঠ খণ্ড, পৃ: ২৩৭ রবীন্দ্রজীবনীকার প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় লিখেছেন, "অব্যবহিত পূর্বের ও পরের কবিতার সঙ্গে ভাবসূত্রে সম্পূর্ণ ছিন্ন।" দ্বিতীয় খণ্ড, ১৯৭৭, পৃ. ৩০৪।

৫১. প্রশান্তকুমার পাল : ওই পৃ: ১৬১।

৫২. প্রভাতকুমার : রবীন্দ্রজীবনী, ২য় খণ্ড, পৃ: ৩০৪-৩০৬।

৫৩. M. Usuda : ওই, P. 233।

৫৪. ১৮৭২ থেকে ১৯০১ পর্যন্ত সেন্সাস রিপোর্টের ভিত্তিতে কর্নেল মুখোপাধ্যায় প্রমাণ করতে চেয়েছিলেন যে হিন্দুরা ধ্বংসোন্মুখ জাতি। এই সিদ্ধান্তটির জনক অবশ্য ছার্বাট রিশলে। ধ্বংস এড়াবার জন্য মুখোপাধ্যায় অস্পৃশ্যতা ইত্যাদি দূর করার কথা লিখেছেন।

৫৫. দিগিন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য : জাতভেদ, ১৯১২।

৫৬. Sekhar Bandopadhaya : ওই Pp 59 & 69।

৫৭. প্রশান্তকুমার পাল : ওই, পৃ : ২৩৭।

৫৮. রবীন্দ্রনাথ : ধর্মের অধিকার (১৩১৮) নবম খণ্ড, পৃ: ৫৬২।

৫৯. আপন জাতের শ্রেষ্ঠত্বের প্রমাণ হিসাবে "কারিকা" প্রকাশে অদ্বিতীয় ছিলেন প্রাচ্যবিদ্যার্ণব নগেন্দ্রনাথ বসু (১৮৬৬-১৯৩৮)। দীনেশচন্দ্র সেনের ভাষায় "তিনি সন্দেহজনক কুলজীর উপর আস্থা স্থাপন করিয়া তাঁহার ঐতিহাসিক সিদ্ধান্তগুলি যদি বিকৃত না করিতেন তবে তিনি ঐতিহাসিক জগতে চক্রবর্তীর স্থান লাভ করিতেন।" অবশ্য সেই সময় অনেক জাত বিষয়ক গ্রন্থকারের, যেমন উমেশচন্দ্র গুপ্ত, ওই অবস্থাই হয়েছিল।

৬০. 'নায়ক' নামক একটি পত্রিকা অম্বিকাচরণকে ক্রমাগত বিদ্রূপ করে রচনা ছাপত। জাতিভেদ হিন্দু সমাজে অপরিহার্য বলে প্রচার করত পত্রিকাটি।

ঢাকার আলিয়া মাদ্রাসা

প্রসঙ্গ মহান শিক্ষক ও প্রশাসক খানবাহাদুর জিয়াউল হক

আবদুশ শাকুর

প্রতিষ্ঠানটিতে মুক্তবুদ্ধির চর্চার প্রথম প্রমাণ পাওয়া গিয়েছিল আমার ভর্তির ব্যাপারেই। আব্বা আমাকে ভর্তি করাতে এনেছিলেন সে বছরেই 'আলিম' পরীক্ষা দেওয়ানোর জন্য। কিন্তু শুরু থেকে এতগুলি ক্লাস কোনও মাদ্রাসাতেই না-পড়া একটা ছাত্রকে কেবল ভর্তি-পরীক্ষায় ভাল করার জোরে 'পূর্ব পাকিস্তান মাদ্রাসা বোর্ডে'র আলিম-ফাইনাল ক্লাসে সরাসরি ভর্তি হতে দেওয়ার মতো মুক্তমন একটি সরকারি প্রতিষ্ঠানে বর্তাল কোত্থেকে? অবশ্যই প্রতিষ্ঠানটির প্রশাসনিক নীতি থেকে। নীতি-নির্ধারক কে? অবশ্যই প্রতিষ্ঠানটির প্রধান—খান বাহাদুর জিয়াউল হক, প্রিন্সিপাল মাদ্রাসা-ই আলিয়া। এক্ষেত্রে আমি তাঁকে দেখি মহান শিক্ষকরূপে। তিনি ছিলেন সুঠাম-সুবেশ, সুদৃশ্য শ্মশ্রুময় এবং উন্নতশির। পরতেন 'কলকাতা মাদ্রাসা আলিয়া'র সুপরিচিত লেবাস—পায়ে অভিজাত ব্র্যান্ডের পাম-শু, গায়ে আলিগড়-কাট পাজামা আর জেট ব্ল্যাক সার্জের শেরওয়ানি, মাথায় ফেজদার তুর্কি টুপি, হাতে মানানসই দামি লাঠি (শৈশবে মুরুব্বিদের মুখে শুনেছি, আলিয়া মাদ্রাসার ছাত্র ছুটিতে বাড়ি এলে তার লেবাস দেখতে দূর-দূরাঞ্চল থেকেও অনেক লোক আসত)।

এককথায় চলনে-বলনে এবং দেখতে শুনতেও বেশ প্রভাবশালী ব্যক্তিত্বের অধিকারী ছিলেন অধ্যক্ষ জিয়াউল হক। দোতলার অফিস থেকে নেমে ক্লাসগুলির চতুর্দিকে একটা চক্কর দিয়ে যেতেন কদাচিৎ। ইনফম্যালি স্টুডেন্ট কমনরুমরূপে ব্যবহৃত সড়ক সংলগ্ন আউটহাউসটির দিকে তাকাতেনও না। কারণ তিনি জানতেন যে সেখানে কিছু কিশোর-যুবক পালা করে একটিমাত্র জানালা দিয়ে রাস্তা-পার সেন্ট ফ্রান্সিস গার্লস স্কুলের সুপুষ্ট আগাখানি মেয়েদের দেখে নবযৌবন উদ্‌যাপন করে থাকে। এক্ষেত্রে আমি তাঁর মধ্যে দেখি মহান প্রশাসকের গুণ। উচ্চমানের প্রশাসকই শুধু বোঝেন—কোনটা তাঁর দেখা দরকার, আর কোনটা না-দেখা। প্রিন্সিপাল জিয়াউল হকের মুক্তবুদ্ধিপুষ্ট উদার নীতিবোধ তাঁর বাকি তিন সিনিয়ার কলিগের মধ্যেও সঞ্চারিত ছিল, যে কারণে মাদ্রাসাটির কোনও ব্যাপারেই কোনও ছন্দপতন হত না তখন। প্রতিষ্ঠানটির সেই তিন মুরুব্বি ছিলেন, ভাইস-প্রিন্সিপাল মাওলানা শফি লখনৌভি, হেড-মোদারেস মাওলানা জাফর আহমদ ওসমানি এবং গ্র্যান্ড-মুফতি মাওলানা আমিমুল এহসান। এঁদের পরিচালনায় তদানীন্তন আলিয়া মাদ্রাসার ছাত্রজীবন ছিল নিরুদ্বিগ্ন, সঙ্কীর্ণতামুক্ত এবং আমার চোখে সর্বাঙ্গীন সুন্দরও।

এখানেই আমার লেবাসঘটিত স্বাধীনতার কথাটা বলে ফেলতে চাই। লেবাসে আগের কালের আভিজাত্য ঢাকার আলিয়ার কালে ছিল না। কারণটাও সাধারণ। আগের কালে শিক্ষা সীমাবদ্ধ ছিল ধনীর মধ্যে। কালে কালে তা প্রসারিত হচ্ছিল নির্ধনের মধ্যেও। তাই ঢাকা আলিয়ার শিক্ষকদের সকলেই শেরওয়ানি পরলেও ছাত্রদের মধ্যে পরত কেবল কেউ কেউ। তাদের সাধারণ লেবাস ছিল জুতা-মোজা, পাজামা-পাঞ্জাবি, টুপি-দাড়ি। আগেই বলেছি ব্যতিক্রম ছিল শুধু প্রিন্সিপাল-তনয় আতিকুল মাওলা আর তার ক্লাসমেট আবদুশ শাকুর। তাদের ড্রেস ছিল পাজামাপাঞ্জাবি, কলারওয়ালা ফুলশার্ট, আর টুপি ছাড়া নাঙ্গা মাথায় টেরি-কাটা লম্বা চুল। সাবালক-দর্শন হবার তাড়ায় তাড়াতাড়ি দাড়ি ওঠানোর জন্য শেভও শুরু করি দু'জনেই অগ্রিম (হয়ত সকলেই তাই করে)। তবে যথাসময়ে পূর্ণ উদ্গমের পরেও গোটা মাদ্রাসায় শেষ পর্যন্ত শ্মশ্রুহীনও থাকি খালি আমরা দু'জনাই। মাওলাকে কারও কিছু না বলার কারণ যদি এই হয় যে সে প্রিন্সিপালের ছেলে, আমাকে তো যে কোনও শিক্ষকই বলতে পারতেন 'তুমি ওকে ফলো করলে অনেকেই করতে চাইবে এবং তাতে মাদ্রাসার ডিসিপ্লিন নষ্ট হবে'। কিন্তু আমাকেও কেউ কিছু বলেননি।

আমিই বরং ব্যক্তিগত সঙ্কোচবশত ওই লেবাসে কেবল একজনের ক্লাসে যেতাম না—মুফতি আমিমুল এহসান সাহেবের, যিনি পরে যথাসময়ে আমাকে 'মুমতাজুল মুহাদ্দেমিন' সনদ দান করেছিলেন। কামিল-কোর্সে 'বোখারি শরিফে'র ক্লাস নেওয়ার জন্য একদিন তিনি তাঁর কলুটোলার

তাকিয়া থেকে মাদ্রাসার পথে পশ্চিমদিকে আসছিলেন। আমি তাঁর ক্লাসে যাব না বিধায় লক্ষ্মীবাজারের 'ভাই ভাই রেস্টুরেন্টে'র উদ্দেশে পূর্বদিকে যাচ্ছিলাম। সামনে পড়ে গিয়ে সালাম দিতেই স্নেহভরে আমার হাত ধরে তিনি বলে উঠলেন—শকুর সাহাব, আপ মেরে ক্লাস মে নেহি আতে হ্যাঁয় তো মুঝে পড়হানে মে মজা নেহি আতা হ্যায়। আমি বললাম—হুজুর, আপকে ক্লাস মে হাম ক্যায়সে আ সেকতে হ্যাঁয় অ্যায়সে লেবাস মে। ক্ষণেক চুপ করে রইলেন তিনি যেন অনেকটা চিন্তাকুল হয়ে। পরে বললেন কিছুটা স্বগতস্বরেই—যেখানে বাতেনি এলেমের তালাশে মনপ্রাণ হয়রান, সেখানে জাহেরি লেবাস নিয়ে পেরেশানির ফুরসত কি থাকে? অতঃপর আমার দিকে তাকিয়ে হঠাৎ শঙ্কিত কণ্ঠে বলে উঠলেন—ক্যা, ম্যায়নে আপ কো কভি টোকা হ্যায় এস বারে মে? না, কখনও কিছু বলেননি তিনি আমাকে। প্রিন্সিপাল জিয়াউল হকও কিছু বলেননি তাঁর টিচিং-স্টাফ 'ক্লিন-শেভড' মাওলানা জালালুদ্দীনকে, যিনি ছিলেন আমাদের ইংরাজির প্রফেসার। তবে লক্ষণীয় যে কেউ কিছু না বলাতেও এতে অন্য কারও কিছু হেরফের হয়নি। শিক্ষক জালালুদ্দীন যেমন অন্য শিক্ষকদের ফলো করেননি, তেমনই তাঁকেও ফলো করেননি অন্য কোনও শিক্ষক। আমরা যেমন অন্য কোনও ছাত্রকে ফলো করিনি, তেমনই অন্য কোনও ছাত্রও আমাদের ফলো করেনি। ফলে সে অর্থে মাদ্রাসার কোনও ডিসিপ্লিন ভঙ্গ হয়নি। আর প্রথা পালন না করে আমরা দু'জনও যে নষ্ট হয়ে যাইনি, সেটা তো এখন পরিষ্কারই দেখা যাচ্ছে পশ্চাদদৃষ্টিতে। প্রিন্সিপাল জিয়াউল হককে আমি মহান শিক্ষক বলি তাঁর এমনই দূরদর্শী শিক্ষানীতির জন্য।

তিনি যে একজন দক্ষ প্রশাসক সেকথা আব্বার মুখে আমি আগেই শুনেছি আমার আলিয়া মাদ্রাসায় ভর্তির বিষয়ে আলোচনা প্রসঙ্গে। ভর্তি হওয়ার আগে থেকেই প্রতিষ্ঠানটির প্রতি আমার ভক্তি সৃষ্টি করার উদ্দেশ্যে নানান গালগল্প করতেন তিনি। ১৮৫৭ সালে স্থাপিত কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের লাইব্রেরির পরেই উপমহাদেশের দ্বিতীয় বৃহত্তম লাইব্রেরি হিসাবে বিবেচিত হত ১৭৮০ সালে প্রতিষ্ঠিত কলকাতা আলিয়া মাদ্রাসার লাইব্রেরি। সেই বিশাল লাইব্রেরিটাকে দেশভাগমাত্রই রেল-স্টিমারে বোঝাই করে ঢাকায় নিয়ে আসেন প্রিন্সিপাল খান বাহাদুর জিয়াউল হক। এবং একালের কাজী নজরুল ইসলাম কলেজের তথা সেকালের ইসলামিক ইন্টারমিডিয়েট কলেজের বেশিরভাগ জুড়ে পুনঃস্থাপন করে লাইব্রেরিটি চালু করে দেন তিনি অনতিবিলম্বে। এই কলেজেরই বিরাট মাঠটি মাদ্রাসার খেলাধূলার মাঠ হিসাবেও ব্যবহৃত হত। (সেখানে খানবাহাদুরকে একবার আমরা আমাদের অ্যানুয়াল স্পোর্টসে প্রধান অতিথি হিসাবেও পেয়েছিলাম, যে অনুষ্ঠানের ঘোষক ছিল তাঁর পুত্র আহমেদ আতিকুল মাওলা তার দারুণ মাইক্রোফোন উপযোগী কণ্ঠের সুবাদে)। এভাবে বেশি জায়গা লাগার ব্যাপারগুলোর ব্যবস্থা হয়ে গেলে অধ্যক্ষ মহোদয় তাঁর শিক্ষালয়টি চালু করেন কলেজটির সামনে এবং মুসলিম হাইস্কুলের বিপরীতে অবস্থিত 'ডাফরিন হস্টেল' নামক তুলনামূলক ক্ষুদ্র ভবনটিতে। মাদ্রাসায় হস্টেলের ব্যবস্থা করেন শ্রীশ দাস লেনের বিশাল একটি জমিদার বাড়িতে এবং নাম দেন 'এলিয়ট হস্টেল', সম্ভবত কলকাতা মাদ্রাসার হস্টেলের নামে। নবগঠিত একটি রাষ্ট্রের যাত্রা-শুরুতে যখন নতুন সরকারের সব বিভাগেরই চাহিদা ছিল জোগানের চেয়ে অনেক গুণ বেশি—তখন প্রিন্সিপাল জিয়াউল হক এতসব ব্যবস্থা তাঁর একটিমাত্র মাদ্রাসার জন্য করতে পেরেছিলেন কীভাবে? আমি মনে করি প্রধানতই তাঁর অভ্রভেদী ব্যক্তিত্বের গুণে—যা গঠিত হয়েছিল প্রশাসনিক প্রজ্ঞার সঙ্গে চারিত্রিক ক্যারিশমার যোগে। নিশ্চয়ই দাবি আদায়ের প্রতিযোগিতায় অন্যান্য অনেক বিভাগীয় অনেক প্রধানকেই আউটস্মার্ট করেছিলেন খানবাহাদুর জিয়াউল হক।

আব্বা আগে থেকে কৌতূহল সৃষ্টি করেছিলেন বলে ভর্তি হওয়ার পর থেকেই আমি ফাঁক পেলেই লাইব্রেরিটিতে চলে যেতাম। সেই বিশাল জগৎটিতে দেখার শেষ ছিল না। বিস্ময়কর কালেকশান। হাতে-লেখা শত শত বছরের পুরাতন পাণ্ডুলিপিও অনেক—একের চেয়ে এক বিশাল। এত বিরাট যে ঘুরে ঘুরে পাণ্ডুলিপির কেবল চারটি কিনারই পড়া যেত। মধ্যের অংশ পড়তে হলে অজু বানিয়ে বিশেষ ব্যবস্থায় পাণ্ডুলিপির বুকে চড়ে বসতে হত। বাংলাভাষারও হেন কাব্য, উপন্যাস, নাটক এবং গল্পের বই নেই—যা আলিয়া মাদ্রাসা লাইব্রেরির সংগ্রহে ছিল না। অতএব লাইব্রেরিটি হয়ে গিয়েছিল আমার সব-পেয়েছির দেশ। সুযোগটি কাজে লাগিয়ে আমি আমার মাদ্রাসা জীবনের বছরগুলিতেই বাংলাভাষার বড় বড় লেখকের সে-পর্যন্ত প্রকাশিত সব গল্প-উপন্যাস পড়ে ফেলেছিলাম। একজনকে শেষ করে তবেই পড়তাম আরেকজনকে। উদ্দেশ্য ছিল প্রত্যেককে পূর্ণরূপে মর্মঙ্গম করে নেওয়া। এভাবে বাংলা সাহিত্যের সঙ্গে আমার স্থায়ী পরিচয়টি হয় ঢাকা আলিয়া মাদ্রাসার লাইব্রেরিতেই। এই অপ্রত্যাশিত প্রাপ্তির জন্য আমি বিশেষভাবে ঋণী খান বাহাদুর জিয়াউল হকসাহেবের কাছে। যিনি যথাযথ গুরুত্ব দিয়ে এই অমূল্য পাঠাগারটিকে সুদূর কলকাতা থেকে—দু'পাশের দুই ট্রেনে এবং মাঝখানের স্টিমারে বারবার ওঠানো-নামানোর হাজার ঝামেলার পরোয়া না

করে—ঢাকায় নিয়ে এসেছেন ঐতিহাসিক সেই দ্বিমুখী মহানিষ্ক্রমণের কালে, যখন পরিবহন-যানের ওপর চাপ ছিল যুদ্ধকালের চেয়েও বহুগুণ বেশি। বহু পুরাতন তুলোট কাগজের অতি নাজুক ঐতিহাসিক পাণ্ডুলিপি পর্যন্ত অক্ষত অবস্থায় আস্ত নিয়ে আসতে পারার কৃতিত্ব একটা সমন্বিত টিমওয়ার্কের ব্যাপার হলেও, সাধুবাদটা তো টিমটির ক্যাপটেনেরই প্রাপ্য।

২

রসকষহীন স্মৃতিচারণ দীর্ঘ হওয়া বাঞ্ছনীয় নয়। তাই শিক্ষক-প্রশাসক খান বাহাদুরের কথা আর না বাড়িয়ে আমি এর পর মানুষ জিয়াউল হক সম্পর্কে দু'চারটি কথা বলি। প্রথমে বর্ণনা করব তাঁর সঙ্গে আমার প্রথম পরিচয়ের ঘটনাটা।

আলিয়ায় ভর্তিমাত্রই আতিক আর আমি মানিকজোড় হয়ে উঠি। সাধারণ সূত্রটি ছিল মেন বিল্ডিঙের ক্লাস পালিয়ে আউটহাউসের কমনরুমে ঢুকে জানালা দিয়ে এবং জানালাটির নীচে রাস্তার পাশে বসা পান-সিগ্রেট-বাদাম-বুট বিক্রেতার কাছে গিয়ে পণ্য কেনার ছলে রাস্তার ওপাশের স্কুলের সামনে দাঁড়ানো চাটনি-আচার আর ভাজাভাজি বিক্রেতার চারপাশে স্বাস্থ্যবতী পশ্চিমে মেয়েদের সদা বিদ্যমান জটলাটা দেখা। কী দেখলাম সেটা বিবেচনা-পুনর্বিবেচনা-আলোচনা-পর্যালোচনা করা—সেকালের ভিক্টোরিয়া (বা একালের বাহাদুরশা) পার্কের দক্ষিণ পাশের রিভার-ভিউ রেস্তোরাঁর স্পেশাল আড্ডাখানায়। ইংলিশ-মিডিয়াম বালিকা বিদ্যালয়টির গুজরাটি মারাঠি সুশ্রী-সুদেহী সবকটি মেয়েরই প্রেমে পড়ে যেতাম আমি—একটিকেও বাদ দিতে পারতাম না। তাই আমার কোনও সমস্যা ছিল না। কিন্তু আতিক প্রেমে পড়ত কেবল একটি মেয়ের। সেজন্যই তার সমস্যা ছিল। আমি তার প্রেমাস্পদার আশপাশের মেয়েগুলিকে দেখিয়ে বলতাম সেগুলি বেশি আকর্ষণীয়া। সে বলত বাকি মেয়েগুলি তার চোখেই পড়ে না। আনাগোনা করতে করতে মেয়েটার নামটাও শোনা হয়ে গিয়েছে তার—আফসানা। না, প্রেমিকটিকে আর বিরত করা যাবে না। কারণ অতিমাত্রায় উদ্বুদ্ধ হয়ে সে এখন তাকে প্রেমপত্র ঠুকতেই উদ্যত।

একদিন মাওলা ঘোষণাই করে দিল যে এ ব্যাপারে আর কারও কোনও কথাই সে শুনবে না। সুতরাং পত্রটুকু সুন্দর উর্দুতে লিখে দেওয়াটাই হবে শাকুরের উপযুক্ত বন্ধুকৃত্য। আমি বললাম আমার ভাষা ফুটবে না, যেহেতু মেয়েটিকে আমার খাসা লাগে না। জলিল লিখুক। আতিক বলে, জইলার উর্দু পড়ে পিত্তি জ্বলে যাবে মেয়েটার। তবে দাড়িয়াল জলিলকে বন্ধুকৃত্য থেকে একেবারে বঞ্চিত রাখেনি আতিক। তাকে দিয়ে দুই প্যাকেট ক্যাপস্ট্যান সিগারেট কিনিয়ে এক প্যাকেট ক্রেতাকে দিয়ে এক প্যাকেট নিজের পকেটে রেখেছিল সারা রাতের জ্বালানি হিসাবে। গ্রামের ছেলে আমি তখনও ওটা ফোঁকার মতো শহুরে হয়ে উঠিনি। কোর্টের সামনেকার বিখ্যাত 'দিল্লি হোটেল অ্যান্ড রেস্টুরেন্ট'-এ আমাদের বসিয়ে চারজনের জন্য পরোটা, কাবাব, হালুয়া ও শাহিটুকরার অর্ডার দিয়ে আতিক চলে গেল 'প্রিন্সিপাল সাহেবের বাংলা'য়। রায়সাহেব বাজার ব্রিজের পুব পাশের 'ধোলাই খালে'র উত্তর পার্শ্বস্থ প্রাসাদোপম ব্রিক-রেড বাড়িটিতে গিয়ে স্নেহময়ী মাতার কাছ থেকে টাকা নিয়ে সে অল্প পরেই ফিরে এসে বিল দিয়ে দিল।

খাবার প্যাকেটগুলি নিয়ে দু'জনে আমার সৌখিন সাইকেলটির সামনে-পেছনে বসতেই আতিক বলল—এলিয়ট হস্টেল। উদ্দেশ্য সহপাঠী ফজলুর রুমে ডিনার খেয়ে রাত কাবার করা। আমার একমাত্র কাজ আতিকের পক্ষে প্রেমপত্র লেখা। আর ওদের সম্মিলিত কাজ হবে আমাকে জাগিয়ে রাখা। আমি ফাঁকি দিয়ে লিখতে চাইলাম 'আফসানা তোমাকে নিয়ে আমি আসিয়ানা বাঁধতে চাই', মানে বাসা বাঁধতে। কিন্তু প্রেমিক তা চায় না। বলে—ওটা বাড়াবাড়ি হবে, দু'জনের যা বয়স। বুঝলাম মানে অ-প্রাপ্তবয়স্ক বন্ধুটি বান্ধবীকে নিয়ে আপাতত কল্পনার জগতেই থাকতে চায়। অগত্যা 'দেবী! ....আঁখুঁ কো এক এশারে কি/জাহ্‌মাত্ তো দিজিয়ে/কাদমুঁ পে দিল বিছা দুঁ/ইজাজত তো দিজিয়ে'—এ ধরনের বাণী সংবলিত একটি চিঠি লিখলাম আধুনিক বাগবিধিঋদ্ধ গদ্যে, আমার উর্দুর তামাম অর্জন উজাড় করে। এটা পড়ামাত্রই তার মনের কথা বলে মনে হল মাওলার।

সিদ্ধান্ত হল পত্রখানি পাত্রীস্থ করতে হবে অবিলম্বে। কী ভাবে? তার ঠিকানা তো অজানা। বন্ধুর উত্তর: তার দরকার হবে না। ছুটির পরে মেয়েটির রিকশার পিছু নেবে আমার সাইকেল। পেছনে বসা আতিকের হাতে থাকবে তার বারতা। যেখানেই রাস্তা কিছুটা ফাঁকা দেখা যাবে, সেখানেই সাইকেলটা দ্রুত এগিয়ে যাবে। রিকশাটা ক্রস করতেই আশেক পত্রটা ছুঁড়ে দিলে ওটা মাশুকার 'ক্রোড়পত্র' হয়ে যাবে। কিন্তু বলতে যত সহজ, করতে তত নয়। স্কুল থেকে বেরিয়ে আফসানার রিকশা চলল তো চললই। নোয়াবপুর-গুলিস্তান পেরিয়ে পলটন-কাকরাইলও ছাড়িয়ে যাচ্ছে রিকশা, তবু একটা ফাঁকা জায়গা পাওয়া যাচ্ছে না কোথাও। সারাটা রাস্তা জুড়ে লোকজন যেন গিজগিজ করছে। আসলে অনেক স্থানেই পথে লোক ছিল না। তবু মাওলার মনে ভয়

ছিল সব সময়। বস্তুত আমাদের দু'জনেরই মনে হচ্ছিল, শহরের সকল মানুষই দেখছে দুটি তরুণ একটি তরুণীকে অবৈধ পত্র দিতে চেষ্টা করছে।

পেছনের আসনে বসা আতিকের দৃষ্টি সামনের রিকশাটির দিকে হলেও, চালকের আসনে বসা আমার দৃষ্টি ছিল সামনের রাস্তাটার দিকে। তবু আমি যেন হঠাৎই আবিষ্কার করলাম যে আমরা শহরের শেষ প্রান্তে এসে পড়েছি। যখনকার কথা বলছি তখন শান্তিনগর বাজার থেকেই শুরু হয়ে যেত গ্রামের ধানখেত। তবে এও দেখা যেত যে খেতের দু'একটা আল চওড়া হয়ে কাঁচা রাস্তার রূপ নিচ্ছে। আর তার আশেপাশে এখানে সেখানে দু'একটা বেড়ার ঘর, টিনের ঘর উঠেছে। এমনকী এক-আধটা সেমি-পাক্কা হাউসও নির্মিত হচ্ছে। আতিককে আমি তাকিদ দিলাম এই বলে যে সেখানে ইসমাইলিদের জামাতখানা থাকার কারণে আগাখানি মেয়েটির বাড়ি শহর ছাড়িয়ে শহরতলিতেও হতে পারে। তাহলে সে শান্তিনগরের মোড়েই রিকশা ছেড়ে কাঁচা রাস্তায় হাঁটা ধরবে। অতএব এটাই শেষ চান্স। লোকজনও নেই। আমি রিকশাটা ক্রস করার ভাণ করতেই পেছন থেকে তুই খামটা তার ঘাড়ের ওপর দিয়ে এমনভাবে ছুঁড়ে দিবি যাতে ওটা ওর কোলের ওপর পড়ে। অতঃপর রিকশা ক্রস না করে সাইকেল ঘুরিয়ে আমরা ফিরে যাব আমাদের আড্ডাখানায়, যেখানে বিপজ্জনক মিশনটার রিপোর্টের জন্য অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছে জলিল আর ফজলু।

পরদিন মাওলা ঠায় দাঁড়িয়ে রইল মাদ্রাসার বানোয়াট কমনরুমটার জানালায়—এই আশায় যে মেয়েটি বার বার স্কুল-গেটের বাইরে এসে আচার কেনার ছলে মুখোমুখি জানালায় প্রেমিকটিকে চিনতে চেষ্টা করবে। বারোটা নাগাদ চাটনিওয়ালার কাছে সে ছাড়া তার গোটা দলটাই এল। নীরব মাওলার ছলোছলো চোখদুটি ব্যাখ্যা চাইল আমার কাছে। জবাবে আমি আবৃত্তি করলাম—'ইব্‌তিদা-য়ে ইশক হ্যায় রোতা হ্যায় ক্যা/আগে আগে দেখিয়ে হোতা হ্যায় ক্যা।' বন্ধুর ছলোছলো চোখদুটি কটমটে হয়ে উঠতে দেখে বললাম—নিশ্চয় সে অসুখের অজুহাতে স্কুল ফাঁকি দিয়ে বালিশ-বুকে উপুড় হয়ে শুয়ে তোর চিঠিখানি বারবার পড়ছে এবং জবাবটাও বারবার লিখছে আর বারবার কাটছে।

এমন সময় মাওলার বাবার ব্যক্তিগত আরদালি, ছাত্রদের শ্রদ্ধেয় কুদ্দুসভাই এসে আমাকে বললেন—প্রিন্সিপালসাহেব আপনাকে ডাকছেন। আমি বললাম—আমাকে তাঁর চেনার কথা নয়, আমি তো নতুন এসেছি; হয়ত আতিকের পুরাতন বন্ধু জলিলকে ডেকেছেন। কুদ্দুসভাই বললেন—না, আপনার নাম বলেছেন। ভয়ের কিছু নেই, হাসতে হাসতেই বলেছেন। তবু ভয়ে ভয়েই দোতালায় উঠলাম এবং প্রতিষ্ঠানপ্রধানের অফিসে ঢুকলাম ভাবতে ভাবতে যে এত তাড়াতাড়ি তিনি আমার নাম জানলেন কী করে। আমার রক্তশূন্য মুখ দেখেই সম্ভবত তাঁর সদাগম্ভীর মুখখানি হাসিহাসি করে নিয়ে প্রিন্সিপালসাহেব বললেন:

'উর্দু ভাষায় তোমার দখলের সুনাম আমি শিক্ষকদের মুখে অনেক শুনেছি। তুমি নাকি একজনের ভুলও ধরেছ—উর্দু শিক্ষক মৌলভী আবদুল জলিল দেহলভির।'

'জী, ওঁর ভুল নয়; ওটা ছিল ছাপার ভুল।'

'ছাপার ভুলটা তো ওঁরই ধরার কথা ছিল, তোমার নয়।'

'জী, আমিও ধরিনি। আমি খালি বলেছি—তাঁর পাঠ এবং ব্যাখ্যায় কবিতাটির মানহানি হয়, ইব্রাহিম জাওকের মান থাকে না।

'তুমি তাঁকে যা বলেছিলে, আমাকেও হুবহু তা-ই বল।'

এতক্ষণে বোঝা গেল আমার ওপর সমন জারি হওয়ার কারণ। মৌলভী জলিল শেষ পর্যন্ত নালিশই করেছেন আমার বিরুদ্ধে। অথচ ব্যাপারটাকে টিচারস' কমনরুম পর্যন্ত নিয়ে গিয়েছেন তিনিই। সেখান থেকে লাইব্রেরি পর্যন্ত নিয়ে গিয়ে ভুলটা সংশোধন করে দিয়েছেন, তাঁর দেহলভি বাগবিধির কট্টর ক্রিটিক এবং লখনভি বাচনভঙ্গির প্রেমিক, মাওলানা শফি লখনভি—যিনি ভাইস-প্রিন্সিপাল হিসাবে প্রিন্সিপাল সাহেবের বাংলার এক কোণে থাকেন। এতসব ভাবছিলাম আমি—এতদিন আগে আমার বলা কথাগুলি হুবহু মনে করার ভাণ করে অবশেষে বললাম।

'আমি তাঁকে বলেছিলাম, আপনি পড়ছেন "লায়ি হায়াত, আয়ি কাজা, লে চালি চালে/আপনি খোশি না আয়ে, না আপনি খোশি চালে" এবং বোঝাচ্ছেন "জীবন এনেছে, মরণ এসেছে, নিয়ে চলে যাচ্ছে"। আমার মনে হয় জাওকের মানের কবিতা হবে যদি পড়ি "লায়ি হায়াত, আয়ে; কাজা লে চালি চালে" এবং যদি বুঝি "জীবন এনেছে, এসেছি; মরণ নিয়ে চলে যাচ্ছে"। তাঁর সম্মানে লাগে এমন কোনও কথা আমি বলিনি হুজুর।'

'তিনি কী বললেন?'

'তিনি বললেন—"যেমনি লেখা আছে, আমি তেমনি পড়ছি এবং পড়াচ্ছি"। আমি আর কিছু না বলে ক্লাসের পরে লাইব্রেরিতে গিয়ে 'দিওয়ানে জাওক' দেখে নিশ্চিত হলাম যে আমাদের মুন্তাখাব-নামক নির্বাচিত কাব্য সঙ্কলনটিতে ছাপার ভুলে 'আয়ে'র স্থানে 'আয়ি' হয়ে আছে।'

'আমাকে ভাইস-প্রিন্সিপাল সাহেব জানিয়েছেন। আমি মুন্তাখাব-সঙ্কলক মাওলানা আবদুস সাত্তারকে বলে দিয়েছি কপিগুলিতে চিপকি লাগিয়ে সংশোধন করে দিতে। এই ভুলটি

ধরার পর থেকেই কি বন্ধুরা তোমাকে "বাবা-এ-উর্দু" বলে?

সংশোধনের সংবাদটা শুনে মনে হল বিপদ কেটে গিয়েছে। তাই এবার একটু সহজ হয়ে গিয়ে জবাব দিলাম;

'জী না। ওরা বলে সাম্যের দোহাই তুলে—পশ্চিম পাকিস্তানের "বাবা-এ-উর্দু" আবদুল হকের মতো পূর্ব পাকিস্তানেরও একজন "বাবা-এ-উর্দু" থাকা দরকার।'

'বেশক্। তবে বয়স কম বিধায় তোমাকে আমি আপাতত "বাচ্চা-এ-উর্দু" বলব—তোমার লেখা সুন্দর এই উর্দুটুকুর জন্য।'

কথাগুলি বলতে বলতে প্রিন্সিপালসাহেব টেবিলের নীচের খোলা ড্রয়ার থেকে বের করে আমার দিকে বাড়িয়ে দিলেন আমার লেখা আতিকের প্রেমপত্রখানি। চিঠিটা দেখা মাত্রই আমার চোখ অন্ধকার হয়ে গেল। সেই অন্ধকারেও পরিষ্কার দেখতে পেলাম—আমি চিরতরে বিতাড়িত হয়েছি আলিয়া মাদ্রাসা থেকে। আব্বা হৃদরোগে আক্রান্ত হয়েছেন তাঁর স্বপ্ন ভগ্ন হয়ে যাওয়াতে। আমার মূর্ছা-যাওয়া অবস্থা দেখে মুহূর্তের জন্য হয়ত বা বাৎসল্যই প্রবল হয়েছিল বন্ধুর পিতার। তিনি বললেন, 'মুক্তার মতো নাস্তালিকে (ফারসি ক্যালিগ্রাফিতে) লেখা তোমার রচনার মুন্সিয়ানা আমাকে মুগ্ধ করেছে। কিন্তু খুবই খারাপ কাজ করেছ তোমরা। "তোহ্ফা"কে তো আমি বোঝাবই, তোমাকেও কথা দিতে হবে—এত ছোট বয়সে এত বড় গুনা তোমরা আর করবে না। আমি মেয়েটির পিতাকে কথা দিয়েছি।'

'জী না। আর করব না।'

ক্ষমা পেয়ে কথাটা আমি ঝটপটই দিতে পেরেছিলাম, তবে ঢোক গিলতে গিলতে। অতঃপর প্রবল ব্যক্তিত্বশালী খানবাহাদুর শুধু একটি শব্দই বলেছিলেন—'যাও।'

আমি উঠে গিয়েও দাঁড়িয়ে রইলাম বাকি কথা শোনার জন্য—করে-ফেলা গুনাটার সাজার কথা। অথচ প্রিন্সিপাল জিয়াউল হক বললেন সাধনার কথা। 'তোম আদীব হো। আদব কে লিয়ে চাহিয়ে মাদেরি জোবান। খেয়াল রাখনা।' [তুমি সাহিত্যিক। সাহিত্যের জন্য চাই মাতৃভাষা। খেয়াল রেখো।]

উল্লেখ্য যে উচ্চতম সে-আদালতে আমাদের সকল কথাবার্তাই হয়েছিল উর্দুতে। শিক্ষা এবং পরীক্ষার মাধ্যম হিসাবে ভাষাটি ছিল আলিয়া মাদ্রাসার ছাত্র-শিক্ষক সকলেরই শ্বাস-প্রশ্বাসের মতো।

৩

ছাত্রের প্রতি প্রিন্সিপাল জিয়াউল হকের পিতৃসুলভ মমত্ববোধ পরে আমি আরও একাধিকবার লক্ষ করেছি। এ প্রসঙ্গে দুই কিশোরের সন্দ্বীপ এবং সুধারাম ভ্রমণের কথা মনে পড়ছে। আতিকের সঙ্গে সন্দ্বীপে তাদের গ্রামের বাড়িতে বেড়ানোর রোমাঞ্চ আমার স্মৃতিচারণে চলে আসে নানা কারণে। ঢাকা ছেড়ে চট্টগ্রামে গিয়ে আমরা রাত কাটালাম হোটেলে এবং বেশ সাবালক বোধ করলাম। কারণ ওটা ছিল দু'জনেরই প্রথম হোটেলবাস। সেখান থেকে কুমিরার খেয়াঘাট পর্যন্ত বাস-জার্নি যে নিরুপম পাহাড়ি এবং সামুদ্রিক দৃশ্যাবলি দেখিয়েছিল সেসবও ছিল দু'জনের বোধেই নতুন এবং চমকপ্রদ। অতঃপর কুমিরা থেকে সন্দ্বীপের উদ্দেশে পাড়ি দিতে গিয়ে সাম্পানে উঠে গভীর সমুদ্রে পৌঁছুতেই উত্তাল-উদ্দাম তরঙ্গের অবিরাম অভিঘাতে মাঝিদের আজানের ধ্বনি আর যাত্রীদের কান্নার রোল শুনে দু'জনের একই সঙ্গে মূর্ছা যাওয়ার অভিজ্ঞতাটা ছিল উভয়ের জীবনেই একক। মরণের একক অভিজ্ঞতাটাও একই সঙ্গে হয়ে যেত যদি দুই মুরুব্বি তড়িঘড়ি দুই ইঁচড়েপাকাকে সামুদ্রিক দুর্যোগের ভয়ঙ্কর দৃশ্যের আড়ালে মানে ডেকের তলে, পাচার করে শুইয়ে কাঁথা চাপা না দিতেন।

সে যাক। সন্দ্বীপ পৌঁছেই আমরা আতিকের ভগ্নীপতি ডক্টর মহীউদ্দীনের মিটিং মিছিলের অংশ হয়ে গেলাম। তিনি তখন সন্দ্বীপের শীর্ষ নেতা, নোয়াখালি ডিস্ট্রিক্ট বোর্ডের চেয়ারম্যান, মজিদসাহেবের বিরোধী গ্রুপের লিডার মোজাফ্ফর মিয়ার নেতৃত্বে সন্দ্বীপ থানাটিকে নোয়াখালি জেলা থেকে বিযুক্ত করে চট্টগ্রাম জেলার অন্তর্ভুক্ত করার আন্দোলনে অংশ নিচ্ছিলেন। আমার মতো দুলাভাইও জানতেন না যে আতিক ভিন্ন অজুহাতে মায়ের কাছ থেকে টাকা নিয়ে পিতার অনুমতি বিনেই এই বিপদসঙ্কুল অভিযানে বেরিয়েছে আরেক বালককে নিয়ে। তিনি শাকুরকে নিয়ে শ্যালকের নিরাপদে সন্দ্বীপ পৌঁছার বার্তাটা জানিয়ে ঢাকায় তার করেছিলেন রুটিন দায়িত্ববোধ থেকে। মাওলার পালিয়ে বেড়ানোর ব্যাপারটা আমরা জানলাম দুই আসামিকেই ঢাকায় ফিরিয়ে নেওয়ার জন্য আসা খানবাহাদুরের ব্যক্তিগত আরদালি কুদ্দুসভাইয়ের কাছে। আমি কৈফিয়ত চাইলে আতিক বলল, পিতার অনুমতি নিলে সঙ্গে তাঁর আরদালিকেও নিতে হত আর তাতে আনন্দটাই মাটি হয়ে যেত, যেমন এখন অর্ধেকটা হবে। এ ব্যাপারে আতিক পিতার তিরস্কার কতখানি পেয়েছে জানি না। তবে আমি প্রিন্সিপালের সমন পাইনি আগের বারের মতো। তাঁর কাছে এ পুত্রটির হয়ত সাতখুন মাফ ছিল। কেবল কনিষ্ঠ সন্তান বলেই নয়, অত্যন্ত মেধাবী হিসাবেও পিতার অশেষ স্নেহের পাত্র ছিল মাওলা। হয়ত তার মেধার যথাযথ বিকাশ ঘটত—আলিয়ার দিকে না এসে মেজভাই মুজিবুল মাওলার মতো

বিশ্ববিদ্যালয়ের দিকে গেলে। মনে হয় আমার অবস্থাতেই পড়েছিল তোফা। পিতা তাকে নিকটতম পারিবারিক বন্ধু বানাতে চেয়েছিলেন নিজের বিদ্যার অংশীদার করে নিয়ে। কনিষ্ঠ পুত্রটিকে তিনি তার আদুরে নামেই ডাকতেন সর্বদা—তবে অন্যদের মতো 'তোফা' নয়, পূর্ণ উচ্চারণে 'তোহফা'।

এর পরে অবশ্য সে পিতাকে বলেই নোয়াখালি সদর থানা ওরফে সুধারাম থানার রামেশ্বরপুর গ্রামে আমার বাড়িতে বেড়াতে এসেছিল, দু'জনেরই বন্ধু সহপাঠী চট্টগ্রামের নুরুকে নিয়ে। সানন্দেই অনুমতি দিয়েছিলেন প্রিন্সিপালসাহেব এবং বলেছিলেন—তোমার বাড়িতে সে বেড়িয়েছে যখন তার বাড়িতে তোমার বেড়ানো তো সৌজন্যও বটে। আসলে আমাকেও তিনি খুবই স্নেহের দৃষ্টিতে দেখতেন। সেবার আমরা তিন বন্ধুতে মিলে ছবির মতো পরিকল্পিত এবং রকমারি ব্যবহারের বাগান-পুকুর পরিবেষ্টিত আমাদের ছোটখাটো জমিদারবাড়িটিতে বেশ কয়েকটা দিন দারুণ আনন্দে কাটিয়েছিলাম। তবে সকল আনন্দেরই উৎসে ছিলেন আমার আব্বা। রাজনীতিক হিসাবে স্বভাবতই তিনি ছিলেন বহির্মুখী প্রকৃতির মিশুকে মানুষ। তাই পুত্রের বন্ধুবান্ধব পেলে অতিমাত্রায় উৎফুল্ল হয়ে উঠতেন। তার ওপর এরা ছিল বিদেশি বন্ধু—একজন ঢাকার, একজন চাটগাঁর। সেকালে যোগাযোগ ব্যবস্থার নিদারুণ দৈন্যের কারণে আন্তঃজেলা যাতায়াত ছিল একান্ত অপরিহার্য কার্যসাপেক্ষ। সেক্ষেত্রে মনের আনন্দে বেড়ানোর জন্য শহুরে কিশোরের গ্রামের গভীরে আসা ছিল একটা মুগ্ধ বিস্ময়েরই ব্যাপার। তাই আব্বা আতিকদের ভিআইপি মেহমানের সম্মান দিচ্ছিলেন।

একদিন বড় পুকুরে জাল টেনে আধমন-একমন ওজনের রুই-কাতলা তোলা হল তো আরেক দিন মাঝারি পুকুরে জাল ফেলে ধরা হল বড় বড় কই-কোরাল। শৈশবটা পিতার কর্মক্ষেত্র কলকাতায় কাটানো আতিকুল মাওলার এবং ভ্রাতার কর্মক্ষেত্র লাহোরে কাটানো নুরুল ইসলামের কাছে মাছধরার এসমস্ত উৎসব দর্শন ছিল অভূতপূর্ব অভিজ্ঞতা। শেষদিনের পার্টিং-ডিনারের জন্য বাজারের মাংসের বদলে কশাই ডেকে গৃহপালিত খাসি জবাই করে মেশিনে কেটে রেজালা-কাবাবের মাংস-কিমা বানানোর ব্যাপারটাও ছিল বালকদের দৃষ্টিতে ঈদেরই মতো। এইসব তৎপরতার ফাঁকগুলি ভরাট করার জন্য ছিল শতাধিক রেকর্ডসহ "হিজ মাস্টার'স ভয়েস" বাজানোর গ্রামোফোন বা কলের গান। তাতেও ক্লান্তি বোধ হলে ছিল আধমন ওজনের ড্রাইসেল সমর্থিত মার্ফি ব্র্যান্ডের বিশাল একটি রেডিও—যার অ্যান্টেনার তার উঠে গিয়েছিল বাড়ির উচ্চতম আমগাছটির শীর্ষ শাখায় বাঁধা আমাদেরই বাগান থেকে কাটা দীর্ঘতম বাঁশটির মাথা পর্যন্ত। ওতে আমরা শুনতাম রেডিও-সিলোন আর বিবিধ-ভারতীর গান। উঠতাম খবরের প্রধান সময়গুলিতে যখন খবর শুনতে গ্রামের অনেক লোকজন এসে জড়ো হত।

গান শোনার সময় সকলেই অনবরত পান করতাম চা। সেটার উৎসেও ছিলেন আব্বা। চা তিনি বেশি খেতেন আম্মার মানা না মেনেই এবং সেজন্যই অন্যদেরও মানা করতেন না। আমাকে তো শৈশবেই দলে ভিড়িয়েছিলেন আম্মার প্রতিপক্ষ বাড়ানোর জন্য। এ ব্যাপারটা আতিকদের জানা ছিল না। কেননা সেকালে চা খাওয়া ছিল দোষেরই ব্যাপার। ছোটদের তো ওটা মানাই ছিল। তাই আব্বা প্রথম দিন ওদের জিজ্ঞেস করলে দু'জনেই বলে উঠল চা ওরা খায় না। শুনে তিনি 'শাকুর তো খায়' বললে আমতা আমতা করে আতিক বলল তারাও খায়, তবে খুব কম। ব্যাস, আব্বাকে আর পায় কে? ইংল্যান্ডের-লিপটন চা আনতে লোক পাঠালেন আট মাইল দূরের জেলাশহরে—যদিও ঘরে তাঁর প্রিয় ব্র্যান্ড দার্জিলিঙের দামি ব্রুকবন্ড চা ছিল। কারণ চা-বিলাসী মহান মেহমানদের আপ্যায়ন করতে হবে আরও স্বতন্ত্র মানের চা দিয়ে।

অনুমতির অতিরিক্ত অনেক বেশি দিন বেড়িয়ে ফিরে গেলে কারণ জানতে চেয়েছিলেন প্রিন্সিপালসাহেব। পুত্র যখন বলল কারণ মেলাই ছিল, তবে সবই আনন্দের। পিতা নাকি তখন খালি আনন্দের তালিকাটাই জানতে চেয়েছিলেন। এমনি প্রবল ছিল খানসাহেবের বাৎসল্য—কেবল পুত্রের জন্য নয়, তার বন্ধুদের জন্যও।

৪

এ লেখাটি আমি শেষ করব ছাত্রের প্রতি অধ্যক্ষ জিয়াউল হকের পিতৃসুলভ দায়িত্ববোধের একটি স্মৃতিচারণ করে। উনিশশো বাহান্নর তামাম সালটাই ছিল বাংলাভাষার সপক্ষে ভাষণের-গানের, মিছিলের-শ্লোগানের, নিবর্তনের-নির্যাতনের। সেদিন ভাবগম্ভীর 'আমার ভায়ের রক্তে রাঙানো একুশে ফেব্রুয়ারি/আমি কি ভুলিতে পারি' গানটি নয়, রক্ত বিস্ফোরক 'ভুলব না, ভুলব না, একুশে ফেব্রুয়ারি ভুলব না' এবং চিত্তোদ্দীপক 'ওরা আমার মুখের ভাষা কাইরা নিতে চায়'-এর মতো তেজিয়ান দেশগানই দেশকে ঝাঁকিয়ে দিয়ে জাগিয়ে তুলেছিল। সমস্বরে উত্থিত দেশজোড়া গণকণ্ঠ আগাগোড়া উর্দুভাষী আলিয়া মাদ্রাসার প্রতিনিধিত্বও আদায় করে নিয়েছিল, প্রতীকী হলেও। কর্তৃপক্ষকে হতবাক করে দিয়ে আতিকুল মাওলা আর আবদুশ শাকুর নামক প্রতিষ্ঠানবিরোধী দুটি বালক দৃপ্তকণ্ঠে মাদ্রাসার প্রাকারবিদারী

চিৎকার করে উঠেছিল—'রাষ্ট্রভাষা বাংলা চাই! রাষ্ট্রভাষা বাংলা চাই!!' সেই মিছিলে তৃতীয় কেউ যোগ না দিলেও কচিকণ্ঠে রণধ্বনি দিতে দিতে মাদ্রাসাভবনটি দ্রুতবেগে প্রদক্ষিণ করেই পালিয়ে গিয়েছিল বিপ্লবী দুই বন্ধু। ধরা পড়ার ভয়ে মাদ্রাসা থেকে পালানোর প্রয়োজন অবশ্য ছিল না। কারণ উর্দু মিডিয়ামের ধর্মীয় শিক্ষালয়টিতে অন্যান্য বিদ্যালয়ের মতো গোয়েন্দা-পুলিশের আনাগোনা ছিল না ভাষা আন্দোলনের গনগনে বাহান্ন সালেও।

ঢাকায় আমার ঠিকানা ছিল মেজো খালুর শেখসাহেব বাজারের শাহসাহেব-বাড়ি। আমার বড়ভাই ইঞ্জিনিয়ার সাহেবের শ্বশুর হিসাবে শাহসাহেব খালু ছিলেন আমার ডবল আত্মীয়। সেদিন শেষ বিকেলে আমি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিখ্যাত স্প্রিন্টার আমার ফেভারিট খালাতো ভাইটির সঙ্গে চাপাবাজি করছিলাম যে তাঁর চেয়ে জোরে দৌড়াতে পারি বলেই সকালে মাদ্রাসায় 'রাষ্ট্রভাষা বাংলা চাই' স্লোগান দিয়েও পুলিশের হাত থেকে বেঁচে গিয়েছিলাম। এমন সময় আতিকের কাছ থেকে ঠিকানা নিয়ে কুদ্দুসভাই এসে বললেন প্রিন্সিপালসাহেব সমন পাঠিয়েছেন। বুঝলাম আলিয়া মাদ্রাসায় ছাত্র-রাজনীতি ঢোকানোর দায়ে ভৎর্সনা শুনতে হবে। মুস্তাফিজভায়ের সাইকেলের ক্যারিয়ারে বসে ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ প্রাঙ্গনের অনুষ্ঠান থেকে ফিরে তখনও আমি কাপড় ছাড়িনি। বললাম—চলুন। বার্তাবাহক বললেন, কিছু কাপড়চোপড়-কেতাবপত্র সঙ্গে নিতে বলেছেন।

আমি জিজ্ঞাসু হলে কুদ্দুসভাই বললেন, সারা শহরে ঢালাও ধরপাকড় চলছে। সকালে মাদ্রাসা প্রাঙ্গনে দু'জন যে কাণ্ড করেছেন তাতে দুশ্চিন্তার কারণ আছে। একজন তো প্রিন্সিপালসাহেবের অফিসিয়াল বাংলায় পুলিশের নাগালের বাইরে আছেন। আপনাকেও তার সঙ্গে সেখানেই থাকতে হবে কয়েকদিন। কবে আপনার এখানে ফিরে আসা নিরাপদ হবে সেটা প্রিন্সিপালসাহেবই বলবেন। আমি ছেলেমানুষ এত সাতপাঁচ তো ভাবিনি বরং নিজের কীর্তির কাহিনি শোনাচ্ছি ভাষা-আন্দোলনকারী কাজিনকে। আমার ঠিকানা যদিও সকলের মুরুব্বি হিসাবে, সিক্স-বাই-ফোর শেখসাহেব বাজারের মেজো খালুর বাড়ি; থাকি আমি পাশের সেভেন বাই ওয়ান শেখসাহেব বাজারের মেজো মামার বাড়িতে। অতএব সেখানে গিয়ে সকলকে বলে সামান নিয়ে চলে গেলাম রায়সাহেব বাজার ছাড়িয়ে প্রিন্সিপালসাহেবের অফিসিয়াল রেসিডেন্সে। সেখানে আমি আতিকের বড় বোন বেগমআপা এবং তাঁর স্বামী ডক্টর মহিউদ্দীনসহ চারজনে মিলে ক্যারম, লুডু খেলে পরবর্তী বেশ কিছু দিন কী আনন্দে যে কাটিয়েছি—সেসব মনে পড়লে এখনও বার বার 'রাষ্ট্রভাষা বাংলা চাই' স্লোগান দিতে ইচ্ছে করে।

খানবাহাদুরের প্রাসাদে তাঁর স্নেহের প্রসাদ ভোগের মেয়াদ আমার বেড়ে যাওয়ার কারণ ছিল পুলিশি উজবুকির সর্বকালীন একটি ক্লাসিক উদাহরণ। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের অনার্স ফাইনাল ইয়ারের ছাত্র আমার উপর্যুক্ত খালাতোভাইটি ছিলেন একাধারে ভাষাপ্রেমিক এবং নারীপ্রেমিক। পার্শ্ববর্তী আজিমপুর গভর্নমেন্ট কলোনির ৪২ নম্বর বিল্ডিঙের বাসিন্দা ইডেন কলেজের জনৈকা ছাত্রীর (পরবর্তীকালে আমার ভাবি) প্রেমপত্রে ভরা ছিল মুস্তাফিজভাইয়ের বাহিরবাড়ির শোবার ঘরের খাটের তলার একটি টিনের বাক্স। একদিন হবু শ্বশুরবাড়িতে প্রেমাস্পদা এবং তাঁর ভাইদের সঙ্গে ডিনার খেয়ে তাস খেলে গভীর রাতে নিজের ঘরে ফিরে দেখেন—পুলিশি তল্লাশির পরিণামে তাঁর বইপুস্তকের সঙ্গে বাক্সের সমস্ত প্রেমপত্রও চতুর্দিকে ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়ে আছে। বেশ কিছু চিঠি নিয়েও গিয়েছে পুলিসবাহিনী, গভীর অভিনিবেশে পড়ে ভাষা-আন্দোলনের সুলুকসন্ধানের উদ্দেশ্যে। বেচারি অপহৃত প্রেমপত্রের দুঃখে চোখ মুছতে-মুছতে পরের ভোরেই নোয়াখালির গভীরে পল্লির বাড়িতে পালিয়ে গিয়েছিলেন। ফিরেছিলেন মাসখানেক পরে।

ঘরে ফেরার খেয়ালে এক রাতের অন্ধকারে প্রিন্সিপালের বাংলা থেকে শেখসাহেব বাজারে গিয়ে ঘটনাটা শুনে এসে মাওলাকে বলেছিলাম। তাতেই অভয়াশ্রমে থাকার মেয়াদ আমার আরেক কিস্তি বেড়ে গিয়েছিল। ছাত্রের প্রতি অধ্যক্ষের এই দায়িত্ববোধ খানবাহাদুর জিয়াউল হকের প্রশাসনিক এবং মানবিক উভয় দিকের ওপরেই পর্যাপ্ত আলোকপাত করে।

বাংলার বাইরে বাংলাচর্চা

মোহাম্মদ আবদুল হাই

১৯৯৯ সালে জাতিসংঘ একুশে ফেব্রুয়ারিকে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস ঘোষণা করেছে। আমাদের ভাষার সংগ্রাম সমগ্র মানবজাতির সাংস্কৃতিক অধিকার আদায়ের সংগ্রামের অংশ হিসাবে স্বীকৃতি পেয়েছে। ১৯৫২ সালের ২১ ফেব্রুয়ারিতে বাঙালির গৌরবময় আত্মদানকে এতদিন আমরা জাতীয় পরিসরে শ্রদ্ধা, শোক এবং গর্বের সঙ্গে স্মরণ করে আসছি। ২১ ফেব্রুয়ারির স্মৃতিবাহী চেতনা ও উদ্দীপনা এখন শুধু বাঙালি আর বাংলাদেশের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। এটি এখন সারা বিশ্বের ক্ষুদ্র ভাষাগোষ্ঠীর অস্তিত্বরক্ষার প্রধান প্রণোদনা দিবস। এ দিবসটির আরও তাৎপর্য হল পৃথিবীর বিকাশমান ও বিলুপ্তপ্রায় ভাষাগুলোর মর্যাদা ও অধিকার রক্ষা করা। ভাষাতত্ত্ববিদরা মনে করছেন আগামী একশো বছরের মধ্যে প্রায় তিন হাজারের মতো ভাষা পৃথিবী থেকে লুপ্ত হয়ে যাবে। 'দি ল্যাংগুয়েজেস অফ দ্য ওয়ার্ল্ড' নামে পৃথিবীর ভাষা সংক্রান্ত একটি প্রকাশনার ২০০৩ সালের জরিপ অনুযায়ী দেখা যাচ্ছে যে পৃথিবীতে বর্তমানে প্রায় ছয় হাজারের মতো ভাষা আছে। এগুলোর মধ্যে মাত্র ৪ শতাংশ ভাষা—অর্থাৎ মাত্র শ' তিনেক ভাষা দিয়েই পৃথিবীর ৯৬ শতাংশ মানুষ তাদের মনের ভাব প্রকাশ করে। বাকি সাড়ে পাঁচ হাজার ভাষার মধ্যে অনেকগুলো, বিশেষ করে যেসব ভাষাতে কথা বলার লোক এক লাখের ওপর নেই, সেগুলোর মধ্যে বেশকিছু এখন অবলুপ্তির মুখে। গবেষণায় দেখা গেছে বিগত একশো বছরে তিন হাজার ভাষার বিলুপ্তি ঘটেছে। এই হিসাবে আজকের পৃথিবীতে প্রতি দুই সপ্তাহে অবলুপ্ত হতে যাচ্ছে একটি করে ভাষা। দেখা যাচ্ছে অবলুপ্তির মুখোমুখি জীবজন্তু, পশুপাখি, গাছপালা এগুলোর চাইতেও দ্রুতগতিতে এবং নিশ্চিতভাবে অবলোপ পাচ্ছে মানুষের ভাষা। এখন পর্যন্ত ভাষাবিদদের তালিকাভুক্ত পৃথিবীর ৬০৬০টি ভাষার মধ্যে ৫১টি ভাষা আছে যেগুলোর প্রতিটিতে মাত্র একজন করে লোক কথা বলে। এই একান্নটির মধ্যে শুধু অস্ট্রেলিয়াতেই ২৮টি এরকম ভাষা রয়েছে। এছাড়াও মাত্র ১০০ জন লোক কথা বলে এরকম ভাষা আছে ৫০০টি। ১৫০০ ভাষা আছে যার প্রতিটিতে কথা বলার লোক আছে ১০০০ জনেরও কম। আর ৫০০ ভাষা আছে যেগুলোর প্রত্যেকটিতে ১০০,০০০ জনের চেয়ে কম লোক কথা বলে। বর্তমান বিশ্বের লোকসংখ্যা ৬০০ কোটি হলেও এর ৪৭০ কোটির বেশি লোকের মাতৃভাষা মাত্র ২২টি। এসব ভাষার ভাষাভাষীর সংখ্যা বর্তমানে সর্বনিম্ন ৫ কোটি ও সর্বোচ্চ ১২৫ কোটি। বাংলাভাষা পৃথিবীর চতুর্থ সংখ্যাগরিষ্ঠ লোকের মাতৃভাষা। এ ভাষা বাংলাদেশের রাষ্ট্রভাষা। বাংলাদেশ ছাড়াও ভারতীয় উপমহাদেশের পশ্চিমবঙ্গ, ত্রিপুরা, আসাম, মণিপুর, বিহার, ওড়িষা, আরাকান ইত্যাদিতে এবং বহির্বিশ্বে যুক্তরাজ্য, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা ও আরব দেশগুলিতে বাংলাভাষী বহু লোক রয়েছেন।

উত্তর আমেরিকার বেঙ্গলি কালচারাল অ্যাসোসিয়েশনের সপ্তদশ সম্মেলন। গত ৩০ জুন থেকে ২রা জুলাই (২০০৪) পর্যন্ত এই সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় নিউ ইয়র্কের হোয়াইট প্লেনস-এ। এখানে সমবেত হন সমগ্র আমেরিকা, অস্ট্রেলিয়া ও জাপানে প্রবাসী বা অনাবাসী বাঙালিরা। এদের মধ্যে কেউ এসেছেন ভারত থেকে কেউ বা বাংলাদেশ থেকে। Cultural Association of Bengal, North America-র এটি একটি মহাবঙ্গ সম্মেলন।

তবে এই সব আয়োজনের মাধ্যমে বিদেশে কিছু বাংলাচর্চার চেষ্টা হলেও আসলে তা কেবল বাংলা-বাংলা গন্ধমাখা, খাঁটি বাংলা নয়। নতুন প্রজন্ম তো বাংলা জানেই না, বিগত প্রজন্মের অনেকেই বাংলা ভুলতে বসেছেন। আর সেখানে বাংলা চর্চা করছেন বি-ভাষী মানুষেরাই। ১৯৭১ সালে স্বাধীন বাংলাদেশের রাষ্ট্রভাষা হিসাবে স্বীকৃত হবার আগে আন্তর্জাতিক ভাষা-মানচিত্রে বাংলাভাষার পরিচিতির সূত্র ছিলেন 'বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ'। রবীন্দ্রনাথই বাংলাভাষা জননীর সেই সূর্য-সন্তান, যাঁর আলোকে বিশ্বলোকে বাংলাসাহিত্যের পরিচিতি, অনুবাদ, চর্চা ও গবেষণা। আর রবীন্দ্রনাথ প্রাচ্যের পরিব্রাজক দার্শনিক কবি হিসাবে বহুবার বহুদেশে গেছেন সাংস্কৃতিক দূত হিসাবে। গড়ে তুলেছেন পৃথিবীর বহু ভাষার সঙ্গে বাংলাভাষার ও সংস্কৃতির সম্প্রীতির সম্পর্ক। তাই আজকের যে তথ্য আমরা পাব সেখানে এখনও আন্তর্জাতিক রাষ্ট্রিক ভাষা হিসাবে বাংলাচর্চার ব্যাপক উদ্যোগ শুরু হয়নি—হয়েছে ভাবের ভাষা হিসাবে সাহিত্যানুরাগীদের চর্চার

সূত্রে। তাই সর্বত্র গড়ে ওঠেনি রাষ্ট্রীয় উদ্যোগে এসব প্রতিষ্ঠান—অনেক ক্ষেত্রেই চর্চার ক্ষেত্র সীমাবদ্ধ থেকেছে ব্যক্তিক চেষ্টায়। এসব বাদে যেসব প্রাতিষ্ঠানিক উদ্যোগের কথা আমরা জেনেছি—তারই সংক্ষিপ্ত বর্ণনা এখানে দেওয়া হল।

ব্রিটেন (UK.)। এদেশের প্রখ্যাত ও ঐতিহ্যপূর্ণ যে প্রতিষ্ঠানটিতে বাংলাচর্চা ও গবেষণার সুযোগ আছে তার নাম 'স্কুল অব ওরিয়েন্টাল অ্যান্ড আফ্রিকান-স্টাডিজ' (School of Oriental and African Studies, England) কবি ও অধ্যাপক উইলিয়াম রাদিচে (William Radice) এর মুখ্য আকর্ষণ। তিনি নিজে অনুবাদ করেছেন মাইকেল মধুসূদন দত্তের মেঘনাদবধ কাব্য। আর এমনকী রবীন্দ্রনাটক 'ডাকঘর' (The Post Office) প্রযোজনাও করেছেন। এছাড়া লন্ডনে আছে রবীন্দ্রচর্চার কেন্দ্র। শান্তিনিকেতনের আদর্শে প্রতিষ্ঠিত এ প্রতিষ্ঠানের সংগঠক এলম্ন হার্স্ট।

কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয় : এখানে বাংলার অধ্যাপক হিসাবে নিযুক্ত হয়েছিলেন জে ডি আন্ডারসন নামে এক গবেষক যিনি ঢাকা শহরে কাটিয়েছিলেন বেশ কিছুকাল।

বাংলাদেশের ছেলেমেয়েদের জন্য বিভিন্ন কাউন্টি স্কুলে বাংলা পড়ানোর ব্যবস্থা করা হয়েছে। এজন্য প্রয়োজনীয় পাঠ্যসূচি পাঠ্যগ্রন্থ ও শিক্ষকের ব্যবস্থা তাঁরা করেছেন। এছাড়া কাউন্টি (জেলা) গ্রন্থাগারগুলিতে চাহিদার ভিত্তিতে কিছু কিছু বাংলা বই রাখা হয়ে থাকে। বিবিসি-র বাংলা অনুষ্ঠান তো নানা কারণে গুরুত্বপূর্ণ। এখানে বাংলা ঘোষক ও শিল্পীদের বড় অংশই বাংলাদেশের হলেও ভারতের শিল্পীদের উপস্থিতিও লক্ষ করা যায়। প্রবাসী বাঙালিদের আয়োজিত চলচ্চিত্র প্রদর্শনী ও নানা ধরনের সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান এবং প্রকাশিত পত্র-পত্রিকার মাধ্যমেও এসব ক্ষেত্রে পরোক্ষে কিছু বাংলাচর্চা হয়ে থাকে।

আমেরিকা (USA) : এদেশে বাংলাচর্চার প্রধান কেন্দ্র শিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়ের দক্ষিণ এশিয়া ভাষা ও সভ্যতা বিভাগ। বহুদিন পর্যন্ত এই কেন্দ্রের প্রাণপুরুষ ছিলেন প্রখ্যাত গবেষক ও পণ্ডিত এডওয়ার্ড ক্যামেরন ডিমক। তিনি অবসর নিয়েছেন। ইনি বৈষ্ণব পদাবলির যে অনুবাদ প্রকাশ করেন তার শিরোনাম 'I Praise of Krishna'। তাঁর অনূদিত অন্য গ্রন্থটি হল বৈষ্ণবসাহিত্যের আকরগ্রন্থ 'চৈতন্যচরিতামৃত'। এই গ্রন্থটির প্রকাশক হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়। বাংলার সহজিয়া বৈষ্ণব কাল্ট বিষয়ক তাঁর গ্রন্থ 'The Place of Hidden Moon'। তাঁর অনুদিত বাংলার মধ্যযুগের আখ্যানগ্রন্থ The Thief of Love and Other Stories'। এছাড়া বিদেশিদের বাংলা কথোপকথন শিক্ষার জন্য তিনি যে অসাধারণ গ্রন্থটি রচনা করেছেন—সেটিও আন্যান্য গ্রন্থের মতো খুবই জনপ্রিয়তা লাভ করেছে। এই প্রখ্যাত বাংলাপ্রেমীকে বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয় 'দেশিকোত্তম' উপাধিতে সম্মানিত করেছে।

শিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়ের উক্ত কেন্দ্রের কর্ণধার অধ্যাপক ক্লিন্টন বি সিলি বাংলার আধুনিক কবি জীবনানন্দ দাশের ওপর একটি পূর্ণাঙ্গ গ্রন্থ রচনা করেছেন। গ্রন্থটির নাম 'A Poet Apart'। এজন্য তিনি 'আনন্দ' পুরস্কার পেয়েছেন। এছাড়া নৃতত্ত্বের গবেষক রন ইন্ডেন (Ron Inden) হিন্দুদের জাতিসম্পর্ক নিয়ে এবং অধ্যাপক র‍্যালফ নিকোলাস (Ralf Nicolus) বাঙালিদের সামাজিক নৃতত্ত্ব নিয়ে গবেষণা করেছেন। বাঙালির দুর্গাপূজা নিয়ে গবেষণা করেছেন গবেষক আকোস অ্যাস্টর (Aacos Astor)।

শিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়ে রবীন্দ্রসাহিত্যের ওপর কাজ করেছেন শ্রীমতী ম্যারী এস লোগো (Smt. Marry S Lago)। রবীন্দ্র অনুবাদে দক্ষ শ্রীমতী লোগো কৃতিত্বের সঙ্গে 'নষ্টনীড়'-এর অনুবাদ করেছন—The Broken Nest' শিরোনামে।

এই প্রতিষ্ঠানের ভাষাবিজ্ঞান ও দক্ষিণ এশিয়া বিভাগের প্রাক্তন ছাত্রী মিরিয়াম ক্লেম্যান অনুবাদ করেছেন মধ্যযুগের রাংলাসাহিত্যের শ্রেষ্ঠ নিদর্শন 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন'। বাংলাভাষা বিজ্ঞানের নানা দিক নিয়েও তিনি কাজ করেছেন। গবেষক রিকি সলোমনের বিষয় ছিল মঙ্গলকাব্য আর রুটা পেপ্পে কাজ করেছেন সাহিত্যিক বুদ্ধদেব বসু প্রসঙ্গে।

এই প্রতিষ্ঠানে প্রাথমিক ভাষাশিক্ষা থেকে পিএইচডি পর্যন্ত নিয়মিত বাংলাচর্চা করা হয়। আমেরিকায় অন্য যেসব বাংলাচর্চা কেন্দ্র আছে তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য কয়েকটি হল—(ক) মিনেসোটা বিশ্ববিদ্যালয় (মিনিয়া পোলিস)—এদের দক্ষিণ এশিয়া বিভাগে একসময় বাংলা পড়ানো হত। বর্তমানে বন্ধ আছে (খ) হাওয়াই বিশ্ববিদ্যালয় (হনোলুলু)—এখানে বাংলা বিভাগের অধ্যাপক র‍্যাচেল ভন বমার। এটিও বন্ধ হয়ে গেছে। (গ) কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয় (নিউ ইয়র্ক)—এখানে বাংলা পড়ানো হয়, তবে কোনও নিয়মিত কোর্স নেই। (ঘ) ক্যালিফোর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয় (বার্কলে)—এখানে বাংলা বিভাগ খোলা হয়েছে। (ঙ) কানাডা বিশ্ববিদ্যালয় (বার্কলে)-এখানে বাংলা বিভাগ খোলা হয়েছে। কানাডা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে মধ্যযুগ বিশেষজ্ঞ যোশেফ ওকোনেল (Joseph O'connel) রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ে এসেছিলেন মধ্যযুগীয় বাংলাসাহিত্য বিশেষ করে, বৈষ্ণব কবিতা ও বৈষ্ণব ধর্মের ওপর কাজ করতে। তিনি অধ্যাপক কাননবিহারী গোস্বামীর সঙ্গে এ নিয়ে কাজ করে

গেছেন। ভয়েজ অব আমেরিকা-র বাংলা সংবাদ ভাষ্য এবং ভারত বাংলাদেশ সংক্রান্ত অনুষ্ঠান বাংলাচর্চার এক বড় দৃষ্টান্ত।

এখানে প্রবাসী সাহিত্যানুরাগীদের উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত সাংস্কৃতিক সংগঠনগুলির বাংলাচর্চার ভূমিকা ক্রমশ আরও ব্যাপকতা লাভ করছে। নিউইয়র্কের সাহিত্যমোদি বাঙালিদের উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত এরকম একটি সংগঠন যুক্তরাষ্ট্র সাহিত্য পরিষদ (যুসাপ)। নিউইয়র্কের ম্যানহাটান, ব্রুকলিন, জ্যাকসনহাইট প্রভৃতি স্থানে এরা বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে বসবাসরত বাঙালিদের সমাবেশ ঘটিয়ে সাহিত্য সম্মেলন করে আসছেন। উত্তর আমেরিকা থেকে নিয়মিত প্রকাশিত হয় 'শব্দগুচ্ছ' নামে একটি কবিতাবিষয়ক পত্রিকা। এটি সম্পাদনা করেন কবি হাসান আল আবদুল্লাহ। এই পত্রিকার দু'জন উপদেষ্টা হলেন পশ্চিমবঙ্গের প্রবাসী কবি জ্যোতির্ময় দত্ত ও বাংলাদেশের প্রবাসী কবি শহিদ কাদরি। এদের ঠিকানা: Shabdaguchha, Editor : Hassan Al Abdullah, 8455 Main St., B 15 Briswood, NY 11435, USA. ক্যালিফোর্নিয়ার বার্কলেতেপ্রতিষ্ঠিত হয়েছে International Institute of Bengal Basin নামে একটি প্রতিষ্ঠান। এ প্রতিষ্ঠানটি পরিচালনা করছেন অধ্যাপক ড. রাসবিহারী ঘোষ। বৃহত্তর বাংলার জনজীবন, মানুষ ও ভূপ্রকৃতি নিয়ে এই প্রতিষ্ঠানের গবেষণাকর্ম পরিচালিত হয়। হিমালয় থেকে বঙ্গোপসাগর পর্যন্ত বিস্তৃত এর গবেষণার পরিধি। এই প্রতিষ্ঠানের ঠিকানা : International Institute of Bengal Basin, Chairman: Rash B. Ghosh. 2507-09 Mc-Gee Avenue. Berkeley. CA 94703; Tel/Fax: 510841-3253. Email: bengalbasin @ comcast.net; Website : www.nvo.com/ ghosh_research।

জার্মানি : সংস্কৃত ভাষার সঙ্গে জার্মান ভাষা সংযোগসূত্রে বাঙালির জার্মান সহযোগ হয়েছে। এছাড়া জার্মানির সঙ্গে বাংলাদেশ ও ভারতের যে সাংস্কৃতিক বন্ধুত্ব গড়ে ওঠে তাও দুই দেশের ভাষা ও সাহিত্য শিল্পের চর্চাকে ঘনিষ্ঠ করে তোলে। তবে এখানে নিয়মিত বাংল-চর্চা কেন্দ্র বলতে উল্লেখ করতে হয় হাইডেলবার্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের দক্ষিণ এশিয়া বিভাগের নাম। এখানকার প্রধান দায়িত্বে ছিলেন অধ্যাপক অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত। এখান থেকে জার্মান ভাষায় প্রকাশিত হয়েছ বহু বাংলা কবিতার অনুবাদ।

এছাড়া জার্মানির বিভিন্ন স্থানে 'সামার স্কুলে' বাংলা শেখানো হয়। এজন্য ওই সময়ে তারা বিভিন্ন স্থান থেকে শিক্ষকও নিয়ে থাকেন। জার্মানির বন-এ রবীন্দ্রচর্চার কেন্দ্র আছে। দীর্ঘকাল সেখানে রবীন্দ্রনাথ নিয়ে অধ্যাপনা ও গবেষণায় যুক্ত ছিলেন অনেক জার্মান পণ্ডিত। জার্মানির বাংলা ভাষা ও সাহিত্য বিশেষজ্ঞ মার্টিন কেম্পশেন ছিলেন প্রথম শান্তিনিকেতনবাসী।

ফ্রান্স : প্যারিসের সোরবোরন বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলা শেখানোর ব্যবস্থা আছে। শেখান কবি লোকনাথ ভট্টাচার্যের স্ত্রী শ্রীমতী ফ্রাঁস ভট্টাচার্য।

বাংলার বিশিষ্ট পণ্ডিত ফাদার দ্যাতিয়েনের নাম এ প্রসঙ্গে স্মরণীয়। তিনি রচনা করেছেন বাংলা গ্রন্থ 'ডায়েরির ছেঁড়াপাতা' ও 'পদ্য পরম্পরার' মতো মূল্যবান গ্রন্থ। তিনি কলকাতায় বহুদিন ছিলেন। মি. ফাদার দ্যাতিয়েন তাঁর ছাত্র অনুরাগীদের নিয়ে একটি বাংলা শিক্ষাকেন্দ্র, বাংলা গ্রন্থাগার ও গবেষণাকেন্দ্র স্থাপন করেছেন বেলজিয়ামে।

চেকোশ্লোভাকিয়া : এদেশের চার্লস বিশ্ববিদ্যালয়ে যে বাংলাচর্চা কেন্দ্র আছে তার অধ্যাপক দুশান জাভাবিতেন। তিনিই এ কেন্দ্র শুরু করেন। তিনি নিজে অনুবাদ করেছেন বাংলার বিখ্যাত পল্লিগীতি কাব্য 'ময়মনসিংহ গীতিকা'। প্রাগ (প্রাহা) বিশ্ববিদ্যালয়েও বাংলা পড়ানো হয়ে থাকে।

পোল্যান্ড : এখানে ইন্ডোলজি (ভারতবিদ্যা)-র বিষয় হিসাবে বাংলাচর্চার ব্যবস্থা আছে।

রুমানিয়া : রুমানিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে একটি বাংলা বিভাগ ছিল। পড়াতেন অধ্যাপিকা অমিতা রায়। তিনি বহু অনুবাদও করেছিলেন।

ইতালি : এখানে রোম বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলাভাষা বিভাগ আছে। একসময় অধ্যাপক ছিলেন রবীউদ্দীন আহমদ। এখন পড়ান তাঁর স্ত্রী।

অস্ট্রেলিয়া : অস্ট্রেলিয়ার বিখ্যাত মেলবোর্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলা বিভাগ আছে। যেখানে অধ্যাপক হিসাবে গিয়েছিলেন অধ্যাপক শিবনারায়ণ রায়, অতীন্দ্র মজুমদার ও মলয়া গঙ্গোপাধ্যায়। এই বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রী ম্যারিয়ান ম্যাডার্ন বহু বাংলা কবিতার অনুবাদ করেছেন।

রাশিয়া : এ প্রসঙ্গে যা তথ্য তা সদ্য-বিগত সোভিয়েত ইউনিয়নের সময়কার কথা। পৃথিবীর বৃহত্তম বাংলা প্রকাশনা ছিল তাদের। তাদের বিভিন্ন বিদেশি ভাষায় সহজ সুলভ সুন্দর প্রকাশনা ইতিহাসের এক বিরল অভিজ্ঞতা। শুধু গ্রন্থই নয় ভারতীয় বিভিন্ন ভাষায় পর্যন্ত দেখেছি তাদের পত্র-পত্রিকা। বাংলাদেশে অরুণোদয়, পশ্চিমবঙ্গে সোভিয়েত দেশ, সোভিয়েত নারী, সোভিয়েত ইউনিয়ন খুবই জনপ্রিয় ছিল। তাদের বাংলা প্রকাশনা বিভাগ ছিল দারুণ সমৃদ্ধ। তথ্যসমৃদ্ধ, সুসম্পাদিত স্বল্পমূল্যে তাদের সরবরাহের গ্রন্থগুলি দরিদ্র মানুষেরও ক্রয়ক্ষমতার মধ্যে ছিল। বিদেশে বাংলাচর্চার

এমন বিপুল আয়োজন আর কোথায় কবে হবে জানি না। রাজনীতি, শিশু-কিশোর সাহিত্য, ধ্রুপদী সাহিত্য, সমাজতত্ত্ব, বিজ্ঞানের বিচিত্র বিষয়ে সব ধরনের প্রকাশনা ছিল তাদের। এজন্য তারা বিশিষ্ট কবি সমর সেন, মঙ্গলাচরণ চট্টোপাধ্যায়, ননী ভৌমিক, বিনয় রায়, অরুণ সোম-এর মতো বিশিষ্ট ব্যক্তিকে যেমন তাদের দেশে নিয়ে গিয়েছেন, তেমনই তাঁদের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়েও বাংলা পড়াবার ব্যবস্থা করেছিলেন। এক্ষেত্রে দুটি বিশ্ববিদ্যালয়ের নাম বিশেষভাবে করা যায়—মস্কো ও লেনিনগ্রাদ। এখানে ভাষা-শিক্ষার নেতৃত্বে ছিলেন মাদাম ভেরা নেভিকোভা। মস্কো বেতারের বাংলা অনুষ্ঠানের পরিকল্পনা ইত্যাদি ক্ষেত্রে উল্লেখ্য নাম মাদাম মালকা নোভা।

এশিয়ার অন্যান্য দেশের আলোচনার আগে একটা কথা স্মরণীয়। তা হল প্রাক্-স্বাধীনতা পর্বে ভারতের সঙ্গে জাপান, বর্মা-সহ বিভিন্ন দেশের ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ছিল। বার্মায় তো এককালে বিপুল সংখ্যক বাঙালির যাতায়াত ছিল। এছাড়া জাভা সুমাত্রা ইত্যাদি দ্বীপসমূহে ভারতীয় ও বাংলার সংস্কৃতির বহু নিদর্শন আজও মেলে।

জাপান : প্রযুক্তিবিদ্যায় আজ শ্রেষ্ঠ দেশ জাপান। এই জাপানের সঙ্গে বাংলাদেশ ও ভারতের সাংস্কৃতিক যোগ দীর্ঘদিনের। রাজনীতি, ধর্ম, শিল্পসাধনা ইত্যাদি নানা ক্ষেত্রে সে সমন্বয়। রবীন্দ্রনাথের আহ্বানে জাপানি পণ্ডিতেরা শান্তিনিকেতনে এসেছিলেন। জাপানে যেসব স্থানে বাংলাভাষা চর্চার সুযোগ আছে তার মধ্যে দুটি কেন্দ্র উল্লেখযোগ্য। ক. টোকিও বিদেশি ভাষা বিশ্ববিদ্যালয় : এখানে বাংলাভাষা বিভাগের দায়িত্বে আছেন অধ্যাপক কে. নোরা। এই কে. নোরার সহযোগে ড. ভক্তিপ্রসাদ মল্লিক রবীন্দ্ররচনার Lexical Index (শব্দভিত্তিক তালিকা) প্রস্তুত করেছেন। এছাড়া আছেন অধ্যাপক উচিদা ও শ্রীমতী উচিদা। অধ্যাপক উচিদা কাজ করেছেন বাংলার মনীষি অশ্বিনীকুমার দত্তের ওপরে। খ. চুকুবা (Tsukuba) বিশ্ববিদ্যালয় : টোকিও থেকে মাত্র পঞ্চাশ মাইল দক্ষিণে এই বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলা পড়াতেন অধ্যাপক কাজুয়ো আজুমা। সম্প্রতি তিনি প্রায়ই শান্তিনিকেতনে যাতায়াত করেন তাঁর গবেষণার কাজের জন্য। এছাড়াও ব্যক্তিগত উদ্যোগে জাপানে তিনি একটি বাংলাচর্চাকেন্দ্র পরিচালনা করছেন।

চীন : পশ্চিমবঙ্গের শান্তিনিকেতনে চীনা ভবনের পরিকল্পনার মধ্যেই দুই দেশের সুদীর্ঘকালের সাংস্কৃতিক মেলবন্ধনের ঐতিহ্য ও আকাঙ্ক্ষা ধ্বনিত হয়ে আছে। পশ্চিমবঙ্গের রাজনীতিতে চীনের বিপ্লব ও সাংস্কৃতিক বিপ্লবের নানা প্রভাব ও প্রতিক্রিয়া এখনও বিদ্যমান।

চীনের বিদেশি ভাষা বিভাগ সোভিয়েতের মতো ব্যাপক সংখ্যায় না হলেও প্রচুর গ্রন্থাদির অনুবাদ প্রকাশ করেছেন। আর এক্ষেত্রে অধিকাংশ অনুবাদই শুনেছি চীনের ভাষা বিশেষজ্ঞদের দিয়ে করানো। চীন বেতারে আমরা কখনওই (বাংলা প্রোগ্রামেও) কোনও বাঙালি ঘোষকের কণ্ঠ শুনিনি। প্রায় সমস্ত ক্ষেত্রেই তাঁরা ছিলেন চীনের লোক।

এখনও চীন থেকে প্রকাশিত নানা বাংলা বই কলকাতায় ন্যাশনাল বুক এজেন্সি সহ নানা বইয়ের দোকানে পাওয়া যায়। যার মধ্যে ধ্রুপদীগ্রন্থও যেমন আছে তেমনই আছে রূপকথা, শিশু কিশোর সাহিত্য, রাজনীতি, সমকালীন নানা তথ্য আর ইতিহাস। চীনে যে প্রতিষ্ঠানে নিয়মিত বাংলাচর্চা করা হয়, তার নাম 'ইনস্টিটিউট অব সোসাল সায়েন্স'-এর দক্ষিণ-এশিয়া বিভাগ।

কিছুদিন আগে চীনের যে শিক্ষা-টিম পশ্চিমবঙ্গে এসেছিলেন—তাঁরা কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিশিষ্ট শিক্ষাবিদদের সঙ্গে মিলিত হন। তখন এক প্রশ্নের উত্তরে তাঁরা জানান বেশ কয়েকটি প্রতিষ্ঠানে নাকি ওখানে বাংলাচর্চা হয়ে থাকে। তবে উচ্চ ডিগ্রি দেওয়ার কোনও প্রতিষ্ঠান নেই। **মরিশাসে** ড. বিষ্ণু দয়ালের নেতৃত্বে 'গান্ধী ইনস্টিটিউট অফ কালচারে' বাংলা সাহিত্য ও সংস্কৃতির নিয়মিত চর্চা হয়। ১৯৯১ সালে এই প্রতিষ্ঠানের উদ্যোগে রবীন্দ্রপ্রয়াণের অর্ধশতক উপলক্ষে আন্তর্জাতিক সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়েছিল।

স্বাধীনতা-উত্তর দশকগুলোতে বিদেশে ব্যাপকভাবে বাংলাদেশের নাগরিকদের বসতি বাংলাভাষাকে দিয়েছে এক মর্যাদাপূর্ণ অবস্থানে উন্নীত হওয়ার সুযোগ। একুশে ফেব্রুয়ারিকে ঘিরে যে চেতনা আমাদের মধ্যে বহমান সে চেতনার এক পর্যায়ে যেমন স্বাধীন বাংলাদেশের অভ্যুদয় হয় ঠিক তেমনই এই চেতনারই ফলস্বরূপ বিশ্বের যে সকল স্থানে বাংলাদেশের লোক বসবাস করছে সেখানে বাংলাভাষার ব্যাপক ব্যবহার হচ্ছে। অবাক বিস্ময়ে আজ দেখতে পাচ্ছি নিউইয়র্ক, সিউল, টোকিও-লন্ডনে বাংলা সাইন বোর্ড, যানবাহনে বাংলা নাম, বাংলা পত্র-পত্রিকা, বাংলা রেডিও-টিভি স্টেশন। পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত তথ্য থেকে জানা যায় যে লন্ডনের স্কুল-ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে প্রায় ৬,০৮,৫০০ জনের মাতৃভাষা ইংরাজি এবং তার পরেই বাংলা, সিলেটি ৪০,৪০০ জনের মাতৃভাষা। সিটি অব লন্ডন, টাওয়ার হ্যামলেটের স্কুলের ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে যথাক্রমে ৫৬.৪ ও ৫৩.৮ শতাংশ বাংলাভাষায় কথা বলে। বিশ্বে প্রায় ৩০ কোটি বাংলাভাষাভাষী রয়েছেন। মনে হয় এমন দিন সুদূর নয় যেদিন বাংলাভাষা একটি নেতৃস্থানীয় আন্তর্জাতিক ভাষার রূপ পাবে। আজ দেশে যারা ইংরাজি না শেখার কারণে পিছিয়ে পড়েছেন তারা আগামীতে বাংলা জানার কারণেই হয়ত এগিয়ে যাবেন।

দু'টি চলচ্চিত্র

মেঘ মুখোপাধ্যায়

ইতিহাসের পুনর্নির্মাণ ঃ ডাউনফল

ইতিহাসের পুনর্নির্মাণের একটা দায় বর্তে যায় শিল্পীর ওপর। যেসব কবি-শিল্পী মনে করেন না যে শিল্প নিছক আনন্দ দেবার জন্য, কেবলই সুন্দরের সাধনা, শিল্পরচনা কেবল ব্যাকুল হৃদয়াবেগের প্রকাশমাত্র, হৃদয়বৃত্তি ভিন্ন যে কিছুই হয় না স্বীকার করে নিয়েও যাঁরা সমাজ আর ইতিহাসবোধে চেতনাকে উজ্জীবিত রাখেন—তাঁরা তাঁদের শিল্পে বহন করেন ইতিহাস পুনর্নির্মাণের দায়। নিজের জাতির দূর অতীত কিংবা নিকট অতীতের ইতিহাস হানা দেয় শিল্পীর মগজে। যদি আবার সে ইতিহাস হয় ভয়ানক বা ধ্বংসাত্মক তবে তা তাড়না করে আরও তীব্রমাত্রায়। চিন্তাজগতকে আলোড়িত করে, কিছু কঠিন প্রশ্ন তোলে, এতকাল চাপা পড়ে থাকা কিছু অস্বস্তিকর প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে চায়। ইতিহাসকে শিল্পের মাধ্যমে পুনর্গঠনের প্রক্রিয়ায় যেন নিজের সঙ্গেই মোকাবিলা করতে চান শিল্পী। মহান সাহিত্যিকরা এ কাজ করেছেন। করেছেন চিত্রকরেরা। ইতিহাস পুনঃসৃজনের এই শিল্পপ্রক্রিয়া আধুনিক যুগে সবচেয়ে সার্থক অভিঘাত সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়েছে থিয়েটারে আর ফিল্মে। ইতিহাসের বিশেষ একটা পর্ব, সংকটপূর্ণ সন্ধিলগ্নের যুগ কিংবা সেই যুগের প্রতিভূ কোনও বড়মাপের স্মরণীয় মানুষের জীবন কেন্দ্র করে কাব্যে-সাহিত্যে-থিয়েটারে-চলচ্চিত্রে এ কাজটা করতে এগিয়ে আসেন একালের কবি-লেখক-নাট্যকার আর নাট্য বা চলচ্চিত্রের নির্দেশক। শুধু স্বপ্ন আর কল্পনা সম্বল করে এ জাতের শিল্পসৃষ্টি সম্ভব হয় না। চাই গভীর ইতিহাসবোধ। ইতিহাসবোধেরই এক অবিচ্ছেদ্য অংশ রাজনীতিবোধ।

শিল্পীর চেতনায় গভীর ইতিহাসবোধের ভিতর থেকে গড়ে ওঠা ইতিহাসের পুনর্নির্মাণকারী কয়েকটি সাম্প্রতিক চলচ্চিত্র দেখার সুযোগ হয়েছিল ২০০৫-এর নভেম্বরে কলকাতা চলচ্চিত্র উৎসবে ঃ তারই একটি জার্মানি-অস্ট্রিয়া-ইতালির যৌথ প্রযোজনায় নির্মিত জার্মান ডিরেক্টার ওলিভার হির্শবিগেল (Oliver Hirschbiegel)-এর 'ডাউনফল' (২০০৪)। বিষয়বস্তুর গুরুত্বে আর চলচ্চিত্রায়নের নৈপুণ্যে ছবিটি বিশ্বের চলচ্চিত্র-দর্শক মহলে বিশেষ আলোড়নের সৃষ্টি করেছে। আমরা এখানে ছবিটির বিষয়ে সংক্ষেপে কিছু জানালাম।

শেষের সেদিন বড়ই ভয়ংকর—হিটলারের জীবনের শেষের দিনগুলি। ১৯৪৫-এর এপ্রিলের বার্লিন। বিধ্বস্ত জার্মানি আসন্ন পতনের অপেক্ষায় দিন গুনছে। তাঁর বিশ্বস্ত প্রধান সহচর, মন্ত্রীবর্গ আর জেনারেলদের নিয়ে ফুয়েরার হিটলার দুর্ভেদ্য পাতালঘরে আশ্রয় নিয়েছেন। সঙ্গে রয়েছে তাঁদের সকলের পরিবার। সেখান থেকে হিটলার পরিচালনা করছেন যুদ্ধের। মিত্রবাহিনীর অপ্রতিরোধ্য আক্রমণ ঠেকিয়ে নাজি জার্মানির জয়ের স্বপ্ন দেখছেন এই কোণঠাসা দশাতেও। যুদ্ধের গতিপ্রকৃতি নির্ধারণ করছেন। সোভিয়েত বাহিনী বার্লিনের দোরগোড়ায়। দিকে দিকে নানা রণক্ষেত্র থেকে তাঁর মারাত্মক সৈন্যবাহিনীর পিছু হটার আর মুখ থুবড়ে পড়ার খবর আসছে। কঠোর পরাজয়ের বাস্তবকে তাঁর বিশ্বাস হচ্ছে না। তিনি নতুন নতুন রণকৌশল রচনা করছেন। নতুন নতুন ফ্রন্ট খুলতে বলছেন, নতুন সৈন্যসজ্জার আর মিত্রপক্ষকে আক্রমণের নির্দেশ দিচ্ছেন। আকাশের তলায় বার্লিন জ্বলছে, সোভিয়েত ট্যাংকের গোলা এসে পড়ছে মুহূর্মুহু, বার্লিনের শরীর গুঁড়িয়ে যাচ্ছে আর মাটিরতলায় বাংকারের মধ্যে বন্দি হিটলার ঘুরে দাঁড়াবার স্বপ্নে বিভোর। জার্মানিকে ধ্বংস করে, বিশ্বস্ত সহকর্মীদের নিয়ে শেষ পর্যন্ত হিটলারকে মরতে হল। হিটলারের জীবনের শেষ বারো দিনের ইতিহাসকে চলচ্চিত্রে রূপ দিয়েছেন পরিচালক। মাঝে মাঝে সামান্য কিছু অংশে বিধ্বস্ত বার্লিনকে দেখানো ছাড়া পুরো ঘটনাটাই ঘটছে বিশাল বাংকারের মধ্যে। রুদ্ধশ্বাস এক আবহাওয়া। অনিবার্য ধ্বংসের, পতনের আর মৃত্যুর অপেক্ষায় এক দানবের নেতৃত্বে একদঙ্গল মানুষকে নিয়ে শ্বাসরোধকারী এক ছবি। মানুষ? না বিশ্বত্রাস বর্বর এক ঘাতকগোষ্ঠী, যারা পৃথিবীকে অন্ধকারে মুড়ে দিতে চেয়েছিল? তাদের পরিণতি নিয়ে ডিটেলস-সমৃদ্ধ এই ছবি।

পরিচালক এই দিনগুলির প্রত্যেকটি মুহূর্তকে পুঙ্খানুপুঙ্খ রূপে জীবন্ত করে তুলেছেন। পতনের গ্রাফ এঁকেছেন। বাংকারের অসাধারণ সেট-নির্মাণ ছাড়া ছবিটাকে ভাবা যায় না।

বাংকারে হিটলারের স্টেনোগ্রাফার হয়ে এল এক তরুণী। এক ঝাঁক প্রার্থীর মধ্যে থেকে ফুয়েরার ওকে তাঁর ব্যক্তিগত সচিব হিসাবে বেছে নিলেন। শেষ পর্যন্ত যারা বাংকার থেকে জীবন্ত বেঁচে বেরিয়েছিল, এই মেয়েটি তাদের একজন। তার চোখ দিয়ে পুরো ঘটনাটা দেখানো হয়েছে। হিটলারকে আমরা যেমন রূপে জানতে অভ্যস্ত 'ডাউনফল'-এ তার থেকে কিছু ব্যতিক্রম ঘটেছে। নরঘাতক-নৃশংস-রক্তপিপাসু দৈত্যটাকে ঠিক পাওয়া যাচ্ছে না। অবিমিশ্র উন্মাদ-দানোর আদলে একটা মানুষের ছায়া পড়েছে। তার খানিকটা পিঠ ঝুঁকিয়ে কুজো হয়ে দাঁড়ানোর ভঙ্গি, কম্পমান বশে না থাকা বাঁহাতটা শরীরের পিছনদিকে সামলে রাখার ধরনে একটা বিধ্বস্ত—ভেঙে পড়া মানুষকে আমরা দেখতে পাচ্ছি। চরিত্রের এই ধরনটাকে ব্রুনো গ্রাঞ্জ তাঁর অভিনয়ে দারুণ জীবন্ত করে তুলেছেন। কখনও কখনও তাই দৈত্যটাকে অসহায় এক ভাগ্যপীড়িত মানুষ বলে মনে হওয়া স্বাভাবিক। মাঝে মাঝে হিটলারকে ঝলসে উঠতে দেখি। তাঁর সেই বিখ্যাত বাচনভঙ্গিমা, অনিঃশেষ গাঁক গাঁক বক্তৃতাবাজি, কথা বলার বদলে হুকুম করার ধরন—যা যা ঐতিহাসিকভাবে হিটলার চরিত্রের সঙ্গে অবিচ্ছেদ্য হয়ে গিয়েছে পরিচালক আর অভিনেতা সেইসবের আশ্রয় নিয়ে আতঙ্ক জাগানো নরঘাতককে দেখিয়েছেন ঠিকই—কিন্তু এক ঘরোয়া হিটলারকেও দেখাতে চেয়েছেন। চরিত্রটার মধ্যে মানবিক দিক আরোপ করেছেন। বিশেষ করে হিটলারকে যখন অসহায় বলে মনে হচ্ছে তখন প্রশ্ন ওঠা স্বাভাবিক পরিচালক Oliver Hirschbiegel কি এই ছবিতে হিটলারের মানবিকীকরণ ঘটাতে চেয়েছেন? এই প্রসঙ্গে তাঁর সুচিন্তিত অভিমত তিনি এইভাবে ব্যক্ত করেছেন ঃ "Even before the Downfall project, I had made a deep investigation of this period, for as Germans we bear a responsibility for it. To my mind, the handling of it was always only a technical description, without any real proximity to people. I had always recoiled from any demonizing of evil. The blood of those who were a million times responsible flows in our veins, whether we like it or not, and a civilized people needs to analyze the past critically."

শেষ পর্যন্ত হাল ছেড়ে দিতে হয় হিটলারকে। হতোদ্যম হিটলার এভা ব্রাউনকে আইনসম্মতভাবে বিয়ে করার পর উভয়ে আত্মহত্যার পথে পা বাড়ান। বন্ধ ঘরে গুলির শব্দের পর নিশ্চিন্ত সহকর্মীরা দু'টি মৃতদেহ বের করে এনে মাটির ওপরে নিয়ে গিয়ে পেট্রোল দিয়ে জ্বালিয়ে দিল। একে একে নাজি যুগের অন্তিম পর্বের শোচনীয় মর্মান্তিক পরিণতি দেখতে পাই। হিটলারের সেনাপতিরা সপরিবারে শিশুদের নিয়ে নৃশংস উপায়ে মৃত্যুবরণ করে। বার্লিনের মাটিরতলায় বারো দিনের শোচনীয় বীভৎসতার গা শিউরানো এই চলচ্চিত্র নানা দিক দিয়ে দর্শককে নাড়া দিয়ে যাবে।

নিদারুণ বিপন্নতা ঃ প্রাইভেট

আজকের পৃথিবীতে প্যালেস্তাইন ভূখণ্ডে সেদেশের সাধারণ মানুষের দুর্দশা-দুর্বিপাকের কথা কে না জানে। তাদের অবিরাম সংগ্রামের কথাও কারও অজানা নয়। প্যালেস্তাইন একটি জ্বলন্ত নাম। দেশ থেকেও তাদের দেশ নেই। স্বদেশভূমি থেকে বঞ্চিত এক জাতি। স্বাধীন দেশ হিসাবে প্রতিষ্ঠালাভের জন্য প্যালেস্তাইনের দীর্ঘ সংগ্রামী ইতিহাস। আধুনিক অস্ত্রশক্তিতে বলীয়ান ইসরাইলের একরোখা জেদ প্যালেস্তাইন ভূখণ্ডের মধ্যেই প্যালেস্তিনিয় নাগরিকদের বছরের পর বছর পরবাসী করে রেখেছে। পাশাপাশি দু'টি দেশের মধ্যে চলে আসছে হানাহানি। দুই প্রতিবেশী জাতির মধ্যে ঘৃণা আর হিংসা। বারুদ-আগুন-বিস্ফোরণ-রকেট হানা-মানববোমা। জমি দখলের লড়াই। অপেক্ষাকৃত কম অস্ত্রধর এক অসহায় জাতির বিরুদ্ধে প্রবল অস্ত্রশক্তির হুমকি। অর্থে-অস্ত্রে-অত্যাধুনিক মিলিটারি শক্তিতে আর সবচেয়ে বেশি রাজনৈতিক প্রভাবে বলীয়ান এক জাতি তার প্রতিবেশী জাতিকে কোণঠাসা করে ফেলতে চেয়েছে। কখনওবা টুটি চেপেই ধরেছে। অন্যদিকের শক্তির উৎস তার স্বদেশভূমিকে চিহ্নিত করার, স্বাধীন রাষ্ট্ররূপে বিশ্বে মাথা তোলার অসীম মনোবল। তবে এই মনোবল অহিংস নয় মোটেই, সহিংস প্রতিরোধ, প্রত্যাঘাত। এক দুর্মর গেরিলা বাহিনীর সংগ্রাম সংগঠিত প্রচণ্ড এক রাষ্ট্রশক্তির বিরুদ্ধে।

সেই প্যালেস্তাইনের একটি পরিবারের জীবনসংগ্রামের কাহিনি চিত্রায়িত হয়েছে 'প্রাইভেট' নামের ছবিটিতে। ছবিটি আসলে নিজগৃহে পরবাসী হবার মর্মান্তিক এক গল্প। নিজেদের ঘরগেরস্থির মধ্যে নিজেরা বিপন্ন। সুস্থ সহজ পারিবারিক জীবন তছনছ। ভয়াবহ একটা গল্পকে শান্ত নিরাসক্তভাবে আমাদের দেখিয়েছেন-শুনিয়েছেন ছবির তরুণ পরিচালক Saverio Costanzo।

একদিন আক্ষরিক অর্থে নিজগৃহে পরবাসী হয়ে পড়েন প্যালিস্তিনিয় প্রৌঢ় ইংরেজির অধ্যাপক মহম্মদ। সপরিবারে।

তাঁর দোতলা বাড়িটির অবস্থান এমন যে কয়েকজন ইসরায়েলি তরুণ সেনা স্ট্যাটেজিক কারণে হঠাৎ এসে মহম্মদের বাড়িটির দখল নিয়ে নেয়। এখান থেকে আশপাশের অঞ্চলে নজর রাখা এবং প্যালেস্তিনিয় যোদ্ধাদের জব্দ করা সুবিধাজনক। বাইরের কারও এ বাড়িতে আশা যাওয়া নিষিদ্ধ করে দেয়। ওরা প্রৌঢ় অধ্যাপককে তাড়িয়ে দেয় না ঠিকই কিন্তু প্রায় গৃহবন্দি করে রাখে। একতলার একটি বড় ঘর কেবল মহম্মদের পরিবারের বসবাসের জন্য বরাদ্দ করে দোতলাটা ওরা জবরদখল করে নেয়। হঠাৎ একদিন বাড়ি ছেড়ে চলে যাবার আগে কয়েকদিনের জন্য জমিয়ে বসে। ছেলেমেয়েদের নিয়ে অধ্যাপক বেকায়দায় পড়েন। তাদের গতিবিধি নিয়ন্ত্রিত। দোতলায় তো কেউ উঠতেই পারবে না, যেখানে সেখানে ঘোরাফেরা চলবে না। স্বল্প পরিসরের মধ্যেই বড় পরিবারটিকে গাদাগাদি করে থাকতে হয়। সোফায়-মেঝেতে রাত্রে বেকায়দায় শুতে হয়। ছেলেমেয়েরা বাবাকে বলে এখান থেকে চলে যেতে। বাড়িটা ছেড়ে দিতে। নিরাপদ কোনও জায়গায় চলে যাবার জন্য তারা বাবাকে অনুরোধ করে, বোঝাতে থাকে। তিনি কিন্তু বাড়ি ছাড়বেন না। এখানেই থাকবেন। এভাবেই থাকবেন। শত্রুপক্ষের নাগালের মধ্যে এক চরম অবমাননাকর অবস্থায়, অমানবিক দশার মধ্যেই তিনি বাস করবেন। কেননা বাড়িটা তাঁর নিজের। জনপদটা তাঁর নিজের। এটা তাঁর কাছে একটা লড়াই। বাড়িটা ছেড়ে পালানো তো চরম পরাজয়। সে কাজ তিনি করবেন না। তাঁর ব্যক্তিগত জীবন লাঞ্ছিত করলেও তিনি দখলদারদের আক্রমণ করবেন না। তাঁর প্রতিরোধের পন্থা অহিংস।

অধ্যাপক মহম্মদকে দেখতে দেখতে, দখলদারদের বিরুদ্ধে তাঁর নিষ্ক্রিয় অথচ অবিচলিত দৃঢ় সংগ্রাম প্রত্যক্ষ করতে করতে আমরা রোমাঞ্চিত হই। গান্ধীজির অহিংস অসহযোগের তত্ত্বের কথা মনে পড়ে নাকি? মনে ঝলক দিয়ে যায় না? প্রশ্ন জাগে মহম্মদ কি গান্ধীজির তত্ত্বের কথা আর প্রয়োগের ইতিহাস জানেন? আসলে এই দৃঢ়চিত্ত-ন্যায়পরায়ণ সংগ্রামী মানুষটিকে লড়াই চালাতে হচ্ছে দু'দিকে। ঘরে ও বাইরে। ঘরে অপমানহত রাগী তরুণ সন্তানদের সঙ্গে। তাদের বোঝাতে হচ্ছে তাঁর নৈতিক শক্তির দিকটা। যুক্তি বুদ্ধি হৃদয় দিয়ে সন্তানদের হৃদয় জয় করে নেবার একটা অভ্যন্তরীণ লড়াই। তাদেরও নৈতিক সমর্থন চান তিনি। তাঁর সংগ্রামের পথটা বোঝানো অত সহজ তো নয়। তরুণেরা চাইবে সক্রিয়তা। অস্ত্রবলের লড়াই। তারা চায় দৈহিকভাবে আক্রমণ করে শত্রুকে পরাস্ত করতে। হঠিয়ে দিতে। বেদখল জমি ফিরে পেতে। তারুণ্যের ভাষা হল হিংসা-আক্রমণ-প্রত্যাঘাত। মেনে না নেওয়াটা ওদের ধর্ম। এই যুদ্ধে পিতা অনেকটাই জিতে যান। সে লড়াই পরিচালক আমাদের অসাধারণ মুন্সিয়ানায় দেখিয়েছেন। মহম্মদের চরিত্রে মহম্মদ বাকরি-র দৃঢ়সংকল্প নীরব যোদ্ধার অভিনয় মনে রাখার মতো। তাঁর চাপা বাচনভঙ্গি, গভীর তাৎপর্যময় দৃষ্টিক্ষেপ, চিন্তাপূর্ণ মুখমণ্ডল, বিশ্বাসপূর্ণ হাঁটা চলা—সব কিছু মিলিয়ে এক সংগ্রামী প্রতিরোধী মানুষকে আমাদের কাছে জীবন্ত করেছেন মহম্মদ বাকরি। বুয়েনস এয়ারেস (২০০৫) আর লোকারনো (২০০৪) উৎসবে তিনি যে শ্রেষ্ঠ অভিনেতার পুরস্কার পেয়েছেন এ খুব সঙ্গত।

আর বাইরের লড়াইটা তো কয়েকজন ইসরায়েলি দখলদার সেনার বকলমে এক প্রবল রাষ্ট্রশক্তির বিরুদ্ধে। তিনি কোনওরকমেই ওদের বিরক্ত করতে চান না, মুখ ফুটে জোরালো প্রতিবাদের ভাষা উচ্চারণ করেন না, কোনও ঝামেলার সৃষ্টি করেন না—তবুও তিনি এই অমানুষিক দশাটা বরদাস্ত করার মধ্য দিয়েই বিরুদ্ধতা করেন ওদের। এই রকমই তাঁর যুদ্ধের ধরন।

বড় মেয়ে মরিয়মের দুঃসাহস এই ছবিতে আকর্ষণীয় মাত্রা যোজনা করেছে। তরুণী মরিয়ম লুকিয়ে ইসরায়েলি সেনাদের চোখ এড়িয়ে সিঁড়ি বেয়ে উঠে পড়ে দোতলার মুখে। দোতলার দরজার বাইরে এক আলমারির মধ্যে ঢুকে পড়ে দু'পাল্লার ফাঁক দিয়ে ওদের ওপর নজরদারি চালাতে থাকে। ওদের কথাবার্তা-পরিকল্পনা শোনে, কাজকারবার দেখতে থাকে। যে কোনও মুহূর্তে ধরা পড়ে যাবার আর তারপরে সাংঘাতিক কিছু ঘটে যাবার অসম্ভব ঝুঁকি নিয়ে পরিবারের অগোচরে সে এ কাজটা করে চলে। পরিচালক মরিয়মের এই দুঃসাহসিকতার সাক্ষী রাখেন আমাদের।

সারা বিশ্বের আলোচ্য একটি সংকট এভাবে একটি পরিবারের কয়েক দিনের অভিজ্ঞতার আধারে চলচ্চিত্রে রূপ পেয়েছে। পরিচালকের প্রথম পূর্ণ দৈর্ঘের কাহিনিচিত্র হিসাবে এক উল্লেখযোগ্য সৃষ্টি। প্যালেস্তাইন ভূখণ্ডের সাধারণ নাগরিকদের চরম দুর্দশা আর অবমাননার জীবন তিনি চলচ্চিত্রের মাধ্যমে শিল্পসম্মতভাবে বিশ্ববাসীর কাছে পৌঁছে দিতে সফল হয়েছেন।

শ্রী মিহির সেনগুপ্তের ১৪১১ বঙ্গাব্দের আনন্দ পুরস্কার প্রাপ্ত গ্রন্থ "বিষাদবৃক্ষ"-র কয়েকটা বিষয় উল্লেখ করে আপনার পত্রিকার মাধ্যমে মিহিরবাবুকে লেখা এই চিঠি।

বিষাদবৃক্ষের লেখক মিহির সেনগুপ্ত তাঁর মনপবনের নাও পিছরার খালের পাশে রেনট্রিতে বেঁধে দু'হাতে কালের মন্দিরা নিয়ে হাছান রাজার মতো গেয়ে চলেছেন কালভঙ্গের ইতিহাস। বিষাদবৃক্ষের দর্পণে উঠে এসেছে ছিন্নমূল মানুষের সমস্যা, নানা বর্গ ও নানা বর্ণের মানুষের কথা এবং সর্বোপরি হিন্দু মুসলমান মানুষের স্বার্থ নিয়ে সংঘাত।

মিহিরবাবু যুগি নাথদের ধর্ম পরিবর্তন করে জোলায় রূপান্তর একই পেশা দেখে অনুমান করেছেন। বাঙালি মুসলমান বেশির ভাগই হিন্দুধর্মের অত্যাচারে রূপান্তরিত মুসলমান। যাদের একত্রিত হয়ে সংঘবদ্ধভাবে বসবাস করার কথা ছিল কিন্তু হিন্দুসমাজের জাতি শৃঙ্খলে সবাই ওপরের দিকে উঠতে চাওয়ায় নিজেদের মধ্যে সংঘর্ষে লিপ্ত থাকে। কখনও কখনও কেউ কেউ উপবীত ধারণ করে নিজেদের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করতে চায়। কিন্তু অবস্থার বিশেষ কিছু হেরফের হয় না।

বিষাদবৃক্ষের ১০৭ পাতায় মিহিরবাবু সহজ প্রশ্ন তুলেছেন। বিশ্বাসঘাতকতা করা হল কেন এবং ভেদের আগুন আনল কে? আবহমান কাল ধরে উচ্চবর্ণীয় মানুষেরা বর্ণবিদ্বেষী ও অত্যাচারী একথা বিষাদবৃক্ষে উল্লেখ আছে। কিন্তু যে কথাটা বিষাদবৃক্ষে উল্লেখ নেই সেটা হল নিজেদের স্বার্থে উচ্চবর্ণীয়রা নিম্নবর্গের মানুষদের ব্যবহার করেছে। কবি জসিমউদ্দীন 'সোজন বাদিয়ার ঘাট'-এ কীভাবে সংঘবদ্ধ নমঃশুদ্র সম্প্রদায়ের শক্তিকে মুসলমানদের বিরুদ্ধে ব্যবহার করে দাঙ্গা বাধানো হয়েছিল তার সুন্দর উল্লেখ করেছেন। যারা বল্লম-সড়কি ধরে যাদের ধর্ম রক্ষা করল তাদের ফেলে চলে আসা বিশ্বাসঘাতকতা নয় কি? উচ্চবর্ণীয় মানুষেরা যদি নিম্নবর্ণীয় মানুষদের ব্যবহার না করতেন তবে ভারতবিভাগ রোখা যেত কি না জানি না কিন্তু রক্তক্ষয়ী দাঙ্গা বন্ধ করা যেত এ কথা নিশ্চিত। দেশবিভাগ মানেই বিশ্বাসভঙ্গের ইতিহাস। কিন্তু স্বাধীনতা-উত্তর ভারতে দন্ডকের অসহায় মানুষদের সোনা-মাটির স্বপ্ন দেখিয়ে মরিচঝাঁপিতে নিয়ে এসে করুণ অবস্থার মধ্যে ঠেলে ফেলা বিশ্বাসঘাতকতা হয়নি কি?

মিহিরবাবু অন্যান্যদের মতো একই ভুল বয়ে নিয়ে চলেছেন। বিষাদবৃক্ষে এক জায়গায় লিখেছেন তফশিলি জাতির নেতারা মুসলিম লিগের সঙ্গে সমমনস্ক ছিল। এই ভুল থেকেই তখনকার তথাকথিত ভদ্রসমাজ মহাপ্রাণ যোগেন মন্ডলকে 'যোগেন মিঞা' আখ্যা দিয়েছিল। আসলে তফশিল নেতারা মুসলিম লিগের সমমনস্ক ছিলেন না সম নীতিতে চালে পড়ে থাকতে বাধ্য হয়েছিলেন। ১৯৪৬ খ্রিস্টাব্দের ২৪ আগস্ট অন্তর্বর্তী মন্ত্রিসভার নাম ঘোষণা করা হয়েছিল। মুসলিম লিগ মন্ত্রিসভার সদস্য হবার ব্যাপারে বিরত ছিল। অন্তর্বর্তী মন্ত্রিসভার সদস্যদের নাম ঘোষণা করার সঙ্গে সঙ্গে ড. আম্বেদকর প্রতিবাদ জানান। তাঁর মতে মন্ত্রিসভায় একজন তফশিলি সদস্য থাকাটা সমগ্র তফশিলি সম্প্রদায়কে বঞ্চিত করার নামান্তর। এই ব্যাপার ড. আম্বেদকর চলে গিয়েছিলেন ইংল্যান্ডে ক্ষমতাসীন লেবার পার্টির নেতাদের সঙ্গে দেখা করার উদ্দেশ্যে। ড. আম্বেদকারের প্রচেষ্টা ব্যর্থ করার জন্য ভারতে তখন ষড়যন্ত্র চলছিল। মুসলিম লিগ মত পরিবর্তন করে মন্ত্রিসভায় যোগ দেবার সিদ্ধান্ত নিয়েছিল। কংগ্রেসের পক্ষ থেকে বাবু জগজীবন রাম এবং মুসলিম লিগের পক্ষ থেকে ড. আম্বেদকারের বড় সমর্থক যোগেন মণ্ডলকে মনোনীত করে আম্বেদকরের রাজনৈতিক সংগ্রামকে ব্যর্থ করে দেওয়া হয়েছিল। মহাপ্রাণ যোগেন মন্ডল আজীবন তফশিলিদের উন্নতিকল্পে নিজেকে উৎসর্গ করেছিলেন। তাঁর ভারতে ফিরে আসাও এক করুণ কালা-ইতিহাস।

অধুনা পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষক-অধ্যাপক, কবি-প্রাবন্ধিক, ঔপন্যাসিক-গল্পকার, মন্ত্রী ও শিল্পী বেশিরভাগই ওপার বাংলার মানুষ এবং বেশির ভাগই উচ্চবর্গীয় হিন্দু। কিন্তু বাংলাদেশে যে সকল সংখ্যালঘু হিন্দু আছে তাদেরকে নিয়ে এই সকল বুদ্ধিজীবীর কোনও মাথাব্যথা নেই। মুক্তিযুদ্ধের সময় যে সকল উদ্বাস্তু সীমান্তবর্তী অঞ্চলে এসেছিলেন তাদের অনেকের আজও কোনও পরিচয়পত্র নেই, কোন দেশের নাগরিক তারা নিজেরাই জানে না। দন্ডক ও আন্দামানে যাদেরকে পাঠানো হয়েছিল তাদের সন্তানসন্ততিরা বাংলা পড়ার সুযোগ পাচ্ছে না। এপার বাংলার বুদ্ধিজীবীরা এসব প্রশ্নে নীরব এবং তাদের যেন কোনও দায়বদ্ধতা নেই। প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর এরা কেমন শীতল-প্রগতিশীল।

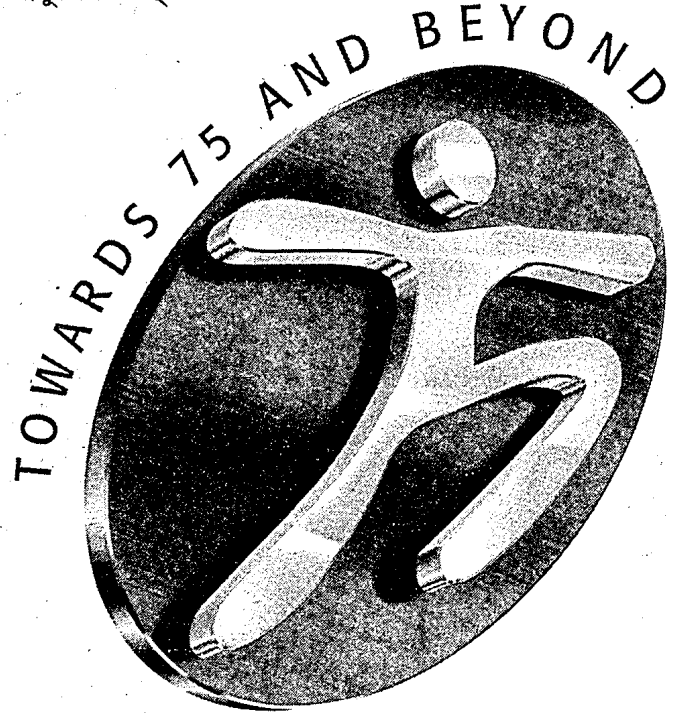
মিহিরবাবু আপনি আপনার বিষাদবৃক্ষে গভীর উপলব্ধি দিয়ে নিম্নবর্ণীয় মানুষের চালচিত্র রচনা করেছেন। আপনার বাড়ির পাশে এখন আর পিছরার খাল নেই কিন্তু আপনি এখন তো ভাগীরথীর পশ্চিমপাড়ের বাসিন্দা। লিখুন না বর্তমান বাংলার অন্ত্যজ মানুষদের জীবনযুদ্ধের ইতিহাস নিয়ে আর একখানা "বিষাদ-সিন্ধু"। সে বই হয়ত পুরস্কার পাবে না কিন্তু হয়ে থাকবে কালচেতনার দলিল।

দেবাশিস মন্ডল
২৮/২, ওঁকারমল জেটিয়া রোড
হাওড়া-৩

The symbol of trust™
Since 1932

আমাদের শক্তি

কোটি কোটি মানুষের আস্থা



আমাদের ভবিষ্যৎ

সকলের সুখ ও সমৃদ্ধি

সাত দশকেরও বেশী সময় ধরে আমরা পথ চলেছি। লাভ করেছি কোটি কোটি মানুষের অটুট আস্থা।
আজ, আমরা যখন এগিয়ে চলেছি শতবর্ষের দিকে, আমাদের অঙ্গীকার - আমরা কাজ করে যাব প্রতিটি ভারতবাসীর সুখ ও সমৃদ্ধির জন্য।

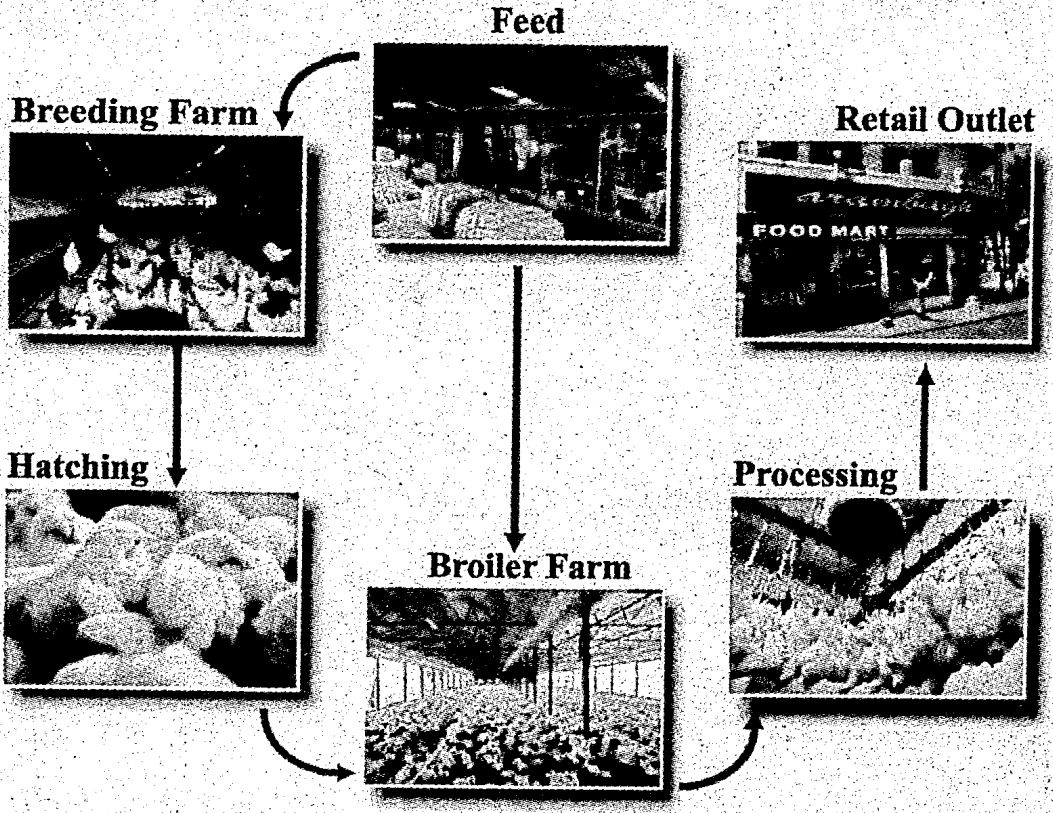
আমাদের গর্ব ঃ ৭৪ বছরের অমূল্য অভিজ্ঞতা । ম্যাচিওরিটি পেমেন্ট বাবদ মেটানো হয়েছে ১২,০০০ কোটি টাকারও বেশি। ৯০ শতাংশের বেশি বিনিয়োগ করা হয়েছে অনুমোদিত ক্ষেত্রগুলিতে । সাড়ে চার কোটি সন্তুষ্ট গ্রাহক । লক্ষ লক্ষ প্রতিনিধি।

The Peerless General Finance & Investment Company Limited
Peerless Bhawan, 3 Esplanade East, Kolkata 700 069, Ph: 033 22483247, Website: www.peerless.co.in,
sms 'smart' to 4545, call toll free helpline 1600 345 1932.

Peerless
Smart Financial Solutions

Arambagh Hatcheries Ltd.

The only fully integrated poultry organisation in India.



There is full traceability of its branded Chicken products right through the supply chain

SGS

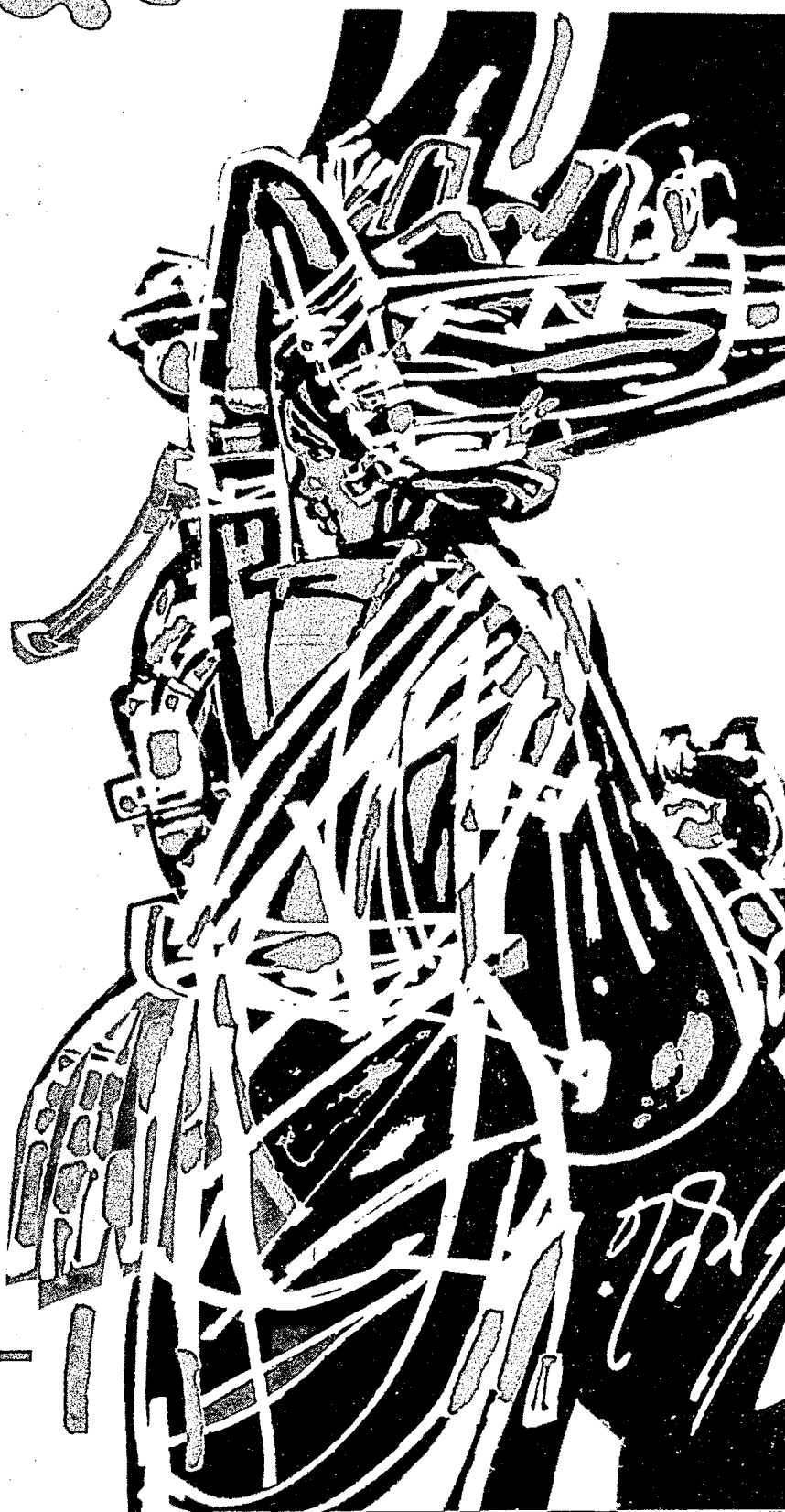
FQF stands for Safe Quality Food
HACCP stands for - Hazard Analysis & Critical control Points

HELP LINE
+91-9433016314

Arambagh's chicken

য়ুন কবির এবং আতাউর রহমান প্রতিষ্ঠিত

বর্ষ ৬৫ সংখ্যা ৪ শ্রাবণ-আশ্বিন ১৪



াস্ত্রের তত্ত্ব মানবিক মূল্যবোধ বিবর্জিত
া অভিপ্রেত নয়, অধ্যাপক হীরেন্দ্রনাথ
র বিচার।

ঠবিদের দৃষ্টিতে ফ্রয়েড দেড়শতবর্ষে
নমীক্ষণের সাম্প্রতিকতা যাচাই
ছেন ড. দিলীপকুমার সিংহ

ার সময়ের কথা'-য় এবার সত্যেন্দ্রনাথ
অতুল গুপ্ত, সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর,
দানন্দিনী দেবী প্রমুখের কথা

া পথের রাঙা ধুলায়'-এ এবার সংখ্যা-
বদ আল্লামা মাশরিকি, স্ট্যালিনের
। সোভিয়েট রাশিয়ার বিদেশনীতির
কার ভিসিনিস্কির প্রসঙ্গ, গান্ধীজিকে
নির্মলকুমার বসুর বই নিয়ে বিতর্ক
কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের
স্মরণীয় দুই পিওনের কথা।

াজি ভাষায় প্রথম ভারতীয় আত্ম-
নীকার দীন মহম্মদের ঐতিহাসিক
ত্বের তথ্যসমৃদ্ধ পর্যালোচনা

দ মুজতবা আলীর দুটি অপ্রকাশিত
তা

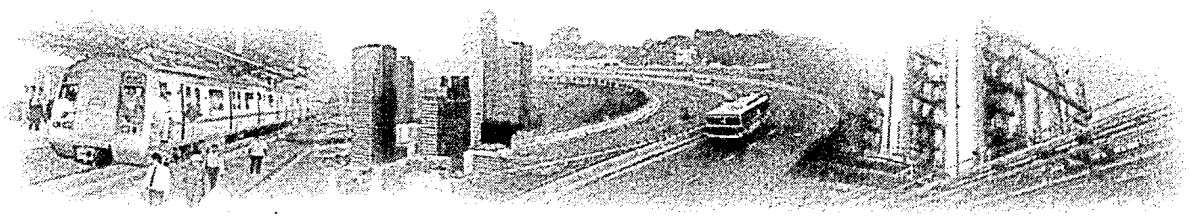
কতার সেকাল নির্ভেজাল ভাল ছিল
-অভিজ্ঞতা ও বিশ্লেষণসমৃদ্ধ সন্দর্ভ।

লন্দু দাশগুপ্তর Themes and
iations গ্রন্থটির রিভিউ করেছেন
দরঞ্জন রায়।

সুজ্জামান এবং চেখভ-কে নিয়ে দু'টি
লনগ্রন্থের আলোচনা।

ত তাপস সেন স্মরণে কুমার রায়,
নুর রহমান স্মরণে শৈলেশকুমার
্যোপাধ্যায় এবং শামসুর রাহমান স্মরণে
দুর রাউফের শ্রদ্ধার্ঘ্য।

Strength of Steel. Reinforced by SAIL



From high rise buildings and metro stations to bridges, flyovers, dams and power projects, SAIL has been at the forefront of the country's steel needs.

The biggest in India and one of the largest steel manufacturers in the world, SAIL has been involved in building the nation by providing complete solution to the country's diverse steel needs.

SAIL's range of products include :
• Hot Rolled Sheets and Coils • Cold Rolled Sheets and Coils • Galvanised Sheets (Plain/Corrugated) and Galvanised Coils • Plates • Electrical Steel Sheets • Tin Plates • Rails, Wheels and Axles • Structurals, Bars and Rods • ERW Pipes & Spirally Welded Pipes • Billets/Blooms/Slabs • Stainless/Alloy Steels

Chiranjit

www.sail.co.in

STEEL AUTHORITY OF INDIA LIMITED

There's a little bit of SAIL in everybody's life

With best compliments from



Manaksia Limited

Manufacturers of

- Aluminium Rolled Products
- Aluminium Alloy Ingots
- Mosquito Repellent Coils
- Crown Closures
- Galvanized Steel Sheets
- ROPP Caps
- Barges, FRP Boats
- Hull blocks of marine vessels

Registered Office

8/1, Lalbazar Street, Bikaner Building, Kolkata - 700 001

Phone 033-2231 0050, 2243 5053 / 5054 / 5556

Fax 033--2230 0336, 2242 8470

E-mail info@manaksia.com • Website www.manaksia.com

With best compliments from :

BESCO LIMITED

STEEL FOUNDERS TO THE NATION

RAILWAY EQUIPMENT BUILDERS

Works & Head office :
8, Anil Maitra Road, Ballygunge,
Calcutta 700 019
Phone : (91) (33) 2440 6364/ 6365/4666
Fax : (91) (33) 2440 4075

Designer, Manufacturer and Exporter of Cast Steel Bogies for Freight Cars, High Tensile Centre Buffer Couplers, Friction Draft Gears, Austenitic Manganese Steel Crossing for Railway Permanent Way and Railway Wagons. We also cater to the needs of Defence,Mining, Steel Plants, Thermal Power Plants, Ship Building & Heavy Engineering Industry.

Product range includes carbon, low alloy and high Manganese Steel castings to International specification viz. JUS, GOST, DIN, ASTM, BS etc. A single piece may weigh from 100 Kgs. to 5,000 Kgs.

৫৫ বছর অতিক্রান্ত সংসদ-এর ধ্রুপদি সাহিত্যের বই

সাহিত্য ও সংস্কৃতি

বৈষ্ণব পদাবলী	৩০০.০০
রামায়ণ কৃত্তিবাস বিরচিত *সম্পা : হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়*	১৫০.০০
কাশীদাসী মহাভারত ২ খণ্ড *সম্পা : দেবনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় (প্রতিটি)*	১৫০.০০
চরিতকথা : *রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী*	৪০.০০
বিবেকানন্দ প্রশ্ন ও প্রসঙ্গ : *নিমাইসাধন বসু*	৭৫.০০
হারানো দিনের নাটক *সম্পা : পিনাকেশ সরকার*	১৫০.০০
সংস্কৃত নাটকের গল্প : *অমিতা চক্রবর্তী*	২৫.০০
দণ্ডনীতি : *নৃসিংহপ্রসাদ ভাদুড়ী*	১০০.০০
ঠাকুরবাড়ির কথা : *হিরন্ময় বন্দ্যোপাধ্যায়*	৮০.০০
স্বাধীনতা সংগ্রামে বরিশাল : *হীরালাল দাশগুপ্ত*	৮০.০০
চলার পথে দিনলিপি : *চারুবালা দত্ত*	১০০.০০
সংসদ বাংলা সাহিত্যসঙ্গী *সম্পা : শিশিরকুমার দাশ*	১২৫.০০

রচনাবলী

বঙ্কিম রচনাবলী-১,২	১৫০.০০/১৭৫.০০
বঙ্কিম রচনাবলী-৩ (সমগ্র ইংরেজি রচনা)	১০০.০০
মধুসূদন রচনাবলী	১২০.০০
রমেশ রচনাবলী	১২৫.০০
দ্বিজেন্দ্র রচনাবলী-১,২	১৩৫.০০/২০০.০০
গিরিশ রচনাবলী-১,২,৩	২২৫.০০/১৫০.০০/৮০.০০
গিরিশ রচনাবলী-৪,৫	১৩০.০০/১০০.০০
দীনবন্ধু রচনাবলী-১,২	১০০.০০
সত্যেন্দ্র কাব্যগুচ্ছ	২০০.০০
তারাশঙ্করের গল্পগুচ্ছ-১,২,৩ (প্রতিটি)	১৮০.০০
ক্ষিরোদপ্রসাদ নাটকসমগ্র-১,২ (প্রতিটি)	১৫০.০০
জ্যোতিরিন্দ্রনাথ নাটকসমগ্র-১	১৫০.০০
রজনীকান্ত কাব্যগুচ্ছ	১০০.০০

প্রকাশিত হল **SAMSAD ENGLISH-BENGALI DICTIONARY WITH SUPPLEMENT 270.00**

শব্দ, বিশিষ্ট প্রয়োগ প্রভৃতির সংখ্যা লক্ষের কাছাকাছি সাম্প্রতিকতম শব্দের চয়নে মূল্যবান

সাহিত্য সংসদ □ ৩২এ আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড □ কলকাতা ৭০০ ০০৯ □ ফোন ২৩৫০ ৭৬৬৯/৩১৯৫

অকাদেমির বাংলা গল্প-সম্ভার

বাংলা গল্প সংকলন-১ ৭০.০০
সম্পাদনা : অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় ও অজিতকুমার ঘোষ

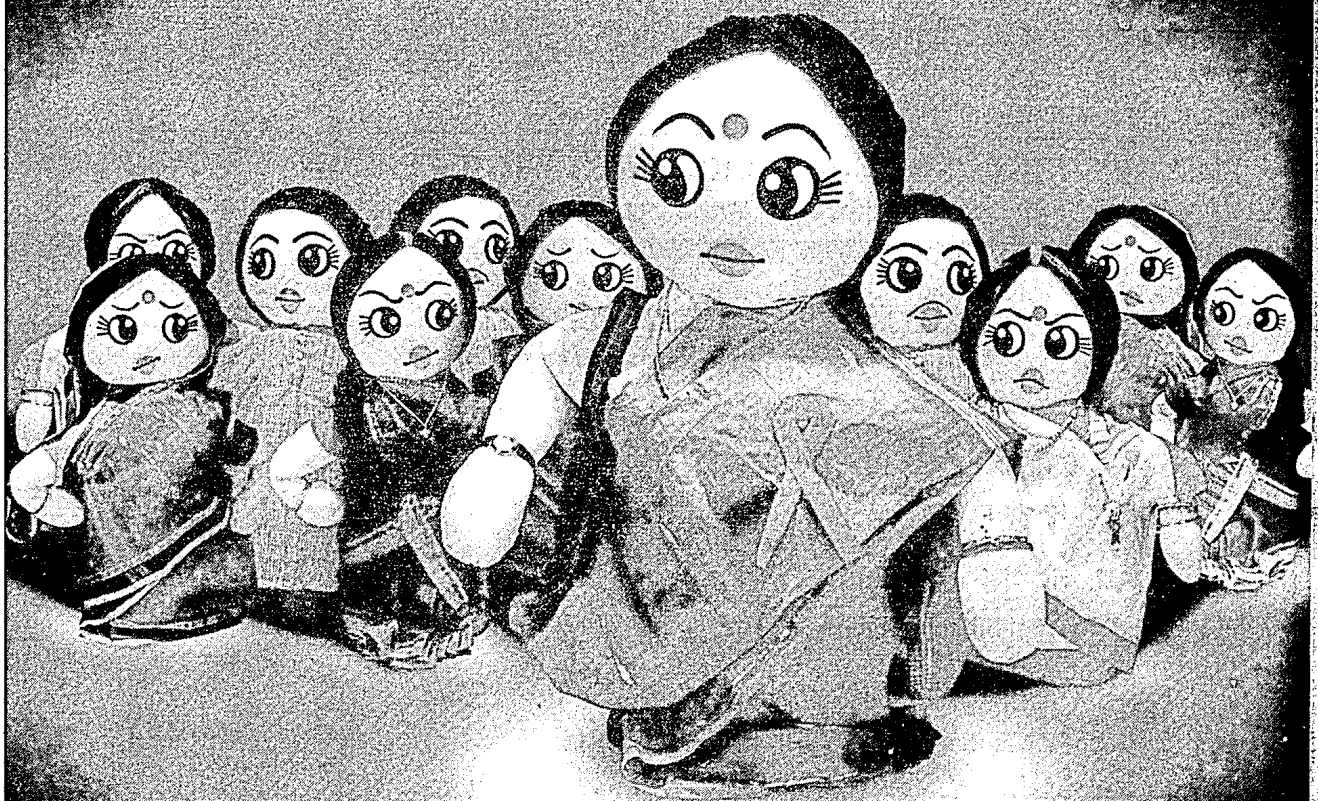
বাংলা গল্প সংকলন-২ ৮০.০০
সম্পাদনা : অশ্রুকুমার সিকদার ও কবিতা সিংহ

বাংলা গল্প সংকলন-৩ ৭৫.০০
সম্পাদনা : অশ্রুকুমার সিকদার

বাংলা গল্প সংকলন-৪ ১৪০.০০
সংকলন ও সম্পাদনা : সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়

সাহিত্য অকাদেমি
আঞ্চলিক দপ্তর
জীবন তারা, ২৩এ/৪৪এক্স, ডায়মন্ড হারবার রোড
কলকাতা ৭০০ ০৫৩, দূরভাষ ২৪৭৮১৮০৬ ।
প্রাপ্তিস্থান : অকাদেমি দপ্তর, দে বুক স্টোর, নাথ ব্রাদার্স
ঊষা পাবলিশিং, ন্যাশনাল বুক এজেন্সি ইত্যাদি

AIDS এর সাথে লড়াই
বুলাদির সাথে সবাই



AIDS বা HIV সম্বন্ধে আরও জানতে
বুলাদিকে ফোন করুন 1097-এ (toll free)



পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য এডস প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণ সংস্থা
পশ্চিমবঙ্গ সরকার



ক্ষমতায়ন নারী

সিদ্ধান্ত গ্রহণে সক্রিয় হোন

With Best Compliments of :

INDIA GLYCOLS LTD.

C - 124, OKHLA INDUSTRIAL ESTATE
PHASE - 1 • NEW DELHI - 110 020
PHONE : 6815772 • FAX : 6810373

ARAMBAGH'S NURSERY

59B, Chowringhee Road, Kolkata 700 020
Phone No. 033-2283-2603, Fax : 91-33-2283-2552
E-mail: arambagh@cal.vsnl.net.in

Proprietress

MRS. JAYA ROY

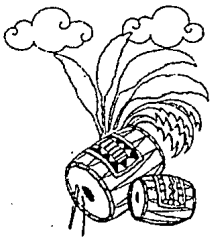
IMPORTER OF FLOWER SEEDS & PALM SEEDS
(U.S.A., AUSTRALIA, JAPAN, HOLLAND)
All kinds of Fruit and Flower Plants and selected ornamental,
Aromatic & Medicinal Plant

: SPECIAL PRODUCTS :

MANGO (Hyb.) AMLAKI (Grafted), KANTHAL (Grafted), ATA (Scented),
KOOL (Apple), IMLI (Sweet), JAMRUL (Green),
Insulin, Sugar Killer, Vanila Tree,
COCONUT (Gangabondhan), KAJU (grafted), EUPHORBIA

MILII & Different types of Spice Plants & Palms

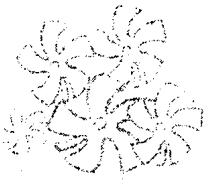
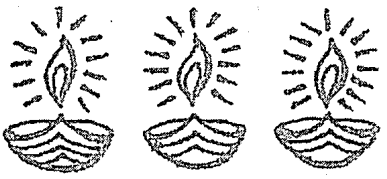
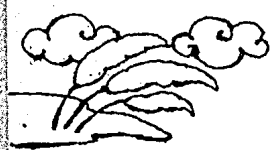
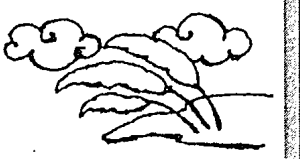
SEEDLINGS OF IMPORTED FLOWER SEEDS
& PALM SEEDS ARE ALSO AVAILABLE





মা আসছেন মর্ত্যলোকে
সঙ্গে পুত্র-কন্যা
প্যান্ডেলে প্যান্ডেলে চাই
স্নিগ্ধ আলোর বন্যা।
নিয়মকানুন মেনেই তবে
জ্বলবে যত আলো
পুজোর খুশি লাগুক মুখে
সবারই হোক ভালো।



WBSEB পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য বিদ্যুৎ পর্ষদ

WITH BEST COMPLIMENTS :

"TO BUILD A BETTER TOMORROW D.T.M OFFERS
A WIDE RANGE OF CIVIL ENGINEERING AND
DREDGING & DISILTING SERVICES UNDER ONE ROOF"

SPECIALISED IN THE CONSTRUCTION AND ERECTION OF :—

- MATERIAL HANDLING PLANTS
- LPG BOTTLING PLANTS
- 400 KV SUBSTATION & SWITCHYARD FOUNDATION
- MULTISTORIED BUILDING
- HOUSING COMPLEXES
- BRIDGE & ROADS
- FACTORY BUILDING & SHEDS
- GAS TURBINE PROJECTS
- MANUFACTURING OF PRE-STRESSED CONCRETE POLES
- DREDGING OF LAKES, CANALS, WATER RESERVOIR & RIVER BEDS
- HEAVY EQUIPMENTS FOUNDATION

D. T. M. CONSTRUCTION (INDIA) LIMITED

CIVIL/STRUCTURAL ENGINEERS and MASTER DREDGERS

Registered Office :

59B, CHOWRINGHEE ROAD, (3RD FLOOR)
CALCUTTA-700 020
PHONE : 2283 2538
TELE FAX : 22832545

35 Years' Dedicated Service to the Nation

চতুরঙ্গ

বর্ষ ৬৫ সংখ্যা ৪

শ্রাবণ-আশ্বিন ১৪১৩

প্রবন্ধ

- অর্থশাস্ত্র, তত্ত্ব ও মূল্যবোধ — হীরেন্দ্রনাথ রায় — ২১৯
- সিগমুন্ড ফ্রয়েড ও সাম্প্রতিকতা — দিলীপকুমার সিংহ — ২২৬

ধারাবাহিক স্মৃতিচারণ

- আমার সময়ের কথা — ননীমাধব চৌধুরী — ২৪১
- ভাঙা পথের রাঙা ধুলায় — সুখরঞ্জন সেনগুপ্ত — ২৬০

কবিতা ২৩৩-২৪০

❖ শম্ভু রক্ষিত ❖ আনন্দ ঘোষ হাজরা ❖ সুদেব বক্সী ❖ সতীনাথ বৈরাগ্য
❖ সুমন্ত মুখোপাধ্যায় ❖ সন্দীপন চক্রবর্তী ❖ শ্রীজাত ❖ জয়দেব বসু

সম্পাদক : আবদুর রাউফ

শিল্পপরিকল্পনা : রণেন আয়ন দত্ত

সম্পাদনা সহকারী : মেঘ মুখোপাধ্যায়

গল্প

- প্রশ্নবাচী — কুমার রাণা — ২৫৩

সাহিত্য-সমাজ-সংস্কৃতি

- উপনিবেশের প্রতিপ্রবাহ : দীন মুহম্মদ — সৌমিত্রশঙ্কর সেনগুপ্ত — ২৮০
- মুজতবা আলী, দু'টি অপ্রকাশিত কবিতা এবং এক বিস্মৃতপ্রায় ব্যক্তিত্ব — প্রসাদরঞ্জন রায় ও শিখা রায় — ২৮৭
- শিক্ষকতার সেকাল — চণ্ডিকাপ্রসাদ ঘোষাল — ২৯০

গ্রন্থসমালোচনা ২৯৮-৩০৮

❖ প্রসাদরঞ্জন রায় ❖ নিখিলেশ্বর সেনগুপ্ত ❖ মেঘ মুখোপাধ্যায়
❖ বুলবুল আহমেদ

স্মরণে

- আলোর কারবারি নয়, তাপস সেন আলোর মহাজন — কুমার রায় — ৩০৯
- অনন্য শামসুর রাহমান — আবদুর রাউফ — ৩১৩
- মিজানভাই — শৈলেশকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় — ৩১৫

উপদেষ্টামণ্ডলী

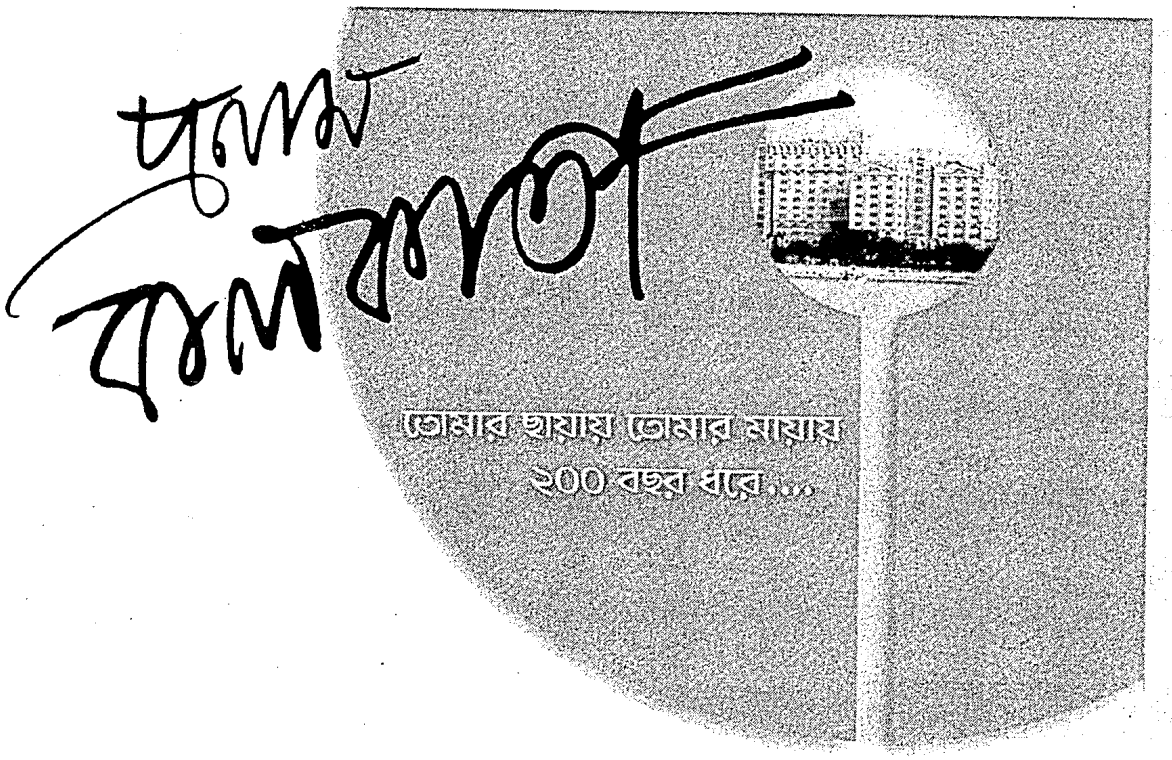
শঙ্খ ঘোষ
দেবব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়
সুখরঞ্জন সেনগুপ্ত
রণেন আয়ন দত্ত
তুষার তালুকদার

মূল্য : ৮৫
ডাকে : ১০

শ্রীমতী নীরা রহমান কর্তৃক ক্রান্তি প্রেস ৩৭ রিপন স্ট্রীট, কলকাতা-১৬ থেকে মুদ্রিত এবং ৫৪ গণেশচন্দ্র অ্যাভিনিউ, কলকাতা-১৩ থেকে প্রকাশিত

অক্ষর বিন্যাসে ক্রান্তি প্রেস ● ৩৭ রিপন স্ট্রীট, কলকাতা-১৬

RNI 3956/1970



State Bank of India

With you all the way since 1806

বর্ষ ৬৫ সংখ্যা ৪ তরুণ শ্রাবণ-আশ্বিন ১৪১৩

প্রবন্ধ

অর্থশাস্ত্র, তত্ত্ব ও মূল্যবোধ

হীরেন্দ্রনাথ রায়

আজকাল অনেকেই অভিযোগ করে থাকেন যে আধুনিক অর্থশাস্ত্র একটি বিশুদ্ধ বিজ্ঞানে পরিণত হওয়ার দরুন অর্থনৈতিক তত্ত্ব এবং সেই সম্বন্ধীয় সিদ্ধান্তের সঙ্গে মানবিকতা এবং নৈতিক মূল্যবোধের ছিটেফোঁটাও সম্বন্ধ নেই। এই অভিযোগ আংশিক সত্যের ওপর প্রতিষ্ঠিত। আংশিক সত্য সম্পূর্ণ মিথ্যার চেয়েও বেশি বিভ্রান্তিকর। তাই অভিযোগটির যাথার্থ বিচার করা জরুরি।

প্রথমে বিষয়টিকে অর্থশাস্ত্রের ঐতিহাসিক বিবর্তনের প্রেক্ষিতে বিচার করা যাক। অর্থশাস্ত্রের প্রতিষ্ঠাতা হিসাবে সর্বজনস্বীকৃত ব্যক্তি হলেন ইংরাজ দার্শনিক অ্যাডাম স্মিথ। দীর্ঘদিন গবেষণা, চিন্তাভাবনার পর তিনি ১৭৭৬ খ্রিস্টাব্দে একটি গ্রন্থ প্রকাশ করেন যার নাম *An Inquiry into the Nature and causes of the Wealth of Nations*। বইটি প্রকাশিত হবার পর অর্থশাস্ত্রের চরিত্রের খোলনলচেই পালটে গেল। এর আগে অর্থশাস্ত্র বলে কোনও আলাদা শাস্ত্রই ছিল না; যা ছিল তা ইতস্তত বিক্ষিপ্ত তৎকালীন অর্থনৈতিক বিষয়ের ওপর লেখা ছোটখাটো পুস্তিকা। এই লেখকদের pamphleteers অর্থাৎ পুস্তিকাকার বলা হত, অর্থনীতিবিদ বলা হত না। এঁদের অনেকেই যথেষ্ট জ্ঞানী ও বাস্তব সম্বন্ধে সচেতন ছিলেন। এঁদের লেখায় তথ্যের অভাব থাকত না। কিন্তু সব মিলিয়ে একটি সুসম্বদ্ধ শাস্ত্র গড়ে তোলার দিকে এঁদের নজর ছিল না। সেই কাজটি প্রথম করলেন অ্যাডাম স্মিথ। একটু লক্ষ করলে দেখা যাবে যে স্মিথের গ্রন্থে মূল শব্দটি হল Wealth অর্থাৎ জাতীয় সম্পদ। দেশের সম্পদের প্রকৃতি ও তার বৃদ্ধির কারণ বিশ্লেষণ করার গুরু দায়িত্বটি কাঁধে তুলে নিয়েছিলেন দার্শনিক পণ্ডিত অ্যাডাম স্মিথ। স্মিথ অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে দর্শন অধ্যয়ন করেছিলেন। পরে গ্ল্যাসগো বিশ্ববিদ্যালয়ে Moral Philosophy অর্থাৎ নৈতিক দর্শনের অধ্যাপনার কাজ করেন। দীর্ঘদিন ধরেই অর্থশাস্ত্র নীতিশাস্ত্রের একটি শাখা বলেই বিবেচিত হত; অর্থশাস্ত্রের নিজস্ব কোনও স্বতন্ত্র রূপ ছিল না। স্মিথ *wealth of Nations*-এ অর্থশাস্ত্রকেই প্রাধান্য দিলেন; কিন্তু নীতিশাস্ত্রের মূল বক্তব্য থেকে সম্পূর্ণ সরে এলেন না। মানুষের মনে যে অন্তর্জাত একটি নীতিবোধ আছে তাকে বিসর্জন দিয়ে অর্থশাস্ত্রের প্রবর্তন করার তিনি পক্ষপাতী ছিলেন না।

স্মিথের আগে জাতীয় সম্পদ নিয়ে আলোচনা করেছেন দু'টি গোষ্ঠী। একটি Mercantilist বা বাণিজ্যসর্বস্বতা মতবাদী গোষ্ঠী এবং অপরটি physiocrats বা ভূমিপ্রাধান্যবাদী গোষ্ঠী। স্মিথ তাঁর গ্রন্থে এই দুই গোষ্ঠীর ধ্যানধারণাকে ত্রুটিপূর্ণ বলে প্রমাণ করেছেন। প্রথম গোষ্ঠীরা মনে করতেন যে মুদ্রাই (তৎকালীন সোনা, রুপো বা অন্য কোনও মূল্যবান ধাতু) হল দেশের প্রকৃত সম্পদ। দেশের স্বর্ণভাণ্ডার বাড়াতে পারলেই দেশের সমৃদ্ধি ঘটবে। এর জন্য যত বেশি সম্ভব আমদানি কম করে রপ্তানি বাড়িয়ে যেতে হবে যাতে দেশের মুদ্রাভাণ্ডার ক্রমশই স্ফীতি লাভ করে। তাত্ত্বিক বিচারে এই ধারণা সম্পূর্ণ ভুল, এটি নানাভাবে প্রমাণিত। তাছাড়া সোনারূপা বাড়লেই দেশের জনসাধারণ কীভাবে যে উপকৃত হবে সে বিষয়ে মার্কেন্টিলিস্টরা প্রায় নিশ্চুপ। অর্থাৎ জনগণের ভালমন্দের বিচারে যে নৈতিকতার প্রশ্নটি সামনে এসে পড়ে, সে কথা এঁদের মাথাতেই আসেনি। ভূমিপ্রাধান্যবাদীদের দৃষ্টিভঙ্গি একপেশে। এঁরা কৃষিকেই সম্পদ বৃদ্ধির একমাত্র উৎস বলে মনে করতেন, কারণ তাঁদের মতে, কৃষি থেকেই একটা উদ্বৃত্ত (surplus) পাওয়া যায়। শিল্প থেকেও যে উদ্বৃত্ত আসতে পারে সেটা এঁরা বুঝতে পারেননি। তাছাড়া স্মিথ যখন *Wealth of Nations* লেখেন তখন ব্রিটেন শিল্পবিপ্লবের দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে। নতুন নতুন শিল্পের সম্ভাবনা দেখা দিচ্ছে, লোকে শিল্পে কাজ পাচ্ছে, বেকারসমস্যার তীব্রতা ক্রমশই ক্ষীয়মান, লোকের আয় বাড়ছে, দারিদ্র দূর হচ্ছে। এই পরিস্থিতিতে শিল্পকে অবহেলা করে শুধু কৃষিতেই মনঃসংযোগ করলে ভুল করা হবে। তাছাড়া কৃষিজমি তো সীমিত, একটি প্রকৃতিদত্ত সম্পদ। শুধু

চাষ করে আর কতদূর এগনো যাবে। স্মিথ এই দুই মতবাদকে খণ্ডন করে একটি যুক্তিনির্ভর সুশৃঙ্খল শাস্ত্র গড়ে তুলতেই আগ্রহী হলেন। এ বিষয়ে তাঁর বিশিষ্ট বন্ধু David Hume তাঁকে যথেষ্ট উৎসাহ দিয়েছিলেন এবং সাহায্য করেছিলেন। স্মিথের দৃষ্টিভঙ্গি বহুমুখী ছিল। তিনি সমাজজীবনের বিভিন্ন দিকের ওপর নজর দিয়েছিলেন। উৎপাদন বৃদ্ধির প্রথম সোপান হিসাবে তিনি শ্রমবিভাজন (division of labour) এর ওপর জোর দিয়েছিলেন। একজন শ্রমিককে যদি কোনও কাজের সবটাই করতে হয় তাহলে সে একদিনে যতটা উৎপাদন করতে পারবে, তার থেকে অনেক বেশি পরিমাণ উৎপাদন সম্ভব যদি পুরো কাজটিকে নানা স্তরে ভাগ করে দেওয়া হয় এবং এক একজন শ্রমিক কাজের একটি অংশই করতেই থাকে। এর কিন্তু একটি খারাপ দিকও আছে। পুরো কাজের একটি অংশই যদি একভাবে কেউ করতে থাকে তাহলে কাজটি তার কাছে একঘেয়ে হয়ে যাবার সম্ভাবনা বিস্তর। এতে শ্রমিক শীঘ্রই ক্লান্ত হয়ে পড়ে, বিরক্তবোধ করে এবং কাজে অনীহা দেখা দেয়। এতে সমাজের সমূহ ক্ষতি। উৎপাদন বৃদ্ধির প্রচেষ্টায় শ্রমিকদের মধ্যে যে বিচ্ছিন্নতাবোধ (alienation) আসতে পারে, এই মানবিক দিকটি কিন্তু দার্শনিক অর্থশাস্ত্রী স্মিথের লেখায় সুস্পষ্ট। এটাই তাঁর বৈশিষ্ট্য ও মূল্যবোধের পরিচায়ক।

স্মিথ অবাধ বাজার-ব্যবস্থার ওপর জোর দিয়েছেন। প্রতিযোগিতার বাতাবরণে জিনিসপত্রের দাম সর্বনিম্নস্তরে পৌঁছবে এবং বিক্রেতা ন্যূনতম স্বাভাবিক মুনাফা (normal profit) লাভ করবে। এটি সম্ভব হবে জোগান-চাহিদার ঘাত-প্রতিঘাতে। এই প্রসঙ্গেই স্মিথ একটি বিতর্কমূলক অথচ মূল্যবান কথা বলেছেন। তাঁর মতে প্রত্যেক মানুষই নিজেকে খুব ভালবাসে এবং যে কাজই করে তা নিজের স্বার্থসিদ্ধির উদ্দেশ্যেই করে। এর বাইরে তার কোনও উদ্দেশ্যই নেই। Self-interest এবং self-love আমাদের জীবনে সর্বক্ষেত্রে প্রধান্য বিস্তার করে। এই প্রবন্ধের শেষ অংশে আমরা দেখব যে স্মিথের এই মতবাদ সব অর্থশাস্ত্রী মেনে নেন না। এই সূত্রেই স্মিথ আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ মত উপস্থাপিত করেছেন। আপাতদৃষ্টিতে মনে হতে পারে যে সকলেই যদি নিজের স্বার্থসিদ্ধির কথা ভেবে কাজ করে তাহলে পারস্পরিক সংঘাত অনিবার্য। স্মিথ কিন্তু তা মনে করেন না। তিনি বলেন যে যতই সংঘাতের সম্ভাবনা থাকুক না কেন, শেষ পর্যন্ত কিন্তু সামাজিক সমন্বয় (social harmony) ঘটবে। এটি হবে বাজারে অবাধ প্রতিযোগিতার ফলে। সামাজিক সমন্বয়ের এই মতবাদ তাঁর *Theory of Moral sentiments* (1759)-এও প্রতিষ্ঠিত।

স্মিথ সব সময়েই মানুষের কথা ভেবেছেন; নিছক অর্থশাস্ত্রীয় কচকচি তাঁর মনঃপূত ছিল না। বিস্তৃত আলোচনায় এসবের উল্লেখ হয়ত করা যেত। কিন্তু আমার উদ্দেশ্য একটু ভিন্ন। তাঁর মূল্যবোধের দিকটিই আমি প্রধানত তুলে ধরতে চাই। এই সূত্রেই স্মিথ মনে করেন শুধু উৎপাদন বৃদ্ধিই অর্থশাস্ত্রের উদ্দেশ্য হতে পারে না। অর্থশাস্ত্রের উদ্দেশ্য হল জনগণের উপভোগ (consumption) বৃদ্ধি করা। তাই স্মিথ ব্যবসায়ীশ্রেণিকে দ্ব্যর্থহীন ভাষায় নিন্দা করেছেন। বলেছেন যে যখনই তাঁরা এক সঙ্গে জড়ো হন তখনই অভিসন্ধি চলতে থাকে যে কী করে জনগণকে শোষণ করা যায়। শিল্পের অগ্রগতির জন্য ধনিকশ্রেণির ভূমিকা যথেষ্ট হলেও এঁদের পক্ষে তিনি কোনও যুক্ত খাড়া করেননি।

পক্ষান্তরে শ্রমিকশ্রেণি কিছুটা শোষিত হলেও তাদের সম্বন্ধেও কোনও খেদোক্তি করেননি। স্মিথের স্পষ্টোক্তি Consumption is the sole end and purpose of all production , এবং এরপর সেই সমাজব্যবস্থাকে তীব্র ধিক্কার দিয়েছেন এই বলে যে যেসব ব্যবস্থা শুধু বিনিয়োগকারীদের স্বার্থ দেখে এবং উপভোক্তাদের স্বার্থ ক্ষুণ্ণ করে সেই আর্থব্যবস্থা ঘৃণ্য এবং সর্বতো-পরিত্যাজ্য। মানবিক মূল্যবোধের এর চেয়ে ভাল উদাহরণ আর কী হতে পারে।

স্মিথ সম্বন্ধে প্রারম্ভেই এত কথা বলার একটিমাত্র উদ্দেশ্য হল যে অর্থশাস্ত্র যখন স্মিথের হাতে একটি সামাজিক বিজ্ঞানে পরিণত হচ্ছে তখন কিন্তু অর্থশাস্ত্র নীরস মূল্যবোধহীন আলোচ্য একটি বিষয় ছিল না। মানবকল্যাণে প্রয়োগ করার উদ্দেশ্যেই এটি গঠিত হচ্ছিল। এই সূত্রেই স্মিথ শিক্ষা, বিশেষ করে উচ্চশিক্ষার ওপর জোর দিয়েছিলেন। তিনি বলেছেন যে বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপকদের কোনও নির্দিষ্ট বেতন থাকবে না। ছাত্রেরা আসবে এবং অধ্যাপকের অধ্যাপনার ভিত্তিতে একটি মূল্য ধরে দেবে। এর ফলে অধ্যাপক বাধ্য হবেন নিজেকে ঠিকভাবে তৈরি করে নিতে এবং যথাসাধ্য ভাল করে পড়াবার চেষ্টা করবেন। তা না হলে দিনদিন ছাত্রসংখ্যা কমবে এবং অধ্যাপককে হয়ত ভুখা মরতেও হতে পারে। আজকাল বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপকেরা স্মিথের এই দাওয়াই মানবেন? মনে তো হয় না।

স্মিথের এই মন্তব্যকে হালকা রসিকতা বলে মনে করলে ভুল হবে। এর পেছনে একটি অর্থনৈতিক তত্ত্ব আছে, যা হল যখন একটি কাজের ভালমন্দ বিচারের সঙ্গে তাঁর আর্থিক প্রতিদানের কোনও যোগসূত্র থাকে না, তখন অবশ্যম্ভাবী ভাবেই কর্তব্যে অবহেলা করার প্রবণতা দেখা দেয়।

এ কথা স্মিথ মানতেন না। এই জন্যই তিনি আয় বিভাজনের কথাও বলেছেন। আয়ের সমবণ্টন না হলে ধনী

ব্যক্তিরাই অধিক মুনাফা করে লাভবান হবেন এবং দরিদ্রশ্রেণির মানুষেরা ক্ষতিগ্রস্ত হবেন, এটি কোনও শুভবুদ্ধিসম্পন্ন অর্থশাস্ত্রীই সমর্থন করবেন না। তাঁর আয় বিভাজন তত্ত্বের কয়েকটি ত্রুটি আছে, একথা মানলেও এটি অস্বীকার করা যায় না যে আর্থব্যবস্থায় সমবণ্টন অতি প্রয়োজনীয়। এখানেও আবার স্মিথ তাঁর মূল্যবোধের দর্শন দ্বারা প্রভাবিত। অসম-বণ্টন দূর করার জন্য সরকারকে কী ধরনের কর-ব্যবস্থা চালু করতে হবে, সে বিষয়ে স্মিথ তাঁর গ্রন্থে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। ধ্রুপদী অর্থতত্ত্বকে এই কারণেই political economy অর্থাৎ রাষ্ট্র দ্বারা পরিচালিত অর্থশাস্ত্র বলা হয়। অর্থশাস্ত্র Economics হয়ে উঠেছে নয়া-ধ্রুপদী অর্থতত্ত্বে (Neo-classical economics)। সে কথায় পরে আসছি।

ধ্রুপদী অর্থতত্ত্বে স্মিথের উত্তরসূরি ছিলেন ডেভিড রিকার্ডো (1772-1823) স্মিথ মূলত দার্শনিক ছিলেন এবং নীতিশাস্ত্রের অঙ্গন থেকে অর্থবিদ্যার ক্ষেত্রে প্রবেশ করেছিলেন। রিকার্ডো এসেছিলেন বৈষয়িক কাজকারবার থেকে। তাই রিকার্ডোর আলোচনায় আর্থব্যবস্থার বিভিন্ন অঙ্গের সম্পর্ক নিয়ে স্পষ্টতর আভাস পাওয়া গেলেও নৈতিকতার কোনও প্রশ্ন সেখানে স্থান পায়নি বললেই চলে।

রিকার্ডো দেশের সম্পদ বৃদ্ধির কারণ নিয়ে মাথা ঘামান নি। তাঁর প্রধান লক্ষ্য ছিল দেশের সম্পদ কীভাবে বিভিন্ন শ্রেণির মধ্যে বিভাজিত হয়। এই নিয়ে তাঁর বিস্তারিত আলোচনা আছে। সেসব নিছক অর্থতত্ত্বের কথা। সম্পদ এবং জনগণের আয় কীভাবে পরিমাপ করা যায় সেদিকে তিনি অনেকটা নজর দিয়েছিলেন। এই প্রসঙ্গেই তিনি মূল্যের শ্রমভিত্তিক তত্ত্ব অনুসরণ করেছিলেন, অর্থাৎ কোনও দ্রব্যের উৎপাদনে কতখানি শ্রম ব্যয়িত হচ্ছে তারই ভিত্তিতে মূল্য নির্ধারিত হবে, এমনই সিদ্ধান্ত করা হয়েছিল। রিকার্ডোর তত্ত্বে ত্রুটি ছিল, সেকথা সব অর্থনীতিবিদই জানেন। একটি কথা অবশ্য তিনি বলেছিলেন যা পরবর্তী কালে কার্ল মার্কসের লেখায় প্রকট রূপ নিয়েছিল। রিকার্ডোর মতে শ্রমিক যে পরিমাণ শ্রম ব্যয় করেন সেই অনুযায়ী মজুরি পান না। তিনি শোষিত হন। লাভের গুড় ঘরে তোলেন মালিকশ্রেণি—বাড়তি মুনাফা হিসাবে। এই শোষণ নীতিসম্মত কি না তা নিয়ে রিকার্ডোর কোনও মাথাব্যথা ছিল না। তিনি শুধু রসকষবিহীন তত্ত্ব আলোচনায় আনন্দ পেতেন। তবে একথাও তিনি বলেছিলেন যে দীর্ঘমেয়াদে এই বাড়তি মুনাফা লাভ করা যাবে না। কয়েকটি তাত্ত্বিক কারণে মুনাফার হার ক্রমশই কমতে থাকবে এবং আর্থব্যবস্থার সেই পরিণতি ঘটবে যাকে ইংরাজিতে Stationary State, অর্থাৎ পরিবর্তনহীন পরিস্থিতি বলা হয়েছে। এই অনড় পরিস্থিতি কতদিন চলবে, তার থেকে মুক্তি পেয়ে ধনতান্ত্রিক আর্থব্যবস্থা আবার চাঙ্গা হয়ে উঠবে কি না, সেসব কথা আমরা রিকার্ডোর বিখ্যাত গ্রন্থ *Priciples of Political Economy and Taxation (1817)*-এ বিস্তারিতভাবে পাই না। একটা কথাই এখানে জোর দিয়ে বলতে হবে যে অর্থশাস্ত্র রিকার্ডোর হাতে ক্রমশই নীতিশাস্ত্র থেকে সরে আসছে এবং সুদৃঢ়ভাবে বিজ্ঞানসম্মত হয়ে উঠছে।

বলাই বাহুল্য যে অর্থশাস্ত্র একটি সামাজিক বিজ্ঞান। তাই অর্থনৈতিক কর্মকৌশলের দ্বারা সাধারণ মানুষ উপকৃত হচ্ছে কি না তা বিচার করা জরুরি। উপকার বা অপকারের কথা উঠলেই নীতির প্রশ্নটি এসে পড়ে। সুতরাং নৈতিকতা বিবর্জিত একটি রুঠো তত্ত্বসম্বলিত বিজ্ঞান খাড়া করার যৌক্তিকতা নিয়ে অনেকেই আজ সরব হয়েছেন। পুনরুক্তি করে বলি নৈতিকতা এবং মূল্যবোধকে বাদ দিয়ে একটি সমাজবিজ্ঞান গঠন করা সঙ্গত নয়; বোধহয় তা করা সম্ভবও নয়।

কার্ল মার্কস (1818-1883) ধ্রুপদী গোষ্ঠীরই একজন। অবশ্য তাঁর চিন্তাভাবনা ধ্রুপদী তাত্ত্বিকদের চেয়ে ভিন্নতর ছিল। তাঁর অন্বিষ্ট ছিল ধনতান্ত্রিক আর্থব্যবস্থার গতিশীলতার নিয়মগুলি (laws of motion of society)। তাঁর মতে ধনতন্ত্র যতদিন টিকে থাকবে ততদিন শ্রমিকশ্রেণির স্বার্থ ক্ষুণ্ণ হবেই। জনসংখ্যার একটি বড় অংশই হল এই শ্রমিকশ্রেণি। তারা যদি ধনতন্ত্রের অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে ক্রমাগত দরিদ্রতর হতে থাকে তাহলে কীসের অর্থনৈতিক উন্নয়ন। মালিকেরা শ্রমিক শোষণ করে উদ্বৃত্ত মূল্য (surplus value) সৃষ্টি করে এবং সেই উদ্বৃত্ত মূল্য বিনিয়োগ করে আরও বেশি মুনাফা করে। কী করে এই উদ্বৃত্ত মূল্য সৃষ্টি হয় তা তিনি একটি তত্ত্বের সাহায্যে ব্যাখ্যা করেছেন। সে তত্ত্ব এখানে আলোচনা করার সুযোগ নেই। এইভাবে মূলধন গঠন, তাঁর মতে, দীর্ঘদিন চলতে পারে না। ক্রমাগত বিনিয়োগের ফলে শ্রমের চাহিদা বাড়ে এবং মজুরি বৃদ্ধি পায়। মুনাফার হার বজায় রাখতে মালিকপক্ষ শ্রম-সঞ্চয়ী মূলধন-নিবিড় প্রযুক্তি ব্যবহার করতে থাকেন, ফলে বেকারের সংখ্যা ক্রমাগত বাড়তেই থাকে। এর নিদারুণ ফলস্বরূপ শ্রমিকশ্রেণি দলবদ্ধ হয়ে মালিকপক্ষের সঙ্গে সংঘাতের জন্য প্রস্তুত হতে থাকে। শ্রেণি দ্বন্দ্ব ক্রমশই দানা বাঁধে। পরিশেষে নানাকারণে বিপর্যয়ের সৃষ্টি হয় এবং ধনতন্ত্রের সন্ধিক্ষণ (crisis) দেখা দেয়। শেষমেশ ধনতন্ত্র ভেঙে পড়ে এবং communist রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হয়। ইতিহাস মার্কসের এই ভবিষ্যদবাণী ভুল প্রমাণিত করেছে। সে যাই হোক, এখানে আমার বক্তব্য হল

মার্কসের এই prognosis ভ্রান্ত হলেও তিনি যে শ্রমিকস্বার্থের কথা ভেবেই তাঁর অর্থতত্ত্ব খাড়া করেছেন তাতে তাঁর জনদরদি মনের পরিচয় পাওয়া যায়। তিনি জার্মান দার্শনিক হেগেলের ছাত্র ছিলেন; হেগেলের সব কথা না মানলেও দার্শনিকসুলভ তাঁর স্পর্শকাতর মনের যে পরিচয় আমরা পাই তাতে নৈতিকতার সুস্পষ্ট আভাষ মেলে। তাঁর নিশ্চয়ই একটা মূল্যবোধ ছিল, যাকে তিনি আড়াল করে অর্থতত্ত্বের মাধ্যমে তাঁর বক্তব্য পেশ করেছিলেন। অর্থনৈতিক তত্ত্বে এখানে অন্তত প্রচ্ছন্নভাবে একটা গভীর মূল্যবোধ আছে এবং এই কারণেই মার্কসের আলোচনাকে আজও সম্পূর্ণ বিস্মৃত হওয়া সম্ভব হয়নি। মার্কসবাদ সম্বন্ধে তর্কবিতর্ক আজও সমানে চলছে।

ধনতন্ত্রের অনিবার্য ধ্বংসের কথা বলে মার্কস ইংরাজ এবং ইউরোপীয় অর্থশাস্ত্রীদের মনে একটা ভীতির সঞ্চার করেছিলেন। ধ্রুপদী অর্থতত্ত্বের ভিত্তির ওপর দাঁড়িয়েই তিনি এই ভবিষ্যদ্‌বাণী করেছিলেন বলে সম্পূর্ণ ভিন্ন একধরনের অর্থতত্ত্ব গঠনের প্রয়োজনীয়তা দেখা দিল। অর্থতাত্ত্বিকেরা অনেকে মিলে একটি নতুন গোষ্ঠী প্রতিষ্ঠা করলেন যা ধ্রুপদী তাত্ত্বিকদের মতবাদ থেকে অনেকটাই আলাদা। এই গোষ্ঠীকে নয়া-ধ্রুপদী গোষ্ঠী (Neo-Classical school) বলা হয়। নয়া-ধ্রুপদী তাত্ত্বিকেরা ধ্রুপদীতাত্ত্বিকদের মতো সমষ্টিকেন্দ্রিক অর্থতত্ত্বের খুঁটিনাটি নিয়ে আলোচনা করেননি। বলাই বাহুল্য যে সমষ্টিকেন্দ্রিক সমস্যার আলোচনা করতে হলে পুরো সমাজকে নিয়ে ভাবতে হবে এবং অবশ্যম্ভাবীভাবে নৈতিকতা ও মূল্যবোধের প্রশ্নটি এসে পড়বে। মার্কস সেই দৃষ্টিকোণ থেকে ধনতন্ত্রকে বিচার করেছিলেন এবং শ্রেণিদ্বন্দ্বের মাধ্যমে ধনতন্ত্রের অনিবার্য পতনের কথা বলেছিলেন। নয়া-ধ্রুপদী তাত্ত্বিকেরা অর্থনৈতিক সমস্যাকে অন্য চোখে দেখলেন। তাঁরা ব্যষ্টিকেন্দ্রিক স্তরে (micro level) সমস্যাকে বিচার করতে শুরু করলেন। এঁরা সোজাসুজি বললেন যে অর্থবিদ্যার উদ্দেশ্য প্রবৃদ্ধি বা জনগণের উপভোগের সর্বোচ্চায়ন নয়। এর উদ্দেশ্য হল অর্থনীতিতে উৎপাদনের উপকরণগুলিকে এমনভাবে প্রতিস্থাপিত করা যাতে উৎপাদনের সর্বোচ্চায়ন ঘটে প্রান্তিকভাবে ন্যূনতম খরচে। পরিভাষায় বলা হয় efficient allocation of resources। এই তত্ত্ব খাড়া করতে নানা সূত্রের উদ্ভাবন করা হয়েছে যেগুলির ব্যাখ্যা হয়ত এখানে প্রাসঙ্গিক হবে না। আসল কথা হল ব্যষ্টিকেন্দ্রিক অর্থতত্ত্বে নৈতিকতার কোনও ছাপ নেই। নৈতিকতা ও মূল্যবোধ বর্জিত এই ধরনের তত্ত্ব দাঁড় করাতে এঁরা গণিতের ব্যাপক সাহায্য নিলেন। গণিত ব্যবহারের একটা বিরাট সুবিধা আছে। গণিত 'কারও' পক্ষে বা বিপক্ষে সায় দেয় না—গাণিতিক দৃষ্টিভঙ্গি নিরপেক্ষ। গাণিতিক নিয়ম অনুসারে যে সিদ্ধান্ত সঠিক, তাকেই মান্য করতে হবে। এতে আপনি ভুরিভোজ করুন, আর রাম, শ্যাম, যদু অনাহারে শুকিয়ে মরুক, এ নিয়ে গাণিতিক মাথা ঘামান না। এরকম নিষ্করুণ সিদ্ধান্ত কী কোনও সামাজিক বিজ্ঞানে গ্রাহ্য হতে পারে? দক্ষ সম্পদ প্রতিস্থাপন করতে গিয়ে যদি সমাজে অসম আয়বণ্টন দেখা দেয় তাতে গাণিতিক অর্থতাত্ত্বিকেরা অস্বস্তি বোধ করেন না। এই অসম আয়বণ্টন কীভাবে পরিমাপ করা যায়, তার গাণিতিক পদ্ধতির কথা চটজলদি তাঁরা বলতে পারেন। Gini Co-efficient এবং Lorenz Curve এসব গালভরা গাণিতিক পদ্ধতির কথা বলে এঁরা বিপক্ষ দলকে বিভ্রান্ত করতে পারেন। তবে যেসব অর্থশাস্ত্রী সামাজিক কল্যাণের কথা ভাবেন তাঁদের অস্বস্তি কিন্তু শেষ পর্যন্ত থেকেই যায়। নোবেলজয়ী প্রখ্যাত অর্থনীতিবিদ পল স্যামুয়েলসান বলেছেন যে গণিত একটি ভাষা—mathematics is a language—সুতরাং এই ভাষাও তো আমরা যে কোনও বিষয়ের আলোচনায় ব্যবহার করতে পারি। যদি গ্রিক, ল্যাটিন, ইংরাজি বা বাংলা ভাষা অর্থতত্ত্বের আলোচনায় ব্যবহার করা যায়, তাহলে গাণিতিক ভাষার বেলায় আপত্তি কেন? গাণিতিক ভাষার আরেকটি গুণ হল যে এই ভাষায় ভুল বোঝাবুঝির কোনও অবকাশ নেই, যা literary language-এর বেলায় সম্ভব। এই মতের একটি আপাত-যৌক্তিকতা আছে। অর্থতত্ত্বের অনেক বিষয়েই গণিতের প্রয়োগ অপরিহার্য। দৃষ্টান্ত হিসাবে ভালরা প্রবর্তিত সার্বিক সমস্থিতির (General quilibrium) উল্লেখ করা যায়। গণিত ছাড়া ধারণাটির ব্যাখ্যা করা প্রায় দুঃসাধ্য। এতদসত্ত্বেও অর্থশাস্ত্রে গণিতের যথেচ্ছ প্রয়োগের বিরোধিতা করেছেন নামকরা অনেক অর্থনীতিবিদই। যেমন জর্জ স্টিগলার আরেক নোবেলজয়ী অর্থনীতিবিদ—তাঁর একটি প্রবন্ধে ঠাট্টা করে বলেছেন যে গণিত শুধু একটি ভাষাই নয়, একে বিজ্ঞানের রানিও (Queen of sciences) বলে মনে করা হয়। তবে গণিত বিজ্ঞানের রানি হলেও গাণিতিক অর্থনীতিবিদ কখনওই রাজ্যশাসনকর্ত্রী রানির স্বামী হতে পারে না। স্টিগলারের ভাষায় 'If mathematics is the queen of sciences, the mathematical economist is seldom a prince consort'। ঠাট্টা হলেও এই উক্তির যাথার্থ অনস্বীকার্য। এখানে একটা কথা বলা খুবই জরুরি। আমার উদ্দেশ্য গণিতকে নস্যাৎ করা নয়—তা সম্ভবও নয়। আমার বক্তব্য হল অর্থশাস্ত্রের মতো একটি আপাদমস্তক সামাজিক

বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে শুধুমাত্র গণিত প্রয়োগ করার কয়েকটি বিশেষ অসুবিধা আছে। তাছাড়া অর্থতত্ত্বের আলোচনায় নীতি ও মূল্যবোধকে বাদ দিই কী করে? আমার ধারণা যাঁরা সর্বপ্রথম ব্যষ্টিকেন্দ্রিক প্রান্তিকতাভিত্তিক অর্থতত্ত্বের বিশ্লেষণের প্রবক্তা—যথা ইংল্যান্ডের Stanley Jevons, ফ্রান্সের লিওঁ ভালরা ও অস্ট্রিয়ার Carl Menges—এঁরা সবাই প্রথমজীবনে গণিতচর্চা করেছিলেন। পরে ইংল্যান্ডে অ্যালফ্রেড মার্শাল, যিনি গণিতে একজন প্রথমশ্রেণির র‍্যাংলার ছিলেন, নয়া-ধ্রুপদী অর্থতত্ত্ব নিয়ে যে আলোচনা করেছিলেন তা কিন্তু একটু ভিন্ন ধরনের। জেভন্‌সেরা শুধু গাণিতিক দিক থেকে সমস্যার সমাধানের প্রচেষ্টা করেছিলেন। অর্থনীতিতে কীভাবে সমস্থিতি প্রতিষ্ঠিত হয়, সে কথাই শুধু ভেবেছিলেন। ওই সমস্থিতি জনগণের স্বার্থসিদ্ধি করছে কি না, সেদিকে এঁদের ভ্রূক্ষেপ ছিল না। এ বিষয়ে শেষ কথা বললেন লন্ডন স্কুল অফ ইকনমিকসের অধ্যাপক Lionel Robbins। 1930 সালে তিনি একটি প্রভাবশালী বই—*An Essay on the Nature of Economic Science* লেখেন। সেখানে স্পষ্ট ভাষায় বললেন যে যখন কোনও পণ্যের জোগান ও চাহিদা সমান হয় তখনই বাজারে সমস্থিতি আসে, সম্পদ প্রতিস্থাপন দক্ষতম হয়। Equilibrium is just equilibrium—এই ভারসাম্যের পেছনে জনগণের অনুমোদন আছে, না নেই সেটা অর্থতাত্ত্বিকের দেখার কথা নয়। অর্থাৎ নৈতিকতা ও মূল্যবোধের ধারণাটি অর্থতাত্ত্বিকদের আলোচনার অন্তর্ভুক্ত নয়। কট্টর নয়া-ধ্রুপদী তাত্ত্বিকদের সম্ভবত এইটেই শেষ কথা। অ্যালফ্রেড মার্শাল অবশ্য প্রখ্যাত ইংরাজ নয়া-ধ্রুপদী তাত্ত্বিক হলেও একজন ব্যতিক্রমী তাত্ত্বিক ছিলেন। তাঁর *Principles of Economics* গ্রন্থে অর্থশাস্ত্রের অন্বিষ্টের কথা তিনি এইভাবে ব্যক্ত করেছেন: তাঁর ইংরাজি উক্তির তরজমা করলে বলা যায় যে অর্থশাস্ত্র মানুষের দৈনন্দিন জীবনের ব্যবসায়িক লেনদেনের হিসাব নিকাস (ordinary business of life) করার পদ্ধতি নিয়ে আলোচনা করে; বাস্তবে উপকরণগুলিকে কীভাবে সদ্ব্যবহার করলে সমাজের কল্যাণ হবে তারই সম্যক পর্যবেক্ষণ করাই অর্থশাস্ত্রের মূল উদ্দেশ্য। বলা যেতে পারে আধুনিক কল্যাণমূলক অর্থতত্ত্বের (Welfare Economics) শুরু হয়ত মার্শালের এই মতবাদের ওপর ভিত্তি করেই। অনেকে বলে থাকেন যে কেমব্রিজে মার্শালের সুযোগ্য ছাত্র অ্যালেক পিগুর লেখা *Wealth and Welfare* (1912) এবং পরবর্তী পর্যায়ের তাঁরই *Economics of Welfare* (1920, 4th edn)-এর বিভিন্ন সংস্করণে কল্যাণমূলক অর্থতত্ত্বের যে বিস্তৃত আলোচনা আছে সেখান থেকেই কল্যাণমূলক অর্থশাস্ত্র একটা স্বতন্ত্র নিজস্ব রূপ গ্রহণ করেছে। এটি অবশ্য বিতর্কের বিষয়। এখানে একটি মন্তব্য অপ্রাসঙ্গিক হবে না। মার্কিন দার্শনিক Will Durant বলেছেন Science gives us knowledge—বিজ্ঞান আমাদের তথ্য ও জ্ঞান দেয় মাত্র; একমাত্র দর্শনই আমাদের প্রাজ্ঞ করে তুলতে পারে—'Only philosophy can gives us wisdom।' একই মন্তব্য একটু অন্যভাবে বলেছেন ভারতীয় দার্শনিক সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণন; 'Greater Knowledge has not resulted in greater wisdom।'

যাঁরা আধুনিক কল্যাণমূলক অর্থতত্ত্বের আলোচনা করেন তাঁদের সুস্পষ্ট মত হল যে নয়া-ধ্রুপদী তাত্ত্বিকেরা যে অর্থশাস্ত্রকে নীতিশাস্ত্রের গণ্ডির বাইরে রাখতে চেয়েছেন তাতে আধুনিক অর্থশাস্ত্রের সমূহ ক্ষতি হয়েছে। অর্থশাস্ত্রের ঐতিহাসিক বিবর্তনের ইতিবৃত্ত আলোচনা করলে দেখা যায় যে অর্থশাস্ত্রের দু'টি উৎস মূল আছে। একটিকে ন্যায়শাস্ত্র-সম্বলিত ঐতিহ্য—ethics related tradition এবং অন্যটিকে কারিগরি বিদ্যা-সম্বলিত ঐতিহ্য—engineering related tradition আখ্যা দেওয়া যেতে পারে। নোবেল পুরস্কার বিজয়ী ভারতীয় অর্থনীতিবিদ অমর্ত্য সেন তাঁর *On Ethics and Economics* গ্রন্থে এভাবেই বিষয়টিকে দেখেছেন। প্রথম ধারাটি এসেছে অ্যারিস্টটল থেকে। তাঁর *The Nicomachian Ethics* এবং *Politics* গ্রন্থ দুটিতে স্পষ্টোক্তি আছে, অর্থশাস্ত্র শেষমেশ নীতিশাস্ত্র এবং রাজনীতি সম্পর্কিত একটি বিষয়। অর্থশাস্ত্রকে কোনওমতেই ethics এবং political philosophy থেকে আলাদা করা সমীচীন হবে না, কারণ মানবিক প্রেরণা (human motivation) সাধারণভাবে নৈতিক প্রশ্নের সঙ্গে জড়িত। আমরা কীভাবে বাঁচব, তার উত্তর পেতে গেলে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে নীতিগত প্রশ্ন তুলতেই হবে। আধুনিক কল্যাণমূলক অর্থতত্ত্বে এই ধারণা ভীষণভাবে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে।

দ্বিতীয় ধারাটি অর্থাৎ কর্মকৌশলের কারিগরি দৃষ্টিভঙ্গিটি তৈরি হয়েছে নানা সূত্র থেকে। ফরাসি অর্থতাত্ত্বিক লিওঁ ভালরা, যিনি বাজারে সার্বিক সমস্থিতির ধারণাটির জনক; শিক্ষাগত যোগ্যতায় একজন ইঞ্জিনিয়ার ছিলেন। বাজার কীভাবে লেনদেন চালায় তার আলোচনা করতে গিয়ে তিনি সার্বিক সমস্থিতির ধারণাটির প্রবর্তন করেন। এটি সাড়া জাগানো একটি মৌলিক তত্ত্ব। সুপ্রাচীন কৌটিল্যের *অর্থশাস্ত্রেও* কারিগরি দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় পাই। এর বিস্তৃত বিবরণ দেওয়ার অবকাশ এখানে নেই। *অর্থশাস্ত্রের* প্রথম পরিচ্ছেদে কৌটিল্য জ্ঞানের চারটি বিভাগের কথা বলেছেন (four fields of Knowledge)। এর মধ্যে অধিবিদ্যা

(Metaphysics), ন্যায়শাস্ত্র, সরকার চালাবার বিজ্ঞান, এবং ধনসম্পদের বিজ্ঞান সবই আছে। ব্যবহারিক জ্ঞানের আলোচনায় তিনি অর্থশাস্ত্রে আমরা যেসব বিষয় নিয়ে আলোচনা করি, যথা কী করে গ্রামগঞ্জ তৈরি করা যায়, রাজস্ব আদায়ের সঠিক পন্থা কী, কী করে খরচপত্রের হিসাব রাখতে হয়, আমদানি, রপ্তানি শুল্কের হার কীভাবে নির্ধারণ করা যয় ইত্যাদি, এসবেরই আলোচনা আছে। এমনকী 'কূটনৈতিক সম্পর্ক' কীভাবে স্থাপন করলে নিজের দেশের লাভ হবে, উপনিবেশ স্থাপনের জন্য কী ধরনের চুক্তি সুবিধাজনক, এমনকী সব দিকে নজর রাখার জন্য গুপ্তচর নিয়োগকেও কৌটিল্য সমর্থন করেছিলেন। এটা সুস্পষ্ট যে কৌটিল্য নৈতিকতার ধার ধারেননি। মানবিক প্রেরণা, উদ্যোগের পেছনে কোনও গভীর নীতিবোধ আছে কি না, সেটি কৌটিল্যের *অর্থশাস্ত্র* গ্রন্থটিতে কোনও স্থান পায়নি।

নীতিশাস্ত্র থেকে অর্থশাস্ত্রকে আলাদা করে দেখার এই যে প্রবণতা ঐতিহাসিকভাবে গড়ে উঠেছে, এটি অর্থশাস্ত্রের মতো একটি সামাজিক বিজ্ঞানের পক্ষে স্বাস্থ্যকর নয়। এই মন্তব্যই শ্রীসেন জোরালো যুক্তির দ্বারা প্রতিষ্ঠা করেছেন। তবে তিনি একথাও বলেছেন যে মানুষের প্রেরণা এবং উদ্যোগ ও ব্যবহারিক আচরণে নীতিশাস্ত্র-বিবর্জিত সঙ্কীর্ণ কারিগরি দৃষ্টিভঙ্গিরও একটি সুফল আছে। দৃষ্টান্তস্বরূপ তিনি সার্বিক সমস্থিতির ধারণাটির উল্লেখ করেছেন। সামাজিক পারস্পরিক নির্ভরতার ব্যাপারটি এতে স্পষ্টতর হয়। ফলে এই গণিতভিত্তিক বিমূর্ত ধারণাটির সাহায্যে আমাদের দৈনন্দিন রুজিরোজগারের সমস্যাও অনেকটা সমাধান করা সম্ভব হয়। এসবই তাত্ত্বিক কচকচি। এর মধ্যে আমরা এখানে প্রবেশ করতে চাই না। আমার প্রতিপাদ্য বিষয়ের ওপর নজর দেওয়া যাক।

অ্যাডাম স্মিথ যে self-interest-এর কথা বলেছেন—লোকে শুধু স্বার্থসিদ্ধির কথাই ভাবে—এটি কতটা গ্রহণযোগ্য? বলাই বাহুল্য যে শুধু স্বার্থসিদ্ধির কথা ভাবলে ন্যায়নীতিকে জলাঞ্জলি দিতে হয়। আমাদের বাস্তবব্যবহার কি সত্যিই এই মতে সায় দেয়? শাস্ত্রে স্মিথের self-interest ধারণাটির অপব্যাখ্যা করা হয়েছে। স্মিথ self interest -এর কথা বললেও একই সঙ্গে sympathy অর্থাৎ সহমর্মিতার কথাও বলেছেন। এর ভুরিভুরি দৃষ্টান্ত আছে *Wealth of Nations* গ্রন্থটিতে। বাজারের কাজকারবারে সহমর্মিতা না থাকলে তিনি পণ্য বিনিময়ের ক্ষেত্রে পারস্পরিক লাভের কথা কখনওই বলতেন না। স্বার্থসিদ্ধির সঙ্কীর্ণ যে সংজ্ঞা দেওয়া হয় তার বিরুদ্ধতা করে অমর্ত্য সেন বলেছেন আমাদের সাধারণ আচরণেও আমরা self-regarding action থেকে other-regarding action-এর কথাও প্রায়শই ভাবি। একটা দৃষ্টান্ত দিলে সহজেই বোঝা যাবে। ধরা যাক রেলের ভিড়ে ঠাসা কামরায় একজন যুবক একটি আসনে উপবিষ্ট। এমন সময় জনৈক বৃদ্ধ তার সামনে এসে দাঁড়ালেন। দেখা যাবে যে অন্তত শতকরা নব্বই ভাগ ক্ষেত্রেই যুবকটি ওই বৃদ্ধকে আসন ছেড়ে দেবে। এমন ঘটনা তো আমরা ট্রামে-বাসের নিত্যযাত্রীরা প্রায়ই দেখে থাকি। একে কী বলবেন? স্বার্থত্যাগ, না বৃহদর্থে স্বার্থসিদ্ধি? স্বার্থসিদ্ধির পরিধিকে যদি একটু বিস্তৃত করে ভাবি তাহলেই বুঝতে পারব যে অন্যের প্রতি সহানুভূতি দেখালে সবারই মনে একটা তৃপ্তিবোধ জাগে। এই সহানুভূতির ভাব না থাকলে সমাজ-ব্যবস্থাই অচল হয়ে পড়বে। কল্যাণমূলক যে অর্থশাস্ত্র গড়ে উঠেছে তাতে সামাজিক কল্যাণের সর্বোচ্চায়ন করতে হলে সমাজে ঐকমত্য জরুরি। এই সত্য অবশ্যই সহমর্মিতার ওপর প্রতিষ্ঠিত। শ্রীসেন তাঁর কল্যাণমূলক অর্থতত্ত্বে এই সহমর্মিতার ওপর জোর দিয়েছেন। অর্থতত্ত্বে আমাদের আচরণের যৌক্তিকতার যে কথা বলা হয় তার একটি নতুন ধরনের ব্যাখ্যা আমরা এখানে পাই। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে কল্যাণমূলক অর্থতত্ত্ব ন্যায়-নীতিকে বিসর্জন দিতে পাবে না। Positive এবং Normative economics-এর যে পৃথকীকরণ করা হয় তার একটি যুক্তি হল বর্ণনামূলক অর্থবিদ্যা থেকে আমরা অর্থনৈতিক সমাজব্যবস্থা কীভাবে পরিচালিত, তার ধারণা করতে পারি এবং সেই ধারণাকে, ভিত্তি করেই কল্যাণমূলক অর্থবিদ্যা যুক্তিসম্মত হয়ে ওঠে।

কল্যাণমূলক অর্থতত্ত্ব বিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে সহজ থেকে ক্রমশ জটিলতার দিকে এগিয়ে গিয়েছে। সে ইতিবৃত্ত এখানে আলোচনা করা সম্ভব নয়। এটুকু বললেই এখানে যথেষ্ট হবে যে একদিকে দেখি কল্যাণমূলক অর্থশাস্ত্রের কোনও ভিত্তিই নেই তা সপ্রমাণ করেছেন প্রখ্যাত নোবেল পুরস্কার বিজয়ী অর্থনীতিবিদ কেনেথ অ্যারো। অন্য দিকে অর্মত্য সেনের মতো অর্থশাস্ত্রীরা অ্যারোর বিরোধিতা করে কল্যাণমূলক অর্থশাস্ত্র যে সম্পূর্ণ অযৌক্তিক নয়, তার প্রমাণ দিয়েছেন। সমস্ত বিষয়টি বেশ জটিল এবং বিতর্কমূলক। এসব কথা থাক। জরুরি কথা হল যে যাঁরা মনে করেন যে গণিতের ভাষা নিরপেক্ষ তাই সমাজ-বিজ্ঞানের মতো একটি শাস্ত্রে গণিত ব্যবহার সঙ্গত নয়, তা কিন্তু ঠিক নয়। আগেই বলা হয়েছে যে গণিত একটি ভাষা। এই ভাষা ব্যবহার করলে আমাদের যুক্তির ফাঁকফোকরগুলো ধরা পড়ে, যে সিদ্ধান্তে আমরা পৌঁছই তার যুক্তিগ্রাহ্যতা সুদৃঢ় হয়। গাণিতিক ভাষার বিরুদ্ধে কিছু বলা চলে না; গাণিতিক ভাষার অপপ্রয়োগ ঘটলেই

বিপদ। অর্থশাস্ত্রে গণিতের অপপ্রয়োগের দৃষ্টান্ত ভুরিভুরি পাওয়া যায়। তবে যোগ্য গাণিতিক অর্থনীতিবিদও অপ্রতুল নয়। তাই আমরা দেখি আধুনিক কল্যাণমূলক অর্থতত্ত্বেও পর্যাপ্ত গণিত ব্যবহার করা হয়েছে।

স্যামুয়েলসনের মতো গণিতপ্রিয় অর্থতাত্ত্বিকও কল্যাণমূলক অর্থতত্ত্ব আলোচনা করেছেন গণিতের মাধ্যমে। সামাজিক কল্যাণ অপেক্ষক (Social Welfare function) অথবা সর্বজনভোগ্য দ্রব্যের (public goods) চরিত্র বিশ্লেষণে উচ্চস্তরের গণিত ব্যবহার করেছেন। কেনেথ অ্যারোর *Social Choice and Individual Values* (1951) গ্রন্থে symbolic logic ব্যবহার করে কারও কারওর ভীতির সঞ্চার করেছেন। এমনকী অমর্ত্য সেন অ্যারোর মতের বিরোধিতা করে যে অন্য ধরনের কল্যাণমূলক অর্থতত্ত্ব খাড়া করার প্রয়াস করেছেন, তাতেও গণিত প্রয়োগ করতে দ্বিধা করেননি। ইদানীন্তন এও লক্ষ করা যায় যে কোনও কোনও তরুণ গাণিতিক অর্থনীতিবিদ, যাঁরা অমর্ত্য সেনের তত্ত্বকে পরিমার্জিত ও পরিবর্ধিত করেছেন, তাঁরাও ঢালাওভাবে কল্যাণমূলক অর্থতত্ত্বে গণিতের আশ্রয় নিয়েছেন। দারিদ্রের পরিমাপ করেছেন নৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে। Ethically flexible measure of poverty, প্রবন্ধের এই নামকরণ থেকেই তা বোঝা যায়। *Ethical Social Index Number* গ্রন্থটির প্রামাণ্যতা অস্বীকার করার উপায় নেই, তবে ওই গ্রন্থে যে ধরনের গণিত প্রয়োগ করা হয়েছে, তা আমাদের মতো অগাণিতিক অর্থনীতিবিদদের পক্ষে প্রায় দুর্বোধ্য। সুতরাং গণিত বনাম নীতিশাস্ত্র এমন দ্বন্দ্বের ছবি আঁকা ঠিক নয়। নিন্দনীয় হল অর্থশাস্ত্রে গণিতের অপপ্রয়োগ।

কল্যাণমূলক অর্থশাস্ত্র যেহেতু ন্যায়-নীতির অনুশাসন মান্য করে, সেইহেতু সমাজের দুঃস্থ, অশিক্ষিত, অনাহারক্লিষ্ট মানুষের উন্নতির দিকে বেশি নজর দেয়। অমর্ত্য সেন দুর্ভিক্ষের কারণ অন্বেষণ করেছেন। শিক্ষার, বিশেষ করে প্রাথমিক স্তরের শিক্ষার মান কীভাবে বাড়ানো যায় তার বিশদ আলোচনা করেছেন। সমাজে অনাহার, অপুষ্টি, অশিক্ষা এসব দূর করার পেছনে অর্থশাস্ত্রীদের অবশ্যই একটি সমাজ স্বীকৃত মূল্যবোধ থাকে। আর্থিক উন্নয়নের আধুনিক যে অর্থতত্ত্ব গড়ে উঠেছে, তাতেও development with human face লক্ষ্য হিসাবে পুরোভাগে রাখা হয়েছে। মানুষের কল্যাণেই উন্নয়নের সার্থকতা। খালি জাতীয় আয় বৃদ্ধি করলেই চলবে না, সেই বর্ধিত আয়ের সুফল সকলের মধ্যে ছড়িয়ে দিতে হবে। রাষ্ট্রচালকদের একটি মূল্যবোধ থাকলেই এরকম লক্ষ্য স্থির করা সম্ভব। এখন প্রশ্ন হল এই মূল্যবোধ কী করে সৃষ্টি করা যায়। শিখিয়ে পড়িয়ে কী এই মূল্যবোধ জাগানো যায়? এর সহজ উত্তর আমার জানা নেই। হয়ত কেউই এর সঠিক উত্তর দিতে পারবেন না। এ সত্ত্বেও বলতে হবে শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা নানা কারণে অপরিহার্য। স্বামী বিবেকানন্দ জনশিক্ষার ওপর জোর দিয়েছিলেন। এ শিক্ষা শুধু অক্ষরপরিচয়ের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়, দেশের ইতিহাস, ঐতিহ্য, সংস্কৃতি ইত্যাদি সম্বন্ধে সচেতন করাই শিক্ষার মূল উদ্দেশ্য। শিক্ষার মাধ্যমেই মানুষ নিজেকে আধ্যাত্মিক এবং অর্থনৈতিকভাবে গড়ে তুলতে পারে। এইভাবেই হয়ত সমাজে একটা মূল্যবোধ জেগে উঠবে। এটা সময়সাপেক্ষ; আমাদের ধৈর্য ধরতে হবে। রবীন্দ্রনাথও প্রকৃত শিক্ষা সম্বন্ধে অনেক কথা বলেছেন। উদ্দেশ্যে একটাই : আসল মানুষ গড়ে তুলতে হবে।

উপসংহারে আমরা বলতে পারি যে সমাজের সর্বত্র অর্থনীতির প্রভাব সুস্পষ্ট। দর্শন, কাব্যসাহিত্য, ইতিহাস, শিল্পকলা, রাষ্ট্রনীতি, এ সবেরই ভিত্তিভূমি হল অর্থনীতি। এই ধারণাকে একটি মার্কসীয় প্রত্যয় বলে নিন্দা করা ঠিক হবে না। এর ঐতিহাসিক অভ্রান্ততা সর্বজনস্বীকৃত। তাই আমরা যাই করি না কেন তা সমাজের সব শ্রেণির উপকারে না এলে তা ব্যর্থ বলে গণ্য করতে হবে। এই মানসিকতা যদি গড়ে না ওঠে তাহলে সভ্যতার অগ্রগতি হচ্ছে, এ কথা বলা যাবে না। সকলকে ভালবাসতে হবে, আপনজন বলে মানতে হবে। এই মূল্যবোধ যদি সৃষ্টি না করতে পারি তাহলে সমাজ ক্রমশই অবক্ষয়ের পঙ্কে নিমজ্জিত হবে। অর্থশাস্ত্রীয় সূত্র, তত্ত্ব ও কৌশল যদি তর্কশাস্ত্রের নিয়ম মেনে গঠিত হয়ও, তাহলেও তা মূল্যহীন। শিল্পকলা, সাহিত্য, দর্শন ও রাষ্ট্রনীতি সম্বন্ধেও ওই একই কথা খাটে। রবীন্দ্রনাথ হয়ত এটি উপলব্ধি করেছিলেন। তাঁরই একটি কবিতার কয়েক ছত্র উদ্ধৃত করে আমার বক্তব্য শেষ করি :

সবলে কারেও ধরি না বাসনামুঠিতে,
দিয়েছি সবারে আপন বৃন্তে ফুটিতে,
যখন ছেড়েছি উচ্চে ওঠার দুরাশা,
হাতের নাগালে পেয়েছি সবারে নীচুতে।

কবিগুরুর এই আপ্তবাক্যকে যদি জীবনে রূপায়িত করি তাহলেই আমাদের সার্থকতা, নচেৎ সমস্ত মানবজীবনই হয়ত ব্যর্থ। অর্থতত্ত্বের আলোচনা মূল্যহীন এবং অবান্তর।*

* রামকৃষ্ণ মিশন ইনসটিটিউট অব কালচার কর্তৃপক্ষ আয়োজিত আচার্য নৃপেন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় স্মারক বক্তৃতা। প্রদত্ত সময় ২৩শে মে, ২০০৬।

সিগমুন্ড ফ্রয়েড ও সাম্প্রতিকতা

দিলীপকুমার সিংহ

শিরোনামটি অনেক দিক থেকেই তাৎপর্যপূর্ণ, বিশেষ করে ফ্রয়েডের একশো পঞ্চাশতম জন্মবর্ষপূর্তির জন্য। ফ্রয়েড, মার্কস, ডারউইন প্রমুখ দিকপালদের কথা যখনই ওঠে, তখনই তাঁদের জন্য আনুষ্ঠানিকভাবে স্মর্তব্য কী কী তা লিপিবদ্ধ করার প্রবণতা স্বাভাবিকভাবেই দেখা যায়। ঐতিহাসিক দিক থেকে তাঁদের সব অবদান গ্রহণযোগ্য না হলেও, সাম্প্রতিককালের পরিপ্রেক্ষিতে তাঁদের অবস্থান কোথায় তার উল্লেখ অপ্রতিরোধ্যভাবে চিত্তাকর্ষক হয়ে উঠছে। এই প্রবন্ধের মূল উদ্দেশ্য হল সাম্প্রতিককালের পরিপ্রেক্ষিতে ফ্রয়েডকে নিয়ে কিছু ভাবনাচিন্তা তথা আলোচনা করা, বিশেষ করে সৃজনমুখিতার নিরিখে। সিগমুন্ড ফ্রয়েডের তাত্ত্বিক অবদান এইদিকে যে কতখানি মূল্যবান এবং ফ্রয়েড যে প্রাসঙ্গিকভাবে মানুষের সৃজনমুখিতা নিয়ে ভাবনাচিন্তার কতখানি পুরোধা ছিলেন সে সম্পর্কে কিছু আলোচনার প্রয়াস রয়েছে এই প্রবন্ধে।

ফ্রয়েডের নাম করলেই সাদামাটাভাবে মনের আনাচে-কানাচে কাম-সম্পর্কিত আরোপ কোথাও না কোথাও বর্তাবে বা রূপ পরিগ্রহ করবে। এই ব্যাপারটার অনুশীলন এবং প্রয়োগসমূহ এত ব্যাপ্ত, অনেক বড় বড় মনীষীদের সৃষ্টিতে অনুশীলনে, কর্মশৈলীতে যেভাবে প্রকট হয়েছে সেসব কথা স্বাভাবিকভাবে উঠতে পারে। মনুষ্যপ্রকৃতি নিয়ে বহু আলোচনা হয়েছে কিন্তু ফ্রয়েড যতক্ষণ না নিপীড়নের সম্ভাবনা সম্পর্কে কিছু বললেন, ততদিন এই দিকে মনীষীদের নজর আকৃষ্ট হয়নি।

যেমন কার্ল মার্কস সচেতনতার ত্রুটির সপক্ষে বক্তব্য রেখেছিলেন এবং পরবর্তীকালে অনেক সমাজ-জীববিজ্ঞানী প্রতিষ্ঠা করতে সমর্থ হয়েছেন যে কীভাবে আমাদের বেশ কিছু ক্রিয়াকলাপ, বিশেষ কয়েকটি চাপ থেকে উদ্ভূত হতে পারে, আর যার ফলে আমাদেরই কাজকর্ম সম্পর্কে কিছু পারস্পরিক অন্তর্দৃষ্টি অনেকাংশে প্রতারণা হিসাবে প্রতীয়মান হয়ে থাকে। কে না জানে ফ্রয়েডীয় অসচেতনতা তত্ত্ব, আইনস্টানের আপেক্ষিকতার তত্ত্ব, পিকাসোর কলাশিল্প, জেমস জয়েসের সচেতনতার-স্রোতময় গদ্য ইত্যাদিকে মানুষ স্বীকার করে নিয়েছে, যা বহুকালের অনেক বিশ্বাসকে ক্ষুণ্ণ করেছে, ফ্রয়েডের জীবনপঞ্জি এতই বৈচিত্রপূর্ণ ও সুবিদিত যে সে সম্পর্কে কোনও রকমের পুনরুক্তি সমীচীন হবে না কিন্তু তাঁর জীবন কাহিনির কিছু জানতে হলে সুস্মর্তব্য হবে ফ্রয়েডের একটি অসাধারণ কথা। মূলত, তা ছিল সুখী জীবনের রহস্য সম্পর্কে একটি প্রশ্নের আপাতবিরোধী সদুত্তর, তা হল : 'ভালবাস ও কাজ করে যাও' আর এই দু'টি কথার মাধ্যমেই যা যা সম্ভাব্য বিকল্প হতে পারে, তারই ইঙ্গিত তিনি দিয়েছিলেন। ফ্রয়েড-প্রণীত বহু রচনার উল্লেখ করা যেতে পারে যেগুলি প্রামাণ্য আকার ধারণ করেছে।

আমাদের সাধারণ জীবনেও আমরা সম্মুখীন হই লালসা ও সংযম। এমনকী উভয়েরই যৌক্তিক ও অযৌক্তিক দ্বন্দ্বের মধ্যে। ফ্রয়েডীয় ভাষায় আমরা সেইটিকে 'অসচেতনতা' আখ্যা দিতে পারি যেখানে শৈশবের নিপীড়ন হয়ে যায় স্থিত; আবার ফ্রয়েড-পরবর্তী যুগের মনোবিজ্ঞানীরা যথা ইয়ুংপন্থীরা অবশ্য এইটিকে এক ধরনের 'একত্রিত অসেচতনতা' বলেছিলেন। ফ্রয়েডের উত্তরসুরিরা যথা অ্যাডলার ও ইয়ুং যে অনেক বক্তব্য রেখেছেন ফ্রয়েডের তত্ত্বের বিরোধিতা করে তা-ও প্রায় সর্বজনবিদিত। মনঃসমীক্ষণ চর্চার শুরু ১৮৯৩ সালে ভিয়েনাতে। মনঃসমীক্ষণ তত্ত্ব যে কত রূপ গ্রহণ করেছে তার কাহিনি লিপিবদ্ধ হয়েছে নানাভাবে। আমাদের প্রাথমিক আলোচনা সীমিত রাখব মুখ্যত ও মূলত ফ্রয়েড যা পেশ করেছিলেন ১৯৩৯ পর্যন্ত, যা ছিল তাঁর প্রয়াণবর্ষ। যে যাই বলুক ফ্রয়েডের আত্মসমীক্ষা, বিশেষকরে মনঃসমীক্ষণ সম্পর্কে মূল্যায়ন, বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য। ফ্রয়েডের কিছু ব্যক্তিগত মত ছিল আকর্ষণীয় কিন্তু তিনি সেগুলিকে প্রতিষ্ঠিত করতে প্রয়াসী হননি। যেমন তিনি বলেছিলেন, 'আমাকে কেউ জিজ্ঞেস করতে পারে, যে মতামত আমি পেশ করেছি সেগুলি সম্পর্কে আমার নিজের বিশ্বাস আছে কি না এবং তাহলে তা দূরপ্রসারী কি না। আমার উত্তর হবে যে আমি

নিজে বিশ্বাস করিও না বা অন্যকে বিশ্বাস করাতেও চেষ্টা করিনি। আরও সঠিকভাবে বললে, আমি জানি না, কতদূর এগুলি বিশ্বাস করি'। তাঁর আত্মজীবনী প্রকাশিত হয়েছিল ১৯৩৫-এ মার্কিনমুলুক থেকে, সেখানে তিনি বলেছিলেন : 'আমার জীবনের নানা কাজের দিকে পিছন ফিরে যখন তাকাই, আমি বলতে পারি যে আমি অনেক কিছুই শুরু করেছিলাম এবং অনেক প্রস্তাবও রেখেছিলাম। ভবিষ্যতে কিছু তার থেকে উদ্ভূত হবে কিন্তু তার মধ্যে কত কম বা বেশি হবে সে সম্পর্কে বলতে পারি না'। বর্তমান প্রবন্ধের অন্যতম উদ্দেশ্য হচ্ছে এই ভবিষ্যৎ সম্পর্কে কিছু আলোকপাত করা যা হালআমলের সৃজনশীলতা ও সৃজনমুখিতাকে সহায়তা ও সমর্থন জোগাতে পারে।

সাম্প্রতিকতা ও সার্বিকতার সাযুজ্য এতই বিস্তৃতি অর্জন করেছে যে হেন বিষয় বা চর্চা অধুনা দেখা যাচ্ছে না যা আন্তর্বিষয়কতা থেকে মুক্ত। অনিশ্চয়তা, অযৌক্তিকতা, অনিয়ন্ত্রণ, আংশিক উন্মত্ততা ইত্যাদি কোথাও-না-কোথাও মানুষের চেতনাকে আগ্রাসী অঞ্চলে এনে ফেলেছে। ভাবলে হয়ত বিস্ময়কর মনে হতে পারে যে এই সংক্রান্ত আলোচনা ও বিশ্লেষণ এমনকী গণিত দ্বারা প্রভাবিত হয়েছে। ফ্রয়েড গণিতকে দেখেছিলেন কামজ ব্যবস্থার এক ধরনের ব্যতিক্রমী বিকল্প এবং এই সম্পর্কে অতৃপ্ত প্রেমিকের সম্বন্ধে রুশোর বক্তব্য প্রায়ই উদ্ধৃত করতেন। সান্ডোর ফেরেনসিজি, যিনি ছিলেন ফ্রয়েডের কাছের মানুষ, তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থে (১৯৫৩ সালে বিলেত থেকে প্রকাশিত) গণিত সম্পর্কে ফ্রয়েডের আলোচনার কথা বলেছেন যা অপ্রকাশিত হলেও, মুখ্যত স্পষ্ট ও অস্পষ্ট (explicit ও implicit) গণিত সম্বন্ধীয়; এই গণিতের গুরুত্ব আজকালকার লোকগণিতচর্চার ক্ষেত্রে প্রায়ই উল্লেখিত হচ্ছে। অসচেতনতার গাণিতিকীকরণ বা বিপরীত দিক থেকে গণিতের মনঃসমীক্ষণ অধুনা প্রাধান্য পাচ্ছে। বর্তমান প্রবন্ধে এই দিকের প্রাসঙ্গিক কিঞ্চিৎ আলোচনা সংযোজিত হয়েছে ফ্রয়েডীয় তত্ত্বের অনুগামী বিষয় হিসাবে।

এখনকার কালে কিছু বলতে গেলে, বিশেষ করে সৃজনশীলতা সম্পর্কে, পুনরাবৃত্তি না করে এমন কিছু বিষয় অগ্রাধিকার পাচ্ছে যে ফ্রয়েডীয় অসচেতনতা তত্ত্বের নতুন ধাঁচে প্রয়োগের সম্ভাবনা দেখা যাচ্ছে। ঔৎকর্ষ ও অভিনবত্ব, শিল্পজগতে বিশ্বায়নের আওতায় নতুন থেকে নতুনতর আকার গ্রহণ করে চলেছে। বলা হয়ে থাকে কৌশল অর্থাৎ strategy কথাটি সুষ্ঠু পরিচালনার ক্ষেত্রে Cognition বা অসচেতন বিশেষ মানসিক প্রক্রিয়া, নতুন আঙ্গিকে ব্যবহৃত হচ্ছে। যখন কোনও ব্যবস্থা জটিল থেকে জটিলতর আকার ধারণ করছে তখন বিবর্তনশীল না হবার বিকল্প কোথায়? Cognitive strategy শব্দ দু'টি তাই খুব দ্রুত এসে গেছে আর তা না হলে কোনও সমস্যার মোকাবিলা বা আপেক্ষিক সমঝোতা সম্ভব হবে না। ঐচ্ছিক বা আবশ্যিক কোনও ভাবেই তা হল উপেক্ষিত হওয়ার সম্ভাবনারহিত। উঁচুমাপের আলোচ্য বিষয়ে মনঃগতিবিদ্যার (psychodynamic) প্রয়োজনীয়তা যে হবে তা পূর্বে কখনও বোঝা যায়নি। রেনেসাঁস জমানায় বহুমুখী প্রতিভার আলোচনায় ফ্রয়েডীয় বিশ্লেষণাত্মক অসচেতনতা প্রভূত। কিন্তু সাদামাটা খবরাখবর পর্যায়ে জনপ্রিয় করার বিষয় মনস্তত্ত্বভিত্তিক যে হতে পারে তার নজির আজকাল অনেক পাওয়া যায়; এই প্রসঙ্গে উদাহরণ বোধকরি নিষ্প্রয়োজন। মনস্তাত্ত্বিক দিক থেকে, বিশেষকরে যা সমাজের গতি-সম্পর্কিত, তার সামগ্রিক মূল্যায়ন তা হলে কি বিলম্বিত হতে পারে? যেমন হাল আমলে গণিতচর্চার ঐচ্ছিকতা বা পাঠ্যপুস্তক সম্পর্কে অনবধানতা, আবেগমুক্ত হতে হলে এবং প্রাসঙ্গিক উদ্দেশ্য-সমর্থিত হতে হলে মনস্তত্ত্বের প্রয়োগ কখনওই প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করবে না। বরং সাফল্যের নিশানা দর্শাবে। সৃজনমুখিতা সম্পর্কে ফ্রয়েডের একটি উভয়বল (ambivalent) মানসিকতার ধারণা চালু আছে। মনঃসমীক্ষণ সম্পর্কে ফ্রয়েডের বক্তৃতায় (দ্রষ্টব্য : *Lecture XXIII, Introductory Lectures on Psycho-Analysis,* London, 1963) তিনি, উদাহরণস্বরূপ বলেছিলেন যে শিল্পী হলেন মৌলত অন্তর্মুখী যিনি উদবায়ু (neurosis) থেকে মুক্ত নন। অতএব ফ্রয়েডীয় মতে কোনও শিশু সম্পর্কে পিতা বা মাতার এমন ধারণা করা উচিত হবে না যে তাদের সন্তানের কোনও না কোনও সময়ের সৃজনমুখী গুণ দেখা যাবে না। আপাতদৃষ্টিতে এটি মনে হতে পারে যে এ হল এক ধরনের অতিসরলীকরণ। মনঃসমীক্ষণ কখনওই ভাল বা খারাপ কলার মধ্যে তুলনা করে না। এমনকী একটি শিল্পকর্ম এবং স্নায়বিক দুর্বলতার মধ্যেও।

অনেকের মতে মনঃসমীক্ষণের প্রয়োগের দুর্বলতা এখানে। ব্যক্তিগতভাবে ফ্রয়েড ছিলেন কবিতার অনুরক্ত এবং যখন উনি শিল্পীদের সম্বন্ধে বক্তৃতা দিয়েছেন, তাঁর মনের আড়ালে ছিল সৃজনশীল লেখকদের কথা, যদিও অনেকের মতে তাঁর দস্তয়েভস্কি, শেক্সপিয়র ও ইবসেনের ওপর রচনাবলির থেকে মিকেলাঞ্জেলোর ওপর লেখা এবং লিওনার্দো দ্য ভিঞ্চির ওপর পুস্তিকা উৎকৃষ্টতর। তাঁর আত্মজীবনীমূলক রচনায় প্রকাশিত এই মত এখনও স্মরণ করা যেতে পারে। বস্তুত বহু জায়গায় ফ্রয়েড লিখেছিলেন যে মনঃসমীক্ষণ সৃজনশীলতা ব্যাখ্যা করতে অসমর্থ। তাঁর আত্মজীবনীতে তিনি জানিয়েছিলেন ঃ মনঃসমীক্ষণ 'শৈল্পিক

প্রকৃতিকে না পারে বিস্তৃত করতে, না শৈল্পিক পদ্ধতির ব্যাখ্যা দিতে'। সৃজনশীলতা সম্পর্কে ফ্রয়েডের অস্বস্তিকর দোনামনা বা উভয়বলতা আর্নেস্ট জোনসের লেখা ফ্রয়েডের জীবনীতেও বিশদভাবে উল্লেখিত হয়েছে। এক সাংবাদিককে ফ্রয়েড লিখেছিলেন 'শৈল্পিক ক্রিয়াকলাপ চালিয়ে যাওয়ার অসম্ভাবনা যে বিশ্লেষণপ্রসূত তা কখনওই প্রশ্নাতীত নয়। তবে তা কিন্তু বিশ্লেষণের ত্রুটি নয়; এটি ঘটার কথা যে কোনও ক্ষেত্রে এবং এটি লাভবান হয় তখনই যখন সঠিক সময়ে তা জানা যায়'। মারিয়া থোমানকে লিখেছিলেন 'যখন একদিকে শৈল্পিক আবেগ, অন্তর্নিহিত প্রতিবন্ধকতার বিশ্লেষণ থেকে বেশি মজবুত, তখন তা পারদর্শিতার ক্ষমতাকে বিনষ্ট না করে সমৃদ্ধ করবে'। এই বক্তব্যের প্রকৃত ইঙ্গিত হল যে শৈল্পিক আবেগ হল পশ্চিমে যাকে বলে *sui generis* বা অনন্য। ফ্রয়েড যে নিঃসন্দেহে ব্যক্তিগতভাবে সৃজনশীল ছিলেন তা বললে অতিশয়োক্তি হবে না। এমনকী একচল্লিশ বছর বয়সে যখন উনি তাঁর এক বন্ধুকে জানাচ্ছেন যে কামজ উত্তেজনা তাঁর মতো ব্যক্তির কাছে আর প্রয়োজনীয় নয়; তাহলে কি এটাই দুঃখের সঙ্গে বলতে হবে যে তাঁর জীবনের পরবর্তী বিয়াল্লিশ বছরে সবকিছু আনন্দই অনুত্তেজক ছিল? অতএব শিল্পীর পক্ষে উত্তরণ (sublimation) স্বাভাবিক, শৈশব পর্যায় যাই থাকুক না কেন, ফ্রয়েডের আত্মকথা বা তার ওপর জীবনী এত মতানৈক্যে ভরপুর বিশেষ করে ভাষ্য বা ব্যাখ্যায় যে বহু উদ্ধৃতি সংকলিত হতে পারে যেখানে ফ্রয়েডের স্ববিরোধিতা, দোনামনা ইত্যাদির সমন্বয়ে এক ভাবমূর্তি প্রতিভাত হবে।

সৃজনশীলতার একটি বিশেষ দিক প্রজ্ঞার সঙ্গে যে ওতপ্রোতভাবে জড়িত, তা অনেকেরই জানা আছে; আরও জানা আছে যে গণিতানুশীলনের এক বিশেষ শৈলী হল প্রজ্ঞা-সমর্থিত। ফরাসি গণিতজ্ঞদ্বয় পঁয়কারে (১৮৫৪-১৯১২) ও হাদামার্দ (১৮৬৫-১৯৬৩) এই দিকে বিশেষভাবে আলোকপাত করেছেন। হাদামার্দ বয়ঃকনিষ্ঠ হলেও একটি কথা জোরের সঙ্গে বলেছিলেন যে নতুন ভাবনাচিন্তা অসচেতন পর্যায়ে উদ্ভূত হয়, বিশেষকরে গাণিতিক সৃজনশীলতার জন্য চাই অসাধারণ অথচ ফলপ্রসূ ভাবনাচিন্তার সংযুক্তি। তাঁর মতে, এই সংযুক্তির উৎস হতে পারে আকস্মিকভাবে, কিন্তু তা ঘটবে অসচেতন স্তরে এক অন্তর্বর্তীস্থানে। আবার, বয়োজ্যেষ্ঠ গণিতজ্ঞ পঁয়কারে আরও বিশদভাবে সমস্যার সমাধানে, নানা দশা চিহ্নিত করার মধ্যে নিহিত আছে প্রস্তুতির এক সচেতন প্রয়াস। ফ্রয়েডীয় উত্তরণ তত্ত্বের পূর্বসূরি তাই পঁয়কারকে বলা যেতে পারে, শুধুমাত্র শব্দটির ব্যবহারের জন্য নয় (প্রাসঙ্গিক ইংরাজি শব্দ sublimal self), যা হল স্বজ্ঞাপ্রসূত উদ্দেশ্যহীন ও অব্যবহারযোগ্য। সচেতনতা কখনও গোচরের আওতায় এলেও গাণিতিক সৃজনশীলতা নিশ্চয়ই গাণিতিক লালিত্যকে উদ্ভাসিত করবে। এই ধরনের ভাবনাচিন্তার উদ্‌গাতা হলেন ফ্রয়েড; তাঁর সৃষ্ট মনঃসমীক্ষণ এই সৃজনশীলতাকে কয়েকটি মৌল-পদ্ধতি সমর্থিত চিন্তার পরিপ্রেক্ষিতে ব্যাখ্যা করতে সমর্থ হয়েছে; অর্থাৎ বলা যেতে পারে এই জাতীয় চিন্তা মূলত হল অবচেতনমুখী। আদি দশার আখ্যা দেওয়া যেতে পারে, এমনকী বলা যেতে পারে এক ধরনের অলৌকিক আধারে শিশুসুলভ ও সম্পদশীল অবস্থা। মনঃসমীক্ষকদের মতে এই মৌল উপাদানগুলি সৃজনশীল ভাবমূর্তি ও প্রতীকী দিককে সমৃদ্ধ করে, যা ফ্রয়েডীয় মতে 'স্বপ্ন দেখার অভিজ্ঞতার' মধ্যে নিহিত ছিল। অধুনা উদ্যোগী মহলে, Cognition সৃজনশীলতার এক বিশেষ আঙ্গিক হিসাবে স্বীকৃত হচ্ছে, যেখানে অসচেতন মানসিকতা, মনঃসমীক্ষকদের অভিমতে, তত্ত্বগত, উৎকর্ষগত, বৈচিত্রের উৎস হতে পারে, যার সম্ভাবনা অন্তত সচেতন মানসিকতা উদ্ভূত নয়। ফ্রয়েডীয় তত্ত্বের পূর্ণ মূল্যায়ন তাই কি এ যুগে প্রয়োজনীয় নয়?

পরিচালনা-জগতে এত দ্রুত পরিবর্তন ঘটে চলেছে যে সেখানে স্বাতন্ত্র্যের বা স্বকীয়তার চাহিদা আরও বিশিষ্টভাবে প্রকট হয়ে উঠেছে। এমনকী ওপরওলার নির্দেশ প্রশাসনিক স্তরে আজ প্রায় কালাতিক্রমী (anachronistic) হতে চলেছে। ব্যক্তিত্বের অভিব্যক্তি সম্যক রূপ পরিগ্রহ করানো এখন একটি অমোঘ কর্তব্য হিসাবে পরিচালকমণ্ডলীর মধ্যে পরিগণিত হচ্ছে; নিশ্চয়ই ব্যক্তিস্বাধীনতা ও গণতান্ত্রিক অধিকার সেখানে মদত জোগাচ্ছে। আশা-আকাঙ্ক্ষা সেখানে নানা রূপে দেখা যাচ্ছে। অসচেতনতা, অবচেতনতা, সচেতনতা—এই দশাত্রয়ী আশাতীতভাবে আকাঙ্ক্ষা রূপায়ণে অংশগ্রহণ করছে। বলতে গেলে, সচেতন ধাক্কা (intervention)'র অভাবে অসচেতন যোগাযোগ প্রভাবিত হবেই। মানসিক পর্যায়ে, অসচেতনতা যে সৃজনশীল ব্যক্তিকে জানবার আগ্রহ বা জ্ঞাতব্য হতে প্রাথমিক অনুভবকে সমর্থন করবে, তা বললে কোনও ভাবেই অতিশয়োক্তি হবে না। যে কোনও উদ্যোগের বা প্রয়াসের আপাত সাফল্য-ইঙ্গিত দেখা গেলেও, অসচেতন মানসিকতাশৈলী সৃজনমুখী হতে সহায়তা করবে। আরও সোচ্চারে ভাবলে অনুভূত হবে সৃজনশীলতার সহায়কের আকার। মূলত তা ঘটে অসচেতন পর্যায়ে, বিশেষ করে, অধুনা ব্যবসাবাণিজ্যের উৎকর্ষের নিমিত্ত। এ কথা চিন্তাজগতে একটা বড় স্থিতি অবস্থান অর্জন করেছে। সৃজনমুখী অন্তর্দৃষ্টি যদি সমস্যার সমাধানে হাতিয়ার হতে হয়,

তবে প্রয়োজন, প্রাসঙ্গিক অসচেতন প্রক্রিয়া সম্পর্কে নিগূঢ় অনুসন্ধান ও গবেষণা। তাই মনস্তাত্ত্বিকরা সমস্যা নিরসনের বিশ্লেষণকে 'protocol analysis' আখ্যা দিতে প্রয়াসী হচ্ছেন। সৃজনশীলতাকে আবার এক নতুন নামে বলা হচ্ছে, psychopathology; প্রশ্ন উঠেছে যে এই নতুন বর্ণনা সৃজনমুখিতাকে সাফল্য জোগাবে, না অন্য কিছু হবে? অবিচ্ছেদ্যভাবে সহায়ক বা কোনও-না-কোনওভাবে সম্পর্কিত হয়ে কি আদৌ পাওয়া যাবে এক নতুন চিন্তা? যদি পাওয়া যায়, ফ্রয়েড অবিসংবাদিতভাবে যে এই নতুন চিন্তার পথিকৃৎ, তা বললে কি অন্যায় হবে? হালআমলে, শিক্ষা ও সংস্কৃতি নতুনভাবে এই উদ্যোগসমূহের স্বচ্ছ আঙ্গিকে হলেও উভয়ই যে মানসিক প্রক্রিয়া প্রসূত তার ইঙ্গিত দিয়ে গেছেন আবার সেই ফ্রয়েড। অসচেতন আকাঙ্ক্ষা যে বিদগ্ধ হতে পারে, বিশেষকরে, যা আমরা জানছি কৃত্রিম ব্যাকরণ সম্পর্কিত পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাধ্যমে, যার ঐতিহাসিক উৎস ও প্রেরণা আবার সেই ফ্রয়েডীয় তত্ত্বে। মোট কথা, সৃজনশীলতা আশা-তৃপ্তি রূপ হলেও পরিচালন সংস্থায় 'ওপর-নিচু' দিক অপেক্ষা 'নিচু-ওপর' দৃষ্টিভঙ্গি গুরুত্ব পাচ্ছে। পরিচালনার আওতায় আর একটা দিক একেবারেই পাত্তা পেত্ না, যা হল কোনও পদক্ষেপের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়ার কিছু অবগতি। পদক্ষেপের শুরুতেই যদি কোনও খামতি থেকে যায়, যেমন প্রাথমিক শর্তাবলির স্বল্প পরিবর্তন করলে, তা হলে কি ভবিষ্যৎ সম্পর্কে নিশ্চিন্ত হওয়া যেতে পারে? অধুনা যে অনুশীলন চলছে এই ভবিষ্যৎ বা পূর্বাভাস সম্পর্কে তার থেকে দৃঢ়ভাবে বলা যায় যে পূর্বাভাস বা ঘটনাচক্রের ক্রম অনিশ্চিত হতে পারে। আজকালকার জমানায় আমরা এক ছন্নছাড়া বা বিপর্যয়মুখী কিছু হতে পারে তার আশঙ্কা করে থাকি অর্থাৎ ক্রম (order) প্রত্যক্ষভাবে বিঘ্নিত হয়ে যায়, পৌঁছে যাই এক দশায়, ইংরাজিতে যাকে আমরা বলি chaos; বাংলা তরজমায় বলা যেতে পারে অস্থিরতা। 'সৃজনশীলতা'র বা 'সৃজনমুখিতা'র অস্থিরতায় কী হাল হবে?

Chaos Incorporated নামে একটি সংস্থা বা এইরকম অনেক সংস্থা বিশ্বের নানা জায়গায় প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। উদ্দেশ্য কীভাবে 'সৃজনশীলতা', 'সৃজনমুখিতা' সকল উদ্যোগের আওতায় ও 'অস্থিরতা'কে স্বাভাবিকীকরণের স্তরে বাস্তবায়িত করা যায়।

ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কারণে যে বৃহৎ পরিণতি হতে পারে, এমনকী মানবসমাজে তার উদাহরণ অনেক দেওয়া যেতে পারে। খুব প্রচলিত উদাহরণ হিসাবে উল্লিখিত হয়ে থাকে, তা হল প্রজাপতি পরিণতি (Butterfly effect), যার অর্থ হল যে ব্রাজিলের কোনও এক প্রান্তে প্রজাপতি পাখা নাড়ালে আর এক সুদূর জায়গায়, যেমন ধরা যাক মার্কিনমুলুকের টেকসাসে আবহাওয়ার অবস্থা বদলে যেতে পারে; এটাও হল 'অস্থিরতার' একটি উদাহরণ। সম্প্রতি আমরা দেখেছি যে বিশ্বের কোনও-না-কোনও জায়গায় স্টক বাজারে খুব ক্ষুদ্র ধস নামাতে সেই সেই মহাদেশে কয়েক মাস পরে অর্থনৈতিক সংকট দেখা গেল; আবার ব্যক্তিগত পর্যায়ে বিশেষকরে, সম্পর্কঘেঁষা অবস্থায় বেঠিক সময়ে অসঠিক কথা ব্যবহারের জন্য সম্পর্ক একেবারেই বিনষ্ট হয়ে গেল— ছোট কারণ, বড় ফল। এই ঘটনাগুলির চরিত্র অনুধাবন করে বিশেষণ দেওয়া হয়েছে অরৈখিক (nonlinear); অরৈখিকতা অস্থিরতার সৃষ্টি করতে পারে এবং বিবর্তনশীলও হতে পারে। এ-ও আমরা জানি যে মস্তিষ্কে কয়েক সহস্র স্নায়ুর মধ্যে ঘাতপ্রতিঘাতের জন্য সচেতনতা উদ্ভূত হতে পারে, যেটা অবশ্য কোনওক্রমেই স্নায়ুর কর্ম নয়। মানবিক স্তরে এক গোষ্ঠীর সঙ্গে অন্য গোষ্ঠীর আদানপ্রদানে বা ঘাত-প্রতিঘাতে যে পরিণতি হবে, তার পূর্বাভাস কখনওই পাওয়া যাবে না অংশগ্রহণকারী প্রত্যেক ব্যক্তির ক্ষমতাগুলিকে আনুষ্ঠানিকভাবে যুক্ত করলে। প্রায় একই কথা বলা যেতে পারে নেটওয়ার্কের বিভিন্ন অংশে ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার মধ্যে, উদ্ভূত হবে বেশ কিছু আশ্চর্য রকমের বৈশিষ্ট্য, যা নেটওয়ার্কের কোনও অংশেরই ধর্ম হিসাবে দৃশ্যমান হয়নি। এই হল সৃজনশীলতার একটি বিশেষ দিক। উৎকর্ষ সম্ভব হতে পারে এইরকম এক আদানপ্রদানকারী পরিবেশে; এমন শর্তের বা অবস্থার সৃষ্টিও হতে পারে যাতে সৃজনশীলতার স্বতঃস্ফূর্ততাও অর্জিত হবে। কিছু আগে আমরা উল্লেখ করেছি সংস্থাগত পরিচালনা সম্পর্কে। এই প্রসঙ্গে বলতে পারি যে সেই পরিচালনায় যদি আত্মসাংগঠনিক (self organisation) চরিত্র নিহিত না থাকে বা প্রস্ফুটিত না হয় তবে সৃজনশীলতার জন্য কোনও রকম পরিবেশ গঠন করা যাবে না। কিছু পূর্বেই আমরা 'ওপর-নিচু' এবং 'নিচু-ওপর' দিকগুলির কথা বলেছি। কিন্তু তাদের সমন্বয়ের কথা এখনও পর্যন্ত উল্লেখ করা হয়নি; বোধকরি নিচু-ওপর উদ্ভূত সৃজনশীলতা আপেক্ষিক দিক থেকে অনেকখানি সহায়ক। সৃজনশীলতার ঔৎকর্ষ যদি কোনও সংগঠনে মূল উদ্দেশ্য হয়, তবে সেই সংগঠনের বুনন এক ধরনের সৃজনশীল ও আকৃতিগত-টান প্রতিফলিত করবে। এ কথা প্রায় সর্বজন স্বীকৃতির পর্যায়ে এসে গেছে যে ব্যবস্থা ও সংগঠনের মধ্যে সংস্কৃতি ও মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠা করা বাঞ্ছনীয়; যা নির্ভর করবে সেই বিশেষ সংগঠনের সংস্কৃতি ও মানসিকতার ওপর। এমন কিছু সংস্কৃতি নিশ্চয়ই উদ্ভূত হবে না, যেখানে কোনও নতুন

ধরনের স্থিতি বা সমন্বয় বা তাদের সম্পর্ক সৃজনশীলতাকে বিঘ্নিত করে। একথা অনস্বীকার্য যে তলার থেকে ওপর ক্রিয়া-প্রক্রিয়া অনেক জ্ঞানের উৎস হয়ে থাকে, কিন্তু সেই জ্ঞানকে যদি শিল্পবাণিজ্য ক্ষেত্রে বুদ্ধিমত্তা ও সহজাত প্রবৃত্তি লাগানোর কালে সতর্ক না হলে তা সৃজনমুখিতাকে বিনাশ করতে উদ্যত হতে পারে, কারণ সৃজনশীলতার অবস্থান তো সেই জায়গায় যেখানে জ্ঞানের উদ্ভব ও ব্যবহার যুগপৎ হয়ে থাকে। সেই সৃজনশীলতাকে যদি ধরে রাখতে হয়, লিপিবদ্ধ করতে হয় এবং অন্য স্থানে বিনিময়যোগ্য করতে হয়, তাহলে আবার সেই 'ওপরতলা থেকে নিচুতলা' পদ্ধতির আশ্রয় নিতে হবে। সৃজনশীলতা কি তাহলে কয়েকটি পদ্ধতির সমন্বয়? বস্তুত, এগুলি জটিলতা ও বিবর্তনশীল অবস্থার আওতার মধ্যে পড়ে, যদি আমরা ভাবি যে মোটামুটিভাবে তিনটি স্তরসাপেক্ষে এগুলির বিবর্তন ঘটছে। এগুলি ভাবা যেতে পারে এইরকম ঃ (ক) সৃজনশীলতা, বিচিত্র ভাবনা চিন্তার মধ্যে অনেক সময় অন্তর্নিহিত থাকে (খ) নতুন ধরনের ভাবনাচিন্তা থেকে নতুন রূপরেখার আবির্ভাব এবং সেগুলি অনুধাবন করা (গ) এদের মধ্যে সর্বোত্তম ভাবনাচিন্তাকে যদি কার্যকরী করতে হয়, তাহলে সুষ্ঠুভাবে বাছাই এবং পরবর্তী পর্যায়ে প্রতিষ্ঠা করা। যাতে সমন্বয় সুসম্পন্ন হতে পারে। অধুনা প্রযুক্তির এত ছড়াছড়ি, যে কোথাও যেন একে বিতরণ করার প্রচেষ্টা, বোধকরি, উৎকর্ষ ও সৃজনশীলতাকে পরিহার করে। অনেক সময় মনে হয় যে প্রতিরোধের সঙ্গে পাল্লা না দিয়ে স্থিতিস্থাপকতা (resilience)-এর সঙ্গে একটা সমঝোতা গড়ে তোলা; অন্যভাবে বললে, নিয়ন্ত্রণমুখী না করে অভিযোজন (adaptation) করে নেওয়া। বর্তমান যুগে তাই দেখতে পাই এক নতুন আধারের বিজ্ঞান, যার আখ্যা দেওয়া হয়েছে জটিলতা বিজ্ঞান (Complexity Science)। এই বিজ্ঞান, সংজ্ঞা অনুসারে, জটিল বাস্তবতার সঙ্গে যুঝবে; অতএব, নানা ভাবনাচিন্তার পদ্ধতির ও অভিজ্ঞতার, বিভিন্ন ক্ষেত্রসাপেক্ষে অংশীদারও হয়ে। পরিচালনার জগতে আমরা তাই পাই নানা সম্ভাবনার এক শঙ্কু (cone) যেখানে সৃজনশীলতা ও পারস্পরিকতা বিশিষ্ট অংশ গ্রহণ করছে।

উপরোক্ত আলোচনা থেকে স্বতঃই মনে হতে পারে যে মনস্তাত্ত্বিক দিক কোথায় যেন পিছন দিকে হঠে যাচ্ছে। কিন্তু, বস্তুত তা হওয়া সম্ভব নয়, কারণ মনুষ্য সম্পর্ক সেখানে জড়িয়ে আছে। হালকাভাবে হলেও আমরা বলে থাকি, সৃজনশীল ব্যক্তির একটি উপমার্গের মননশীলতা আছে। অতএব মনস্তাত্ত্বিকতা কোনও ভাবেই পরিহার করা সম্ভব নয়। মানবমনস্তত্ত্বে অনেক সমান্তরাল ভাবনাচিন্তা খুঁজে পাওয়া যায়। আইনস্টাইনের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের ঐতিহাসিক আলাপচারিতায় আমরা পাই এই মানবিক মনস্তত্ত্ব সম্বন্ধে অনেক নিগূঢ় তত্ত্ব। রবীন্দ্রনাথের মতে, আমাদের আবেগ ও কামনা অনেক সময় অসংযমী হলেও আমাদের চরিত্র সেগুলিকে এক ছন্দোময় সার্বিকতায় বশীভূত করে। আর একজন বিজ্ঞানী নিলস বোর জানিয়েছিলেন যে চিন্তা ও আবেগ আমাদের সচেতন জীবনশৈলীর বৈচিত্র ও সীমা সংরক্ষণ করতে অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। মনস্তাত্ত্বিক ব্যাখ্যা নিরন্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে। ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের মর্যাদা আমাদের বাঞ্ছনীয় হলেও তার যেন বিকৃতি না ঘটে, আত্মতৃপ্তি বা আত্মউপাসনায়। আবার সেই মনস্তত্ত্ববিদ্যার কথায় আত্মমতবাদের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত আছে ইংরাজিতে যাকে আমরা বলি narcissism। আত্মমুখিনতা হয়ত আবার পুরনো কথায় এক ধরনের পলায়নী মনোবৃত্তি। এমনও হতে পারে যে পলায়নমুখিনতার এমন কিছু ক্ষমতা আছে যার সাহায্যে তার আদি প্রকৃতিকে ধরে রাখতে পারে এবং চারপার্শ্বের অমানবিক শক্তিগুলিকে প্রতিহত করতে পারে। এ যুগের একজন প্রতিষ্ঠিত মনস্তত্ত্ববিদ Paul Vitz একটু বিশদভাবে বলেছেন এইরকম : 'Narcissism a private stronghold against a hostile, mechanised modern world'। বিজ্ঞানজগতের বহু দিনের স্বীকৃত তত্ত্ব হল হ্রাসকরণ তত্ত্ব (reductionist theory)। সিগমুন্ড ফ্রয়েড সরাসরি না বললেও বা দেখলেও, তাঁর উত্তরসূরিরা মনস্তাত্ত্বিক বিজ্ঞানে কি এই ধরনের মনস্তাত্ত্বিক হ্রাসকরণবাদ (reductionism) করতে পেরেছেন? আবার সেই রবীন্দ্রনাথের কথায় এবং বর্তমান বিজ্ঞানজগতের মনীষী Penrose-এর কথায়, আত্মীকরণ (internalisation)কে মনস্তাত্ত্বিক দিক থেকে বা স্নায়বিক মনস্তত্ত্বের দিক থেকে স্বীকৃতি দিতেই হবে, না হলে সৃজনশীলতা ও সৃজনমুখিতার এখনকার জগতের চিন্তা-ভাবনার নিরিখে ব্যাখ্যা পাওয়া সহজ হবে না।

ফ্রয়েডীয় তত্ত্বে আধুনিককালের প্রাসঙ্গিকতা আলোচিত হলেই প্রশ্ন ওঠা স্বাভাবিক যে মনস্তত্ত্বের দিকে নজর দেওয়া, কোনও রকমের অনুসন্ধানে, আদৌ প্রয়োজন কি না। এমনকী সংকট, যদি কোনও বিষয়ে বা ঘটনায় উপস্থিত হয়ে থাকে, যেখানে বিষয় হিসাবে মনস্তত্ত্বের চাহিদা আবশ্যিক হয়ে দেখা দেয়? এইরকম বহু বিষয় বা ঘটনার অবতারণা করা যেতে পারে। তবে বর্তমানে লেখকের পক্ষে সহজ হবে যদি গণিত বিষয় সংক্রান্ত দিকটির উল্লেখ করা যায়। সুতরাং এই প্রবন্ধের অবশিষ্ট অংশটি এই দিকের ওপর সীমিত উপস্থাপনা, যা মূলত গণিতচর্চার নির্যাস নিয়ে, বিধিবদ্ধ অতিসূক্ষ্মতাকে জড়িত না করে।

সব শাস্ত্রের মতো না হলেও, গণিতশাস্ত্রানুশীলনের একটি বৈশিষ্ট্য হল, ঐতিহাসিক পরম্পরাকে অনুপেক্ষিত করে তাত্ত্বিক দিক থেকে কোনও অসঙ্গতি বা অসংলগ্নতা এড়িয়ে যাতে গাণিতিক ভিত নড়বড়ে না করে গাণিতিক বক্তব্যকে সঠিকভাবে যুক্তিসঙ্গত পন্থায় প্রতিষ্ঠিত করা। ফরাসি দেশে বুরবাকি (Bourbaki) গোষ্ঠীর কথা বলা যেতে পারে। গণিত বিবর্তনশীল এবং স্বজ্ঞা, স্বতঃসিদ্ধ, উপপাদ্য অনুসিদ্ধান্ত ইত্যাদি মানসিক প্রস্তুতির সহায়তায়, গণিতস্থাপত্য নির্মাণ করা হয়েছে। এই প্রয়াসে গত দু'শতাব্দী ধরে দেখা যায় এক ধরনের সংকট আর তা মোকাবিলার জন্য শরণাপন্ন হতে হল মনস্তত্ত্ববিদদের কাছে। জন্ম নিল, গণিতজ্ঞদের মতে, স্ব-মনঃসমক্ষীণ (autopsychoanalysis)। এর ফলে গণিতজ্ঞরা গভীরভাবে অনুসন্ধান করতে শুরু করলেন মানসিক কাঠামোর গভীরতম স্তর থেকে আর পাওয়া গেল গাণিতিক আঙ্গিকে, কাঠামো/আকৃতি (structure) ও সম্পর্ক (relations)। দীর্ঘকাল ধরে গণিতে ব্যবহৃত কিছু সামগ্রী অবলুপ্ত হল এবং এই দুই নতুন তত্ত্বের নিরিখে গাণিতিক জ্ঞানসম্ভার ঢেলে সাজানোর প্রচেষ্টা দেখা দিল। গাণিতিক সৃজনশীলতায় দেখা দিল এক ধরনের টান (tension), যার উল্লেখ পূর্বেই করা হয়েছে। গণিত, বোধকরি লুক্কায়িত হল মনের জগতে, কিন্তু এর শাশ্বত উৎকর্ষ এক ধরনের বিশ্বাসে পর্যবসিত এমনভাবে হল যাতে মানবজাতির অস্তিত্ব (existence) কখনই বিঘ্নিত হবে না, শুধুমাত্র যে দীর্ঘমেয়াদি ভাবনাচিন্তার জগতে নয়, যার থেকে জন্মাল এক উদ্ভাবনী ভাবনাশক্তি। গণিতজ্ঞদের সচেতনতা বোধকরি ধাক্কা খেল। উদাহরণস্বরূপ বলা যেতে পারে 'অইউক্লিডীয় জ্যামিতি'র বাস্তবতা সম্পর্কে। আবার প্রশ্ন উঠেছে, এমন কী মানসিক কাঠামো আছে যা থাকলে বীজগণিতবিদ, জ্যামিতিবিদ প্রমুখ গণিতজ্ঞরা ভিন্ন ভিন্ন গোষ্ঠী হিসাবে স্বীকৃত হতে পারেন? পঞ্চাশের দশকের মাঝামাঝি থেকে গণিতজ্ঞরা নিজেদের মধ্যে প্রশ্ন করেছেন : এর কি কোনও psychosomatic ভিত (basis) আছে? গণিত যেহেতু মানসিক ক্রিয়াকলাপজাত, শুধুমাত্র মানসিক অবগতি কি একমাত্র সহায়ক, মানসিক আশঙ্কা উদ্ভূত সমস্যা নিরসনে? সত্যি কথা বলতে কি, গণিতকে দেখা যেতে পারে, মনের এক বিশেষ ধাঁচের ক্রিয়া যার সঙ্গে অন্য রকমের ক্রিয়া-প্রক্রিয়ার যোগসূত্রতা গড়া যেতে পারে। বস্তুত গণিত হল মনেরই একটি আরোপ, যা বিচ্ছিন্ন করাতে, একত্রিত করাতে, চাপ সৃষ্টি করাতে এমনকী এড়ানোরও অংশীদার হতে পারে; বিশেষ করে, মন যখন নিজেরই ওপর কোনও কর্মে লিপ্ত হয়ে যায়। প্রসঙ্গত বলা যেতে পারে এই ধরনের মানসিক কার্যাবলি অভিব্যক্তির জন্য কার্যত চাই একটি সক্রিয় উপাদান, যাকে বলতে পারি ভাষণ (speech) যার আলোচনা বিস্তৃত বলে এখন তার থেকে বিরত থাকা সমীচীন। শুধু এইটুকুই বলা যেতে পারে যে এই অভিব্যক্তির গতিকে বিধিবদ্ধ আকার দিতে হলে নবগণিতের সৃষ্টি অবশ্যম্ভাবী হয়ে উঠবে।

১৯৯৩ সাল ছিল ফ্রয়েডের অসচেতন সম্পর্কিত রচনার শতবর্ষপূর্তি; স্মরণ করা যেতে পারে এর জার্মান প্রতিশব্দ হল das Unbewasse, যা সিগমুন্ড ফ্রয়েডের প্রায় সব রচনা সংকলনের অন্তর্ভুক্ত। বলা বাহুল্য যে এই পর্যায়ে এটি লেখা মনঃসমীক্ষণের দৃষ্টিভঙ্গি থেকে। মনঃসমীক্ষণ পৌঁছে দিতে পারে এক ধরনের ভাবনাচিন্তা, যা কোনও ব্যক্তির জীবনে এক সময়ে সব কিছু ছিল অসচেতনভাবে, কিন্তু নিপীড়িত হয়েছিল, কারণ তারা ছিল ফ্রয়েডীয় দৃঢ় দৃষ্টিভঙ্গিতে সত্যের প্রতিরূপ। মনঃসমীক্ষণের প্রতিপাদ্য হল : এইরকম ভাবনাচিন্তা নিপীড়িত হয়ে থাকতে পারে বা বিস্মৃত হতে পারে, কিন্তু সক্রিয় থাকে ব্যক্তির জীবনে এবং ব্যক্তির জীবনে এক গোপন অথচ বলিষ্ঠ প্রভাব বিস্তার করে যায়। তাহলে মনঃসমীক্ষণ কি শুধু অসচেতনতায় ব্যাপৃত থাকে? তা শুধু করার নিমিত্ত করা নয়, কোনও কিছুর অনুসন্ধানে ব্রতী হয়; এমনকী বর্তমানের উদ্বেগের পশ্চাদ্ধাবনে। অতীতকে স্মৃতিপটে জাগানোই একমাত্র উদ্দেশ্য নয়; অতীতকে নতুনভাবে জীবিত করা, যার ফলে বর্তমানের সঙ্গে তার সহাবস্থান সহজ হয়। বর্তমান পর্যায়ে, বিশ্লেষণের দায়িত্ব হল এই সম্পর্ককে বারংবার পুনরুজ্জীবিত করা। কিন্তু গণিত সম্পর্কে এর প্রাসঙ্গিকতা কোথায়? একদিকে আবেগ, আর একদিকে আপাত-শীতল বুদ্ধিমত্তা। আবেগমিশ্রিত জীবনশৈলীকে, তাত্ত্বিক জগতের বাস্তবতার নিরিখে ধ্বংস করা কি উচিত? অন্য দিক থেকে বললে, এরকম ভাবনাও আসতে পারে যে তর্ক-জগতকে আবেগ কর্তৃক দূষিত করা কি সমীচীন? এইগুলির আংশিক জবাব পাওয়া যাবে Ignacio Matte Blanco কর্তৃক প্রণীত *The Unconscious as Infinite Sets* গ্রন্থে যা প্রকাশিত হয়েছিল ১৯৭৫ সালে লন্ডন থেকে এবং যার সমালোচনা, দেখা গেল মনঃসমীক্ষণের ওপর এক বিখ্যাত আন্তর্জাতিক পত্রিকায়; বস্তুত, সুপ্রসিদ্ধ গণিতজ্ঞ ও অসীমোত্তর তত্ত্বের জনক Georg Cantor-এর (১৮৯৫-১৯১৮) অসীমতা ও অসচেতনতার যোগসূত্রতা স্থাপন সম্পর্কে। Matte Blanco-এর কাজটিকে অসচেতনতার গাণিতিকীকরণ বলা যেতে পারে। এর বিপরীত অর্থাৎ গণিতের মনঃসমীক্ষণ কি সম্ভব? হাঙ্গেরির এক বিশেষজ্ঞ Imre Hermenn, ১৯৮০ সালে প্রকাশিত তাঁর '*Parallelisms*' গ্রন্থে আলোচনা করেছেন এই দিকে,

এমনকী Cantor সম্পর্কেও। আর একজন হচ্ছেন ফরাসি বিশেষজ্ঞ Michell Serries, যিনি তাঁর বিজ্ঞান ও গণিতের ইতিহাস সম্পর্কিত নানা প্রবন্ধে একটি মনঃসমীক্ষণমূলক বিশ্লেষণে গণিতের উৎস সন্ধানে ব্রতী হয়েছেন এবং বহু আলোচিত অয়দিপাউস মিথ বা সংগ্রামের সঙ্গে পিথাগোরাসের অমূলদতা তত্ত্ব অনুসন্ধানের সাযুজ্য দেখিয়েছেন। মনঃসমীক্ষক হিসাবে আগেই বেশ কিছু বলা হয়েছে, ফ্রয়েডের ধারণা ছিল যে কোনও ব্যক্তির জীবনের কয়েকটা বছর কেবলমাত্র পরবর্তী জীবনের গুণগত ধারাকেই নির্ণয় করবে তা শুধু নয়; এই প্রথম কয়েকটি বছর নির্ভর করবে জীবনের প্রথম কয়েকটি মাসের উপর। তাহলে ফ্রয়েড জীবনবিকাশের সময়সীমা ধরেছেন : তিন থেকে পাঁচ, যা হল তথাকথিত অয়দিপাউস-দশা বা গূঢ়ৈষা। ফ্রয়েডের আর একজন উত্তরসূরি, মহিলা মনঃসমীক্ষক Melaine Klein-এর মতে, এই দশা আরও আগের থেকে শুরু অর্থাৎ যখন থেকে শিশুর মাতৃবক্ষের সঙ্গে সম্পর্ক শুরু। আর এক মনঃসমীক্ষক Wilfred Bion, গাণিতিক ভাষায় বলেছেন, এইরকম বয়স-পর্যায়ে, মানসিক ক্রিয়াকলাপ হল শৈশব অবস্থার অপেক্ষক। Bion তাঁর গ্রন্থে অনেক মনীষীদের কথা উদ্ধৃত করেছেন, তবে পঁয়েকার রচিত *Science and Method* নামে বিখ্যাত পুস্তকে বৈজ্ঞানিক সৃজনশীলতা সম্পর্কে উদ্ধৃতি আজও বিশেষভাবে অত্যন্ত প্রয়োজনীয় ও প্রাসঙ্গিক।

উপসংহারে বলা যায়, ফ্রয়েডীয় সাম্প্রতিকতা তখনই প্রাসঙ্গিক হয়ে ওঠে, যখনই যুগপৎ প্রসঙ্গ ও সম্প্রতি নানাভাবে আলোচিত হতে থাকে; উভয়ের মধ্যে যোগসূত্রতা কোনও ক্রমেই যেন হারিয়ে না যায়, অর্থাৎ ইতিবাচক দিক থেকে তা যেন নিরন্তর প্রস্ফুটিত হওয়ার জন্য উন্মুক্ত থাকে। Bion তাঁর সুবিদিত *Learning from Experience* (প্রকাশক : Heinemann, London, প্রকাশকাল ১৯৮২) পুস্তকে ফ্রয়েডের ওপর যা মন্তব্য করেছেন, তা অত্যন্ত প্রণিধানযোগ্য; তা হল এই : Any experience may be used as a 'model' for future experience. This aspect of learning by experience is related to and may be identical with, the function Freud attributes to attention when he says it had 'periodically to search the outer world in order that its data might be already familiar, if an urgent need should arise'। একথাগুলি আজও প্রযোজ্য, বিশেষকরে উদ্যোগী প্রয়াস সম্পর্কে ও অভিজ্ঞতাপ্রসূত জ্ঞানার্জনে। আর একটু বলা যেতে পারে যে Bion মনঃসমীক্ষণের 'মডেল' নির্মাণে প্রেরণা পেয়েছিলেন গণিত তর্কাচার্য Alfred Tarski-র থেকে। এই সম্পর্কে বিশদ আলোচনা করলে গাণিতিক জগতের আপেক্ষিকভাবে জটিল তত্ত্বে উপনীত হতে হবে, যেখানে গণিতজগতের দুই দিকপাল Gödel ও Cohen-এর গাণিতিক অবদানের কথা অবশ্যই এসে যাবে ফ্রয়েডের দেড়শো বছর জন্মপূর্তিতে। প্রসঙ্গত রাজনীতি, শিক্ষা, সমাজ ইত্যাদির প্রেক্ষাপটে যেন আমরা ভাবি : 'We need not feel that we are faced with a choice between poetic warmth and the cold, dry fruits of the Pythagorean tree'। যা অত্যন্ত দৃঢ়ভাবে জানিয়েছেন Sherry Turkle তাঁর *Psychoanalytic politics* গ্রন্থে (প্রকাশক, Burnett, London; 1979 Pg. 237)।

পুনরাবৃত্তি

শম্ভু রক্ষিত

চারপাশের রিক্ত হৃদয় চিৎকার করে এসে দাঁড়াল গোচারণ ভূমির ওপরে।
প্রত্যেকবার আমার পাশ বেয়ে প্রদর্শিত মুখ
অভিশপ্তের উন্মুক্ত প্রার্থনার মতো
বিবস্বানের নির্দেশে স্বতন্ত্রভূমি তৈরি করল।

এক শ্বেত কুষ্ঠরোগিনী শতচ্ছিন্ন পোশাকের তলায়
হাত লুকিয়ে আমার শরীরে উচ্ছ্বাসের সংলাপ ঢালছিল।
তার বৈশিষ্ট্য সমর্পিত, পরিপূর্ণ
এবং তার প্রশ্নকটি আমার কাঁধের ওপর হয়ে দিনের ঊষায় জঠরাগ্নি নামাচ্ছে।

পিতলের বাতিদানের চিহ্ন ধরে এসে গান গেয়ে ক্লোম জাগল।
মিশ্রিত ধ্বনি অবলীলাক্রমে এক-একজন নৃত্যঙ্গনা নোংরা আর উকুনভর্তি
নারীর মেঘরেশম শাড়ির ছোট ছোট ঘোড়াদের ওপর পশুর গলা বানিয়ে ফেলল।
সবই বেসুরো। অপরিণত। অবশ্য স্বচ্ছন্দ।

তিনজন আবকার আমার ঘরের মেঝেয় বসে হিজিবিজি সব বানাচ্ছে।
সামান্য আগে জানালাম। আমি তখনো আমার হয়ে উঠিনি। নির্দিষ্ট।
মৃতদের বিস্ময়কর শক্তি দেখে আমার ভীষণ রোষ হল।
আমি রাসায়নিক তন্তুর কাছে অনেকদিন কাউকে গলে যেতে দেখলাম না।
কোন মানুষ ছায়া হতে পরিবর্তন এল।
আপিঙ্গল বাতাসকে আমি কি করে সম্বোধন করব?
আমার আপশোস থাকল। সুখের ক্ষীণ শব্দের মধ্যে
আমার চাবুক। এবং চিরন্তন যেন
জাহানের চিত্রের ঘাড় বেঁকিয়ে রূপান্তরিত। আধুনিক।

অনেকেই থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল। সহগামিনীরা বেগবান জলোচ্ছ্বাসের মতো
এগিয়ে এল। ফুলে ফুলে হেলে দুলে নাচতে লাগল। আর প্রত্নতত্ত্ব ভূতত্ত্ব ও
আবহাওয়া বিজ্ঞানীদের শাসন করে আমার মুখের দিকে চেয়ে রইল।
আমার শূন্য যন্ত্রণা।
আমার অজ্ঞেয় হৃদয়ে ধারণার আইনঘড়ি। প্রতিজ্ঞাবদ্ধ।
তাদের নিরুদ্দেশ যাত্রায় ষাঁড়ের ও মেষশিশুর অবসর।

সবাই নির্ব্যাজ নিকুঞ্জের বাইরে এসে পড়ল।
দেখল মাটির ওপর বিচ্ছিন্নতার ভেতর আমি পরিপূর্ণতা জুড়ে রয়েছি।
আমার অভিসন্তাপ মুখ দেখা যায়নি।
আমার উদ্ধত মুখ শুদ্ধ। উন্মুক্ত। অভ্যর্হিত।

অন্য আলো

আনন্দ ঘোষ হাজরা

কতদিন থাকে সে আলোক?

যে আলোক নেমে আসে
বাঁকানো চাঁদের শিং ভেঙে
অথবা সে অবিশ্রাম স্বর্গীয় শ্মশ্রুর রূপে নামে
চৌপাহাড়ি জঙ্গলের ধারে—
সেইখানে রাত্রি জুড়ে বছর বছর ধরে দাঁড়িয়ে রয়েছ
রহস্য ছবির মতো তুমি.....
কতদিন থাকে সে আলোক?

ধূলিকণা মুছে দেয় সে আলোর রেখা
মুছে দেয় প্রবল বাতাস
তবু পড়ে থাকে গূঢ় আরিজোনা-ক্ষত।

ই-মেলে সংবাদ এল
তোমার পুত্রের বিয়ে হল
দ্বিতীয় পুত্রের.....

বৃত্তি

সুদেব বক্সী

হেঁটে হেঁটে যাই
ভরা পেটে যাই
কথা সম্বিৎ জগতে।

প্রহরে প্রহরে
সে কী ধোঁয়া ওড়ে
খিদেও পারে না এগোতে
না এগোলে খিদে
তখনই সুবিধে
ভীরু দু'পা ধুই বরফে
যদি খিদে পায়
অন্নের প্রীয়
কথাগুলি রাখি হরফে।

আসি

সতীনাথ বৈরাগ্য

বাবার আজ বিকেলে ফিরে আসার কথা ছিল ব'লে
মা, ঠাকুমার কথামত বাবার প্রিয় তিলের নাড়ু
করেছিল সকালে।

এখন বিকেল।
কয়েকজন লোক—বাবার কাঠুরে সঙ্গী,
বাবার দেহটা ধরাধরি করে এনে
উঠোনে শুইয়ে দিয়ে বলল—
বাঘে খেয়েছে।

পাথরের বুড়ি আমার ঠাকুমা।
তার ঘোলাটে চোখে জল নেই।
মার বনরঙা শাড়িতে লেগে যাচ্ছে বাবার রক্ত।
বাঘের হিংসাকে ধুয়ে মুছে দিচ্ছে তার
অজস্র অশ্রুবিন্দু।

বাবার পাশে ফেলে রাখা কুড়ুলটা তুলে নিই
বনে যাব।
বাবার ঘাতক বাঘ, তোকে আমি নাও পেরে পারি
কাঠ পাব।

ঠাকুমা, আসছি.....
আসি, মা।

ধ্বনি

সুমন্ত মুখোপাধ্যায়

তুমি শব্দময়
তুমি আমার কাঁধের শব্দে
হাত রেখেছিলে
আমার হাতের শব্দে
তোমার আঙুলগুলো
কী যে একলা হয়ে উঠেছিল
কাকে বলব
আমি আজ মাছির সংসারে বসে আছি
ধ্বনির সংসারে
যদি কালো ফুল ফুটে উঠল
কে শুনিল রাজেশ্বরী
কমল মুকুল দল
সেই শব্দে
কোন গঙ্গাজলে

অপার

সন্দীপন চক্রবর্তী

হাওয়া জমে জমে পাথর হচ্ছে
রোদ জমে জমে মাখন
ভয় জমে জমে মাথার ভিতর
নড়বড়ে এক সাঁকো
কিছুতে পেরোতে পারছি না, জানিস
পা ফস্কে গেলে মৃত্যু
রাগ জমে জমে শিরায় ছুটছে
চোখ ঝলসানো বিদ্যুৎ
ছাই হয়ে গেছে মাইল মাইলস্টোন
তুমি সব লিখে রাখো

হাওয়া জমে জমে পাথর হচ্ছে
রোদ জমে জমে মাখন

খেলা

শ্রীজাত

আর কী খেলব আমি, আমাকে শেখাও কোনও নতুন খেলা
তুমি তো দূরেই থাকো, এখানে পড়েও আসে বিকেলবেলা
জামায় দাগের মতো, যেতেও চায় না আর, অলস যে রোদ...
কোথাও যাবার নেই। তোমার ডানায় কাজ...বাসায় ফেরো
আমার লাগে না ভাল আমার লাগে না ভাল লাগে না ভাল
ছায়ায় কাটাই ছায়া...হেলায় কাটায় পাশা একেকটা লোক
আর কী বুঝব আমি, আমাকে বোঝাও কোনও জটিল ধাঁধা
তুমি তো দূরেই থাকো, এখানে পায়ের নীচে কাঁকর, কাদা...
আবার সন্ধে নামে। কেন যে ফুরিয়ে আসে বিকেলবেলা
আর কী খেলব আমি, আমাকে শেখাও কোনও নতুন খেলা

আর. এস চতুর্দশপদী : ১৮

জয়দেব বসু

মশলা বাটতে-বাটতে আমার
এত বছর কাটতে, হঠাৎ
স্বপ্নে এলেন উনি—
বললেন, 'ওরে ভুনি,
তোকে কত ভালই যে বাসতাম;
না বুঝে তুই রাস্তায়
বেরিয়ে গেলি মাগী। আজও
তোর লাগি রাত জাগি।'

চমকে উঠি...ইশ্,
লাগে উনিশশো তেত্রিশ।
দেখি : দর্জ্জিপাড়ার সেথো
ওয়াঁয় ডেকে নিচ্চে ভেতর।

কিন্তু, কোথায় গেল সে,
আমায় বার করল যে।

আমার সময়ের কথা

ননীমাধব চৌধুরী
সম্পাদনা ও টীকা—সুমিতা চক্রবর্তী

(পূর্বপ্রকাশিতের পর)

বড় ম্যাথেম্যাটিসিয়ান, বড় ফিজিসিস্ট, আবার কাব্যে, সংগীতে রুচিবান, হাস্য-কৌতুকের রসে উচ্ছল, গল্প-গুজবে অপরিমিত উৎসাহী, আসরজমানো মজলিশি আলাপে অদ্বিতীয়। যেমন নিবিষ্টচিত্তে মোটা খাতায় পাতার পর পাতা equation কষতে থাকে আবার আমার মেয়ের এসরাজ নিয়ে একা বসে তেমনই নিবিষ্টচিত্তে বাজাতে লাগল স্বচ্ছন্দ গতিতে—দিকে দিকে বিচরণশীল বৃহৎ, উদার মন সত্যেন্দ্রনাথের। নানা রকম চরিত্রের, নানা রকম শখের, নানা রকম ভাবনার মানুষের সঙ্গে সহজে মিশে যেতে পারতেন তিনি। মানুষের কথা ও ব্যবহারের পশ্চাতে যে মন কাজ করে সেই মনকে চিনে নেবার সহজ দক্ষতা ছিল তাঁর। কারও মনের মধ্যে ভাল জিনিস আছে দেখতে পেলে বাক্য ও ব্যবহারের ত্রুটি উপেক্ষা করতে পারতেন। তাই নানা মতের নানা পথের লোক ভিড় করত তাঁর চারপাশে। সহজ প্রীতিতে মানুষকে আপন করে নেবার ক্ষমতা ছিল তাঁর।

বাংলাসাহিত্যের প্রতি বিশেষ অনুরাগ ছিল সত্যেন্দ্রনাথের। বাংলাভাষার মাধ্যমে বৈজ্ঞানিক তথ্য প্রচারের জন্য 'বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ' প্রতিষ্ঠিত করেছেন। বাংলাকে উচ্চশিক্ষার, বিজ্ঞানশিক্ষার বাহন করবার জন্য বহু প্রচারকার্য করেছেন। বিরল অবসরে বাংলা প্রবন্ধও লিখেছেন। কিশোর বয়সে ও প্রথম যৌবনে বাংলার বিপ্লবীদলের সংস্রবে এসেছিলেন। অনেক বিপ্লবী নেতার সঙ্গে ব্যক্তিগত আলাপ ছিল তাঁর। শুধু সত্যেন্দ্রনাথ কেন তাঁর নাম করা সতীর্থ ও বন্ধুগণের মধ্যে মেঘনাদ সাহা, জ্ঞানেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, জ্ঞানেন্দ্রনাথ ঘোষ সম্বন্ধে একথা বলা যায়। বয়স অভিজ্ঞতা ও বিজ্ঞানের সাধনা বিপ্লবী আন্দোলনের প্রতি কৈশোরের সহানুভূতি মুছে ফেলে নাই।

সবুজপত্রের সূত্রে আলাপ আরম্ভ হয়ে সত্যেন্দ্রনাথের ক্ষেত্রে সেই আলাপ ঘনিষ্ঠ বন্ধুত্বের কোঠায় পৌঁছেছে। ঠিক এমনটি আর কারও বেলায় হয়নি। সবুজপত্রের সূত্রে সত্যেন্দ্রনাথের কয়েকজন বিশিষ্ট বন্ধুর সঙ্গেও আলাপ হয়েছিল কিন্তু মেলামেশা থাকলেও তাঁদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা জন্মায়নি। সত্যেন্দ্রনাথের warm heartedness, large heartedness, wide sympathy এবং balance যার-তার মধ্যে দেখা যায় না।

আমার সাহিত্যকর্মে সত্যেন্দ্রনাথ বরাবর আগ্রহ দেখিয়েছেন। তাঁর প্রতিষ্ঠিত বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদের "জ্ঞান বিজ্ঞান" পত্রিকায় আমার অনেকগুলি প্রবন্ধ ("ভারতবর্ষের অধিবাসীর পরিচয়" সিরিজ) প্রকাশিত হয়েছে। আমার কয়েকটি গল্প, বিশেষ করে দেশবিভাগের পরে লিখিত কয়েকটি গল্প তিনি পড়েছেন। দেশের স্বাধীনতা আন্দোলনের ইতিহাস আশ্রয় করে যে উপন্যাস সিরিজ লিখেছি তার কিছু কিছু পড়েছেন। আমার এই উদ্যমের তিনি উৎসাহী সমর্থক।

বৈজ্ঞানিক সত্যেন্দ্রনাথ সভাসমিতিতে রাজনৈতিক ব্যাপার সম্বন্ধে মত প্রকাশ করেননি কখনও। দেশ স্বাধীন হবার পরেও। ঘরোয়া আলোচনার মধ্যে সরকারি নীতির সমালোচনা উঠলে সাধারণত বিতর্কে যোগ দেন না। এ সত্ত্বেও তাঁর ব্যক্তিগত মত কোন দিকে বুঝে নেওয়া যায়। ১৯৪৯ থেকে কংগ্রেসি সরকারের মানে পণ্ডিত নেহরুর তিব্বত নীতির সমালোচনা করে কাগজে প্রবন্ধ লিখেছি। কয়েকমাস আগে তাঁর বাড়িতে গিয়েছি। দেখলাম ডা. রাম মনোহর লোহিয়া এবং আরেকজন অবাঙালি ভদ্রলোক এসেছেন। নেফায় চীন আক্রমণের কথা এবং নেহরুজির তিব্বত নীতির কথা উঠল। সত্যেন্দ্রনাথকে দেখাব বলে ১৯৫০ সনে হিন্দুস্থান স্ট্যান্ডার্ড প্রকাশিত তিব্বত সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধের কপি নিয়ে গিয়েছিলাম পকেটে করে। সেটি বের করে ডা. লোহিয়াকে পড়তে দিয়ে বললাম, look at the date of publication and the lines marked with red pencil. লাইনগুলিতে নেহরুজির চীন-তিব্বত নীতি রীতির নিন্দা করা হয়েছিল, এরপর দেখা যাবে তিব্বতে কায়েম হয়ে বসবার পরে চীন নেফা এবং আপার আসাম গ্রাস করবার জন্য এগিয়ে আসবে।

ডা. লোহিয়া প্রবন্ধটি পড়লেন এবং চিহ্নিত লাইনগুলি জোরে পড়লেন। সত্যেন্দ্রনাথ হেসে আমার পিঠে হাত বুলিয়ে বললেন, তুই যে একজন Prophet জানতাম না। কপট গাম্ভীর্যের সঙ্গে বললাম, চেরাগের নীচেই যে আঁধার। তিনি উচ্চহাস্য করলেন। ডা. লোহিয়া ও তাঁর সঙ্গী চলে গেলে প্রবন্ধটি তিনি মন দিয়ে পড়লেন।

সত্যেন্দ্রনাথ ঢাকা থেকে ফিরে বালিগঞ্জ সার্কুলার এবং নিউ আলিপুরের ভাড়া বাড়িতে কিছুকাল কাটিয়ে অবশেষে ঈশ্বরী মিল লেনের পৈতৃক গৃহে পাকা হয়ে বসেছেন। তাঁর বাড়ি বালিগঞ্জ থেকে একটু দূরপাল্লার পথ, অতুলবাবুর মৃত্যুর পরে এই পথ পাড়ি দিয়ে আড্ডা দিতে তাঁর বাড়িতে যাতায়াত কিছু বেড়েছে। একদিন বললেন, যেতে আসতে কষ্ট হয় একটু না? বললাম, কী করি পনেরো কুড়ি দিন দেখা না হলে বিরহব্যথা জেগে ওঠে প্রাণে। হাসলেন আমার কথা শুনে। একদিন ফোনে ডাকতে রিসিভার ধরে বললেন, হ্যালো। বললাম, ননীবাবু ফোন করছেন, তাঁর কাজ হয়ে গেছে এবার ছেড়ে দিচ্ছে না, বিস্ময়ের স্বরে বললেন কী ব্যাপার? কী খবর তোর? বললাম, অনেক দিন শুনিনি, তাই গলার স্বর শোনবার জন্য ফোনে ডাকলাম। উচ্চহাস্য করে বললেন, চলে আয় এখানে।

অতুলবাবুর কথা শুনলে মনে হত বন্ধ জানালা খুলে গিয়ে খোলা হাওয়া লাগল, সত্যেন্দ্রনাথের হাসি দেখলে, হাসি শুনলে মনে হত মন ভাল হয়ে গেল। সম্প্রতি সত্যেন্দ্রনাথের সত্তর বৎসর পূর্তি উপলক্ষে যে উৎসব হয়ে গেল কলকাতায় শুধু বৈজ্ঞানিক নয়, দেশের বিভিন্ন স্তরের লোকের বিশেষ করে ছাত্র এবং যুবসমাজের অনেকের মনে তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা ও প্রীতির পরিচয় পাওয়া গিয়েছে। সবুজপত্রের মজলিশে প্রমথ চৌধুরীমশায়ের প্রবন্ধ ও গল্প পড়া শুনেছি, রবীন্দ্রনাথের গান, নাটক করা এবং গল্প শুনেছি। কিরণশঙ্কর রায়ের গল্পপড়া শুনেছি। যতদিন কলেজে চাকুরি করতেন মজলিশে নিয়মিত অগ্র আসনে কিরণশঙ্কর, রাজনীতিতে যোগ দেবার পরে কম আসতেন। বেশ ভাল লাগত তাঁকে। তাঁর সঙ্গে শেষ দেখা হয় অতুলবাবুর বাড়িতে তাঁর এক ছেলের বিয়ের সময়। মানিক গকুর গ্রাম্য ভাষায় লিখিত গল্প করতেন সুরেশানন্দ ভট্টাচার্য। তাঁর কয়েকটি গল্প সবুজপত্রে প্রকাশিত হয়েছিল। আরও অনেকের কথা ভুলে গিয়েছি।

সত্যেন্দ্রনাথ এবং অতুলবাবুর কথা বলতে গিয়ে সময়ের অনেকগুলো ধাপ পার হয়ে এসেছি। আবার ফিরে যাওয়া যাক কলকাতা বাসের প্রথম কয়েকটি বৎসরের কথায়। এবার পড়াশোনার কথা কিছু বলব। এই পড়ার নেশা, জানবার নেশা খানিকটা পঙ্গুত্ব এনে দিয়েছে বৈষয়িক জীবনের পথে। তার ফলে অনেকদিকে অসুবিধা ঘটেছে, অসুবিধার ফল ভোগও করেছি।

সবুজপত্রে ফরাসি গল্পের অনুবাদ প্রকাশিত হতে থাকলে ভাষাশিক্ষার ব্যাপারে উৎসাহী হয়ে স্প্যানিশ, রাশিয়ান, জার্মান এবং ইতালিয়ান ভাষা শিখতে আরম্ভ করেছিলাম। হিন্দি এবং উর্দুও। এক স্প্যানিশ ভাষা ছাড়া আর কোনও ভাষাশিক্ষায় অগ্রসর হতে পারিনি। একটা কারণ ছিল বইয়ের অভাব। স্প্যানিশ অক্ষর গ্রামার এবং কয়েকখানি সাহিত্যের বই প্রমথ চৌধুরীমশায়ের কাছে পেয়েছিলাম। সেই বইখানায় বেনাভেন্তের কয়েকটি নাটিকার সঙ্কলন ছিল। দুটি নাটিকাও বাংলায় অনুবাদ করেছিলাম।

ভাষাশিক্ষার উৎসাহ একটু কমে আসতে দেখলাম ইংরাজি সাহিত্যে এম. এ. পাশ করেছি বটে কিন্তু জানি না কিছুই। দেশের প্রাচীন সাহিত্যের, ইতিহাসের কিছু জানি না। এই বিরাট দেশের বিরাট জনসংখ্যার পরিচয়, ধর্মের ইতিহাস, প্রতিবেশী দেশগুলির ইতিহাস, লোকপরিচয় কিছু জানি না। জানি শুধু ইংরাজি সাহিত্যের ডজন তিন লোকের নাম এবং তাঁদের রচনার অতি সামান্য অংশমাত্র।

অনেকটা এলোমেলোভাবে পড়াশোনা আরম্ভ হল। দূর অতীতের দিকে তাকিয়ে চিন্তা করতে বসলে মনে হয় গোড়াতে যদি নির্দিষ্ট লক্ষ্য সামনে রেখে সুপরিকল্পিত প্ল্যান করে পড়াশোনা আরম্ভ করতাম হয়ত একটা চিহ্ন রেখে যাওয়া সম্ভব হত। আমার কোনও প্ল্যান ছিল না। নিজের বিরাট অজ্ঞতায় অভিভূত হয়ে গিয়েছিলাম। যেন কিছু করে যাবার কথা মনেই হয়নি, মনে হয়েছিল শুধু নিজের মনে জ্ঞানের আলোক জ্বালতে হবে। তাই আরম্ভ করলাম geology এবং geography নিয়ে।

এখন কথাটা ভাবলে হাসি পায় কিন্তু দেখতে পাচ্ছি, সেকালে পাঠ্য বিষয়ের choice খানিকটা বিঘ্নিত হয়েছিল বই পাবার সুবিধার দ্বারা। যেসব বইয়ের প্রয়োজন, প্রমথ চৌধুরীমশায়ের লাইব্রেরিতে সেসব বই ছিল না। দু'জন নতুন বই সরবরাহক হাতের কাছে ছিলেন। দু'জনেই প্রতিবেশী এবং ছাত্র আমলের বন্ধু। একজন ভাই প্রবোধচন্দ্র বাগচী, দ্বিতীয় জন তারকচন্দ্র দাস। উভয়েই বিশ্ববিদ্যালয়ের লেকচারার। উভয়েই Ancient Indian History and culture বিভাগের ছাত্র কিন্তু পাঠ্যবিষয় আলাদা। প্রবোধ নাম করেছেন বৌদ্ধ ধর্ম-সাহিত্য সম্বন্ধে (বিশেষ করে চীনা ভাষায়) গবেষণা করে। তারক কাজ করেছেন cultural anthropology এবং tribes নিয়ে। যেসব বই এঁদের দু'জনের বাড়িতে দেখতে পেতাম তার মধ্যে পছন্দমতো দু'চারখানা বেছে নিয়ে পড়তে লাগলাম। আমার চাহিদা মতো

বই তাঁরা বিশ্ববিদ্যালয় লাইব্রেরি, এশিয়াটিক সোসাইটির লাইব্রেরি থেকে আনিয়ে দিয়েছেন। সেকালের ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরির সেক্রেটারিয়েট লাইব্রেরি সাহিত্য পরিষদ লাইব্রেরি থেকে আনিয়েছি। দেশের ধর্ম সাহিত্য এবং লোকপরিচয়, লোক-ধর্মচর্চায় আমার সব চাইতে বেশি সময় ও উৎসাহ নিয়েছে। অনুসন্ধানক্ষেত্রের প্রসার ক্রমে বেড়ে গিয়েছে। দেশের সীমা অতিক্রম করে প্রতিবেশী এবং দূরবর্তী দেশগুলির প্রাচীন ইতিহাসের খোঁজ নিতে হয়েছে। সে প্রাচীন ইতিহাস শুধু রাজনৈতিক ইতিহাস নয়, সভ্যতা পত্তনের, জাতি সংমিশ্রণের, ধর্ম ও সংস্কৃতির, প্রতিবেশীর সঙ্গে সংযোগের, আদানপ্রদানের ইতিহাসও বটে। দেশের লোকপরিচয়ের ক্ষেত্রে অনুসন্ধান করতে গিয়ে পণ্ডিতদের লেখা বই পড়া ছাড়া বিশ্ববিদ্যালয়ের নৃতত্ত্ব বিজ্ঞান বিভাগে গিয়ে সমবয়সি অধ্যাপকদের কাছে anthropomatric formualae সম্বন্ধে পাঠও নিতে হয়েছে। লোকধর্মের অনুসন্ধান করতে গিয়ে ব্রতকথা ও পাঁচালি থেকে উপপুরাণ, পুরাণ, রামায়ণ, মহাভারত এবং বেদ পর্যন্ত ছুটতে হয়েছে আবার দেশের সব প্রদেশের পুরনো জেলা গেজেটিয়ারগুলো আটকাতে হয়েছে। সেকালের ইংরাজ সিভিলিয়ানদের সংকলিত এই পুরনো গেজেটিয়ারগুলি অপূর্ব জিনিস। খুঁজতে খুঁজতে ঝাপি দু'চারটে যে না বেরোয় তা নয় তবে মণিমুক্তা, সোনাদানাও অনেক মেলে।

আমাদের ধর্ম, সংস্কৃতি, জাতিসংমিশ্রণ সম্বন্ধে ইয়োরোপীয় এবং আমেরিকান পণ্ডিতগণ পিঠ-চাপড়ানোর সুরে যেসব কথা বলে গেছেন এবং দেশীয় পণ্ডিতগণের মধ্যে সাড়ে পনেরো আনা যা মেনে নিয়েছেন তা-ই ঠিক কি না জানবার ইচ্ছা মনে রেখে যাত্রা আরম্ভ করেছিলাম। গোড়ায় বুঝতে পারিনি এ যাত্রাপথ সোজা সড়ক ধরে নয়, অনেক বনবাদাড় ভাঙতে হবে, খানাডোবা পেরতে হবে, চড়াই উতরাই ডিঙোতে হবে। পণ্ডিত বলে নাম করবার ইচ্ছা নয়, আমার জাতি-সংস্কৃতি-ধর্মসাধনা সম্বন্ধে বিদেশি পণ্ডিত-গণের এক দলের মতামতের সত্য-মিথ্যা পরীক্ষা করবার দুর্বিনীত অভিপ্রায় ছিল আমার দুরন্ত পরিশ্রমের একমাত্র প্রেরণা। যে পন্থা আমি আশ্রয় করেছিলাম সেটা নামখ্যাতি অর্জনের পন্থা নয় এ জ্ঞান জন্মেছে এক সময়ে, জ্ঞান বিশ্বাস মতে সত্য উদঘাটনের চেষ্টা করলে, মেকি ও ফাঁকির আবরণ অপসারিত করবার চেষ্টা করলে প্রশংসা সুলভ না হয়ে দুর্লভ হওয়াই স্বাভাবিক এ জ্ঞানও জন্মেছে এক সময়ে। যাক এসব কথা।

এত পরিশ্রমের বিষফল প্রসব করেছে, পরে সে কথা বলব। এই প্রসঙ্গে আর একটা কথা বলছি। কী উদ্দেশ্য নিয়ে দীর্ঘকাল ধরে পণ্ডিতি গবেষণা করেছি ও পরে বলেছি। ভাষা একটু বদলে বলা যায় যে এই উদ্দেশ্য ভারতবর্ষের স্বরূপ জানবার সাধনা। জওহরলাল নেহরুর বিখ্যাত গ্রন্থ Discovery of India। নাম একটু পরিবর্তন করে বলা যায় Endeavoure to discover India আমার সাহিত্যকর্মের উদ্দেশ্যও তাই endeavoure to discover India।

পণ্ডিতি পড়াশোনা আরম্ভ হয়েছিল যৌবনের গোড়ার দিকে, বোধহয় ১৯২৫/২৬ সনে। খেয়াল করিনি কবে যৌবন চলে গেছে, প্রৌঢ়ত্বের মাঝপথে এসে পড়েছি। যখন ক্লান্তি বোধ করেছি গবেষণামূলক পড়া ও লেখাতে, দু' একটা গল্প লেখবার চেষ্টা করেছি একঘেয়েমি কাটাবার জন্য। সে আমলের কয়েকটা গল্প বন্ধু শৈলেন্দ্রকৃষ্ণ লাহা সম্পাদিত 'ছোট গল্প' নামক সাপ্তাহিক পত্রিকায় বের হত। একটি গল্প স্বল্পায়ু 'উদয়ন' নামক মাসিক পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল।

(১০)

ড. প্রবোধচন্দ্র বাগচী ফ্রান্স থেকে ফিরলে তাঁর ওয়েলিংটন স্ট্রিটের বাড়ি আমাদের অন্যতম আড্ডার জায়গা হয়েছিল আগে বলেছি। এই বাড়িতে ইয়োরোপে যেসকল বাঙালি পড়ুয়াদের সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠতা হয়েছিল তাঁদের কেউ কেউ আসতেন। এদের মধ্যে ড. বিজনরাজ চট্টোপাধ্যায় ড. সুবোধ মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি কয়েকজনের সঙ্গে আলাপ হয়েছিল। প্রবোধ উৎসাহী পণ্ডিত। ফেরবার কিছুদিন পরে তিনি কয়েকজনকে নিয়ে এক ইন্দো-লাতিন সোসাইটি গড়ে তুললেন। এঁরা ফরাসি ভাষা ও সাহিত্যের অনুরাগী এবং চারপাঁচজন ফ্রান্স-ফেরত। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি কক্ষে সোসাইটির অধিবেশন। সোসাইটির সম্পাদক প্রবোধ এবং নগেন্দ্রচন্দ্র। ইনি চন্দননগরবাসী, ভাল ফরাসি জানতেন, ফরাসি ট্রেড কন্সালের অফিসে কাজ করতেন এবং সম্ভবত তখন থেকে বিশ্ববিদ্যালয়ের ফরাসি ভাষা শেখাবার ক্লাসও নিতেন। সাপ্তাহিক সভায় ফরাসি ভাষায় বক্তৃতা হত এবং খানিকটা ফরাসিতে খানিকটা ইংরাজিতে আলোচনা হত। ট্রেড কন্সাল অফিসের ফরাসি কর্মচারিরা মাঝে মাঝে কলকাতায় আগন্তুক ফরাসি ভদ্রলোকদের বক্তৃতা দেবার জন্য নিয়ে আসতেন। গোড়া থেকে আমিও এ সভার সভ্য ছিলাম এবং এক সভায় ফরাসি ভাষায় লিখিত বাংলাসাহিত্যের ওপর ফরাসি প্রভাব সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধও পড়েছিলাম। যতদূর মনে আছে ড. সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, ড. বিজনরাজ চট্টোপাধ্যায়, ড. সুবোধ মুখোপাধ্যায়, ড. বিজনরাজ চট্টোপাধ্যায়, ড. সুবোধ মুখোপাধ্যায়, ড. কালিদাস নাগ ও

হারীতকৃষ্ণ দেব, ড. উপেন্দ্রনাথ ঘোষাল (প্রেসিডেন্সি কলেজ), ড. নিরঞ্জনপ্রসাদ চক্রবর্তী (কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়) (পরে Director, Archaeological Survey) প্রভৃতি এ সভায় আসতেন। সে আমলের ছাত্র হুমায়ুন কবির আসতেন। হিরণ্ময় ঘোষাল নামে প্রেসিডেন্সির একটি ছাত্র আসতেন। এঁর সঙ্গে পরে আলাপ হয়েছিল। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের আরম্ভে ইনি পোলান্ডের ওয়ারশ বিশ্ববিদ্যালয়ে ইংরাজি সাহিত্যের অধ্যাপক ছিলেন। বিজয়ী জার্মানদের আদেশে তাঁকে পোলান্ড ছাড়তে হয়। দেশে ফিরে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে কোনও কাজের চেষ্টায় ব্যর্থকাম হয়ে দিল্লি চলে যান। মিসেস বিজয়লক্ষ্মী পণ্ডিত যখন মস্কোতে ভারতীয় এমবেসেডর হয়ে যান তিনি Cultural Attache হিসাবে তাঁর সঙ্গে গিয়েছিলেন। ভদ্রলোকের সম্বন্ধে এর পরের কোনও খবর সংগ্রহ করতে পারিনি। এর কয়েকখানা বাংলা বই আছে, একখানার নাম "মহত্তর যুদ্ধের প্রথম অধ্যায়"। ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার কাহিনিতে পূর্ণ এই বইখানি সুপাঠ্য।

এই সভায় আর একটি ভদ্রলোককে প্রথমদিন দেখে চিনতে পারিনি। পরে আলাপ হয়েছিল, ইনি ড. ধীরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, আমার মধ্যমভ্রাতার কালাজ্বরের চিকিৎসা প্রসঙ্গে যাঁর নাম করেছি। ইনি তখন আর জি কর মেডিকেল কলেজের প্যাথোলজির প্রফেসর। কয়েক বছর ফ্রান্সে ছিলেন গবেষণা করবার জন্য। শেষের দিকে ডাক্তারি করা প্রায় ছেড়ে দিয়ে গবেষণা নিয়ে ব্যস্ত থাকতেন। একদিন নিমন্ত্রিত হয়ে তাঁর বাড়িতে গিয়ে গবেষণার কাহিনি শুনেছিলাম। যতদূর মনে পড়ে গবেষণার বিষয়বস্তু সম্ভবত Pathology নয়, Supramental ব্যাপার ট্যাপার কিছু।

Indo-Latin-Society-র সভায় Prof. Tucci একদিন বক্তৃতা দিয়েছিলেন। Prof. Sylvain-levy কলকাতায় এলে তাঁকে প্রবোধ সোসাইটির সভায় এনেছিলেন বক্তৃতা দেবার জন্য। সেদিন অনেক লোক হয়েছিল সভায়। চন্দননগরের ফরাসি Administrator প্রো: লেভির সম্বর্ধনা উপলক্ষে সোসাইটির সভ্যদের চন্দননগরে তাঁর ভবনে নিমন্ত্রণ করেছিলেন। আমরাও গিয়েছিলাম। ফ্রান্স ফেরত দু'চার জন সভ্য এই উপলক্ষে চন্দননগরে গিয়ে ফরাসি পানীয়ের আস্বাদ গ্রহণ করেছিলেন কিঞ্চিত অধিক মাত্রায়। অর্থাৎ তাঁদের বেএক্তিয়ার হয়ে পড়বার কথা একটু মনে পড়ছে।

সোসাইটি বছর দু'তিন জীবিত ছিল। প্রবোধ ড. কালিদাস নাগের Great India Society-র কাজে বেশি ব্যস্ত হয়ে পড়াতে ক্ষীণ-প্রায় ইন্দো-লাতিন সোসাইটির মৃত্যু ত্বরান্বিত হল। Great India Society-র কাজে সহানুভূতি থাকলেও তাতে যোগ দিই নাই। সে অধিকারও বোধহয় ছিল না।

কলকাতায় বসবাসকালের অন্যান্য স্মৃতি

(১১)

যে সময়ের কথা বলছি সেটা গান্ধীজির সব চাইতে বড় কীর্তি অসহযোগ আন্দোলনের ব্যর্থতার প্রতিক্রিয়ার যুগ। এই প্রতিক্রিয়ার যুগ চলেছিল কয়েকবছর ধরে আইন অমান্য আন্দোলনের নেতৃত্ব গ্রহণ করে গান্ধীজি আবার সাক্ষাৎভাবে রাজনৈতিক মঞ্চে অবতীর্ণ না হওয়া পর্যন্ত। অসহযোগ আন্দোলনের ব্যর্থতার ফলে স্বরাজি Politics-এর উদয় হল। কংগ্রেস গান্ধীজির হাত থেকে চলে গেল চিত্তরঞ্জন দাস, মতিলাল নেহরু প্রমুখের হাতে। organised disciplined oppsition-এর আবির্ভাব হল কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক আইনসভাগুলিতে। কংগ্রেসের মধ্যে দলাদলির সৃষ্টি হল গরম গরম বুলিওয়ালা কিন্তু আসলে আগেকার আমলের liberal politics-এ বিশ্বাসী স্বরাজি এবং গান্ধী-অসহযোগ নীতির বয়কটে বিশ্বাসী No-changer দলের মধ্যে। স্বরাজি দলের হাতে কংগ্রেসকে ছেড়ে দেয়াকে এঁরা গান্ধিজীর Surrender বলে সমালোচনা করতে লাগলেন। কিন্তু Surrender-এর মূল্য বাবদ তিলক স্বরাজ ফান্ডের যে মোটা টাকাটা হাতে পেলেন তাই নিয়ে গ্রাম সংস্কার ইত্যাদি ব্যাপারে হাত লাগালেন নিজের কয়েকজন অনুগামীকে নিয়ে। কংগ্রেসের বাইরেও প্রতিক্রিয়া দেখা দিল। প্রথমত গান্ধীজির অসহযোগ আন্দোলনের বড় স্তম্ভে অর্থাৎ কংগ্রেসি ও খিলাফত আন্দোলনের সংযোগে ফাটল দেখা দিল। হিন্দু-মুসলমান ঐক্য গেল। আরম্ভ হল প্রচণ্ড সাম্প্রদায়িক দাঙ্গাহাঙ্গামা। একদিকে শুদ্ধি সংগঠন আন্দোলন আরম্ভ হল, অন্যদিকে পালটা তবলিব, তাঞ্জিম আন্দোলনে আরম্ভ হয়। Hindu Nationalism, Hindu re-organisation-এর স্লোগান নিয়ে হিন্দু মহাসভা আন্দোলন সক্রিয় হয়ে উঠল। অসহযোগ আন্দোলনের সময় বিপ্লবীরা হাত গুটিয়ে বসেছিলেন গান্ধীজির আবেদনে। তাঁরা নতুন তোড়জোড় আরম্ভ করলেন। আবার বোমা দেখা দিল।

১৯১৭ খ্রিস্টাব্দে রুশিয়ায় যে বিপ্লব ঘটেছিল তার প্রভাব ভারতে এসে পৌঁছল। কমিউনিস্ট পার্টির পত্তন হল কানপুরের সভায়।

অসহযোগ আন্দোলন ছিল সত্যিকার বিপ্লবাত্মক আন্দোলন। Aimed revolt নয়, mass revolt। এই revolt এর গায়ে অহিংসার ছাপ দেগে দিয়েছিলেন

গান্ধীজি। তাঁর পরিকল্পিত গণবিপ্লব যখন মূর্ত হয়ে উঠল, তার প্রলয়ঙ্কর-সম্ভাবনাপূর্ণ চেহারা দেখে ভয় পেয়ে গেলেন তিনি। মনে পড়ছে দু'চারজন ইংরেজ প্রশাসনিক কর্তাব্যক্তি বলেছেন the revolt was within an inch of success। এ মন্তব্য তৎকালীন ভারতীয় জননেতাদের চরিত্র সম্বন্ধে তাঁদের অজ্ঞতার ফল। শেষ পর্যন্ত বিপ্লবী গণ আন্দোলনের নেতৃত্ব করবার মতো সাহস, শিক্ষা, মনোভাব তাঁদের ছিল না। success থেকে এই এক ইঞ্চি দূরত্ব কখনও ঘুচত না। অসহযোগ আন্দোলনে ঘোচেনি, আইন অমান্য আন্দোলনে ঘোচেনি, বিয়াল্লিশের বিপ্লবে ঘোচেনি।

অহিংস অসহযোগ আন্দোলনের সময় পড়ে পড়ে মার খাওয়া দেখে যাঁরা ম্রিয়মান হয়েছিলেন স্বরাজদলের stage herdies তাঁদের ম্রিয়মানতা এবং মূহ্যমানতা বোধহয় একটু ঘোচাতে পেরেছিল। ভোট কড়াকড়ির ব্যাপারে ঘুষ এবং অন্যবিধ দুর্নীতির বিষ তখন থেকেই প্রকাশ্যভাবে কংগ্রেসি politics-এ ঢুকল।

(১২)

এই সময়ের কাছাকাছি দুটো জায়গায় বেড়াবার স্মৃতি মনের মধ্যে বেশ স্পষ্ট রয়েছে।

আগে দার্জিলিংয়ের কথা বলেছি। দার্জিলিং এর আগেও একবার গিয়েছি, দৃশ্যের নতুনত্বের আকর্ষণ ছিল না, আকর্ষণ ছিল অন্য রকমের। পূজার সিজনে আমার মেজভাইয়ের সঙ্গে দার্জিলিং গেলাম। আমি উঠেছিলাম স্যানাটোরিয়ামে। আমার মেজভাই চুনি উঠেছিল জ্বলাপাহাড়ে একটি বাড়িতে কুমুদনাথ চৌধুরীর পরিবারের অতিথি হয়ে। সস্ত্রীক প্রমথ চৌধুরী ছিলেন কেরোলিন ভিলা নামে একটি হোটেলে এবং তাঁর কনিষ্ঠ ভ্রাতা অমিয়নাথ চৌধুরী সপরিবারে ছিলেন ম্যালের কাছে তার উইসওয়াস নামক বাড়িতে। তাঁর জ্যেষ্ঠপুত্র এখনকার জেনারেল জে. এন চৌধুরী, তখন কিশোরবয়স্ক বালক।

সকালে চা খেয়ে কেরোলাইন ভিলায় হানা দিতাম। সেখানে আরেক দফা চা খাবার পেতাম ন' জ্যাঠাইমা ইন্দিরা দেবীর কাছে। কোনও দিন গল্পগুজব চলত, কোনও দিন বেরিয়ে পড়তাম হেঁটে বা ঘোড়ায় চড়ে বেড়াবার জন্য। মাঝে মাঝে খাবার নিমন্ত্রণ পেতাম জ্বলাপাহাড়ের বাড়িতে। অনেক ছেলেমেয়ে জুটত ও বাড়িতে।

সে-সময় যেসব ছেলেকে কিশোর বয়সি বা আরও ছোট দেখেছি তাদের মধ্যে পরে তিনজন হয়েছিল বৈমানিক। মি. পি কে মজুমদারের ছেলে ডি. মজুমদার ভারতীয় বিমান বাহিনীতে নামকরা বৈমানিক ace pilot হয়েছিলেন, বিমানদুর্ঘটনায় তাঁর মৃত্যু হয়। অমিয়নাথ চৌধুরীর মেজছেলে হেমনাথ চৌধুরী ভারতীয় বিমানবাহিনীতে squardon commandor হয়েছিলেন। ব্যারাকপুরে এক বিমানদুর্ঘটনায় তিনি নিহত হন। কুমুদনাথ চৌধুরীর ছোট ছেলে কালিপ্রসাদ দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় ইংল্যান্ডের রয়েল এয়ার ফোর্সে যোগ দিয়েছিলেন। জার্মান অধিকৃত ফ্রান্সের ওপর বোমা ফেলে ফেরবার সময় জর্মান ফাইটার প্লেন কর্তৃক আক্রান্ত হয়ে তিনি নিহত হন। আর অমিয়নাথ চৌধুরীর জ্যেষ্ঠপুত্র জয়ন্ত হয়েছেন ভারতবর্ষের Chief of the army staff। উইসওয়াসের ছেলেমেয়েরা আসত। তাদের মেসো ওয়েসপয়েন্টের মি. পি কে মজুমদারের (ব্যারিস্টার) ছেলেমেয়েরা আসত। সঙ্গী বা আড্ডার অভাব হত না। সে সময় স্যানাটোরিয়ামে ড. নরেশ সেনগুপ্ত ছিলেন। ড. সেনগুপ্ত আমার অফিসের বন্ধু কুঞ্জবিহারী রায়ের সহপাঠী শুনেছিলাম। মাঝে মাঝে তাঁর কাছে গিয়ে আলাপ করতাম। স্যানাটোরিয়ামে এক ভদ্রলোকের সহযাত্রী হয়ে একদিন শেষরাত্রে উঠে টাইগার হিলে সূর্যোদয় দেখে এলাম। তখন অক্টোবরের শেষ দিক। সুতরাং শীতের প্রকোপ প্রচণ্ড। অন্ধকারের মধ্যে শেষ খাড়া পথটুকু উঠতে বেশ কষ্ট হয়েছিল। গিয়েছিলাম ডাঙ্গিতে। টাইগার হিল সম্পর্কে তিনটি জিনিসের কথা মনে আছে : শীত, সূর্যোদয় এবং আগত একপাল ইউরোপীয় স্ত্রী-পুরুষের আধা-অন্ধকারে মাতলামি ও জড়াজড়ি।

টাইগার হিল থেকে সূর্যোদয় দেখবার জন্য নানা দেশ থেকে লোক আসে। এই অপূর্ব দৃশ্যের বর্ণনা অনেকে করেছেন। হিমালয়ের চিরতুষারমণ্ডিত শিখরগুলি চোখের সামনে উদঘাটিত হয়। কাঞ্চনজঙ্ঘার অনেকখানি চোখে পড়ে, পর্বতগাত্রের যে অংশে তুষার-আচ্ছাদন নাই তাও দেখা যায়। এভারেস্টের চূড়াও দেখা যায়। সূর্যোদয়ের কিছুক্ষণ আগে থেকে রঙের খেলা আরম্ভ হয় শুধু চিরতুষারবৃত শিখরগুলিতে নয়, সমস্ত দৃষ্টিপথ জুড়ে। কয়েক মিনিট স্থায়ী সূর্যোদয়ের দৃশ্যটি যেন লোকাতীত সুষমামাখা একটি লিরিক, ভাষায় যার সৌন্দর্য প্রকাশের অতীত।

এবারকার দার্জিলিং বেড়ানোর কাহিনির উল্লেখ করবার প্রধান উদ্দেশ্য অতীত দিনের একটি আনন্দময় স্মৃতি স্মরণ করা। সে-আনন্দের স্মৃতি হচ্ছে অমিয়নাথ চৌধুরীর গৃহে বিজয়া সম্মিলনী। দু'ভাই প্রমথ চৌধুরী ও অমিয় চৌধুরী, তিন বউ, রাধারানি দেবী, ইন্দিরা দেবী ও প্রমীলা দেবী, দু' বাড়ির ছেলেমেয়েরা এবং এদের অনেক আত্মীয়স্বজন উপস্থিত ছিলেন। এঁদের পরিচিত বাঙালি অবাঙালি, অনেকে এসেছিলেন। প্রচুর মিষ্টির সরবরাহ ছিল, গান, গল্প

ছিল, উজ্জ্বল আলো ফুলের সমারোহ ছিল, সাজপোশাকের জৌলুস, নমস্কার, প্রণাম, কোলাকুলি সব কিছু ছিল, মায় সিদ্ধির সরবৎ পর্যন্ত। সেই কম বয়সে ভাল লেগেছিল সমস্ত অনুষ্ঠানটি। বোধহয় গৃহকর্ত্রী মিলিকাকিমার (মিসেস এ এল চৌধুরী) সস্নেহ ব্যবহারের জন্য অত ভাল লেগেছিল।

এরপর রাঁচি বেড়াবার কথা। একবার বড় দিনের সময় মোরাবাদীর "সত্যধাম" গৃহে প্রমথ চৌধুরী ও ইন্দিরা দেবীর অতিথি হয়ে কটা দিন কাটিয়েছিলাম। ইন্দিরার মাতা জ্ঞানদানন্দিনী দেবী তখন ওই বাড়িতে ছিলেন। পাশের একটি গৃহে সেবার সম্ভবত আর্টিস্ট যামিনী গাঙ্গুলি ছিলেন। আর একটি বাড়িতে থাকতেন আশুতোষ চৌধুরীর কন্যা অশোকা দেবী এবং জামাতা উপেন্দ্রনাথ চৌধুরী। উপেন্দ্রবাবু ছিলেন জিয়োলজিস্ট, সিলেটের লোক। রানিগঞ্জের সানি পার্কের বাড়ি ভাড়া দিয়ে উপেন্দ্রবাবু রাঁচির স্থায়ী অধিবাসী হয়ে গিয়েছিলেন। আগে থাকতে এঁর সঙ্গে আলাপ ছিল। আড্ডা দেবার জন্য মাঝে মাঝে তাঁর বাড়িতে যেতাম। এর ছোট ছেলে এস কে চৌধুরী ভারত সরকারের Diplomatic Service-নিযুক্ত। বর্তমানে (১৯৬৪) ঢাকায় ডেপুটি হাইকমিশনার।

রাঁচির কথায় এক সহৃদয় ভদ্রলোকের কথা মনে পড়ল। ইনি মার্টিন কোম্পানির ইঞ্জিনিয়ার। রাঁচি যাবার সময় গাড়িতে এঁর সঙ্গে কথাপ্রসঙ্গে হাজারিবাগ যাবার ইচ্ছা প্রকাশ করেছিলাম। তিনি বললেন তাঁর কোম্পানি হাজারিবাগে কোর্ট বিল্ডিং তৈরি করছে, দু'তিন দিন পরে ইনসপেকশনে যাবেন, আমি যদি যাই তাঁর গাড়িতে নিয়ে যাবেন। ক'দিন পরে তিনি 'সত্যধামে' গাড়ি পাঠালেন সকালে। আগের দিন নিজে 'সত্যধামে' বসে প্রমথ চৌধুরী এবং ইন্দিরা দেবীর সঙ্গে আলাপ করে গাড়ি পাঠাবার কথা জানিয়ে গিয়েছিলেন। তাঁর বাসায় গিয়ে দেখি অত সকালে বিস্তর খাবার আয়োজন করেছেন। আমি বেশ কিছু খেয়ে এসেছি জানালেও শুনলেন না, জোর করে খাওয়ালেন। আমি মাফলার আনিনি দেখে বকলেন একটু, বাড়তি কম্বল ও মাফলার নিলেন আমার জন্য। বললেন রাত হয়ে যাবে ফিরতে, খুব ঠান্ডা লাগবে, এ বাবুপোশাকে কুলবে না। বয়সের হিসাবে তখন আমি তাঁর কাছে ছেলেমানুষ এবং ছেলেমানুষের স্নেহশীল, সতর্ক অভিভাবকের মতোই তিনি হাজারিবাগ শহর ঘুরে দেখিয়ে, সুপারভাইজিং ইঞ্জিনিয়ারের বাড়িতে খুব খাইয়ে ফেরবার পথে মাফলার জড়িয়ে, কম্বল ঢেকেঢুকে মোরাবাদীর বাড়িতে পৌঁছে দিলেন। পথে ক'খানা ছবি তুলেছিলাম, তাঁর ছবিও তুলেছিলাম কিন্তু তাঁর নাম ঠিকানা লিখে না রাখতে কলকাতায় ফিরে প্রিন্ট করবার পর তাঁকে কপি পাঠাবার সময় দেখলাম তা ভুলে গিয়েছি। ইন্দিরা দেবী এ কথা শুনে বকুনি দিয়েছিলেন আমাকে।

আগে আলাপ না থাকলেও খুব সহজে জ্ঞানদানন্দিনী দেবীর সঙ্গে ভাব হয়ে গিয়েছিল ক'দিনের মধ্যে। এর একটা কারণ বোধহয় এই যে তিনি আবিষ্কার করেছিলেন যে আমার জর্দা খাবার অভ্যাস আছে এবং বেশি পান খাই। এ দু'টি অভ্যাস তাঁরও ছিল। হাজারিবাগ বেড়াতে যাবার সময় যখন গাড়িতে উঠেছি কাগজে মুড়ে কয়েকটি পান ও কিছু দোক্তা আমার হাতে দিয়েছিলেন। খাবার টেবিলে প্রায়ই তাঁর সঙ্গে ঝগড়া বেধে যেত। তাঁর কারণ হরিপুরের লোকের খাদ্য বিষয়ে রুচি সম্বন্ধে তাঁর সকৌতুক মন্তব্য। টেবিলের অপরপ্রান্তে উপবিষ্ট তাঁর জামাতা ইঙ্গিতে ইশারায় আমাকে রীতিমতো উৎসাহ দিতেন ঝগড়া বাধাতে। হরিপুরের রন্ধনবিদ্যার originality সম্বন্ধে আমার ডবল ডোজের প্রশংসা শুনে তিনি হাসতে হাসতে একদিন আমাকে চ্যালেঞ্জ করলেন এই originality-র প্রমাণ দিতে। তাঁর কন্যা ইন্দিরা দেবীও তাঁকে সমর্থন করলেন। জোর গলায় আমি Challenge accept করলে জ্ঞানদানন্দিনী দেবীর জামাতা একটু উদ্বিগ্ন স্বরে প্রশ্ন করলেন, কী করে প্রমাণ দেবে তুমি? বললাম, রান্না করে খাইয়ে। সকৌতুক হাস্যে জ্ঞানদানন্দিনী দেবী বললেন, কী রান্না করবে? ভাত, না পুঁটি মাছের কালিয়া? বললাম, ঠাকুরবাড়ির লোকরা পুঁটিমাছের কালিয়া খান, হরিপুরের লোকেরা পুঁটি মাছের চচ্চড়ি আর অম্বল খায়। পালংশাকের ঝোল খেয়েছেন ঠাকুর বাড়িতে? মাতা ও কন্যা উভয়েই হেসে উঠলেন শাকের ঝোল শুনে. মাতা বললেন, শাকের ঝোল? ওটা বুঝি কাঁঠালের আমসত্ত্বের মতো খেতে? গম্ভীরভাবে পালংশাক এবং অন্যান্য উপকরণের তালিকা দিয়ে বললাম, কাল বাজার থেকে এগুলো আনিয়ে দেবেন, বাবুর্চি হাত দেবে না, আমি রান্না করব।

পরদিন বাজার থেকে ফরমায়েসি জিনিসগুলো এল। ইন্দিরা দেবী মোড়া নিয়ে দেবরের কাছে চেপে বসলেন আমি কী করি দেখবার জন্য। শাকের ঝোল বস্তুটি তাঁদের কাছে originality। পাকশালে ঢুকে বাবুর্চিকে সরিয়ে দিয়ে আমার হাতাখুন্তি নাড়াবার দৃশ্যটি অপ্রত্যাশিত। মুখ দেখে মনে হল আমার উদ্যম দেখে তিনি খুশি হয়েছেন। শ্বশুরবাড়ির মানরক্ষা কোন মেয়ে না চায়, হোক না এক্ষেত্রে অশ্রুতপূর্ব, অনাস্বাদিতপূর্ব তুচ্ছ শাকের ঝোলের দ্বারা মানরক্ষা। পালং শাকের ঝোল খেয়ে জ্ঞানদানন্দিনী দেবী খুশি। অনেকগুলো পুডিং খাইয়েছিলেন, নিজের হাতে পানসেজে দিয়েছিলেন এবং কদিন পর্যন্ত সত্যধামে যাঁরা

বেড়াতে আসতেন এঁদের কাছে পালংশাকের ঝোলের গল্প করতেন। এঁদের মধ্যে একজন ছিলেন কুচবিহারের মহারানি সুনীতিদেবী। এঁর কথা মনে আছে এজন্য যে এঁর সামনে আমাকে পরীক্ষা দিতে হয়েছিল আর একটি বিষয়ে। সে সময়ে রবীন্দ্রনাথের অনেকগুলো বড় বড় কবিতা আমার মুখস্থ ছিল এবং মাঝে মাঝে সন্ধ্যার পরে আবৃত্তি শোনাবার জন্য ডাক পড়ত। সম্ভবত মহারানির কাছে পালংশাকের ঝোলের গল্প বলবার পরে আবৃত্তির কথা কিছু বলা হয়েছিল। তিনি আমার খোঁজ করলেন। ঘরে ঢুকে নমস্কার করতে মহারানি বললেন, তোমার আবৃত্তির কথা শুনলাম, শাজাহান কবিতাটি আমাকে শোনাও। আবৃত্তি করতাম ঘরোয়া পরিবেশে, মহারানির অনুরোধে ঘাবড়ে গেলাম বেশ। মাথা চুলকে কোনও মতে বললাম, সবটা মনে নেই, পারব না। মাননীয় অতিথির অনুরোধ, ইন্দিরা দেবী একটু বিরক্ত হলেন মনে হল। মহারানি আবার বললেন, লজ্জা করছ কেন, যতটা মনে আছে বলো। গত্যন্তর নাই দেখে আরম্ভ করলাম। 'এ কথা জানিতে তুমি ভারত ঈশ্বর-শা-জাহান' শেষ হতেই আরও ফরমায়েশ হতে পারে ভয়ে নমস্কার ঠুকে স্থান ত্যাগ করলাম।

রাঁচিতে থাকবার সময় ক্যামেরা কাঁধে ঝুলিয়ে সকালের দিকে একা মাঠে মাঠে ঘুরে বেড়াতাম। একদিন এক ঢিবি পাহাড়ের, বোধহয় ভারম পাহাড়, কাছে বেড়াবার সময় হঠাৎ এক হায়েনার সম্মুখে পড়ে গিয়েছিলাম। প্রথমে মনে হয়েছিল কুকুর। তারপরেই আয়তন, হিংস্র চাহনি এবং দাঁড়াবার ভঙ্গি দেখে মনে হল নেকড়ে বা হায়েনা। ওর মতলব ভাল নয় হিংস্র দৃষ্টি দেখে বুঝতে একটুও কষ্ট হয়নি। আমার এর পরের performanceটা বিস্ময়কর। পিছু হটতে হটতে কাছেই একটা নালা দেখতে পেয়ে লাফিয়ে পড়েছিলাম তার মধ্যে। সাত থেকে আট ফুট গভীর নালা, তলায় ছোট বড় বিস্তর পাথর ছড়িয়ে রয়েছে। নালাটা পাহাড় থেকে বেরিয়েছে। বৃষ্টির জল নিকাশের পথ, চওড়ায় চার-পাঁচ ফুট হবে। অনেক দূর অবধি গিয়েছে। আমার কতটা লেগেছিল মনে নেই তবে জখম হইনি। জন্তুটা নালার পাড় অবধি এসে দাঁড়িয়েছিল। আত্মরক্ষার জন্য কয়েকবার পাথর ছুঁড়েছিলাম দৌড়তে দৌড়তে। বাড়ি ফিরে এই adventure-এর গল্প শুনে সবাই বললেন ওটা হায়েনা বটে। কাল রাতে হায়েনার ডাক শোনা গিয়েছিল কাছেই।

রাঁচির কথা বললাম জ্ঞানদানন্দিনী দেবীর কথাটুকু বলবার জন্য। রবীন্দ্রনাথের বিভিন্ন বইতে ওঁর কথা আছে, আরও অনেকে লিখেছিলেন তাঁর কথা, আমি যেটুকু দেখেছি তাই এখানে বললাম। সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরকে দেখেছি মে-ফেয়ারের বাড়িতে। গম্ভীর মানুষ, তখন অসুস্থও বটে, সামান্য কথাবার্তা হয়েছে। শেষবার যখন তাঁকে দেখি তখন তিনি আরও অসুস্থ। মে ফেয়ারের বাড়ির বারান্দায় আরাম-চেয়ারে শুয়ে তাঁর একখানি বইয়ের ফাইনাল প্রুফ দেখছিলেন একমনে। ক্লান্ত, ক্লিষ্ট, ফ্যাকাশে চেহারা, মুখে নিরুদ্বেগ গাম্ভীর্য, বাইরে থেকে দেখে অসুখের বিশেষ কিছু বোঝা যায় না। এর ক'দিন পরে তাঁর মৃত্যু হয়।

পুরনো স্মৃতির কথা যখন বলছি আরও দু'একটা কথা বলে নিই। কিছু পিছিয়ে যেতে হবে। ১৯২৪-এর মার্চ মাস।

সরকারি অনুবাদকের অফিসের কাজ ছেড়ে অন্যত্র যাবার চেষ্টা করছিলাম তখন। বিদ্যার ও আকাঙ্ক্ষার কথা জানিয়ে একখানা চিঠি লিখেছিলাম স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়কে। তিনি তখন নামে পোস্ট-গ্রাজুয়েট কাউন্সিলের প্রেসিডেন্ট, কাজে সর্বেসর্বা—সকলেই একথা জানতেন।

চিঠি পাঠাবার ক'দিন পরে ৭৭নং রসা রোডে গেলাম মুখে আবেদন জানাতে। ছাত্র অবস্থায় তাঁকে দেখেছি অনেকবার, ছোটখাটো দরবারও করেছি, ধমকানি শুনেছি কিন্তু ব্যক্তিগত পরিচয় ছিল না। দেখা করতে গেলাম কারও সুপারিশের চিঠি না নিয়েই। দুঃসাহসের কাজ সন্দেহ নেই। সৌভাগ্যের কথা সেই সময়টায় আর কেউ ছিল না ঘরে, থাকলে হয়ত কিছু বলা হত না। খালিগায়ে চেয়ারে বসে আছেন, মনে হল ওঠবার সময় হয়েছে। একটা প্রণাম ঠুকে গড়গড় করে বলতে শুরু করলাম চিঠিতে যা লিখেছিলাম। আমাকে থামিয়ে দিয়ে বললেন, তোমার চিঠি পড়েছি। দেখো আমি তো চাই তোমাদের মতো ছেলেদের ইউনিভার্সিটিতে নিয়ে আসি, পড়াশোনা করবার সুবিধে করে দিই। এই তো সুনীতিকে বিলেতে পাঠালাম। কিন্তু টাকা কোথায় পাই। গভর্নমেন্টের সঙ্গে ঝগড়া চলছে, টাকা দেবে না, কাজ করতে দেবে না। কতদিক সামলাই? তারপর বললেন, তোমার নামটা কী? নাম শুনে বললেন, চৌধুরী তো মস্ত নাম হে। কিছু সম্বন্ধ আছে ওদের সঙ্গে, বালিগঞ্জের চৌধুরীদের সঙ্গে?

বললাম, আছে।

একটুখানি ভেবে বললেন, দেখো মাইনে বেশি দিতে পারব না। যা দিতে পারব তাইতে রাজি আছ সরকারি চাকুরি ছেড়ে আসতে? বললাম, রাজি আছি।

বললেন, বেশ। আসছে সেশন থেকে আসবে। জুনের শেষে একবার দেখা করো।

তিনি উঠে দাঁড়িয়েছিলেন কথা বলতে বলতে। গভর্নমেন্টের সঙ্গে কথাটা আবার বললেন। (এই সময়ের কিছু

আগে বা পরে লর্ড লিটনকে লেখা তাঁর চিঠি কাগজে প্রকাশিত হয় এবং তিনি বিখ্যাত freedom first, freedom second, freedom last বক্তৃতা দেন।) আমি প্রণাম করে ওঠবার সময় মাথা তাঁর বিশাল অনাবৃত ভুঁড়িতে লেগে গেল। পিঠে তিনি যে থাবড়াটা মারলেন এতদিন পরেও তার কথা মনে আছে। দু'চারজনের কাছে এই সাক্ষাতের বিবরণ বলতে তাঁরা বললেন, তোমার চাকুরি হয়ে গেছে। তবে ইউনিভার্সিটিতে যোগ দেবার আগে হাতের চাকরি ছেড়ো না।

ইউনিভার্সিটির চাকুরি কিন্তু হল না। মার্চ মাসে সাক্ষাৎ করেছিলাম, মে মাসে স্যর আশুতোষের হঠাৎ মৃত্যু হল।

তাঁর মৃতদেহ কলকাতা পৌঁছলে হাওড়া স্টেশন থেকে শোকযাত্রা আরম্ভ হল। আমার কনিষ্ঠভ্রাতা অশ্বিনীর শোকযাত্রায় যোগ দিয়ে কিছুক্ষণ মৃতদেহ বহন করবার সৌভাগ্য হয়েছিল। সিনেট হাউসের সামনে শোকযাত্রার যে ছবি কাগজে বেরিয়েছিল তাতে তাঁর ছবিও উঠেছিল। আমি অফিস থেকে বেরিয়ে রসা রোডে শোকযাত্রায় যোগ দিয়ে কেওড়াতলা পর্যন্ত গিয়েছিলাম। কলকাতার লোক, বিশেষ করে ছাত্রসমাজ হাজারে হাজারে যোগ দিয়েছিল সে শোকযাত্রায়। কেওড়াতলায় ভিড়ের চাপে আমার চশমা ঠিকরে পড়ে গুঁড়ো হয়ে গিয়েছিল।

আরও কয়েকটা শোকযাত্রার কথা মনে আছে।

দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের মৃতদেহ কেওড়াতলায় দাহ করবার সময় গান্ধীজি শ্মশানঘাটে উপস্থিত ছিলেন। ভিড়ের থেকে গান্ধীজিকে বাঁচাবার জন্য একটি লম্বা চওড়া জোয়ান যুবক তাঁকে কাঁধের ওপর বসিয়েছিলেন মনে আছে। মনে পড়ছে দু' পা ঝুলিয়ে যুবকটির কাঁধে বসে হাতে ছোট একটা বটগাছের ডাল চেপে ধরে ডান হাত তুলে চিৎকার করে জনতাকে শান্ত হবার জন্য আবেদন জানিয়েছিলেন গান্ধীজি। ছবিটি এখনও চোখের সামনে ভাসছে। শেষ পর্যন্ত বহু চেষ্টায় ভিড় থেকে বেরিয়ে পড়ে হাঁফ ফেলে বাঁচি। সব শ্রেণির লোক দেশবন্ধুর শোকযাত্রায় যোগ দিয়েছিল।

যতীন দাসের শোকযাত্রাও খুব বড় হয়েছিল। এ শোক-যাত্রাতেও বিভিন্ন শ্রেণির লোক যোগ দিয়েছিল।

শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের শোকযাত্রাতেও যোগ দিয়েছিলাম। সাহিত্যিকের শোকযাত্রা হলেও খুব লোক হয়েছিল। অনেক শিখ এতে যোগ দিয়েছিলেন।

(১৩)

১৯৭২-এ কনিষ্ঠভ্রাতা ডাক্তারি পাশ করে বেরলে বৈঠকখানার মেস ছেড়ে দিয়ে গড়পারে (বাহির মির্জাপুর রোড) বাড়ি ভাড়া করলাম। বাড়ি নেবার উদ্দেশ্য ছিল ওই বাড়ি থেকে প্র্যাকটিশ করবে। কিন্তু ছ'মাস হাউস সার্জনের কাজ করবার পরে হঠাৎ P & O Company-র জাহাজে মেডিকেল অফিসারের চাকুরি নিয়ে চলে গেলেন। আমার মধ্যমভ্রাতা এর আগে B.I.S.N. কোম্পানির জাহাজে Purser চাকুরি নিয়ে বর্মা, সিঙ্গাপুর, থাইল্যান্ড, ইন্দো-চীন, ইন্দোনেশিয়ায় যাতায়াত করেছিলেন। এই বাড়িতে থাকবার সময়ে ১৯২৮-এর শেষে দু'ভ্রাতার অনুপস্থিতিতে আমার বিয়ে হয়ে গেল বর্ধমানে। মেয়ে দেখতে গিয়েছিলেন ড. প্রবোধ বাগচী। বরযাত্রীদলের মধ্যে ছিলেন তিনি, ড. নিরঞ্জন চক্রবর্তী এবং বন্ধুবর তারকচন্দ্র। বিয়ের পরেই চলে গেলাম চাইবাসা।

চাইবাসা তখন এখনকার মতো বড় industrial শহর হয়নি। শহরের আশেপাশে হো গ্রাম। ক্যামেরা কাঁধে, কখনও বা বন্দুক ঘাড়ে ঘুরে বেড়াতাম নিকটবর্তী গ্রামগুলোয়। অন্য পশুপাখির অভাবে কিছুদিন ঘুঘু মারা গেল, তারপর বিরক্ত হয়ে বন্দুক তুলে রাখলাম। ছবি তোলবার মতো অনেক কিছু মিলত। প্রায় সবই হো-দের জীবনযাত্রার দৃশ্য। লম্বা লাইন বেঁধে যখন হো মেয়েরা মাথায় ফুল গুঁজে ঝুড়ি মাথায় হাটে যেত বা হাট থেকে ফিরত, আগে হতে জায়গা বেছে নিয়ে অনেক সময় হয়ত তাদের অগোচরে Snap নিতাম। ক'টা ছবি বেশ ভাল হয়েছিল। নিকটবর্তী সুন্দর প্রাকৃতিক দৃশ্যের মধ্যে অবস্থিত দু'একটা গ্রামে, চাইবাসা হতে চক্রধরপুর পর্যন্ত প্রাকৃতিক দৃশ্য চমৎকার। পথে চড়িভাতি করতে যাওয়া হত। শহর থেকে মাইল দুই দূরে লুপুংগুটু নামে এই রকম একটা গ্রাম ছিল। আমার প্রথম প্রকাশিত গল্পগ্রন্থের এই নাম দেওয়া হয়েছে।

নানা খনিজে সমৃদ্ধ এই অঞ্চল। লোহা, ম্যাঙ্গানিজ, মাইকা মেনে, ম্যাঙ্গানিজ বেশি। চাইবাসা হয়ে একটা রেল লাইন উড়িষ্যার কেওনঝড়ের সীমানা পর্যন্ত চলে গেছে খনিজ-সমৃদ্ধ অঞ্চলের মধ্য দিয়ে। এই অঞ্চলে খনিজ উত্তোলনের কাজ হচ্ছে দেখলাম। রোপওয়ে এখানেই প্রথম দেখি। চাইবাসা শুকনো স্বাস্থ্যকর জায়গা, মাটি লাল, কঙ্করময়, খুব বেশি পছন্দ না হলেও জায়গাটা ভালই লেগেছিল তখন।

বাহির মির্জাপুর রোডের বাড়িতে বাস করবার সময় ১৯২০-এর শেষ দিকে বালিগঞ্জে জমি কিনে বাড়ি তৈরি আরম্ভ হল। ১৯৩১-এর এপ্রিল মাসে নূতন বাড়িতে উঠে এলাম। জমি কেনা এবং বাড়ি তৈরির কথা আরও একটু বেশি করে বলতে ইচ্ছা হচ্ছে জীবনের শেষ অংশে। আমার দুটি বন্ধুও ছিলেন এর মধ্যে। ড. প্রবোধ বাগচী এবং তারকচন্দ্র দাস। কালিঘাটে দুটি বাড়িতে এঁরা তখন বাস করতেন। প্রবোধের গৃহের এক অংশে তখন বাস করতেন সস্ত্রীক ড. নিরঞ্জন চক্রবর্তী। এই বাড়িতেই আইরিশ মেয়েটির সঙ্গে হিন্দু মতে তাঁর বিয়ে

হয়েছিল। উভয়ের আলাপ অবশ্য বিদেশে থাকতেই। বিয়ের কনেযাত্রী ও বরযাত্রী ছিলাম আমরাই ক'জন। কিছুদিন পরে Opigraphist-এর চাকুরি নিয়ে ড. চক্রবর্তী দিল্লি চলে যান।

প্রতি রবিবারে আমরা তিনজন সমবেত হতাম তিন বাড়ির কোনও এক বাড়িতে। আমাদের তিনজনের নাম হয়েছিল Three Musketeers, সম্ভবত প্রবোধ দিয়েছিলেন। আহারাদির পরে যাত্রা করা হত জমি দেখবার উদ্দেশ্যে। জমির দাম তখন অনেক সস্তা ছিল কিন্তু গৃহ নির্মাণ অভিলাষীদের পুঁজি ছিল বেশ কম। ঢাকুরিয়া নিউ আলিপুর এবং অনেক পাড়ায় জমি দেখে দেখে অবশেষে ১৯৩০-এর গোড়ায় বন্ডেল রোডের দক্ষিণে হিন্দুস্থান কো-অপারেটিভ ইন্সিওরেন্স সোসাইটির স্কিমের দক্ষিণে জমি পছন্দ করা হল। পছন্দ করবার বড় একটা কারণ কিস্তিতে মূল্য দেবার ব্যবস্থা।

সমস্ত এলাকায় গোটা তিনেক মাত্র নূতন বাড়ি ছিল তখন, কিন্তু কেউ বাড়িতে বাস করতেন না। প্রায় সবটাই বড় বড় তাল তেঁতুল গাছ শোভিত, খানাডোবায় জখম মাঠ, আশেপাশে ধেনো জমি, দু'একটা বস্তি। দুই তিন ঘর ভদ্র পুরনো বাসিন্দা ছিলেন এই এলাকার পশ্চিমে রুস্তমজি স্ট্রিটের গলিতে।

প্রবোধ করিৎকর্মা মানুষ। জমি কিনে বাড়ি তৈরি করতে আরম্ভ করলেন। পুঁজি কম, বড় কিছু করা অসাধ্য, কষ্টে সৃষ্টে মাথা গোঁজবার স্থান করা। অথবা বাড়িভাড়ার চাপ থেকে বাঁচবার ব্যবস্থা করা। কারণ দেশে মাথা গোঁজবার স্থান তিন বন্ধুরই ছিল। প্রবোধের বাড়ি হয়ে গেল ১৯৩০-এর সেপ্টেম্বরে। পুজোর আগে তিনি গৃহপ্রবেশ করলেন। পরিবার দেশে পাঠিয়ে তারকও ওই বাড়িতে চলে এলেন। ডিসেম্বর মাসে আমার গৃহ আরম্ভ হল এবং ১৯৩১-এর এপ্রিলে আমি নূতন বাড়িতে উঠে এলাম। এরপর তারক আরম্ভ করলেন তাঁর বাড়ি তৈরি। আমি বাড়িতে আসবার দিনপনেরো আগে রাস্তায় ফিল্টার জল এল। জলের কানেকশন পেতে প্রায় দু'সপ্তাহ দেরি হল। এই দু'সপ্তাহ প্রবোধের বাড়িতে স্নান করতে হত। রান্না-খাবার জল তার বাড়ি হতে আনা হত। এইভাবে ১৯১৮ হতে যে-তিনজন এক ছাত্রাবাসের বন্ধু ছিলাম তাঁরা হলাম নিকট প্রতিবেশী।

এই কথাগুলো লিখলাম এই মনে করে যে বন্ধু ও প্রতিবেশীদের একজন শান্তিনিকেতনে মারা গেছেন কয়েক বছর আগে (ড. প্রবোধ), আরও কাজ করবার, আরও নাম করবার আশা অপূর্ণ রেখে। দ্বিতীয়জন (তারক) আরও চারদিন আগে (২৬ জুলাই ১৯৬৪) মারা গেলেন। ১৯২৯-৩০-এর জমি সংগ্রহাভিলাষী Three Musketeers-এর মধ্যে আমি অবশিষ্ট রইলাম lonely melancholy Musketeer.

(১৪)

কুমুদনাথ চৌধুরীর ব্রাইট স্ট্রিটের বাড়িতে সবুজপত্রের যে আড্ডা বসত, সেটা হল সবুজপত্রের আড্ডার তৃতীয় পর্যায়। এই পর্যায় শেষ হলে প্রমথনাথ যখন এসে তাঁর সেজদার বাড়িতে বা পাম অ্যাভিন্যুর সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুরের লাল বাংলোতে থাকতেন তখন আড্ডার জন্য তাঁকে ঘুরে বেড়াতে হত। কখনও আমার গৃহে এসে বসতেন, কখনও অতুলবাবুর গৃহে যেতেন, প্রায়ই প্রবোধের গৃহে বসতেন।

প্রবোধের গৃহ বড় আড্ডার জায়গা হয়ে দাঁড়িয়েছিল। সত্যেন্দ্রনাথ আসতেন, সুধীন্দ্রনাথ দত্ত, হারীতকৃষ্ণ দেব প্রভৃতি সবুজপত্র-মজলিশের প্রাক্তন সভ্যরা এখানে নূতন আরও অনেককে নিয়ে জমিয়ে বসতেন। এঁদের মধ্যে সত্যেন্দ্রনাথ, পুরনো বন্ধু পাড়ার নীরেন রায়ও ছিলেন। এই আড্ডা ক্রমে 'পরিচয় গোষ্ঠী' নামে পরিচিত হয়ে ওঠে। পরিচয় গোষ্ঠী নামের মূল সুধীন্দ্র দত্তের 'পরিচয়' কাগজ। কখনও কখনও প্রবোধের গৃহে এই আড্ডায় হয়ত গিয়েছি, চিনতাম আড্ডার প্রায় সবাইকে কিন্তু এই গোষ্ঠীর বাইরেই থেকে গেছি বরাবর।

নূতন আড্ডা খুঁজে নিতে দেরি হল না। এটি হচ্ছে 'রবিবাসর', প্রবাসী ও Modern Review অফিসের কবি শৈলেন্দ্রকৃষ্ণ লাহার অনুরোধে রবিবাসরে যোগ দিয়েছিলাম। প্রবাসীতে তখন নিয়মিতভাবে আমার প্রবন্ধ বেরত, Modern Review-তেও মাঝে মাঝে লেখা বেরত। মাসে দু'টি করে অধিবেশন হত রবিবাসরের, পালা করে সভ্যদের এক একজনের গৃহে। বেশির ভাগ অধিবেশন হত কলকাতায়। দু'চারটা অধিবেশন বাইরেও হত। বছরে একদিন কারও বাগানবাড়িতেও অধিবেশনের ব্যবস্থা ছিল। প্রবন্ধ ও কবিতাপাঠ বা আলোচনা তবে মুখ্য ব্যাপার ছিল ভোজন। প্লেটে করে খাবার দেওয়া হত বেশিরভাগ বাড়িতে। পাত পেড়ে লুচি মাংস মাছ, দই মিষ্টির ব্যবস্থা হত কোনও কোনও গৃহে। গান বাজনাও হত কোনও কোনও বাড়িতে। চাঁদা নির্দিষ্ট ছিল মাসিক আট আনা।

রবিবাসরের চালক ও প্রাণ ছিলেন সেক্রেটারি নরেন বসু। সভাপতি ছিলেন জলধর সেন। রবিবাসরে প্রবেশ করে আলাপ হয়েছিল পরলোকগত অমূল্য বিদ্যাভূষণ, শিশুসাহিত্যের লেখক যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত, নরেন্দ্র দেব, বাঁশবেড়ের মুণীন্দ্রদেব রায়মশায়, জ্যোতিপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়, উপেন্দ্রনাথ গাঙ্গুলি এবং আরও অনেকের সঙ্গে। আমি সভ্য হবার কিছুদিন পরে শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়কে সভ্য করে নেওয়া হয়। শরৎবাবু রবীন্দ্রনাথকেও টেনে আনেন রবিবাসরের মধ্যে। তাঁর পদ হয় মহানায়ক। পরলোকগত রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়, খগেন্দ্রনাথ মিত্র রবিবাসরের সভ্য হয়েছিলেন।

আমার বাড়িতে দুটি অধিবেশন হয়েছিল। প্রথম অধিবেশনে অতুল গুপ্ত, প্রমথ চৌধুরী এবং পাড়ার খগেন্দ্রনাথ মিত্রকে নিমন্ত্রণ করেছিলাম। পাড়ার অনেক ভদ্রলোককেও নিমন্ত্রণ করেছিলাম। এই অধিবেশনে খগেন্দ্রবাবু রবিবাসরের সভ্য শ্রেণিভুক্ত হন। দ্বিতীয় অধিবেশনে শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় উপস্থিত হয়েছিলেন। তাঁকে দেখবার জন্য পাড়ায় অনেক মহিলা উপস্থিত হয়েছিলেন। তাঁকে দেবার জন্য বড় একটা গোলাপের তোড়া তৈরি হয়েছিল বাগানের গোলাপফুল তুলে। বাড়িতে তখন একশতের ওপর গোলাপগাছ ছিল এবং অজস্র ফুল হত। আহারাদির পরে সভা ভাঙবার সময় শরৎচন্দ্রকে একটু বসতে অনুরোধ করা হল মেয়েরা তাঁকে দেখতে চান জানিয়ে। অনুরোধ শুনে গোলাপের তোড়াটি হাতে নিয়ে একলাফে আসন ত্যাগ করে দ্রুতবেগে রাস্তায় নামলেন। তাঁর কাণ্ড দেখে অনেকে হাসতে লাগলেন।

শরৎচন্দ্রের অশ্বিনী দত্ত রোডের গৃহে দু'বার রবিবাসরের অধিবেশন হয়েছিল। দু'বারের কথাই বেশ মনে আছে। মনে আছে ভোজনের সুপ্রচুর ব্যবস্থার জন্য বোধহয়। প্রথম বারের অধিবেশন শরৎচন্দ্রের গৃহপ্রবেশ উপলক্ষে। শরৎচন্দ্র কিছুক্ষণ তাঁর সাহিত্যিক অভিজ্ঞতার কথা বলেছিলেন। রাজনৈতিক চর্চাও কিছু হয়েছিল। গানবাজনার ব্যবস্থাও কিছু ছিল সম্ভবত। তারপর পাতপেড়ে লুচি, মাংস পোলাও, দই মিষ্টির সদ্ব্যবহার। শরৎচন্দ্র পট্টবস্ত্র পরে সুপারভাইজ করে বেড়াচ্ছিলেন। মনে আছে খেতে খেতে পার্শ্ববর্তী কে যেন বলছিলেন, শরৎবাবু জমিদার নন, ব্যবসায়ী নন, চাকুরিও করেন না। তিনি শুধু সাহিত্যিক। সাহিত্যিকের গৃহে সাহিত্যকর্ম করে লব্ধ অর্থে এই ভোজনের ব্যবস্থা করা হয়েছে, এজন্য এই খাওয়া স্মরণীয়। দ্বিতীয় অধিবেশনে রবীন্দ্রনাথ এসেছিলেন। শরৎবাবুর প্রস্তাবে রবীন্দ্রনাথ রবিবাসরের মহানায়ক পদে নির্বাচিত হন। দুই সাহিত্য-মহারথীর মধ্যে কথাবার্তা, হাস্যপরিহাস হয়েছিল কিন্তু দুঃখের বিষয় সে কথা মনে করতে পারছি না। কিছুক্ষণ পরে রবীন্দ্রনাথ চলে গেলেন। যাবার আগে রবিবাসরের সভ্যদের শান্তিনিকেতনে যাবার নিমন্ত্রণ করে গেলেন। এদিনেও গুরুতর ভোজের আয়োজন ছিল।

কলেজি শিক্ষার প্রথমদিকে শরৎবাবুর রচনার সঙ্গে পরিচয়। যতদূর মনে পড়ে তাঁর 'বিরাজ বৌ' বোধহয় প্রথম পড়েছিলাম যখন ভারতবর্ষ পত্রিকায় লেখাটি বের হচ্ছিল। পড়েই মনে হয়েছিল একজন বিশেষ শক্তিমান লেখকের অভ্যুদয় হয়েছে। তাঁর সম্বন্ধে কিছুই জানতাম না তখন। দিনদিন তাঁর পপুলারিটি বেড়ে চলল, তাঁর গল্প-উপন্যাসের সঙ্গে পরিচয় হতে লাগল। ভারতবর্ষ কাগজ প্রতিমাসে বেরবার সঙ্গে সঙ্গে সর্বাগ্রে তাঁর লেখাটি পড়তাম। মনে আছে বঙ্গবাণী মাসিক পত্রিকায় তাঁর 'পথের দাবী' উপন্যাস যখন প্রকাশিত হল, তরুণ মহলে প্রচুর উত্তেজনার সৃষ্টি হয়েছিল। পুস্তকাকারে বেরবার পরেই 'পথের দাবী' proscribed হয়। অফিসের কার্যসূত্রে গোটা বইখানি আমাকে ইংরাজিতে অনুবাদ করতে হয়েছিল।

গল্প-উপন্যাসের মধ্য দিয়ে সাহিত্যিক শরৎচন্দ্রের অনন্য সাধারণ সৃজনীপ্রতিভা অনুভব করেছি। কংগ্রেস দলভুক্ত, সুভাষ-ভক্ত, গান্ধীজির অহিংসা নীতির সমালোচক শরৎচন্দ্রের রাজনৈতিক উদ্যমের পরিচয় সমসাময়িক সংবাদপত্রাদি হতে জেনেছি। তাঁর সৃষ্ট সাহিত্যের বিপুল আকর্ষণ এবং জনপ্রিয়তার কথা প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা হতে জানতাম, স্বগৃহে এবং তাঁর নিজের গৃহে কাছে বসে তাঁর কথাবার্তা শোনবার সুযোগ হয়েছে কিন্তু ঘনিষ্ঠতা হয়নি। তাঁর সঙ্গে সুযোগসুবিধা থাকলেও ঘনিষ্ঠ হবার অবসর হয়নি। মনে হয় কোথায় যেন, কিসে যেন আটকে যাচ্ছিল আরও কাছে যাবার চেষ্টা। বাংলাসাহিত্যে অনেক অনেক নূতন জিনিস দিয়েছেন সাহিত্যিক শরৎচন্দ্র। বাংলা সাহিত্যের পরিধি অনেকখানি বাড়িয়ে দিয়েছিলেন। তাঁর বাহুল্য বর্জিত মর্মস্পর্শী স্টাইলই এক অসাধারণ বস্তু, কিন্তু এখানে শরৎচন্দ্রের সাহিত্য বা সাহিত্য-প্রতিভার বিশ্লেষণ করতে বসিনি। তবুও বলব। আমার মনে হয়েছে শরৎচন্দ্রের শ্রেষ্ঠ সাহিত্যসৃষ্টির রসগ্রহণ করা বোধহয় পরিণত বয়সের অপেক্ষা রাখে।

শরৎচন্দ্রের মৃতদেহ নিয়ে যে শোকযাত্রা কেওড়াতলা শ্মশানঘাটে পৌঁছেছিল সে শোকযাত্রা ছিল বেশ বড় এবং অনেকটা আন্তঃপ্রাদেশিক, জাতীয় পতাকা এবং বন্দেমাতরম ধ্বনিও ছিল তাতে। অভারতীয় দু'চারজনকে সে শোকযাত্রায় দেখেছিলাম মনে হচ্ছে। তাঁর শ্রাদ্ধবাসরেও কিছু সংখ্যক অবাঙালি উপস্থিত হয়েছিলেন। ঠিক বলতে পারি না, এর কারণ তাঁর সাহিত্যের প্রভাব না জনপ্রিয় রাজনৈতিক দল কংগ্রেসের সঙ্গে তাঁর সংযোগ, অথবা দুটোই। আগে বলেছি শরৎচন্দ্রের গৃহে যেদিন এসেছিলেন সেদিন রবীন্দ্রনাথ রবিবাসরের সভ্যদের শান্তিনিকেতনে একটি অধিবেশন করবার নিমন্ত্রণ করেছিলেন।

এই অধিবেশন রবিবাসরের ইতিহাসে একটি স্মরণীয় ঘটনা। উত্তরায়ণ ভবনের প্রশস্ত সিঁড়িতে বসে সভ্যদের যে ফোটো তোলা হয়েছিল তার একখানি কপি এখনও আমার কাছে রয়েছে। যাঁদের ফটো আছে তাঁদের মধ্যে অর্ধেকের বেশি ব্যক্তি পরলোকগমন করেছেন। চেয়ারে উপবিষ্ট তিনজনের রবীন্দ্রনাথ, রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়, জলধর সেন কেউ বেঁচে নাই। উপেন্দ্রনাথ গাঙ্গুলি, অমূল্য বিদ্যাভূষণ, মুনীন্দ্রদেব রায়মশাই, কবি সুরেন্দ্রনাথ মৈত্র আরও অনেকে বেঁচে নাই। উপেন্দ্রনাথ গাঙ্গুলিমশাই দীর্ঘকাল আমার

প্রতিবেশী ছিলেন। তাঁর কথা পরে বলব। তিনি এই অধিবেশনের একটি মনোজ্ঞ বিবরণ লিখেছিলেন, তার বিচিত্রা বা অন্য কোন কাগজে সেটা বেরিয়েছে মনে করতে পারছি না।

দলবেঁধে থার্ড ক্লাসের কামরা বোঝাই করে রওনা হয়েছিলাম সকলে। আমার পাশে বসেছিলেন অমূল্য বিদ্যাভূষণমশায়। তাঁর সঙ্গে নানারকম আলাপে আনন্দে সময়টা কেটেছিল। অসাধারণ বিদ্যাবত্তা, নিরহংকার এবং সদালাপি স্বভাবের জন্য এই ভদ্রলোকের প্রতি অনেকখানি শ্রদ্ধা ছিল আমার মনে। গাড়িতে একটি নূতন তথ্য আবিষ্কার করা গেল। রামানন্দবাবুর মতো গম্ভীরদর্শন মানুষ যে অত হাসতে এবং হাসাতে পারেন আগে আমার মতো অনেকেই কল্পনা করেননি।

বোলপুর পৌঁছবার পর থেকে রবীন্দ্রনাথের অতিথিদের আদর-আপ্যায়ন আরম্ভ হল। শান্তিনিকেতনে আমি প্রথম গিয়েছি, সব কিছুই আমার কাছে নূতন। রাত্রে পৌঁছেছিলাম। আহারাদি সেরে গেস্ট হাউসে রাত্রিযাপন করা হল। পরদিন সকালে চা খাবার পরে উত্তরায়ণ ভবনে কবিগুরুর দর্শন এবং রবিবাসরের অধিবেশন হবে। দুপুরে সেখানে তাঁর মধ্যাহ্নভোজনের নিমন্ত্রণ রক্ষা হবে শুনলাম।

উত্তরায়ণে রবিবাসরের অধিবেশনের প্রারম্ভে সভ্যদের নাম ডেকে পরিচয় করে দেওয়া হল কবিগুরুর সঙ্গে। অনেককেই তিনি চিনতেন। অধিবেশন শেষ হলে বেশির ভাগ সভ্য যখন শান্তিনিকেতন ঘুরে বেড়িয়ে দেখবার জন্য চলে গেলেন আমি তাঁর কাছে গিয়ে বসলাম। কিছুদিন আগে 'মোপাসাঁর গল্প' তাঁকে পাঠিয়েছিলাম। অনুবাদের প্রশংসা করে চিঠি লিখেছিলেন। বইখানা সম্বন্ধে দু'একটা প্রশ্ন করলেন। তারপর প্রমথ চৌধুরী এবং ইন্দিরাদেবীর কথা জিজ্ঞাসা করলেন। বললেন, প্রমথ বড্ড নড়বড়ে হয়ে গিয়েছে, বয়সে আমার চাইতে কত ছোট। ইচ্ছে করেই হোক বা অভ্যাসবশে সিল্কের আচকানের ঢিলে হাতটা খানিকটা টানলেন। তাঁর সুপুষ্ট প্রকাণ্ড কবজি চোখে পড়ল। আমার চোখে সপ্রশংস দৃষ্টি দেখে মৃদু হাসলেন। বললাম, ন'জ্যেঠিমার (ইন্দিরা দেবী) হাতও আপনার হাতের মতো। আবার মৃদু হাসলেন। তারপর বললেন, শ্রীনিকেতন দেখেছ? ফেরবার আগে দেখে যেয়ো। শ্রীনিকেতনের কথা বলছেন এমন সময় কয়েকজন রবিবাসরের সভ্য এলেন। আমি প্রণাম করে বিদায় নিলাম।

মধ্যাহ্নভোজনের সমারোহের কথা বেশ মনে আছে। সত্তর আশি জন আসন পেতে খেতে বসেছেন, থালায় ও অনেকগুলো করে বাটি সাজানো আহার্যের সামনে। একপাশে বেতের চেয়ারে রবীন্দ্রনাথ উপবিষ্ট। তাঁর পুত্রবধূ প্রতিমা দেবী তত্ত্বাবধান করছেন, শান্তিনিকেতনের ছেলেরা পরিবেশন করছেন। কবিগুরুর হাস্যপরিহাসে মাঝেমাঝে উচ্চ হাসি উঠছে ভোক্তাদের মধ্যে। মাছ, মাংস, পোলাও, দই, নানাপ্রকার মিষ্টির প্রচুর আয়োজন। সকলেই আয়োজনের যথাসাধ্য সদব্যবহার করতে তৎপর।

উত্তরায়ণের এই ভোজসভা আরেকটি ভোজের কথা স্মরণ করিয়ে দিল। পরে তার কথা বলছি।

আহারের পরে বাস ও মোটরে অনেকের সঙ্গে আমিও শ্রীনিকেতন দেখতে গেলাম। অনেক রকম কুটিরশিল্পের প্রতিষ্ঠান ছুটোছুটি করে দেখেছিলাম। তাঁতের কাজ, ছুতোরের কাজ, বেতের কাজ, অনেক কিছু—ভাল করে মনে নাই এখন তবে তখনকার মনোভাবের কথা মনে আছে। রবীন্দ্রপ্রতিভা যে কত বৃহৎ ক্ষেত্রে কত বিচিত্র কর্মানুষ্ঠানের মাধ্যমে আত্মপ্রকাশ করেছে বারবার সেই কথা মনে হচ্ছিল।

ফিরে এসে মোটঘাট নিয়ে স্টেশনে যেতে হল। কবিগুরু তখন বিশ্রাম করছেন, দেখা হল না। কর্মীরা চা পরিবেশনের প্রস্তাব করলেন। গুরুভোজনের গুরুত্ব শ্রীনিকেতন পরিক্রমার ফলেও তেমন লঘু হয়নি, প্রস্তাব সবিনয়ে প্রত্যাখান করলেন সবাই। রবিবাসরের এই অধিবেশন নিঃসন্দেহে সেরা অধিবেশন।

সিঁথির এক বাগানবাড়িতে রবিবাসরের এক মুদ্রণ ব্যবসায়ী সভ্যের নিমন্ত্রণে একটি অধিবেশন হয়েছিল। এই অধিবেশনে রবীন্দ্রনাথকে টেনে আনা হয়েছিল। কী একখানা কাগজে লিখেছিলাম এই অধিবেশনের কথা রবীন্দ্রস্মৃতি হিসাবে। এখনও ক্রোধ এবং বিরক্তি জেগে ওঠে এই অধিবেশনের কথা মনে করলে। রবীন্দ্রনাথকে নিজেদের মধ্যে পেয়ে আনন্দের পরিবর্তে যন্ত্রণা বোধ করেছিলাম অবাঞ্ছিত পরিবেশে তাঁর অবস্থিতিতে। মনে আছে কয়েকজন মিলে কতকটা জোর করে রবীন্দ্রনাথকে তাঁর গাড়িতে তুলে দিয়েছিলাম।

এর কিছুদিন পর সভাপতি জলধর সেনের মৃত্যুর পরে আমি রবিবাসর ছেড়ে দিই। জলধর সেনমশায়ের পরে রায়বাহাদুর খগেন্দ্রনাথ মিত্র সভাপতি হন। রবিবাসর ছাড়বার পরে দু'চারটে অধিবেশনে যোগ দিয়েছি যাঁদের গৃহে অধিবেশন হবে তাঁদের বিশেষ নিমন্ত্রণে। পরলোকগত যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত, উপেন্দ্রনাথ গাঙ্গুলি, শৈলেন্দ্রকৃষ্ণ লাহা এবং রায়বাহাদুর খগেন্দ্রনাথ মিত্রের নাম মনে আছে। খগেন্দ্রনাথ এবং উপেন্দ্রনাথ উভয়েই আমার প্রতিবেশী, কবি শৈলেন্দ্রকৃষ্ণ ছিলেন বন্ধু। যোগেন্দ্র গুপ্তমশায়ের গৃহে অধিবেশনে দেখলাম লেডি রানু মুখার্জি রবিবাসরের সভ্য হয়েছেন।

উত্তরায়ণের ভোজসভার কথা বলতে গিয়ে যে ভোজের কথা মনে পড়েছিল তার কথা বলছি। এটা একেবারে

পারিবারিক ভোজ, এর একমাত্র বৈশিষ্ট্য আমার এই ভোজে স্থান পাওয়া। বৈশিষ্ট্য বলছি এজন্য যে আমি তখন বি এ ক্লাসের পড়ুয়া বালকমাত্র এবং তিনজন নিমন্ত্রিতের মধ্যে একজন মহারাজা শশীকান্ত, আরেকজন গোবরডাঙার জমিদার প্রসিদ্ধ শিকারী জ্ঞানদাবাবু। আমি অনিমন্ত্রিত। রবিবার বা ছুটির দিনটা কাটাতে গিয়েছিলাম। ব্রাইট স্ট্রিটের ন'জ্যেঠামশাই কুমুদনাথ চৌধুরীর গৃহে। মূল্যবান কার্পেটের আসন মাপমতো প্রকাণ্ড থালা এবং গোটা ত্রিশ বাটি এবং খান দশ রেকাবি সাজিয়ে প্রত্যেকের জন্য আসন রচনা করা হয়েছিল। আমাকে টেনে নিয়ে যখন একটি আসনে বসিয়ে দিলেন ন'জ্যেঠামশাই, এই মহারাজকীয় ব্যবস্থা দেখে বিষম ঘাবড়ে গেলাম। বলাবাহুল্য খাওয়া বিশেষকিছু হল না, যদিও এই বালখিল্য পঙক্তি ভোক্তার দুরবস্থার প্রতি কোনও মনোযোগ না করে কিন্তু রাজকীয় অতিথিরা গল্পগুজব করতে করতে খেতে থাকলেন। বড় রূপার চামচ দিয়ে বাটি থেকে খাবার তোলবার চেষ্টায় ঘেমে উঠেছিলাম কেবল। আজ পর্যন্ত বুঝতে পারিনি আমাকে তখন ওরকম রাজকীয় মর্যাদা কেন দেওয়া হল। বোধহয় স্নেহপ্রবণ হৃদয়ের খেয়াল।

রবিবাসরের সূত্রে সাহিত্যিক উপেন্দ্রনাথ গাঙ্গুলির সঙ্গে যে-পরিচয় হয় প্রতিবেশিত্বের সূত্রে তা ঘনিষ্ঠ হয়ে ওঠে। আলাপ হবার পরে একদিন তাঁকে স্মরণ করিয়ে দিয়েছিলাম বিচিত্রা প্রকাশিত হবার সময় তিনি একদিন আমার সঙ্গে দেখা করেছিলেন বিচিত্রার জন্য আমার বন্ধু ড. প্রবোধচন্দ্র বাগচীর লেখা আদায় করবার উদ্দেশ্যে। কে তাঁকে খবর দিয়েছিস প্রবোধের লেখা পাবার উপায় হল আমার সাহায্য নেওয়া। অবশ্য প্রবোধের সঙ্গে দেখা করেছিলেন তিনি। উভয়ের চেষ্টায় প্রবোধ বিচিত্রার জন্য তাঁর ইন্দো-চীন ভ্রমণ কাহিনি লেখেন।

উপেন্দ্রবাবুর গৃহ প্রিয় আড্ডার স্থান ছিল অনেকের কাছে। মজলিশি লোক ছিলেন তিনি। গল্প করতে ভালবাসতেন, খুব ভালো গল্প করতেও পারতেন। হাস্যকৌতুক করতে পারেন, গান গেয়ে মনোরঞ্জন করতে পারতেন। তাঁর গুণমুগ্ধ অনুরাগীর সংখ্যাও ছিল বিস্তর। তাঁর মত সত্যিকার গুণী, সম্পূর্ণ complex মুক্ত সাহিত্যিক এবং মধুর ব্যবহার, মিষ্ট ভাষণ ও আকর্ষণীয় চরিত্রগুণের অধিকার লেখক এ যুগে আর চোখে পড়েনি। তাঁর সাহিত্য ও তাঁর চরিত্রের মৌলিক মিষ্টত্ব সঞ্চারিত হয়েছিল। (ক্রমশ)

প্রশ্নবাচী

কুমার রাণা

প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা সীমিত হতে বাধ্য। কিন্তু ব্যক্তি তো তাকে মূল্য দেবেই এবং চন্দ্রা ব্যক্তিমাত্র। সমাজ, দেশ, বিশ্বচরাচরের সঙ্গে যতই পাকে পাকে জড়িয়ে থাক না কেন তার নিজত্ব বাধ্যতামূলকভাবে প্রভাবশালী—অন্তত সে যেগুলিকে নিজের বলে মনে করে সেগুলি সম্পর্কে সিদ্ধান্ত নেবার বেলায়। অবশ্য একথা বলাও বোধহয় অনাবশ্যক যে একক চন্দ্রার গড়ে ওঠার পরতে পরতে নানান নৈর্ব্যক্তিক, সামাজিক, জাগতিক এবং আদি আদি ব্যাপার নিরবচ্ছিন্ন কাজ করে গেছে। কিন্তু অবশেষে সেগুলি তার যে একান্তকে গড়ে দেয় তা সকল কিছুর ঊর্ধ্বে বিশিষ্ট হয়ে ওঠে। অতএব এই সঙ্কটমুহূর্তে তার সামনে পড়ে থাকা নানান তারকা তারকা প্রাইভেট হাসপাতালের লোভনীয়, দারুণ আশাবাদী এবং করুণাঘন পর্চাগুলি অথবা মন্ত্রী, প্রাক্তন মন্ত্রী, মন্ত্রীপদপ্রার্থী ভিন্ন ভিন্ন মাপ ও খাপের সমাজকর্তাদের উচ্চ উচ্চ ঘোষণা, কিংবা দলীয় নেতা কর্মীবৃন্দের আশ্বাসবাণী, অথবা সংবাদপত্র থেকে নিয়ে অফিসের সর্বজ্ঞ কেরানি পর্যন্ত নানান পেশাদার ও নেশাখোর খবরচিদের হতাশ্বাস—কোনও কিছুই তাকে প্রভাবিত করতে পারে না।

সে একটি নিজস্ব সিদ্ধান্ত নিতে চায়।

কেননা, এই মুহূর্তে এই ঘর, মার হাতের ফুলতোলা, রংচটা বালিশের ওয়াড়, ফুটপাথ থেকে কেনা বিছানার চাদর, দু'বছরের বেশি মারা যাওয়া পরম ভক্তিসম্পন্না এবং যুগপৎ তেত্রিশ কোটি দেবদেবীর চরণাশ্রিতা মার রেখে যাওয়া লক্ষ্মী, কালি, মহাদেবের ছবি—পুরনো আদলের ঘরের একটি তাকের অর্ধেক জুড়ে তাদের ফেলা যায়নি, বাকি অর্ধেক তাক জুড়ে, পেতলের ছোট থালা, ঘটি গেলাস, ধূপদানি—তাদেরও সরানো যায়নি। অন্য তাকগুলিতে বইপত্র, পত্রিকা, ডায়েরি, খাতা, অবিন্যস্ত টুকিটাকি হস্তশিল্প, ওপরের দেয়ালে একদিকে মার ছবি—সাদা কালো, শুধু সিঁথিতে ফটো কারিগরের এঁকে দেওয়া লাল সিঁথি—তাঁর পতিবন্তী নিশান, অন্যদিকে রহস্যাবৃত কার্ল মার্কস—অদূরে মৃদুহাস্যময় ব্যঙ্গ ঝোলানো ঠোঁটে লেনিনের উপস্থিতি, নীচে তক্তাপোষে বিছানা, কাঠের পুরনো চেয়ার, প্লাস্টিকের তুলনামূলক নতুন চেয়ার, জলের জাগ—এই সব নানান সাংসারিকতা নিয়ে যে ঘর সেখানে নিশুতি রাতে সে তার পিতাকে আগলে রাখে।

এই মুহূর্তে বাবা তারই একান্ত। অথবা সে বাবার। অথবা দুই-ই। ঘোরতর দলীয়, দলময়, পিতাও তো এক একটি ক্ষুদ্র সময়খণ্ডে ব্যক্তিগত, কখনও তো তিনিও কোনও নিমেষকে নিজস্ব ভেবেছেন। সে ভাবেই তো চন্দ্রার আগমন। চন্দ্রা নামটিও তাঁর বেছে নেওয়া। বাংলাসাহিত্যে রুচি ছিল। ঈষৎ গবেষণা ছিল। কবি চন্দ্রাবতীর নামে মেয়ের নাম—কিছুটা অ-দলীয়, অ-রাজনৈতিকভাবেই, যদিও স্বাভাবিক ছিল লতিকা, প্রতিভা, অহল্যার নামে নাম রাখা—রাজনৈতিক, বিশেষত, বামপন্থী ক্রিয়াকাণ্ডে স্মরণীয় নারী নামগুলি সীমিত হলেও একেবারেই নেই তা নয়। অবশ্য কারও সম্মানে কারও নাম রাখতেই হবে তেমন কোনও কথা নেই। কিন্তু সংস্কার তো থেকেই যায়। মা তো সচেতন সংস্কারময়ী। কিন্তু বাবা?

চন্দ্রা রূঢ় হতে চায় না। বাবা যন্ত্রণায় কাতর। ওষুধ তেমন একটা কাজ করছে না। রাত এগারোটা পর্যন্ত পাড়ার ডাক্তার দলীয় কর্মী দীপেন বসেছিল। অন্য কিছু কর্মী তারও পর পর্যন্ত বসেছিল। কেউ কেউ থেকেও যেতে চেয়েছিল। চন্দ্রা সবিনয়ে তাদের যেতে বলে।

চিকিৎসা নিয়ে নানান পরামর্শ। এমনকী উত্তপ্ত বিতর্ক। সে সময়টা চন্দ্রার বিশেষ ভূমিকা ছিল না। চা করে খাওয়ানো বা জল দেওয়া, কিংবা বাবার পাশে বসা ছাড়া। সংক্ষিপ্ত রান্না সন্ধ্যাতেই সারা হয়ে গিয়েছিল। অফিস থেকে ফিরেই স্নানটানও সেরে নিয়েছিল।

ওরা বাবাকে ঘিরে রয়েছিল। বাবা ওদের। চন্দ্রা কন্যামাত্র, এবং একজন দলীয় মানুষের—বাবার কথায় অবশ্য বৃহত্তর সামাজিক—সব কিছুই দলগত। মানুষটিই তো দলের

সম্পত্তি। চন্দ্রা তাদের আন্তরিক বিশ্বাস নিয়ে প্রশ্ন তুলতে চায় না। দলকে সে অপ্রয়োজনীয় মনে করে না, এবং হয়ত বা সে নিজেও একথা মনের মধ্যে বিশ্বাসের খুঁটিতে বেঁধে দিয়েছে যে বাবা সামাজিক সম্পত্তি। অতএব সে নিজেকে গণ্ডিবদ্ধ রাখে। কিন্তু কখনও কখনও তাকে গণ্ডির পরিধি বাড়াতে হয়। এবং বাবাকে তার পরিধি কমিয়ে নিতান্তই ক্ষুদ্র এক বিন্দুতে নিয়ে আসতে হয়—যখন রাত এগারোটা বারোটার পর সব কিছু ক্ষুদ্র হতে থাকে, পৃথিবী বৃহৎ হতে থাকে, আর পিতা ও কন্যা ব্যক্তিগত বৃহত্ত্বের দিকে অগ্রসর হয়।

★

সারাদিন অফিস। চাকরি না করলে চলবে কেন? চাকরিটা নতুন। চন্দ্রার সঙ্গে আমাদের পরিচয় যত সামান্যই হোক না কেন এটুকু বুঝে নিতে কষ্ট হয় না যে চাকরিটা কষ্টার্জিত, নিজের জোরে। কষ্টে পড়াশোনা, কষ্টে বড় হওয়া। কষ্ট করে চাকরি। তবু সে নিজেকে পরম সৌভাগ্যবতী মনে করে। চাকরির বাজার যা তাতে কাজ পেয়ে যাওয়াটা প্রায় লটারি পেয়ে যাওয়ার মতোই।

সন্ধ্যায় বাড়ি ফেরা। ঘর ভর্তি লোক। অবশ্য সে এতেই অভ্যস্ত। বাস্তবিক সে মনেই করতে পারে না কবে তারা একা ছিল। সারাদিনই কেউ না কেউ আসে। কখনও কখনও এর চেয়ে বেশি। বাবা সর্বক্ষণের কর্মী; বাবা উঁচু স্তরের নেতা। সহকর্মী, কর্মীদের ভিড় লেগেই থাকে। এমনকী বাবা না থাকলেও তাঁদের আসা যাওয়া বন্ধ হয় না। কত কথা, আলোচনা, তর্ক পরিকল্পনা—যা ষড়যন্ত্রের উচ্চতায় পৌঁছে যায়। কখনও বা এই বাড়ি পার্টি অফিসের চেয়েও ব্যস্ত ও গুরুত্বপূর্ণ। বাবাকে সে বড় বেশি ব্যক্তিগত পায়নি। বাবার সঙ্গীসাথীদের কেউ কেউ ব্যক্তিগত হতে চেয়েছে। সে অন্য কথা—চন্দ্রা মনে করতে চায় না। এই ক্ষণটিতে সে বিরক্ত হতে চায় না। বাবার অসুখ তার ব্যক্তিগত বাবাকে তার কাছে এনে দিয়েছে—তার বাবা বেঁচে উঠুক। ঘরে এমনকী তার জায়গা যদি না-ও হয় তবুও—বাবা যেমনভাবে বেঁচে এসেছে তেমনইভাবেই বাঁচুক।

সে কি মার মতো করে ভাবছে? মাকে তো সে এই নিয়ে কত কথা শুনিয়েছে। মার পতিভক্তি আর দেবভক্তি নিয়ে। মা হেসেছে। মাথায় হাত বুলিয়ে দিয়েছে। ওই পর্যন্ত; মার কাছে বোধহয় পতিভক্তিটা ঠাকুরদেবতাদের ওপর ভক্তির চেয়ে বেশি ছিল—হয়ত বা পতির কল্যাণকামনায় ঠাকুরভক্তি। বাবা তো ঘোর নাস্তিক; কিন্তু মার আচারে বাধা দেয়নি কখনও—হয়ত এমন অনেক কিছুই মেনে নিতে হয়, বড় কোনও স্বার্থে ছোট ছোট বিশ্বাসগুলির সঙ্গে আপোষ। দুর্বল এক মুহূর্তে বাবা বলেই ফেলেছিল—'ওটা আমার পরাজয়। আমার আদর্শ আমার ঘরেই প্রতিষ্ঠিত করতে পারিনি।' এই স্বীকারোক্তিটুকু চন্দ্রাকে তৃপ্তি দেয়। কিন্তু, মা-ও কি ঠিক এই প্রশ্নটা তুলতে পারত না? ঘর তো মারও বটে। না কি তা ছিল না?' তাছাড়া আরও প্রশ্ন জাগে, 'বাবা তো অনেক যুদ্ধেই পরাজিত। সে সবও কি সমান স্বীকৃতি পেয়েছে?' নাঃ সে মার মতো করে ভাবছে না। সে তার অর্ধেক পিতার গর্বের গর্বিণী, অর্ধেক পিতার পলায়নে লজ্জিতা। সব জয় পরাজয়কে সে নিষ্প্রশ্ন মাথায় তুলে নেয়নি।

না নেওয়াতেই তার নিজস্বতা। মায়ের যেমন উলটোটা। কিন্তু এখন সে কথা থাক। চন্দ্রা এখন বাবাকে ভাল দেখতে চায়। কিন্তু বাবার বঞ্চনা যে তীব্রতায় পৌঁছেছে তাতে ভাল হওয়ার লক্ষণ কোথায়? অথচ বাবার চিকিৎসা নিয়ে জটিলতার শেষ নেই। দীপেন কিছুতেই বাবাকে হাসপাতালে পাঠাতে রাজি নয়, নানান প্রাইভেট হাসপাতালের কাগজপত্রগুলি তারই জোগাড় করে আনা—যাতে সেগুলির মধ্যে তুলনামূলক বিচার করে কোনও একটিকে বেছে নেওয়া যায়। এতে অবশ্য কর্মীদের খুব আপত্তি নেই—যদিও তারা জোরের সঙ্গে একথাও বলছে যে সরকারি হাসপাতালেও বাবার চিকিৎসার ত্রুটি হবে না—সেখানেও দলীয় সমর্থক ডাক্তাররা আছেন—তাছাড়া বাবা নেতা। নেতা সোমনাথকাকু অবশ্য খুবই জোর দিয়ে দীপেনকে সমর্থন করে যান। সোমনাথকাকু অনেক বেশি অভিজ্ঞ এবং বাস্তববাদী। কিন্তু বাবার নিজস্ব মতামতটি একগুঁয়ে ঃ 'এখানেই চিকিৎসা হবে। যা হবার তা হবে।' কিন্তু তাঁর পক্ষে তর্ক চালিয়ে যাওয়া কঠিন। রোগজনিত দুর্বলতা তাঁর মানসিক শক্তিকেও বোধহয় কাহিল করে দিয়েছে।

চন্দ্রার বক্তব্যকে কেউই তেমন গুরুত্বপূর্ণ মনে করে না—সে বালিকামাত্র—তাছাড়া বাবার চিকিৎসাটাও একটা দলীয় কাজ, সদস্য সমর্থকদের বাইরের কাউকে এ নিয়ে চিন্তিত হবার প্রয়োজন নেই। তবু সে দীপেনকে আংশিক সমর্থন করে। তার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা, খণ্ডিত, সীমিত হলেও সে অভিজ্ঞতা তার গড়ে ওঠায় বিশিষ্ট হতে বাধ্য ঃ বান্ধবী তৃষ্ণা মাত্র ছ'মাস আগে সরকারি হাসপাতালে প্রাণ হারিয়েছে। চিকিৎসা বলতে যদি কিছু হয়ে থাকে সেটা, স্পষ্ট বলা যায়, অপচিকিৎসা। কিন্তু সেই ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা আবার দীপেনকে সম্পূর্ণ সমর্থন করা থেকে বাধা দেয়—বেসরকারি হাসপাতালের অর্ধজীবন্ত নমুনা তো সে নিজেই।

বাবা দলীয় কাজে বাইরে গিয়েছিল। মাঝ রাত্রে প্রচণ্ড পেটের যন্ত্রণা ওঠে। মা অসহায় বোধ করেছিল। পাশেই এক

দলীয় কর্মীর বাড়ি—তাকে খবর দেওয়া, ঘণ্টাখানেকের মধ্যে সাহায্যের অনেক হাত। দলীয় কর্মীরাই ব্যবস্থাপত্র করে চন্দ্রাকে বড় এক তারকামার্কা হাসপাতালে ভর্তি করে। বাবা থাকলে সরকারি হাসপাতালে নিয়ে যেত। তাতে হয়ত ভাল হত। কিংবা খারাপ। সবই এখন সংখ্যাগাণিতিক সম্ভাবনা। নয়ত অজস্র টাকা খরচ করেও চন্দ্রা বিকলাঙ্গ হয়ে বাড়ি ফিরল কেন? বহু টাকা কর্মীরাই যোগাড়যন্ত্র করে, অবশ্য বাবা পাইপয়সা ফেরত দেয়। তার জন্য আপোসও করতে হয়—যে বাড়ি সে ত্যাগ করেছিল সেই পৈতৃক সম্পত্তির ওপর অধিকার নিয়ে, বিক্রি করে টাকা শোধ হয়—বাবার তো কোনও কালে কোনও সঞ্চয় ছিল না—বাবা দলীয় অন্নদাস। পার্টি থেকে পাওয়া 'ওয়েজ' দিয়ে সংসার চালিয়ে এসেছে। ইদানীং অবশ্য চন্দ্রার চাকরির সৌজন্যে সংসারে সাচ্ছল্য এসেছে—কিন্তু মা সেটা দেখে যেতে পারেনি। যাই হোক, প্রাইভেট হাসপাতাল থেকে যে সুস্থতা ফিরে পায় তার জন্য তাকে মাতৃত্বের ভবিষ্যৎ বিসর্জন দিতে হয়। ভুল অপারেশন—নিছক ভুল। দীর্ঘদিন ভুগে ওঠার পর সে জীবন শক্তি ফিরে পায়—কিন্তু তার প্রজননক্ষমতা কোনওদিনই ফিরে আসবে না। অবশ্য তার কাছ থেকে পুরো ঘটনাটিই গোপন রাখার চেষ্টা করা হয়; কিন্তু এমন অনেক কথাই তার কাছে স্বাভাবিক হাজির হয় যা তার জানার কথা নয়। আর এ তো তার নিজের জীবনের প্রশ্ন।

জীবনের প্রশ্ন জটিল হতে বাধ্য। সে যে একথা জানে তা সে কাউকে জানায় না। এমনকী মাকেও না। মারা যাওয়ার আগের বছর মা বহুবার তার বিয়ের কথা বলেছে। সে হেসে এড়িয়ে গেছে 'আমরা বয়স কত হল মা? তাছাড়া, চাকরি বাকরি পাই, তারপর দেখা যাবে।' মার কাছে অপরাধী থাকতে হয়নি। মার মৃত্যু তাকে বাঁচিয়েছে। বাবার ধর্মসংকট হয়নি। মার মৃত্যুটি নিছক দুর্ঘটনায়। হাসপাতাল নার্সিংহোম কিছুই করতে হয়নি। করতে হলে কী হত?

ধরা যাক, চন্দ্রা মাঝে মাঝেই নিজের মনেই খেলে, ধরা যাক মার খুব অসুখ করেছিল। তা মা প্রায়ই অসুস্থ থাকত, কিন্তু ডাক্তার-বদ্যির ওপর একটা চাপানো অবিশ্বাস প্রকট করত। সংসারের খরচ কমানো একটা বড় কথা, সংসারের সবার শেষে মা তার নিজস্ব প্রয়োজনগুলিকে স্থান দিতে গিয়ে কখনওই প্রায় কিছু পায়নি। কিন্তু শুধু তা-ই নয়, মা না থাকলে সংসার চলা কঠিন ছিল। ওই সামান্য টাকায় মা কীভাবে সবকিছু চালিয়ে নিত তা ভাবলে অবাক না হয়ে পারা যায় না। মার নিজস্ব ছকে যেভাবে সংসার চলত, মার অনুপস্থিতিটা সেখানে সংসারের পক্ষে ভয়াবহভাবে দেখা দেবেই—অন্তত মা তেমনটাই ভাবত। কিন্তু কেউই অপরিহার্য নয়, মা মারা যাবার পর সংসার তো চলছে। চন্দ্রা চালাচ্ছে, বাবাকে একটুও বাড়তি দায়িত্ব নিতে হয়নি। যে কথা ভাবা—বাবা কী করত? বাবা কি মাকে সরকারি হাসপাতালে পাঠাত? না কি প্রাইভেট নার্সিংহোমে? বাবা প্রথমটাই করত। কিন্তু তাতে খুব একটা সমস্যা হত না—বাবার স্ত্রী হিসেবে মা সরকারি হাসপাতালে যতটা ভাল সম্ভব ততটা ভাল চিকিৎসাই পেত। এবং যদি না-ও পেত, তাহলেও বাবার কি খুব ভাবান্তর হত? হয়ত হত। হয়ত না। কল্পিত একটা সমস্যা নিয়ে বেশিদূর যাওয়া কঠিন।

কিন্তু বাস্তব যে সমস্যাটি, নিজের চিকিৎসা, সেক্ষেত্রেও বাবার আত্মবিশ্বাসের মাত্রাটি চন্দ্রা স্পষ্ট বুঝতে পারে না। বাবা সরকারি হাসপাতালেই চিকিৎসা করতে চায়। কিন্তু সেটা হাসপাতালের ওপর আস্থা থেকে নাকি নিজস্ব আদর্শের প্রতি দায়বদ্ধতাটিকে স্পষ্টতর জানানোর সুপ্ত অহমিকা থেকে তা খুব নিশ্চিত নয়। কিন্তু এ সময়ে সরকারি হাসপাতালে ভর্তি হওয়ার জিদটাই বাস্তব। চন্দ্রা তাকে সম্মান করে, কিন্তু সে ভয় পায়। তার ভয় অন্যদের কাছ থেকে সমর্থিত হয়।

'কিন্তু সরকারি হাসপাতালের অবস্থা কি আপনি জানেন না?' দীপেন ক্ষুব্ধ।

'জানি। কিন্তু সৃষ্টিই হোক বা লয়, সে তো আমাদেরই। তার দায় আমি যদি না নিই তাহলে অন্যদের নিতে বলি কিসের জোরে?'

'আপনার প্রাণের মূল্য অনেক বেশি। অনেক কিছু নতুন করার জন্যই আপনাকে দরকার। সামনে অনেক কিছু বাকি পড়ে আছে তা কি আপনার অজানা?'

বিভাসকাকু আবেগঘন। জেলা নেতৃত্বের যদিও এমন আবেগ মানায় না।

'আর রাধু মন্ডলের জীবনের দাম বুঝি কম ছিল? সে মরে যেতে তার সংসারটাই উজাড় হয়ে গেল। ঠিক চন্দ্রার বয়সি মেয়েটি, আমরা তার জন্য কিছু করতে পারলাম? আর যদি করতামও রাধুর জীবনের বিকল্প তো তা হতে পারত না।' বাবার দৈহিক কষ্টকে ছাপিয়ে যায় তাঁর ব্যক্তিগত প্রীতি, টান। বিড়বিড় করে বলেন, 'কী চমৎকার মানুষ ছিল! কী অসাধারণ কর্মী!' চন্দ্রার মনে প্রশ্ন—রাধুকাকা যদি অসাধারণ কর্মী বা চমৎকার মানুষ না হত তাহলেও কি বাবা এমনটা ভাবতে পারত? ঠিক, রাধুকাকা লড়াইয়ের ময়দানে সবার আগে, রাধুকাকা বাবার অনেক কাজে পথপ্রদর্শক, কিন্তু সে সব যদি না হত তাহলেও কি প্রায় বিনা চিকিৎসায় রাধুকাকার মৃত্যুটা মেনে নেওয়া যায়? চমৎকার মানুষ বা অসাধারণ কর্মী যা-ই হোক রাধুকাকা ছিল খেতমজুর—তার জীবনের দাম অন্য খেতমজুরের জীবনের দামের চেয়ে যে বেশি হয়নি তাতে হয়ত বাবার শ্লাঘা আহত হয়েছে—রাধুকাকা তারই জায়গায় থেকে গেছে, ওপরে ওঠেনি বা নীচে নামেনি।

'দেখুন এত সেন্টিমেন্টাল হলে জগৎ চলে না। আমরা তো চেষ্টা করছি। নানান পথ খোঁজা হচ্ছে। সমস্যাটা তো বিশ্বজুড়ে। পশ্চিমবঙ্গকে আলাদা করে দেখলে তো চলবে না। ...এই তো পাড়াতে একটা পলিক্লিনিক খোলা হল। গরিব লোকেরা কত সাহায্য পাচ্ছে।' বিভাসকাকু চরম বাস্তববাদী।

'গরিবরা নয়, মধ্যবিত্তরা পাচ্ছে। তোমার পাড়ায় ক'টা গরিব লোক থাকে? আর, ঠিক করে বলো তো পলিক্লিনিক খোলাটা কি খুব বুক বাজিয়ে বলবার মতো একটা ব্যাপার?' বাবার কষ্ট বাড়ে। শিরা ফুলে ওঠে। দীপেন তাঁকে কথা বলতে বারণ করে। উত্তেজনা ক্ষতিকর। কিন্তু তাঁর কাছে সেই সময় তাঁর বক্তব্যটি জরুরি মনে হল, 'অধিকার না খয়রাত এখনও যদি এ প্রশ্নের মীমাংসা করতে হয় তাহলে রাজনীতি করে কাজ নেই বিভাস। প্রাথমিক কর্তব্যকে কখনওই অন্য রকম শুভেচ্ছা থেকে মুক্তি দেওয়া চলে না, এ বোধটুকু লোকে আমাদের কাছ থেকে আশা করেছিল।'

সোমনাথকাকু কম কথার লোক। এতক্ষণ চুপচাপ ছিলেন। বিড়বিড় করে শুধু বলেন, 'এ পাগল লোককে নিয়ে কিছু করার নেই। পড়ে আছে মান্ধাতার আমলের আইডিয়া নিয়ে।'

★

কী আর করা যাবে সোমনাথকাকু? বিভাসকাকু? আরও আরও কাকুরা জেঠুরা? বাবা তো সেই মান্ধাতার আমলের আদর্শের টানে জীবন শুরু করেছিল। মাঝারি চাষির ছেলে, পিছন থেকে টান ছিল—মধ্যচাষির টান—যে টানে সবচেয়ে কাছের শত্রুই হল খেতমজুর। অথচ কলেজে পড়তে গিয়ে কী যে মাথায় ঢুকল—যা স্বাভাবিক হতে পারত, তুলনামূলকভাবে মেধাবী ছাত্র হিসাবে একটা যাকে বলে ভদ্র চাকরি নিয়ে, যাকে বলে, ভদ্রলোকের জীবনযাপন করতে পারত। কিংবা ভালভাবে চাষ করতে পারত, তারপর ব্যবসা—সুযোগ তো কত না বেড়েছে—বাবার পুঁজির অভাব ঘটত না—আর্থিক, সামাজিক কোনও পুঁজিরই না—বংশপরম্পরায় এ বংশ সুবিধাজীবী, সুযোগকে আরও প্রসারিত করে নিতে বড় বেশি মেহনত করতে হত না—সেই চল্লিশ বছর আগে শত্রুপক্ষ হিসাবে শুরুও যদি করত এতদিনে স্বাভাবিক মিত্রপক্ষে চলে যাওয়াটা অনিবার্য ছিল। কিন্তু বাবা কোনও দিকেই না গিয়ে খেতমজুরদের সংগঠিত করতে লেগে গেল। ঠাকুরদা বলেছিলেন, 'লেখাপড়া শিখিয়ে বিভীষণ তৈরি করলাম।' আর ত্যাগের প্রতিমূর্তি হিসাবেই শুধু নয়, বাবুদের বাড়ির এই তরুণকে মজুরশ্রেণি দেখেছিল শত্রুপক্ষ থেকে ছিনিয়ে আনা মিত্র হিসাবে—এটাই ছিল একটা জয় এবং ঠিক একারণেই রাধুকাকার চেয়ে এবং অন্য অনেকের চেয়ে যোগ্যতার দিক দিয়ে খুব এগিয়ে না থেকেও বাবার জনপ্রিয়তা চূড়ায় পৌঁছয়—তাছাড়া বাবা অন্যভাবে হাতিয়ার সমৃদ্ধ—সাংগঠনিক অপরিহার্যতা হিসাবে শিক্ষার অধিকার বাবার আয়ত্তে ছিল।

বাবা মান্ধাতার আমলের সব স্বপ্ন দেখছিল। স্বপ্নগুলো ভাঙতে দেখেছে—কিন্তু নতুন নতুন স্বপ্ন গড়ার প্রকৃত অথবা ছদ্ম উচ্চারণে বাবাকে দৃঢ় মনে হত—ভাঙা বা মচকানোর কোনও লক্ষণই দেখা যায়নি। আবার মধ্যচাষি বাড়ি থেকে আসা হিসাবি রক্তগুণও হয়ত বাবাকে স্থির রেখেছিল। সময়ের গতি বুঝতে পারার ক্ষমতা বাবার ছিল। অতএব যা কিছু করতে পারার সম্ভাবনা তা সে তার এক চিরায়ত পরিমণ্ডলের মধ্যেই করতে পারার ব্যাপারে নিঃসন্দেহ ছিল—যা করতে না পারা তা এর বাইরে গিয়ে হবে বলে সে বিশ্বাস করেনি। সব ভাঙাচোরা নিয়ে সে একটা কিছু বিশ্বাস গড়ে নিয়েছে। কাছের লোকরাই শুধু জানত, যেমন চন্দ্রা, অবরে-সবরে তাও, স্বপ্ন ভেঙে কেমনভাবে তার স্বপ্নের ইঁট কাঠ সিমেন্ট চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়া নিয়ে বাবা কত সচেতন ছিল। আর কারা কারা সেই সব ছড়িয়ে পড়া মালপত্র কুড়িয়ে নিয়ে গিয়ে সত্যিকারের মহল বানাচ্ছে তাও তার অজানা ছিল না। সোমনাথকাকু আপনিও তো বানিয়েছেন। বিভাস কাকু আর আর কাকু, জেঠু অন্যরা আপনারাও তো বানিয়েছেন। আর আপনাদের সেই মহল একেবারে জীবন্ত—প্রজননশীল। নতুন নতুন স্বপ্ন দেখায়—নতুন নতুন বাস্তব গড়ে দেয়। আর বাবা? অসহায়তা ও বিশ্বাস, নিষ্ঠা ও আপোষ, উত্তরণ ও অবস্থানের টান এইসব যৌগিক, সর্পিলতার পথ ধরে বাবা তার মতো করে এগোচ্ছে।

বাবা তো এরকমই। বাড়ি ছেড়েছিল সেই কবে? কোন যৌবনের প্রারম্ভবেলায়। সারাক্ষণের কর্মী মানে সারাক্ষণেরই। প্রৌঢ়ত্বের চৌকাঠে সব কিছু যখন অনেক থিতু এবং বয়সও কিছুটা স্থিরতার দাবি নিয়ে হাজির হয়েছে তখন, এবং কিছুটা সহসাও বটে, বাবা ঘর বাঁধল। ততদিনে শহরে। বড় নেতা, অতএব গ্রাম থেকে আর কাজকর্ম সামলানো যায় না। কলকাতার কাছের এই শহর অবশ্য অনেক দিক দিয়েই সুবিধাজনক। কলকাতা ও মফস্সলের মধ্যে যোগসূত্র চমৎকার—তাছাড়া সস্তা। সে কারণে হয়ত বাবা কখনও কলকাতা যেতে চায়নি। চায়নি বলে চন্দ্রার অসুবিধা হয়েছে খুব, বিশেষত কলেজে পড়ার সময়, কিন্তু মানিয়ে তো গেছে। এ শহরেই বাবা কাটিয়ে দিল প্রায় তিরিশ বছর।

একশো টাকা ভাড়ায় বাড়িটা পেয়েছিল—একজন সমর্থকের বাড়ি। তিনি পরে একা হয়ে যান। ছেলে বিলেত চলে যায়। স্ত্রী মারা যান। ভদ্রলোক একরকম জোর করে

বাবাকে বাড়িটা দিয়ে যান। যান মানে, তিনিও গত। 'সর্বহারা থাকা হল না। একটা বাড়ির মালিক হয়ে গেলাম।' বাবা ঠাট্টা করে বলেছিল। কিন্তু বাস্তবিকই কি বাবা কখনও সর্বহারা ছিল? অর্থ না-ই থাক, বাবার তো সম্পদের অভাব ছিল না—বিপুল সামাজিক পুঁজি। নাম, নেতৃত্ব, ক্ষমতা।

বাবা-মার বিয়েটা কাকতালীয়। শহরেরই এক কোণার মেয়ে তার মা। বাবার মনে প্রেম-ভালবাসা তেমনভাবে কখনও জেগেছিল কি না জানা নেই—বাবা কাউকে বলেনি, আর এসব তো মাইক ফুঁকে বলবার কথা নয়। মার সঙ্গে কোনও পূর্ব-পরিচয় ছিল না। কোনও এক ছুতোয় মার জন্য সম্বন্ধ করা পাত্র বিয়ের পিঁড়ি ছেড়ে উঠে যায়—বাবা উদ্ধারকর্তা হয়। আচ্ছা বাবা যদি সেখানে না থাকত? সব কিছু অন্যরকম হত। অথবা হয়ত হত না। মাকে ছাড়া যেমন চলে যাচ্ছে, তেমন বাবা না থাকলেও মার চলে যেত। যেত কি? কিছুই নিশ্চিত বলা যায় না।

বাবার অবশ্য কিছু মনস্তাপ ছিল। মায়ের কোনও কিছুতে খামতি ছিল এমন মনে করে নয়। মনস্তাপ এই জন্য যে বাবার মনে হয়েছিল সে মাকে করুণা করেছে। সেইভাবে সে মাকে অন্যরকম চোখে দেখেছিল নাকি? হবেও বা। ভাল কি বেসেছিল? হতে পারে। আবার না-ও হতে পারে। বাবাকে সে বরাবর রহস্যময় মনে করে এসেছে। কখনওই খুব খোলামেলা ছিল না। থাকলে অবশ্য এত ওপরে উঠতে পারত না—সেটা আগে জেনেই গিয়েছিল এবং নিজের সঙ্গে একটা মীমাংসা করে নিয়েছিল। হ্যাঁ সোমনাথকাকু, আপোষই বলা যায়। যে অনাপোষি বাবাকে আপনারা জনসমক্ষে তুলে ধরেন তা তো সে নয়। হলে বহুকাল আগেই আপনাদের সঙ্গ ত্যাগ করত।

বাবা অনেক কিছুই জানত যা সে মন থেকে মেনে নিতে পারত না। কেননা বৃহত্তর স্বার্থ। আর, শ্রেণি-বিভাজিত সমাজের নানা টুকরো-টাকরা নিয়ে আমাদের চলতে হয়—অতএব ছোটখাটো অনেক কিছুকেই অন্‌দেখি করে দিতে হয়, নজর সরিয়ে নিতে হয়। জানেন কাকুরা, জেঠুরা, আমার বাবা কতখানি চোখ বন্ধ রাখতে পারত? অ-নে-ক খানি। দলীয় স্বার্থ ক্ষতিগ্রস্ত হোক তা সে প্রাণ গেলেও চাইতে পারত না। তাই যখন বাবার বারো বছরের বালিকা কন্যাকে আদর করার ছুতোয় পরিতোষজেঠু যেখানে সেখানে হাত দেন, সেই মেয়ে মেয়ে-পরম্পরার জ্ঞানে অস্বস্তি পায়, দুঃখ পায় এবং মার কাছে কেঁদে ভেঙে পড়ে, আর মা স্থিরকণ্ঠে হয়ত জীবনে প্রথমবার—বাবাকে নির্দেশ দেয়, 'পরিতোষদা যেন বাড়িতে না আসেন', তখনও বাবা নির্বিকার। পরিতোষ জেঠু তারপরও বাড়িতে এসেছেন—বাবার মনে হয়েছিল 'পরিতোষদাও তো সমাজেরই অংশ। একটু আধটু পদস্খলন তো ঘটতেই পারে।' বাবা কি খুব বিশ্বাসের জায়গা থেকে বলেছিলেন? নাকি পরিতোষজেঠুর প্রতাপের তাপে? না কি সেই বৃহত্তর স্বার্থে?

সঠিক জানা নেই। তবে সেই কন্যা পরিতোষজেঠুর কাছে কৃতজ্ঞ। পরিতোষজেঠু তাকে অনেক কিছু এত আগাম দেখিয়ে দিলেন যা সে বই পড়ে জানতে পারত না। ব্যক্তির নিজস্ব অভিজ্ঞতাকে মূল্য দিতে সে তখনই শিখে গিয়েছিল।

★

যন্ত্রণা বোধহয় কিছুটা কমেছে। বাবা অনেকখানি শান্ত। উঠে বসে জল খেতে চায়। এই রোগযন্ত্রণার মধ্যেও স্বয়ম্ভরতার পরাকাষ্ঠা। চন্দ্রা তাড়াতাড়ি উঠে জল দেয়। বাবা বালিশের তলা হাতড়ায়। 'না, বিড়ি নেই। ফেলে দিয়েছি।' চন্দ্রা হেসে বলে, 'আর তুমি বিড়ি খেতে পাবে না'

'একটা দে মা। সারাদিন তো খাইনি।'

'হ্যাঁ। সারারাতও খাবে না।' ছদ্ম গাম্ভীর্য তারপরই কোমল হয়ে ওঠে 'অনেক রাত হল। এখন একটু ঘুমোবার চেষ্টা কর বাবা। এখন একটু ভাল লাগছে বাবা?' সে বারবার বাবা কথাটি ফিরিয়ে ফিরিয়ে বলে যায়। প্রয়োজনে অপ্রয়োজনে।

'হ্যাঁ মা লাগছে। অনেক ভাল লাগছে। তোর বড় পরিশ্রম যাচ্ছেরে। যা তুই ঘুমো। সকালে তো অফিস যাবি।'

'আমার জন্য ভেব না বাবা। আমার কোনও কষ্ট হচ্ছে না। তুমি ওঠো বাবা।'

সেরে উঠতে গেলে এখন অনেক কিছু করতে হবে। রোগ বেশ খানিকটা জাঁকিয়ে বসেছে। আগে তেমন পাত্তা দেয়নি। বেশ বাড়াবাড়ি হওয়ার আগে পর্যন্ত সহ্য করে গেছে। অসহ্য বোধ হওয়ায় নিজে গিয়ে আউটডোরে লাইন দিয়ে ডাক্তার দেখিয়েছে। ডাক্তার দেখাতে গিয়ে বিপদ—প্রচুর পরীক্ষা নিরীক্ষা এবং ব্যায়বহুল। ডাক্তার দেখাতে গিয়েই রোগের কথা জানাজানি হয়—চেনা লোকের তো অভাব নেই, শুভানুধ্যায়ীরও নয়। ফলে দলের লোকেরা ধরেবেঁধে কলকাতা নিয়ে গিয়ে পরীক্ষানিরীক্ষা করিয়ে এনেছে। বাবা লাইন দিয়েই করাতে চেয়েছিল। 'তাহলে আর এ জন্মে হবে না', সোমনাথকাকুই বলেছিল। দীপেনও বলেছিল। এমনকী স্থানীয় বিধায়ক তরুণকাকুও।

'কেন হবে না?' সেই তর্ক। 'যদি এত লোকের চিকিৎসা লাইন দিয়ে হয় তাহলে আমারও হবে। না হলে না হবে। ডাক্তারখানা আবার আলাদা আলাদা হবে কেন? লোকের জীবনের প্রশ্ন।' বাবা হাসপাতাল না বলে ডাক্তারখানা বলে।

সোমনাথকাকু কোনওকালেই বিতর্কের ধার ধারে না। 'যা করার কাজে করতে হবে, বেশি কথা বলে লাভ কী?

স্পষ্ট জীবনদর্শন। সে জন্যই তিনি এত সফল। ফটাফট ঝুপড়ি উচ্ছেদ, বাড়ি খালি করা, বাড়িতে লোক ঢুকিয়ে দেওয়া, ধর্মঘট ডাকা বা ভাঙা—সব কিছুতেই তিনি বেজোড়। 'ভালয় ভাল না গেলে জাস্ট পাঁজাকোলা করে তুলে নিয়ে যাওয়া হবে।' বাস্তবিকই বাবা কী করবে বুঝে ওঠার আগেই অ্যামবুলেন্স এসে যায়। সোমনাথকাকু বাবাকে আশ্বস্ত করে, 'সরকারি ডাক্তারখানাতেই যাচ্ছি।' ডাক্তারখানা কথাটার ওপর জোর দিয়ে সোমনাথকাকু কী বোঝাতে চাইল?

পরীক্ষানিরীক্ষাগুলিতে টাকা লাগেনি—কিন্তু প্রভাব লেগেছে। সামান্য কিছু টাকা খরচ অবশ্য হয়েছে। 'পার্টির লোকের জন্য এ দায়িত্ব পার্টির' বলার পরও অবশ্য চন্দ্রা সে টাকা জোর করে মিটিয়ে দিয়েছে।

পরীক্ষানিরীক্ষার পর বড় ডাক্তার দেখেন। অপারেশন করতে হচ্ছে। বড় ডাক্তার সমর্থক হিসাবে পরিচিত—অবশ্য এখন তো সমর্থকের অভাব নেই—যেখানেই যাও সেখানেই সমর্থক। তা সেই সহানুভূতিসম্পন্ন ডাক্তার অপারেশনের সাফল্য নিয়ে কোনও খারাপ ইঙ্গিত না দিলেও পরামর্শের ঢঙে বলে গেলেন, 'সম্ভব হলে ভেলোর বা ব্যাঙ্গালোর নিয়ে যান।'

তারপর থেকে বাবার মেজাজ গরম। এবং রোগে চড়া। এমনিতেই তো দলে দলে লোকে ভেলোর ছুটছে। ব্যাঙ্গালোর ছুটছে। বিদেশও ছুটছে। চিকিৎসা তো নয়, স্টেটাস দেখানো। বাবার জিদ যা হবার এখানেই হবে।

অপারেশনের তারিখ ছিল দু'সপ্তাহ পর। কিন্তু বিকেল থেকে যে অবস্থা দাঁড়িয়েছে তাতে এক্ষুনি এক্ষুনি কিছু একটা না করলেই নয়। এবং কিছু করা নিয়েই তর্ক-বিতর্ক। বাবাকে বাঁচানো দরকার। বাবা তো আর রাধু মন্ডল নয়। বাবা এখনও তুখোড় এক পাকা মাথার সংগঠক। জেলাকে চেনে নিজের চেয়েও বেশি। এলাকায় প্রবল জনপ্রিয়। বিশেষত প্রাচীনপন্থী বলে পরিচিত হয়ে যাওয়াটি দলের নবীনপন্থা নিয়ে সংশয়ীদের ওপর প্রভাব ফেলতে কাজে লাগে। 'এই তো দেখুন আমাদের...।'

চন্দ্রার এ কথা ভাবতেই কেমন কষ্ট হয়। যে-বাবা গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে খেতমজুর আন্দোলনের নেতা, যে বাবা জীবনটাই তুলে দিয়েছে সমাজের জন্য—অবশ্য সে সংশয়ী, সমাজ ও দলের মধ্যে সে পার্থক্য করে, বাবা করে না—সেই বাবার এমন অদ্ভুত ভূমিকায় সে পীড়িত বোধ করে। কর্তার ইচ্ছায় কর্ম যদি করতে হত তাহলে তো আরও অনেক কিছু করার ছিল—তার জন্য জীবন দেওয়ার দরকার কী? বাবা এখন শুধু নীতির ঘোষক মাত্র; নীতিপ্রণয়নে তার কোনও ভূমিকা নেই, মাথা নাড়া বা হাত তোলা ছাড়া, বা বড় জোর নিজের মনে বিড়বিড় করা ছাড়া; আর নীতি রূপায়ণের সামর্থ্য বা মানসিকতা কোনওটাই নেই। কিন্তু কে না জানে ঘোষকের ভূমিকাটি গুরুত্বপূর্ণ?

বাবা চলো সব ছেড়ে ছুড়ে দিয়ে আমরা অন্যভাবে বাঁচি। এ আমার কমবয়সি আবেগ হতে পারে। কিন্তু বাবা গো, আবেগটার কি কোনও দাম নেই? তুমি যে তুমি, আবেগ ছাড়াই কি তুমি এরকম? যদি মনের টানটাই না থাকত, শুধু কি পুঁথি পড়া জ্ঞানে তুমি এমন ঝাঁপিয়ে পড়তে পারতে? আর কমবয়সি আবেগ যে কত সুদূরপ্রসারী হতে পারে তার কথা তো তোমার কাছ থেকেই শোনা। সেই যে তোমাদের গ্রামের বড়লোক ক্ষমতাবান...আর সেই হতদরিদ্র অচ্ছ্যুত খেতমজুররা...সেই কোন ছোটবেলায় তোমার চোখের সামনে জেগে ওঠে এক বীভৎস পৃথিবী যেখানে বড়লোকের জুতো গরিবদের পিঠের কালো চামড়াকে বেগুনি করে দিয়েছিল...আর তোমার বালক মনে বিদ্রোহ। বাবা গো একবার মনে করো। কিন্তু তারপর বাবা, তুমি কেন এরকম হয়ে গেলে?

কেন আমার বাবাকে লোকে শিখণ্ডীর মতো ব্যবহার করবে। কেন আমার বাবা আমার বাবা থাকবে না? বাবা! ও বাবা!

তন্দ্রার মধ্যে বাবা দেখতে পান অনেকগুলি মুখ। মৃতা পত্নী, চন্দ্রা, পরিতোষদা, বিভাস, সোমনাথ, দীপেন, রাধু মন্ডল। রাধু প্রশ্নবাচী তাকিয়ে আছে। স্থির। পরিতোষদার মুখে সবকিছু হাতছাড়া হওয়ার ভয়ে আগলে রাখার বীভৎস আকুতি।

সোমনাথ নিস্পৃহতার ভান করে; কিন্তু চিন্তা লুকোতে পারে না।

দীপেন হিপোক্রিটাসের শপথ পড়ে যাচ্ছে। বিভাস ভুলে যেতে চাইছে শিখদের ওপর নিধন চালানোর সময় তার অসমসাহসী কৃতিত্ব; বিভাসের মুখে অনন্য ভীরুতা।

চন্দ্রা যেন অসংখ্য মেঘের ভেতর নিষ্প্রভ জ্যোৎস্নাময়ী।

চন্দ্রার ভবিষ্যৎ কী?

এত বছর পর মনে পড়ছে চন্দ্রার ভবিষ্যৎ কী? আমাকে দয়া দেখিয়েছিলে বলে সারাজীবন মনস্তাপে ভুগলে। ওগো, আজ আমি সত্যিই দয়াভিক্ষা করছি। আমার মেয়েটার কী হবে? এখনও যে বালিকামাত্র। তোমার গুরুগম্ভীর সংসারে তার মুখে একটা গাম্ভীর্যের ছাপ পড়লেও বা। সবে জীবন শুরু করেছে। চাকরিতে ঢুকেছে বটে, কিন্তু চাকরি-ই তো সব নয়—ওকে কে দেখবে? না গো, পরিতোষদাদের ভয় আমি পাচ্ছি না। সে চন্দ্রা নিজেই নিজেকে রক্ষা করতে পারবে।

কিন্তু সে তো দেহে? মনের কী হবে? তার ব্যক্তিজগতের কী হবে? ওগো দয়া করো।

বাবার ধড়মড় করে উঠে বসার শব্দেই চন্দ্রা জেগে ওঠে। সে মাদুর পেতে মেঝেতে শুয়েছিল। নিজের ঘরে যায়নি।

'কী হল বাবা গো? জল খাবে? কষ্ট হচ্ছে বাবা?'

'না রে কষ্ট হচ্ছে না। দে একটু জল দে। তোর মাকে স্বপ্ন দেখলাম।'

চন্দ্রা বাবার মাথায় হাত বুলিয়ে দেয়। আস্তে আস্তে বলে, 'বাবা, একটা কথা বলি?'

'হ্যাঁ মা, বল। তোর কথা তো শোনাই হয়নি কখনও।'

'ছিঃ বাবা ও কথা বোলো না। আমার মন খারাপ হয়। না বাবা, যে কথা বলেছিলাম', সে বাবার কানের কাছে প্রায় ফিসফিস করে বলে, যেন দেওয়ালের টিকটিকিটাও না শুনতে পায়, 'চলো আমরা বাইরে গিয়ে চিকিৎসা করাই। লক্ষ্মী বাবা আমার। আমার একটা কথা শোনো। খরচের জন্য ভেব না। আমি তো লোন পেয়ে যাব। তোমাকে কারও দয়া নিতে হবে না।

'রাধুর তো কেউ ছিল না যে টাকার জোগাড় করতে পারত।' কথা ক'টি খুবই অস্পষ্ট।

চন্দ্রা মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে থাকে। নীরবে। কিন্তু তার মধ্যেই বাবার অন্তরাত্মায় ধ্বনিত হয়—

তোমার বহিরঙ্গে কোনও আঁচ পড়বে না বাবা। তুমি, তোমার বেঁচে থাকাটাই সব, লোকে দেখতে যাবে না তুমি কী ভাবে বেঁচে এলে? তা যদি দেখত, তাহলে ভাব তো ক'জন বিধায়ক নির্বাচিত হতে পারত? তাছাড়া এসব নিয়ে ভাববার সময়ই বা কার আছে? বহু বড় বড় জয়ের তলায় তোমার এই ক্ষুদ্র পরাজয় চোখেই পড়বে না...শুনতে পাচ্ছ জয়ধ্বনি? ...রাধুকাকার যন্ত্রণা বহুকাল চাপা পড়ে গেছে...কেউ শুনতে পাবে না বাবা।

অস্বস্তি হয়। কিন্তু চন্দ্রার সরব হয়ে ওঠাতে শান্তি পান—কিছুটা বা আত্মসন্তুষ্টি। 'বাবা আমার কাছ থেকে তোমাকে কিছু নিতে হচ্ছে না। আমি তো তোমারই মেয়ে, তুমিই তো আমাকে আমি করে গড়েছ। আমি যে এই সহস্র সূর্যের উদ্দীপ্ত অন্ধকারে হারিয়ে যাওয়ার সুযোগটুকু নিইনি তা তো আমার নিজস্ব পছন্দের ব্যাপার নয় বাবা। তোমারই সুরক্ষাবলয়ে আছি বলেই তো...'

জি টি রোডের ওপর দিয়ে ছুটে চলা ট্রাকের আওয়াজ। বাইরে ফিকে অন্ধকার। মোড়ের ল্যাম্পপোস্টের আলোটা ভাঙা। পাশের বাড়ির পাঁচিলের ধারে নারকেল, আম আর লেবুগাছের ভিন্ন ভিন্ন পাতার ছায়ায় ভিন্ন ভিন্ন ছাপ। আকাশে অজস্র তারা—তার মাঝে এক ফালি চাঁদ তার নিস্প্রভতা নিয়েও বিপুল উদ্যমে চলে ফেরে।

বাবা ঘুমিয়ে পড়ে। চন্দ্রা পারে না। তার ব্যক্তিগত বোধ তাকে অন্য এক সামাজিক তাড়নায় ছিন্নভিন্ন করে। এই মুহূর্তে ঘুরপথ পাওয়া গেলেও সর্বদা সেটা পাওয়া যাবেই এমনকী নিশ্চয়তা আছে? সে নিজেই এক প্রশ্নচিহ্ন হয়ে নিজের সামনে দাঁড়ায়।

ভাঙা পথের রাঙা ধুলায়

সুখরঞ্জন সেনগুপ্ত

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

ওই দু'জনের মধ্যে একজন অত্যন্ত প্রথিতযশা অধ্যাপক। তাঁর কাব্যময় বাচনভঙ্গি, তাঁর শব্দচয়ন ও বাক্যবিন্যাস ছিল শুনবার ও মনে ধরে রাখার মতো। প্রৌঢ়ত্বের দরজায় পৌঁছেও চলনে ও বলনে তিনি ছিলেন প্রখর তরুণ। ওই ছাত্রী এই অধ্যাপকের ক্লাস-লেকচারে মুগ্ধ বিস্ময়ে আপ্লুত হয়েছিল। সে ক্লাসের বাইরে করিডরে, প্রফেসরস কমন রুমে গিয়ে পাঠ্য বিষয়ে ওই অধ্যাপকের সঙ্গে কথা বলত প্রায়শই। পরে সে সংশ্লিষ্ট অধ্যাপকের বাড়িতে আসা-যাওয়া করতে লাগল এবং অধ্যাপকের স্ত্রী ও মেয়ের সঙ্গেও ছাত্রীটির অন্তরঙ্গতা জন্মাল। কিন্তু এম এ ফাইনাল পরীক্ষার আগে অধ্যাপক তাঁর এই ছাত্রীকে অন্য কোনও স্থানে দেখা করতে বললেন। এখানেই মেয়েটির শ্রদ্ধানুভূতি ধাক্কা খেল। সে এই অধ্যাপককে এড়িয়ে যেতে আরম্ভ করল। পরিণতিতে মেয়েটির অভিযোগ, Political Thoughts in Ancient India পেপারে তাকে ১০/১২ নম্বর কম দেওয়া হয়েছে। ফলে সে First Class থেকে বঞ্চিত। আমি বেঞ্চে বসে শুনছি ডি এন ব্যানার্জি ওর নাম, রোল নম্বর চেয়ে নিলেন এবং মেয়েটিকে কয়েকদিন পরে দেখা করতে বললেন। এরপর মেয়েটি বেরিয়ে যাবার কয়েক সেকেন্ডের মধ্যে আমি ঘরে ঢুকতেই তিনি বললেন, 'তুমি তাহলে খুব কাছেই ছিলে?' আমি বুঝতে পারলাম তিনি ধরতে চাইছেন যে আমি মেয়েটির সব কথা শুনেছি কি না। আমি জবাব না দিয়ে একটু হাসলাম। আমি নোট বুক দেখে ডি এন ব্যানার্জিকে জানালাম, ইউরোপ ও মধ্যপ্রাচ্য হয়েছে, এবার এশিয়ার পরিস্থিতি। তিনি চীনের অবিরাম গৃহযুদ্ধ, জাপানের অবিশ্বাস্য অভ্যুত্থান, এশিয়া ভূখণ্ডে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সম্প্রসারণ, যুদ্ধ অবসানে চীনে ও ভিয়েতনামে কমিউনিস্ট বিপ্লবের জয়যাত্রা ব্যাখ্যা করলেন। তিনি যখন ওই বিষয় আমাকে বোঝাচ্ছিলেন, তখন তাঁর কাছে কোনও বই ছিল না। তিনি তাঁর স্মৃতি ও ক্লাসে পড়ানোর অভিজ্ঞতা থেকেই আমাকে বোঝাচ্ছিলেন।

আমি ডি এন ব্যানার্জির ঘর থেকে বেরিয়ে এলাম। কিন্তু আমার চোখে তখনও ওই মেয়েটি ভাসছে। ওর অভিযোগ আমার মনে অনুরণিত হচ্ছে, সেটাই একজন রিপোর্টারের পক্ষে স্বাভাবিক। আমি আশুতোষ বিল্ডিংয়ের ডি এন ব্যানার্জির ঘর থেকে বেরিয়ে দ্বারভাঙা বিল্ডিংয়ের বারান্দায় ক্যাশ কাউন্টারের সামনে কারও একজনের সঙ্গে কথা বলছিলাম। এমন সময় বিশ্ববিদ্যালয়ের স্ট্রং রুমের (Strong Room) একজন অতি দক্ষ অফিসার অপর্ণাপ্রসাদ সেনগুপ্ত দ্বারভাঙা বিল্ডিংয়ের বারান্দা পেরিয়ে দ্রুত আশুতোষ বিল্ডিংয়ের দিকে মোড় নিলেন। আমার মনে তক্ষুনি একটা সন্দেহ উঁকি দেওয়ায় আমি অপর্ণাবাবুকে অনুসরণ করলাম। দ্বারভাঙা ও আশুতোষ বিল্ডিংয়ের ভৌগোলিক অবস্থান যাদের মনে আছে তাদের নিশ্চয়ই মনে পড়বে যে এই দুটো বাড়ির যোগসূত্র হল সিমেন্টের একটি পাটাতন। পাটাতন পেরলেই ডানহাতে Statistics বিভাগের প্রধান ড. পূর্ণেন্দু কুমার বসুর ঘর। সেটি ছাড়িয়ে বাঁদিকে মোড় নিলেই প্রথম ঘরটি ছিল ডি এন ব্যানার্জির। অপর্ণাবাবু পাটাতন পেরিয়ে ডি এন ব্যানার্জির ঘরের দিকে ঘুরতেই আমি বুঝে নিলাম যে আমার অনুমান ঠিক। বিশ্ববিদ্যালয়ের Strong Room-এ কোনও টাকা-পয়সার বালাই ছিল না। ওখানে ছাত্রদের পরীক্ষার যাবতীয় রেকর্ড সুরক্ষিত থাকত। অপর্ণাবাবু এখানে কাজ করতেন। খুব ন্যায়পরায়ণ ও দৃঢ়চেতা অফিসার বলে তাঁর সুনাম ছিল। ডি এন ব্যানার্জি অপর্ণাবাবুকে ওই ছাত্রীটির সংশ্লিষ্ট পেপারের উত্তরপত্রের খাতাটি নিয়ে আসতে বলেছিলেন। খাতাটি হাতে নিয়ে তিনি মেয়েটির লেখার ধরন পরীক্ষা করে নিলেন। পরে তিনি Ancient Indian History and Culture বিভাগের দু'জন প্রসিদ্ধ অধ্যাপক ড. বিনয় চন্দ্র সেন ও ড. কল্যাণ গাঙ্গুলিকে (এই দু'জন অধ্যাপক Political Thoughts in Ancient India বিষয়টি সম্বন্ধে যথেষ্ট ওয়াকিবহাল ছিলেন) দিয়ে খাতাটি যাচাই করে নিলেন যে মেয়েটিকে under marking করা হয়েছে কি না। এই দু'জন অধ্যাপকের মতামত মেয়েটির অনুকূলে থাকায় ডি এন ব্যানার্জি ছাত্রীটিকে 'রিভিউ' করার জন্য দরখাস্ত করতে বললেন। পরে তিনি ড. কল্যাণ গাঙ্গুলিকে দিয়ে খাতাটি

আনুষ্ঠানিকভাবে 'রিভিউ' করিয়েছিলেন। ফলে মেয়েটি আগের নম্বরের চেয়ে ৯-১০ নম্বর বেশি পাওয়াতে তার First Class পাওয়ার পক্ষে কোনও বাধা রইল না। এই ঘটনাটি জেনেও আমি খবরের কাগজে রিপোর্ট করিনি। সন্তর্পণে নিজের মনে লুকিয়ে রেখেছি। কারণ আমি রিপোর্ট করলেই বিশ্ববিদ্যালয়ের লোকেরা ধরে নিতেন যে ডি এন ব্যানার্জি আমাকে খবরটি দিয়েছেন। এতে তাঁর অমর্যাদা হত। প্রকৃতপক্ষে তিনি আমাকে এই বিষয়ে কিছুই বলেননি। কিন্তু ঘটনাটি আমি জানতে পেরেছি তাঁর সঙ্গে আমার সম্পর্কের ভিত্তিতেই। সুতরাং এটি লিখলে তাঁর কাছে আমার বিশ্বাসযোগ্যতা নষ্ট হত—আমার বিবেচনায় এটাই হল Continuity of relationship। ঠিক অর্ধশতাব্দী পরে আমি মন খুলে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের এই ঘটনাটি লিখলাম। কারণ আমার মনে হয় যে কলেজে ও বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রদের মুগ্ধ করে রাখার মতো পড়ানো নিশ্চয়ই শিক্ষকের একটি বড় গুণ। কিন্তু তা কখনওই একমাত্র গুণ হতে পারে না। ছাত্রদের প্রতি নিরপেক্ষতা এবং পরীক্ষার খাতায় ন্যায়বিচার, রাজনৈতিক ও সেক্সজনিত মতলবের সম্পূর্ণ অনুপস্থিতি অবশ্যই অধ্যাপকদের অন্যতম প্রধান গুণ বলে ধার্য হওয়া উচিত। আমি ডি এন ব্যানার্জি সম্পর্কে এতখানি কথা লিখলাম এজন্য যে ১৯১০-১২ সাল থেকে যদি বাংলার শিক্ষাপ্রসারের ইতিহাসের দিকে একবার ফিরে দেখি তাহলে অনিবার্যভাবে একথা বলতে হবে, যে উজ্জ্বল নক্ষত্রেরা বাংলাকে অর্থনীতি শিখিয়েছেন তাঁদের মধ্যে স্যার জাহাঙ্গির কয়েজি (Sir Jehangir Coyaji), স্যার মনোহরলাল, ড. জে সি সিংহ, ড. পি এন ব্যানার্জি ('মিন্টো' অধ্যাপক), ড. জে পি নিয়োগী, ড. এইচ এল দে (ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়), ড. অমিয় দাশগুপ্ত (ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়) ও ড. ভবতোষ দত্তের নাম যেমন উল্লেখযোগ্য ঠিক তেমনই বাঙালিকে যাঁরা রাষ্ট্রবিজ্ঞান বা আন্তর্জাতিক বিষয় সম্পর্কে কমপক্ষে দুটি প্রজন্ম ধরে শিক্ষিত করে তুলেছেন তাঁরা হলেন অধ্যাপক ডি এন ব্যানার্জি (ঢাকা ও কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়), অধ্যাপক পৃথ্বীশ চক্রবর্তী (ঢাকা ও যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়), অধ্যাপক সুবিমল মুখার্জি (কলকাতা ও যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়), অধ্যাপক জে কে ব্যানার্জি (কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়), অধ্যাপক রমেশ ঘোষ (কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়), অধ্যাপক সন্তোষ চ্যাটার্জি (কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়)। বাঙালিকে অনিবার্যভাবে এঁদের কথা মনে রাখতে হবে। ড. এইচ এল দে (পুরো নাম যতদূর আমার স্মরণে আছে হীরেন্দ্র লাল দে) সম্ভবত প্রথম ভারতীয় অর্থনীতিবিদ যিনি দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের অবসানের অব্যবহিত পরে আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি পান। যুদ্ধে ক্ষতিগ্রস্ত এশিয়ার দেশগুলির অর্থনৈতিক পুনর্গঠন ও সহযোগিতার জন্য যখন ECAFE ('একাফে') গঠিত হল, তখন ড. দে ওই সংগঠনের ভারতীয় সদস্য মনোনীত হন। পরে তিনি আন্তর্জাতিক অর্থ তহবিলে (IMF) ভারতীয় প্রতিনিধি নিযুক্ত হন। তাঁরই প্রচেষ্টায় অধ্যাপক অমিয় দাশগুপ্ত ও অধ্যাপক পরিমল রায় বিশ্বঅর্থনীতির প্রাঙ্গণে পদার্পণ করেছিলেন। ১৯৫০ বা তার পরবর্তী যুগে জন্ম নেওয়া বাঙালিরা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতির অধ্যাপক পরিমল রায়ের নাম হয়ত শোনেননি। এমন একজন বিদগ্ধ বাঙালি বাঙালির জীবন-ইতিহাসে বিরল। তিনি জীবনের পঞ্চাশ বছর পূর্ণ করতে পারেননি। ১৯৫১ সালে আন্তর্জাতিক অর্থ তহবিলে (IMF) ভারতীয় সদস্য থাকাকালীন অবস্থায় তিনি ওয়াশিংটনে মারা যান। তিনি 'ইদানীং' (প্রকাশক এম সি সরকার) নামের মাত্র একটি গ্রন্থ রচনা করেই বাংলার প্রবন্ধসাহিত্যে অমর হয়ে আছেন। মুজতবা আলির অতি অন্তরঙ্গ বন্ধু এই অধ্যাপক পরিমল রায় মুজতবা আলির বহু রচনায় দীপ্যমান হয়ে আছেন। বিশেষ করে নীরদ চৌধুরী সম্পর্কে এঁদের বাক্যবিনিময় বাঙালি পাঠককে হাসাতে হাসাতে মাটিতে লুটিয়ে ফেলবে। অধ্যাপক ডি এন ব্যানার্জি অবশ্য গুরুগম্ভীর পাণ্ডিত্যের মানুষ ছিলেন। দেশবিভাগের পর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে থাকার সময়েই তিনি ভারতীয় সংবিধানের খসড়ারচনা কমিটির বিশেষজ্ঞ প্যানেলের সদস্য ছিলেন। ওই সময় ওই প্যানেলের অন্যতম সদস্য ছিলেন সেই সময়কার বিশ্বের সেরা সংবিধান বিশেষজ্ঞ স্যার আইভর জেনিংস। তিনি তখন কলম্বো বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস-চ্যান্সেলার। গণপরিষদে ভারতীয় সংবিধানের ধারা ভিত্তিক আলোচনা এবং বিশেষজ্ঞ সদস্যদের বিভিন্ন মতামত সম্পর্কে অধ্যাপক ডি এন ব্যানার্জি সেই সময়কার Modern Review পত্রিকায় অনেকগুলি ধারাবাহিক লেখা লিখেছিলেন। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের আগে হেগ শহরে International Political Science Congress নামে একটি সংগঠনের পত্তন হয়েছিল। তিনি ওই সংগঠনের প্রতিষ্ঠাতা-সদস্য ছিলেন (১৯৫৮ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে রাষ্ট্রবিজ্ঞানে অনার্স কোর্স চালু হয়।)

রিপোর্টার হিসাবে আমি আমার সাংবাদিক জীবনের অভিজ্ঞতায় দেখেছি শিক্ষা ও অশ্রু ধর্ম-সম্প্রদায় ও রাষ্ট্র বৈরিতার গণ্ডিকে আদৌ গ্রাহ্য করে না। এরকম কয়েকটি নজির আমার দৃষ্টিতে প্রতিভাত হয়েছে এবং সেগুলি আমি এই প্রজন্ম ও ভবিষ্যদপ্রজন্মের বাঙালিদের জন্য রাখছি। ১৯৫৫ সালের শেষভাগে এই উপমহাদেশের ইংরাজি সাহিত্যের প্রবাদপ্রতিম অধ্যাপক অমরনাথ ঝা (Amar Nath Jha) মাত্র ৫৮ বছর বয়সে মারা গেলেন। তিনি লাহোর

গভর্নমেন্ট কলেজ, এলাহাবাদের মুয়ির কলেজে (Muir College) ও এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ে ইংরাজি সাহিত্যের অধ্যাপক ছিলেন। ১৯৩৯-৪০ সালে তিনি এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস-চ্যান্সেলারও হয়েছিলেন। তিনি যে সময়ে মারা যান সে সময় কাশ্মীর-প্রশ্নে ভারত ও পাকিস্তানের সম্পর্ক আবার এক তিক্ততম জায়গায় ছিল। রাষ্ট্রসংঘের নিরাপত্তা পরিষদে ও অন্যান্য আন্তর্জাতিক কমিটিতে দুই দেশের প্রতিনিধিদের মধ্যে ক্রুদ্ধ বাকবিতণ্ডা নিত্যদিনের সংবাদ ছিল। খবরে এমন সব কথাও শোনা যেত যে নিউইয়র্ক বা ওয়াশিংটনের দোকানে বাজারে ভারত ও পাকিস্তানি অফিসাররা মুখোমুখি হলে কেউ কারও সঙ্গে কথা পর্যন্ত বলতেন না। ওই সময় রাষ্ট্রসংঘের পাকিস্তানি প্রতিনিধিদের নেতা ছিলেন বিখ্যাত জেড এ বোখারি (Z. A. Bokhari)। এই বোখারিসাহেব ১৯৪৪-৪৫ সালে অল ইন্ডিয়া রেডিওর ডিরেক্টর জেনারেল হিসাবে সে সময়কার ভারতে সংবাদ-শিরোনামে ছিলেন (যাযাবর লিখিত 'দৃষ্টিপাত' বইটিতে এই বোখারিসাহেব সম্পর্কে কয়েকটি সুরসিক মন্তব্য আছে)। এই বোখারিরা তিন ভাই অধ্যাপক অমরনাথ ঝার ছাত্র ছিলেন। রাষ্ট্রসংঘের ভারতীয় প্রতিনিধিদলে Indian Foreign Service-এর অফিসারদের মধ্যেও অনেকে অধ্যাপক ঝার ছাত্র ছিলেন। এই ছাত্ররা সকলেই অমরনাথ ঝার আকস্মিক মৃত্যুতে মর্মাহত। রাষ্ট্রসংঘে ভারত ও পাকিস্তানের প্রতিনিধিদের মধ্যে যাঁরা তাঁর ছাত্র ছিলেন, তাঁরা তাঁদের এই প্রিয় শিক্ষকের মৃত্যুর খবর পেয়ে একে অপরের সঙ্গে যোগাযোগ করলেন। তারপর অন্যান্য বিদেশি কূটনীতিবিদদের এক অভাবনীয় বিস্ময়ে ফেলে ভারত ও পাকিস্তানের প্রতিনিধিরা যুক্তভাবে এক শোকসভার আয়োজন করে অধ্যাপক অমরনাথ ঝার জন্য সম্মিলিতভাবে অশ্রুবর্ষণ করলেন রাষ্ট্রীয় বৈরিতার গণ্ডি অতিক্রম করে। এই সময় অধ্যাপক অমরনাথ ঝার মৃত্যুর ওপর Statesman পত্রিকায় মনে রাখার মতো একটি চিঠি প্রকাশিত হয়েছিল। চিঠিটি লিখেছিলেন রাজশাহি বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস-চ্যান্সেলর ড. মামুদ হোসেন। ড. মামুদ হোসেন অধ্যাপক অমরনাথ ঝার ছাত্র ছিলেন সম্ভবত এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ে। প্রায় এক কলম দীর্ঘ এই চিঠিটির একাংশে লেখা ছিল .....Professor A N Jha is dead. But hundreds of his students shall treasure his class teaching through out their life.....একজন শিক্ষকের জীবনে এবং মৃত্যুতে এর চেয়ে বড় পাওনা আর কী-ই বা হতে পারে? ড. মামুদ হোসেন ১৯৫৬-৫৭ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে এসেছিলেন তখনকার ভাইস-চ্যান্সেলর অধ্যাপক নির্মলকুমার সিদ্ধান্তের সঙ্গে দেখা করতে। সেই প্রসঙ্গে পরে আসব।

অধ্যাপক অমরনাথ ঝার কথা লিখতে গিয়ে আর একজন অধ্যাপকের নাম মনে এল। এই উপমহাদেশের ইতিহাসে তিনি শিক্ষাজগতের চেয়ে অনেক বেশি স্মরণীয় হয়ে রয়েছেন ভারতবর্ষের এক রাজনৈতিক টর্নাডো হিসাবে। তিনি আল্লামা মাশরিকি (Allama Mashriqi), নিখিল ভারত খাকশার পার্টির জন্মদাতা। কিন্তু অধ্যাপনার জগৎ থেকে তাঁর রাজনৈতিক জগতে প্রবেশ ভারতীয় শিক্ষা জগতের যে কত বড় ক্ষতি করেছিল, তা গণিতবিদ্যার এই মহাপণ্ডিতের জীবন সম্পর্কে যাঁরা নিতান্ত অল্পই জানেন, তাঁরাও স্বীকার করবেন। ১৯৬৩ সালের আগস্ট মাসের এক দিন Morning News. পত্রিকাটি দেখছিলাম। স্বাধীনতা ও দেশবিভাগের আগে এই পত্রিকাটি কলকাতা ও করাচি থেকে যুগপৎ প্রকাশিত হচ্ছিল। এর মালিক ছিলেন এক ধনী গুজরাতি মুসলমান পরিবার, যাঁরা মহম্মদ আলি জিন্নার খুব ঘনিষ্ঠ ছিলেন বলে কথিত। এই কাগজেই বিখ্যাত সাংবাদিক-সাহিত্যিক সন্তোষকুমার ঘোষের সাংবাদিক-জীবনের সূচনা। আমার দেখা সেরা রিপোর্টারদের অন্যতম খগেন দে সরকার ১৯৪৫-৪৬ সালে এই কাগজের চিফ রিপোর্টার ছিলেন। দেশবিভাগের পর এই পত্রিকাটির কলকাতা অফিস ঢাকায় স্থানান্তরিত হলে সেখান থেকে একটি সংস্করণ প্রকাশিত হতে থাকে। আমরা কলকাতার রিপোর্টাররা এই কাগজের ঢাকা সংস্করণই প্রতিদিন পেতাম। ১৯৬৩ সালের আগস্ট মাসের ওই কাগজটিতে একদিনের একটি সংবাদে আমার চোখ আটকে গেল। সংবাদটি ছিল আল্লামা মাশরিকির মৃত্যুসংবাদ। আমরা যারা দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের আমলে কিশোর বয়সে খবরের কাগজ পড়তে শিখেছি, তাদের কাছে আল্লামা মাশরিকি একটি বিশ্রুত নাম। তিনি নিখিল ভারত খাকশার পার্টির প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি। এই পার্টির সদস্যদের পোশাক ছিল খাকি হাফ প্যান্ট ও সাদা হাফ শার্ট, শার্টের সামনে ও পিছনে 'বেলচা'র ছাপ—ওই ছাপটা হল পার্টির প্রতীক। ১৯৪৬ সালে এই পার্টি সংবাদ-শিরোনামে এসে যায়। ওই সময় এই পার্টির অনুগত সদস্যরা বোম্বাই, লাহোর ও দিল্লিতে তিন তিনবার মহম্মদ আলি জিন্নার প্রাণনাশের চেষ্টা করে। দিল্লিতে জিন্নাসাহেব কয়েক ইঞ্চির জন্য রক্ষা পেয়েছিলেন। কিন্তু এই ঘটনার পর খাকশার পার্টিকে ভারত সরকার নিষিদ্ধ ঘোষণা করলেন এবং লাহোরে আল্লামা মাশরিকিকে গ্রেফতার করা হল। সুতরাং 'মর্নিং নিউজ'-এর পাতায় তাঁর মৃত্যুসংবাদ দেখে আমার স্মৃতি অনেক পিছনে চলে গেল। কিন্তু পত্রিকাটিতে তাঁর জীবনের সংক্ষিপ্তসার কয়েকবার পড়েও আমার সাধ

মিটল না। কারণ তাঁর ওই জীবনীতে এরকম কয়েকটি লাইন ছিল—'লাহোর গভর্নমেন্ট কলেজে আল্লামা মাশরিকি গণিতশাস্ত্রের প্রধান অধ্যাপক ছিলেন। তিনি যখন অনার্স ক্লাসে পড়ানো শেষ করে মাথার টুপিটি আবার লাগিয়ে ক্লাশরুম থেকে বেরিয়ে যেতেন, তখন তাঁর হিন্দু-মুসলমান-শিখ ছাত্ররা হুমড়ি খেয়ে তাঁর পা স্পর্শ করতে চাইত। দীর্ঘকায় এই অধ্যাপক তখন তাঁর দুই বাহু প্রসারিত করে হুমড়ি খেতে উদ্যত ছাত্রদের বুকে জাপটে ধরে তারপর হেসে ছেড়ে দিতেন...।' এই কয়েকটি লাইন আমাকে অধ্যাপক আল্লামা মাশরিকি সম্বন্ধে ভীষণ কৌতূহলী করে রেখেছিল দীর্ঘদিন। মাত্র কয়েক বছর আগে (আই সি এস) অন্নদাশঙ্কর রায় তাঁর 'যুক্তবঙ্গের স্মৃতি' গ্রন্থটিতে ময়মনসিং জেলার নেত্রকোনা মহকুমার এস ডি ও আখতার হামিদ খান (Akhtar Hamid Khan ICS) নামের একজন আই সি এস অফিসারের সপ্রশংস উল্লেখ করেছেন। পড়তে পড়তে হঠাৎ এক জায়গায় আল্লামা মাশরিকির নাম। আই সি এস আখতার হামিদ খান হলেন আল্লামা মাশরিকির জামাতা। অন্নদাশঙ্কর রায় বলেছেন, সিভিল সার্ভেন্ট হিসাবে আখতার হামিদ খান উচ্চমানের একজন অফিসার। কোনও প্রকার সাম্প্রদায়িক ভেদবুদ্ধি তাঁর মধ্যে ছিল না। কিন্তু যেহেতু তিনি আল্লামা মাশরিকির জামাতা, সেহেতু তিনি বাংলার মুসলিম লিগ শাসকগোষ্ঠীর বিশেষ করে মুখ্যমন্ত্রী (প্রিমিয়ার) শাহিদ সুরাবর্দির খুবই বিষনজরে ছিলেন। অন্নদাশঙ্কর আখতার হামিদ খানের ধর্মনিরপেক্ষতা ও ফৌজদারি দণ্ডবিধির (Criminal Procedure Code) প্রতি তাঁর আনুগত্যের উল্লেখ করে লিখেছেন যে ১৯৪৬ সালের আগস্ট মাসে কলকাতা ও অক্টোবর মাসে নোয়াখালির দাঙ্গার পর পূর্ববাংলার বেশ কিছু জেলায় মুসলিম লিগের সক্রিয়কর্মী ও গুন্ডারা সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ ছড়াতে আরম্ভ করে। ময়মনসিং জেলার নেত্রকোনা শহরে অবাঞ্ছিত পরিস্থিতির সূচনা-মুহূর্তেই এস ডি ও আখতার হামিদ খান সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ ছড়াতে সচেষ্ট লোকদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়েন এবং তাদের আটক করেন। এই ঘটনায় মুসলিম লিগ নেতারা বিশেষ করে মুখ্যমন্ত্রী সুরাবর্দিসাহেব আখতার হামিদ খানের ওপর খুব ক্রুদ্ধ হন এবং তাঁকে চিফ সেক্রেটারি মারফত রাইটার্স বিল্ডিংয়ে ডেকে পাঠান। চিফ সেক্রেটারি তাঁকে শাসকদলের সঙ্গে কিছুটা আপস করতে পরামর্শ দেন। কিন্তু হামিদ খান তাঁর অবস্থান থেকে এক ইঞ্চিও সরে আসতে রাজি হননি। পরিস্থিতি এমন এক জায়গায় চলে যায় যে তেজোদৃপ্ত আখতার হামিদ খান আই সি এস চাকরিতে ইস্তফা দিয়ে লাহোরে ফিরে যান। পরবর্তী সময়ে এই আখতার হামিদ খান পাকিস্তানে একজন বিশিষ্ট সমাজসেবী হিসাবে আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি পেয়েছিলেন।

যা হোক আল্লামা মাশরিকি সম্বন্ধে আমার জানা সব কথা এখনও বলা হয়নি। কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের গণিতশাস্ত্রের 'র‍্যাংলার' এবং Indian Education Service-এর এই প্রথিতযশা অধ্যাপক আল্লামা মাশরিকি দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের মুখে মুখে আকস্মিকভাবে তাঁর নিজের গড়ে তোলা মর্যাদার জীবন থেকে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করে ফেলেন খাকশার পার্টি গঠন করে। ১৯৭০ থেকে ১৯৯০-এর যুগের মধ্যে পাকিস্তানের পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয় ও লাহোর গর্ভনমেন্ট কলেজ ওই অসাধারণ প্রতিভাধর মানুষটি সম্বন্ধে কিছু গবেষণামূলক কাজ করেছে। এসব কাজ থেকে জানা যায় যে তিনি যে সময় কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে ছিলেন, সে সময়ে তাঁর সমসাময়িক আরও দু'জন প্রতিভাবান ভারতীয় ছিলেন। তাঁরা হলেন প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশ ও সি ডি দেশমুখ। কিন্তু ছাত্র হিসাবে মাশরিকি সাফল্যের যে চূড়ায় পৌঁছেছিলেন, মহলানবিশ ও দেশমুখ সেই পর্যন্ত পৌঁছতে পারেননি। আল্লামা মাশরিকির সাফল্যের ও প্রতিভার কিয়দংশ আমি তুলে ধরছি ঃ

(Mashriqi : Scholar and Founder of the Khaksar Movement)

Punjab University : Master of Arts (M.A.) in Mathematics; Degrees from Christ's College, Cambridge University, England (1907-1912) : Bachelor of Arts (B.A.). Bachelor of Science (B.Sc.), Bachelor of Engineering (B.E.), Bachelor of Oriental Languages (B.O.L.). Four Triposes with distinction in five years (at Cambridge University from 1907-1912) in Mathematics, Natural Sciences, Mechanical Sciences, and Oriental languages. Titles awarded at Cambridge University : Wrangler, Foundation Scholar and Bachelor Scholar; Fellow of the Royal Society of Arts (F.R.S.A.) (1923). Fellow Geographical Society (F.G.S.; Paris, France), Fellow of Society of Arts (F.S.A.; Paris, France), Member of the Board at Delhi University, President Mathematical Society, Authored Tazkirah and many other books, Member International Congress of Orientalists, President All World's Faiths Conference (1937), A delegate to Palestine World Conference, Gold medalist World Society of Islam, Head of the delegation for the Motamar-I-Khilafat Conference at Cairo, Member of Indian Education Service (I.E.S.), Under Secretary of Education of undivided India.

আল্লামা মাশরিকির জন্ম ২৫ আগস্ট ১৮৮৮, মৃত্যু ২৭ আগস্ট ১৯৬৬। আচার্য জগদীশচন্দ্র বসুর পর আল্লামা মাশরিকির মতো সর্বগ্রাসী প্রতিভা নিয়ে আর কতজন ভারতীয় জন্মেছিলেন? তার আমরা কতটুকুই বা খবর রাখি!

আমি আমার সাংবাদিক জীবনের দীর্ঘ অভিজ্ঞতায় একটা সত্যকে বারবার বড় হতে দেখেছি ভারত-পাকিস্তানের সম্পর্কের ক্ষেত্রে ও হিন্দু-মুসলমানের তিক্ততার মধ্যেও। এই সত্যটা হল শিক্ষা এবং ছাত্র-শিক্ষকের সম্পর্ক। পদার্থ বিজ্ঞানের মোটামুটি একজন পরিচিত অধ্যাপক বি ডি নাগচৌধুরি ১৯৩০-এর যুগের গোড়ায় এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপক মেঘনাদ সাহার ছাত্র ছিলেন। দেশবিভাগের কয়েক বছর আগে তিনি ওই বিশ্ববিদ্যালয়ে পদার্থবিজ্ঞানের অধ্যাপক হন। দেশবিভাগের পরও কয়েক বছর তিনি ওই বিশ্ববিদ্যালয়ে ছিলেন। ১৯৬৬ সালে তিনি পরিকল্পনা কমিশনের সদস্য হন। ওই রকম একটা সময়ে তিনি এক সরকারি কাজে বিদেশে গিয়েছিলেন। তিনি দিল্লি ফিরছিলেন একটি বিখ্যাত বিদেশি এয়ারলাইনসে। বিমানটি করাচি বিমানঘাঁটিতে অবতরণের পরই একটি বড় ধরনের ইঞ্জিন বিভ্রাটের সমস্যায় পড়ল। ফলে সব যাত্রীদের Transit lounge-এ নিয়ে এলেন পাকিস্তানের অসামরিক বিমান পরিবহন কর্তারা। বি ডি নাগচৌধুরিও অন্যান্য যাত্রীদের মতো নির্দিষ্ট স্থানে এলেন। এসব ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক প্রথা অনুযায়ী যাত্রীদের সিকিউরিটি প্রহরায় রাখা হয় এবং প্রত্যেক যাত্রীর পাসপোর্ট চেকিং হয়ে থাকে। এই চেকিং-এর সময় Pakistan Civil Aviation-এর একজন পদস্থ অফিসার অধ্যাপক বি ডি নাগচৌধুরিকে শনাক্ত করে ফেলে সরাসরি তাঁর পায়ে হাত দিয়ে বললেন—স্যার, আমি এলাহাবাদে আপনার ছাত্র ছিলাম.....অমুক বছর অমুক ব্যাচ, আমার এই নাম।.....। অধ্যাপক নাগচৌধুরী ধীরে ধীরে তাঁর এই প্রাক্তন ছাত্রকে চিনতে পারলেন। এক-দেড় বছর আগে ১৯৬৫ সালে ভারত-পাকিস্তানের মধ্যে একটি যুদ্ধ হয়ে গিয়েছে, দু'দেশের সম্পর্কও মোটেই সুখকর নয়। ওই ছাত্রটি তাঁর প্রাক্তন শিক্ষককে জানালেন যে এই বিমানটি যাবে না। যাত্রীদের নিতে সিঙ্গাপুর থেকে একটি 'রিলিফ' বিমান আসবে। অন্তত দশ-বারো ঘণ্টা অপেক্ষা করতে হবে। এই অফিসারটি অধ্যাপক নাগচৌধুরিকে দেখাশোনার দায়িত্ব অন্য কয়েকজনের ওপর দিয়ে কিছুক্ষণের জন্য চলে গেলেন। দেড়-দু'ঘণ্টা পরে ছাত্রটি আরও জনাসাতেক এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীকে সঙ্গে নিয়ে তাঁদের প্রাক্তন শিক্ষকের কাছে ফিরে এলেন। এঁরা সকলেই বারো-পনেরো বছর আগে ভারত ছেড়ে পাকিস্তানে চলে আসেন এবং সেখানে বিভিন্ন সরকারি উচ্চপদে রয়েছেন। তখন এই ছাত্ররা সম্মিলিতভাবে পাকিস্তান স্বরাষ্ট্র দপ্তরের বিশেষ অনুমতি আদায় করে অধ্যাপক বি ডি নাগচৌধুরিকে করাচি শহরে তাঁর প্রাক্তন ছাত্রদের কারও একজনের বাড়িতে নিয়ে গেলেন। বি ডি নাগচৌধুরি দিল্লিতে ফিরে দিল্লির কয়েকজন সাংবাদিককে তাঁর এই সুন্দর অভিজ্ঞতার কথা বলেছিলেন। দিল্লির বেশ কয়েকটি কাগজে তখন এই সংবাদটি বের হয়েছিল। আর একটি ঘটনা ঘটেছিল নোবেল পুরস্কার বিজয়ী পাকিস্তানি পদার্থবিজ্ঞানী আবদুস সালমকে নিয়ে। তিনি ১৯৭৯ সালে পদার্থবিজ্ঞানে নোবেল পুরস্কার পান। তিনি ছাত্রজীবনে লাহোরে একটি সরকারি স্কুলে একজন বাঙালি হিন্দু শিক্ষকের কাছে অংক শিখতেন। এই শিক্ষক অনিলেন্দ্র গাঙ্গুলিকে আবদুস সালম নোবেল পেয়েও জীবনে বিস্মৃত হননি। ১৯৮১ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের আমন্ত্রণে এই নোবেলবিজ্ঞানী কলকাতায় আসেন। তিনি তাঁর কলকাতা অবস্থানের দ্বিতীয় দিনে চক্রবেড়িয়া রোডের বাড়িতে গিয়ে তাঁর লাহোরের মাস্টারমশাই অনিলেন্দ্রবাবুকে জড়িয়ে ধরেন। ১৯৪৬ সালের পর আবদুস সালম তাঁর এই বয়োবৃদ্ধ অসুস্থ শিক্ষকের খাটে বসে আবেগের সঙ্গে বলেছিলেন, 'স্যার, সেদিন আমাকে বকে রাগারাগি করে কান টেনে আমাকে অংক শিখিয়েছেন। তাই আমি অংকে পোক্ত হতে পেরেছি।' ১৯৮১ সালের ১৯ জানুয়ারি আবদুস সালম তাঁর মাস্টারমশাই অনিলেন্দ্রবাবুর কাছে প্রকাশ করলেন 'নোবেল' পাওয়া ছাত্রটি কত বড় 'নোবল'।

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রসঙ্গে ইতি টানবার আগে আমি আমার ওই সময়কার জীবনের সঙ্গে যুক্ত দু'জন কর্মচারীর নাম উল্লেখ না করে পারব না। এঁরা কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের দু'জন পিওন। একজনের নাম ফেকন (Fekon) ও অন্যজনের নাম মফিজ (Mafiz)। ফেকনকে আমি 'ফেকনদা' বলে ডাকতাম। ফেকন বিহারের দ্বারভাঙা অঞ্চলের লোক। বালক বয়সে ফেকনদা কলেজ স্ট্রিট অঞ্চলে হরপ্রসাদ শাস্ত্রীমহাশয়ের বাড়িতে কাজ করতে আসে। তখন তার বয়স ১২/১৩ বছর। শাস্ত্রীমহাশয় যখন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কৃত বিভাগের প্রথম প্রধান অধ্যাপকের দায়িত্ব নেন, তখন ফেকনও তাঁর সঙ্গে ঢাকা চলে যান। সেটা সম্ভবত ১৯১৮ কিংবা ১৯১৯ সাল। হরপ্রসাদ শাস্ত্রীমহাশয় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে কতদিন ছিলেন মনে নেই। তবে তিনি ১৯৩১ সালে মৃত্যুর বেশ কয়েক বছর আগেই ঢাকা থেকে কলকাতায় ফিরে আসেন। কিন্তু ফেকন ঢাকাতেই থেকে যায়। শাস্ত্রীমহাশয় চলে আসার পর ড. মহম্মদ

শহিদুল্লাহসাহেব ফেকনদাকে তাঁর নিজস্ব পিওন হিসাবে নিয়ে নেন। শহিদুল্লাহসাহেবের হাত ঘুরে ফেকন চলে যায় অর্থনীতি বিভাগের প্রধান ড. এইচ এল দে-র কাছে। এখানে কাজ করার সময় ফেকনদা অধ্যাপক ডি এন ব্যানার্জি ও অধ্যাপক অমিয় দাশগুপ্তের ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শে আসেন। ১৯৩০ সালের মাঝামাঝি সময়ে যখন অর্থনীতি বিভাগ থেকে বের করে এনে রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগকে পৃথক বিভাগের মর্যাদা দেওয়া হল, তখন এই বিভাগের প্রথম প্রধান অধ্যাপক হিসাবে ডি এন ব্যানার্জি ফেকনদাকে তাঁর কাছে নিয়ে আসেন। সেই থেকে ফেকনদা ডি এন ব্যানার্জির সঙ্গে ঢাকা ও কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে কাজ করেছে। ফেকনদা বিহারের লোক হয়েও অননুকরণীয় ঢাকাই ভঙ্গি এমনকী ঢাকার 'কুট্টি' বাংলা বলতে পারত। সেই সময় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ই ছিল বাংলার একমাত্র আবাসিক বিশ্ববিদ্যালয়। ফলে অধ্যাপকেরা প্রায় সকলেই কাছাকাছি গণ্ডির মধ্যে থাকতেন। ওই গণ্ডি ছিল পুরনো পল্টন, সেগুন বাগিচা, রমনা। বলতে গেলে রমনাই ছিল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের চৌহদ্দি। ফেকনদা এই চৌহদ্দির সব খবর রাখত। কোন অধ্যাপক থলের বদলে স্যুটকেশ নিয়ে বাজার করে সাইকেলের ক্যারিয়ারে চাপিয়ে বাড়ি ফিরতেন, তারপর প্রতিবেশী অন্য অধ্যাপক-পত্নীর তাই নিয়ে রসিকতা, এসব ফেকনদার বছর কুড়ি পরেও মুখস্থ ছিল। ফেকনদার কাছে গল্প শুনতাম এক ভাইস চ্যান্সেলারের স্ত্রীর কৃপণ স্বভাবের কথা। ঢাকা শহরের তাবৎ ভিখারি ওই ভদ্রমহিলাকে নাকি চিনত। ফলে ভিখারিরা ভাইস চ্যান্সেলারের বাড়ির ত্রিসীমানা এড়িয়ে চলত। এরকম অনেক মজার ঘটনা ফেকনদার মুখ থেকে শুনতে পেতাম। আর যেহেতু ফেকনদা 'ঢাকাই কুট্টি' বাক্যবিন্যাসে পারদর্শী ছিল, সেহেতু আমার তা শোনার আগ্রহ উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেত।

একদিন আশুতোষ বিল্ডিঙের করিডরে দাঁড়িয়ে দেওয়ালে হেলান দিয়ে ফেকনের বাচনভঙ্গি আস্বাদন করছি, এমন সময় অবিভক্ত ও বিভক্ত ভারতবর্ষের অর্থনীতিশিক্ষার ইতিহাসের কিংবদন্তি এক অধ্যাপকের মেয়ে আমাদের পাশ দিয়ে যাচ্ছিল। আমার সঙ্গে মেয়েটির যথেষ্ট পরিচয় ছিল। মেয়েটি প্রেসিডেন্সি কলেজে অর্থনীতি পড়ত। মেয়েটির চোখ মুখ খুব সুন্দর। মেয়েটি আমায় দেখে একটু হেসে আপনমনে চলে যাচ্ছিল। ফেকনদা তৎক্ষণাৎ আমাকে প্রশ্ন করল, 'মাইয়াটা কে? তোমারে দেইখা চক্ষে চক্ষে হাসল?' আমি জবাব দিলাম, 'প্রফেসার অমিয় দাশগুপ্তের মেয়ে।' ফেকন জোরের সঙ্গে বলল, 'ঢাকার অমিয় দাশগুপ্ত? ডাকো অরে ডাকো।' ফেকনদার শেষের কথাগুলি অলকানন্দার কানে যেতেই সে ফিরে আমার দিকে চাইল। আমার ইশারায় এগিয়ে এল। আমি অলকানন্দাকে ফেকনদার পরিচয় দিয়ে বললাম, 'ঢাকায় তোমার বাবার কাছেও কাজ করেছে ফেকনদা, তাই তোমাকে দেখতে চাইছে।'

এবার ফেকনদা অলকানন্দাকে তাক লাগিয়ে দিল। ডি এন ব্যানার্জির নেমপ্লেটটা দেখিয়ে ফেকন বলল, 'আমার এই স্যার তোমার বাবার বিয়ের বরকর্তা ছিলেন। আর তোমার মায়ের আশীর্বাদের গয়নাগাটি, বেনারসি কাপড়-চোপড় সব ছিল আমার জিম্মায়। মাঝরাতে নারায়ণগঞ্জ থেকে স্টিমার ছাড়ল। ভোরে স্টিমার মেঘনার মধ্যে দুটো নোঙ্গর ফেলে থামল। নদী তো নয় যেন সমুদ্র। তোমার বাবায় কইল, ফেকন এখানে নামতে হবে। দুটো বড় বড় নৌকা এসে স্টিমারের গায়ে ভিড়ল। তোমার বাবারে নিয়ে আমার এই স্যার নৌকায় চড়ল। তারপর পুরুতঠাকুর ও নাপিতকে নিয়ে আমি নৌকায়।...'

ফেকনদার বলার ভঙ্গিতে অলকানন্দা হেসে কুটিপাটি। পরে একটু গাঢ়কণ্ঠে ফেকনদা অলকানন্দাকে বলল, 'তোমার মায়েরে কইয়ো ফেকনের লগে দেখা হইছিল।' ফেকনদা বিহারে তাঁর দেশের বাড়িতে বহুদিন হল গত হয়েছে। অলকানন্দা পরবর্তী জীবনে বিখ্যাত অর্থনীতিবিদ আই জি প্যাটেলকে জীবনসঙ্গী হিসাবে বেছে নিয়েছে। উনিশশো একাত্তর সালের ডিসেম্বরের শেষের একটা দিনে ঢাকা জেলার সোনারগাঁও থেকে স্টিমারে বড় মেঘনা পাড়ি দিয়ে ওপারে কুমিল্লা জেলার দাউদকান্দি যাওয়ার সময় শীতের মেঘনাকেও আমার ফেকনদার মতো 'সমুদ্র' বলে মনে হয়েছিল। সেদিন ফেকনদাকে খুব মনে পড়েছিল।

ফেকনদার পর কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্মৃতিতে আমার মনে যে মানুষটি আজও অম্লান, তার নাম হল মফিজ (Mafiz)। আমি বেশ কয়েকজন অপরিসীম সুন্দর পুরুষ মানুষ দেখেছি। তাঁরা সকলেই কুলকৌলিন্যে ও উচ্চশিক্ষায় বিভূষিত। যেমন সৌম্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর, সুধীন্দ্রনাথ দত্ত, বসন্ত চৌধুরি। কিন্তু এসব ছাড়া আমি আমার জীবনে যে একজন অপরূপ সুন্দর পুরুষ দেখেছি সে হল ওই মফিজ, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলরের একনম্বর বেয়ারা। মফিজ উত্তরপ্রদেশের লোক, লখনউ অঞ্চলে বাড়ি। ১৯৫১/৫২ সালে ওর বয়স ছিল চল্লিশের কাছাকাছি। অসাধারণ বুদ্ধি ও প্রখর বাস্তববোধ, তাকে ভাইস চ্যান্সেলর থেকে আরম্ভ করে বিশ্ববিদ্যালয়ের তাবৎ কর্তাব্যক্তিদের খুব প্রিয় করেছিল। রাত ন'টা, সাড়ে নটা পর্যন্ত মফিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে থাকত। অধ্যাপক সতীশচন্দ্র ঘোষকে গাড়িতে তুলে দিয়ে তার ছুটি। বিশ্ববিদ্যালয়ের তাবৎ খবর ছিল তার নখদর্পণে। কলকাতা তো বটেই, তাছাড়া ঢাকা, এলাহাবাদ, লখনউ ও দিল্লি

বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন ফ্যাকাল্টির নামকরা অধ্যাপকদের সকলকেই মফিজ চিনত। মফিজ আমার 'নিউজ সোর্স' ছিল। বাংলা পড়তে পারত, কিন্তু লিখতে পারত না। ভাইস চ্যান্সেলারের ঘরে বাইরের কোনও অধ্যাপকদের কথোপকথনের ইংরেজি শব্দ শুনে সে তক্ষুনি উচ্চারণ অনুযায়ী উর্দুতে লিখে রাখত। তারপর সময়মতো আমাকে সেগুলি শোনাত। একটা ঘটনার কথা বলি : ১৯৫৬/১৯৫৭ সালের কথা। একদিন সন্ধ্যাবেলা মফিজের কাছ থেকে জানতে পারলাম যে রাজশাহি বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলর আমাদের ভাইস চ্যান্সেলর অধ্যাপক নির্মলকুমার সিদ্ধান্তের সঙ্গে দেখা করতে এসেছিলেন। দু'জনের কথাবার্তা শুনে মফিজের মনে হয়েছিল যে অধ্যাপক নির্মলকুমার সিদ্ধান্ত রাজশাহির ভাইস চ্যান্সেলরের 'মাস্টারমশাই'। মফিজ আমাকে আরও জানাল যে কিছুক্ষণ পরে প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে অধ্যাপক সুবোধ সেনগুপ্ত, অধ্যাপক তারক সেন আসছেন ভাইস চ্যান্সেলরের ঘরে। কিছুক্ষণ পরে এলেন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরাজি বিভাগের মোহিনীবাবু। তাঁদের আলোচনার সময় মাঝেমাঝে চা ও জল দিতে গিয়ে মফিজ বুঝে নিয়েছিল যে তাঁরা ইংরাজি সিলেবাস নিয়ে আলোচনা করছেন। মফিজের অনুমানের ভিত্তিতে আমি পরের দিন ভাইস চ্যান্সেলর অধ্যাপক নির্মলকুমার সিদ্ধান্তের সঙ্গে কথা বলে জানতে পারলাম মফিজের অনুমান খুবই সঠিক। রাজশাহি বিশ্ববিদ্যালয় ওইসময় ছিল পূর্ববাংলার দ্বিতীয় বিশ্ববিদ্যালয় এবং এই বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম ভাইস চ্যান্সেলর ড. মামুদ হোসেন ছিলেন এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপক নির্মলকুমার সিদ্ধান্ত ও অধ্যাপক অমরনাথ ঝা'র (A N Jha) ছাত্র। তিনি রাজশাহি বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরাজি অনার্স ও এম এ কোর্সের সিলেবাসের বিষয়ে আলোচনার জন্য কলকাতায় এসেছিলেন তাঁর 'মাস্টারমশাই' অধ্যাপক নির্মলকুমার সিদ্ধান্তের সঙ্গে কথা বলতে। ড. মামুদ হোসেনসাহেব ছিলেন আমাদের রাষ্ট্রপতি ড. জাকির হোসেনের ছোট ভাই। দেশবিভাগের পর তিনি পাকিস্তানে চলে গিয়েছিলেন।

এরকম অনেক খবর মফিজের কাছ থেকে পেতাম। মফিজ বলেছিল, ওর জ্যাঠা কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি স্যার আশুতোষের একনম্বর 'চাপরাশ' (Chapres) ছিলেন। তিনি প্রতিদিন বিকালে স্যার আশুতোষের সঙ্গেই বিশ্ববিদ্যালয়ে আসতেন এবং যতক্ষণ 'স্যার' বিশ্ববিদ্যালয়ে থাকতেন, ততক্ষণ পর্যন্ত তার জ্যাঠাও সেখানে থাকতেন। এভাবে স্যার আশুতোষের প্রধান 'চাপরাশ' হওয়ার সুবাদে বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তাব্যক্তিদের সঙ্গে মফিজের জ্যাঠার খাতির হয়ে গিয়েছিল। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের কয়েক বছর আগে সেই জ্যাঠা মফিজকে উত্তরপ্রদেশ থেকে কলুটোলায় নিজের কাছে নিয়ে আসেন। ১৯৩৮ সাল নাগাদ জ্যাঠা তাকে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে পিওনের চাকরিতে ঢুকিয়ে দিলেন। তার প্রথম চাকরি হয়েছিল রেজিস্ট্রারের বিভাগে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ আরম্ভ হয়ে গিয়েছে। স্যার আজিজুল হক তখন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলর। একদিন ভাইস চ্যান্সেলর ওই অল্পবয়সি অসাধারণ সুন্দর চেহারার পিওন মফিজকে করিডরে দেখে ফেলেন। তাকে ডেকে নাম জিজ্ঞেস করলেন ও কোথায় কাজ করে তা জানতে চাইলেন। পরদিন থেকে মফিজ কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলরের তিন নম্বর পিওনের পদে বহাল হল। মফিজকে আমি দেখেছি সেনেটের বৈঠকের পর বিচারপতি রমাপ্রসাদ মুখার্জির সামনে হাঁটু গেড়ে তাঁকে প্রণাম করতে। সে সব সময় মনে রেখেছিল স্যার আশুতোষের পরিবারের সঙ্গে তাঁর জ্যাঠার সম্পর্ক এবং ওই সম্পর্কের জোরেই বিশ্ববিদ্যালয়ে তার চাকরির সংস্থান। মফিজ বাংলায় মজার মজার ছড়া কাটতে পারত। ওইসময় অর্থাৎ ১৯৫৪/৫৫ সাল পর্যন্ত দু'জন ইংরেজ মহিলা কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনা করতেন। তাঁরা ছিলেন অধ্যাপিকা স্টেলা ক্রামরিশ (Stella Crumrish) ও অধ্যাপিকা মিস স্টোক (Miss Stok)। অধ্যাপিকা ক্রামরিশ 'বাগিশ্বরী অধ্যাপক' ছিলেন এবং ভারততত্ত্ববিদ হিসাবে তিনি আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি পেয়েছিলেন। তিনি দেখতে বেশ সুশ্রী ছিলেন। ১৯৫৩ সাল নাগাদ তিনি কলকাতা ছেড়ে অক্সফোর্ড বা কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে চলে যান। অধ্যাপিকা মিস স্টোক ছিলেন ইংরাজি বিভাগের প্রধান। তিনি পদাধিকার বলে সেনেট সদস্য ছিলেন। প্রতিটি বৈঠকে যোগ দিতেন। কিন্তু দেখতে মোটেই ভাল ছিলেন না। হাঁটু ছাড়িয়ে অনেকটা নীচু পর্যন্ত গাউন পরতেন আর সেটিও আধময়লা। দেহে ও চলনে আদৌ নারীত্বের লেশ ছিল না। কিন্তু শুনেছি পড়াতেন খুব ভাল। এই মিস স্টোককে নিয়ে মফিজ একটি ছড়া বানিয়েছিল। ছড়াটি আজও আমি ভুলিনি—

'বলতে পারেন কি?
এখন যিনি চলেছেন
তিনি He কিংবা She?'

মিস স্টোক ১৯৫৫ সাল নাগাদ পাকিস্তানের করাচি কিংবা পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয়ে ইংরাজি ভাষা ও সাহিত্যের প্রধান অধ্যাপকের দায়িত্ব নিয়ে বহু টাকা বেতন পেয়ে চলে যান।

মফিজ ১৯৬৯/৭০ সালে অবসর নিয়ে চলে যায় তার উত্তরপ্রদেশের বাড়িতে। কলকাতা ছেড়ে যাওয়ার আগে

মফিজ 'যুগান্তর' অফিসে আমার সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিল। বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন জায়গায় দীর্ঘদিন রিপোর্ট করেছি। একটা বোধহয় জন্মের মতোই অমোঘ নিয়মে মমত্ববোধের জায়গা গড়ে ওঠে যা আমৃত্যু অম্লান থেকে যায়। আমার কাছে ফেকনদা ও মফিজ এখনও তাই।

নারী-পুরুষ নির্বিশেষে অনেক মানুষকে মানুষ না দেখেই ভালবেসে ফেলে। তাঁর কথা শুনে বা বক্তৃতা পড়েই। আমি এমন একজনকে ভালবেসে ফেলেছিলাম তাঁর বক্তৃতার বাংলা অনুবাদ করতে করতে। আমার এই ভালবাসার মানুষটি ছিলেন আন্দ্রেই ভিসিনিস্কি (Andrei Vyshinsky)। ১৯৪৫ সালে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শেষ হওয়ার লগ্নে রাষ্ট্রসংঘ (United Nations) প্রতিষ্ঠার সময় থেকে একটানা প্রায় দশ বছর ভিসিনিস্কি রাষ্ট্রসংঘে সোভিয়েট রাশিয়ার প্রতিনিধিদলের নেতা ছিলেন। তিনি রাষ্ট্রসংঘের সাধারণ পরিষদে (General Assembly) ও নিরাপত্তা পরিষদে (Security Council) যেসব বক্তৃতা করেছেন সেগুলির (১৯৫১ থেকে ১৯৫৪ সাল পর্যন্ত) অন্তত বারো থেকে পনেরো হাজার ইংরাজি শব্দের বাংলা তর্জমা আমি করেছি। তাঁর বক্তৃতার বাংলা অনুবাদ করতে করতে এই মানুষটির প্রতি আমার এক আবেগময় আকর্ষণ জন্মায়। রাষ্ট্রসংঘ প্রতিষ্ঠার পর থেকে গত ৬০ বছরের আন্তর্জাতিক ইতিহাসে ভিসিনিস্কির মতো প্রখর ব্যক্তিত্বের, খরতপ্ত রসনার এবং প্রচণ্ড দাপুটে ব্যক্তিত্ব রাষ্ট্রসংঘে আর দেখা যায়নি। তাঁর সম্বন্ধে দেশি ও বিদেশি পত্রপত্রিকায় যেসব খবর বের হত; আমি তা মুখস্থ করে ফেলতাম। তিনি রাশিয়ার এক সমৃদ্ধশালী পরিবারের সন্তান। তাঁর পিতা এত ধনাঢ্য ছিলেন যে তিনি এই পুত্রের স্কুল ও কলেজ জীবনের লেখাপড়া ফরাসি দেশের বিখ্যাত শিক্ষায়তনে করিয়েছিলেন। ওই বয়স থেকে তিনি ফরাসি, ইংরাজি ও স্প্যানিশ এই তিনটি ভাষায় অনর্গল বক্তৃতা করতে পারতেন। ১৯১৭ সালে যখন সোভিয়েট বিপ্লব ঘটে, তখন ভিসিনিস্কি প্যারিসে তাঁর ছাত্রজীবন শেষ করে ফেলেছেন। বিপ্লবের পর ভিসিনিস্কি দেশে ফিরে সোভিয়েট ইউনিয়নের পররাষ্ট্র দফতরে যোগ দেন। সোভিয়েট ইউনিয়নের রাষ্ট্রীয় কাঠামো যাই হোক না কেন, একটা দেশের পররাষ্ট্র নীতিকে আন্তর্জাতিক চূড়ায় পৌঁছে দিতে যে কূটনৈতিক কৌশল বা Career diplomacy-র দরকার সেটা তাঁর রক্তমাংসে মিশে ছিল। এই মানুষটি সম্বন্ধে সোভিয়েট ইউনিয়নে কোনও গবেষণা বা গ্রন্থ রচনা করা হয়েছে কি না আমি জানি না। কিন্তু আমি তাঁর বক্তৃতার মধ্য দিয়ে যতটুকু বুঝতে পেরেছি, তাতে নিঃসন্দেহে বলতে পারি যে তিনি দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের শেষে ঠান্ডা লড়াই যুগের সোভিয়েট পররাষ্ট্র নীতির অন্যতম স্থপতি। ১৯৩৫-৩৬ সালে তিনি প্যারিসে, জেনেভায় ও দি হেগ শহরে লিগ অব নেশনস (League of Nations)-র শ্রাদ্ধবাসরে উপস্থিত ছিলেন। হিটলারের অসীম ক্ষমতাশালী পররাষ্ট্র মন্ত্রী ভন রিবেনট্রপের (Von Ribentrop) সঙ্গে তিনি পাঞ্জা লড়েছেন। ১৯৪১ সালের শেষে অপরাজেয় জার্মান বাহিনী যখন সোভিয়েট ইউনিয়ন আক্রমণ করল, তখন ব্রিটেন ও আমেরিকাকে সোভিয়েট ইউনিয়নের 'মিত্র' হিসাবে পাওয়ার জন্য ভিসিনিস্কির কূটনৈতিক প্রয়াস ঐতিহাসিক। তিনিই মস্কোতে নিযুক্ত ব্রিটিশ রাষ্ট্রদূত স্যার স্ট্যাফোর্ড ক্রিপস (Sir Stafford Cripps) ও আমেরিকান রাষ্ট্রদূত অ্যাভারেল হ্যারিম্যানের (Averell Harriman) সঙ্গে মৈত্রীচুক্তির খসড়া প্রস্তুত করেছিলেন। ১৯৪৫ সাল থেকে তিনি রাষ্ট্রসংঘে সোভিয়েট প্রতিনিধিদলের নেতা হিসাবে দশ বছর নিউইয়র্কে ছিলেন। ওই সময় ১৯৫১ সাল থেকে ১৯৫৪ সাল পর্যন্ত রাষ্ট্রসংঘে তাঁর বক্তৃতার বাংলা তরজমা করতে গিয়ে দেখেছি, শত্রুপক্ষকে আক্রমণ করতে তিনি কঠোরতম ভাষা প্রয়োগ করতে দ্বিধা করতেন না। ওই সময় তাঁর প্রধান প্রতিপক্ষ ছিলেন আমেরিকার পররাষ্ট্রমন্ত্রী জন ফস্টার ডালেস। ডালেসকে গালাগাল করতে গিয়ে তিনি তাঁর পছন্দমতো ইংরাজি শব্দ না পেলে অত্যন্ত ক্ষিপ্রতার সঙ্গে ফরাসি শব্দের সাহায্য নিতেন। কখনও জুতসই ফরাসি শব্দ জিহ্বাগ্রে না এলে অতি দ্রুত স্প্যানিশে চলে যেতেন। ইংরাজি থেকে ফরাসি ও ফরাসি থেকে স্প্যানিশে তাঁর বিচরণ ছিল অনায়াস। ১৯৫০-এর যুগে প্রায় প্রতিদিনই ভিসিনিস্কির ছবি খবরের কাগজে প্রথম পাতায় বের হত। ছবিগুলিতে কখনও তিনি ব্রিটিশ বা আমেরিকান প্রতিনিধির দিকে ক্রুদ্ধভঙ্গিতে আঙুল তুলে কিছু বলছেন। কখনওবা গালে হাত দিয়ে বসে চোখ বুজে কিছু ভাবছেন। এই দ্বিতীয় ধরনের তাঁর ছবিটি দেখলে মনে হত যেন অধ্যাপক সত্যেন্দ্রনাথ বসু; মাথায় একঝাঁক তুষারশুভ্র অবিন্যস্ত কেশ। ঠিক একই রকম ভারী স্থূল দেহ। তাঁর ডেস্কে USSR লেখা প্লেটটির বদলে India লেখা একটি প্লেট রেখে দিলে কে বলবে এই লোকটি ভিসিনিস্কি—সত্যেন্দ্রনাথ বসু নন? রাষ্ট্রসংঘে তিনি কখনও কখনও ক্লান্তিকর বক্তৃতা এড়ানোর জন্য কান থেকে Headphone সরিয়ে কোনও ফরাসি কবির প্রেমের কবিতা পড়তেন। কখনওবা ফরাসি চিত্রকলার বইয়ে নিমগ্ন হয়ে দেখতেন। এই ভিসিনিস্কির পরিহাসপ্রিয়তার একটি ঘটনা কাগজে পড়েছি। ১৯৫০/৫১ সালের কথা। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় সম্পাদিত ইঙ্গ-সোভিয়েট মৈত্রী চুক্তির (Anglo-Soviet Friendship Treaty) এক বর্ষপূর্তি অনুষ্ঠানে তিনি লন্ডনে 'হাউস অব কমন্স'-এ আসেন।

এই অনুষ্ঠান উপলক্ষে এক নৈশভোজের ব্যবস্থা ছিল। তখন ব্রিটেনের প্রধানমন্ত্রী রিচার্ড ক্লিমেন্ট এটলি। তাঁর পররাষ্ট্রমন্ত্রী ছিলেন আর্নেস্ট বেভিন (Ernest Bevin)। বেভিন রাজনীতিতে কুখ্যাত ছিলেন অন্যদের খোঁটা বা খোঁচা দিয়ে কথা বলার জন্য। কূটনৈতিক প্রথা অনুযায়ী নৈশভোজের টেবিলে ভিসিনিস্কির পাশেই বসেছিলেন বেভিন। খেতে খেতে বেভিন ভিসিনিস্কিকে বলেছিলেন—একটা ব্যাপারে আমার খুব বিস্ময় লাগে। আপনি কত ধনী ঘরের ছেলে, বলতে গেলে সোনার চামচ মুখে নিয়ে জন্মেছেন। আর আমি এক খনিশ্রমিকের ঘরে জন্মেছি। দু'বেলা পেট ভরে খেতে পেতাম না। অথচ আজ আপনি শ্রমিকশ্রেণির সমাজতান্ত্রিক সরকারের প্রতিনিধি, আর আমি এক পুঁজিবাদী ধনতান্ত্রিক দেশের প্রতিনিধিত্ব করছি। ভিসিনিস্কির এই খোঁচামারা কথাটা মোটেই ভাল লাগেনি। কিন্তু কূটনৈতিক শিষ্টাচার একটা বড় বালাই। ভিসিনিস্কি কাঁটা-চামচ প্লেটে রেখে তাঁর জ্বলজ্বলে দুটি চোখ দিয়ে বেভিনের দিকে তাকিয়ে বলেছিলেন—এটা এমন কী একটা বিস্ময়ের ব্যাপার? You betrayed your class—I betrayed my class! ভিসিনিস্কির বিপরীতে বসেছিলেন বিরোধী দলের নেতা স্যার উইনস্টন চার্চিল। তিনি ভিসিনিস্কির জবাব শুনে সশব্দে হেসে উঠেছিলেন। ভিসিনিস্কি কখনওই কোনও ব্যক্তিত্বের পরোয়া করতেন না। ১৯৫৩ সালে ভারতীয় প্রতিনিধি কৃষ্ণমেনন কোরিয়ার যুদ্ধবিরতির প্রস্তাব রাষ্ট্রসংঘে পেশ করেছিলেন, তখন ভিসিনিস্কি কৃষ্ণমেননকে এমন নাস্তানাবুদ করেছিলেন যে কৃষ্ণমেনন প্রথম প্রস্তাব প্রত্যাহার করে নিয়ে সংশোধিত প্রস্তাব পেশ করতে বাধ্য হয়েছিলেন।

এমন একটি ক্রুদ্ধ ও খরতপ্ত রসনার মানুষের একটি কোমল দুর্বল জায়গা ছিল। সেটি হল তাঁর মেয়ে, তাঁর একমাত্র সন্তান জিনাইদা (Zinaida)। ১৯৫১-৫২ সালে জিনাইদার বয়স ছিল ২২/২৩ বছর, বেশ সুশ্রী, বাপের মতো প্রতিভাদীপ্ত উজ্জ্বল দুটি চোখ, মাথায় একরাশ অবিন্যস্ত চুল। নিউইয়র্কের খবরের কাগজে ও বিভিন্ন ম্যাগাজিনে জিনাইদার ছবি প্রায়ই ছাপা হত। জিনাইদার ১৯৪৫ সাল থেকে স্কুল ও কলেজ জীবনের দিনগুলি নিউইয়র্কে কেটেছে। জিনাইদা শৈশবেই মাতৃহারা। বাবা ভিসিনিস্কি তাঁকে মায়ের মমতা দিয়ে গড়ে তুলেছেন। বাল্যকাল থেকে এই মেয়ে বাপের হাত ধরে প্যারিস, জেনেভা, দি হেগ শহরে গিয়েছেন। তারপর দুরন্ত কৈশোর থেকে তিনি নিউইয়র্কে। তিনি কখনওই তাঁর এই ক্রুদ্ধ ও রাগি পিতাকে ছেড়ে থাকতে পারতেন না। আমাদের ভারতীয় সমাজে বিশেষ করে বাঙালি সমাজে এ দৃশ্য বিরল নয় যে পরিবারে মাতৃহীনা কন্যা বৃদ্ধ পিতাকে দেখবার জন্য আজীবন অনূঢ়া থেকে গিয়েছেন। কিন্তু এজন্য কেবল এজন্যই একশ্রেণির আমেরিকান সংবাদপত্র দিনের পর দিন বাবা ভিসিনিস্কি ও মেয়ে জিনাইদাকে কুৎসিত ও জঘন্যভাবে আক্রমণ করেছে। এই কাগজগুলি বারবার এই জঘন্য কথা বলেছে 'ভিসিনিস্কি মেয়ের বিয়ে দিচ্ছেন না, তিনি মেয়ের প্রতি আসক্ত তাই।'

আমেরিকায় তখন 'ম্যাকার্থিবাদ' সমাজ ও নাগরিক জীবনকে বিষাক্ত করে ফেলেছে। বিপন্ন হয়ে পড়েছিল গণতান্ত্রিক জীবনধারা। মেয়ে জিনাইদাকে নিয়ে আমেরিকার খবরের কাগজগুলির কুৎসা ভিসিনিস্কিকে বিষণ্ন করে তুলেছিল। যে-ভিসিনিস্কি প্রতিপক্ষকে পৃথিবীর বিষাক্ততম সাপের ছোবলমেরে তাঁর জিহ্বার সবটুকু বিষ নিংড়ে দিতেন, সেই ভিসিনিস্কির জীবনের শেষদিকের এক বক্তৃতায় এক গভীর বেদনা ও বিষণ্ণতার সুর শুনেছিলাম। ১৯৫৪ সালে রাষ্ট্রসংঘের দশম প্রতিষ্ঠা দিবস উপলক্ষে রাষ্ট্রসংঘে Foreign Correspondents Association আন্দ্রেই ভিসিনিস্কিকে এক সংবর্ধনা দিয়েছিল। ওই সংবর্ধনাসভায় ভিসিনিস্কি অত্যন্ত বিষণ্ণকণ্ঠে মর্মস্পর্শী ভাষায় আমেরিকান সাংবাদিকতার ওই অন্ধকার জগৎকে আক্রমণ করেছিলেন। ওই সভায় জিনাইদাও উপস্থিত ছিলেন। ওই বছরেই অর্থাৎ ১৯৫৪ সালে নভেম্বর মাসে ওই নিউইয়র্ক শহরেই আন্দ্রেই ভিসিনিস্কি লোকান্তরিত হলেন। তখন তাঁর বয়স হয়েছিল ৭১ বছর। কমিউনিজম অথবা পুঁজিবাদের বিতর্ক সরিয়ে রেখে কেবল এই একটি মানদণ্ডে আন্দ্রেই ভিসিনিস্কির বিচার করার প্রয়োজন অপরিহার্য যে তিনি ছিলেন বিংশ শতাব্দীর সোভিয়েট রাশিয়ার অন্যতম শ্রেষ্ঠ প্রতিভাদীপ্ত মানুষ। তাঁর মৃত্যুর বহু বছর পর আমেরিকায় তাঁর সম্বন্ধে কিছু গবেষণা হয়েছে। এই গবেষণার যৎকিঞ্চিৎ আমি Time সাপ্তাহিকীতে দেখেছিলাম। তাতে বলা ছিল : Andrei Vyshinsky been one of the Soviet Union's best known political figures in the early 1950's when he served as head of the Soviet mission to the United Nations, A master of inflamatory rhetoric, combative scornful and ready in an instant to heap the most undiplomatic abuse on other U. N. spokesmen. Vyshinsky drew wide attention, more of it favourable. Visitors to the U. N. hoped to catch him in the act of banging his fist or flalling his arms. Delegates complained that he attacked them like criminals. At his death a few weeks before his 71st birthday on November 22, 1954, the New York Times called him 'a master of the Vitriolic word.' Other editorialists remembering

as well the role he had played as state prosecutor in Stalin's purge in 1930...

কেবল ভিসিনিস্কির মেয়ে জিনাইদার ব্যাপারে নয়, ওই সময় আমেরিকার সংবাদজগতে এক জঘন্য রুচি দাপিয়ে বেড়িয়েছে। কিন্তু এই রুচির সাংবাদিকরা জব্দ হয়েছিল উইনস্টন চার্চিলের ছেলে র‍্যানডলফ চার্চিলের (Randolph Churchill) হাতে। ওই সময়টাতেই ১৯৫৫-৫৬ সাল নাগাদ তৎকালীন ব্রিটেনের একজন সেরা সাংবাদিক র‍্যান্‌ডলফ চার্চিল রাষ্ট্রসংঘের হাঙ্গেরি-সুয়েজ খাল সংক্রান্ত এক অতি গুরুত্বপূর্ণ বিতর্কের রিপোর্ট করতে নিউইয়র্ক যান। ওই সময়টাতে ইংলন্ডের সেরা মাতাল বলে চিহ্নিত ছিলেন উইনস্টন চার্চিলের কন্যা সারা চার্চিল (Sarah Churchill)। সারা খুব বলশালী মহিলা ছিলেন। তিনি চার-পাঁচটা স্বামী বদলেছেন। তিনি কারণে-অকারণে স্বামীদের খুব মারতেন। কারও নাক থেতলে দিতেন, কাউকে ঘুষি মেরে দাঁত ভেঙে দিতেন, কাউকে কানে মেরে বধির করে দিয়েছেন। প্রতিটি ক্ষেত্রে তাঁর স্বামীরা আদালতে গিয়ে তাঁদের দৈহিক আঘাত দেখিয়ে কেবল ডিভোর্সই পাননি চিকিৎসার ক্ষতিপূরণও পেয়েছেন। রাতে মাতাল হয়ে ঘরে ফেরার সময় লন্ডনের রাস্তায় সারা চার্চিল নিরীহ পথচারীদের আক্রমণ করতেন প্রায়শই। কোনও পুলিস কনেস্টবল তাঁকে একা মোকাবিলা করতে পারত না। তাঁকে ধরতে গেলে তিনি কনেস্টবলদের জননেন্দ্রিয় মুচড়ে দিয়ে পালিয়ে -যেতেন। ফলে সারা চার্চিলের চলাফেরার রাস্তায় নির্দিষ্ট সময়ে লন্ডন পুলিস অত্যন্ত বলশালী দৈত্যাকৃতি নিগ্রো পুলিস রাখতেন। সারা চার্চিল সপ্তাহে অন্তত দু'দিন রাতে জেল হাজতে কাটাতেন। এসব খবর লন্ডনের কাগজে তো বটেই পৃথিবীর সর্বত্র বিশেষকরে আমেরিকার কাগজগুলিতে প্রকাশিত হত। ১৯৫৩/৫৪ সালে উইনস্টন চার্চিলের প্রধানমন্ত্রিত্বের শেষ আমলেও সারা চার্চিল অবিরাম এইসব কাণ্ডকারখানা করতেন। ৩৮/৪০ বছরের সারাকে কেউই নিয়ন্ত্রণ করতে পারতেন না। নিউইয়র্কে র‍্যানডলফ চার্চিলকে একদিন একদল আমেরিকান রিপোর্টার ঘিরে ধরলেন। তাঁরা র‍্যানডলফকে অনেক অশোভন ও অভদ্র পারিবারিক প্রশ্ন করলেন। র‍্যানডলফ তাঁদের জবাব দিয়েছিলেন যে সারা চার্চিল একজন প্রাপ্তবয়স্কা মহিলা, তিনি স্বাধীন ইচ্ছায় চলাফেরা করেন। মাঝে মাঝে আইন ও আদালতের দ্বারা সারা নিয়ন্ত্রিত হয়ে থাকেন। সারার সম্পর্কে পরিবারের অন্য লোকদের কিছুই করার নেই। কিন্তু আমেরিকান রিপোর্টাররা তাতে সন্তুষ্ট না হয়ে আরও কিছু অশোভন প্রশ্ন করলে র‍্যানডলফ ক্ষেপে গিয়ে ওদের কিছু কথা বলেন। অর্ধ শতাব্দীর আগের এই ঘটনা সম্পর্কে র‍্যানডলফ চার্চিলের মুখ থেকে বেরিয়ে আসা সব ইংরেজি উক্তি আমার মনে নেই। কেবল একটা লাইন আমার এখনও মুখস্থ, সেটি হল...you Americans are so indecent that I doubt wheather you people have any parent at all...। র‍্যানডলফ চার্চিলের এই খিস্তি ইংলন্ড ও আমেরিকার খবরের কাগজের জনতাকে খুব আলোড়িত করেছিল সেই সময়ে। তবে এই ঘটনার পর থেকে আমেরিকার রিপোর্টারদের সংবিৎ ফিরে এসেছিল অনেকটা।

১৯৫৪ সালে গান্ধীজিকে নিয়ে এক অহেতুক কিন্তু ক্রুদ্ধ বিতর্কের সূচনা করলেন এক অতি নিষ্ঠাবান গান্ধীবাদী পুরুষোত্তমদাস ট্যান্ডন। এই বিতর্কের কেন্দ্রবিন্দু ছিলেন গান্ধীজির অতি বিশ্বাসভাজন সেক্রেটারি নির্মলকুমার বসু। নির্মলবাবু ভারত ইতিহাসের এক যুগসন্ধিক্ষণে ১৯৪৬ ও ১৯৪৭ সালে গান্ধীজির সেক্রেটারি হিসাবে কাজ করেছেন। তিনি গান্ধীজি সম্পর্কে তাঁর বিখ্যাত বই My days with Gandhi ১৯৫৩ সালে প্রকাশ করেন। কলকাতা, দিল্লি, মাদ্রাজ, বাঙ্গালোর, এলাহাবাদ ও লখনউ-এর ইংরাজি খবরের কাগজগুলিতে সমালোচনা (Book reviews) প্রকাশিত হয়। লখনউয়ের National Herald কাগজে এই বইটির সমালোচনা করেন প্রাক্তন কংগ্রেস সভাপতি দৃঢ়চেতা ব্যক্তিত্ব পুরুষোত্তমদাস ট্যান্ডন। ট্যান্ডন দীর্ঘ আড়াই কলমব্যাপী সমালোচনায় গান্ধীজির নোয়াখালি সফরকালীন কয়েকটি ঘটনার বিবরণ নিয়ে নির্মলবাবুর প্রতি তীব্র উষ্মা প্রকাশ করেন। কেবল তাই নয় তিনি বইটির কতগুলি পৃষ্ঠা পরবর্তী মুদ্রণ থেকে বাদ দেওয়ার দাবি জানান। অন্যথায় বইটি (My Days with Gandhi) নিষিদ্ধ ঘোষণা করার জন্য প্রধানমন্ত্রী জওহলালাল নেহরুকে অনুরোধ জানান। যেহেতু National Herald পত্রিকাটি নেহরু পরিবারের 'পত্রিকা' হিসাবে ভারতীয় রাজনীতিতে চিহ্নিত ছিল, সেহেতু এই বিষয়টিতে জওহরলাল নেহরুকে হস্তক্ষেপ করতে হয়েছিল। এই বিতর্কে জওহরলাল অত্যন্ত দৃঢ়তার সঙ্গে নির্মলকুমার বসুর পাশে দাঁড়িয়েছিলেন। তিনি ওই পত্রিকায় এক দীর্ঘ চিঠি লিখে বলেন, নোয়াখালিতে গান্ধী আশ্রমের যে ঘটনাগুলি নির্মল উল্লেখ করেছেন, সেগুলি সবই ঘটনা। এবং ওইসব ঘটনা নিয়ে নির্মলের মনে যেসব প্রশ্ন উঠেছিল, সেগুলি নিয়ে নির্মল গান্ধীজির সঙ্গে খোলাখুলি আলোচনা করেছেন। কিছু কিছু ঘটনা আমার নিজেরও জানা। আমি বইটি খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে পড়েছি, কারণ যেহেতু বইটির অনেক স্থানে আমার উপস্থিতি রয়েছে। আমার কখনওই এক মুহূর্তের জন্যও মনে হয়নি যে নির্মল গান্ধীজির চরিত্র

কালিমালিপ্ত করেছে।' এই বিতর্কটি কেবল এক বিস্মৃত অধ্যায়ই নয়, এই ঘটনাটি খুব কম লোকেরই জানা। পুরুষোত্তমদাস ট্যান্ডন My days with Gandhi বইটির যে যে অংশ বাদ দেওয়ার কথা বলেছিলেন, সেগুলি সম্পর্কে অন্তত দুটি প্রজন্মের ভারতীয়দের জানিয়ে রাখছি। ওই অংশগুলি হল ঃ

Srirampur, Tuesday, 17-12-1946 :

At 3.20 in the morning, I heard Gandhiji talking aloud to Sushila Nayyar who had stayed over for the night with us. His voice seemed worried.

Some time after prayer, while I was conversing at the door of my cottage with a few friends, suddenly all of us heard a deeply anguished cry proceeding from the main room. It was Gandhiji's voice, and then we heard the sound of two loud slaps given on someone's body. The cry then sank down into a heavy sob. We were all amazed beyond measure and looked at one another. I ran towards the room, and when I reached the doorstep, I saw Gandhiji sitting upon his bed with his back reclining upon the wall, while his eyes were closed and tears were streaming down his face. Sushila was standing near by on the floor. Her face was also bathed in tears, but as she bent forward and tried to say something to Gandhiji, he waved her aside with a strong movement of his arms. This happened more than once.

I did not enter the room but returned to my own and decided that Gandhiji should be left in peace for the rest of the day. The day however proved fairly heavy, for some important matters had to be attended to. But to all those who came, I said that Gandhiji was feeling very much indisposed and it would be best if everyone took as little time as possible.

Gandhiji listened in silence, but expressed no remark.

I noticed that Gandhiji has been slightly absent-minded throughout the day. He sent a long letter to Sushila Nayyar.

Srirampur, Thursday, 19-12-1946 :

This was a very heavy day for Gandhiji. In the morning, Kularanjan Mukherji arrived from Calcutta. He is in charge of the hydro-therapy section of the Marwari Relief Society's Hospital; and, as Gandhiji takes a keen interest in naturecure methods, the Society has sent him here for a short time.

Omprakash Gupta conversed with Gandhiji for several hours during the day, and several times the latter had to remind him that he was feeling exhausted. Omprakash Babu wanted to discuss some personal matters with him. At one time, I heard Gandhiji plainly asking him if he had come to dedicate himself wholly to village work here. The real test was this : Was he prepared to continue the work even if Gandhiji were not there? If not, then he had evidently come because the latter's presence provided a sort of intoxication (*nesha*). It was not his business to provide such sop for anyone.

Others also come on interviews which were unnecessarily prolonged and left Gandhiji in an exhausted condition. Some of these interviews could not be prevented by me as the workers were old associates who had come from long distance.

Manu Gandhi, daughter of Jaisukhlal Gandhi, Gandhiji's nephew, arrived in Srirampur today.

At prayer time, Gandhiji felt too tired to make any speech.

The news had gone round that he was about to begin a tour on foot through the affected villages of Noakhali and Tipperah, and therefore several Press representatives and photographers arrived here today. I met them in a private conference and, communicated to them the following instructions from Gandhiji :

1. They should seek the permission of the villagers before staying anywhere. They should not be a burden to anyone.

2. They should help one another and share news without reserve.

3. They would not be allowed to accompany him in the walking tour, as Gandhiji did not want to travel with a large retinue.

4. He wished that the correspondents should make independent observation in the surrounding villages and try to find out if evacuees were returning home or not, and what was the effect of Gandhiji's presence on Muslim villagers.

An important letter was sent today to the Secretary of the Bengal Provincial Congress Committee. Already on the 29th of last month, I had written to the Vice-President of the same body to make a public statement to the effect that the number of persons killed was much lower than what had appeared in the Press in October. The latter had said in a contemporary public statement that the figure was nearly five thousand. But detailed enquiries had shown that it was no more than three hundred, although that was not the worst part of the disturbances. The cause of this exaggeration was easily understandable. If there were ten members in a family, and if only one had been murdered when the disturbances took place, then those who survived, escaped in different directions. And when they reached places of safety, each looked upon himself as the sole survivor and gave a high figure for those who had been killed. There was thus a multiplication of error. Now that the real facts were very nearly known, Gandhiji was anxious that the truth should be publicly stated. The Vice-President of the Congress Committee however felt otherwise. He wrote back to say that the figures in his October statement had been described as approximate. Gandhiji had called for the necessary Press cuttings from the Secretary. After going through them, I wrote to him under authority that it was true the figures were approximate, but there was nothing in the statement to indicate, by way of caution, that there might have also been error in the collection of data. A public worker of the Vice-President's standing had to be much more careful in respect of every word in a public utterance.

In the morning, while I was administering his daily bath, Gandhiji spoke to me of his own accord about the happenings of the 17th. Ever since that day, no word had passed on this subject between him and me.

He wished to learn from me as well as from Parasuram 'if Sushila Nayyar had fallen in our estimation' (*Tumhare nazar me gir gai hai?*), on account of that day's incident. I said, I could speak for myself, not for Parasuram. She had undoubtedly fallen, and the reason was this : No person however great had the right to disturb him as Sushila had apparently done. Gandhiji then said, 'Supposing she did so with a good intention, perhaps to help me in my own work? She may have been suggesting certain steps even for my sake, not for her own; even then, would you say she was wrong?'

I said, 'Yes, even then. If she felt that you were contemplating a wrong step, she might have offered her suggestions and then left you free to decide.'

Gandhiji said, 'She is against my plan of tour on foot in the present condition of my health. She thinks that, at least, one old companion who knows all about my personal needs should accompany me, and she offered her own services. She suggested that it would not be safe to depend on new workers like you and Parasuram, who know so little about my physical requirements.'

I said, 'If I had been in her position, I would have placed my views fully before you and left you free to decide. If the decision had not been favourable, I would have waited patiently until you discovered your error.'

After I spoke, Gandhiji repeated the substance of my views in his own language in order to make sure that he had understood me rightly.

Srirampur, Friday, 20-12-1946 :

The work in Srirampur was becoming heavier and heavier every day. So, when Manu joined us permanently, both Parasuram and myself felt greatly relieved. She has taken charge of the bath and much of the cooking, with the result that we can devote more time to office work.

When I reached Gandhiji's room even before 4 in the morning, I heard him talking to Manu in a low voice in his own bed, where she had gone to sleep at night. After prayer, Gandhiji called me and said that I should get ready a report on recent happenings in Noakhali. Things looked as if he would have to engage in a battle with the League Government in Bengal. He admitted that the non-violence which the whole country had so far evinced was non-violence of the weak. But he had cherished the hope that people would realize from experience that the non-violent method was more effective than violence in actual practice.

This expectation had, however, not materialized. The path which henceforth lay before him was the path which could only be trodden by the brave. Gandhiji mentioned the name of Jesus Christ, and said that Jesus was the 'Prince of passive resisters.' Indeed, there was no passivity in Him and His whole life was an epic of intensely heroic action.

Referring to Manu, he said, that he had been telling her how he personally felt that he had reached the end of one chapter in his old life and a new one was about to begin. He was thinking of a bold and original experiment, whose 'heat will be great'. And only those who realized this, and were prepared to remain at their posts, should be with him. Manu would look after his personal needs, while one more worker would be needed to deal with the Urdu correspondence and that would complete his new staff.

During bath, I said to Gandhiji, 'You have drawn me into your company and given me many liberties. If you pardon me, may I ask you a question? Did you slap Sushila the other day?', for I had not been able to get over the painful recollection of the two sharp sounds which had proceeded from within the room.

Gandhiji's face wore a sad smile and he said, 'No, I did not beat her, I beat my own forehead. When I was twentyfive years old, I once beat my own son; but that was the last time.

'Sushila is a gifted girl, and is of service to me in many ways. When she learnt about my proposed journey on foot, she began to argue against it. We had been talking ever since 2.30 in the night. I explained to her how my mission was going to take me to a lonesome journey through the Muslim villages. Muslims had been taught to regard me as an arch-enemy of Islam. If I was to overcome that feeling, I could only do so by entering into their midst in the most unprotected condition possible. I would have to depend upon them completely for all my needs and they would be free to do with me what they liked. But she was insistent that some old companion who knew about my personal requirements should be in my company. Then I grew impatient. If I could not convince one like her, who has known me for years, that the step was right, how could I hope to convince others? And I beat my own forehead as I wept.'

Srirampur, Sunday, 22-12-1946 :

This being Kasturba Day, Gandhiji was up at 2.30 a.m. and worked till prayer time. Prayer began at 4.15 a.m. Sushila Nayyar, Manu Gandhi and Parasuram did the reading of the *Bhagabad Gita*. While this was going on, Pyarelal dropped in with an English friend. Sushila left at about ten.

The Provincial Muslim League of Bihar has sent a printed report of the riots in that province. I went through a substantial portion of it before Gandhiji's bath, while he has already finished reading the report. Later on, he told me that even if half of what was written in that report were true, and if the Congress Ministers of Bihar had actually concealed anything from him, then it meant that the end of his life had been reached (*meri zindagi chali gai*). He would, in that case, have to go to Bihar and fast unto death. He had already lived a long life and had done more than an average man's share of work; if did not matter if the time had come for him to depart.

I argued with him that as Jawaharlal Nehru was coming soon, there should be no hurry, for he would get all the facts in a few days' time. But Gandhiji was restless. He said, the visit was yet a week away, and that was a long way off. The Muslim League had made conditions hot, and the iron must be struck while it was yet hot. The Congress Ministers of Bihar ought to have taken up the challenge of the League immediately; but them were procrastinating.

He then said that if he left for Bihar, it would mean a great blow to Noakhali. 'I do not know', he continued, 'what the Hindus will do then. Even if it comes to wholesale migration, let them do it. My place is now in Bihar. I shall go there practically as a representative of the Muslims to find out the truth.'

Today, I received a touching letter from Sushila Nayyar in which she tried to explain, from her own point of view, what had happened in the morning of the 17th. The letter is reproduced below in part :

'At night while reading Bapu's diary I read "I had a curious dream". I casually asked him what it was. He did not say and I kept quiet.

'At three o'clock the next morning, I woke up with the noise of Bapu jumping in bed. He said he was very cold and was taking exercise to warm up. After that, he asked me if I was awake and started telling me of his curious dream. After the dream he started explaining how his present step was a *tapascharya* (penance) for him, and how he was going through inconveniences. On the previous day, I had remarked that God did and would send him helpers in whatever he did.....In a short note I asked him if I would be allowed to come with him. I mentioned that what he had said about *tapascharya* and what I had said about God sending him help were not contradictory and tried to explain it. He answered with irritation that he had tried to explain things to me but had not succeeded.....I could see that he was getting worked up. So.....I walked away. Suddenly I heard him slap his forehead. I rushed back and stopped him.....

'I am completely unnerved.....I came yesterday with great trepidation. Bapu had asked me to come for Gita.....He again raised the topic this morning and I found that my self-control has not returned as yet.'

Sushila had left Srirampur in the morning in tears.

Srirampur, Monday, 23-12-1946 :

Early in the morning, at 5 o'clock, Gandhiji handed a note to me. It was Monday, his day of silence. He had written, 'I do not know what God is doing to me or through me. If you have the time and inclination I would like you to walk to Sushila at daybreak and return after passing some time with her and learning all about her requirements and her health. You can give her the whole of our conversation about her without reserve. The rest you will know from her if she cares to tell you. You can show this to her if you wish. If you propose to shoulder this burden, you will act as the spirit moves you. Don't work beyond your capacity.'

I made ready to go. In the meanwhile, Arun Datta a volunteer had come from the Nandigram refugee camp where out of 1,800 evacuees, Government rations had been stopped for 300. The Government were trying to force the evacuees to return home. Gandhiji gave them the following instruction, 'I do not want them to hunger strike at present. Let there be a full cause ready for such a strike. The question therefore is, are those who get their rations prepared to share with those (300) what they get? If they are, these should take their share while the matter is being prosecuted.'

The party then left for Nandigram in order to carry out Gandhiji's instructions.

I started for Changirgaon where Sushila is posted at 7.30 a.m. with some fruits for her and returned at eleven.

Srirampur, Wednesday, 25-12-1946 :

A telegram came from Jawaharlal Nehru in which he said that he would reach Srirampur on the 27th evening.

Members of the Friends' Service Unit have sent a bag of Christmas presents to us. The bag contained cigarettes, playing cards, a pair of canvas slippers, a towel, soap etc. Gandhiji seemed to be in a happy and playful mood today. He asked us to spread our gifts on the mat and then started distributing them among the volunteers here and elsewhere. The packet of cigarettes was a problem; but then suddenly Gandhiji asked me to keep it for Jawaharlal Nehru.

Rabindramohan Sengupta, Trailokya Chakraverty, Ananta De, Santimoy Dutt and Pratul Chaudhuri of the Revolutionary Socialist Party of India paid a visit to Gandhiji and wished to place their services at his disposal. Trailokya Babu confessed that, so far, all of us had failed to find a way out of the terrible fear which held the common man in its grip. It was time therefore to try Gandhiji's method of instilling courage before the country could earn its right to freedom.

I left Srirampur for Ramganj early in the morning and handed over the above letter to the Deputy Superintendent of Police for despatch to Calcutta. Then I went to the officer in charge of relief and rations. We went together with a few representatives of the public to inspect the bags

of rice in the godown. The public representatives were invited to choose the lowest grade of broken rice which could be accepted as an emergency measure for the current fortnight. The Officer was prepared to supply that grade of rice as far as possible from his stock and supplement it with wheat flour. It appears the matter will be set right soon.

While I was away, Parasuram approached Gandhiji and unburdened his mind on certain private matters. It will be remembered that Gandhiji had asked for his opinion regarding the happenings of the 17th morning just as he had done from me.

এরপর নির্মলবাবু নোয়াখালি থেকে গান্ধীজির দীর্ঘদিনের অনুগামী পরশুরামের চলে যাওয়ার ঘটনার উল্লেখ করেছেন। তিনি গ্রন্থের সংশ্লিষ্ট অধ্যায়টিকে 'এক বন্ধুর বিদায়' (A Friend's Parting) বলে চিহ্নিত করেছেন। উল্লেখ্য অধ্যায়টি হল এই :

A FRIEND'S PARTING

Srirampur, Tuesday, 31-12-1946 :

Yesterday, when I was away from the camp, Parasuram had spoken for an hour with Gandhiji on a certain private question. He had also told Gandhiji that I held a similar view to his own, but had refrained from giving expression to it because I did not, in any way, 'wish to disturb him in the work he had undertaken for the sake of Bengal'. At seven in the evening, Gandhiji therefore sent for me and asked me if Parasuram's report was correct. We were together till 8.30. I began to speak as usual in Hindi, but with Gandhiji's permission soon slipped into English. The following is a revised translation of my Bengali diary of that date.

I said to Gandhiji, I have deep reverence for you from a particular point of view. I have always looked upon you as one of the great pathfinders in human history. Men have been groping for ages past for some effective means of bringing about social change without recourse to violence. You are one of the pioneers in this respect. For many years I have read your writings with care and have formed a more or less concrete picture of your thoughts on the subject. I have also tried to observe how it works out in collective practice in which common men are involved.

There are in Bengal numerous workers who try to follow your teachings. They spin regularly, practise all kinds of austerities in personal life, but, instead of being able to conduct experiments in collective non-violence, often settle down into an individualistic practice of a set of non-violent rituals. They thus lose all effectiveness in the social or political field.

Those who thus practise austerities have not often taken to it because it is necessary in the pursuit of an ideal : but, in at least some cases, it springs from a mere love of austerities, or from the desire of finding favour in your eyes. As such, the austerity and humility which they exhibit before you become false. Repression does good only when it is a joyous enterprise undertaken for a noble cause. But under the above circumstances, the end becomes vague and over-shadowed by the means; with the result that such persons try to find compensation through other channels. A morbid hankering after fame and public approval may step in, or the personality may begin to crack under a load which nobody called upon it to bear. Thus, your love for asceticism results in an injury to the personality of those who do not know how to preserve a sense of social responsibility, which you personally never lose sight of.

Secondly, I have seen you lose temper and become sentimental at times; and have felt drawn closer to you on that account. If you had been completely free from all weaknesses, I would have perhaps revered you from a distance but would never have felt drawn close to you as I do today.

Parasuram has a complaint against the way in which you deal with different workers, how you seem to have personal preferences and fail to chastise when necessary. He has made this a cause of complaint against you. I do not do so. I have looked upon this part of your life as a necessary element of play to save you from the influence of the cold and barren atmosphere in which you have to work in the rest of your life. If you had tried to root out every trace of softness from your character and even succeeded in doing so, you would have become more distant from us from the human point of view. So, when you hold

the reins a little loose, and give way to anger, for instance, I do not look upon it as a matter for complaint.

But there is another side of the picture too.

There are many women, who, when they are in love, try to convert their object of love into a plaything. Sometimes they deal hard blows upon the object and sometimes they invite similar blows in return. There is a secret satisfaction in such play and in exclusive possession. That is an expression of our sexual instinct.

Among the women who are associated with you in social work, I have observed an attitude bordering on this kind. When women love men in normal life, a part of their psychological hunger is satisfied by the pleasure which they derive in the physical field. But when women pay their homage of love to you, there can be no such satisfaction, with the result that when they come close to you personally, their mind becomes slightly warped. Of course, all of us are neurotics to a more or less extent. But the effect of your contact has an undoubtedly dangerous influence upon some of your associates, whether male or female.

Parasuram is a simple, straightforward man. He has told you from his own point of view what he considers wrong. Although I do not share his opinion about right or wrong, yet I felt sympathy for his point of view.

Gandhiji listened in silence and when I had finished said, 'Your hint is that—should be sent away from here'. Of course, that was never my intention although that was an important item in Parasuram's demands.

Parasuram broke in by saying that whatever Gandhiji's attitude may be, as a common man he would say that he should give no occasion for any one to misunderstand him. If reflections were cast on Gandhiji's personal character, the cause for which he stood would itself suffer. This was something he could not bear personally. While at school, he had once come to blows with mates when they had cast aspersions against Gandhiji's character. Moreover, had he not himself promised to his co-workers in Sevagram that he would keep women workers away from his immediate company?

In explaining his position, Gandhiji said that it was indeed true that he permitted women workers to use his bed, this being undertaken as a spiritual experiment at times. Even if there were no trace of passion in him of which he was conscious, it was not unlikely that a residue might be left over, and that would make trouble for the girls who took part in his experiment. He had asked them if, even unconsciously, he had been responsible for evoking the least shade of evil sentiment in their heart. This 'experiment', as he called it, had been objected to by distinguished co-workers like Narahari (Parekh) and Kishorlal (Mashruwala); and one of their grounds of complaint had been based on the possible repercussions which the example of a responsible leader like him might have upon other people.

When Gandhiji finished his personal explanation, I ended by saying that unless I had known how great he was, and unless I had a purely objective attitude towards his life, I might have given way to sentimentality and subscribed to some of the charges laid against him by Parasuram.

Gandhiji then asked me to help Parasuram in framing his complaints in writing.

Srirampur, Wednesday, 1-1-1947 :

Parasuram typed out an enormous letter running over ten foolscap pages, in which he expressed his views with great clarity and suggested certain changes in our life here.

As this was the last day of our stay at Srirampur, I got up at two and wrote out my personal diary which has been quoted under yesterday's date. A pretty large amount of correspondence had accumulated, and all through the day, I tried to clear up the arrears of work.

Charu Chandra Chaudhuri of the Khadi Pratisthan came with a statement of accounts in which it appeared that more than one lac of rupees had been subscribed by the public for Gandhiji's work in Noakhali. The expenses incurred up to date, amounted to a little over Rs. 8,000/- in all. This had been advanced by the Khadi Pratisthan of Sodpur. Gandhiji did not

wish to burden the Khadi Pratisthan with these expenses and made arrangements for repaying the advance out of the sum contributed by the public.

Chandipur, Thursday, 2-1-1947 :

Early in the morning about a dozen volunteers arrived in order to carry all over belongings to the next halting station at Chandipur. All the things had already been made up into packages.

Just before Gandhiji left, the members of the household gathered together and bade him farewell. We started at 7.30 a.m., and as Gandhiji walked across the paddy fields recently laid bare after the harvest had been gathered in, he halted for a few minutes at the residence of the Chakraverty family in the southern extremity of Srirampur. In that house, not a single hut had been left standing by the miscreants. Chandipur was reached at about 9 a.m., although the distance was no more than 3 miles.

The day was spent in arranging our things at the residence of the Mazumdars. Prayer was held in the open space north of the tank at 4.30 p.m. Gandhiji took his meals after this, and then proceeded towards Changirgaon where Sushila Nayyar is posted.

Before leaving Srirampur, Gandhiji had written a reply to Parasuram's letter, in which he said :

'I have read your letter with great care. I began it at 3 a.m., finished reading it at 4. a.m. It contains half-truths which are dangerous. You wronged me, the parties you mention, yourself and the cause by suppressing from them and me your opinion about them.

'I cannot concede your demands. The other points you raise do not make much appeal to me.

'Since such is your opinion and there is a conflict of ideals and you yourself wish to be relieved, you are at liberty to leave me today. That will be honourable and truthful. I like your frankness and boldness. My regard for your ability as a typist and shorthand writer remains undiminished and I was looking forward to taking a hand in bringing out your other qualities. I am sorry that it cannot be.

'My advice to you is that you should confer with Pyarelalji and Sushilabehn. You should take Kanubhai's guidance in shaping your future. I shall always be interested in your future and shall be glad to hear from you when you feel like writing to me. Finally let me tell you that you are at liberty to publish whatever wrong you have noticed in me and my surroundings. Needless to say you can take what money you need to cover your expenses'.

A few days later, Gandhiji perhaps did an injustice to Parasuram, when in a letter to another friend, he wrote, 'Parasuram has left..... because he did not believe in my ideals..... The immediate cause I think was that Manu shared the same bed with me. He thought that it was improper not because, as he said, there was anything wrong with me or Manu, because he know that she was in the place of grand-daughter to me, but because it would be a bad example for young men, for example, like himself.....I believe that everybody in the camp knows that Manu is sharing my cot and, in any case, I do not want to do anything in secrecy. I am not advertising the thing. It is a sacred thing to me. But those who want to see everything wrong about me are at liberty at any time they like to advertise the fact and give it what colour they like.'

This was completely unfair to Parasuram, because Parasuram's complaint as summarised in my own diary or in his subsequent letter was quite different and it was inspired by the deepest of loyalty to the cause for which Gandhiji stood. Only, his point of view was the point of view of the common man; he did not realize how contact with men and women on a common level might be a spiritual need for Gandhiji. My belief is that while writing the above letter, Gandhiji did not perhaps have Parasuram's letter before him and was evidently reporting from memory, whcih did not serve him right at least on this particular occasion.'

My Days with Gandhi (by Nirmal Kumar Basu) গ্রন্থের যে যে অংশগুলি আমি এখানে উদ্ধৃত করেছি, সেই অংশগুলি সম্পর্কেই পুরুষোত্তমদাস ট্যান্ডনের আপত্তি। লখনউয়ের National Herald পত্রিকায় (১৯৫৪ সালে) ট্যান্ডনের ক্রুদ্ধ সমালোচনা এবং নির্মলবাবুর পক্ষে জওহরলাল নেহরুর জোরালো বক্তব্যের পর আমি এই বিষয়টি নিয়ে বিশেষ কিছু শুনিনি। নির্মলবাবুর এই

ঐতিহাসিক বইটি আমি অসংখ্যবার পড়েছি এবং এখনও মাঝে মাঝে চোখ বুলাই। ১৯৬৪ সালে গান্ধীজি সম্পর্কে অন্য একটি প্রসঙ্গে কথা বলতে আমি নির্মলকুমার বসুর কাছে যাই। আমি তখন 'যুগান্তর' পত্রিকায় কাজ করি। নির্মলবাবুর বোসপাড়া লেনের বাড়ি 'যুগান্তর' পত্রিকা অফিস থেকে মাত্র মিনিট তিনেকের মধ্যে। যে-ঘটনাটি সম্পর্কে প্রথম আমি নির্মলবাবুর সঙ্গে কথা বলি সেটি হল Leonard Mosley-এর বিখ্যাত গ্রন্থ *Last Days of the British Raj* সম্পর্কে। এই গ্রন্থটির এক জায়গায় এরকম বলা হয়েছে যে লর্ড মাউন্টব্যাটেনের সঙ্গে দেখা করার জন্য ১৯৪৭ সালের মার্চের শেষের দিকে গান্ধীজি পাটনা থেকে দিল্লি যাচ্ছিলেন। তখন রাতে গান্ধীজি যখন ট্রেনে ঘুমিয়েছিলেন, তখন এক চোর গান্ধীজির প্রিয় ট্যাক-ঘড়িটি বালিশের তলা থেকে চুরি করে নিয়ে যায়। আমার ঘটনাটিকে খুবই অবিশ্বাস্য মনে হয়েছে। কারণ গান্ধীজির সঙ্গে ওই কামরায় কেবলমাত্র তাঁর নাতনি মনু গান্ধী ছিলেন; আর 'চোর' গান্ধীজির কামরায় কী করে ঢোকার সুযোগ পাবে? নির্মলবাবু আমাকে তারিফ করে বললেন, তুমি ঠিক জায়গায় ধরেছ। ওই ট্যাক ঘড়িটি হারিয়ে যায় বিহারশরিফের কাছে একটি গ্রামে। নোয়াখালি থেকে পাটনা যাওয়ার পথে মাত্র একটি রাত আমরা সোদপুরে কাটাই। পরদিন সন্ধ্যায় আমরা পাটনায় পৌঁছাই। বিহারের বহু গ্রামে তখন দাঙ্গা চলছে। বিহারশরিফের কাছে গান্ধীজির সঙ্গে আমরা যখন একটি গ্রামে পৌঁছলাম, তখন হাজার হাজার আর্ত মুসলমান গান্ধীজির পায়ের কাছে পড়ে কাঁদতে লাগল। আগের রাতে বেশ বৃষ্টি হওয়ায় রাস্তার মাটি কাদা হয়ে গিয়েছিল। গান্ধীজিকে ঘিরে প্রচণ্ড ধাক্কাধাক্কি আরম্ভ হলে কোমর থেকে গান্ধীজির কাপড় খুলে যাচ্ছিল। আমি অতিকষ্টে গান্ধীজির কোমর জড়িয়ে রাখি। ওই সময়ে গান্ধীজির কোমর থেকে ট্যাক-ঘড়িটি পড়ে যায়। পরে ওই জায়গায় আমরা অনেক খোঁজাখুজি করেছিলাম। কিন্তু ট্যাক ঘড়িটি আর পাওয়া গেল না।' এই আলোচনার সময় আমি নির্মলবাবুর কাছ থেকে একটি দিন ও সময় নির্দিষ্ট করে নিয়েছিলাম নোয়াখালি প্রসঙ্গে তাঁকে কিছু প্রশ্ন করব বলে।

১৯৪৭ সালের ৭ সেপ্টেম্বর সন্ধ্যায় গান্ধীজি বেলেঘাটা থেকে দিল্লির ট্রেন ধরবার জন্য রওনা হওয়ার সময় নির্মলবাবু তাঁকে শেষবারের জন্য প্রণাম করেছিলেন। ওই বছরেই শেষদিকে সম্ভবত নভেম্বর মাস থেকে নির্মলকুমার বসু 'শনিবারের চিঠি' নামের বিখ্যাত সাপ্তাহিক পত্রিকায় 'নোয়াখালিতে গান্ধীজি'—এই শিরোনামে ধারাবাহিক লিখতে আরম্ভ করেন। তাঁর এই ধারাবাহিক লেখার শেষ কিস্তিটি আমার যতদূর মনে পড়ে ১৯৪৯ সালের জানুয়ারির কোনও একটি সংখ্যায় প্রকাশিত হয়। এটি 'রঞ্জন পাবলিশিং হাউস' পুস্তকাকারে প্রকাশ করেছিল কি না আমার জানা নেই। তবে নির্মলবাবু তাঁর এই রচনার শেষ অংশে বলেছিলেন '...কোন এক বিস্মৃত অতীতে ভারতীয় শিল্প সাধনায় এক সাধকশিল্পী অর্ধনারীশ্বরের মূর্তি কল্পনা করিয়াছিলেন। মাটির গড়া দেবতার মূর্তিতে নয়, রক্তে মাংসে গড়া গান্ধীজির মানবচরিত্রে তাহা প্রত্যক্ষ করিয়া নিজেকে ধন্য করিয়াছি ধন্য করিয়াছি ধন্য করিয়াছি।' এরপর তিনি ১৯৫৩ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে *My Days with Gandhi* প্রকাশ করেন। ১৯৬৪ সালে নির্মলবাবুর স্থির করে দেওয়া দিন ও সময় অনুযায়ী আমি তাঁর কাছে গেলাম। আলোচনা প্রসঙ্গে আমি প্রথমেই 'শনিবারের চিঠি'তে তাঁর ধারাবাহিক বাংলারচনার কথা তুলে লেখার শেষ কয়েকটি লাইন মুখস্থের মতো বলায় নির্মলবাবু খুবই স্নেহের কণ্ঠে বললেন, 'তুমি একেবারে হৃদয় দিয়ে পড়েছ দেখছি।' এরপর আমি *My Days with Gandhi*-র প্রশ্ন তুলে পুরুষোত্তমদাস ট্যান্ডনের National Herld পত্রিকার বিরূপ সমালোচনার কথা বললাম। এবার নির্মলবাবু অনেকটা বিস্ময়ের সঙ্গেই বললেন 'এটাও তোমার নজরে পড়েছে, এতে মনে হচ্ছে গান্ধীজি সম্পর্কে তুমি খুবই আগ্রহী।' অনেকটা সাহস পেয়ে আমি তখন বললাম, ১৯৪৬ সালের ১৭ ডিসেম্বর তারিখে সকালবেলায় নোয়াখালির শ্রীরামপুরের গান্ধী-শিবিরে ডা: সুশীলা নায়ারকে কেন্দ্র করে যে-ঘটনা ঘটেছিল এবং গান্ধীজির স্নেহধন্য পরশুরামের চলে যাওয়া সম্পর্কে আপনি নিজের কথা নিজের অনুভূতি সম্পর্কে একেবারেই নীরবতা পালন করেছেন। আপনি অন্যদের প্রতিক্রিয়া ও অনুভূতির কথাই আমাদের জানিয়েছেন। নির্মলবাবু অনেকক্ষণ চুপ করে থেকে আমাকে প্রশ্ন করলেন, 'এতদিন পরে আমার অনুভূতির কথা জেনে তুমি কী করবে? তুমি কি কিছু লিখবে? সেক্ষেত্রে কিন্তু ওই লেখার বিশ্বাসযোগ্যতা নিয়ে প্রশ্ন উঠবে। আর যদি কৌতূহল নিবৃত্তি করতে চাও তাহলে আমি তোমাকে আমার জীবদ্দশা পর্যন্ত কৌতূহল জিইয়ে রাখতে বলব।'

আমি তাঁকে বললাম, আপনার বইতে এবং প্যারেলাল (গান্ধীজির স্থায়ী সেক্রেটারি) তাঁর বই *Gandhi The Last Phase—Vol II*-এ ১৯৪৭ সালের ৭ সেপ্টেম্বরের বেলুড় স্টেশনের ঘটনাটির বর্ণনা দিতে গিয়ে বলেছেন যে বেলেঘাটা থেকে গান্ধীজিকে হ্যারিসন রোড ধরে হাওড়া স্টেশনে নিয়ে গেল না। কারণ গোয়েন্দাদের খবর ছিল যে কলেজ স্ট্রিটে ও বড়বাজারে গান্ধীজির গাড়ির ওপর উগ্রহিন্দুরা আক্রমণ চালাবে। তাই গোপনে গান্ধীজিকে বি টি রোড-দক্ষিণেশ্বর দিয়ে বেলুড় স্টেশনে নিয়ে যাওয়া হল। সেখানে দিল্লিগামী

ট্রেন থামিয়ে গান্ধীজিকে গাড়িতে তোলা হল। সে সময় বেলুড় প্ল্যাটফরমে দাঁড়িয়ে রাজীতিতে গান্ধীজির এক পরাক্রমশালী প্রতিপক্ষ যিনি গান্ধীজিকে বারংবার নোয়াখালি যেতে বাধা দিয়েছিলেন, সেই হুসেন শাহিদ সুরাবর্দি অশ্রুরুদ্ধকণ্ঠে বলেছিলেন, 'এই পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ মানুষটিকে এভাবে লুকিয়ে বাংলা থেকে যেতে হল!' তাই আপনি বিংশ শতাব্দীর বিশ্বের অন্যতম শ্রেষ্ঠ মানুষ গান্ধীজি সম্পর্কে আমার কৌতূহল কেন নিবৃত্ত করবেন না? এবার নির্মলবাবু হেসে ফেলে বললেন, 'বিশ্বাসযোগ্যতার দায়ভাগ পুরোটাই তোমার কিন্তু।'

নির্মলবাবু বলতে আরম্ভ করেন, 'তুমি বইটা অনেকবারই পড়েছ। তুমি পুরুষোত্তমদাস ট্যান্ডনের সমালোচনা এবং আমার সমর্থনে জওহরলাল নেহরুর কথাগুলিও পড়েছ। যেটুকু তোমার জানা নেই সেটা হল, গান্ধীজি রাতের অন্ধকার যথেষ্ট থাকতেই প্রাতঃভ্রমণে বেরিয়ে যেতেন। ওই সময় গান্ধীজির কাছাকাছি থাকত একজন শিখ সর্দারজি, তিনি ইস্টার্ন ফ্রন্টিয়ার রাইফেলস-এর (ই এফ আর) এক বয়স্ক সৈনিক। কিন্তু আগে সরকারিভাবে যখন গান্ধীজির প্রহরার জন্য প্রস্তাব করা হয়, তখন তিনি তা প্রত্যাখ্যান করেন। ওই সময় ইস্টার্ন ফ্রন্টিয়ার রাইফেলসের উক্ত বয়স্ক শিখ সৈনিক নোয়াখালিতে তাঁর ব্যাটেলিয়ানের সঙ্গে ছিলেন। তিনি একদিন এসে গান্ধীজির পা ছুঁয়ে বললেন, তাঁর জীবনের বাকি দিনগুলি তিনি গান্ধীজির সেবায় নিযুক্ত থাকতে চান। গান্ধীজি তাঁকে শর্ত দিলেন যে বন্দুক কাঁধে নিয়ে তিনি গান্ধীজির পাশে চলতে পারবেন না। তবে যেহেতু তরবারি বহন করা শিখ ধর্মের অঙ্গ, সেহেতু সেটি বহন করা চলতে পারে। এভাবে গান্ধীজির একা চলাফেরার সময় তাঁর জন্য একরকম প্রহরার ব্যবস্থা করা হল নোয়াখালির গ্রামগুলিতে। ওই সময়কার খবরের কাগজের ছবিতে ওই বয়স্ক শিখ সৈনিকটিকে বিভিন্নভাবে গান্ধীজির পিছনে ও পাশে দেখা গিয়েছে। এছাড়া UNESCO ও Gandhi Peace Foundation তাদের Movie Cameraতে গান্ধীজির নোয়াখালি সফরের যে ছবি সংরক্ষণ করেছে, তাতেও ওই শিখ সৈনিকটিকে খুব ভালভাবেই দেখানো হয়েছে। (১৯৬৮ সালে গান্ধীজির জন্মশতবর্ষের সূচনাতে কলকাতার Globe সিনেমা হলে ওই ছবিটি দেখানো হয়েছিল। আমি তখনকার রাজ্যপাল ধর্মবীরের পাশে বসে ওই ছবিটি দেখেছিলাম। তখন নির্মলবাবুর কথা বারংবার মনে হয়েছিল। ছবিতে তিনিও ছিলেন। কিন্তু তিনি আর আমাদের মধ্যে ছিলেন না।)

নির্মলবাবু বলছিলেন, আমাদের দেশে উপকূলবর্তী অঞ্চলে শীতের সময় হঠাৎ হঠাৎ বৃষ্টি এসে যায়। ১৭ ডিসেম্বর (১৯৪৬) গান্ধীজি যখন আশ্রম থেকে প্রায় আধ মাইল দূরে হাঁটছিলেন, তখন হঠাৎ বৃষ্টি এসে পড়ল। শিখ সর্দারজি দৌড়ে গান্ধীজির কাছে এসে তাঁর গায়ের ইউনিফর্ম কোটটি খুলে গান্ধীজির মাথা ঢাকা দিতে চাইলেন। কিন্তু গান্ধীজি রাজি নন। তখন শিখ সৈনিকটি গান্ধীজিকে পিঠে তুলে নিয়ে ছুটতে চাইলেন। গান্ধীজি তাতেও রাজি হলেন না। তখন অগত্যা গান্ধীজি যাতে পিছলে পড়ে না যান, সেজন্য শিখ সর্দার শক্ত করে গান্ধীজির হাত ধরে তাঁকে আশ্রমে পৌঁছে দিলেন। ৭৯ বছরের গান্ধীজি তখন শীতে ঠকঠক করে কাঁপছিলেন। নোয়াখালিতে গান্ধীজির ঘরে বেশিরভাগ দিনই নাতনি মনু গান্ধী থাকতেন। কখনও কখনও মনুর সঙ্গে সুশীলা নায়ারও থাকতেন। মনুকে আগের দিন অন্য রিলিফ কেন্দ্রে পাঠানোতে গান্ধীজিকে পরিচর্যার দায়িত্ব সবটাই ছিল সুশীলার উপর। সুশীলা ডাক্তার হওয়ায় এক্ষেত্রে কিছু সুবিধাও ছিল। সুশীলা আপাদমস্তক ভেজা গান্ধীজিকে দেখে হাঁকডাক দিয়ে আমাকে ও হেমপ্রভাদিদিকে ডাকতে পারতেন। কিন্তু তিনি তা না করে একা একাই গান্ধীজিকে মুছিয়ে শুকনো কাপড় পরিয়ে গান্ধীজিকে কয়েকটা কম্বল দিয়ে চাপা দিলেন। কিন্তু তাতেও গান্ধীজির কাঁপুনি থামছে না দেখে সুশীলা নিজে নিজেই একটা সিদ্ধান্ত নিলেন। এটা আমরা জানি যে পুরুষদের চেয়ে মেয়েদের দেহের উত্তাপ অনেকটাই বেশি। সুশীলা মেয়ে হিসাবে এটা জানেন, ডাক্তার হিসাবে আরও বেশি জানেন। সুশীলা সেই মুহূর্তে গান্ধীজির শরীরের উত্তাপ ফিরিয়ে আনার জন্য কতগুলি কম্বল শুদ্ধ গান্ধীজিকে বুকে জাপটে ধরে ঝাঁকাচ্ছিলেন। গান্ধীজির ঘরের দরজা কখনওই ভিতর থেকে বন্ধ থাকে না, সব সময় ভেজানো থাকে এবং ওই সময় ভেজানো দরজা ঠেলে পরশুরাম গান্ধীজিকে কিছু বলার জন্য ঢোকেন। সুশীলা গান্ধীজিকে যে ঝাঁকাচ্ছিলেন, তা পরশুরাম দেখেন। এই দৃশ্যটা পরশুরামের অনুভূতিতে ভাল লাগেনি। এটাই পরশুরামের গান্ধীজিকে ছেড়ে চলে যাওয়ার কারণ। সুশীলার এই ব্যবস্থা গান্ধীজিও বিব্রতভাবে গ্রহণ করেছেন। যার জন্য তিনি নিজে কপালে করাঘাত করেছিলেন, যেটা আমি মনে করেছিলাম গান্ধীজি বুঝি সুশীলাকে চড় মেরেছেন। কিন্তু আসলে বিব্রত গান্ধীজি নিজের কপালে করাঘাত করেছেন।'

আমি নির্মলবাবুর কাছে জানতে চেয়েছিলাম যে ডা. সুশীলা নায়ারের কাছে ওই ব্যবস্থা ছাড়া বিকল্প কিছু ছিল কিনা। নির্মলবাবু জবাব দিয়েছিলেন 'সম্ভবত নয়। সুশীলা যদি গান্ধীজির আত্মজা হতেন, তাহলে হয়ত তিনি ওই ব্যবস্থাই নিতেন। কিন্তু সুশীলার উচিত ছিল হেমপ্রভাদিদিকে ও আমাকে চেঁচিয়ে ডাকা। কিন্তু তিনি তা করলেন না। এটা তাঁর

মাতব্বরি মনোভাব। সুশীলার এই মানসিকতা আমি অন্যভাবে অনেকবার দেখেছি। এটা কিন্তু মনু গান্ধীর মধ্যে আদৌ ছিল না। বিহারে (মার্চ, ১৯৪৭) ও বেলেঘাটায় (আগস্ট, সেপ্টেম্বর, ১৯৪৭) মনু ও আমার ওপর গান্ধীজির সব দায়িত্ব ছিল। ফলে নিজেদের মধ্যে কখনওই কোনও সমস্যা দেখা দেয়নি।' আমার আর একটি বিষয়ে কৌতূহল নির্মলবাবুর কাছে ছিল। সেটি ছিল যে কেন তিনি *My Days with Gandhi* গ্রন্থে ওই ব্যাখ্যাটুকু দিলেন না। এখানে নির্মলবাবু বলেছিলেন, বইটিতে তাঁর নিজের ব্যক্তিগত অনুভূতি ও ব্যাখ্যার জায়গা তিনি রাখেননি। কোথায়ও তিনি 'শোনা কথা' ব্যবহার করেননি। যেমন ১৭ ডিসেম্বর (১৯৪৬) সকালে গান্ধীজির বৃষ্টিতে ভেজার ব্যাপারটা তিনি সবিস্তারে শিখ সর্দারজির কাছ থেকে শুনেছেন। এরপর নোয়াখালিতে গান্ধীজি যাতে ওরকম অবস্থায় না পড়েন, সেজন্য ওইদিন থেকে সর্দারজি একটি ছাতা সঙ্গে রাখতেন। এছাড়া হেমপ্রভা মজুমদার চার-পাঁচটি ছোট হাঁড়িভর্তি তুষ রেখেছিলেন। গান্ধীজি শীতে কাতর বোধ করলে তুষের হাঁড়িতে আগুন ধরিয়ে দেওয়ার জন্য। পূর্ববাংলায় গরিব গৃহস্থবাড়িতে শীতের মরশুমে এটা ছিল সবচেয়ে গ্রহণযোগ্য ব্যবস্থা। ট্যান্ডনের বিরূপ সমালোচনা সম্পর্কে নির্মলবাবু আমাকে জানিয়েছিলেন যে ট্যান্ডন তাঁকে কোনও চিঠি লেখেননি। অথচ ট্যান্ডনের সঙ্গে তাঁর যথেষ্ট আলাপ পরিচয় ছিল। National Herald পত্রিকায় ট্যান্ডনের সমালোচনা প্রকাশের পর নির্মলবাবুর সমর্থনে জওহরলাল নেহরুর বিবৃতি প্রকাশের প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই তিনি নেহরুর কাছ থেকে একটি ব্যক্তিগত চিঠি পেয়েছিলেন। নেহরু বইটিকে (*My Days with Gandhi*) গান্ধীজির শেষ জীবনের এক ঐতিহাসিক দলিল বলেছিলেন। এর বছর দু'য়েক পরে ১৯৫৭ সালে নেহরু বেশ কয়েকদিন কলকাতায় থাকার সময় নির্মলবাবুকে দেখা করতে বলেছিলেন। তিনিও তাঁর সঙ্গে দেখা করেছিলেন। নির্মলবাবু ১৯৬৪ সালে এই বিষয়ে কথা বলার সময় বারংবার আমাকে সাবধান করেছিলেন 'কিছু না লেখার জন্য।' কারণ 'সেক্ষেত্রে তোমার লেখার বিশ্বাসযোগ্যতা নিয়ে প্রশ্ন উঠবে। আর আমি তখন তোমার পক্ষে দাঁড়ানোর জন্য বেঁচে থাকব না।' তাঁর এই শেষের উক্তিটি ভীষণ অনিবার্য হয়ে দেখা দিয়েছিল মাত্র দু'বছর পরেই। অধ্যাপক নির্মলকুমার বসু আমাদের কাছ থেকে চিরবিদায় নিলেন তখন।

আমিও ওই বিষয়ে আদৌ কিছু লিখব বলে ভাবিনি। কিন্তু ১৯৯৩ সালে মহাত্মা গান্ধীর জন্মের ১২৫ বছরকে স্মরণ করার জন্য তখনকার প্রধানমন্ত্রী পি ভি নরসিমা রাও একটি জাতীয় কমিটি গঠন করলেন। ওড়িশার বিখ্যাত সমাজবাদী নেতা ও গান্ধীভক্ত সুরেন্দ্রনাথ দ্বিবেদী ছিলেন ওই কমিটির সভাপতি। গান্ধীজি সম্পর্কে আমার যাবতীয় ইংরাজি ও বাংলা লেখার কপি আমি দ্বিবেদী মহাশয়কে পাঠাই। আমার ওই লেখাগুলির সবই ছিল ১৯৪৬-৪৭ সালের প্রেক্ষাপটে। সুরেন্দ্রনাথ দ্বিবেদীর সঙ্গে আমার রিপোর্টার হিসাবে অল্প পরিচয় ছিল। তিনি একসময় লোকসভার ও রাজ্যসভার তীক্ষ্ণ শ্লেষযুক্ত ও নির্ভীক বাগ্মিতার জন্য বিশেষ খ্যাতিমান ছিলেন। তিনি আমার চিঠি পেয়ে যে জবাব দিয়েছিলেন তাতে তিনি নির্মলবাবুর *My Days with Gandhi* গ্রন্থটির উল্লেখ করে বেশ কিছুটা ক্ষোভ প্রকাশ করেন। উপলক্ষ সেই ডা. সুশীলা নায়ার ও পরশুরামের নোয়াখালি থেকে চলে আসা। পুরুষোত্তমদাস ট্যান্ডনের মতো দ্বিবেদীমহাশয়েরও ধারণা যে নির্মলবাবু তাঁর বইটিতে গান্ধীজির 'চরিত্রে কালিমা লেপনের' চেষ্টা করেছেন। সেইসঙ্গে সুরেনবাবু আমাকে একথাও জানান যে, মালতী চৌধুরি নোয়াখালির প্রেক্ষাপটে গান্ধীজি সম্পর্কে একটি বই প্রায় সম্পূর্ণ করে ফেলেছেন। উল্লেখযোগ্য যে এক অসাধারণ নির্ভীক গান্ধীবাদী মহিলা মালতী চৌধুরিও নোয়াখালিতে গান্ধীজির সঙ্গে দীর্ঘদিন ছিলেন। যেহেতু গান্ধীজির শেষের দিনগুলি সম্পর্কে আমার বিশেষ আগ্রহ সেজন্য সুরেন্দ্রনাথ দ্বিবেদী আমাকে ওড়িশার অঙ্গুল (Angul) গান্ধী আশ্রমে (যেখানে মালতী চৌধুরি থাকেন) খোঁজ নিতে অনুরোধ করেন। এই চিঠিটি আমি ১৯৯৩ সালের শেষদিকে পাই। সুরেনবাবুর চিঠি পাওয়ার পর আমি তো কিছুদিন ধরে ভেবেছি অঙ্গুলে যাওয়ার কথা। কারণ মালতী চৌধুরি সম্পর্কে আমি অপরিসীম শ্রদ্ধা পোষণ করি। তাছাড়া আমি তাঁকে আন্দোলনের কর্মী হিসাবে কলকাতায় জয়প্রকাশ নারায়ণের সঙ্গে অনেকবার দেখেছি। ১৯৭৫ সালের ২৫ জুনের মধ্যরাতে দেশে জরুরি অবস্থা জারির বিরুদ্ধে যে মহিলার প্রথম প্রতিবাদী কণ্ঠ উচ্চারিত হয়েছিল তিনি ছিলেন মালতী চৌধুরি। পরের দিন বিজু পট্টনায়কের হাত ধরে ভুবনেশ্বরের পথে পথে বিক্ষোভ দেখিয়ে গ্রেফতার বরণ করেছিলেন মালতী চৌধুরি। ১৯৮৭ কিংবা ১৯৮৮ সালে ভারত সরকারের গান্ধী শান্তি পুরস্কার তিনি প্রত্যাখ্যান করেন। কারণ ওই পুরস্কার প্রধানমন্ত্রী রাজীব গান্ধীর হাত থেকে গ্রহণ করতে হবে বলে। ১৯৯৪ সালের মার্চ মাসে অঙ্গুল যাব মনস্থ করে আমি ভুবনেশ্বর গেলাম। ভুবনেশ্বর থেকে অঙ্গুল আশ্রমে ফোন করে খবর নিলাম যে মালতী চৌধুরি এতই অসুস্থ যে তিনি অর্ধচেতনায় আচ্ছন্ন। তাঁর সঙ্গে কথা বলার কোনও প্রশ্নই ওঠে না। এভাবে ভুগতে ভুগতে মালতী চৌধুরি ১৯৯৮ সালে চিরবিদায় নিলেন।

(ক্রমশ)

উপনিবেশের প্রতিপ্রবাহ : দীন মহম্মদ

সৌমিত্রশঙ্কর সেনগুপ্ত

The power to narrate, or to block other narratives from forming and emerging...constitutes one of the main connections between culture and imperialism...From the begining of Western speculation about the orient, the one thing the orient could not do was to represent itself.

—Edward Said

এশিয়া মহাদেশে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের উত্থানের পর্বে দক্ষিণ এশিয়া বিশেষত ভারত থেকে বিলাতে যাওয়া মানুষেরা কীভাবে ব্রিটিশ-সমাজে যুক্ত হয়েছেন তা বেশ কিছুকাল ধরে গুরুত্বের সঙ্গে আলোচিত হচ্ছে। উপনিবেশবাদী ও উপনিবেশবাসীর সম্পর্কের বিবর্তন, বিভিন্ন কালপর্যায়ে এই সম্পর্কের রূপ, প্রাক্তন উপনিবেশগুলি থেকে ব্রিটেনে অভিবাসন—গবেষণার প্রেক্ষাপটটি বিপুল। সমসাময়িক গবেষকদের মধ্যে শ্রদ্ধার সঙ্গে উচ্চারিত নাম অধ্যাপক মাইকেল ফিশার। তাঁর শ্রমসাধ্য গবেষণার ফলে ১৭৯৪ সালে আয়ারল্যান্ডে প্রকাশিত *The Travels of Dean Mahomet* গ্রন্থটি দু'শো বছর পরে বিস্মৃতির অতল থেকে উঠে এসেছে এবং দীন মহম্মদ স্বীকৃতি পেয়েছেন ইংরাজি ভাষার প্রথম এশীয়, ভারতীয় তথা বাঙালি (দীন আত্মপরিচয়ে নিজেকে বাংলার মানুষ বলেছেন) লেখক হিসাবে।

ভারতীয়দের বিলাতে যাওয়া এবং সেখানকার স্থায়ী বাসিন্দা হওয়া শুরু হয়, অষ্টাদশ শতাব্দীর সূচনায়। প্রথম দিকের অভিবাসীরা বিলাতে গিয়েছিলেন ভারত-প্রত্যাগত ইংরাজ রাজপুরুষদের ভৃত্য হিসাবে কিংবা জাহাজের নাবিক হয়ে। রাজকীয় দূত বা অতিথি এবং ভ্রমণকারী হিসাবে বিলাতে গেছেন ও ফিরে এসেছেন এমন ভারতীয়ের সংখ্যাও কম নয়। দীন মহম্মদ এদের থেকে আলাদা। তিনি প্রথম ভারতীয় যিনি বিলাতে গিয়ে পেশাদার হিসাবে আত্মপ্রতিষ্ঠার স্বাধীন উদ্যোগ নিয়েছিলেন। বিচিত্র সব পেশায় আত্মনিয়োগ করেন তিনি। কফি হাউস ও ভেপার বাথ হাউসের পরিচালনা, ভারতীয় দাঁতেরমাজন ও কলপের বিপণন ইত্যাদি। সবকিছু ছাপিয়ে এত বছর পর তাঁর নাম আলোচিত হচ্ছে পূর্বোক্ত গ্রন্থটির জন্য।

১৯৯০ সাল পর্যন্ত দীন মহম্মদের নাম বিস্মৃতির অতলে তলিয়ে ছিল। ওহিও-র ওবারলিন কলেজের ইতিহাস বিভাগের ড্যানফোর্থ-অধ্যাপক মাইকেল এইচ ফিশার হঠাৎ দীন মহম্মদকে আবিষ্কার করেন। ফিশারের অধ্যয়নের বিষয় বিলাতে আদিভারতীয় অভিবাসীদের জীবনচর্যা। আঠারো শতকের একটি গ্রন্থতালিকায় দীন মহম্মদের নাম তাঁর চোখে পড়ে। ওই দীর্ঘ তালিকায় আর কোনও ভারতীয় লেখকের নাম ছিল না। দীর্ঘ অনুসন্ধানের পর ডিউক বিশ্ববিদ্যালয়ে এবং আয়ারল্যান্ডের কর্ক শহরের একটি সন্ন্যাসিনীদের মঠে তিনি বইটি খুঁজে পান। এরপর ছ'বছর গবেষণা চালিয়ে ফিশার দীনের জীবনের অনেক অজানা অধ্যায়ের ইতিবৃত্ত উদ্ধার করেন। তাঁর সম্পাদনায় ১৯৯৬ সালে অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশ করে—*The First Indian Author in English : Dean Mahomed (1759-1851) in India, Ireland and England* বইটি। ১৯৯৭ সালে ক্যালিফোর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ফিশারের ভূমিকাসহ *'The Travels of Dean Mohamet : An Eighteenth century Journey through India'*, প্রকাশিত হয়।

দীন মহম্মদের শৈশব, বেঙ্গল আর্মির কর্মজীবন এবং আয়ারল্যান্ড পৌঁছনোর কাহিনি Travel-এর উপজীব্য। তাঁর জীবনের বাকি অংশ ছ'বছরের গবেষণায় পূর্ণ করেছেন ফিশার। বিদেশের সম্পূর্ণ অচেনা সমাজে জীবনধারণের জন্য তীব্র ও দীর্ঘ লড়াই ফুটে উঠেছে এই প্রবাসী ভারতীয়র জীবনকথায়। অন্যদিকে তাঁর জীবনের বিভিন্ন কালপর্বের ঘটনাপ্রবাহ, দীনের রচনার বিষয়বস্তু, উদ্দেশ্য ও রচনাশৈলী থেকে ফিশারের অনুসন্ধিৎসায় উন্মোচিত হয়েছে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ ও উপনিবেশবাদের সূচনা-পর্বের দান ও প্রতিদানের জটিল সম্পর্কের হারিয়ে যাওয়া সূত্র।

(২)

শেখ দীন মহম্মদের জন্ম পাটনাতে, ১৭৫৯ সালে। দীন লিখেছেন, তাঁদের এবং মুর্শিদাবাদের নবাব-পরিবার ছিল একই বংশগৌরবের অধিকারী। তাঁর বাবা ছিলেন বেঙ্গল আর্মির সুবাদার। ১৭৬৯ সালে বাবার আকস্মিক মৃত্যুর পর মাত্র ১১ বছর বয়সে দীন বেঙ্গল আর্মিতে যোগ দেন।

আঠারো শতকের মধ্যভাগে যখন বাংলায় ও অন্যত্র কোম্পানির রাজনৈতিক প্রভাব বাড়তে থাকে তখন ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি তিনটি প্রেসিডেন্সির জন্য পৃথক সেনাবাহিনী গঠন করে। আয়তনে সব থেকে বড় ছিল বেঙ্গল আর্মি। ক্রমক্ষয়িষ্ণু মুসলমান শাসন বাংলা, বিহার, উড়িষ্যার বিস্তীর্ণ অঞ্চলে বেকার সামরিক পেশাদারের জন্ম দিয়ে চলেছিল। এই সামরিক বাজার থেকেই পেশাদার ও অপেশাদার সৈন্য সংগ্রহ করে তৈরি হয় বেঙ্গল আর্মি। অভিজাত মুসলমান পরিবারের সদস্যরা বেঙ্গল আর্মিতে যোগ দিলে প্রায় সরাসরি ইউরোপীয় অফিসারদের ঠিক নীচে, উচ্চমর্যাদার পদ লাভ করতেন। বাংলার নবাব এবং অন্যান্য স্থানীয় মুসলমান শাসকদের ক্ষমতা যত খর্ব হয় সমরকুশল মুসলমানেরা তত বেশি সংখ্যায় যুক্ত হতে থাকে কোম্পানির বাহিনীতে।

দীন মহম্মদের বাবা ছিলেন বেঙ্গল আর্মির সুবাদার। একজন ভারতীয় তখন কোম্পানির বাহিনীতে এর থেকে উঁচুর কোনও পদে যেতে পারত না। সেটা বাংলা, বিহার, উড়িষ্যার মাটিতে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক আধিপত্য প্রতিষ্ঠার পর্ব। বিহারের নায়েব দেওয়ান সিতাব রায় ও পাটনা রেভিনিউ কাউন্সিলের প্রধান টমাস রামবোল্ডকে রাজস্ব আদায়ের কাজে সাহায্য করত যে সেনাদলগুলি, তার একটির সুবাদার ছিলেন দীন মহম্মদের বাবা। ১৭৬৯ সালে যখন ছিয়াত্তরের মন্বন্তর শুরু হয়েছে, দুর্ভিক্ষপীড়িত বিহারের তাজপুরে রাজস্ব আদায় অভিযানে স্থানীয় ভূস্বামীদের হাতে তাঁর মৃত্যু হয়। হত্যাকারী জমিদারদের ধরা হয়। অচিরেই তারা প্রদেয় রাজস্বের থেকে আরও বেশি অর্থ কোষাগারে জমা দেওয়ার শর্তে মুক্তিও পেয়ে যায়।

দীন মহম্মদ বেঙ্গল আর্মিতে যোগ দিলেন ১১ বছর বয়সে। পাটনাতে সিতাব রায়ের প্রাসাদে টেনিস পার্টিতে ক্যাপটেন গডফ্রে ইভান বেকারের চোখে পড়ে দীন মহম্মদকে। এই আইরিশ যুবক তখন বেঙ্গল আর্মিতে সদ্যনিযুক্ত হয়ে ভারতে এসেছেন। তাঁর নেতৃত্বাধীন থার্ড ব্রিগেডে 'ক্যাম্প ফলোয়ার' পদে ভৃত্যদের তত্ত্বাবধানের কাজ পেলেন দীন।

১৭৭১-১৭৮৩ কালপর্বে দীন মহম্মদের Travel-এ পাওয়া যায় ইংরেজ শাসন সংহত হওয়ার পর্বের বহু গুরুত্বপূর্ণ ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শীর বিবরণ। ১৭৭১ সালে বেকারের ব্রিগেডকে যেতে হয় উত্তর ভারতে। রাজনৈতিক পরিস্থিতি তখন বেশ জটিল। বিহারের পশ্চিম সীমানা দিয়ে কোম্পানি অধিকৃত অঞ্চলে মারাঠা আক্রমণ শুরু হয়েছে। থার্ড ব্রিগেডকে পাঠানো হয় কর্মনাশা নদীর তীরে বকসারে। কোম্পানি বাহিনীর লুঠতরাজের মধ্য দিয়ে এই এলাকার মানুষের প্রথম পরিচয় ঘটে কোম্পানির শাসনের সঙ্গে। গ্রীষ্মকালে মারাঠা আক্রমণ কমে গেলে সম্ভাব্য ফরাসি আক্রমণ প্রতিরোধে তারা রওয়ানা হন কলকাতার পথে। রাজমহল গিরিশ্রেণি ও গঙ্গার মধ্যবর্তী সংকীর্ণ পথ দিয়ে যখন তাদের বাহিনী বিহার থেকে বাংলায় প্রবেশ করে তখন বারবার সংঘর্ষ হয় পাহাড়ি উপজাতিগুলির সঙ্গে। পাহাড়ের পাদদেশে বসবাসকারী গ্রামগুলির শান্তি বিঘ্নিত করত মাল পাহাড়িয়ারা। এদের নির্মমভাবে দমন করার চেষ্টা করা হয়। ইংরেজ বাহিনীর হাতে ধরা পড়লে তাদের মেরে পথের পাশে আধমাইল পরপর গাছের ডালে ঝুলিয়ে দেওয়া হত সঙ্গীদের সন্ত্রস্ত করার জন্য। কলকাতা যাওয়ার পথে এমন বহু ঝুলন্ত মৃতদেহ দেখেছেন দীন।

থার্ড ব্রিগেড কলকাতায় পৌঁছায় ১৭৭২ সালের মে মাসে। পরের ছ'মাস তাঁরা ছিলেন ফোর্ট উইলিয়ামে। তখনকার কলকাতার মুগ্ধ বর্ণনা আছে ট্রাভেলস-এ। আছে চিনাবাজার, লালবাজার, ধর্মতলা, চৌরঙ্গি, বৈঠকখানা, খিদিরপুর, মেছুয়াবাজার, চাঁদপালঘাট ইত্যাদির প্রসঙ্গ।

১৭৭৩-৭৪ এই দু'বছর বেকারের বাহিনী অবস্থান করে বহরমপুরে। কিছুকাল আগে কোম্পানি সেখানে বড় সেনা ছাউনি বানিয়েছিল। পাশেই নবাবি শাসনকেন্দ্র মুর্শিদাবাদ। এখানে দীন পুনরাবিষ্কার করলেন তাঁর আত্মপরিচয়। নবাব পরিবার ও অভিজাত মুসলমান শাসকবর্গের সমমর্যাদার বংশ-পরিচয় যে তিনি বহন করেন তা উল্লেখ করতে ভোলেননি দীন মহম্মদ। তাঁর ট্রাভেলস-এর অনেকগুলি চিঠিই মুর্শিদাবাদের বিভিন্ন অভিজ্ঞতার বর্ণনা। কোনওটা মুর্শিদাবাদবাসী আত্মীয়ের বাড়িতে ধর্মীয় অনুষ্ঠানে যোগ দেওয়ার কাহিনি, কোনওটা বা বিবাহ অনুষ্ঠানের, নবাবি শোভাযাত্রার বিবরণ।

দীন মহম্মদের কলকাতা ও মুর্শিদাবাদ নগরীর বর্ণনা পাশাপাশি রাখলে দেখা যায় কীভাবে ভবিষ্যতের রাজধানী মহানগর হিসাবে কলকাতা ধীরে ধীরে গড়ে উঠছিল। মুর্শিদাবাদ তখনও বাংলা, বিহার, উড়িষ্যার রাজধানী। কিন্তু ক্রমক্ষয়িষ্ণু। ধীরে ধীরে তার গৌরবচ্ছটা ফিকে হয়ে

আসছে। নবাব পেনশনভোগী। নবাবের কর্মচারীদের হাত থেকে প্রশাসনিক ক্ষমতা ক্রমশই সরে যাচ্ছে কোম্পানির কর্মচারীদের হাতে। নবাবি আমলের অভিজাতদের উপার্জন কমছে। দীন মহম্মদের পরিবার এককালে পরিণত হয়েছিল নবাব বংশের হৃতগৌরব শাখায়। যেন সেই দৃশ্যের পুনরভিনয় দেখছেন দীন।

বহরমপুর থেকে অযোধ্যা। ১৭৭৫ সালে অযোধ্যার কাছে বিলগ্রামে শিবির স্থাপন করল থার্ড ব্রিগেড, রোহিলা আফগানদের বিরুদ্ধে অযোধ্যার নবাব সুজাউদ্দৌল্লাকে সাহায্য করার জন্য। দু'বছর পর অযোধ্যার পাট চুকিয়ে আটশো মাইল পথ পাড়ি দিয়ে তাঁরা ফিরলেন কলকাতায়। এই কালপর্বের বর্ণনায় পাওয়া যায় অযোধ্যা, লক্ষ্ণৌ, এলাহাবাদ, বেনারস, দিল্লির কথা। মুঘল সম্রাট তখন মারাঠাদের হাতে প্রাসাদবন্দি। মধ্য-গাঙ্গেয় সমভূমির বহু গ্রাম, বহু মানুষ, তাদের জীবনের টুকরো ছবি ভেসে ওঠে দীন মহম্মদের বর্ণনায়। বারাণসী তাঁকে মনে করিয়ে দেয় আমাদের দেশের প্রাচীন সংস্কৃতির কথা। হিন্দু-মুসলিম ভেদের ঊর্ধ্বে তার চমৎকার বর্ণনা ফুটিয়ে তোলেন তিনি।

১৭৭৮-৭৯ সারা সময়টা কলকাতায় কাটান এবং ১৭৭৯-৮০ কালপর্ব কাটে বহরমপুরে। ১৭৮১ সালে বেকারের পদোন্নতি হয়। বেকারের দাক্ষিণ্যে পদোন্নতি হয় দীন মহম্মদেরও। দীনের কর্মজীবনের শেষ সামরিক অভিযান হয় বেনারসে। মিত্রতার শর্ত লঙ্ঘন করায় বেনারসের রাজা চৈত সিংহকে দমন করতে অগ্রসর হয় কোম্পানির বাহিনী। শেষ পর্যন্ত মেজর পপহ্যামের বাহিনীর হাতে চৈত সিংহের চূড়ান্ত পরাজয় হয় এবং রাজা বেনারস ছেড়ে পালিয়ে যান। রাজার ভ্রাতুষ্পুত্রকে জমিদার করে প্রকৃত শাসন নিজের হাতে তুলে নেয় কোম্পানি। রাজস্বের পরিমাণ বাড়ানো হয়। দ্বৈত শাসন যে অসন্তোষের জন্ম দেয় তা প্রশমনে বেনারসের গ্রামাঞ্চলে অভিযান চালায় বেঙ্গল আর্মি। এ সময় বেকার ও তার বাহিনী গ্রামে কোম্পানির কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠার নামে ব্যাপক অত্যাচার চালাচ্ছে ও জোর করে প্রচুর অর্থ আদায় করছে—এই অভিযোগে বেকারের বিরুদ্ধে তদন্ত শুরু হয়। তাঁকে সক্রিয় দায়িত্ব থেকে সরিয়ে দেওয়া হয়। পরে তদন্তে নির্দোষ প্রতিপন্ন হলেও বেকার পদত্যাগ করেন। ততদিনে ভবিষ্যৎ জীবনের জন্য যে পর্যাপ্ত সঞ্চয় করে নিয়েছিলেন বেকার, তা সহজেই অনুমেয়।

পদত্যাগপত্র গৃহীত হওয়ার আগে বেনারস থেকে ফিরে বেকার ও দীন মহম্মদ ঢাকা ও সুন্দরবন ভ্রমণে যান। কেবল পর্যটন নয়, বাণিজ্যিক স্বার্থ ছিল। বিশেষত ঢাকা তখন মসলিন ও আরও কিছু পণ্যের জন্য বিশ্ববিখ্যাত। দীন মহম্মদ তখন কর্মহীন। ফলে ক্যাপ্টেন বেকারের সঙ্গী ও আশ্রিত হয়ে দিন কাটে তাঁর। বেকার এই সময়টাকে কাজে লাগান তাঁর ব্যবসাপত্র গোছাতে। ১৭৮৩ সালের ২৭শে নভেম্বর বেকারের কর্মজীবন শেষ হয়। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির সঙ্গে সম্পর্কের শেষ সুতোটি ছিঁড়ে ফেলে বেকার ও দীন মহম্মদ বিলেতে পাড়ি জমান। কোম্পানির জাহাজ নয়, তাঁরা বিলাতযাত্রা করেন ডেনিস জাহাজে। কোনও সন্দেহ নেই বে-আইনি পথে পণ্য নিয়ে যাওয়া ও শুল্ক ফাঁকি দেওয়ার উদ্দেশ্যে শত্রুজাহাজ পছন্দ করা হয়েছিল। সেকালে স্মাগলিঙের জন্য কুখ্যাত ডার্টমাউথ বন্দর হয়ে কর্ক বন্দরে যায় জাহাজটি এবং সেখানেই আয়ারল্যান্ডের মাটিতে পা রাখেন তাঁরা। প্রসঙ্গত কর্ক বন্দরের হারবার মাস্টার ছিলেন বেকারের বাবা।

(৩)

১৭৮৪ সালের সেপ্টেম্বরে তাঁরা পৌঁছন ডার্টমাউথ বন্দরে। এখানেই তাঁর 'Travels' শেষ করেছেন দীন মহম্মদ।

বেকার-পরিবার ছিল কর্কের অভিজাত ভূম্যধিকারী শ্রেণির অংশ। তাঁদের সৌজন্যে কর্কের অভিজাত অ্যাংলো-আইরিশ-প্রোটেস্ট্যান্ট সমাজে প্রবেশাধিকার পেলেন দীন মহম্মদও। এসময় বেকারের পরামর্শ ও সহায়তায় প্রাতিষ্ঠানিকভাবে ইংরাজি ভাষাশিক্ষা শুরু হয় তাঁর। ১৭৮৬ সালে হঠাৎই বেকারের মৃত্যু হল। ওই বছরেই দীন বিয়ে করলেন জেন ভ্যালি নামে এক প্রোটেস্ট্যান্ট তরুণীকে। চার্চের কাগজপত্র থেকে মনে হয় ইতিমধ্যে দীন আর্থিক সচ্ছলতা অর্জন করেছিলেন।

আয়ারল্যান্ডে বসবাসের দশ বছরের মাথায়, ১৭৯৩ সালে প্রকাশিত হল তাঁর *The Travels of Dean Mahomet A Native of Patna in Bengal*। বইটি প্রকাশের আগে গ্রাহক সংগ্রহের জন্য কাগজে বিজ্ঞাপন দিয়েছিলেন তিনি। তেমনই রেওয়াজ ছিল তখন। গ্রাহকমূল্য ছিল দুই শিলিং ছয় পেন্স। অগ্রিম মূল্য দিয়ে গ্রাহক হয়েছিলেন ৩২০ জন।

পরিচিতজনকে চিঠি লেখার আঙ্গিকে লেখা এই বইয়ের প্রথম চিঠিতে বইটি লেখার দু'টি উদ্দেশ্যের কথা বলেছিলেন দীন। প্রথম তাঁর দেশ ও দেশবাসীর পরিচয় তুলে ধরা এবং দ্বিতীয় তাঁর নিজের কথা, কর্মজীবন ও সেই সূত্রে তাঁর দেখা জায়গাগুলির বিবরণ দেওয়া। মূল উদ্দেশ্য ভারত তথা প্রাচ্য সম্পর্কে সেদেশের মানুষের কৌতূহল-নিবৃত্তি।

ধরে নেওয়া যায় এই লেখার পিছনে দীন মহম্মদের সামাজিক আত্মপ্রতিষ্ঠার স্বপ্নও কাজ করেছিল। কর্কের

অ্যাংলা-আইরিশ প্রোটোস্ট্যান্ট সমাজে, বিশেষত অভিজাতদের সঙ্গে মেশার সুযোগ ও সম্মান পেলেও নানা দিক থেকে দীন মহম্মদ একক ছিলেন। জন্মসূত্রে, গাত্রবর্ণে, সংস্কৃতিতে তিনি ছিলেন শ্বেতাঙ্গদের থেকে আলাদা। অন্যদিকে পরিচারিকা, ভৃত্য বা কর্মচারী শ্রেণির যে ভারতীয়রা কর্কে বাস করত তাদের সঙ্গেও তিনি একাত্ম হতে পারতেন না। বেকার-পরিবারের আনুকূল্যে এবং ভারতে থাকাকালীন চাকরির সূত্রে তাঁর কিছু ধনসম্পত্তি ছিল। কর্কে তাঁর নিজের একটি বাড়িও বানিয়েছিলেন। কিন্তু শেষপর্যন্ত বেকারের ছোটভাই উইলিয়াম বেকারের সঙ্গে তাঁর বনিবনা হয়নি। ১৮০০-০৬ সাল ভারতে কাটিয়ে উইলিয়াম স্থায়ীভাবে কর্কে ফিরে আসেন। ১৮০৭ সালেই দীন কর্ক ছেড়ে, আয়ারল্যান্ড ছেড়ে চলে আসেন লন্ডনে, শুরু করেন বিলাত প্রবাসের দ্বিতীয় ইনিংস। লক্ষণীয় আয়ারল্যান্ড বাসের ২৩ বছরের (১৭৮৭-১৮০৭) ঘটনা সম্পর্কে দীন মহম্মদ বাকি জীবন নীরবতা পালন করেছেন। অনুমান করা যায় প্রথমাবধি দীন আত্মপরিচয় ও আত্মপ্রতিষ্ঠার সংকটে গ্রস্ত ছিলেন। হয়ত ওই স্বজনহীন সমাজে নিজস্ব পরিচয় প্রতিষ্ঠার বাসনা তাঁকে প্রণোদিত করেছিল বইটি লিখতে।

দীন মহম্মদ যখন প্রবাসজীবন শুরু করেন তখন ভারত তথা পূর্বদেশ নিয়ে বিলেতে যথেষ্ট আগ্রহ ছিল। ভারত-প্রত্যাগত কোম্পানি কর্মচারীর ও অন্যান্যদের কিছু বিবরণ প্রকাশিত হলে তা নিয়ে উৎসাহ দেখা যেত। সে ধরনের লেখাতে থাকত বিপুল তথ্য-বিভ্রান্তি। রেভারেন্ড জেম্‌স লঙ তাঁর সুবিখ্যাত On the Banks of River Bhagirathi প্রবন্ধে এ ধরনের লেখার উল্লেখ করেছেন : Beside Haber's Journal there are scarcely any journal of travellers worth notice on Bengal; in a recent work. 'Bacon's First impressions'. It is stated, that after leaving Barrackpore 'a few hours trecking brought us to Serampore'! The author gives a drawing of a Fakir's serai on the banks of the river near Hugly with a hill in the vicinity!' তথ্যগত ভ্রান্তির থেকেও অনেক ঊর্ধ্বে, এ ধরনের রচনায় কাজ করত দৃষ্টিভঙ্গি। ঔপনিবেশিকদের চোখে দেখা ভারত ও তাঁর জনগণের ছবি ফুটে উঠত এতে। উপনিবেশের দেশ-কাল-মানুষকে তাঁরা পর্যবেক্ষণ করেছেন সাম্রাজ্যবাদের, ঔপনিবেশিকের দৃষ্টিভঙ্গি থেকে (Mary Louise Pratt এর ভাষায় imperial eyes বা imperian gaze) এবং সেভাবেই তাদের হাজির করেছেন প্রতীচ্যের পাঠকের সামনে। ইংরাজি তথা কোনও ইউরোপীয় ভাষায় ভারতীয়র চোখে ভারতবর্ণনায় দীন মহম্মদই পথিকৃৎ। সে অর্থে Travel যেন এক প্রতিস্পর্ধী সৃষ্টি। ইউরোপের পাঠকের কাছে ভারতবর্ণনা ইংরাজ তথা ইউরোপীয়দের একচেটিয়া অধিকার নয়। উপনিবেশের মানুষেরও ভাষা আছে, স্বপ্রকাশের সাহস আছে।

এই প্রসঙ্গে ফিশার টেনে আনেন ওলাউদা ইকিয়ানোর কথা। আফ্রিকান, প্রাক্তন দাস ইকিয়ানো দীন মহম্মদের সমকালের দাসবিরোধী সংগ্রামী। ১৭৮৯ সালে, অর্থাৎ Travel-এর পাঁচ বছর আগে প্রকাশিত হয় তাঁর আত্মজীবনীমূলক রচনা *'The Interesting Narrative of the life of Olaudah Equiano...The African, Written by Himself'*। এই বইটি সোচ্চারে ঘোষণা করে আফ্রিকানরাও মানুষ, সম্পত্তির মতো তাদের যথেচ্ছ কেনাবেচা অনৈতিক, অমানবিক। ১৭৯১ সালে, অর্থাৎ দীন মহম্মদ যখন কর্কে বাস করছেন, ইকিয়ানো তাঁর বই ও বক্তব্যের প্রচারে কর্ক তথা আয়ারল্যান্ড ঘুরে গেছেন। অর্থাৎ অ-ইউরোপীয় উৎসের সাহিত্যের একটা প্রেক্ষাপট সেখানে তৈরি হচ্ছিল।

দীন মহম্মদের ট্রাভেলস লেখা হয়েছিল পত্রাবলির আকারে। সেসময় লেখকদের মধ্যে এটা ছিল সবথেকে জনপ্রিয় স্টাইল। এই স্টাইলে খোলাখুলি, অন্তরঙ্গভাবে লেখার ভাব ফুটে উঠত। যেন পাঠকদের সঙ্গে সরাসরি পত্রালাপ করছেন লেখক। এছাড়া দীন তাঁর লেখার মধ্যে অনুবাদ না করেই বহু ল্যাটিন উদ্ধৃতি ব্যবহার করেছেন। এভাবে যেন উচ্চবর্গীয় পাঠককূলের সঙ্গে পত্রলেখক একাত্ম করেছেন নিজেকে। বিভিন্ন ঘটনার ক্ষেত্রে দীন যথাযথ তথ্য পরিবেশন করেছেন। তিনি লিখেছেন ১৭৬৯-৮৪ সময়কালের ভারতবর্ষের কথা। রচনাকাল ১৭৯৩। তা সত্ত্বেও দীন মহম্মদ তাঁর লেখায় বিভিন্ন স্থান ও ঐতিহাসিক ঘটনাপ্রবাহের যে বর্ণনা দিয়েছেন দু'-একটি ক্ষেত্র ছাড়া তা প্রায় নির্ভুল। সুতরাং ধরে নেওয়া যায় সমকালে প্রকাশিত অন্য বই ও লেখা থেকেও তথ্য সংগ্রহ করেছেন তিনি। সাহিত্যগুণান্বিত ইংরাজিতে, আধুনিক আঙ্গিকে, নির্ভুল স্থানিক ও ঐতিহাসিক বর্ণনার পিছনে তাই গবেষকদের অনেকেই অন্য কোনও ইংরাজ লেখকের ভূমিকা খুঁজেছেন। উপনিবেশের এক নেটিভ কর্মচারী তথা ব্রিটিশ ভক্তের সৃজন ক্ষমতা স্বীকার করতে বর্তমানকালের গবেষকদের অনীহা থেকেই অনুমান করা যায় তাঁর সমকালে দীন মহম্মদের রচনা ইংরাজিভাষী ঔপনিবেশিক সমাজে কতটা আদৃত হয়েছিল! মাইকেল ফিশার তাঁর শ্রমসাধ্য গবেষণায় প্রমাণ করেছেন ট্রাভেলস দীনের স্বকীয় সৃষ্টি। সমসাময়িক অন্য

লেখা তিনি গ্রহণ করেছেন, অনেক সময় সেই গ্রহণ 'প্লেগিয়ারিজম'-এর পর্যায়েও গেছে তথাপি তা হয়ে উঠেছে দীনের নিজেরই লেখা, উচ্চারিত হয়েছে তাঁরই কণ্ঠস্বরে।

কিন্তু তা কি ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির সদ্য অধিকৃত ভারতীয় উপনিবেশের কোনও মানুষের কণ্ঠস্বর? ইউরোপীয়দের ভারতবর্ণনার থেকে তা কি মৌলিকভাবে আলাদা? সমসাময়িক গবেষকদের অনেকে এ প্রশ্নও তুলেছেন। দীন মহম্মদের বাবা ছিলেন কোম্পানির বেঙ্গল আর্মির দেশীয় অফিসার। দীন মহম্মদ পাটনাতে যে পরিবেশে বড় হয়েছেন তাও এক ব্রিটিশ-অনুগত পরিমণ্ডল। নিজে মাত্র এগারো বছর বয়সে যোগ দিয়েছেন বেঙ্গল আর্মিতে। যে 'ভ্রমণ' কাহিনি তিনি লিখেছেন, তা সবই বেঙ্গল আর্মির কর্মচারী হিসাবে বিভিন্ন সামরিক অভিযানে যুক্ত থাকার বা বিভিন্ন সেনা ছাউনিতে বসবাসের অভিজ্ঞতা-সঞ্জাত! এছাড়াও জন্মসূত্রে শাসক অভিজাত সম্প্রদায়ের শরিক হওয়ায় তাঁর দেখার চোখ খুব ভিন্ন ছিল না। মুঘল শাসন থেকে ব্রিটিশ শাসনে পরিবর্তনের সেই তরল কালপর্বে দীন মহম্মদ ভারতকে শাসকের চোখে দেখবেন না —এ আশা বাতুলতা, ফিশারের ভাষায় anachronistic expectation। ভারতীয় জাতীয়তার জন্ম অনেক পরে। উপনিবেশবাদী ও উপনিবেশবাসী, প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের পরিচয়ের সংঘাত তখনও তীব্র হয়নি। গ্রহণ-বর্জনের প্রক্রিয়া সদ্য শুরু হয়েছে মাত্র। আর দীন মহম্মদ লিখেছেনও তো এলিট ও আইরিশ পাঠকের জন্য।

আসলে দীন মহম্মদ তাঁর ট্রাভেলস লিখছেন সাংস্কৃতিক উত্তরণের প্রান্তসীমায় দাঁড়িয়ে। আশৈশবের ভারতীয় পরিবেশ ও সংস্কৃতি এবং কর্মজীবনের ব্রিটিশ সংস্রব দু'য়ের প্রভাবে তাঁর ব্যক্তিত্ব বিকশিত। তাঁর অবস্থান মধ্যবর্তী। এ যেন কিছুটা তাঁর লেখার ভাষা, আঙ্গিক ও বিষয়বস্তুর মতো। ইংরাজিভাষী সমাজের জন্য বিলেতি আঙ্গিকে আত্মজীবনীমূলক ভারতবর্ণনা। দীনও ঔপনিবেশিক ভারতবর্ষের মানুষ। বিদেশে এসে বাস করেছেন ইংল্যান্ডের আর এক উপনিবেশ আয়ারল্যান্ডে, শাসনক্ষমতার অংশীদার প্রোটেস্ট্যান্ট সমাজে। সেখানেও তিনি শাসিত-ক্যাথলিক-সমাজ ও শাসক-প্রোটোস্ট্যান্টদের থেকে আলাদা একটা অবস্থান খুঁজেছেন। সাম্রাজ্যবাদী ও ঔপনিবেশিক প্রক্রিয়ায় কীভাবে একটা Social space তৈরি হয় যেখানে ভিন্নধর্মী সংস্কৃতির মিলন, সংঘাত, জমির লড়াই চলে, উপনিবেশবাসীর নিজস্ব কণ্ঠস্বর ভাষা পায়, দীন মহম্মদের লেখা, এবং তারও বেশি, দীন মহম্মদের জীবনসংগ্রাম তার বড় উদাহরণ। আয়ারল্যান্ড ও ব্রিটেনে নিজেকে প্রতিষ্ঠা করার লড়াই আসলে ভারতীয় উপনিবেশের এক মানুষের আত্মপরিচয় প্রতিষ্ঠার লড়াই। তাই, কী প্রক্রিয়ায় উপনিবেশের গতিপ্রবাহ ধাবিত হয় ঔপনিবেশিক সংস্কৃতিকে প্রভাবিত করতে, তা বোঝার জন্য দীন মহম্মদের প্রবাসজীবনের পরবর্তী অধ্যায়ে প্রবেশ করতে হবে।

(৪)

১৮০৭ সালে আয়ারল্যান্ড ছেড়ে দীন মহম্মদ চলে আসেন লন্ডনে। লন্ডন তখনই কসমোপলিটান, দ্রুত বিকশিত হচ্ছে বিশ্বজোড়া সাম্রাজ্যের রাজধানী-নগর হিসাবে। শিল্প-বিপ্লবোত্তর অর্থনীতি ও ঔপনিবেশিক শোষণের বলে সম্পদ ও প্রাচুর্যে বলীয়ান লন্ডনে তখন আয়ারল্যান্ড ভারত ও সাম্রাজ্যের অন্য দেশগুলি থেকে আসা শ্রমিক, বণিক, আধিকারিকদের ভিড়। ভারতীয় নাবিক বা ভারতের সঙ্গে বাণিজ্যসম্পর্ক আছে এমন বণিকদের মহল্লায় নয়, দীন ঘর বাঁধলেন লন্ডনের অভিজাত পল্লি পোর্টম্যান স্কোয়ারে।

দীন চাকরি নিলেন ভারত-ফেরত 'নবাব' বেসিল কচ্‌রেনের ভেপার বাথ থেরাপি কেন্দ্রে। অভিজাত মানুষদের স্বাস্থ্যোদ্ধার স্পৃহায় অচিরেই জনপ্রিয় হল ভেপার বাথ। কচরেন প্রচার করেছিলেন ভারতে থাকাকালীন এই ভেপার বাথ তিনি আবিষ্কার করেন। টাকার জোরে লন্ডনের ডাক্তারদের স্বীকৃতিও আদায় করে নিয়েছিলেন তিনি। ভেপার বাথ থেরাপি প্রয়োগে দীনের অবদান স্বীকার করেননি কচরেন। যাইহোক ভেপার বাথের সঙ্গে দীন যুক্ত করেন shampooing বা মালিশ। দীন তাঁর ট্রাভেলস্-এ লিখেছেন, ১৭৮৪ সাল থেকেই shampooing শুরু করেন তিনি। এর জনপ্রিয়তার ফলে আরও কয়েকটি বাণিজ্যিক হাউস চালু হয়ে গেল। ততদিনে দীন মহম্মদ ভারতীয় সংস্কৃতির আর একটি দিক লন্ডনবাসীদের চেনাতে মনস্থ করেছেন—তা হল ভারতীয় রন্ধনশৈলী।

১৮০৯ সালে দীন মহম্মদ লন্ডনে তাঁর রেস্তোরাঁ চালু করলেন। হিন্দুস্তান কফি হাউস ছিল পোর্টম্যান স্কোয়ারের কাছেই। দীনের লক্ষ্য ছিল মূলত ভারতপ্রত্যাগত অভিজাতরা। তাঁর কফি হাউসে আদৌ কফি পাওয়া যেত না। তাঁরা পরিবেশন করতেন ভারতীয় পদ্ধতিতে রান্না করা মশলাদার আমিষ ও নিরামিষ পদ। প্রথম দিকে হিন্দুস্তান কফি হাউস বেশ সাড়া ফেলেছিল। কিন্তু লন্ডনের অভিজাত পল্লিতে একটি বিলাসবহুল রেস্তোরাঁ স্থাপনের প্রাথমিক ব্যয়ভার ছিল খুব বেশি। দীন মহম্মদের হিন্দুস্তান কফি হাউস শেষ পর্যন্ত লাভজনক হয়ে উঠতে পারেনি। ১৮৪২ তিনি নিজেকে দেউলিয়া ঘোষণার আবেদন করেছেন।

এবার ব্রাইটনে একটি ভেপার বাথ-এ কাজ নেন দীন মহম্মদ। ব্রাইটন সে সময় সমুদ্রসৈকত হিসাবে খ্যাতিলাভ

করছে। যুবরাজ চতুর্থ জর্জ নিয়মিত ছুটি কাটাতে আসেন সেখানে। তাঁর পৃষ্ঠপোষকতায় তৈরি হয়েছে মেরিন প্যাভিলিয়ন। প্যাভিলিয়ন সাজানো হয়েছে সাম্রাজ্যের শ্রেষ্ঠ মুকুট ভারতবর্ষের আবহে। এ সময়েই ব্রাইটনে এসে পড়লেন দীন মহম্মদ এবং দ্রুত তাঁর বিবিধ ভারতীয় পণ্য ও সেবার বিপণন নজর কাড়ল ব্রাইটনের। দীনের পণ্যের মধ্যে ছিল ভারতীয় দাঁতের মাজন এবং চুল কালো করার কলপ।

তখনকার অন্য ভেপার বাথ থেকে নিজেদের আলাদা করতে নানা ভারতীয় ভেষজের ব্যবহার শুরু করলেন দীন। নাম দিলেন 'The Indian Medicated Vapour Bath'। ভেপার বাথ দেওয়ার যন্ত্রের নকশা পালটালেন তিনি। ভারতীয় তেল দিয়ে মালিশও চালু হল তাঁর বাথ হাউসে। ১৮১৮ সাল নাগাদ দীন তাঁর নতুন উপাধি প্রচারের আলোয় আনলেন—Shampooing Surgeon। এ বিষয়ের একটি বইও প্রকাশ করলেন ১৮২০ সালে *'The cases cured by Sake Dean Mohamed, Shampooing Surgeon, and Inventor of the Indian Medicated Vapour and Sea-Water Bath'* এ সময় নাটকীয় বৃদ্ধি ঘটল ভেপার বাথ শিল্পের, তা ছড়িয়ে পড়ল সারা ব্রিটেনে। ১৮১২ সালে ব্রাইটনে আরও ভাল অবস্থানে নতুন বাথ হাউস করলেন দীন।

Mahomed's Bath দীনের পেশাদার জীবনের সেরা সাফল্য। এ-সময় Cases Cured বইটির পরিবর্ধিত সংস্করণ প্রকাশিত হয়। বইটির তৃতীয় সংস্করণ হয় ১৮৩৮ সালে। দীন ইংল্যান্ডের দুই রাজা চতুর্থ জর্জ (১৮২০-৩০) এবং চতুর্থ উইলিয়ামের (১৮৩০-৩৭) Shampooing Surgeon হিসাবে নিয়োগপত্র পান। রাজকীয় নিয়োগপত্র অনুযায়ী প্রতি ভিজিটে তাঁর ফিজ ছিল এক গিনি। তিনি রাজদরবারে যেতেন দরবারি পোশাক পরে। রাজপুরুষরাও ছিলেন তাঁর অনুরাগী। রাজা ব্রাইটনে কবে আসবেন সে খবরও আসত দীনের কাছে। সুতরাং তখনকার ব্রাইটনে দীন মহম্মদের সামাজিক মর্যাদা সহজেই অনুমেয়।

কিন্তু ১৮৩০ দশকের শেষে তিনি রাজা উইলিয়ামের পৃষ্ঠপোষকতা হারান। ভিক্টোরিয়া রানি হওয়ার পর পরিস্থিতি একেবারে পালটে যায়। তিনি ব্রাইটনের রাজকীয় দরবার মেরিন প্যাভিলিয়ন গুটিয়ে ফেলেন।

জীবনের প্রায় শেষ দিন পর্যন্ত দীন মহম্মদকে পেশায় প্রতিষ্ঠিত হওয়ার জন্য লড়াই করতে হয়েছে। ১৮৫১ সালে ৯২ বছর বয়সে দীন মারা যান। মাহোমেদস বাথ তাঁর হস্তচ্যুত হয়। লন্ডনের বাথ হাউসগুলি অন্যের মালিকানায় দীনের খ্যাতিকে মূলধন করেই চলতে থাকে। কিন্তু দীন ততদিনে আবার নিঃস্বপ্রায়।

দীন মহম্মদ যে খুব মহান বা বড় মাপের মানুষ ছিলেন এমন নয়। কিন্তু তাঁর ট্রাভেলস বা পরবর্তী জীবনের আলোচনায় ভারত তথা ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের ইতিহাসের ও জনজীবনের সবচেয়ে জটিল কালপর্বের ছবি পাওয়া যায়। দীনের শৈশবে ভারতে মুঘলশাসন শেষ হয়ে আসছে। ইউরোপীয় বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানগুলির সংঘাতের পরিণতিতে ক্রমশ প্রধান শক্তি হিসাবে আত্মপ্রকাশ করছে ইংরাজ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি। ক্ষয়িষ্ণু মুঘল দরবারের সামরিক ও অভিজাত পরিবারের সদস্যরা নাম লেখাচ্ছে কোম্পানির সেনাবাহিনীতে। বেঙ্গল আর্মির সাহায্যে বাংলা, বিহার, উড়িষ্যার বাইরেও কোম্পানি প্রশাসনিক ক্ষমতাবিস্তার করছে। দীনের লেখায় উঠে এসেছে প্রান্তবাসী পাহাড়িয়া বা বৃহত্তর ভারতের গ্রামজনতার কথাও যারা ব্রিটিশ শাসন সম্পর্কে অবহিত নয়। অচেনা শাসকদের সঙ্গে যারা সংঘাতে লিপ্ত হয়। রাজমহল থেকে বেনারস একই চিত্র। দীনের অবস্থান মাঝামাঝি। তিনি ব্রিটিশরাজের অনুগত মুগ্ধসেবক। কিন্তু দেশ-ধর্ম-সংস্কৃতি থেকে তিনি বিচ্ছিন্ন নন। বিলাতে যে সমাজে তিনি মেলামেশা করেন সেখানেও তিনি একাকী। মাঝে মাঝে এই সংঘাতের ছায়া পড়েছে তাঁর লেখায়।

এই মধ্য-মনস্কতা আর একাকিত্ব থেকেই সূচনা তাঁর সংগ্রামের। তাঁর জীবনসংগ্রামের পর্বে সাম্রাজ্যবাদ ও উপনিবেশের মধ্যে সংস্কৃতির সীমা ক্রমশ কঠোর, দুর্ভেদ্য হয়ে উঠছে। সাম্রাজ্যের স্বদেশে ভারতীয় বা অ-ইউরোপীয়দের পরিচয়ের গণ্ডি ক্রমশ সংকীর্ণ হয়ে আসছে। সাম্রাজ্যের বিস্তার, ঔপনিবেশিক আত্মবিশ্বাসের শক্তিবৃদ্ধির সঙ্গে তাল মিলিয়ে বাড়ছে সাংস্কৃতিক আধিপত্য। তার মাঝে আত্মপরিচয় খুঁজছেন দীন কিংবা তাঁর মতো উপনিবেশ থেকে আসা প্রবাসী মানুষজন। এ-প্রসঙ্গে সমসাময়িক কিছু ঘটনাক্রমের দিকে চোখ রাখা যায়। সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শতকে ভারতীয় লশকরেরা ব্রিটিশ নাবিকদের সমান মজুরি দাবি করে। কোনও জাহাজের ক্যাপ্টেন অবিচার করলে, মজুরি বন্ধ করলে প্রতিবাদপত্র পাঠাচ্ছে কোম্পানির ডিরেক্টরদের কাছে। দেশে ফিরতে না পারা লশকরেরা ক্ষোভ জানাচ্ছে রাজদরবারে। ফিশার অন্যত্র লিখেছেন জোসেফ আমিন নামে ভারত থেকে ব্রিটেনে যাওয়া এক আর্মেনিয়ানের আত্মজীবনীর কথা। তিনিও প্রচেষ্ট আত্মপরিচয় প্রতিষ্ঠায় যাতে ব্রিটিশ-সমাজ তাঁকে তাঁর প্রাপ্য সামাজিক মর্যাদা থেকে বঞ্চিত করতে না পারে। এডমান্ড বার্কের সঙ্গে বন্ধুত্ব হচ্ছে পেশোয়ার দূত হনুমন্তরাও-এর (১৭৮১)। তিনি গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠছেন বার্কের রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপূরণে তাঁর ভূমিকার

জন্য নন্দকুমারের ফাঁসি ও হেস্টিংসের বিচার তখন তুমুলভাবে আলোচিত।

অষ্টাদশ শতকের শেষ থেকে উনবিংশ শতকের মধ্য ভাগ পর্যন্ত ব্রিটেনে ভারতীয়দের অবস্থান কেমন! তাঁরা বঞ্চনার শিকার, কিন্তু সামাজিক পরিচয়-প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে তাঁরা সম্পূর্ণ পরাজিত নয়। ব্রিটেনের সমাজ ও শ্রেণি-কাঠামোর মধ্যে তাঁরা উপনিবেশের কণ্ঠস্বর তৈরি করেছেন। উপনিবেশের ভাষাকে উচ্চারিত হওয়ার space তৈরি করে দিয়েছেন। এদেরই একজন দীন। পঁচিশ বছর বয়সে বিলাতে এসে সচ্ছলতা, দারিদ্র, সুনাম, ব্যর্থতাকে সঙ্গী করে পঞ্চান্ন বছর কাটিয়েছেন আয়ারল্যান্ড ও ইংল্যান্ডে। ভারত-দর্শক দীন মহম্মদের থেকে প্রবাসী দীন যেন ক্রমশ আলাদা হয়ে যান। বেঙ্গল আর্মির সেনানী দীন ব্রিটিশ-রাজভক্ত, তিনি প্রবাসজীবন শুরু করেন সাম্রাজ্যের স্বদেশে তাদের একজন হওয়ার স্বপ্নে; কিন্তু ক্রমশ তাঁর লড়াই হয়ে দাঁড়ায় ভারতীয় হয়ে ওঠার লক্ষ্য। তাঁর লেখায় ও জীবিকার সংগ্রামে উপনিবেশের ভাষা প্রাণ পায়। সূচনা হয় সাম্রাজ্যের স্বদেশাভিমুখে উপনিবেশের প্রতিপ্রবাহের। দীন মহম্মদের সমগ্র প্রবাসী-জীবনের সৃজন, সংগ্রাম ও পেশার লড়াইয়ের একটাই ব্র্যান্ড নেম—ভারতীয়ত্ব।

অনিবার্য কারণে এই সংখ্যায় 'স্বদেশি আন্দোলনে ভদ্রলোক নেতৃত্ব : সাফল্য ও ব্যর্থতা' সন্দর্ভটির শেষ কিস্তি প্রকাশ করা গেল না। আগামী সংখ্যায় (জানুয়ারি '০৭) বেরবে।

—স: চ:

মুজতবা আলী, দু'টি অপ্রকাশিত কবিতা এবং এক বিস্মৃতপ্রায় ব্যক্তিত্ব

প্রসাদরঞ্জন রায় ও শিখা রায়

সৈয়দ মুজতবা আলীর (১৯০৪-১৯৭৪) নাম আজ পরিচিতির অপেক্ষা রাখে না। বাংলাসাহিত্যে তিনি অদ্বিতীয় রসরচনার স্রষ্টা—'দেশে বিদেশে', 'চাচাকাহিনী', 'পঞ্চতন্ত্র', 'ময়ূরকণ্ঠী' ইত্যাদি অসামান্য গ্রন্থের রচয়িতা। এছাড়াও ভাষাতত্ত্ব, সাহিত্য, ইতিহাস, ভূগোল, শিল্পকলা, সংগীত, সভ্যতা, রাজনীতি, ধর্মশাস্ত্র এবং ভোজন ও রন্ধন শিল্প—সর্বক্ষেত্রেই ছিল তাঁর অবাধ বিচরণ। বিশ্বভারতীতে উচ্চশিক্ষা শেষ করে তিনি বছর দুয়েক কাবুল বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনা করেন। ১৯২৮ সালে হুমবোল্ড বৃত্তির অধিকারী হয়ে বার্লিন ও বন বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করে পিএইচ ডি ডিগ্রি লাভ করেন। এই সময়ে গোটা ইউরোপে এবং মধ্যপ্রাচ্যে ঘুরেছেন অনেক। প্রায় বছর খানেক কায়রোর বিখ্যাত আল আজহার বিশ্ববিদ্যালয়েও অধ্যয়ন করেছেন। দেশে ফিরে এসে বরোদায় তুলনামূলক ধর্মশাস্ত্রের অধ্যাপক হিসাবে যোগ দেন। দেশ স্বাধীন হবার পর বছর তিনেক বগুড়া কলেজের অধ্যক্ষ ছিলেন। ১৯৫০ সালে সাময়িকভাবে আকাশবাণী কলকাতা কেন্দ্রের দায়িত্ব নেন। কর্মজীবন শেষ করেন বিশ্বভারতীতে। তিনি ছিলেন বহু ভাষাবিদ, গুণীজনের মতে ১৫টি ভাষায় তিনি পারদর্শী ছিলেন। বাংলা সংস্কৃত, হিন্দি, মারাঠি, গুজরাতি, উর্দু, আরবি, ফারসি প্রভৃতি ভাষা ছাড়াও ইংরাজি, ফরাসি, জার্মান ও ইটালিয়ান ভাষায় তাঁর দক্ষতা ছিল। অসীম জ্ঞানের সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল তাঁর সূক্ষ্ম রসবোধ। তাই তাঁর সৃষ্ট সাহিত্য তাঁর অগাধ জ্ঞানের সাক্ষ্য বহন করলেও, কখনও পাণ্ডিত্যে ভারাক্রান্ত হয়নি। গভীর জ্ঞানের কথাও তাঁর কলমে কৌতুকে সরস হয়ে পরিবেশিত হয়েছে এবং তাঁর সৃষ্ট রম্যরচনার এইসব কাহিনিকে উপজীব্য করে বাঙালির কয়েক পুরুষ কেটে যাবে বলেই মনে হয়।

তাঁর সরস, অমায়িক ও মিশুকে স্বভাবের জন্য তিনি ছোট-বড় সব মানুষের সঙ্গেই সহজে মিশে যেতে পারতেন। বহু বিদগ্ধ গুণীজন তাঁর ঘনিষ্ঠ বন্ধু হয়ে দাঁড়িয়েছিলেন। আলী সাহেবের এরকমই এক অসমবয়সি বন্ধু ছিলেন স্বনামধন্য ব্যারিস্টার ও কলকাতা কর্পোরেশনের প্রাক্তন মেয়র নিশীথচন্দ্র সেন। নিশীথচন্দ্র সেনের প্রয়াণের পরেই মুজতবা আলীসাহেব 'নিশীথদা' নামে একটি ছোট স্মৃতিচিত্র প্রকাশ করেন, পরে সেটি 'ময়ূরকণ্ঠী' বইতে অন্তর্ভুক্ত হয়। এঁদের দু'জনকে এক অসামান্য বন্ধনে জড়িয়ে রেখেছে আলীসাহেবের সৃষ্ট দু'টি অপ্রকাশিত কবিতা এবং সেই প্রসঙ্গের অবতারণা করাই এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্য।

এখানে নিশীথচন্দ্র সেনের কিছুটা পরিচয় দেওয়া দরকার, কারণ আজকের যুগে তিনি প্রায় অপরিচিত। নিশীথচন্দ্র সেনের জন্ম ১৮৮০ সালের ১লা ফেব্রুয়ারি, কলকাতার এক সুপরিচিত ব্রাহ্ম পরিবারে। অবশ্য তাঁদের পরিবারের আদি বাসস্থান বরিশাল জেলার বাসন্ডা গ্রাম। তিনি ছিলেন চণ্ডীচরণ সেন (১৮৪৫-১৯০৬) ও বামাসুন্দরী দেবীর দ্বিতীয় পুত্র ও চতুর্থ সন্তান। চন্ডীচরণ সেন বরিশালে ওকালতি করতেন এবং পরে বিচারবিভাগে যোগ দিয়ে মুনসেফ ও সাব-জজ হিসাবে কাজ করেছিলেন দীর্ঘদিন। তিনি সাহিত্যক্ষেত্রেও যথেষ্ট কৃতিত্বের অধিকারী ছিলেন। 'টম কাকার কুটির' তাঁর এক বিখ্যাত অনুবাদগ্রন্থ। এছাড়াও তাঁর ঐতিহাসিক উপন্যাস 'অযোধ্যার বেগম', 'ঝাঁসির রাণী', 'দেওয়ান গঙ্গাগোবিন্দ সিংহ', 'মহারাজ নন্দকুমার' সেকালে শিক্ষিত বাঙালির মনে যথেষ্ট আলোড়ন তুলেছিল। ইংরাজ সরকার এইসব বইয়ে স্বদেশচিন্তার অনুরণন ভালভাবে নেয়নি এবং শেষ পর্যন্ত তিনি বিচারবিভাগের সরকারি চাকরি থেকে পদত্যাগ করেন। তিনি চেয়েছিলেন তাঁর পুত্র-কন্যাদের উচ্চশিক্ষিত ও স্বদেশপ্রেমী করে মানুষ করতে। তাঁর জ্যেষ্ঠাকন্যা কামিনী রায় (১৮৬৪-১৯৩৩) ছিলেন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথমদিকের মহিলা স্নাতকদের মধ্যে একজন এবং বিখ্যাত মহিলা কবি। তাঁর দ্বিতীয়া কন্যা যামিনী ছিলেন সেকালের প্রথম শ্রেণির মহিলা ডাক্তার, দীর্ঘদিন তিনি নেপাল-রাজদরবারে চিকিৎসার দায়িত্ব পালন করেছেন। কনিষ্ঠপুত্র সুধীরচন্দ্র সেন (১৮৮৮-১৯৫৯) ছিলেন প্রথমে সেন-পণ্ডিত কোম্পানি এবং পরে সেন-র‍্যালে সাইকেল কোম্পানির প্রতিষ্ঠাতা। আর দুই পুত্র ব্যারিস্টার ও ইঞ্জিনিয়ার রূপে সুপ্রতিষ্ঠিত হয়েছিলেন।

নিশীথচন্দ্র সেন ১৯০০ সালে কলকাতার সিটি কলেজ থেকে স্নাতক হন। এরপর ১৯০২ থেকে ১৯০৬ সাল পর্যন্ত ব্যারিস্টারি পড়ার জন্য বিলেতে ছিলেন। কলকাতায় ফিরে

১৯০৬ সালের শেষ দিকে তিনি হাইকোর্টের বার-এ যোগদান করেন এবং যথেষ্ট খ্যাতি অর্জন করেন। ১৯১২ সালের ২৪ জুলাই হালিসহর নিবাসী নরেশচন্দ্র মজুমদারের কন্যা শোভনা মজুমদারের সঙ্গে তাঁর বিবাহ হয়। হাইকোর্টে যুক্ত থাকাকালীন তিনি রাজনীতিতে জড়িয়ে পড়েন এবং গোড়া থেকেই কংগ্রেস দলের সঙ্গে তাঁর যোগ ছিল নিবিড়। বিপ্লবীদের জন্য বহু রাজনৈতিক মামলায় তিনি বিনা পারিশ্রমিকে লড়াই করে বহুক্ষেত্রে তাঁদের কারাবাস ও আরও কঠোর শাস্তি থেকে অব্যাহতি দিতে পেরেছিলেন। এই সূত্রেই তাঁর সঙ্গে চিত্তরঞ্জন দাস, সুভাষচন্দ্র বসু প্রমুখ জাতীয়তাবাদী নেতাদের ঘনিষ্ঠতা হয়। অর্থে, সামর্থে, বিপদে-আপদে এবং অন্যান্য নানান প্রয়োজনে তিনি মানুষের পাশে দাঁড়াতেন এবং কোনও দিন নিজের নাম জাহির করেননি। এই প্রসঙ্গে মুজতবা আলী লিখেছেন, 'একথা বললে ভুল বলা হবে না যে, দেশসেবা করেছেন, কিন্তু শ্রীযুক্ত নিশীথ সেনের সঙ্গে তাঁর যোগসূত্র স্থাপিত হয়নি, এরকম লোক বাংলাদেশ দেখেনি। ...খবর নিয়ে জানতে পারলুম, নিশীথদা কত বড় ডাকসাইটে ব্যারিস্টার এবং তার চাইতেও বড় কথা, সেই আলিপুরের আমল থেকে আজ পর্যন্ত পাঁচজনের জানা-অজানাতে কত অসংখ্যবার ফীজ না নিয়ে বিপ্লবীদের জন্য লড়েছেন।' বরাবরই তিনি ছিলেন দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের অনুগামী। ১৯২৩ থেকে ১৯২৬ সাল পর্যন্ত তিনি বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার সদস্য ছিলেন। ১৯৩২ সালে কলকাতা কর্পোরেশনের কাউন্সিলার নিযুক্ত হন। ১৯৩৯ সালে তিনি কর্পোরেশনের মেয়র পদে বৃত হন। তার আগে এই পদটিকে অলঙ্কৃত করেছিলেন দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাস (১৯২৪-১৯২৫), দেশপ্রিয় যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত (১৯২৫, ১৯২৭, ১৯৩০-১৯৩১), নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু (১৯৩০) এবং বিধানচন্দ্র রায় (১৯৩১-১৯৩২)। এর থেকেই কিছুটা পরিচয় পাওয়া যাবে তিনি কতটা বড় মাপের মানুষ ছিলেন এবং সেকালের কলকাতায় তাঁর নাম কতটা সুপরিচিত ছিল। ১৯৪৭ সালে তিনি কলকাতা হাইকোর্ট থেকে অবসর গ্রহণ করেন। ১৯৫১ সালের ১৫ মে তাঁর প্রয়াণ ঘটে।

বয়সে বড় হলেও তাঁর কর্মজীবনের শেষ দিকে তিনি হয়ে দাঁড়িয়েছিলেন সৈয়দ মুজতবা আলীর অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ বন্ধু, যাঁকে আলী সাহেব ডাকতেন 'নিশীথদা' বলে। ১৯৫০ সালে নিশীথ সেনের ৭০ বছর বয়স পূর্ণ হয় এবং সেই বছরেই মুজতবা আলীর 'দেশে বিদেশে' গ্রন্থটি প্রথম প্রকাশিত হয়। তিনি এই বইটিতে স্বহস্তে দুটি কবিতা লিখে তাঁর নিশীথদাকে জন্মদিনে উপহার দেন। কবিতা দুটি রসে, ছন্দে ও রচনাশৈলীতে অপূর্ব। প্রথম কবিতাটিতে গুণমুগ্ধ কবি তাঁর নিশীথদার গুণবর্ণনা করে জন্মদিনের শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করেছেন। কবিতাটি নীচে তুলে দেওয়া হল।

নিশীথদা,

বিস্ময় মেনেছি বারম্বার
সপ্ততি বর্ষে তুমি খর্ব কর মোর অহঙ্কার।
মোর কেন, দেখি যবে এযুগের তরুণের দল—
স্তিমিত জীবন-দ্বীপ, নিরুৎসাহ, ক্ষীণ, হীনবল—
তার মাঝে আছো তুমি, নিয়ে তব joie de vivre
বাসব-আসব আছে, আর আছে যবে তরুণীর
নর্মদিঠি স্পর্শে হিয়া সাড়া দিতে অপ্রমত্ত চিতে
তরুণ হৃদয় তব। বলো দেখি কোথায় নিভৃতে
কি কৌশলে করিয়াছ কার আরাধনা? যে রুদ্রের
কল্যাণ-বয়ান খুঁজে সর্বজন—দক্ষিণ মুখের
প্রসাদ পেয়েছো তাঁর? অথবা কি পিতা নোসি-জ্ঞান
—বিশ্বজন পিতা যিনি—পেয়ে গেছ তাঁহার সন্ধান
গোপনে গোপনে? যাঁহার কৃপায় করিয়াছ জয়
বাসব মদন, লক্ষ্মী-সরস্বতী।
অথবা কোন সে দেবী—মোর কাছে অজানা-'শোভনা'
এ জীবনে করিয়াছ একমাত্র তাঁরে আরাধনা?
তাঁর-ই বরে লভিয়াছ সুস্থ এই জীবনভঙ্গীরে?
বহু নারী ঈর্ষে, শুনি তব পূণ্য জীবন-সঙ্গীরে।
এ আনন্দ দিনে, হে পূষণ
নিশীথে-শোভনে করো হিরণ্ময় পাত্র উন্মোচন।
শান্তি শান্তি
২.২.০০ প্রীতিমুগ্ধ আলী।

মুজতবা আলীসাহেব তাঁর 'নিশীথদা' প্রবন্ধে লিখেছেন যে তাঁরা দু'জনে একবার শিলঙে বেড়াতে গিয়েছিলেন, উঠেছিলেন প্যারীমোহন মুখার্জির (স্বনামধন্য ব্যারিস্টার) বাড়িতে। সেখানে একদিন সকালের অভিজ্ঞতা সম্পর্কে আলীসাহেব সকৌতুকে বলছেন ঃ 'তার বয়স তখন সত্তর। সেই শিলঙে একদিন সকালবেলা দেখি, ড্রেসিং গাউনে পকেটে হাত পুরে বারান্দায় ঘন ঘন পাইচারি করছেন, মুখে সিগার নেই। কথা কয়ে ভালো করে উত্তর পাই নে। "কি হয়েছে, ব্যাপার কি নিশীথদা?" সেই জ্বলজ্বলে চোখ—সে চোখ দুটি কেউ কখনও ভুলতে পারে—দিয়ে বললেন, "কবি, সব জানো, সব বোঝো, কিন্তু বিয়ে তো করো নি, তাহলে এটাও বুঝতে"।' এই ঘটনাটি নিয়েই আলীসাহেবের দ্বিতীয় সরস কবিতাটি।

একাত্তর!

সত্তর হ'ল একি কথা বলো
বিশ্বাস নাহি হয়
চ্যাংড়ার মত তড়পাও দেখি
বিশ্বভুবনময়।
ক্যালকাটা ক্লাব থিরি হানড্রেট

চষিয়া করিলে শেষ
তারপর দেখি নূতনের খোঁজে
ছাড়িলে গৌড়-দেশ।
পুষ্পক রথ চড়ি নটবর
নিশীথ চলিল হের
চাঁদমুখ যেথা মঙ্গোলিয়ান
একিরে আজব গেরো!
নিশীথ ধাইছে চাঁদের পিছনে
বিশ্বাস নাহি হয়
নিশীথ-বুকেতে শোভনা-চন্দ্র
এ কিছু নতুন নয়।
আমি ছিনু সাথে পিয়ারীও ছিল
হক কথা মোরা জানি
চাঁদের দেশেতে পৌঁছে নিশীথ
বুঝিল তত্ত্বখানি।
হাউ হাউ করে কাঁদে আর বলে,
"চাইনে এসব চাঁদ
আমার শোভনা হৃদয় জোছনা
নিশীথ-হৃদয়-সাধ।
ছেড়ে দাও মোরে যাব আমি ফিরে
পাইনি দুদিন চিঠি,
প্যারী বেরসিক আলীটাও জ্যাঠা
জানেনা শোভনা-দিঠি।"
ব্যারিস্টারের মুখেতে আছেন
স্বয়ং ভারতী দেবী
শোনায় মোদের অষ্টপ্রহর
কি করে শোভনা সেবি—
জলুস রেখেছে জোয়ানি বাঁচায়ে,
আহা সে প্রেমের গান—
শোনালে নিশীথ ঝাড়া দশদিন
যেন সে মেশিনগান।
তারপর দেখি শিহরিত আমি
প্যারীও বাক্যহারা,
নিশীথ তাকায় মেঘের পানেতে
যেন সে পাগল-পারা।
দুই বাহু তুলি বিড়বিড় করে
কি কয় আপন মনে,
সোনালী রোদেতে রূপালি সে কেশ
শিরীষ চাঁপার বনে।
নিশীথের ডাকে নামিল বরষা
নব-মল্লার গানে
এ নিশীথ সেন মিয়া তানসেন
নবীন জোয়ার প্রাণে
ছাড়িল হুইস্কি যেন ভিশিনিস্কি
ইউ এন-এ জলসা ছাড়ে।
চাঁদের আলোতে মরে ঘুরে ঘুরে
শীত কি লাগে না হাড়ে?
মুখুটি বামুন কুটিল অতীব
কহিল আমারে ধরে—
"বুঝিলে হে আলী, তুমি আমি খালি
কি করে ঠেকাবো ওরে?
যদি যায় ক্ষেপে কি করিতে পারো
ছাড়ো যে কেবল বুলি।
বিপ্লবী ছিল এ নিশীথ সেন
ছুঁড়িতে জানে ও গুলি।"
লাইমুখরার মুখরার দল
শিলঙ চাঁদের হাট
তুচ্ছ করিয়া তাদের গর্ব
উড়িল নিশীথ-লাট
কলকাতা পানে মনের ধেয়ানে
আঁকিয়া শোভন ছবি
আড়ালে আছেন চুপ চুপ চুপ
নিশীথ রাতের রবি।
শোভনা সে দেবী শোভন এ ঘর
কি আর আশিষ দিব
হউক শোভন নিশীথ জীবন
শতম শতম জীব।

মুজতবা আলী
২.২.৫০

এ দুটি কবিতা মুজতবা আলীসাহেবের স্বহস্তে লেখা 'দেশে বিদেশে' বইটির মধ্যে রাখা ছিল। নিশীথচন্দ্র সেনের পৌত্র শাক্য সেনের সৌজন্যে কবিতাদুটি পাওয়া গেছে। ১লা ফেব্রুয়ারি নিশীথচন্দ্র সেনের জন্মদিন হলেও সম্ভবত ২রা ফেব্রুয়ারি তাঁর জন্মদিন উদযাপিত হয়েছিল সে বছর। দুর্ভাগ্যবশত মুজতবা আলীসাহেবের শুভকামনা সার্থক হয়নি, এই অনুষ্ঠানের কয়েক মাস বাদেই নিশীথ সেনের সহধর্মিণী শোভনার প্রয়াণ ঘটে এবং তার কয়েক মাস পরেই নিশীথ সেনও মুজতবা আলীর মতন সুহৃদদের ছেড়ে চলে যান। এ প্রসঙ্গে মুজতবা আলীসাহেব লিখেছেন, 'নিশীথদা বউদিকে বড্ড ভালবাসতেন। আমি জানি নিশীথদা আরও কিছুদিন কেন এ সংসারে থাকলেন না। ফেব্রুয়ারি মাসে অখণ্ড সৌভাগ্যবতী শ্রীমতী শোভনা ইহলোক ত্যাগ করেন। সঙ্গে সঙ্গে নিশীথদার জীবনের জ্যোতি যেন নিভে গিয়েছিল।'

এই প্রবন্ধের যৌথ রচয়িতা শিখা রায় প্রয়াত নিশীথচন্দ্র সেনের পৌত্রী।

শিক্ষকতার সেকাল

চণ্ডিকাপ্রসাদ ঘোষাল

সেকালের সন্ধানে

'অনেক আগেকার শিক্ষকদের ওপর আমার পক্ষপাত আছে; হয়তো সেটা আমার মনের ভুল,'[১] এই দ্বিধাদীর্ণ মন্তব্য এক শিক্ষকেরই। তিনি জীবনানন্দ দাশ। আগেকার যুগের শিক্ষকদের প্রতি পক্ষপাত, বস্তুত এক সর্বজনীন দুর্মর প্রবণতা। কিন্তু সেই পক্ষপাত নিয়ে দোটানা জীবনানন্দের মতো আর কারুর বোধহয় নেই। তাঁর এই দোলাচল সম্ভবত এই কারণে যে এই বৃত্তির মাহাত্ম্য সম্পর্কে তিনি মুগ্ধতায় বিবশ ছিলেন না।

শিক্ষকতার ওপর চিরাচরিতভাবে কিছু বিরল বৈশিষ্ট্য চিরকাল আরোপিত। শিক্ষাদানের বৃত্তিকে সমাজ চিরকাল রাখতে চেয়েছে উপার্জনমুখী কর্মের তুচ্ছ জগৎ থেকে অনেক উঁচুতে। কারণ দেখানো হয়েছে এ রকম—বিদ্যাদান কোনও সাধারণ কাজ নয়, একটি মহান ব্রত। শিক্ষক হবেন আদর্শ, সততা, ন্যায়নিষ্ঠা ইত্যাদি সদ্‌গুণের সমাহার। শিক্ষকতার জন্য সমাজ-নির্ধারিত যোগ্যতা এ রকমই। যোগ্যতার এই রূপরেখা কীভাবে তৈরি হয়েছিল বলা মুশকিল। বস্তুত শিক্ষকতা যে একটি পেশা, সেই সত্যটিকে পাশ কাটিয়ে সমাজ ভাববাদী রূপকল্পের আশ্রয় নিয়েছে। শিক্ষকের অবস্থান শিক্ষার সেই উৎসমুখে যেখান থেকে তাবৎ শিক্ষার্থীসমাজ আহরণ করবে ভবিষ্যতের জন্য যাবতীয় মানসিক উপাদান। শুধু বিদ্যাদাতা হিসাবে নয়, ব্যক্তিগত আচার-আচরণ তথা জীবনধারার নিরিখেও আদর্শ শিক্ষাগুরু বিরাজ করবেন শিক্ষার্থীর জীবন ও মননে। তাঁর জীবন সমর্পিত পেশায় নয়, আদর্শে। শিক্ষক হবেন একটি পেশার প্রতিনিধি নয়, এক মহৎ ব্যক্তিচরিত্র, বাস্তবের রোদ-জলে উদাসীন এক দেশজ সক্রেতিস। কিন্তু যা তাঁর কর্তব্যের মূলাধার সেখানে তাঁর ভূমিকা ঠিক কী হবে? একজন ইতিহাসবিদ বলছেন, 'কী দিয়ে মাপা হবে এক মহান শিক্ষককে? ক্লাসে নিয়মিত পড়াচ্ছেন, পড়া বুঝিয়ে দিচ্ছেন, ক্লাসের লাস্টবয়ও সব বুঝতে পারছে। কিংবা প্রশ্ন উশকে দেওয়াটাই তাঁর কাজ। বা ফ্যালফ্যাল দৃষ্টির সামনে অকুতোভয়ে তিনি কি বলবেন যে উত্তরটা তাঁর জানা নেই। কেউ হয়তো ক্লাসে পড়ানোয় তত দড় নন। অথচ ছাত্রদরদী, সবার মিতা, সুখদুঃখের ভাগীদার। সত্যি কীভাবে তৈরি হয় প্রবাদপ্রতিম শিক্ষক। চরিত্রে, পাণ্ডিত্যে না বাচনভঙ্গিতে, সহমর্মিতায় না খামখেয়ালিপনায়। হয়তো সবকিছুরই দরকার পড়ে।'[২] যাঁরা মহান বা প্রবাদপ্রতিম নন, সাধারণ শিক্ষক তাঁদের মাপার পদ্ধতিটা কী? আবার শিক্ষকদের এই দুটি শ্রেণিতে ভাগ করে নিলে কিন্তু সাধারণ শিক্ষকদের জন্য সমাজ-নির্ধারিত মানদণ্ডটি আর ধোপে টেঁকে না। তাঁদের সাধারণ বৃত্তিজীবী হিসাবে মেনে নিতে হয়। কিন্তু সমাজ চিরকাল সাবেক আমলের শিক্ষকসমাজকে মহত্ত্বের নামাবলি পরিয়ে রেখেছে। এবং আশ্চর্য, কোনও সমাজই সমকালে যথার্থ শিক্ষাব্রতীর সন্ধান পায়নি। নিজের কালে তীব্র সমালোচনাই জুটেছে শিক্ষকদের বরাতে চিরদিন। আর প্রকৃত শিক্ষকের উদাহরণ খুঁজতে সমাজ অনিবার্যভাবে ফিরে ফিরে তাকিয়েছে এক দুর্নিরীক্ষ্য অতীতের দিকে, যার পোশাকি নাম—সেকাল। পূর্ববর্তীকালের শিক্ষকদের ব্রত আর ন্যায়নিষ্ঠার কষ্টিপাথরে মূল্যায়নের পর সমকালীন শিক্ষক সম্প্রদায়কে ফেল করিয়ে দেওয়াই চিরাচরিত রীতি।

আজকের ভোগবাদী সমাজে 'প্রফেশনালিজম' একটি প্রিয় শব্দ। আর সব বৃত্তিকে এই মানদণ্ডে পরিমাপ করা হলেও শিক্ষকতার ক্ষেত্রে একে মেনে নিতে আমাদের সমাজ আজও তৈরি নয়। পেশাদার নয়, ছাত্র-বাৎসল্যে উৎসর্গীকৃতপ্রাণ, দরদী, উচ্চচিন্তার ধারক—শিক্ষকের এই ভাবমূর্তিই অভিপ্রেত। বৃত্তি বা পেশার ওপর যদি আদর্শ ও মহত্ত্বের প্রলেপ দেওয়া যায় তবে উপার্জনের জরুরি প্রশ্নটি অনেকটাই অবান্তর হয়ে পড়ে। তার খেসারত দিতে দিতে ন্যুব্জ হয়ে পড়া শিক্ষককুল যখন একালে এসে বৃত্তির সঙ্গে জড়িত দাবি নিয়ে সরব, তখন তার শরীর থেকে একে একে খুলে নেওয়া হয় যাবতীয় বিরল পালক।

শিক্ষাব্যবস্থায় দুর্দশার জন্য অভিযুক্ত আজকের শিক্ষক সমাজকে ঘায়েল করার সবচেয়ে বড় হাতিয়ার সেকালের শিক্ষকদের মহিমাকীর্তন। একালের সঙ্গে তুল্যমূল্য বিচারে সেকালের শিক্ষাগুরুরা কত ন্যায়নিষ্ঠ, শিক্ষার্থীঅন্তপ্রাণ ও আদর্শবাদী তা প্রতিপন্ন করাটাই মূল অভীষ্ট। আজ যারা প্রবীণ তাদের কাছে নিজেদের শৈশব-কৈশোরের শিক্ষাগুরুরা সোনালি স্মৃতি। তাদের পিতৃপিতামহের ছাত্রজীবন যাদের আশ্রয়ে যাপিত তারাও স্মৃতির আলোয় সমান উজ্জ্বল। এইভাবে যতই পিছিয়ে যাওয়া যাক স্মৃতির ছবিটা পালটায় না। পালটায় না মানসিকতার ধারাবাহিকতাও। এ একান্তই নস্টালজিয়া-আক্রান্ত সমাজের চিরন্তন আত্মপ্রবঞ্চনা। সেকালের সঙ্গে তুলনায় একাল চির-ভূলুণ্ঠিত, ধরাশায়ী। পরাজয় তার ললাট-লিখন। কিন্তু সেই সেকালটা কবে শেষ হয়ে একালকে স্থান করে দিল? প্রচলিত মতে, সেকালটা ছিল

শিক্ষার্থী-অন্তপ্রাণ, ন্যায়নিষ্ঠ, আদর্শবাদী জ্ঞানতাপসদের নিয়ে এক স্বর্ণযুগ, একালের মতো দায়সারা নয়। ১৮৭৩ সালে রাজনারায়ণ বসু সেকাল আর একালের মাঝখানে একটি বিভাজনরেখা নির্ণয় করে দিয়েছিলেন। তাঁর মতে, আমাদের দেশে ইংরাজি শিক্ষা শুরুর সময়টিই সেই সন্ধিক্ষণ। এবং মজার ব্যাপার, নিজে নব্য শিক্ষায় শিক্ষিত, সংস্কারপন্থী ও আধুনিকমনস্ক হয়েও তিনি সেকালের পক্ষেই জোরালো সওয়াল করে গেছেন। হেয়ারসাহেবের স্কুলে শিক্ষক উমাচরণ মিত্রকে স্মরণ করে রাজনারায়ণ বলেছেন, 'যে সকল গদ্য পদ্য কাব্য তিনি আমাদিগের নিকট পড়িতেন তাহা ক্লাসের পাঠ্যপুস্তক ছাড়া। একালের কোনও শিক্ষক কি এরূপ করিয়া থাকেন?'[৩] ১৯১৭ সাল নাগাদ বাল্য স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে দীনেশচন্দ্র সেন লিখেছেন, 'আমাদের সৌভাগ্যগতিকে মহাত্মা ঈশ্বরচন্দ্র সেন, দীননাথ সেন প্রভৃতি মহোদয়ের মত শিক্ষাগুরু আমরা পাইয়াছিলাম। এক্ষণে জানিতে পাই অনেক শিক্ষক মহাশয়রাই ছাত্রদের সহিত সেরূপ স্নেহ-মমতা রাখেন না।'[৪] মন্তব্য দুটির মধ্যে ব্যবধান আশি বছরের, কিন্তু মর্মবাণী অভিন্ন—সমসময় সম্পর্কে হতাশা। লক্ষণীয় এই, রাজনারায়ণ স্মরণ করেন শিক্ষকের ক্লাসরুম পারফরম্যান্স আর দীনেশচন্দ্র দরদ। এর পাশাপাশি ১৯৯৬ সালে এক যশস্বী শিক্ষাবিদের বক্তব্য স্মরণীয়, 'In my life, I have seen more problem-teachers than problem-children'।[৫] মন্তব্যটি যদি এক শতাব্দী আগেও উচ্চারিত হত, তাহলেও অ্যানাক্রনিজম-এর দোষে দুষ্ট হবার কোনও কারণ থাকত বলে মনে হয় না। নিজের কালের প্রব্লেম সম্পর্কে অতিরিক্ত সচেতনতা খুব স্বাভাবিক একটি প্রবণতা। এবং তাতে সমসাময়িক শিক্ষকদের আধিক্য পরিলক্ষিত হওয়ার মধ্যেও কোনও অস্বাভাবিকতা নেই। কারণ তেমনটাই প্রথাসিদ্ধ।

'মাস্টার অবতারে বধ্য ছাত্র'

দীনেশচন্দ্রের দাবি যাই হোক, ছাত্রদের প্রতি স্নেহ-মমতা বিষয়ে উনিশ শতকের গুরুমশায়দের বড় সুনাম ছিল না। তিনি যে শৈশবে দু'একজন শিক্ষকের বাৎসল্য লাভ করেছিলেন তা ব্যতিক্রমী ঘটনা। কারণ সাধারণ ছবিটা মোটেই সেরকম ছিল না। সেকালের পাঠশালায় কচিকাঁচাদের জন্য মায়ামমতার ভাঁড়ারে ছিল নিদারুণ অনটন। দীনেশচন্দ্রের শৈশবেই বঙ্কিমচন্দ্রের 'বাবু' (১৮৭২) রচনাটি 'বঙ্গদর্শন'-এ ছাপা হয়। বাবুসম্প্রদায়ের উদ্দেশে নিঃক্ষিপ্ত তাঁর বিদ্রূপের ফুলকি থেকে শিক্ষক সম্প্রদায়ও রেহাই পায়নি। তাঁর মতে, বিষ্ণুর মতো বাবুদেরও দশটি অবতার। একটিতে শিক্ষক। বঙ্কিমচন্দ্রের নিজের ভাষায়, 'মাস্টার অবতারে বধ্য ছাত্র।'

দীনেশচন্দ্র রবীন্দ্রনাথের চেয়ে বয়সে ছ-সাত বছরের ছোট। শৈশবের শিক্ষকদের যে স্নেহ-মমতার কথা তিনি আক্ষেপের সঙ্গে উল্লেখ করেছেন, তার গতিপ্রকৃতি হাড়েহাড়ে টের পেয়েছিলেন বালক রবীন্দ্রনাথ। স্কুলের ওপর তাঁর বীতরাগের অন্যতম কারণ যে শিক্ষকদের নির্মমতা 'জীবনস্মৃতি'তে রয়েছে তার অকপট উল্লেখ। সাত বছর বয়সে ওরিয়েন্টাল সেমিনারিতে ভর্তি হয়ে শারীরিক শাস্তির ভয়াবহতা দেখে স্কুল সম্পর্কে তাঁর আজীবনের ভীতির সঞ্চার। নর্মাল স্কুলে এসেও তাঁর অভিজ্ঞতা পালটায়নি। তাঁরই পরবর্তীকালের এক ছাত্রের কথায়, 'এখানকার শিক্ষকগণ কথায় কথায় ছেলেদের মা-বাপ তুলিয়া কুৎসিত ভাষায় গালিগালাজ দেন। একটু ভুল হইলেই পিঠের উপর সপাং সপাং করিয়া বেতের বাড়ি মারেন। এখানে ইংরাজি, বাংলা, শুভঙ্করী সমস্ত জিনিসই ভয় দেখাইয়া মুখস্ত করাইয়া দেওয়া হয়। কোনও জিনিষেরই অর্থ মিষ্ট কথায় ভাল করিয়া বুঝাইয়া দেওয়া কিংবা বালকদের বয়স ও বোধশক্তির বিচার করিয়া তাহাদিগকে বিদ্যাদান করা হয় না।'[৬] নিষ্ঠুরতায় ওই স্কুলের সব শিক্ষককে ছাপিয়ে যান হরনাথ পণ্ডিত। বালক রবি বিত্তশালী পরিবারের সন্তান। হয়ত বা অভাবি শিক্ষকের আক্রোশের কারণ সেটাও। ঠাকুর পরিবারের ছেলেটি স্কুলের বার্ষিক পরীক্ষায় উল্লেখযোগ্য ফল করলে ক্ষিপ্ত হরনাথ ক্লাস টিচার মধুসূদন পণ্ডিতের বিরুদ্ধে অধ্যক্ষের কাছে নালিশ করেন।

১৯০০ সালে 'প্রদীপ' পত্রিকায় 'সেকালের ছাত্র' নামে একটি স্মৃতিকথায় এক দোর্দণ্ডপ্রতাপ শিক্ষকের ছাত্রসংহার বৃত্তান্ত রয়েছে। তখন সবে পল্লিগ্রামের পাঠশালায় ইংরাজি শিক্ষা শুরু হয়েছে। লেখক চল্লিশ বছরের পুরনো স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে লিখেছেন, 'এখনও যদি কেহ বলে মনের মধ্যে যমের একটি চেহারা কল্পনা কর, কেন বলিতে পারি না, তৎক্ষণাৎ বেণী চক্রবর্তী মহাশয়ের মূর্তি চিত্তপটে চিত্রিত হইয়া উঠে। আমাদের মনোরাজ্য হইতে যমকে নির্বাসিত করিয়া চক্রবর্তী মহাশয় সেখানে এমনই প্রবল প্রতাপে রাজত্ব করিতেন।'[৭] শুধু বেত বৃষ্টি নয়, আরও ভয়ানক নানা পদ্ধতি তিনি শাস্তি হিসাবে প্রয়োগ করতেন। মদনমোহন নামে একটি ছাত্রের দুরন্তপনাও সেই অত্যাচারের কাছে নত। ছেলেটি বাড়িতে নালিশ করে। তার বাবা স্কুলের সেক্রেটারির ঘনিষ্ঠ। সুতরাং চরম পরিস্থিতিতে ছেলেটির বাবা এসে হেডমাস্টারকে ডেকে শাসান, 'আপনি মশাই আপনার বেণী মাষ্টারকে সাবধান করে দেবেন, যদি তিনি এভাবে ছেলে ঠ্যাঙান, ত তাঁকে এ মুল্লুক ছেড়ে পালাতে হবে, পেয়াদা পাড়ার দুটো মুসলমান পাইককে লেলিয়ে দেব, তারা তাঁর হাড় ক'খানা হাউলের জলে রেখে আসবে।'[৮] এবংবিধ হুঁশিয়ারিতে সংবিত ফিরে পেয়ে বেণী মাস্টার মদনমোহনের গৃহশিক্ষকের পদে নিজেকে সঁপে দিয়ে পরিস্থিতি সামাল

দেন। হিন্দু কলেজের এক মারমুখী শিক্ষক বিশ্বাস করতেন, 'চকমকি পাথরে ইস্পাতের আঘাত করিলে যেমন তাহাতে অগ্নির প্রকাশ হয়, সেইরূপ বালকদিগকে প্রহার করিলে তাহাদের বুদ্ধির বিকাশ হইয়া থাকে।'[৯] যে-তালপাতার পাখার অস্ত্রে তিনি ছাত্রদের ধরাশায়ী করতেন, ডেভিড হেয়ার সাহেব ক্লাসে এসে ছাত্রদের সামনেই সেই পাখার বাঁটটি ছুরি দিয়ে কেটে শিক্ষকের হাতেই ফিরিয়ে দেন। এক প্রহার-প্রবণ শিক্ষককে মেট্রোপলিটান ইন্সটিটিউশন থেকে ক্ষিপ্ত হয়ে বিদায় করে দিয়েছিলেন বিদ্যাসাগর। সুকুমার রায়ের ছড়াতেও সেই বঙ্কিমচন্দ্র-বর্ণিত ছাত্রবধের ছবিটিই অবিকল আঁকা—'ডাক্তার ফস্টার ইস্কুল মাস্টার, বেত তার চটপট ছাত্রেরা ছটফট—ভয়ে সব পস্তায়, গ্রাম ছেড়ে শহরে, গয়া কাশী লাহোরে।' প্রহার-প্রীতিতেই ছিল শিক্ষকের পরিচয় ও স্বীকৃতি, আজ যেমন কোচিং-কূজনে। শারীরিক নির্যাতনের একটি মর্মান্তিক ছবি পাওয়া যায় ১৮৯৫ সালে 'দাসী' পত্রিকায় ছাপা একটি চিঠিতে। ঘটনাটি পত্রলেখকের শৈশব স্মৃতি, 'আমাদের গুরুমহাশয় একপ্রকার নতুন শাস্তির বিধান করিতেন। অপরাধী বালককে একটা চাউলের বস্তার ভিতর পুরিয়া তন্মধ্যে একপ্রকার পোকা ভরিয়া দিতেন। ঐ পোকার কামড়ে বালকের সর্বাঙ্গ ক্ষতবিক্ষত হইত। অথবা ঐ প্রকারে বস্তার মধ্যে ভরিয়া, মুখমাত্র বাহিরে রাখিয়া সমস্ত দিবসের জন্য জলের ভিতর বসিয়া থাকিতে হইত। বলা বাহুল্য, এবম্বিধ দুই প্রকার অবস্থাতেই বস্তার ভিতর বালকের হাত-পা বাঁধা থাকিত। পৃষ্ঠোপরি তৈলমর্দন করিয়া তদুপরি বেত্রাঘাত করাই আমাদের গুরুমহাশয়ের রীতি ছিল।'[১০]

নিষ্ঠুরতায় সবাইকে ছাপিয়ে গেছেন ঋষি আয়োদধৌম্য। গুরুগৃহে শিক্ষালাভরত তাঁর তিন শিষ্য উপমন্যু, বেদ ও আরুণি ঋষিবাক্যের অন্যথা করে না। আরুণি অশেষ কষ্ট স্বীকার করে খেতের আল বাঁধে। উপমন্যু তার সমস্ত ভিক্ষান্ন গুরুকে দান করে অনাহারে থাকতে থাকতে অর্কপত্র ভক্ষণ করে অন্ধ হয়ে যায়। বেদ-এর বরাতেও জোটে অসীম দুর্ভোগ। শিক্ষান্তে গৃহস্থাশ্রমে প্রবেশ করার পর বেদ নিজে যখন গুরুর আসনে, তখন তিনি সদা সচেতন থাকতেন যাতে নিজের শিষ্যদের সঙ্গে অমানবিক, নির্মম আচরণ না করেন, কারণ 'গুরুকুল বাসের দুঃখ তাঁহার মনোমধ্যে সতত জাগরূক ছিল। এই নিমিত্ত তিনি শিষ্যগণকে ক্লেশ দিতে পরাঙ্মুখ হইলেন।'[১১] সন্দীপন মুনির শিষ্য হিসাবে প্রায় একই অভিজ্ঞতার শরিক শ্রীকৃষ্ণ ও সুদামা। গুরুপত্নীর আদেশে ঝড়বৃষ্টির মধ্যে কুশ ও কাঠ সংগ্রহ করতে গিয়ে বনের মধ্যে অন্ধকারে পথ হারিয়ে ফেলেন তাঁরা। আশ্রমবাসী শিক্ষার্থীদের সঙ্গে যথেচ্ছ নির্দয় আচরণ করাই আচার্যদের রীতি ছিল। আর এই নির্মমতা সহ্য করার নাম কৃচ্ছ্রসাধন। প্রচলিত নিয়ম ছিল, ছাত্রেরা গুরুগৃহে থেকে শিক্ষালাভ করবে। ব্যয় বহনে অক্ষম ছাত্রদের ক্ষেত্রে আচার্যের ঘর সংসার ও খেতখামারের কাজকর্ম ছিল বাধ্যতামূলক। যে ছাত্ররা আহার, বাসস্থান ও শিক্ষার সব খরচ দিত, তাদের ক্ষেত্রে গুরুগৃহে কাজ বাধ্যতামূলক ছিল না। গুরুদেবকে খুশি রাখার জন্য তাদের কেউ কেউ স্বেচ্ছায় সেবা করত।

বস্তুতপক্ষে, পাঠশালার গুরুমশাইদের প্রহার-প্রবণতার সঙ্গে লেখাপড়ার কার্যকারণ সম্পর্ক যতটা তার চেয়ে অনেক বেশি ছিল ব্যক্তিগত চাহিদা পূরণের। সেই চাহিদা কতটা সঙ্গত তা নিয়ে ভাবিত হবার অবকাশ তাঁদের ছিল না। নিত্যকার সাংসারিক অনটনই তার মূল কারণ। পুঁথিপাঠের আনুষঙ্গিক এমন ক্রিয়াকর্মে তাদের বাধ্য করা হত যাতে গুরুমশায়ের সংসারে আর্থিক সুরাহা হয় এবং তা নৈতিকতার মূল্যে। বইপত্রের সঙ্গে কলাপাতার ঠোঙায় ভরে পাঠশালায় তামাক নিয়ে আসা ছিল প্রচলিত রীতি। তাতে গুরুমশায়ের নেশার তৃপ্তি ও সেই বাবদ আর্থিক সাশ্রয় দুই-ই হত। যে পড়ুয়া এই নিয়মের অন্যথা করবে শারীরিক নিগ্রহ তার বরাতে নিশ্চিত। পরবর্তীকালে ছাত্রীদের ক্ষেত্রে ছিল ঘুঁটে নিয়ে যাওয়ার নির্দেশ। এই অভিজ্ঞতা-সমৃদ্ধ এক ছাত্রের খেদোক্তি, 'ইংরাজি শিক্ষার প্রভাবে বর্তমান সময়ে আমরা যথেষ্ট উন্নতি করিয়াছি বটে, কিন্তু পাঠশালার গুরুমহাশয়গণ এখনও ছাত্রদিগকে চুরিবিদ্যা শিক্ষা দিতেছেন। কারণ, বাবার অথবা কাকার তহবিল হইতে চুরি না করিলে তাহারা তামাক কোথায় পাইবে? কেহ কেহ বাড়ি হইতে পয়সা চুরি করিয়া তদ্দারা তামাক কিনিয়া আনিয়া গুরুমহাশয়ের দারুণ প্রহারের হাত হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিতেছে।'[১২] শ্রীশচন্দ্র মজুমদারের 'ফুলজানি' (১৯২৯) উপন্যাসে গুরুমশায়ের কার্যকলাপের বর্ণনা এরকম : 'সর্দার পোড়ো পুরন্দর এতক্ষণ হাঁকিয়া হাঁকিয়া মহামহিম লিখিতেছিল, এবং বোসেদের বড়বাবুর নাম ফাঁদিয়া কর্জ করিবার কায়দাটা শিখিতেছিল। যেমন সে বুঝিল, গুরুমহাশয়ের রাগ একটু কমিয়াছে, অমনি কাছে আসিয়া তামাক সাজিতে চাহিল। রামধন ভট্টাচার্যের মুখে হাসি আর ধরে না। বলিলেন, ভাল তামাক সেজে আনিস রে ব্যাটাহু তোর বাপের তামাক একটু চুরি করেই না হয় আন, আর দেখিস যেন খেয়ে পুড়িয়ে শেষ করে আনিস নে।' এই রামধনবাবুর পড়ুয়ারা 'সদসৎ উপায়ে অভিভাবক বা অভিভাবিকাদের জ্ঞাত বা অজ্ঞাতসারে তাঁহার জন্য যে ঘুঁটে, চাউল, তরকারিরাশির সমাবেশ' করে তা তিনি উৎফুল্ল হয়ে দেখেন।

ছাত্রদের সেবা লাভ করার আরও পন্থা ছিল। গুরুমশায়ের বাজারের সওদা কাঁধে বয়ে বাড়ি পৌঁছে দেওয়ার দায়িত্ব থাকত প্রতিদিন দু'তিনজনের এক-একটি দলের ওপর। এরকম এক দলের সদস্যের জবানিতে, 'দুই-তিনজন বাদ্যকরের ছেলে আমাদের সঙ্গে পড়িত। গুরুমশায়ের বাড়িতে কোনও শুভকার্যের অনুষ্ঠান হইলেই ইহাদের

আত্মীয়-স্বজনকে বাইয়া বিনা পয়সায় গুরুমহাশয়ের বাড়িতে বাজাইয়া দিয়া আসিতে হইত। জন ছয়েক ঘরামির ছেলেও আমাদের সঙ্গে পড়িত। বর্ষাকালে গুরুমহাশয়ের ঘরের খড় উড়িয়া গেলে ইহাদের আত্মীয় স্বজনকে যাইয়া ঐ ঘর মেরামত করিয়া দিয়া আসিতে হইত। এইরূপে ধোপাকে বিনা পয়সায় কাপড় কাচিতে হইত, নাপিতকে কামাইতে হইত।'[১৩] এইভাবে গত্যন্তরহীন দরিদ্র ছাত্ররা দিব্যি গুরুমশায়ের দারিদ্রমোচনে নিয়োজিত থাকত। অবস্থাপন্ন ছাত্রদের কথা আলাদা। মনোমোহন বসু লিখেছেন, 'সেকালে চারিআনা মাসিক বেতন এত অল্প শ্রুত হইত যে যদি কখনও কখনও ছাত্রের মা-বাপ তত দিতেন তবে তাঁহাদের কাছে গুরুর মাথা কেনা থাকিত।'[১৪] ব্যতিক্রমও ছিল। কিন্তু ব্যতিক্রমী শিক্ষকদের বরাত চিরকালই মন্দ। 'কেঁড়েলের জীবনচরিত' (১২৮০)-এ মনোমোহন বসু হরিশমাস্টার-এর স্মৃতিচারণ করেছেন যিনি সেই যুগেও এই বিশ্বাসে থিতু ছিলেন যে মারধোর করলে ছেলেরা লেখাপড়া শেখে না। তিনি অন্য গুরুদের মতো কঠোরহৃদয় ছিলেন না। বিশেষ দোষ না পেলে কাউকে মারতেন না। শিক্ষাগুরুর ভূমিকা নিয়ে তাঁর সঙ্গে অভিভাবকদের ধারনার বিস্তর ব্যবধান ছিল। পাঠাভ্যাসের চেয়ে শৃঙ্খলারক্ষা, বিদ্যার্জনের চেয়ে কঠোর শাসনই অভিভাবকদের বেশি পছন্দ। যে-শিক্ষক নির্মম হতে নারাজ, তাঁর ওপর অভিভাবকেরা আস্থাশীল হতেও নারাজ। স্নেহার্দ্র শিক্ষকের পাঠশালায় সন্তান পাঠানো নিরর্থক। হরিশমাস্টারকে সতর্ক করে দেওয়া হয়েছিল, তিনি যদি ভাল করে শাসন করতে না পারেন, তবে তাঁরা ছেলে পাঠাবেন না। ফলত হরিশমাস্টারের পাঠশালায় ছাত্রের অনটন। নির্মমতা যেহেতু যোগ্যতার মাপকাঠি, সুতরাং অভিভাবকদের অনুগত হওয়াই গুরুমশাইরা শ্রেয় জ্ঞান করতেন জীবিকার তাগিদে। যে গুরুমশাইয়ের ব্যাখ্যায় 'দুঃখ বিনা সুখলাভ হয়কি মহীতে' মানে হল, 'হে মহীতে, দুঃখ বিনা কি সুখ লাভ হয়'?[১৫] কিংবা 'দুষ্কর্ম' শব্দের অর্থ 'যে কর্ম বহু দূরে সাধিত হয়,' তাঁর স্কুলে ছাত্রের জোয়ার। শুধু এই বহরের জ্ঞান বিতরণই নয়, নিজের পড়ানোর দায়িত্বটি অন্যদের ওপর চাপিয়ে দেবার দিব্যি চল ছিল। অর্থাৎ উঁচু ক্লাসের মাতব্বর ছাত্রদের দিয়ে নিচু ক্লাসে পড়ানো। এদের বলা হত 'সর্দার পোড়ো'। শিক্ষকের প্রশ্রয়েই এরা ক্ষুদে গুরুমশাই সেজে নিরীহ পড়ুয়াদের ওপর যথেচ্ছ গুরুমশায়গিরি করত।

১৮২০ সাল নাগাদ কলকাতা স্কুল বুক সোসাইটি শহর ও শহরতলির দেশীয় পাঠশালাগুলির সংস্কার করে সেগুলিকে নিয়ন্ত্রণে আনতে উদ্যোগী হয়। পাঠশালা পরিদর্শন, পাঠ্যপুস্তক বিতরণ, গুরুমশাইদের মানোন্নয়ন, ছাত্রদের যথোপযুক্তভাবে পরীক্ষাগ্রহণ ইত্যাদি কর্মসূচি নেয়। অনেক পাঠশালাই সহজবোধ্য কারণে এর আওতায় আসতে অনিচ্ছুক ছিল। বিদ্যালয় পরিদর্শক পাঠশালায় এলে নিজেদের যোগ্যতা প্রমাণের জন্য নানা ছলচাতুরির আশ্রয় নিতেন গুরুমশাইরা। সেসব কৌশল মহাত্মা গান্ধীর ছাত্রজীবনে স্কুল পরিদর্শকের সামনে ভুল বানানে 'কেটল' শব্দটি লেখার গল্পটি স্মরণ করিয়ে দেয়। এক ছাত্রের অভিজ্ঞতা এরকম, 'সব ইন্সপেক্টরবাবু স্কুল দেখিতে আসিয়া আমাদিগকে কোনও প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলে গুরুমহাশয় দূরে দাঁড়াইয়া বিবিধ প্রকারের ভাবভঙ্গি করিয়া আমাদিগকে ঐ প্রশ্নের উত্তর বলিয়া দিতেন। যথা—প্রশ্ন ২ × ৪ কত? গুরুমহাশয় দূরে দাঁড়াইয়া তাঁহার এক হস্তের পাঁচটি ও অপর হস্তের তিনটি অঙ্গুলি দেখাইতেন। ...আমরা গুরুমহাশয়ের এরূপ ভাবভঙ্গির তাৎপর্য গ্রহণে সম্পূর্ণ অভ্যস্ত ছিলাম। এবং আমাদের উপর গুরুমহাশয়ের এরূপ কড়া হুকুম ছিল যে কেহ স্কুল পরীক্ষা করিতে আসিয়া কোনরূপ প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলে আমাদিগকে তৎক্ষণাৎ গুরুমহাশয়ের পানে তাকাইতে হইবে।'[১৬] অন্যথা গুরুমশায় তথা পাঠশালার মান বাঁচে না। অতএব, বিদ্যাশিক্ষা ও নীতিশিক্ষা দুই-ই সমান বেপথু। অভিভাবকদের সন্তোষবিধানের জন্য শৃঙ্খলারক্ষাই পরম কর্তব্য। এ দস্তুর শুধু পুরনো যুগের পাঠশালায় সীমাবদ্ধ ছিল না। ইংরাজি শিক্ষার যুগেও বিশেষ তারতম্য ঘটেনি। বিশ শতকের প্রায় মাঝামাঝি সময়ের অভিজ্ঞতা-সমৃদ্ধ লেখক মনোজ বসুর 'মানুষ গড়ার কারিগর' উপন্যাসে মহিম মাস্টারের হাহাকার, 'অনার্স নিয়ে বি এ পাস করেছি। ফিফথ ক্লাসের উপরে পড়াবার বিদ্যে কি নেই আমার, বলুন?' ক্লাস রুটিন তৈরির দায়িত্বপ্রাপ্ত শিক্ষক চিত্ত গুপ্ত জবাব দেন, 'বিদ্যে নিয়ে কথা নয়। পড়ানো চায় না তো স্কুলে। মুস্কিল কি জানেন, আপনি ক্লাস ম্যানেজ করতে পারেন না মোটে। ফিফ্‌থ ক্লাসেও তো গণ্ডগোল'। পড়ানো নয়, ক্লাস ম্যানেজ করাটাই আসল কথা। হুতোমি সতর্কীকরণ যথার্থ, 'পাঠক, পাঠশালা যমালয় হতেও ভয়ানক—পণ্ডিত ও মাস্টার যেন বাগ (বাঘ) বিবেচনা হচ্ছে'।[১৭]

আদর্শের বিড়ম্বনা

যাঁরা 'বাঘ' বিবেচিত হননি, আবার দীনেশচন্দ্রের দয়ার্দ্র শিক্ষকদের দলেও ছিলেন না, এমন শিক্ষকদের ছবিটা একেবারেই আলাদা। ১৮৫০ থেকে ১৮৭০ সালের মধ্যে কলকাতা শহরের ঘটনাবলির পটভূমিকায় লেখা 'সচিত্র গুলজারনগর' (১৮৭১) নামে ব্যঙ্গধর্মী বইটিতে লেখক 'ভাঁড়' ওরফে কেদারনাথ দত্ত সেকালের স্কুলের হালচাল সম্পর্কে লিখেছেন, কীভাবে এক ছাত্রকে যৎসামান্য শাস্তি দিতে গিয়ে চাকরি খোয়াতে বসেছিলেন শিক্ষক হাবুবাবু। 'খুদে মঙ্গলবারে হাবুবাবু ফক্‌কড়িধরের গলা টিপেছিলেন, তাতে কেউ শিশ, কেউ জুতর ঠকঠকি, কেউ নাকে কাঠি দিয়ে হ্যাঁস্য আরম্ভ করলে, হাবুবাবু রেগে টাই, হেডমাষ্টারের কাছে রিপোর্ট কত্তে

যান, ছোকরারা অমনি নেচে হাততালি দিয়ে হোহো হরিবোল করে উঠল, টেবিল চাপড়ান আরম্ভ হল, হুড়দুম শব্দ হল, হেডমাষ্টার নেউলের মত ফুলতে ফুলতে এসে আস্ফালন কল্লেন, হাবুবাবু বাছাই কোরে বিচ্ছুদের ধরিয়ে দিলেন, হেডবাবু তাদের নীচের ক্লাসে নামিয়ে দেন এমন সময় চতুরঙ্গের গাওনা উঠল, ঘুঘু ঘুরবুলি বেরল, শিসের হিসহিসে ঘর ফেটে গেল, ক্লাসের তামাম ছোকরা 'ধিনিকেষ্ট তিনি তা' কোরে স্কুল থেকে বেরিয়ে যায়, হেডবাবুর আককেল গুড়ুম, হেড্‌বাবু বেহেড হলেন, ছেলেছোকরাদের বোঝালেন, হাতে ধরলেন, শেষ তাদের কাছে মাপ চেয়ে উল্টে হাবুবাবুকে ধমকে বিদেয় হলেন। হাবুবাবু ছাদনাতলায় বরের মতন ফ্যালফ্যাল কোরে চেয়ে রইলেন।' অবশেষে ছাত্রের কাছে হেডমাস্টার ক্ষমা চেয়ে তাদের সামনেই সহকারী শিক্ষককে ধমকধামক দিয়ে পরিস্থিতি সামাল দিলেন। এই ঘটনাটি সেকালের দুটি অন্যতম প্রতিষ্ঠান হিন্দু কলেজ কিংবা ওরিয়েন্টাল সেমিনারির। ছাত্রদের দৌরাত্ম্যে শিক্ষকরা কতদূর বিপর্যস্ত তার নমুনা অন্তহীন। ১৯০০ সালের কথা। হেয়ার স্কুলের তৎকালীন প্রধান শিক্ষক ছাত্রদের আচরণে অত্যন্ত অপমানিত বোধ করে আক্ষেপ করেছিলেন, 'বাপু, আজকাল আমি ভারতবর্ষের মধ্যে একটি সর্বশ্রেষ্ঠ স্কুলের প্রধান শিক্ষক। ভারতবর্ষের রাজধানী কলিকাতায় সর্বশ্রেষ্ঠ গভর্ণমেন্টের বিদ্যালয় আমার অধীনে। কিন্তু আমার মনে হয়, আমি হুগলিতে অথবা অন্য কোনও পল্লিগ্রামে থাকিলে ভাল হইত। এখানকার ছেলেদের কথা বলিও না, কাহাকেও কিছু বলিতে ভয় করে, পাছে রাস্তায় ছুরি মারে। আমার ছাত্রেরা পথে আমার সম্মুখে বার্ডসাই খায়, লজ্জায় আমি ছাতা আড়াল দিয়া চলিয়া যাই।'[১৮] ব্যথিত, বিধ্বস্ত প্রধান শিক্ষকের এই জবানির কোনও জবাব সমকালের কাছে ছিল কি না আজ তা জানবার উপায় নেই। ছুরি মারার কথাটি নেহাৎ কথার কথা নয়। ছাত্রের হাতে শিক্ষকের ছুরিকাহত হবার ঘটনা রয়েছে বিশিষ্ট গায়ক অমিয়রঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়ের স্মৃতিতে। ১৯৩০-এর দশকে ওরিয়েন্টাল সেমিনারির ছাত্র ছিলেন তিনি। সেই সময়ে ওই স্কুলের এক প্রবীণ শিক্ষক গঙ্গায় স্নান করতে যাবার পথে নিজের স্কুলের ছাত্রের হাতে আক্রান্ত হন। কারণটি অবশ্য জানা যায়নি।[১৯]

কলকাতার খেলাতচন্দ্র ইন্সটিটুশনে ১৯২৯ থেকে ১৯৪১ সাল অবধি পড়িয়েছেন বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়। ক্লাসরুমে প্রায়শই তিনি ছাত্রদের কাছে উপহাসের পাত্র। সদাই একটু আনমনা, উদাসীন মানুষটির কাছে ওই চারদেয়াল হয়ত অস্বস্তিকর ছিল। ত্রিশের দশকের মাঝামাঝি থেকে ১৯৪১ সাল পর্যন্ত সেই স্কুলে পড়া এক ছাত্রের কথায়, 'আদর্শ শিক্ষক বলতে যা বোঝায় তা তিনি ছিলেন না। চাকরির খাতিরে ক্লাসে এসে বসতেন, মামুলিভাবে সামান্য কিছু পড়াতেন—ব্যস ওই পর্যন্ত। তাঁর ক্লাসে হৈ-হট্টগোল লেগে থাকত।'[২০] কখনও কখনও গোলমাল থামাতে হেডমাস্টার নিজেই আবির্ভূত হতেন। ছাত্ররা তাঁর অন্যমনস্কতা নিয়ে সামনেই বিশ্রী রসিকতা করত। মাস্টারমশায়ের ভ্রমণের নেশা নিয়ে ক্লাসের মধ্যেই এক ছাত্রের বিদ্রূপ, 'মুরগি যতটুকু উড়তে পারে, আকাশের খবর ততটুকুই সে রাখে।' শিক্ষককে সরাসরি এই ভাষায় আক্রমণ কী ধরনের মানসিকতার প্রতিফলন তার ব্যাখ্যা নিষ্প্রয়োজন। অথচ বিভূতিভূষণ পাঠ্যসূচির বাইরে জ্ঞানবিজ্ঞান নিয়ে সহজ গল্পগুজবের ভঙ্গিতে ছাত্রদের কৌতূহলী করে তুলতেন। চিড়িয়াখানায় গিয়ে আড্ডার ছলে সাহিত্য, ইতিহাস-ভূগোলের বিচিত্র কাহিনি শোনাতেন। তাঁর অবস্থা বস্তুত মনোজ বসুর সেই মহিমমাস্টারের মতো। ক্লাসকে স্তব্ধ রাখতে অক্ষম বলেই তিনি ছাত্রের চোখে 'আদর্শ শিক্ষক' নন। স্মৃতিচারণ প্রসঙ্গে প্রাক্তন ছাত্রটি মন্তব্য করেছেন, বিভূতিভূষণ 'আর যাই হোক, নিছক স্কুল মাস্টার হবার যোগ্য নন'। বহুদিন পর মাঝরাস্তায় সেই ছাত্র যখন 'স্কুলের এক সাধারণ মাস্টার' বিভূতিভূষণকে প্রণাম করে লজ্জিত বোধ করেন, তখন বোঝা যায় তাঁর শ্রদ্ধা লেখক বিভূতিভূষণের খ্যাতির জন্য, শিক্ষকের জন্য নয়। শিক্ষকতাকে মর্যাদা দিতে গিয়ে তিনি বিভূতিভূষণকে হেয় করেন, আবার লেখক বিভূতিভূষণকে শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করতে গিয়ে শিক্ষকতাকে হেয় করেন। এই দৃষ্টিভঙ্গি অস্বাভাবিক নয়। সেই চিরাচরিত সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গিরই ব্যক্তিগত প্রকাশ।

শিক্ষক সম্পর্কে এই মনোভাবসম্পন্ন ছাত্রকে পাওয়া যায় বিভূতিভূষণেরই 'অনুবর্ত্তন' উপন্যাসে। চুনি নামে ছাত্রটিকে বাড়িতে পড়াতে এসে তার স্কুলেরই শিক্ষক নারাণবাবু তার মুখেই শোনেন, 'মাস্টার বাড়িতে রাখা ঐ জন্যই তো। এতগুলো করে টাকা মাইনে দিতে হয় আমাদের ফি মাসে শুধু প্রাইভেট মাস্টারদের।' একাধারে সাহিত্যিক ও শিক্ষক ছিলেন বলেই রোমান্টিক মানুষ হয়েও বিভূতিভূষণ তাঁর অভিজ্ঞতার জগৎটাকে নিয়ে সমসাময়িক শিক্ষক সমাজের একটি দলিল রচনা করতে পেরেছিলেন। সেখানে সাহেব-হেডমাস্টার, ও তার বশংবদ অ্যাসিস্ট্যান্ট হেডমাস্টারের বেতন নিয়মিত বাড়ে। অথচ সহকারী শিক্ষকদের সামান্য বেতন থেমে থাকে একই জায়গায়। তাদের বেশিরভাগ ফাঁকিবাজ, টিউশানি-সর্বস্ব। অনেকের শিক্ষার মান কহতব্য নয়। পড়ানোয় অনীহা, ঘনঘন ছাত্রদের অফিসে পাঠানো হয় কটা বাজে দেখে আসার জন্য। সেকালের এই আদর্শবাদী শিক্ষককুল সাহেব-হেডমাস্টারকে সাত-পাঁচ বুঝিয়ে ছুটি আদায় করেন। ক্লাসে ক্লাসে নোটিস যায়, The school will remain closed tomorrow, the 9th inst. for the great Hindu festival Ghantakaran Puja. পরীক্ষার

হলে চেয়ারে বসে ঢুলতে থাকা, ছেলেদের দেওয়া পয়সা থেকে লুকিয়ে ভালমন্দ খাওয়া, মিথ্যে হিসেব দিয়ে টাকা নেওয়া যদুবাবু আরও পুরনো যুগের শিক্ষক! ভাল করে পরীক্ষার খাতা দেখার বালাই নেই শিক্ষকদের। একমাত্র ব্যতিক্রম প্রবীণ নারাণবাবু। স্কুল এবং ছেলেদের উন্নতি নিয়ে তিনি সদা ভাবিত। অথচ তাঁর আদর্শবাদের মূল্য কোথায়? তিনি যে বাড়িতে দিনের শেষে পড়াতে যান সেখানে অভিভাবক, এমনকী চুনি নামে ছাত্রটির কাছেও প্রতিনিয়ত অপমানিত। নতুন মাস্টার রামেন্দুবাবু এই অভাবি শিক্ষকদের দলে নেই, কারণ তিনি অবস্থাপন্ন পরিবার থেকে আসা। বাকি শিক্ষকদের কাছে আদর্শ রক্ষার চেয়ে বেশি জরুরি জীবন ধারনের প্রাণান্তকর প্রয়াস।

বৈশম্পায়ন-পরীক্ষিৎ

পশ্চিমী শিক্ষার তাগিদ উনিশ শতকের প্রথম দিকে যে সব প্রতিষ্ঠানের জন্ম দিয়েছিল, সেগুলিতে পাঠশালা থেকে কলেজি শিক্ষার বন্দোবস্ত ছিল। পাঠশালার শিক্ষকরা উঁচু ক্লাসে পড়াতেন না। তবে মুখস্থ করার রীতিটা স্কুল-কলেজ সর্বত্রই সমান। ১৮৯০ সাল নাগাদ প্রবীণ রাজনারায়ণ বসুর খেদোক্তি, 'কলেজে ছাত্রেরা কেবল শ্রোতা। শিক্ষক ব্যাখ্যা করিয়া যাইতেছেন, বালকেরা কেবল নোট লিখিতেছে। বৈশম্পায়ন বক্তা, পরীক্ষিত শ্রোতা। না আছে বালক কর্তৃক শিক্ষককে জিজ্ঞাসা, না আছে শিক্ষক কর্তৃক বালককে জিজ্ঞাসা। আমি এই শিক্ষা প্রণালী ঘৃণা করি।'[২১] তারপর এক শতাব্দী অতিক্রান্ত। রাজনারায়ণের ঘৃণা সেই ট্র্যাডিশনকে বেপথু করতে পারেনি। রাজনারায়ণের ভাবনায় হয়ত ছিল শিক্ষা সম্পর্কে গীতায় উচ্চারিত সেই শ্লোক ঃ

তদ্বিদ্ধি প্রণিপাতেন পরিপ্রশ্নেন সেবয়া।
উপদেক্ষ্যন্তি তে জ্ঞানম্ জ্ঞানিনস্তত্বদর্শিন॥ (৪।৩৪)

অর্থাৎ, আচার্যদের কাছে গিয়ে প্রণাম এবং তাঁদের সেবা করে তুষ্ট করতে হবে। তোমার সেবা ও নম্রতায় খুশি হয়ে তাঁরা তোমার জিজ্ঞাসা তৃপ্ত করবেন। কিন্তু কার্যত, জিজ্ঞাসার প্রশ্নটিই অবান্তর। বিদ্যার্জনের পন্থা হিসাবে কণ্ঠস্থ করার রীতিটিই সনাতন ঐতিহ্য। গুরুমশাইদের অনেক ক্ষেত্রে শিক্ষাগত মান যেমন সন্তোষজনক ছিল না, কেউ কেউ বুঝিয়ে দেবার ঝুঁকিই নিতেন না। আবার কেউ নির্দ্বিধায় ভুল পড়িয়ে যেতেন। তাছাড়া পাঠশালার পাশাপাশি অন্যান্য কাজেও ব্যস্ত থাকতেন গুরুমশাইরা। সুতরাং পড়ুয়াদের দেবার মতো বেশি অবকাশ কোথায়? সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর 'আমার বাল্যকথা'য় (১৯১৫) পণ্ডিতমশায়ের কাছে সংস্কৃতশিক্ষার কথা বলতে গিয়ে বাণেশ্বর বিদ্যালংকারের কাছে প্রাপ্ত শিক্ষার উল্লেখ করেছেন। বিদ্যালংকার বলতেন, 'আবৃত্তিঃ সর্বশাস্ত্রানাং বোধাদপি গরীয়সী। আবৃত্তি বোধের চেয়েও বেশি গুরুত্বপূর্ণ, সর্বশাস্ত্রের সার, বোঝো আর না-ই বোঝো, কিছু এসে যায় না।'[২২] বিশিষ্ট পণ্ডিত রবীন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত তাঁর ছাত্রজীবনের প্রসঙ্গে লিখেছেন, 'আমাদের হেডমাস্টারমশাই ইংরেজি গদ্যও মুখস্থ করিতে বলিতেন। আমাদের বুঝাইতেন ইংরাজি রচনা মুখস্থ করিয়া আবৃত্তি না করিলে ঐ ভাষা আমাদের রক্তে প্রবেশ করিবে না'।[২৩] মুখস্থ করার মাধ্যমে বিদ্যার্জনের পরম্পরায় নোট-সংস্কৃতির আবির্ভাব। এই ধারাবাহিকতার সঙ্গে জুড়ে রয়েছে বোঝাবুঝির জটিলতা এড়িয়ে মুখস্থবিদ্যার মাধ্যমে জ্ঞানচর্চা। আর জ্ঞানলাভের চেয়ে শৃঙ্খলারক্ষা চিরকালই বেশি গুরুত্বপূর্ণ। ক্লাসে পড়াশোনার চেয়ে বেশি জরুরি নিস্তব্ধতা, যা নিশ্চিত করতে একটি রক্তচক্ষু পেয়াদাই যথেষ্ট, শিক্ষক নয়। প্রেমেন্দ্র মিত্রের 'ভবিষ্যতের ভার' গল্পে হেড পণ্ডিত ও থার্ড পণ্ডিতের মধ্যে ক্লাসে পড়ানো নয়, ডিসিপ্লিন রাখার তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতা। ছেলেরা পাংশু মুখে সভয়ে শ্বাস-প্রশ্বাস নেয়।

দেশীয় পাঠশালায় গুরুমশায়দের প্রহার-প্রবণতার অন্যতম কারণ ছিল অভিভাবকদের সন্তোষবিধান। যে গুরুমশাই যত ভয়ঙ্কর, তাঁর স্বীকৃতি তত বেশি। অবশ্যই রুদ্রমূর্তি গুরুমশাইদের যুগ শেষ হবার পর সেই স্বীকৃতির পালক শোভা পায় কোচিং-ক্লান্ত শিক্ষকদের উষ্ণীষে। যে নোট-সংস্কৃতি সম্পর্কে রাজনারায়ণের তীব্র বিষোদ্‌গার, তার উত্থানের মূলেও একই কারণ—অভিভাবকদের সন্তোষ বিধান। রবীন্দ্রনাথ শিক্ষকদের বলেছেন, 'নোটের বোঝার বাহন'। আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় তাঁর লেখা ও বক্তৃতায় নোট-সংস্কৃতির বিরুদ্ধে সোচ্চার। এই উপসর্গের কারণটি শিক্ষক হিসাবে তাঁর অজানা নয়। 'পরীক্ষার ভাল ফল দেখাতে না পারলে অভিভাবকেরা অসন্তুষ্ট হন, কাজেই শিক্ষকের ভাল ফল করার চেষ্টায় নোট দেওয়া, বাইরের বই পড়া রহিত করা প্রভৃতি দুষ্কার্য করিতে হয়। এর ফলে ভবিষ্যৎ জীবনে ছেলেরা কীরূপ দিগগজ হয় সে তো সবাই দেখতেই পাচ্ছি।'[২৪] এই 'দুষ্কার্য' না করার পরিণাম কী হয় তার একটি নজির উল্লেখ করা যেতে পারে ১৮৭৬ সালে 'তত্ত্ববোধিনী' পত্রিকার একটি সংখ্যা থেকে। ছাত্রেরা যাতে নিজেদের বুদ্ধিমত্তা প্রয়োগ করে এই বাসনায় এক ইংরাজি সাহিত্যের অধ্যাপক পরীক্ষায় বাঁধা ছকের প্রশ্ন দেওয়া থেকে বিরত হলে ক্ষিপ্ত ছাত্রেরা তাঁর বিরুদ্ধে অধ্যক্ষের কাছে অভিযোগ করে। অধ্যক্ষ সেই অধ্যাপককে ডেকে প্রাজ্ঞ পরামর্শ দেন, অন্যান্য কলেজে সাহিত্য বিষয়ে শিক্ষার যে পদ্ধতি প্রচলিত তা-ই অনুসরণ করা কর্তব্য। অর্থাৎ 'শিক্ষক শিক্ষক নহেন, কেবল ব্যাখ্যাতা মাত্র, ছাত্ররাও ছাত্র নহে, কেবল শ্রোতা মাত্র।'[২৫] রাজনারায়ণের ভাষায়, বৈশম্পায়ন-পরীক্ষিৎ। এই গতানুগতিকতার অন্যথা করলে শিক্ষক গুরুত্বহীন হয়ে পড়বেন।

ছাত্রজীবনের কথা বলতে গিয়ে নোটবইয়ের দৌরাত্ম্য সম্পর্কে হুঁশিয়ারি দেন রেভ. লালবিহারি দে। ১৮৭৩ সালে

তিনি নোট রচয়িতাদের দ্বীপান্তর দাবি করেছিলেন: '[They] are the greatest pests in the country and the sooner they are deported to Botany Bay, the better for the education of the rising generation.'[২৬] শিক্ষক এবং শিক্ষিত মহলে নোটবইকে দৃশ্যত শাপশাপান্ত করার আদত খুব পুরনো। নোটবই অনেকের মতে একটি সাম্প্রতিক উপসর্গ। 'শিক্ষার কথা'য় জীবনানন্দ অনুমানের বশে ভ্রান্ত মন্তব্য করেছেন, পঁয়ত্রিশ-চল্লিশ বছর আগে কোনও অভিজ্ঞ শিক্ষক বা অধ্যাপক ইস্কুলের ছেলেদের জন্য নোট লিখতেন না। প্রকৃতপক্ষে, অন্যান্যদের সঙ্গে শিক্ষকরাও নোটবই রচনার সঙ্গে যথেষ্ট যুক্ত ছিলেন। প্যারিচরণ সরকারের সুযোগ্য সন্তান শৈলেন্দ্রনাথ সরকার বিশ শতকের প্রথম চার দশকে কলকাতার বিভিন্ন স্কুলে প্রধান শিক্ষকতা করে যশস্বী হন। তাঁর নামাঙ্কিত একটি স্কুলও রয়েছে উত্তর কলকাতায়। শৈলেন্দ্রনাথ ছিলেন লব্ধপ্রতিষ্ঠ নোট-প্রণেতা। অসচ্ছলতা যে বৃত্তিজীবীর নিয়তি, তাকে উপার্জনের একাধিক পথের সন্ধান করতেই হয়। আবার নোট প্রণয়নের সঙ্গে জুড়ে থাকে শিক্ষক হিসাবে সাধারণ্যে বিস্তর স্বীকৃতিও। প্রকাশকদের সৌজন্যে অনেক প্রয়াত শিক্ষক-নোটপ্রণেতা অমরত্ব পেয়েছেন আজকের পড়ুয়াদের পড়ার টেবিলে।

চাকরি ও বিয়ের বাজারে বিকোতে হলে পাশ চাই-ই। ১৩১১ বঙ্গাব্দে 'ভারতী' পত্রিকায় 'আমাদের উচ্চশিক্ষা' শীর্ষক একটি রচনায় জীবিকা অর্জনের উপায় সম্পর্কে শ্রীমতী সরলা দেবীর প্রশ্নের উত্তরে আশুতোষ চৌধুরীর জবাব, 'আমরা বি.এ, এম.এ পড়ি উকিল, ব্যারিষ্টার হইবার জন্য, ইউনিভারসিটিতে যাই চাকুরির চেষ্টায়। শিক্ষা পথে যতটুকু হয়, তাহার পরে প্রায় কিছুই করি না। গরীব আমরা আহার চেষ্টায় দিনরাত থাকি। বি.এ. পাশ করিলে খাইবার সংস্থান হইবে বলিয়াই তো বি.এ পড়ি। চাকুরি না পাইলে আইন ব্যবসায়ী হই।'[২৭] সুতরাং নোটের সামাজিক চাহিদা অপ্রতিরোধ্য। তা রুদ্ধ করার ক্ষমতা ও দায় কোনওটিই শিক্ষকের নেই। বরং স্বল্প বেতন সংসারে যে অনটন জিইয়ে রাখে, ব্যক্তিগত কুশলতায় ছাত্রদের পাশ করাতে পারলে তা খানিকটা লাঘব করা সম্ভবপর। শিক্ষকের মূল্য ক্লাসে ছাত্রছাত্রীদের প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে পাঠ্যবিষয়ে কৌতূহল চরিতার্থ করায় নয়। কারণ তাদের কৌতূহল জ্ঞান আহরণে নয়, প্রতিযোগিতার বাজারে নামার জন্য পরীক্ষা পাশের সহায়ক 'নোট' সংগ্রহে। সামাজিক চাহিদা যত অসঙ্গতই হোক, তাকে রোধ করা শিক্ষকের সাধ্যাতীত। ব্যবস্থার নির্ধারক তিনি নন, সমাজের নিয়ামকও নন। সমাজই তাঁর নিয়ামক।

প্রেসিডেন্সি কলেজের কয়েকজন শিক্ষকের স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে তাঁদের গুণমুগ্ধ ছাত্র ও সহকর্মী যশস্বী অধ্যাপক সুবোধচন্দ্র সেনগুপ্ত বলেছেন '...not one of them may be said to have made any contribution to the making of history.'[২৮] শিক্ষক ইতিহাস সৃষ্টি করতে পারেন না। সেই সৃষ্টির দায় পেয়ে বসলে পরিণাম কী হয় তার উদাহরণ ডিরোজিও সাহেব, যাঁকে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, 'ভগীরথ', উত্তরকাল বলেছে কিংবদন্তি শিক্ষক। হিন্দু কলেজের অমন ডাকসাইটে শিক্ষাগুরুর বরাতে কী দুর্ভোগ জুটেছিল? কলেজের শিক্ষানুরাগী পরিচালকমণ্ডলী ১৮২৮ সালে মিথ্যে অপবাদ দিয়ে তাঁকে বরখাস্ত করে। এই বিতাড়নে নেতৃত্ব দেন বিদগ্ধ পণ্ডিত রামকমল সেন, যিনি আবার ওই কলেজে শিক্ষকপদে নিয়োগ করেন তাঁর নিজেরই পাচকঠাকুরকে। রাজনারায়ণ বসু লিখেছেন, 'আমাদিগের কলেজে (হিন্দু কলেজ) যিনি বাঙলা পণ্ডিত ছিলেন তিনি একসময়ে রামকমল সেনের পাচক ব্রাহ্মণ ছিলেন।'[২৯] রামকমল ছিলেন এশিয়াটিক সোসাইটির প্রথম ভারতীয় সম্পাদক ও হিন্দু কলেজের প্রতিষ্ঠাতাদের একজন। তাঁর মতো বিশিষ্টজনের মূল্যায়নে শিক্ষকের মর্যাদার যে পরিচয়, তার পরিপ্রেক্ষিতে অবশিষ্ট সমাজের দৃষ্টিভঙ্গি আলোচনার অপেক্ষা রাখে না। তাঁর নিযুক্ত শিক্ষকের দক্ষতার কথায় রাজনারায়ণ লিখেছেন, 'তাঁহার সঙ্গে আমরা রান্নার গল্প করিয়া সময় কাটাইতাম'। এই পাচক থেকে পণ্ডিত হয়ে ওঠা ব্যক্তিটির প্রসঙ্গ ব্যঙ্গ ও স্বভাবসিদ্ধ রসিকতায় মুড়ে দিয়েছেন হুতোমও, 'পণ্ডিত মহাশয় প্রথমে এক বড়মানুষের বাড়ি রাঁধুনি বামুন ছিলেন, এডুকেশন কৌন্সেলের সূক্ষ্ম বিবেচনায় সেনবাবুর সুপারিশে ও প্রিন্সিপালের কৃপায় পণ্ডিত হয়ে পড়েন।'[৩০] রাজনারায়ণের ক্লাসের ছেলেরা পাচক-পণ্ডিতের সঙ্গে রান্নার গল্প করত। হুতোমের সহপাঠীদের সঙ্গেও তাঁর সম্পর্ক তথৈবচ। হুতোমের নিজের জবানিতে, 'পণ্ডিত মহাশয় পান খেতে বড় ভালবাসতেন, সুতরাং সকলেই তাঁকে যথাসাধ্য পান দিয়ে তুষ্ট কত্তে ত্রুটি কত্তো না। পণ্ডিত মহাশয় মাঠে আসবামাত্র ছেলেরা পান দিতে আরম্ভ কল্লে। আমরাও একদোনা মিঠে খিলি উপহার দিলেম'। শিক্ষক-সুলভ নয়, ইয়ারদোস্তের প্রগলভতায় ছাত্রদের সঙ্গে তাঁর আড্ডা চলত। আর, তাঁর ক্লাস থেকে নিস্তার পাবার জন্য ছাত্ররা মুখিয়ে থাকত। হিন্দু কলেজের ছাত্র কালিপ্রসন্ন ওরফে হুতোমের অবশেষে স্বস্তি, 'আর এক কেলাস উঠলেম, রাঁধুনি বামুন পণ্ডিতের হাত এড়ানো গ্যালো।' হিন্দু কলেজের মতো প্রতিষ্ঠানের বিদগ্ধ পরিচালকদের দৃষ্টিতেই যদি পাচকঠাকুর ডিরোজিওর চেয়ে যোগ্যতর শিক্ষক গণ্য হন, তাহলে সাধারণ

মানসিকতায় শিক্ষকতার মান-মর্যাদার চেহারা সহজেই অনুমেয়। প্রতিষ্ঠান কর্তৃপক্ষের শিক্ষানুরাগের নমুনা হাতড়ে বেড়ানোর প্রয়োজন নেই। দীনেশচন্দ্র সেন কুমিল্লার শম্ভুনাথ ইন্সটিটুশনে পঞ্চাশ টাকা বেতনে প্রধান শিক্ষকের পদে যোগ দিয়ে যে অভিজ্ঞতা অর্জন করেন তা বিলক্ষণ স্মরণযোগ্য। ক্লাস চলাকালীন শিক্ষকদের ওপর নজরদারি করতে বেরিয়ে তিনি দেখেন, 'একজন একটি ছাত্রকে দাঁড় হইবার জন্য বারংবার বলিতেছিলেন, stood up, stood up, আর একজন ইতিহাস পড়াইবার সময় একটি ছত্র পাইলেন Babur founded the Mughal Empire, অমনই চিৎকার করিয়া টিপ্পনি করিতে লাগিলেন, find, found, found, এই তিনরকম পদ ব্যাকরণশুদ্ধ, কিন্তু এখানে লেখক founded লিখিয়াছেন, সাহেব কিনা, যাহা ইচ্ছা লিখিয়া পার পাইলেন, বাঙ্গালি হইলেই তাহার টিকিতে হাত পড়িত।'[৩১] এ হল দুটি ক্লাসের ভেতরকার দৃশ্য। আর ক্লাসরুমের বাইরের দৃশ্য সম্পর্কে দীনেশচন্দ্রের বিবরণ, 'দেখিলাম মাস্টাররা যখন ইচ্ছা আসেন, যখন ইচ্ছা যান, আমি কৈফিয়ৎ চাহিলে মুচকি হাসিয়া পাশ কাটাইয়া যান। কেহ একটায় আসেন, দুইটায় যান, কলেজের প্রফেসারদের মতো—গুণপনাও সেইরূপ।' অনুমোদনপ্রত্যাশী একটি স্কুলের পক্ষে এই বিলাসিতা বিস্ময়কর। ১৯৫৪ সালে মধ্যশিক্ষা পর্ষদের স্কুল ফাইনাল পরীক্ষায় স্বাস্থ্য বিজ্ঞান পত্রে একটি প্রশ্ন ছিল, 'State what illness may result from eating unboiled milk।'[৩২] প্রশ্নপত্র পরীক্ষার্থীদের হাতে পৌঁছনোর আগেই অবশ্য নজরে পড়ে যাওয়ায় মান রক্ষা হয়।

আগামী সংখ্যায় সমাপ্য

সূত্রনির্দেশ

১। জীবনানন্দ দাশ—শিক্ষার কথা, বিভাব জীবনানন্দ দাশ জন্মশতবর্ষ স্মরণ সংখ্যা, (সম্পাঃ ভূমেন্দ্র গুহ) ১৯৯৮, পৃ. ১৫৩
২। গৌতম ভদ্র—শিক্ষকচরিত, রবিবাসরীয় আনন্দবাজার পত্রিকা, ২৮ জুলাই, ১৯৯৬
৩। রাজনারায়ণ বসু—আত্মচরিত, ওরিয়েন্ট বুক কোম্পানি, কলকাতা, ১৯৬১, পৃ. ৯
৪। দীনেশচন্দ্র সেন—ঘরের কথা ও যুগ সাহিত্য, জিজ্ঞাসা, কলকাতা, ১৯৬৯, পৃ. ৩৫
৫। Jyoti Bhattacharya, The Teacher—Baulmon Prakashan, 1999. p. 81
৬। নৃপেন্দ্রকুমার বসু—আমাদের বিশ্বকবি, ১৩৪৯, পৃ. ২১
৭। সেকালের ছাত্র—(প্রদীপ পত্রিকা, পৌষ ১৩০৭) থির বিজুরি, আশ্বিন ১৪১০ সংখ্যায় সংকলিত, পৃ. ১৯
৮। তদেব
৯। মহাত্মা ডেভিড হেয়ার—(প্রদীপ, আষাঢ় ১৩০৭) থির বিজুরি, আশ্বিন ১৪১০ সংখ্যায় সংকলিত, পৃ. ৩০
১০। সেকালের পাঠশালা—রাসবিহারি সেন (থির বিজুরি, প্রাগুক্ত) পৃ. ১৭
১১। কালীপ্রসন্ন সিংহ (সম্পা), মহাভারত (১ম খণ্ড), বসুমতী সাহিত্য মন্দির, কলকাতা, পৃ. ২৪
১২। রাসবিহারি সেন—সেকালের পাঠশালা (থির বিজুরি, প্রাগুক্ত), পৃ. ১৫
১৩। তদেব, পৃ. ১৬
১৪। মনোমোহন বসু—গুরুমহাশয় (থির বিজুরি, প্রাগুক্ত), পৃ. ১৫৮
১৫। রাসবিহারি সেন—সেকালের পাঠশালা (থির বিজুরি, প্রাগুক্ত), পৃ. ১৭
১৬। তদেব
১৭। হুতোমপ্যাঁচার নকশা—(সম্পা), ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, সজনীকান্ত দাস, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, ১৩৯১ পৃ. ৪৯
১৮। যোগেন্দ্রকুমার চট্টোপাধ্যায়—স্কুলের স্মৃতি (থির বিজুরি, প্রাগুক্ত), পৃ. ১৭১
১৯। প্রবীণ শাস্ত্রীয় সংগীতশিল্পী অমিয়রঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় গত শতকের তিনের দশকে ওরিয়েন্টাল সেমিনারির ছাত্র ছিলেন। তাঁর এখনো অপ্রকাশিত আত্মজীবনী 'আমার সেই দিনগুলি'-র পাণ্ডুলিপিটি পড়ে দেখার সৌভাগ্য আমার হয়েছিল। সেখানে এই প্রসঙ্গটির উল্লেখ রয়েছে। তাঁর সঙ্গে কথোপকথন প্রসঙ্গেও তিনি এ বিষয়টির অবতারণা করেন।
২০। বৈদ্যনাথ ধর—মাস্টারমশাই বিভূতিভূষণ, ('এবং এই সময়' বিভূতি সংখ্যা, সম্পা, অরুণ বন্দ্যোপাধ্যায়), ১৯৯৪, পৃ. ৪৮২
২১। আত্মচরিত, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৫
২২। পুলক চন্দ—ব্রিটিশ ভারতে শিক্ষা ষড়যন্ত্র, লেখনী প্রকাশন, ২০০১, পৃ. ১২৬
২৩। রবীন্দ্রকুমার দাশগুপ্ত—সেকালের কথা, শারদীয় পরিচয় ১৪১১, পৃ. ৪
২৪। Annual Report of The Oriental Seminary 1921
২৫। ব্রিটিশ ভারতে শিক্ষা ষড়যন্ত্র, প্রাগুক্ত, পৃ. ১১৫-১৬
২৬। ব্রিটিশ ভারতে শিক্ষা ষড়যন্ত্র (রেভা. লালবিহারি দে-র রিকালেক্শনস অফ মাই চাইল্ডহুড থেকে উদ্ধৃত), পৃ. ১২০
২৭। আমাদের উচ্চশিক্ষা, (ভারতী পত্রিকা, ভাদ্র ১৩১১) থির বিজুরি, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৩
২৮। Subodh Chandra Sengupta—Portraits & Memoirs, Jijnasa, 1975, preface
২৯। আত্মচরিত, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩২
৩০। হুতোম প্যাঁচার নকশা, পৃ. ৫১
৩১। ঘরের কথা ও যুগসাহিত্য, পৃ. ১০৫
৩২। খায় না পান করে—আনন্দবাজার পত্রিকা (২৭ এপ্রিল, ১৯৫৪) ২৭ এপ্রিল, ২০০৪ পুনর্মুদ্রিত

বিজ্ঞানের জগতে অনায়াস বিচরণ

প্রসাদরঞ্জন রায়

চতুরঙ্গের সম্পাদকের অনুরোধে এই সমালোচনা। বইটি নেড়েচেড়ে অমলেন্দু দাশগুপ্তের পড়াশুনো আর চিন্তার ব্যাপ্তি দেখে মনে প্রশ্ন জেগেছিল এই বইয়ের সমালোচনা করার জন্য আমি যোগ্য ব্যক্তি কি না। পরবর্তীকালে ইন্টারনেট ঘাঁটতে গিয়ে দেখলাম টেলিগ্রাফ কাগজে বইটির সমালোচনা করেছিলেন ড. অশোক মিত্র। এতেই যে কোনও সমালোচকের হাত-পা ঠান্ডা হয়ে যাবার পক্ষে যথেষ্ট। তবে মনের মধ্যে যে সংশয়টা ছিল সেটা কেটে গেল, স্পষ্টই বুঝতে পারলাম যে এই বইটির প্রকৃত সমালোচনা করা প্রায় আমার সাধ্যাতীত। তবু সম্পাদকের অনুরোধে দু'চার কথা লিখতে হচ্ছে।

প্রথমেই নবীন পাঠকদের জন্য অমলেন্দু দাশগুপ্তের একটা পরিচয় দেবার চেষ্টা করা উচিত। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরাজির ডাকসাইটে ছাত্র ছিলেন তিনি। কিছুদিন কলেজে অধ্যাপনাও করেছিলেন। তারপর প্রশাসনিক কাজে যোগ না দিয়ে সাংবাদিক হিসাবেই নিজের জীবন গড়ে তোলেন। মাঝখানে কয়েক বছর ভিয়েনাতে International Atomic Energy Agency (IAEA) সংস্থাতে কাজ করেছিলেন। আবার ফিরে আসেন খবরের কাগজের জগতে। 'স্টেটসম্যান' পত্রিকায় যোগ দেন এবং শেষ পর্যন্ত ১৯৮৬ সালে সম্পাদক হিসাবে কর্মজীবন শেষ করেন। অবশ্য স্টেটসম্যান পত্রিকায় তাঁর লেখা আরম্ভ হয়েছিল ওই কাগজে যোগ দেবার আগেই এবং অবসরগ্রহণের পরেও তিনি নিয়মিত লিখে গেছেন। সাংবাদিক জীবনে তাঁর নাম দেশে ও বিদেশে যথেষ্ট পরিচিত ছিল। ইংরাজি সাহিত্যের ছাত্র এবং অধ্যাপক হিসাবে তাঁর ইংরাজি লেখার মুনসিয়ানা ও প্রসাদগুণ হয়ত আমাদের খুব একটা আশ্চর্য করে না, কিন্তু যা আশ্চর্য করে দেয় তা হল বিজ্ঞানের জগতে তাঁর অনায়াস বিচরণ। সম্ভবত ভারতবর্ষে তিনিই প্রথম কোনও খবরের কাগজের বিজ্ঞান সংবাদদাতা হিসাবে কাজ করেন এবং সেই সূত্রে তাঁর লেখা প্রবন্ধ থেকেই তাঁকে বেছে নিয়ে যায় IAEA।

এই প্রবন্ধ-সংকলনটিতে প্রায় ৫০ বছর ধরে লেখা ৩১টি প্রবন্ধ আছে। প্রবন্ধগুলির মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক নেই কিন্তু তাদের চার ভাগে ভাগ করা হয়েছে। প্রথম ভাগটির নাম Hastening the End—যাতে আলোচিত হয়েছে সাম্প্রতিক আন্তর্জাতিক রাজনৈতিক চিন্তার কিছু অংশ। দ্বিতীয় ভাগের নাম—Politics of the Bomb। এতে আলোচিত হয়েছে পরমাণু অস্ত্র নিয়ে সারা পৃথিবীর পরিস্থিতির কথা এবং অবশ্যই এর জন্য তিনি নির্ভর করেছেন IAEA-তে তাঁর অভিজ্ঞতার ওপর। তৃতীয় ভাগটি—Science and Beyond তাঁর বিজ্ঞানভিত্তিক চিন্তাধারার ফসল। আর শেষ ভাগটিতে আছে ভিন্ন স্বাদের কিছু লেখা, কোনওটির উপজীব্য নগর জীবন, কোনওটির ইংরাজিসাহিত্য আবার কোনওটি ভারতীয় সংস্কৃতির ওপর আলোচনা। স্বাভাবিকভাবেই এই ভাগের নাম A Miscellany। এখানে স্বল্প পরিসরে কেবল কয়েকটি প্রবন্ধ নিয়ে সংক্ষিপ্ত আলোচনার অবকাশ আছে।

প্রথম প্রবন্ধটি যথেষ্ট কৌতূহলোদ্দীপক। নাম Life after the End of History. অবশ্যই ফ্রান্সিস ফুকুয়ামার The End of History প্রবন্ধ অবলম্বনে লেখা। ১৯৮৯ সালে এই প্রবন্ধে ফুকুয়ামা আলোচনা করেছিলেন সোভিয়েত ইউনিয়নের পতনের পর দ্বিতীয় বিশ্ব এবং ঠান্ডা লড়াই শেষ হয়ে গেলে তার কী প্রভাব পড়বে পৃথিবীর ওপর। তিনি বলেছিলেন, 'What we may be witnessing is not just the end of the Cold War, or the passing of a particular period of post-war history, but the end of history as such : that is, the end point of mankind's ideological evolution and the universalisation of Western liberal democracy as the final form of human government'। অবশ্যই প্রবন্ধটি বহু চর্চিত হয়েছে। মার্কসীয় দৃষ্টিভঙ্গি থেকে এর বিরোধিতা করেছেন অনেকেই, স্বয়ং দেরিদা বেশ কড়া ভাষাতেই এর সমালোচনা করেছেন। কিন্তু ফুকুয়ামা রাশিবিজ্ঞান ব্যবহার করে দেখিয়েছেন যে গত ১০০ বছরে সারা পৃথিবীতে উদারপন্থী গণতন্ত্রের প্রসার ঘটেছে যথেষ্টই। এও বলতে চেয়েছেন যে উদারপন্থী গণতন্ত্রে বিশ্বব্যাপী যুদ্ধ এবং দেশের মধ্যে গৃহযুদ্ধ দুইই কমবে। এই প্রবন্ধে অবশ্য শ্রীদাশগুপ্ত আলোচনা করতে চেয়েছেন যে ভারতের ওপর এর কী প্রভাব পড়তে পারে। প্রবন্ধটি যখন শ্রীদাশগুপ্ত লেখেন তার বছর দু'য়েক বাদে ফুকুয়ামা তাঁর তত্ত্বটি আরও

বিস্তারিত করে 'The End of History and the Last Man' বইটি লেখেন। আজ এই প্রবন্ধটি লেখা হলে ফুকুয়ামার বই এবং হান্টিংটনের '*Clash of Civilisations*' বইটি অবলম্বনে নিশ্চয়ই আরও কিছু কথা বলার সুযোগ থাকত। সারা বিশ্বে সাম্প্রতিক উগ্রপন্থী কার্যকলাপ এবং ভারত-মার্কিন সম্পর্ক নিয়ে বামপন্থী সমালোচনা হয়ত এই নির্দেশই দেয় যে ফুকুয়ামার বিশ্লেষণ কিছুটা সরলপন্থী এবং শেষ পর্যন্ত ঠান্ডা লড়াইয়ের পরবর্তীকালের পৃথিবী কোন দিকে যায় তা নিয়ে কিছুটা সংশয় থেকেই যাবে।

প্রথম পর্বে আরও তিনটি প্রবন্ধে গর্বাচভের '*গ্লাসনস্ত*' ও '*পেরেস্ত্রইকা*' নিয়ে কিছু আলোচনা করা হয়েছে। ১৯৯১ সালে শ্রীদাশগুপ্ত স্পষ্ট করেই লিখেছিলেন, 'The Indian Left used to be chastised for blind subservience to Soviet policies; for well over a year, it is the Right which has insisted that we must follow Mr. Gorbachov's example regardless of the appalling problems thrown up by the Soviet and East European reforms'। কোনও অজ্ঞাত কারণে লেখক বরাবরই গর্বাচেভকে Gorbachov বলে উল্লেখ করে গেছেন, যদিও প্রায় সর্বত্রই আমি Gorbachev বানানটি পেয়েছি। অবশ্যই রাশিয়ান বানান বা উচ্চারণ নিয়ে আমার তেমন কোনও জ্ঞান নেই। একটি প্রবন্ধে বিশেষভাবে আলোচিত হয়েছে চীনের সাম্প্রতিক নীতিপরিবর্তন। বেশ কয়েকটি ক্ষেত্রে তিনি ভারতবর্ষের উদাহরণ এনেছেন এবং পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে ভারত কেমনভাবে চলবে তা নিয়ে এমন সব প্রশ্ন তুলেছেন যার উত্তর আজও আমাদের সঠিক জানা নেই। প্রথম পর্বের যে প্রবন্ধটি আমাকে বিশেষভাবে আকৃষ্ট করেছে তা হল Fuchs and the Soviet Bomb। ১৯৫০-এর দশকে *Brighter than a thousand Suns* বইটি থেকে আরম্ভ করে নারায়ণ সানাল্যের '*বিশ্বাসঘাতক*' বই পর্যন্ত বহু আলোচিত হয়েছে রবার্ট ওপেনহাইমারের বামপন্থী (কমিউনিস্ট) চিন্তাধারা এবং তথাকথিত বিশ্বাসঘাতকতার প্রমাণ। তুলনায় অনেকটা আড়ালে চলে গেছে ক্লাউস ফুখ্‌স-এর বিশ্বাসঘাতকতার কাহিনি। ফুখ্‌স (১৯১১-১৯৮৮) জন্মেছিলেন জার্মানিতে এবং জার্মান কমিউনিস্ট পার্টিতে যোগ দেন ১৯৩০-এর দশকে। নাৎসি আমলে তিনি আশ্রয় নেন প্রথমে ফ্রান্সে এবং পরে ইংল্যান্ডে। ইংল্যান্ডেই তিনি ডি এসসি ডিগ্রি লাভ করে সেখানেই পড়াচ্ছিলেন এবং দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ আরম্ভ হবার পর অন্যান্য জার্মানদের মতন তিনিও অন্তরীণ হয়েছিলেন। শেষ পর্যন্ত ম্যাকস বর্নের সুপারিশে তিনি মুক্তি পান, ব্রিটিশ নাগরিকত্ব পান এবং আমেকিার লস আলামস-এ অ্যাটম বোমার গোপন গবেষণায় অংশগ্রহণ করেন। কেউ কেউ ইঙ্গিত দিয়েছেন যে ওপেনহাইমার নয়, অ্যাটম বোমার গুপ্ত সংবাদ পাচার করার ব্যাপারে প্রধান হোতা ছিলেন ফুখ্‌স। কিন্তু তখন তাঁর বিরুদ্ধে কোনও ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি। পরবর্তীকালে যখন হাইড্রোজেন বোমার গবেষণার কাজ চলছিল তখন ১৯৪৭ থেকে ১৯৪৯ সালের মধ্যে ফুখ্‌স কোনও সোভিয়েত এজেন্টকে (আলেকজান্ডার ফেকলিসভ) এই তথ্য পাচার করেন এবং ইংল্যান্ডে ফিরে যাবার পর ১৯৫০ সালে তিনি দেশদ্রোহিতার দায়ে অভিযুক্ত হন। তিনি এ দায় স্বীকারও করেছিলেন, ইন্টারনেটে তাঁর সম্পূর্ণ স্বীকারোক্তি পাওয়া যায়। এর জন্য তাঁর ১৪ বছরের সাজা হয়েছিল, অবশ্য ১৯৫৯ সালে তিনি শেষ পর্যন্ত মুক্তি পান। এ নিয়ে কোনও সন্দেহ নেই যে ফুখ্‌স-এর পাচার করা এই তথ্যের ভিত্তিতেই সোভিয়েত হাইড্রোজেন বোমা তৈরির কাজটি অনেক সহজ হয়ে যায়। মুক্তি পেয়ে ফুখ্‌স চলে যান পূর্ব জার্মানিতে, সেখানেই নাগরিকত্ব নেন এবং রসেনডর্ফে পারমাণবিক গবেষণা কেন্দ্রে কাজ করেন আরও ২০ বছর। ১৯৮৮ সালে ড্রেসডেনে তাঁর মৃত্যু হয়। তাঁর মৃত্যুর পরেই ফুখ্‌স সম্বন্ধে প্রবন্ধটি লেখেন শ্রীদাশগুপ্ত এবং এই প্রবন্ধের মাধ্যমে চিত্রিত হয়েছেন এক প্রায়-বিস্মৃত 'ট্রাজিক হিরো' (অথবা বিশ্বাসঘাতক)। প্রবন্ধের শেষে শ্রীদাশগুপ্ত লিখেছিলেন, 'There is no defence of what Fuchs did, only a reminder of deception and guilt of other kinds and at other levels'। অত্যন্ত কম কথায় লেখক ফুখ্‌সের প্রতি তাঁর সমবেদনা জানিয়েছেন এই বাক্যাংশে।

বইটির দ্বিতীয় ভাগে শ্রীদাশগুপ্ত অবশ্যই তাঁর IAEA যুগের অভিজ্ঞতার ওপর নির্ভর করেছেন। এই অংশে বেশ কয়েকটি প্রবন্ধে তিনি দেখিয়েছেন কীভাবে সারা বিশ্ব মেতে উঠেছে পারমাণবিক প্রতিযোগিতায়। তিনি এই আলোচনায় সোভিয়েত রাশিয়া বা আমেরিকা কাউকেই ছেড়ে কথা বলেননি। বলেছেন Strategic Defence Initiative (SDI) এবং Mutually Assured Destruction (MAD) নিয়ে আমেরিকান চিন্তার কথা যা সারা পৃথিবীকে নিয়ে গেছে ধ্বংসের মুখে। বলেছেন পাকিস্তানি বোমার কথা এবং ভারতীয় উপমহাদেশে পরমাণু প্রতিযোগিতার কথা। পোখরান-প্রসঙ্গে সরাসরি বলেছেন যে ভারতীয় নীতি যাঁরা প্রণয়ন করেছেন (অর্থাৎ ইন্দিরা গান্ধী থেকে নরসিংহ রাও পর্যন্ত) তাঁরা সমস্যাটা পুরো না বুঝেই তাঁদের সিদ্ধান্ত দিয়েছেন। বিস্তারিতভাবে আলোচিত হয়েছে Complete Test Ban Treaty (CTBT), Non-Proliferation Treaty (NPT), Strategic Arms Limitation Treaty (SALT) এবং

Strategic Arms Reduction Treaty (SART) আর সেই প্রসঙ্গে ভারতীয় নীতি। স্পষ্টতই ভারত-পাকিস্তান সম্পর্কের সঙ্গে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে ভারতীয় নীতির সাযুজ্য সবসময় ছিল না। এই প্রসঙ্গে এক জায়গায় তিনি বলেছেন, 'Besides, Delhi cannot deny Pakistan's right to make the bomb without undermining its own stand against the NPT. The entire Indian case against the non-proliferation doctrine has been based on the argument that it entails unacceptable discrimination. Should India try to limit Pakistan's freedom of choice by use of force, it would have no grounds for complaint in the event of similar intervention in its own nuclear programme'। অবশ্যই সোভিয়েত ইউনিয়নের পতনের পর পরিস্থিতিটা অনেক পালটে গেছে, তবু এই অংশের প্রত্যেকটি প্রবন্ধই আজও যথেষ্ট সময়োচিত।

তৃতীয় অংশে লেখক আলোচনা করেছেন সাধারণভাবে বিজ্ঞান নিয়ে এবং বিজ্ঞান ছাড়িয়ে ঈশ্বরের ধারণা নিয়ে। প্রথম প্রবন্ধটি আইনস্টাইন শতবর্ষ উপলক্ষে লেখা, ১৯৭৯ সালে আইনস্টাইনের জন্মশতবর্ষে এটি তাঁর প্রতি শ্রদ্ধার্ঘ্য। গত বছর আইনস্টাইনের আপেক্ষিকতাবাদের শতবর্ষ উপলক্ষে সারা দুনিয়া জুড়ে তাঁকে নিয়ে হই চই হয়েছে, লেখা হয়েছে বহু প্রবন্ধ এবং কয়েকটি বই, কিন্তু এই লেখাটির ২৭ বছর পরেও শ্রীদাশগুপ্তের অনবদ্য ভাষায় আইনস্টাইনের ভূমিকার আলোচনা অত্যন্ত যুগোপযোগী। বাকি কয়েকটি প্রবন্ধে বিজ্ঞান ও ঈশ্বরের সম্পর্ক নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। লেখক বলেছেন যে নিউটনীয় গতিবিদ্যার মডেলের ওপর ভিত্তি করে সারা মহাবিশ্ব কীভাবে চলছে তা বুঝিয়ে বলার দায়িত্ব নিয়েছিলেন অনেক বিজ্ঞানী, তাঁদের কারুর মতে মহাবিশ্বের তত্ত্বে ঈশ্বরের কোনও ভূমিকা থাকতে পারে না। অথচ স্বয়ং নিউটন বলেছিলেন তাঁর বিখ্যাত সূত্রগুলি 'laws impressed upon nature by God'। বিংশ শতাব্দীর পটভূমিকায় অবশ্যই এসেছে আইনস্টাইনের কথা, যাঁর গভীর ঈশ্বরে বিশ্বাস আজ প্রবাদপ্রতিম। আইনস্টাইন বলেছিলেন, 'I believe in Spinoza's God, who reveals himself in the orderly harmony of all that exists, not in the God who concenrs himself with the fates and actions of human beings'। এই আইনস্টাইনই কোয়ান্টাম তত্ত্ব প্রসঙ্গে আলোচনায় নিলস বোহরকে বলেছিলেন, 'God does not play dice'। কোয়ান্টাম তত্ত্বের অনিশ্চয়তাবাদ (indeterminism) তাঁর পক্ষে মেনে নেওয়া শক্ত ছিল। অথচ হাইসেনবার্গের অনিশ্চয়তাবাদ তত্ত্বের বিষয়ে এডিংটন বলেছিলেন, 'Religion first became possible for a reasonable scientific man about the year 1927'। ওই ১৯২৭ সালেই হাইসেনবার্গের তত্ত্ব প্রচারিত হয়েছিল। এ প্রসঙ্গে লেখক হাইসেনবার্গ, ডিরাক, ম্যাকস প্ল্যাঙ্ক, লুই দ্য ব্রয়ি প্রমুখ অনেকেরই ধারণা নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন প্রাঞ্জল ভাষায়। অবশ্যই হাইসেনবার্গের বিখ্যাত বই '*Physics and Philosophy*' তাঁর আলোচনার পরিধি থেকে বাদ যায়নি। সবশেষে তিনি আলোচনা করেছেন হকিংয়ের ঈশ্বরচিন্তা বা তার প্রভাব নিয়ে। স্টিফেন হকিং অবশ্য বলেছিলেন ঠিক এর উলটো কথা : 'In effect, God was confined to the areas that nineteenth-century science did not understand'। অর্থাৎ হকিং-এর মতে বিশ শতকের বিজ্ঞানের ভিত্তিতে ঈশ্বরের ধারণার আর কোনও প্রয়োজন নেই। বার বার পড়েও আমার মনে হয়েছে এই খণ্ডের প্রবন্ধগুলি যখন লেখা হয়েছিল তখন যেমন আকর্ষণীয় ছিল, আজও তাই রয়ে গেছে।

শেষ খণ্ডের প্রবন্ধগুলি কিছুটা ভিন্ন স্বাদের। আমাকে বিশেষভাবে মুগ্ধ করেছে Two Cities নামে তাঁর যে প্রবন্ধটি এই বইয়ের সবচেয়ে পুরনো, অর্থাৎ ১৯৪৮ সালে লেখা। এই প্রবন্ধে তিনি পঞ্চাশ বছর আগেকার কলকাতার সঙ্গে দিল্লির তুলনা করেছেন এবং যদিও পঞ্চাশ বছরে অনেক পরিবর্তন হয়ে গেছে তবু দুই শহরের চরিত্রের মধ্যে পার্থক্য রয়েই গেছে। কলকাতা সম্বন্ধে তাঁর বক্তব্য, 'Calcutta tempts you with all its wiles until you are completely seduced. The charms are many and diverse. Can one forget the old Bengal pathos and filth of Baghbazar behind the facade of a senile culture, the new world snobbery of Rashbehari Avenue, the decadent fascination of old Ballygunge, the squalid Rajabazar and Colootollah, the book shops on College Street, and the care-worn girls in the university corridors?'। এ কলকাতা অবশ্যই আর নেই কিন্তু সেই দিল্লিও কি আছে? দিল্লির প্রসঙ্গে তিনি লিখেছিলেন, "New Delhi may take a fairly long time to change, but one can meanwhile be happy with the imperial glory of Old Delhi where the Jumma Masjid glimmers in the morning light and the Red Fort casts a majestic spell in the twilight glow, and where you can hear the dead voices of emperors and courtesans in the non-stop chorus of Chandni Chowk. ... So long as this charm of Old Delhi remains and so long as the lonely and undulating roads of Civil Lines are not swamped by refugees, I would not think of returning to Calcutta. ... Life

in New Delhi is peaceful, nothing disturbs you except cases of supersession. ... you can even afford to be a little poetical at the sight of the dried-up stream of the Jumna and dream Shahjahan's tragic dreams'। দিল্লি সম্পর্কে তাঁর তখনকার ধারণার সঙ্গে *দৃষ্টিপাত*-এ 'যাযাবর'-এর ধারণার সাযুজ্য বেশ স্পষ্ট কিন্তু ভাবতে ইচ্ছা করে আজকের দিল্লি দেখলে লেখক কী বলতেন? অন্য প্রবন্ধটি টি এস এলিয়টের মৃত্যুর পরে (১৯৮৮) তাঁকে নিয়ে লিখেছিলেন—Mr. Eliot and us। এই এলিয়টকে নিয়ে ১৯৪৮ সালে তিনি স্টেটসম্যানে আর একটি প্রবন্ধ লিখেছিলেন। তিনি লিখেছেন, 'By the 1960's Eliot may have ceased to be a fashionable cult, but he was an important part of our cultural awareness. Apparently, he still is.'। আবার অন্যত্র এলিয়টের জনপ্রিয়তার সন্ধান করেছেন, যদিও তাঁকে obscure বলতেও তাঁর দ্বিধা হয়নি। সেই কলেজের প্রথম যুগে যখন 'The Waste Land' পড়েছি, একটা অদ্ভুত আনন্দ পেয়েছি পড়ে কিন্তু একটা আলো-আঁধারি ধোঁয়াশার ভাব থেকেই গিয়েছিল। সত্যিই কি এর মানে ঠিকভাবে বুঝেছি? একেই বোধহয় লেখক obscure বলেছেন। তবে একথা ঠিক যে আশি বছরের পুরনো হলেও এ বই পুরনো হবে না। এই প্রসঙ্গে শুধু বলি যে এলিয়টের ওপরে লেখা বেশ বড় আকারের প্রবন্ধেও আমার প্রিয় লেখাটি নিয়ে কোনও আলোচনা নেই। যদি 'Murder in the Cathedral' আলোচিত হত তবে আরও আনন্দ পেতাম সন্দেহ নেই।

সবশেষে অশোক মিত্র এই বইটিকে বলেছিলেন a civilisable volume এবং এও বলেছেন যে আজকের পাঠকদের কতজন এসব বই পড়ে সভ্য হতে চায় তা তাঁর জানা নেই। আমার শুধু এটুকুই যোগ করা দরকার যে যাঁরা পুরনো আমলের লিবারাল চিন্তাধারায় বিশ্বাসী তাঁরা এ বইটি পড়ে নিশ্চয়ই আনন্দ পাবেন, যদিও সবকটি প্রবন্ধ খুব সহজবোধ্য নয়।

থিমস অ্যান্ড ভ্যারিয়েশনস—অমলেন্দু দাশগুপ্ত/ প্যাপিরাস, কলকাতা-৪/২৫০.০০

প্রসঙ্গ আনিসুজ্জামান

নিখিলেশ্বর সেনগুপ্ত

বাংলা সাহিত্য-সংস্কৃতিচর্চার ক্ষেত্রে অধ্যাপক আনিসুজ্জামান একটি বিশিষ্ট নাম। পুরো নাম আবু তৈয়ব মোহাম্মদ আনিসুজ্জামান। জন্ম ১৯৩৭। আদি নিবাস উত্তর চব্বিশ পরগণার বসিরহাট। ১৯৪৭-এ খুলনায় চলে যান। বাঙালি বুদ্ধিজীবী হিসাবে তাঁর পরিচিতি শুধুমাত্র বাংলাদেশে সীমাবদ্ধ থাকেনি। দেশে-দেশান্তরে ছড়িয়ে পড়েছে তাঁর বিপুল কর্মধারার ফল। পরিচিতি বেড়েছে উত্তরোত্তর। তাঁর সম্পর্কে বাংলাদেশ থেকে প্রকাশিত হয়েছে *আনিসুজ্জামান : সংবর্ধনা স্মারক*। শ্রদ্ধাজ্ঞাপক গ্রন্থ। আটত্রিশ জন লেখক এই বইতে 'প্রীতি', 'স্মৃতি' ও 'কৃতি' এই তিন পর্যায়ে তাঁকে সম্মান জানিয়েছেন। এঁরা তাঁর দেশ-বিদেশের গুণমুগ্ধ সুহৃদ ও ছাত্র-ছাত্রী। বইটির সম্পাদকের নিবেদনে আছে, '২৩ জুন ২০০৫ চট্টগ্রামে অধ্যাপক আনিসুজ্জামানকে সংবর্ধনা জ্ঞাপনের জন্য একটি অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে।' এইটি সংবর্ধনা অনুষ্ঠানেরই গ্রন্থরূপ। তবে 'অধ্যাপক সালাহউদ্দীন আহমেদের লেখাটি পুনর্মুদ্রিত; অন্য সব লেখাই এই সংকলনের জন্য রচিত।'

'প্রীতি' পর্যায়ে বাংলাদেশের তিনজন কবির তিনটি কবিতা রয়েছে। শামসুর রাহমান 'গুণী বন্ধু আনিসুজ্জামানের উদ্দেশে' বলেন, 'আত্মভোলা নন তিনি, নন অচেতন সমাজের কল্যাণ কি অকল্যাণ বিষয়ে কখনো যতদূর/জানি দৃষ্টি তার সদা মানবের প্রগতির দিকে/প্রসারিত। কী প্রবীণ, কী নবীন সকলের বরেণ্য নিয়ত।' এমন একটি মানুষের 'খ্যাতির শিখরে পদার্পণ/ কোরেও সাধনা তার থামেনি।' সৈয়দ শামসুল হক যথার্থই বলেন যে, আনিসুজ্জামানের মধ্যে বিদ্যা ও মূল্যবোধ এই দুটি অভিন্ন সত্য মিলে-মিশে একাকার হয়ে গেছে। তাই 'প্রতিদিনের চিত্রলেখা দিনের শেষে মুছে' গেলেও কালের চলমান হাত সবটা মুছতে পারে না—এই 'আমোচ্য যে নামগুলো তার একটি আনিসুজ্জামান।'

'স্মৃতি' পর্যায়ের লেখাগুলির মধ্যে দু'টি ইংরাজি লেখা ১. ফ্রাঁস ভট্টাচার্যের 'কনগ্র্যাচুলেশনস' এবং ২. ক্লিন্টন বি. সিলির 'এ ট্রুলি গুড ম্যান অ্যান্ড স্কলার এক্সট্রাঅর্ডিনারি।' শিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক এবং জীবনানন্দ-জীবনীকার সিলি তাঁর নাতিদীর্ঘ আন্তরিক রচনায়

আনিসুজ্জামানের পাণ্ডিত্যের পরিচয় দিয়েছেন। শুধু পাণ্ডিত্যের নয়, তাঁর হৃদয়বত্তা, মানুষের প্রতি ভালবাসা ও সহৃদয়তার কথা লিখেছেন শিক্ষা ও সংস্কৃতি জগতের বিখ্যাত মানুষেরা—তাঁদেরই মধ্যে কেউ তাঁর ছাত্র, কেউ বা তাঁর শুভানুধ্যায়ী বন্ধু, বা বয়োজ্যেষ্ঠ কেউ। শিক্ষক হিসাবে তিনি যে কতটা সম্মানিত ছিলেন তা আবুল মাল আবদুল মুহিতের রচনায় প্রতিফলিত। তিনি লিখছেন, 'একদিন আনিসের সঙ্গে কলাভবনের অভ্যন্তরে ঘুরছি। শুনেছি ছাত্রেরা শিক্ষকদের তোয়াক্কা করে না। খুব বেয়াড়া তাদের ব্যবহার। গুরুজন বা বয়োজ্যেষ্ঠরা তেমন সম্মান আশা করতে পারেন না। আনিসের সঙ্গে সেদিনের চক্কর কিন্তু আমার ধারণা একেবারে পাল্টে দিল। প্রকৃত শিক্ষক এখনও ছাত্রদের আকর্ষণ করেন। ছাত্রেরা এবং জুনিয়র শিক্ষকরা তাঁদের সম্মান করেন।' মোজাফ্ফর আহমদ আনিসুজ্জামানকে নিয়ে কিছু কথা বলতে গিয়ে রাজ-অর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপট সঙ্গত কারণেই তুলে ধরেছেন। তাঁর ভাষায়, 'আমাদের প্রজন্ম সম্মুখীন হয়েছিল পাকিস্তান রাষ্ট্রের নানা মৌলিক সাংবিধানিক প্রশ্নের—যা নিয়ে রাজনৈতিক, সামাজিক অঙ্গন নানাভাবে চঞ্চল হয়ে উঠেছিল। এ সমস্ত চঞ্চলতার কেন্দ্র ছিল ঢাকাতেই। আনিস অত্যন্ত সচেতনভাবেই এই অধিকার-চেতনার সঙ্গে যুক্ত হয়েছিলেন এবং পরেও যুক্ত থেকেছেন।' কিন্তু আনিসুজ্জামান কখনওই রাজনৈতিক নেতৃত্বের আসনে নিজেকে সংস্থাপিত করেননি। তিনি শিক্ষাজীবনকেই গভীরভাবে গ্রহণ করেছেন। সেই ১৯৫৪ সালে অনুষ্ঠিত পাকিস্তান সাহিত্য-সম্মেলনে ড. আবদুল গফুর সিদ্দিকীর লেখা 'সভাপতির অভিভাষণ পাঠ করল আনিস। সতেরো বছরের কিশোর কিন্তু ব্যবহারে আচরণে অত্যন্ত উপযুক্ত একজন গুণীজন যেন।' সেখানে ড. শহিদুল্লাহও উপস্থিত ছিলেন, যিনি পরবর্তীকালে আনিসের শিক্ষাজীবনকে প্রভাবিত করেছিলেন। প্রভাবিত করেছিলেন মুনীর চৌধুরী, আবদুর রাজ্জাক প্রমুখ শিক্ষাবিদগণ। অনেকেরই ধারণা, আনিসুজ্জামানের কাজের ধারা শুধুমাত্র ভাষা ও সাহিত্যের আলোচনায় সীমাবদ্ধ, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তা ঠিক নয়, তাঁর কাজে সমাজ, রাজনীতি, ধর্ম, নৃতত্ত্ব এ সমস্তই নানা বিচারে যুক্ত হয়েছে। তিনি নিজে যেমন বিভিন্ন দিক নিয়ে গবেষণা করেছেন, তেমনই গবেষণা করিয়েছেনও। তাঁর নানা বিষয়ের গবেষণার মূল ভিত্তি যে সমাজ তা বিশেষভাবে লক্ষিত হয়। সরদার ফজলুল করিম যথার্থই বলেছেন, জীবনযাপনে ও বিদ্যাচর্চায় তিনি একটি 'অনবদ্য অননুকরণীয় আনিসীয় স্টাইল' গড়ে তুলেছেন। তাঁর ছাত্র বা ছাত্রপ্রতিমদের সঙ্গে প্রতিনিয়ত মিথস্ক্রিয়ার ফলে বিদ্যার জগতে উভয় পক্ষেরই লাভ হয়েছে সন্দেহ নেই। তাঁর ছাত্র সহকর্মীদের মধ্যে হায়াৎ মামুদ, গোলাম মুরশিদ, সিকান্দার খান, মামুদ আল জামান, মালেকা বেগম, সেলিনা হোসেন, মাহবুবুল হক প্রমুখ আনিসুজ্জামান সম্পর্কে যে তন্নিষ্ঠ স্মৃতিচারণ করেছেন তাতে তাঁর মনুষ্যত্ব ও পাণ্ডিত্যের পরিচয় গভীরভাবে ফুটে উঠেছে।

উনিশ জন লেখক আনিসুজ্জামানের ভাষা-সাহিত্য বিষয়ক কাজকর্মের বিশ্লেষণ করেছেন। সালাহউদ্দীন আহমদ লিখেছেন, 'মুক্তবুদ্ধির অধিকারী, মানবতাবাদী মূল্যবোধের ধারক গণতান্ত্রিক সমাজবাদে বিশ্বাসী পণ্ডিত আনিসুজ্জামান বাংলাদেশের গৌরব। বাংলা সাহিত্য ও বাংলার সামাজিক ইতিহাসের উপর মৌলিক গবেষণা করে তিনি তরুণ বয়সেই প্রভূত খ্যাতি অর্জন করেছেন।' সারা জীবনের কাজের মধ্যে দিয়ে তাঁর খ্যাতি ক্রমাগত বৃদ্ধিই পেয়েছে। কিন্তু শুধুই বইয়ে মুখ গুঁজে সারস্বত সাধনায় নিজেকে মগ্ন রেখেছেন এমন বলা যাবে না। জিল্লুর রহমান সিদ্দিকীর ভাষায়, 'তিনি বলা যায়, দু' হাতে দু'দিক সামলেছেন। অধ্যয়ন-অধ্যাপনা-গবেষণায় নিষ্ঠ থেকেছেন, আবার রাষ্ট্রীয় প্রতিকূলতার বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে যাঁরা দেশের সংস্কৃতিকে সরল ও সৃষ্টিশীল রাখার কঠিন ব্রত পালন করেছেন, তাঁদের পুরোভাগে থেকেছেন।' কিন্তু কোনও সরকারি পদের প্রলোভনে তিনি আদর্শচ্যুত হননি, যেমন 'একাত্তরে প্রবাসী সরকারের সঙ্গে যাঁরা যুক্ত ছিলেন, যুদ্ধ শেষে দেশে ফিরে এসে তাঁরা অনেকেই পুরস্কৃত হয়েছিলেন বা হতে চেয়েছিলেন। আনিসুজ্জামান সে দলে পড়েন না।' তিনি তাঁর সুকৃতির জন্য সকলের শ্রদ্ধাভাজন হয়ে থাকবেন।

আনিসুজ্জামানের গবেষণাকর্ম ও বিভিন্ন বিষয় নিয়ে লেখালেখির যে একটা বিশেষ জগৎ তৈরি হয়েছে তা খোন্দকার সিরাজুল হক, আহমদ কবির, ভুঁইয়া ইকবাল, শান্তনু কায়সার, গোলাম মুস্তাফা, মহীবুল আজিজ প্রমুখ আলোচকদের নিপুণ বিশ্লেষণাত্মক রচনায় ফুটে উঠেছে। তাঁর 'মুসলিম-মানস ও বাংলা সাহিত্য' বাঙালির চিন্তনের জগতে আলোড়ন সৃষ্টি করেছে। এই গবেষণাগ্রন্থ পরবর্তীকালের ভাষা ও সাহিত্য গবেষকদের পথপ্রদর্শন করেছে। সেদিক থেকে তিনি পথিকৃৎ। তাঁর অন্যান্য গবেষণাও গবেষকদের নতুন আলো দেখিয়েছে। বর্তমান বইটিতে আনিসুজ্জামানের একটি গ্রন্থপঞ্জি সংকলিত হয়েছে, তাতে দেখি, তাঁর নিজের লেখা বইয়ের সংখ্যা ২৪ এবং সম্পাদিত (একক ও অন্যান্যদের সঙ্গে) বইয়ের সংখ্যা ৩৭। তবে এই বইগুলি ছাড়াও বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় যে তাঁর অসংখ্য লেখা ছড়িয়ে আছে তারও একটা পঞ্জি তৈরি হওয়া প্রয়োজন। বইটিতে আছে আনিসুজ্জামানের জীবনপঞ্জি ও ৪১টি আলোকচিত্র।

এই সুমুদ্রিত শ্রদ্ধাজ্ঞাপক স্মারক গ্রন্থটি প্রকাশের জন্য সম্পাদক ও প্রকাশককে ধন্যবাদ।

□ **আনিসুজ্জামান সংবর্ধনা স্মারক—সম্পাদক, ভুঁইয়া ইকবাল/ মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা/২৫০.০০**

থিয়েটারের চেখভ

মেঘ মুখোপাধ্যায়

মাত্র পাঁচটি পূর্ণাঙ্গ নাটক আর গোটা কয়েক একাঙ্ক লিখে নাট্যকার হিসাবে জগদ্বিখ্যাত আন্তন পাভলোভিচ চেখভ। কয়েকজন মহৎ শিল্পস্রষ্টা বা বিজ্ঞানীর জীবন আর কর্ম নিয়ে আমাদের নিরন্তরচর্চা প্রয়োজন। চেখভ সেই গোত্রের একজন। বিশ্বসাহিত্যে চেখভের স্থান অসামান্য ছোটগল্পকার রূপে। ছোটগল্পে তিনি অপ্রতিদ্বন্দ্বী। পাঠকের কাছে তাঁর এই পরিচয়টাই বড়। ছোটগল্পের শিল্পকে তিনি তাঁর কলমে এক বিরল উচ্চতায় স্থাপন করেছেন। তাঁর অনেক গল্প অসামান্য কবিতা বা অপূর্ব সংগীতের মতো। একবার পড়ে ফেলার পর বহুকাল মনের গহনে অনুরণিত হতে থাকে। একজন পাঠক সারা জীবনভর তাঁর গল্পগুলি ঘুরিয়ে ফিরিয়ে বারবার পড়তে পারেন। সাধারণ মানুষের রোজকার চিরচেনা জীবনকেই তিনি এমনভাবে দেখিয়েছেন যে তার মধ্যে থেকে এতাবৎ অনাবিষ্কৃত অনেক দিক আমাদের সামনে উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছে। তাঁর গল্পের মুগ্ধ পাঠক ছিলেন তলস্তোয়। চেখভের 'ডার্লিং' গল্পটি পড়ে তলস্তোয় এমন অভিভূত হয়ে গিয়েছিলেন যে তাঁর আলোড়িত মনের বহিঃপ্রকাশ ঘটেছিল স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে লেখা ওই গল্পটির একটি সমালোচনায়। বিস্ময়ের কথা যে তলস্তোয়ের আলোচনাটি হয়েছিল গল্পটির চেয়ে আয়তনে বড়। পৃথিবীর আর কোনও লেখকের জীবনে প্রশংসালাভের এমন বিরল সৌভাগ্য হয়নি। অথচ আশ্চর্যের, চেখভের নাটক লেখা তিনি একদম সমর্থন করতেন না। ছোটগল্পের খ্যাতির শিখরে আরোহণকারী সেই চেখভ যখন তাঁর স্বল্পায়ু জীবনের শেষ ন'বছরে চারটি নাটক লিখলেন আর সেগুলি সদ্যপ্রতিষ্ঠিত মস্কো আর্ট থিয়েটারে মঞ্চস্থ হল—যুগান্তকারী নাট্যপরিচালক—অভিনেতা স্তানিশ্লাভস্কির নির্দেশনায়—তারপর থেকে, চেখভের নাম বাদ দিয়ে আর বিশ্বের থিয়েটারকে ভাবা যায় না। নাটক, নাট্যকলা, অভিনয়, রঙ্গমঞ্চ তথা থিয়েটারের পরম অর্জনের সঙ্গে যুক্ত হয়ে গিয়েছে এই কটিমাত্র নাটক লেখার সুবাদে চেখভের নাম। আজ বিশ্বে বোধহয় এমন কোনও দেশ বা জাতি নেই যাদের রঙ্গমঞ্চে চেখভের নাটক অভিনীত হয়নি। যথার্থ বলতে গেলে, চুয়াল্লিশ বছর আয়ুষ্কালে মাত্র চারটি পূর্ণাঙ্গ নাটক লেখার দৌলতেই তিনি শেক্সপিয়র, ইবসেন, ব্রেশটের তুল্য গুরুত্ব অর্জন করেছেন। নাট্যকলার ওপর তাঁর প্রভাব পড়েছে অসীম।

বাংলার নাট্যচর্চা চেখভকে আপন করে নিয়েছে। বাঙালির থিয়েটারের ঐতিহ্যের সঙ্গে চেখভ যুক্ত হয়েছেন। ১৯৬৪-তে পবিত্র সরকারের রূপান্তরে আর অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্দেশনায়-অভিনয়ে বঙ্গীয় বাতাবরণে 'চেরি অর্চার্ডে'র নাট্যরূপ 'মঞ্জরী আমের মঞ্জরী' বাংলা রঙ্গমঞ্চের এক অবিস্মরণীয় প্রযোজনা। চেখভের হাত ধরে নান্দীকারের এই অভিনয় নাট্যকলার নানা দিকে পরীক্ষানিরীক্ষার গুণে নতুন অনুভূতি সঞ্চার করেছিল। চেখভ-নাটকের স্বাদ-সুঘ্রাণ ছড়িয়ে পড়েছিল বাঙালির জীবনে। নান্দীকার এ-নাটক অভিনয় করে আলোড়ন সৃষ্টির পর এতকাল বাদে মনে প্রশ্ন জাগে, অজিতেশের আগে আর কেউ চেখভকে বঙ্গরঙ্গমঞ্চে আনার কথা কি ভাবেননি? শম্ভু মিত্র বা উৎপল দত্ত? শিশিরকুমারের কি মনে হয়নি? তিনি তো আধুনিক বিশ্বসাহিত্যের/নাট্যসাহিত্যের মগ্ন পাঠক ছিলেন।

নান্দীকারের পর আরও কয়েকটি নাট্যদল সাড়া জাগানো চেখভ প্রযোজনা করেছেন। যেমন অসিত মুখোপাধ্যায়ের নির্দেশনায় গান্ধারের ভস্মা (আঙ্কল ভানিয়া), রমাপ্রসাদ বণিকের নির্দেশনায় পাখি (দ্য সীগাল) আর কৌশিক সেনের নির্দেশনায় স্বপ্নসন্ধানীর 'তারা তিন বোন'। অজিতেশের অভিনয়ে চেখভের বিখ্যাত একাঙ্ক নাটকগুলি তো আজ বাঙালির ঘরের জিনিস। এইসব নাট্যাভিনয়ের মধ্য দিয়ে চেখভের প্রতি বাঙালির যে-টান তৈরি হল তারই প্রসারণ দেখতে পেলাম সত্য ভাদুড়ির সম্পাদনায় 'আন্তন চেখভ : বিষয় নাটক' সংকলনটিতে। চেখভের নাটকের প্রতি ভালবাসার কিংবা নাট্যকার চেখভের দিকে বাঙালির ক্রমবর্ধমান আগ্রহের এক নিদর্শন এই বইটি। ইংরেজি অনুবাদের দৌলতে চেখভের বিষয়ে আমাদের মধ্যে অনেকের জানাচেনা-পড়াশুনো কম নয় ঠিকই কিন্তু চেখভের নাটক আর থিয়েটারের সঙ্গে তাঁর সংযোগ নিয়ে বাংলাভাষায় পুরো একটা সংকলনগ্রন্থ সম্পাদনা করে প্রকাশ করার মধ্যে বাংলাভাষার থিয়েটার আর সাধারণ বাঙালি পাঠকের প্রতি একটা দরদের প্রকাশ দেখতে পাই। বাংলাভাষার প্রতি একটি দায়িত্ববোধও। এখন তো বইটা হাতে নিয়ে আর পৃষ্ঠার পর পৃষ্ঠা পড়তে গিয়ে অবাক হয়ে নিজেকেই প্রশ্ন করছি, আরে, বাংলাভাষায় তবে এতদিন পর্যন্ত চেখভের নাটক নিয়ে

কোনও সংকলন/আলোচনা-গ্রন্থ ছিল না? কী আশ্চর্য! তবে এতকাল আমাদের চলছিল কিসে? ইংরেজি পড়ে? যাঁরা তেমন ইংরেজি পড়তে দড় নন, ইংরেজি বইপত্র জোগাড়যন্ত্র করা যাঁদের পক্ষে সহজ ছিল না, অথচ যে অসংখ্য নাট্যকর্মী বা বাংলা থিয়েটারের সাধারণ দর্শক চেখভের নাটক নিয়ে জানতে চান—তাঁদের হাতের নাগালে বাংলা প্রকাশনা কোনও বই দিতে পারেনি?

এতদিনে (প্রকাশ বৈশাখ ১৪১২), তবে আমাদের হাতে এল এমন একটি প্রয়োজনীয় বই। এরকম একটি সংকলন পাওয়ার জন্য আমরা অপেক্ষা করছিলাম। কী আছে এতে? একটি সুলিখিত ভূমিকাসহ পাঁচটি বিভাগ। পরিচয়, ছোট নাটক, পূর্ণাঙ্গ নাটক, চিঠিপত্র আর পরিচিতি। নাট্যকার আর মস্কো আর্ট থিয়েটারের নাট্যোদ্যোগের সঙ্গে জড়িয়ে যাওয়া চেখভের অপূর্ব আলেখ্য পাওয়া স্তানিশ্লাভস্কি আর ওলগা নিপারের খুঁটিনাটিসমৃদ্ধ বিশদ স্মৃতিচরণ দুটি থেকে। লেখক-শিল্পী হিসাবে তাঁর মহত্ত্বকে চিহ্নিত করার চেষ্টা করতে গিয়ে চেখভের এই দুই অতি আপনজন আসলে লিখে গিয়েছেন এক রুগ্ন সরল সাদাসিধে মহৎ মানুষের কথা। মানুষ হিসাবে তাঁর গভীরতার সূক্ষ্মতার সন্ধান পাই আমরা। নাট্যকলা অভিনয় রঙ্গমঞ্চ অভিনেতা-অভিনেত্রী আর নাট্যকর্মীদের প্রতি তাঁর তীব্র আকর্ষণ আর ভালবাসার স্পন্দন এই লেখা দুটি থেকে বিকীর্ণ হতে থাকে। কী জীবন্ত স্তানিশ্লাভস্কি আর ওলগা নিপারের প্রকাশভঙ্গি! কত তুচ্ছ কথা তাঁরা উল্লেখ করেছেন—চেখভ সম্বন্ধে কোনও প্রসঙ্গকেই তাঁরা খাটো চেখে দেখেননি; না-বললেও চলে, এমন কিছু নয়, বলে মনে করেননি। লেখক-নাট্যকারের চেয়েও মানুষ চেখভকে তাঁরা কত বড় মনে করতেন, কিংবা বলা যায় মানুষ চেখভ তাঁদের কাছে ধীরে ধীরে কেমন বড় হয়ে উঠেছিলেন তাঁর শিল্পপরিধি ছাড়িয়ে, আর তাঁর উষ্ণ সান্নিধ্যলাভের জন্য কেমন উদগ্রীব হয়ে থাকতেন তাঁরা নিজেদের পুরনো-মলিন হয়ে আসা জীবনকে নতুন করে নেবার তাগিদে, নিজেদের রক্তস্রোতে নতুন প্রাণবেগ সঞ্চারিত করে নেবার আগ্রহে—তার বিবরণ পড়তে পাওয়াও কম সৌভাগ্যের নয়।

চেখভ সম্বন্ধে স্তানিশ্লাভস্কির মুখ থেকে আমরা জানতে পারি—

> অশিক্ষিত গরিবগুর্বোরা যে অন্ধকারের মধ্যে পড়েছিলেন; তাতে সামান্য আলোর ছোঁয়া লাগার সম্ভাবনাই চেখভকে ওরকম আনন্দিত করে তুলেছিল। যা কিছুই মানুষের জীবনকে আরও একটু সুন্দর করে তুলতে পারে, তাতেই তিনি দারুণ খুশি হতেন।
>
> (মস্কো আর্ট থিয়েটার প্রতিষ্ঠার প্রারম্ভে) তিনি আমাদের প্রথম শরিকদের মধ্যে একজন। প্রস্তুতিপর্বে আমাদের প্রতিটি কাজের খুঁটিনাটি নিয়ে তাঁর কৌতূহল ছিল অসীম, চাইতেন আমরা যেন নিয়মিত ও খোলাখুলিভাবে তাঁকে সব জানাই।
>
> চেখভ প্রায় শিশুর মতো খুশিতে মঞ্চের চারধারে আর নোংরা সাজঘরগুলোতে ঘুরে ঘুরে বেড়ালেন। থিয়েটারের উজ্জ্বল দিকটা তাঁর যতটা পছন্দসই ছিল, কষ্টকর দিকটাও ততটাই প্রিয় ছিল।
>
> তিনি থিয়েটারকে ভালবাসতেন কিন্তু অশোভনতা পছন্দ করতেন না মোটেই। কোনও ধরনের অশালীনতা দেখলেই তিনি হয় একেবারে সিঁটিয়ে থাকতেন, নয় সেখান থেকে পালিয়ে যেতেন।
>
> অবশ্য চেখভের মন্তব্য বা অভিমতের এটাই ছিল বৈশিষ্ট্য—আলঙ্কারিক এবং অতি সংক্ষিপ্ত। সবসময়ই সেগুলো বিস্মিত করত, আর সেই কারণেই মনে থেকে যেত। তিনি যেন একটা ধাঁধা বলে চলে যেতেন, যেটার অর্থ না বুঝতে পারা অবধি তা মনে গেঁথে থাকতে বাধ্য।
>
> চেখভ আমাদের মহলায় আসতে খুবই পছন্দ করতেন।
>
> চেখভের চিরকালীন স্বভাব ছিল, যখন যা তাঁর মনে ধরে তখন তাই নিয়েই বারবার কথা বলে যাওয়া। আমাদের কাজের প্রতিটি খুঁটিনাটি নিয়েই তাঁর আগ্রহ ছিল, তবে তাঁর বিশেষ আগ্রহ ছিল—কী ধরনের নাটক আমাদের প্রযোজনার তালিকায় থাকছে, সেই দিকে।
>
> যে কেনও সাংস্কৃতিক কাজ বা উন্নতির লক্ষ্যে যে কোনও পদক্ষেপ চেখভকে খুবই আনন্দ দিত।
>
> সে সময় আমাদের কথাবার্তা হত মূলত আমাদের নতুন থিয়েটার নিয়ে।

নাট্যকার চেখভের সঙ্গে সম্ভাবনাময়ী তরুণী অভিনেত্রী ওলগা নিপারের পরিচয়, গভীর প্রণয় আর স্বপ্নের মতো অতি সংক্ষিপ্ত দাম্পত্যজীবনের কাহিনি নিপারের কাছ থেকে বিশ্ববাসী শুনতে পেয়েছে। এক রোমাঞ্চকর অথচ করুণ অধ্যায়। বিয়ের আগে নিপারকে লেখা চেখভের অসামান্য চিঠিগুলি তাঁর কোনও শ্রেষ্ঠ গল্পের চেয়ে ন্যূন নয়। অসুস্থতার জন্য চেখভকে বছরের বেশিটা সময় কাটাতে হত রাশিয়ার উষ্ণপ্রদেশ ইয়ালটায় অথচ তাঁর মন পড়ে থাকত শীতের মস্কোতে—যেখানে রয়েছে থিয়েটার, তাঁর MAT-এর অনুরাগী বন্ধুরা যেখানে মঞ্চ কাঁপাচ্ছে, যে মস্কোর মঞ্চে

অভিনয় করছে ওলগা নিপার; যেখানে নতুন নাটকের প্রস্তুতি চলছে, মহলা হচ্ছে—সেখানেই তো জীবন, বেঁচে থাকার তাৎপর্য। ওলগা নিপার তাঁর অবিস্মরণীয় স্মৃতিচারণের এক জায়গায় অকপটে তাঁদের বিবাহিত জীবনের এক চরম জটিলতার আর তার ফলে উদ্ভূত সংকটময় পর্বের কথা বলেছেন। স্ত্রী অভিনয়ের জন্য মস্কোতে আর তাঁর অসুস্থ রুগ্ন-যক্ষ্মাগ্রস্ত-মরণাপন্ন স্বামী গরম আবহাওয়ায় সুদূর ইয়ালটায়—তাহলে তাঁদের দাম্পত্যজীবনের অর্থ কী? অন্যদিক দিয়ে নিপারকে ইয়ালটায় গিয়ে স্বামীর সঙ্গে বাস করতে হলে, তাঁর দেখাশুনো করতে হলে পর স্ত্রীর অভিনয়-জীবনের কি হবে? অভিনেত্রীর জীবন, MAT-এর সঙ্গে যুক্ত স্পন্দমান প্রাণচঞ্চল জীবন—তারই বা কী হাল হবে? দু'জনে কী সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন এই চরম সংকটে—নিপার আমাদের তা খুলে বলেছেন।

স্তানিশ্লাভস্কির পরবর্তী প্রজন্মের নির্দেশক তোভস্তোনোগভ MAT-এর উজ্জ্বল চেখভ-প্রযোজনার ঐতিহাসিক বিপুল সাফল্যের পরও কেন আবার চেখভের নাটক করতে চান আর কেনই বা তিনি তাঁর দুঃসাহসী আকাঙ্ক্ষা পূরণের জন্য 'তিন বোন' বেছে নিয়েছেন—তার একটি চমৎকার কৈফিয়ৎ দিয়েছিলেন। এক মহান শিল্পীর নিজের কাছে নিজের মুখোমুখি দাঁড়ানোর দলিল এই প্রবন্ধটির অনুবাদ রয়েছে এই সংকলনে। তাঁর কাছে চেখভের সাহিত্য ছিল আধুনিক হয়েও ধ্রুপদী। নতুন মানসিকতা দিয়ে চেখভের নাটকগুলিকে তিনি বিচার করেছেন। তন্নতন্ন বিশ্লেষণ করে দেখিয়েছেন আবার চেখভ করার তাৎপর্য কোথায়; আজকের দিনে চেখভের প্রয়োজনীয়তা আর প্রাসঙ্গিকতা কেন। তিনি নতুন প্রজন্মের অভিনয়শিল্পী আর নির্দেশকদের কাছে চেখভের হয়ে দাবি করেছেন 'উপযুক্ত অভিনিবেশ, অকৃত্রিম ভালবাসা ও সুগভীর খনন।' তাঁর মতে 'সবসময়ই চেখভ আমার কাছে যৌবনের অগ্রদূত, জীবনের প্রেরণাদাতা, যোগ্য শিক্ষক, বিচক্ষণ বিচারক ও প্রাজ্ঞ বন্ধু'; 'জীবনের বীভৎস এবং সুন্দর, মানুষের পরস্পর বিপ্রতীপ দুই মনোবৃত্তিকে তাঁর নাটকে একসূত্রে বেঁধে অতি সূক্ষ্ম কাব্যিক লাবণ্যে তা প্রকাশ করে গেছেন'। 'আমাদের মনে সৃষ্টি হচ্ছে কিছু না করতে পারার যন্ত্রণা, আমাদের চরিত্রে জন্ম নিচ্ছে এক ধরনের কূপমণ্ডুকতা। এরকম মানসিক অবস্থার অতিসূক্ষ্ম প্রকাশ আমরা তাঁর এই নাটকে বড় সুন্দর করে পেয়েছি।' সবশেষে তোভস্তোনোগভের সিদ্ধান্ত যে 'জীবনে যাদের অশুভ কর্তৃত্বের ফলে চেখভের নায়করা জীবনকে, ইচ্ছে থাকলেও, কাব্যিক সুষমায় প্রকাশ করতে পারল না—তাদের চরিত্রগুলোকে আমরা দিনের আলোর মতো স্পষ্ট করে তুলতে চাই।'

স্তানিশ্লাভস্কি আর নেমিরোভিচ-দানচেঙ্কোর MAT-এর উজ্জ্বল ঐতিহ্য আত্মসাৎ করে আজকের থিয়েটার চিন্তায়-ভাবনায় পরিকল্পনায় প্রয়োগে কোথায় এসে পৌঁছেছে—তিনি তার দিশা দিতে চেয়েছেন। চেখভকে নাট্যপ্রয়োগে সমকালীন করে তোলা ব্রেশটের চেয়ে কঠিন বলে তিনি মেনেছেন। বর্তমান নির্দেশকদের কাছে এ এক দিগদর্শী ভাষ্য।

এরকম আরেকটি প্রখর বিশ্লেষণী প্রবন্ধ রয়েছে এই সংকলনে। নান্দীকার কেন চেরি অর্চার্ডের রূপান্তর মঞ্জরী আমের মঞ্জরী অভিনয় করতে মনস্থ করেছে তার কারণ জানিয়ে ডিসেম্বর ১৯৬৪-তে প্রবন্ধটি লিখেছিলেন পবিত্র সরকার। শুধু চেখভকে বুঝতেই নয়, আধুনিক বাংলার থিয়েটারের ইতিহাসকে বুঝতেও ৪০ বছর আগে লেখা এই প্রবন্ধটি গুরুত্বপূর্ণ। তিনি বলেছেন যে 'চেখভের মতো আর কোনও নাট্যকার catastrophe-কে নিয়ে এমন ছিনিমিনি খেলতে পারেননি।' 'আমাদের লক্ষ্য খুব স্পষ্ট। স্বভাববাদ কোন উত্তুঙ্গ শিখরে পৌঁছুতে পারে এবং কোথায় পৌঁছুতে পারে না তার অভিজ্ঞতা আমরা অর্জন করতে চাই।'

অন্য তিনটি প্রসিদ্ধ নাটকের রূপান্তরের সঙ্গে এই সংকলনে 'সিন্ধুসারস'-এর অনুবাদ বা রূপান্তর থাকা অপরিহার্য ছিল। (ভূমিকায় দেখছি সম্পাদক এ বিষয়ে সচেতন।) সেরকম চেখভকে নিয়ে গোর্কির অসামান্য স্মৃতিচারণটিও সত্যবাবু এই সংকলনভুক্ত করলে পাঠকের প্রাপ্তির মাত্রা আরও বেড়ে যেত।

আরও কিছু চিঠির অনুবাদ আশা করেছিলাম। আশা করি যে এ সংকলনটি বাংলাভাষী থিয়েটারপ্রেমী পাঠকের সমাদর পাবে আর পরবর্তী সংস্করণে সম্পাদক এই কয়েকটি ঘাটতি পূরণ করবেন।

এরকম সুচারু রূপে প্রকাশিত আর্ট প্লেট সম্বলিত একটি গ্রন্থে মুদ্রণপ্রমাদ দৃষ্টিকটু। বানানরীতি গ্রহণে সামঞ্জস্য নেই। পেপারব্যাক হিসাবে দাম একটু চড়া লাগে বইকি। কয়েকটি ছোটখাটো দিকও সম্পাদকের মনোযোগ পেলে ভাল লাগত। যেমন স্তানিশ্লাভস্কির স্মৃতিচারণে সব জায়গায় আছে 'ইয়াল্টা' অথচ পরেই নিপারের স্মৃতিচারণে সর্বত্র দেখতে পাই 'ইয়ালতা'। দু'টো লেখাতেই কোনও একটি বানান অনুসরণ করলে ভাল হত না কি? এছাড়া প্রচ্ছদে আর নামপত্রে যথাক্রমে 'সম্পাদনা ও ভূমিকা' আর 'ভূমিকা ও সম্পাদনা' লেখাও চোখে লাগে। এই শব্দক্রম বদলের অর্থ কি? শুধু সম্পাদনা লেখাই কি যথেষ্ট হত না?

আন্তন চেখভ : বিষয় নাটক—সম্পা : সত্য ভাদুড়ি/ মৌহারি, কলকাতা-৮৬, পরিবেশক—প্যাপিরাস, কলকাতা-৪/ ২০০.০০

ছোট্ট পড়ুয়াদের জন্য তালিবান ও আলকায়দা

বুলবুল আহমেদ

আমেরিকার টুইন-টাওয়ার ধ্বংস হবার পর থেকে পৃথিবীতে সন্ত্রাসবাদের সংজ্ঞা নতুনভাবে নির্ধারিত হয়েছে। এবং এই নিয়ে লেখালেখি কম হয়নি। আজকের তথ্য প্রযুক্তির মহাবিস্ফোরণের যুগে বাংলাভাষায় লেখা একটা নিরীহ বই কতটা সম্ভব হবে মানুষের ধারণা বদল করতে? আজ প্রায় সারা পৃথিবীতেই মানুষের মধ্যে বই পড়ার অভ্যাস কমতে বসেছে। অন্যান্য বৈদ্যুতিন মাধ্যমের দাপট প্রতিদিনই বাড়ছে। আর হিরণ্ময় ভট্টাচার্যের 'তালিবান ও আলকায়দার স্বর্গরাজ্যে' নামকরণের জন্য একটা আলাদা মনোযোগ আকর্ষণ করতে সক্ষম হলেও এই বই আদতে কিশোর-বয়সিদের উদ্দেশে লেখা। হিরণ্ময়ের নতুন ও পুরাতন কিছু ভ্রমণকথা আছে এ বইতে। তিনি ভারতের নানা জায়গা সাইকেলে ভ্রমণ করেছেন প্রথমযৌবনে, বন্ধু কৃষ্ণব্রত গুহকে সঙ্গে করে। ভারতের বাইরে খাইবার গিরি অঞ্চলে আফ্রিদি উপজাতির বসতি এলাকাতেও হাজির হয়েছেন তাঁরা। সেখানকার মানুষদের সঙ্গে পরিচিত হয়ে, আতিথ্য লাভ করে বিচিত্র অভিজ্ঞতা লাভ করেছেন। এবং বলা প্রয়োজন তাঁরা এইসব করেছেন কেবল আনন্দ থেকে, সেখানে একাডেমিক দায় কাজ করেনি।

ধুলোজমা পাতা থেকে হিরণ্ময় ভট্টাচার্য উদ্ধার করেছেন তাঁর অভিজ্ঞতার কথা—'আর কোনও বাঙালি খাইবার গিরিপথ অঞ্চলে এমনভাবে ঘুরেছে কি না জানি না। সেটা ইংরেজ রাজত্বের শেষ বছর। তারপর অন্তত পশ্চিমবাংলার বাঙালির পক্ষে সে মুখে পা বাড়ানো সাপের মাথায় পা দেবার সামিল। সাইকেলে কলকাতা থেকে পেশোয়ার যাবার শেষ পর্যায়ে শুনি কলকাতার ঐতিহাসিক দাঙ্গার কথা। অগাস্ট ১৯৪৬ কলকাতায় যখন তুমুল তাণ্ডব চলেছে আমরা ছিলাম লাহোরের কালীবাড়িতে। সেটা আবার মুসলিম পল্লীর মাঝখানে। কদিন সেখানেও টেনশন ছিল। সারা শহর পুলিশ টহল দিয়েছে। ...ব্রিজের কাছাকছি গ্রামের সর্দার নুর সাহেবের আতিথ্যে রাতটা নিশ্চিন্তে কেটেছে, রাস্তা থেকে বহু নিচে সিন্ধু নদীর তীরে, উন্মুক্ত আকাশের তারা গুনতে গুনতে। ...সেই রাতে আর এক হিন্দু পরিবার তাদের যুবতী মেয়ে নিয়ে নির্ভয়ে সেখানে আশ্রয় নিয়েছিল। গ্রামের নাম মালাইটোলা, মাঝিদের গ্রাম। বাদশা আকবর তাঁর নৌবাহিনীর স্বার্থে আর মাঝিদের সুবিধার জন্য গ্রামটা তাদের দান করে যান।' পরেশনাথ মন্দির, হাজারিবাগের জঙ্গল, দিল্লির কথা থাকলেও এই বইয়ের মূল বিষয় আফগানিস্তান ও তার মানুষ আর তার অতীত ও বর্তমান।

তালিবান জমানা শুরু হবার চার দশক আগের সময়টায় মহিলারা স্বাধীনভাবে ঘুরে বেড়িয়েছেন। কাবুল বিশ্ববিদ্যালয়ে অধিকাংশ পড়ুয়া ছাত্রী। সে সুখের সময় আর থাকল না। ফতোয়া—ছাত্রী হও কি, অধ্যাপিকা হও, কি মজুর, পথে বেরতে হলে সবাইকে বোরখা মুড়ি দিয়ে বেরোতে হবে। না মানলে শাস্তিভোগ। পিটুনি অবধারিত। সত্যি কয়েকজনকে রাজপথে প্রহারেণ ধনঞ্জয় করা হয়েছে। যে মহিলারা তাদের পরোয়া না করে পথে বেরিয়েছিল, তালিবান বাহিনী অ্যান্টেনা ওড়ানো গাড়ি থেকে নেমে তাদের লাঠিপেটা করছে, এ ছবি দেখেছে সারা পৃথিবীর লোক। আমরা জানি সে আঘাত দেহে যত না লেগেছে, তার চাইতেও বেশি তাদের মর্যাদা ও আত্মসম্মান মাটিতে মিশিয়ে দিয়েছে। তবে এর পিছনেও একটি ইতিহাস আছে এবং লেখক তাঁর সংযত ভাষায় এবং সংক্ষিপ্ত পরিসরে তা ব্যক্ত করেছেন।

১৯৭৯ সালের ২৭শে ডিসেম্বর রাশিয়ার বাহিনী কাবুলে প্রেসিডেন্ট হাফিজুল্লার প্রাসাদ দখল করে। তাঁকে হত্যা করা হয়। সিংহাসনে বসেন সোভিয়েত মদতপুষ্ট নেতা বারবাক কারমাল। তার পরের ঘটনাক্রমকে লেখক তিনটি পর্যায়ে ভাগ করেছেন। প্রথম পর্যায়ে রাশিয়ার প্রতাপ। সে সময়ে যারা দেশটাকে মুক্ত করার জন্য যুদ্ধ করেছে তাদের কূটনৈতিক, রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক সমর্থন দিয়েছে আমেরিকা, আফগান বাস্তুহারাদের জন্য গড়া মাদ্রাসার ছাত্ররা হয়েছে তালিবান। দ্বিতীয় পর্যায়ে ১৯৮৮-৯২, এই সময় দেশের শাসনভার ধরে রেখেছিলেন কমিউনিস্ট পার্টির প্রতিনিধি নাজিবুল্লা। সোভিয়েত ইউনিয়ন ভেঙে যাবার পর নাজিবুল্লা আর বেশিদিন ক্ষমতায় থাকতে পারেননি। আর শেষ পর্যায়ে ১৯৯২ সাল থেকে বর্তমান সময় পর্যন্ত ঘটনার ঘনঘটা। আর সকলেই তা জানে।

হিরণ্ময় ভট্টাচার্য তাঁর এই বইয়ে তালিবানদের উৎপত্তি সম্পর্কে একটা সঠিক এবং নিরপেক্ষ ধারণা দেবার চেষ্টা করেছেন। ইসলামের মূল ঐতিহ্যের সঙ্গে এর পার্থক্য নির্দেশ

করেছেন। এই বই আলকায়দা ও ওসামা বিন লাদেন সম্পর্কে কিশোর বয়সি পড়ুয়াদের একটা স্বচ্ছ ধারণা দেবে। আর কিছু প্রচলিত ভুল ধারণার অবসান ঘটাবে।

তাছাড়া আফগানদের স্বাধীনতাপ্রিয়তার কথা, অতিথি-পরায়ণতার কথা বলেছেন নানা প্রসঙ্গে। ইংরেজদের ভুবনবিজয়ী কূটকৌশলও হার মেনেছে তাদের কাছে এসে।

বাঙালি পাঠক মুজতবা আলীর কল্যাণে অন্য আফগানিস্তানের সঙ্গে পরিচিত হয়েছে অনেক আগে। তিনি যখন অধ্যাপনার কাজ নিয়ে কাবুলে যান তখন আমির আমান উল্লার সময়। বাদশা ইউরোপ ঘুরে এসেছেন, তাঁর ইচ্ছে দেশটাকে আধুনিক করা। সংস্কারের গোঁড়ামি থেকে দেশকে মুক্ত করা। তিনি আধুনিক তুরস্কের জন্মদাতা কামাল আতাতুর্কের আদর্শে অনুপ্রাণিত ছিলেন। তাঁর উদ্দেশ্য অবশ্যই মহৎ কিন্তু মোল্লারা ঠুঁটো জগন্নাথ হয়ে বসে থাকেনি আমানউল্লার প্রগতির হাওয়ায় গা ভাসিয়ে দিয়ে। লেখক মন্তব্য করেছেন, আমানউল্লা সুপারসনিক বেগে এগিয়ে যাচ্ছিলেন। এক সময় তাঁকেও হার মানতে হয়। একটু ধীরে সুস্থে এগোলে হয়ত বাধাটা এতটা মারাত্মক হত না। আর এ প্রসঙ্গে বলা দরকার মুজতবার মতো না হলেও এ বইয়ে হিরণ্ময় ভট্টাচার্য রসিকতা করতে কসুর করেননি। বোঝা যায় নানা জনের রসিকতা কেন তার অত্যন্ত প্রিয় বিষয়!

তালিবান ও আলকায়দার স্বর্গরাজ্যে—হিরণ্ময় ভট্টাচার্য/সাগর পারে, লন্ডন/৪৫.০০

সংক্ষিপ্ত পরিচয় ঃ চারটি কাব্যগ্রন্থ

[চতুরঙ্গ দপ্তরে নিয়মিত প্রচুর কবিতার বই সমালোচনার জন্য জমা পড়ে। ইচ্ছে থাকলেও স্থানাভাবে আমরা সে-বইগুলির প্রতি সুবিচার করতে পারি না। এখানে কয়েকটি কাব্যগ্রন্থের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেওয়া হল।

—স. চ.]

ভাষায় যেটুকু বলা যায়—বিজয়া মুখোপাধ্যায়, আনন্দ, কলকাতা-৯, ৬০.০০

বিজয়া আমাদের সময়ের এক প্রধান কবি। এই বইটিতে অনেকগুলি বার বার ফিরে পড়ার যোগ্য কবিতা রয়েছে। তাঁর কবিনৈপুণ্য আর জীবনবোধের পরিচয়ে সেগুলি উজ্জ্বল। নারী হিসাবে তাঁর নিজস্ব বোধ আর জগৎ-কে দেখার ভঙ্গিতে ঝলমল করছে কিছু কবিতা, যেমন যমযমী সংবাদ, শাড়ির পোশাকে আইনি পকেট, পরিসংখ্যান-২০০২, টুকাই, ওরা। কবিতায় গল্পের ছোঁয়া থাকা উচিত কি না, তাতে কি কবিতার কিঞ্চিত হানি ঘটে এমন প্রশ্ন জাগাতে পারে তাঁর এই কবিতাগুলি—সুহাসের বাড়ি-ফেরা, অপুর কথা। কাহিনির ইশারা দিয়ে গড়া অসাধারণ একটি কবিতা 'দুঃখী কালো মেয়ে'। বাংলায় কালীকে নিয়ে গান রচনার সমৃদ্ধ ঐতিহ্য রয়েছে। এ কবিতাটি তাতে এক অসামান্য আধুনিক সংযোজন। যিনি এই কবিতাটিসহ 'পাখি', 'দেখি সেই বাজ', 'পাঁচালি'-র মতো অনেক গভীর কবিতা লিখেছেন তিনি কেন কবিতার নামে সুনীলকে নিয়ে 'কবির বয়স নেই'-জাতীয় প্রতিবেদন লিখতে গেলেন? তাতে সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় বা কবিতা কাউকেই বড় করা গেল কি?

কল্পনা এবং একাকীর কিংবদন্তী—অমিতাভ গুপ্ত, ডি. এন. পাবলিকেশনস্, কলকাতা-৯, ৩০.০০

ষাট-সত্তরে লিখতে শুরু করে বর্তমানে বাংলার অন্যতম প্রধান কবি অমিতাভ গুপ্ত। তাঁর 'প্রণীত কবিতাপুঁথি ২৩' উৎসর্গ করা হয়েছে কল্পনা চাওলা এবং শক্তি চট্টোপাধ্যায়কে। কল্পনা চাওলাকে নিয়েই এ পুঁথির প্রথম কবিতাটি মনে দাগ কেটে বসে। শব্দ-চিত্রকল্প দিয়ে কবিতার রূপ নির্মাণে দুরূহতার দিকে যাত্রার একটি সচেতন ইচ্ছে থাকলেও অমিতাভ গুপ্ত আসলে লিরিক কবি। তাঁর কবিমন আধুনিক পৃথিবীর জটিলতাগুলিকে আয়ত্ত করে নিয়েও আদ্যন্ত লিরিক্যাল। এই পুঁথিটির এইসব নিবিড় গীতিকবিতায় যে-কেউ আচ্ছন্ন হয়ে পড়তে পারেন—না দেওয়ার উদ্দেশে, অসি, স্তোত্র, পটুয়াপল্লী, পাহারা দেওয়া। শ্রদ্ধা কিংবা বোন—গভীর

বেদনাসঞ্চারী। কিন্তু এমন সব কবিতার পাশে একেবারে মানায় না কবিতা-লেখা নিয়ে কৈশোরক উচ্ছ্বাসভরা 'তীর্থযাত্রা'। জীবনবোধে, ভাষাব্যবহারে আর ছন্দ-প্রয়োগের দক্ষতায় তিনি নিজের স্থানটি দৃঢ় করলেন এই কাব্যপুঁথিতে।

বেদ পয়স্বিনী—সৌমনা দাশগুপ্ত, কৃত্তিবাস প্রকাশনা, কলকাতা-১৯, ৪০.০০

নতুন শতকের তরুণ কবিদের মধ্যে কবিতা লিখে মনোযোগ আকর্ষণ করেছেন সৌমনা দাশগুপ্ত। এটি তাঁর প্রথম কবিতার বই। সহজ করে বলতে চেয়েও ধীরে ধীরে তাঁর কবিতা কখন যেন দুরূহতার দ্বার ছুঁয়ে যায়। বলা পঙ্‌ক্তিগুলির চেয়ে না-বলা অনুভবের ইশারা টের পাওয়া যায় বেশি। অনেকটা না-বলা কথা কবিতাকে ঘনবদ্ধ করে তোলে। তা যেমন ব্যঞ্জনা সৃষ্টি করে, তেমনই কখনও বা রসগ্রহণে বাধাও দেয় বই কি। উপমার ধরনেও নিজস্বতা। ভাল লেগে যায় এই কবিতাগুলি—রূপান্তর, শীত, দহন, নদীর ডায়েরি থেকে, গ্রীষ্মস্নান, পতনের দিনরাত, অনামী বারোমাস্যা। এগুলি তাঁর কবিত্বশক্তি আর জীবনবোধকে চেনায়। তিনটি দীর্ঘ কবিতা এ বইটিকে সমৃদ্ধ করেছে। কবিতা দিয়ে তিনি জীবনের গভীরতল স্পর্শ করতে চান এরকম উচ্চারণে ঃ 'এই বৃষ্টিতে প্রথম তোমাকে ছুঁয়েছি/সেগুন! ইস এত খসখসে, জ্বলে যাবো যে।/আমার তীর্থে আগুন। নেমে আসছে শিখা/খসখসে সুখে। আমি তোমার প্রথম ফুলে/ঢেলে দিচ্ছি, নামিয়ে রাখছি গ্রীষ্মস্নান।'

ব্যবহারিক রূপবিজ্ঞান তত্ত্ব—তাপস রায়, কৃত্তিবাস প্রকাশনা, কলকাতা-১৯, ৪০.০০

কাব্যগ্রন্থের নামে চমক দিতে চেয়েছেন তাপস রায়। দরকার ছিল কি? কারণ এ বইটিতে তিনি কয়েকটি মনে রাখার মতো কবিতা গেঁথে দিতে পেরেছেন। যেমন প্রথম কবিতাটিই। প্রথম স্তবকের উচ্চারণের গাঢ়তা মন টেনে নেয় ঃ 'অন্তর্গত ধ্বনিটিকে বলি ডেকে/আরও রং দাও বাঁচার ছলনাটিকে/ পরিণাম ভেবে দশদিক কৃশ, একা লক্ষ্মীও ফিকে'। ঠিক এরই বিপরীত ঘরানার কবিতা লিখতে চেয়েছেন গ্রন্থনাম কবিতাটিতে। কবিতাটি অন্য ধরনের স্বাদ দিলেও পুরো বই পড়ে মনে হল এ তাঁর স্বধর্ম নয়। 'টেলিফোনের অজানা তারের ভেতর কথারা কেঁপে কেঁপে ডানা মেলে', 'জল থেকে যে রং টপটপ ঝরে যাচ্ছিল তা তোমার আহ্লাদ/তুমি শাণিত হওয়ার আগেই প্রকাশ্যে নিসর্গ জ্বালিয়ে দিয়েছ', 'মাটি ফুঁড়ে উঠে পড়েছে গাছপালা, পিঁপড়ে/মাল্টিস্টোরিড শূন্যতা/যেখানে যাবার কথা ছিল, যাওনি', 'সেইসব পুরনো ইশারা আবার উঠে এসে বসেছে বারান্দায়'—এই রকমই তাঁর নিজস্ব উচ্চারণ। যদিও 'মেঘ কালো হয়ে এলো বলে আকাশ বিরহী দেখাচ্ছে' গোছের পঙ্‌ক্তি লেখা তাঁকে মানায় না।

আলোর কারবারি নয়, তাপস সেন আলোর মহাজন

কুমার রায়

আলো আর অন্ধকার নিয়ে যাঁর কারবার কয়েক যুগ ধরে সেই ঘনিষ্ঠ বন্ধু তাপস সেন চলে গেলেন গত ২৮শে জুন বুধবার হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার পথে। বিগত শতাব্দী ও বর্তমান শতাব্দীর সেতুবন্ধনের কাজে নাট্যের জগতে যিনি সবচেয়ে চলমান ব্যক্তি ছিলেন তাঁকে আর আমরা দেখতে পাব না। শরীর নানাভাবে তাঁকে উৎপীড়িত করে এসেছে বিগত কয়েক বছরে কিন্তু মনের অসাধারণ জোর তাকে থামতে দেয়নি। এই সৃজনশীল মানুষটি, এই অভিনব উদ্ভাবনী শক্তির আঁধারটি এবং এই প্রতিবাদী জীবনটি শেষ হয়ে গেল।

তার মৃত্যুর পর অনেকে অনেকভাবে তাকে এবং তার শিল্পজীবন এবং ব্যক্তিজীবনকে অন্তরের আবেগ মিশিয়ে বুঝতে চেয়েছে এবং নানা পত্র-পত্রিকার পাতায় তা প্রকাশও পেয়েছে। কেউ বলেছেন, তিনি আমাদের নাট্যঅঙ্গনকে আলোয় আলোকময় করা হীরকদ্যুতি। আমাদের আলোর কবি। কেউ তার মৃত্যুকে, আলো থেকে অন্ধকারে পাড়ি দেওয়ার সঙ্গে তুলনা করেছেন। তাঁর বহুকালের অন্তরঙ্গ এক বন্ধু চিত্রপরিচালক মৃণাল সেন—রবীন্দ্রসদনে শায়িত তাপসের ফুলে ফুলে ঢাকা মৃতদেহের সামনে সেদিন বললেন যে তাপস ছিল অন্ধকারের প্রহরী। এই সবটা নিয়েই আমার বন্ধু তাপস সেন।

'বহুরূপী'-র প্রতিষ্ঠালগ্নের পরের বছরে সেই ১৯৪৯ সালে 'পথিক' নাটকের প্রযোজনা-কাল থেকেই পরিচয় এবং বন্ধুত্ব গড়ে ওঠে। শম্ভু মিত্র-র পরিকল্পনায় তখন সবে সংগঠন গড়ে উঠতে শুরু করেছে। তিনি সংগঠন এবং নির্মাণের স্থপতি। নাট্যনির্দেশকও। পর পর 'উলুখাগড়া', 'চার অধ্যায়'। তাপস সেনের আলোকপরিকল্পনায় আর আমাদের সমবয়সীদের মধ্যে তাপস-এর সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা বাড়তে থাকল। আমরা ভাল বন্ধু হয়ে গেলাম। হাল আমল পর্যন্ত সেটা অটুট ছিল। সে-ই বলত আজকাল,-'সম্বোধনে 'তুই' বলার লোক তো কমে গেল রে—এখন তুই আর আমি আর মৃণাল। আর তো কেউ নেই।' হ্যাঁ, সেই তাপস চলে গেল।

'রক্তকরবী' নাটকের সফল প্রযোজনার পর তার নির্দেশক শম্ভু মিত্র বলেছিলেন—'তাপস সেন হচ্ছেন আলোর ব্যাপারে একজন বিখ্যাত ব্যাপারি'। তার পরে পরেই সে তো তার কাজ দিয়ে সত্যিই বিখ্যাত হয়ে উঠেছে। বহুরূপী ছাড়াও তখন ভারতীয় গণনাট্য সঙ্ঘ, লিটল থিয়েটার গ্রুপ, উত্তর সারথি, অনুশীলন সম্প্রদায়, গন্ধর্ব, নান্দীকার প্রভৃতি নাট্যদলের প্রয়োজনায় তার অসামান্য কাজ মানুষকে মুগ্ধ করেছে। কলকাতার হিন্দি থিয়েটারে ১৯৫৭ সাল থেকে ১৯৮০ সাল পর্যন্ত 'অনামিকা'-র একাধিক নাটকে আর ১৯৬৪ সাল থেকে, মহীশূর, কটক, অসম, বম্বে, ন্যাশানাল স্কুল, দিল্লিতে একাধিক নাটকে বিশেষকরে দিল্লি এবং বোম্বাই নাট্যজগতে তার কাজ এবং স্বীকৃতি তো এখন ইতিহাস। আর নৃত্যনাট্যে তার আলোকপরিকল্পনায় সমৃদ্ধ হয়েছে কেলুচরণ মহাপাত্র, অনাদিপ্রসাদ, বৈজয়ন্তী মালা, মৃণালিনী সারাভাই, হেমা মালিনী, অমলাশঙ্কর, সাধনা বসু প্রভৃতি প্রথিতযশা শিল্পীদের কাজও। আর সি এল টির গৌরবের কালে প্রায় প্রতিটি অনুষ্ঠানে কলকাতায় এবং বিদেশে আলো নিয়ে সহযোগ দানে তাপস ছিল একনিষ্ঠ। সুরেশ দত্তর সি-পি-টি-র 'রামায়ণ', 'আলাদীন, 'সীতা', —আশ্চর্য কাজের সব নিদর্শন পুতুলনাটকে।

এই তালিকা অসম্পূর্ণ হল হয়ত, —কিন্তু দিতে হল একটি অফুরান প্রাণসম্পদে ভরপুর ঋজু, অক্লান্ত পরিশ্রমী মানুষের কাজ এবং পরিকল্পক মানুষটির পরিচয় পাওয়া যাবে এই আশায়।

একথা তো ঠিক যে তাপস সেন তাঁর কার্যকালে বাংলা থিয়েটারে আলোকে (এ ব্যাপারে বাংলা থিয়েটারের প্রথম পথিকৃৎ শিল্পী সতু সেনকে স্মরণে রেখেই বলছি) প্রথম সামগ্রিক সৃষ্টিকর্মকে অঙ্গীভূত করেই পৃথক এক শিল্পসৃষ্টির নিদর্শন রেখে গেছেন। তাঁর নিজস্ব মৌলিক নান্দনিক বোধ তাঁকে স্বতন্ত্র মর্যাদা দিয়েছে সারা ভারতে। অথচ গভীর পরিতাপের বিষয়—তাঁর প্রয়াস সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে সংবাদ

পত্রে বা অন্য কোনও সংবাদমাধ্যমে স্থান পায়নি। অথচ কোনও প্রাক্তন সাংসদের বা রাজনৈতিক ক্ষেত্রের কোনও ব্যক্তির অখ্যাত কোনও ছেলে-মেয়ের অনৈতিক কাজের কেচ্ছা দিনের পর দিন প্রকাশ পায়! মগ্ন আলোর কবি তাপস সেন সেখানে অপাঙতেয় হয়ে রইলেন।

আমাদের নাট্য আন্দোলনের অনেক সুখ দুঃখের অংশীদার, অনেক অভিজ্ঞতার শরিক ছিল সে। থিয়েটারের নানা দিক-পরিবর্তনের সঙ্গে যুক্ত সে সব অভিজ্ঞতা। এই স্মরণ আলেখ্যতে সে সব বিস্তারিত আলোচনা সম্ভব নয়। কেননা তাপস তো শুধু আলোর কারবারি ছিল না—সে যে নাট্য আন্দোলন তথা নাট্যশিল্পের এক অনন্য ব্যক্তিত্ব হয়ে উঠেছিল এ কাজ আরম্ভের কিছু দিনের মধ্যেই। তার চিন্তা-ভাবনায় সমাজ মানুষ ও রাজনীতি সম্পৃক্ত হয়ে এক সচেতন শিল্পী হিসাবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেছে। চৈতন্যবান মানুষ হিসাবে।

মানুষের আদিতম ভয়ের উৎস বোধকরি অন্ধকার। আমরা সেই ভয়টা বহন করে আসছি অনাদ্যন্ত কাল ধরে। আর সেই সঙ্গে আলোর আকাঙ্ক্ষাও করেছি। আলোর সঙ্গে আনন্দের, অন্ধকারের সঙ্গে বেদনার যোগসূত্রও আদিকালের। সাহিত্যে, ধর্মে, লোককথায় আলো আর অন্ধকারের কত না মৈত্রী, কত না বিরোধের দ্যোতনা। মানুষের মনের ওপর এর কী প্রচণ্ড প্রভাব! আধুনিক আলোকশিল্পী তাপস সেন—মনের ওপর এই আলো-অন্ধকারের প্রভাবের কথাটা বুঝেছিলেন; ধরতে পেরেছিলেন এর প্রতিক্রিয়া। আমাদের আবেগের প্রতিক্রিয়াকে নির্দিষ্ট সুরে বেঁধে দেবার ক্ষমতা ছিল আলোকশিল্পী তাপস সেনের হাতে। যবনিকা উঠে যেতে যে আলো বা অন্ধকার বা ছায়া আমরা দেখতে পাই তা আমাদের মনের ঠিক সুরটি ধরিয়ে দিত। তাপস ছিল সেই আলো-ছায়ার শিল্পী। নিরন্তর পরীক্ষার মধ্য দিয়ে সামান্য আলোর সরঞ্জাম নিয়ে—কখনও বিস্কুটের টিন, বার্লির বা দালদার কৌটো, কখনও ফেলে দেওয়া প্রেক্ষাগৃহের Exit লেখা আলোর খাপ, কখনও রাংতার দোমড়ান-কোঁচকান ফয়েল ব্যবহার করে তার উদ্ভাবনী প্রক্রিয়া চালিয়ে মঞ্চে অসাধরণ সৃষ্টিকুশলতার পরিচয় দিয়ে এসেছে। তাই আমার কাছে তাপস কেবলমাত্র আলোর 'যাদুকর' নয়। এই বিশেষণে যখন তাকে চিহ্নিত করা হয় তখন আমার ভাল লাগে না। কারণ—'যাদু' কথাটার সঙ্গে কেবল কৌশল শব্দটি মানায়, খানিকটা চালাকিও বা। একটা ফাঁকি, মানুষকে বোকা বানিয়ে মোহমুগ্ধ করে তোলার কারসাজির কথা মনে আসে ওই যাদু শব্দটির মধ্যে। তাপসের কাজে কোনও ফাঁকি নেই, মানুষকে বোকা বানাবার চেষ্টা নেই। আধুনিক থিয়েটারে আলোর ভূমিকা অনেক জটিল। অনেক মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণের অপেক্ষা রাখে; যে-বিশ্লেষণ, যে-জটিলতা নাটকের সঙ্গে—নাট্য উপস্থাপনায় নির্দেশকের মূল পরিকল্পনার সঙ্গে—তার সঙ্গে যুক্ত রেখেই তাকে কাজ করতে হয়েছে। বিচ্ছিন্ন নয়, তাই 'যাদুও' নয়, অনেক প্রত্যক্ষ। প্রতিভাবান আলোকশিল্পী হিসাবেই, সৃজনশীল থেকেই এই সম্পাদ্য শিল্পে আপন কর্মকুশলতা ও কল্পনার ছাপ প্রায় প্রতি প্রযোজনাতেই তাপস সেন রেখে গেছেন। তার স্মৃতি, কাজের সৌকর্যের কথা তাই আরও বহুকাল মানুষের মনে থাকবে। সে ছিল এক কল্পনায় সমৃদ্ধ আলোক শিল্পী।

পূর্ববঙ্গে তার পৈত্রিক বাসভূমি। বড় হয়েছে, লেখা পড়া শিখেছে দিল্লিতে। পলিটেকনিক পড়াশুনো চালিয়েছিল বিদ্যুৎশিল্পের কারিগর হবে বলে। কিন্তু তার স্কুলের ড্রয়িং-এর শিক্ষক প্রতাপ সেন তার জীবনে প্রেরণার উৎস হয়ে উঠল। আর এ কথা জীবনের শেষ পর্যন্ত তাপস ভোলেনি। বলবার কথা বলতে গেলেই সে সেই দিল্লির রাইসিনা স্কুলের শিক্ষকের নাম উল্লেখ করেছে। নতুবা আমরা জানবই বা কীভাবে সে নাম! সব ঋণ স্বীকার করার ঔদার্য ছিল বলেই তাপস বড় হতে পেরেছে। 'ওরা চারজন' শীর্ষক একটি নিবন্ধে যে চারজন মানুষ তার মনের ওপর প্রভাব ফেলেছিল তাদের কথা জানাতে গিয়ে লিখেছে, —'আমাদের বাংলা তথা ভারতীয় থিয়েটারকে এক উজ্জ্বল রূপ দেবার পিছনে যে চারজন ব্যক্তিত্বের অবদান সব চেয়ে বেশি তাঁদের সকলের সঙ্গেই আমার কাজ করার সৌভাগ্য হয়েছে। এই চারজন হলেন শম্ভু মিত্র, উৎপল দত্ত, বিজন ভট্টাচার্য এবং অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায়। এই চারজনই নাটক লিখেছেন, প্রযোজনা করেছেন এবং অভিনয় করেছেন। বাংলা থিয়েটারের গৌরবময় পথকে এগিয়ে নিয়ে যেতে আরও অনেকেই কৃতিত্ব দাবি করতে পারেন, কিন্তু এঁদের মতো নাটকের সামগ্রিক অস্তিত্বের সঙ্গে জড়িত নয় অন্য কেউ। এঁদের সঙ্গে কাজ করতে গিয়ে দেখেছি প্রত্যেকেই নিজস্বভাবে থিয়েটারকে নিয়ে ভেবেছেন, প্রয়োগ করেছেন, পদ্ধতিগতভাবে একজনের সঙ্গে অন্যজনের যথেষ্ট অমিল রয়েছে কিন্তু চারজনই এক জায়গায় স্থির ছিলেন। সেটা ছিল ভারতবর্ষের তথা বাংলাদেশের সামগ্রিক উত্থানপতনকে, তার সমস্যাকে থিয়েটারের আলোয় প্রতিবিম্বিত করা।'

এই লেখাটা, তাপস সেনের মৃত্যুর পর, স্মরণ-আলেখ্য হিসাবে বিবেচিত হবে হয়ত। কিন্তু সচেতন থাকতে চাইছি, প্রচলিত অর্থে তা যেন না হয়ে ওঠে। তার কর্মময় জীবনের বিস্তৃতি ও বৈচিত্র তুলে ধরার প্রয়াসের মধ্যে নিজেকে আবদ্ধ রাখতে চাই। এ কথা অস্বীকার করবার উপায় নাই যে আজ তাপস দীর্ঘকালের কাজ, তার ব্যাপকতা, শুধু তো নাট্যের

ক্ষেত্রে নয়, তার সৃজনী ও উদ্ভাবনী আলোর বিন্যাস মঞ্চনাটক ছাড়াও নৃত্যে, দর্শনীয় নানা জায়গায়, মাঠে, ময়দানে, প্রাচীন ও ঐতিহাসিক সৌধে। এটা তো সম্ভব হয়েছিল কল্পনা ও দক্ষতার নিরন্তর পরীক্ষানিরীক্ষার চর্চায়।

যে কোনও শিল্পচর্চায় কেউ যদি তাঁর কাজের মধ্যে বিপ্লব ঘটিয়ে থাকেন, —যেমন তাপস সেন আলোর ক্ষেত্রে ঘটিয়েছিলেন, তাহলে ধরে নিতেই হবে যে সেই সক্ষমতার পিছনে বহুদিনের মনোযোগ এবং হাতে কলমে কাজের প্রস্তুতি থাকে। কিন্তু এই কাজে যেটা দেখেছি সেটাও বলে নিতে হয় এই ফাঁকে, অনেক কিছু বারবার তাকে গড়তে হয়েছে আবার ফেলেও দিতে হয়েছে। বারবার বদল ঘটিয়ে তবেই সৃষ্টি হয়—যা আমরা দেখি। নাটকে তো এটা হয়-ই। তিনি তৃতীয় বিশ্বের অর্থাৎ অনুন্নত দেশের শিল্পী। যে সমস্ত যান্ত্রিক উন্নত কলাকৌশল, উন্নত দেশে সহজলভ্য, যার প্রয়োগের ক্ষেত্রে কোনও ভাবনাচিন্তা করবার আর প্রয়োজন নেই। বোতাম টিপতেই যে যন্ত্র ঈপ্সিত ফল দেখিয়ে দিতে পারে, তা তো অনায়াসলভ্য ছিল না আমাদের দেশে। তাপসকে তো সেই আমাদের দেশেই কাজ করতে হয়েছে।

বহুরূপীর প্রতিষ্ঠাকাল থেকে ততদিনে 'পথিক', 'উলুখাগড়া', 'ছেঁড়াতার', 'চার অধ্যায়', হয়ে 'রক্তকরবী'ও হয়ে গেছে ১৯৫৪ সালে। আমরা আন্তর্জাতিক এক মহানাট্য সম্মেলনে 'রক্তকরবী' নিয়ে বোম্বাই-এ গেছি। সেটা ১৯৫৬ সাল। আন্তর্জাতিক নাট্যপ্রতিনিধি এবং ভারতীয় প্রতিনিধিদের সামনে শম্ভু মিত্র নির্দেশিত 'রক্তকরবী' মঞ্চস্থ হল। বিদেশের থিয়েটারে রাজসূয় ব্যাপার। সেই রাজসূয় যজ্ঞের হোতারা অবাক 'রক্তকরবী' প্রযোজনায় আলোর প্রয়োগ দেখে। এর নির্দেশক এবং আলোকশিল্পী ব্যক্তি নিশ্চয়ই বিদেশে শিক্ষাপ্রাপ্ত। তাঁদের সবাই খুঁজছেন। তাপসকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না মঞ্চের ওপর, সে সঙ্কুচিত। পীড়াদায়ক তাঁদের আত্মাভিমান। প্রশংসায় অবশ্য তারা সরব। খুশির কারণ এবং গৌরবের যে যান্ত্রিক কলাকুশলতায় পারদর্শী দেশের লোক ভারতের নাট্যপ্রযোজনায় মুগ্ধ। অথচ আমাদের কটাই বা আলো ছিল তখন। তাপস তার 'ওভালটিন', 'দুধের বালতি', 'ইঁদুর কল', 'ইক্‌রিমিক্‌রি'—ইত্যাদি দিয়ে বাজিমাৎ করে দিল। এ নামকরণগুলি সবই তাপসের এবং সবই তার সহকর্মীদের বোঝার জন্য এবং সময়মতো জ্বালানো-নেভানোর জন্য। এবং সর্বোপরি সবগুলিই ওই কৌটো, টিনের বাক্স ইত্যাদি দিয়ে বানানো। আজও যারা সে আমলের তাপসের কাজের সঙ্গে পরিচিত তাঁরা জানেন এসব। আর একটি উদাহরণ দিই। সেটি অনেক পরবর্তী কালের যখন বিদেশ থেকে অনেক যন্ত্রপাতি আমাদের দেশে এসে গেছে। —অভিজ্ঞতাটা শুনেছিলাম তাপসের মুখেই। কিন্তু উদ্ধৃত করছি এই নিবন্ধে, বহুরূপীর সে আমলের সভ্য তাপস সেনের অনুগত সহকারী শীতাংশু মুখোপাধ্যায়ের লেখা থেকে। সে-ও চলে গেছে বেশ কয়েকবছর আগে। বহুরূপীর পর স্থায়ীভাবে দিল্লিতে থেকে গিয়েছিল এবং তাপসের সেখানকার যাবতীয় কাজের সঙ্গী ও সহকারী ছিল। প্রথমে 'আইফ্যাক্স' হলের আলোর দায়িত্ব নিয়ে কর্মজীবন দিল্লিতে শুরু করে। পরে সে নিজেই দায়িত্বশীল আলোর কারবারী হয়ে ওঠে। তাপস বড় নির্ভর করত শীতাংশুর ওপর। তা সেই শীতাংশুর এক স্মৃতিচারণমূলক লেখা বহুদিন আগে প্রকাশিত হয়েছিল—সেখান থেকেই উদ্ধৃত করি। শীতাংশু লিখেছে, —'সে সময় ভারতে ইলেকট্রনিক কন্ট্রোল যন্ত্র তৈরি হ'ত না। ফলে অনেকভাবেই অসুবিধার সম্মুখীন হতে হয়েছে। পরে সে যন্ত্রও করেছিলেন কিছু নবীন ইলেকট্রনিক যন্ত্রবিদের সহায়তায়। ইলেকট্রনিক যন্ত্রের কথায় মনে পড়ছে তিনমূর্তি ভবনে নেহরুর জীবন নিয়ে 'শব্দ-আলোর' কথা। ফিলিপস একটি পাঞ্চটেপ গাইডেড্ কমপিউটারাইজড কন্ট্রোল ব্যবস্থা আমদানি করেছিল, সঙ্গে ছিল ইলেকট্রনিক ডিমার। ঐ শব্দ-আলো (সঁ-এৎ-লুমিয়ের)-র পরিচালক ছিলেন ইব্রাহিম আলকাজী। সে এক এলাহী কর্মযজ্ঞ। তাপস সেন যেমন আলো চান, যে রঙ চান, হল্যান্ডীয় বিশেষজ্ঞরা মাথা নাড়েন। রঙ মিশ্রণ করতে চাইলেও ঐ নঞর্থক মাথা নাড়া। সাম্প্রদায়িক আগুনের দৃশ্য, তাদের ফ্লপিডিস্‌ক কিছুই করতে পারে না। আলকাজী সাহেব গেলেন খেপে, আর সাহেবরা 'ইমপসিবিল' বলে কেটে পড়লেন। স্থানীয় ফিলিপসের মাথায় হাত। আলকাজী সাহেবের ঐ আলোই চাই—তাপস যা চায়। শেষে ফিলিপস্-এরই নবীন কর্মী শ্রী গুপ্তার সঙ্গে বসলেন তাপস সেন, বুঝেছিলেন, কেমন করে 'লাইটস্ক্রিপ্ট' বানালে পাঞ্চটেপে ট্রানশ্লেট করা যাবে। ব্যস, ঘড়ি ধরে সেকেন্ড মেপে বানিয়ে ফেললেন ঐ স্ক্রিপ্ট। বার পাঁচেক টেপ কারেকশন করে যা চাইছিলেন, ঠিক তেমনি আলো হ'ল। আর আগুনের জন্য পিচ্‌বোর্ড, কাঠের আর হাতে ঘোরান চরকি তৈরি হ'ল, মোটর মেটাল শিট্ ইত্যাদি দিয়ে দিল্লীরই এক গলিতে। হল্যান্ডীরা আবার এলেন, আর অবাক হলেন। যে মেশিন থেকে তারা যা হবে না বলেছিলেন সেগুলিই যখন হচ্ছে দেখলেন, তাদের গুমর চুপসে গেল।' উদ্ধৃতিটা দীর্ঘ হল—কিন্তু কোনও উপায় নেই। থার্ড ওয়ার্ল্ডের শিল্পীর জয় হল যে! অভাব থেকে জন্ম নিয়েই তাপস সেনের নতুন আলোর ভূমিকা।

আমাদের সঙ্গে তার কাজ এবং বন্ধুত্ব দুই-ই সমান গুরুত্ব পেয়ে এসেছে। সে নিজেকে সংরক্ষণ করতে জানত।

নানা নথিপত্র চিঠি কাজের খসড়া পরিকল্পনা তার জমা থাকত। 'রক্তকরবী', 'পুতুলখেলা' 'ডাকঘর' এসব নিয়ে অনেক অনুপুঙ্খ লেখা হয়েছে, যেমন উৎপল দত্ত-র সঙ্গে তার কাজ 'অঙ্গার' 'কল্লোল', 'ফেরারী ফৌজ' 'মানুষের অধিকার নিয়েও আলোচনা আছে। আর তাকে অভিযুক্ত করে, আঙ্গিকের বাড়াবাড়ি করে নাট্যকে অবহেলা করার সে অভিযোগ ধোঁপে টেকেনি পরবর্তীকালে—যেমন ধরা যাক সাধারণ রঙ্গালয়ে তার করা 'সেতু' নাটকের কালে কিংবা মিনার্ভা মঞ্চে এল টি জি প্রযোজিত 'অঙ্গার' নাটক-এ এইরকম বিরূপ সমালোচনা—অর্থাৎ আলোর ম্যাজিক দেখানোর অভিযোগ—তা গ্রাহ্য হয়নি। দুটি নাটকেই ওই দুটি চমৎকারী আলোর বিন্যাস নাটক দুটির দাবি ও প্রয়োজনেই করা হয়েছে এবং তা অন্যান্য দৃশ্যের আলোক-পরিকল্পনার সঙ্গে যুক্ত। হয়ত দর্শকের নজর একটু বেশি কেড়ে নেয় ওইসব দৃশ্য—এই মাত্র। যাঁরা মঞ্চে যান্ত্রিকতা ও আলোর ব্যবহারে শঙ্কা প্রকাশ করেছেন, আঙ্গিকের বাড়াবাড়ি বলেছেন, তাঁরা হয়ত তখন ভুলে গিয়েছিলেন সবাই পরিবেশ সৃষ্টির কাজে আলো ও যন্ত্রের সাহায্য নিয়েছেন ও নেওয়া হয়। কোথাও বেশি, কোথাও কম। কোথাও ভালভাবে কোথাও মন্দভাবে, কোথাও অভিনব ভাবে। কোথাও সমসাময়িক প্রচলিত রীতিতে। তা যদি হয়ে থাকে, তাহলে 'সেতু' বা 'অঙ্গার'-এ এমন কী নতুন ব্যাপার ঘটল যাতে সে সময় অনেকে শঙ্কিত হয়েছিলেন! পরিবেশ ও দৃশ্যসজ্জাকে তাপস তার আলো দিয়ে আরও অর্থবহ করে তুলতে সক্ষম ছিল। সর্বোপরি তার কাজের লক্ষ্য, দৃশ্যের ভাব প্রকাশ এবং দর্শকের আবেগের প্রতিক্রিয়াকে তুঙ্গে সংস্থাপনাতেই নিবদ্ধ ছিল। আমাদের আবেগের ওপর আলোর প্রভাব সংগীতের মতোই সরাসরি। বোধকরি আকার, রঙ এবং শব্দ অপেক্ষা থিয়েটারে আমাদের অনুভূতির দুয়ারে আলো এসে ধাক্কা দেয় আগে এবং প্রতিক্রিয়া ঘটায়।

কলকাতার নাট্যআন্দোলনের সূচনাপর্ব থেকেই তাপস সেন যুক্ত হয়ে যায়। সিনেমার প্রতি টান এবং অল্পদিন হলেও সেখানে কাজ শেষ করে, বোম্বাই-এর ফিল্ম জগতের পাট চুকিয়ে দিয়ে স্থায়ী ভাবে কলকাতাকেই কর্মক্ষেত্র করে তোলে। কিন্তু তার খ্যাতি অচিরেই এখানকার কাজের সুবাদে ছড়িয়ে যায় সর্বভারতের নাট্যক্ষেত্রে। শুধু নাট্য এবং নৃত্যনাট্যের বা একক নাচের ক্ষেত্রে নয় (সেখানে মৃণালিনী সারাভাই, বৈজয়ন্তীমালা, হেমা মালিনী, অনাদি প্রসাদ, মঞ্জুশ্রী চাকী, প্রভৃতি শিল্পীর সঙ্গে তার কাজ অবশ্যই স্মরণযোগ্য।) সঁ-এৎ-লুমিয়ের-এর পরিচালনায় সবরমতী আশ্রম, চুনার দুর্গ, গোয়ালিয়র দুর্গ প্রভৃতি জায়গায় তার কাজও স্মরণীয়। আর বিদেশে ভারত-উৎসবে প্যারিসে এবং মস্কোতে, সেই সমস্ত উন্নত দেশেও তার কাজ অবাক করেছে আন্তর্জাতিক দর্শকদের। একটা জীবনে এত কাজ সে করেছে যে ভাবলে অবাক হতে হয়।

আমরা জানতাম এবং অনেকেই বাইরে থেকে তাকে দেখলে মনে করত ঢিলে-ঢালা এক মানুষ। কিন্তু কাজের ব্যাপারে মোটেই তা ছিল না। অনেক সময়েই তাকে অপছন্দের নাটক করতে হয়েছে। কিন্তু যে নাটক তার ভাল লেগেছে তখন তাকে মনপ্রাণ ঢেলে দিতে এবং প্রভূত মেহনত করতে দেখা গেছে। সে নিজেকে সংরক্ষণ করতে জানত। কোনও কাজ নিয়ে লেগে থাকার অদ্ভুত ক্ষমতা ছিল। আর ছিল স্পষ্টবাদিতা এবং একটা লড়াকু মনোভাব। ক্ষমতার অধিষ্ঠানে থাকা মানুষদের খুব স্পষ্ট করে, স্পষ্টভাবে তাদের গাফিলতির কথা বলতে পারত।

তার আর একদিকের কাজের কথাটাও উল্লেখযোগ্য। ভারতের বিভিন্ন প্রান্তে নাট্যগৃহ নির্মাণের ব্যাপারে সে ছিল অন্যতম উপদেষ্টা। তার অভিজ্ঞতার দাম যে ছিল অনেক। নিজেকে দিনে দিনে তিলে তিলে সে তৈরি করেছে। বড় হওয়ার সাধনায় ফাঁকি দেয়নি। বিজ্ঞানের বিভিন্ন বিষয়ে জানবার অত্যুগ্র আগ্রহ দেখেছি। চিত্রশিল্পে, বিখ্যাত সব আঁকিয়েদের ছবিতে আলো এবং ছায়ার খেলা তাকে মুগ্ধ করত। কখনও তো কেউ দেখে থাকতেই পারেন যে তার ভাবনাচিন্তার অবিন্যস্ত দ্রুতগতি। আশ্চর্য সব ভাবনা তার মনে দানা বাঁধতে না বাঁধতেই সে অন্য বিষয়ে মগ্ন হয়ে গেল। একটা ছটফটানি তো ছিলই।

আজ তার মৃত্যুর পর, তাকে স্মরণ করতে গিয়ে অনেক কথাই তো মনে পড়বে। অনেকেই তাকে নিয়ে লিখবেন, বলবেন—দুঃখী মানুষটার কথা, সফল মানুষটির কথা, তার ছটফটানির কথা, তার স্পষ্টবাদী উচ্চারণের কথা, কিন্তু সর্বশেষে যেটা বলতে হবে আধুনিক থিয়েটারে আলোর ব্যাপারে সে ছিল মহাজন। নাটকের আলো নিভে যায় নাটক শেষে। তাপসের জীবনে যবনিকা নেমে এলেও মহাজনের আলো থেকে যাবে শুধু স্মৃতিতে নয়—যুগের পরম্পরার মধ্যে।

স্মরণে

অনন্য শামসুর রাহমান

(জন্ম : ২৩.১০.১৯২৯—মৃত্যু : ১৭.০৮.২০০৬)

আবদুর রাউফ

প্রায় তিন দশক আগে শম্ভু মিত্র শামসুর রাহমানের কবিতা সম্পর্কে লিখেছিলেন, '.....প্রশ্ন হতে পারে, শামসুরের সামনে বাংলাদেশের স্বাধিকার অর্জনের সংগ্রাম ও ভাষা আন্দোলনের পটভূমি না থাকলে শামসুর কি এত ভাল লিখতে পারতেন? উত্তরে বলা চলে, সার্থক কবিতা তো প্রত্যক্ষ বেদনাসঞ্জাত অভিজ্ঞতারই ফসল।' (উত্তরসূরী : ২২ বর্ষ ১ সংখ্যা ১৩৮১) শম্ভু মিত্র অবশ্য কবির 'জাদু প্রতিভা'কে অকুণ্ঠ স্বীকৃতি জানিয়েই কথাকটি উচ্চারণ করেছিলেন। এই উচ্চারণের মধ্যেই নিহিত রয়েছে শামসুর রাহমানের কবিকৃতির অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্যটি। যে বৈশিষ্ট্যের কারণেই এপার বাংলার তাঁর সমসাময়িক কবিদের তুলনায় তিনি অনেকখানি আলাদা।

দেশভাগ হয়ে যাওয়ার কারণে শামসুর রাহমান তাঁর কবিসত্তার স্ফুরণের সময় থেকেই ছিলেন পাকিস্তানের কবি। পাকিস্তানি আমলের ঢাকা শহর তথা পূর্ববাংলার পারিপার্শ্বিক, বিশেষ করে তাঁর সামাজিক-সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক আবহ এড়িয়ে গিয়ে তাঁর পক্ষে বড় মাপের কবি হয়ে ওঠা সম্ভব ছিল না। প্রকৃত কবির তীব্র সংবেদনশীলতার অধিকারী হওয়ার কারণে এড়িয়ে যাওয়া তাঁর পক্ষে সম্ভবও ছিল না। তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানে যে সময়টায় শামসুর রাহমানের কাব্যচর্চার শুরু সেটা ছিল বিশ শতকের পঞ্চাশের দশক। স্বাধীনতার অব্যবহিত পরে দ্বিধাবিভক্ত দেশে ওপার বাংলার সামাজিক-সাংস্কৃতিক এবং রাজনৈতিক পরিমণ্ডলের সঙ্গে এপার বাংলার মিল ছিল না অধিকাংশ ক্ষেত্রেই। মিল না থাকার মূলে ধর্মের একটা ভূমিকা ছিলই। ইসলাম ধর্মের প্রাধান্যজনিত কারণে উদ্ভূত সামাজিক পরিবেশের সঙ্গে এপার বাংলার হিন্দুধর্মের অনুসারীদের সংখ্যাগরিষ্ঠতাজনিত বাতাবরণের মিল ছিল না। এখানে নাস্তিক্যসুলভ আচার-আচরণকে যত সহজে মেনে নেওয়া হত ওখানে সেটা হত না। কলকাতাকেন্দ্রিক এলিটরা অন্তত তাঁদের বাহ্যিক জীবনে ধর্মকে যেভাবে উপেক্ষা করতে পারতেন, পূর্ব পাকিস্তানের এলিটদের পক্ষে বাহ্যত ততটা সম্ভব ছিল না। তাঁদের ব্যক্তিগত বিশ্বাস যেমনই হোক বাহ্যিক জীবনে ধর্মীয় আচার-আচরণের সঙ্গে কিছুটা আপস তাঁদের করতে হতই। কারণ ইসলাম ধর্মে কিছু কিছু রিচুয়াল কঠোরভাবে সমষ্টিগত। সে তুলনায় হিন্দুধর্মে ধর্মীয় রিচুয়ালগুলি মূলত ব্যক্তিগত। তাই পূর্ব পাকিস্তানের এলিটদের সামাজিক অবস্থানের সঙ্গে পশ্চিমবঙ্গের এলিটদের সামাজিক অবস্থানের ফারাক ঘটে গিয়েছিল বিস্তর। খেয়াল রাখতে হবে মানসিকতার নয়, আমি বলছি সামাজিক অবস্থানের ফারাকের কথা।

আর একটা ব্যাপারেও ফারাক লক্ষ না করে উপায় নেই। কলকাতাকেন্দ্রিক এলিটরা গ্রাম্যজীবনের সঙ্গে কয়েক পুরুষের বিচ্ছিন্নতার সূত্রে যতখানি নাগরিক জীবনযাত্রায় অভ্যস্ত হয়ে উঠতে পেরেছিলেন ঢাকাকেন্দ্রিক এলিটদের পক্ষে সেটা হয়ে ওঠা সম্ভব হয়নি। কারণ বিগত শতকের চল্লিশ কিংবা পঞ্চাশের দশকের ঢাকায় গ্রাম্যজীবনের সঙ্গে বিচ্ছিন্ন পুরোপুরি নাগরিক জীবনযাত্রা গড়ে ওঠেনি। ঢাকার অধিবাসীরা তখনও গ্রাম্যজীবনযাত্রারই শহুরে সংস্করণে অভ্যস্ত ছিল। ফলে নিছক ব্যক্তিকেন্দ্রিক বা ব্যক্তির খেয়াল খুশিমাফিক জীবনযাত্রা ঢাকা শহরে সম্ভব ছিল না। ফলে বাউন্ডুলে মদ্যপ কবিরা 'মধ্যরাত্রির কলকাতাকে' তখন যেভাবে 'শাসন' করতে পারত ঢাকায় সেটা সম্ভব ছিল না। কলকাতার কবিরা ইউরোপ থেকে আমদানি নতুন নতুন মতাদর্শ বা অভিনব ভাবনা কবলিত হয়ে যেভাবে নিজেদের জীবনযাত্রাকে বেপরোয়া করে তুলতে পারতেন ঢাকায় সেটা করা যেত না। এক্ষেত্রে 'বেপরোয়া' বলতে বুঝতে হবে প্রচলিত নীতি-মূল্যবোধগুলির তোয়াক্কা না করা। ঢাকায় প্রকাশ্যে সেরকম কিছু করতে চাইলে তাৎক্ষণিক সামাজিক শাস্তির সমূহ সম্ভাবনা ছিল।

ঢাকা ও কলকাতার এইরকম বাস্তব পরিস্থিতিগত ফারাকের কারণেই সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, শক্তি চট্টোপাধ্যায়, শরৎকুমার মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে শামসুর রাহমানের মানসিক সাযুজ্য যতই থাকুক কবি হিসাবে তাঁদের ভূমিকার ফারাক ঘটে গিয়েছিল বিস্তর। তাছাড়া কলকাতার কবিতাপাঠকদের

সঙ্গে ঢাকার কবিতাপাঠকদের চরিত্রগত পার্থক্যও অনুধাবন না করে উপায় নেই। কলকাতা তথা পশ্চিমবঙ্গের কবিতা পাঠকদের সামনে পঞ্চাশের দশকে যেসব ব্যক্তিগত এবং সামাজিক সমস্যা ছিল সেগুলি ঢাকা তথা পূর্ব পাকিস্তানের কবিতাপাঠকদের সমস্যাবোধের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ ছিল না। ব্যক্তিস্বাধীনতাকে সুনিশ্চিত করার জন্য কলকাতায় সামন্ততান্ত্রিক বন্ধনদশার সঙ্গে সংগ্রামের তেমন কোনও প্রয়োজন ছিল না। সমাজের চোখ রাঙানির ফলে ব্যক্তির স্বাধীনতা কীভাবে খর্ব হয় কলকাতায় তরুণরা তা নিয়ে উদ্বিগ্ন হয়ে ওঠার তাগিদ অনুভব করত না। কিন্তু ঢাকার তরুণদের পক্ষে সমাজের চোখ রাঙানিকে উপেক্ষা করা তখনও সম্ভব ছিল না। ফলে কলকাতায় বিশেষ করে কবিতা-অনুরাগী তরুণদের ক্ষেত্রে (কমিউনিস্টদের কথা অবশ্য এক্ষেত্রে স্বতন্ত্র) ব্যক্তিস্বাধীনতা যখন ব্যক্তিস্বেচ্ছাচারিতায় রূপান্তরিত হচ্ছিল ঢাকায় তখনও চলছিল ব্যক্তিস্বাধীনতা অর্জনের সংগ্রাম। এরকম পরিস্থিতিতে ঢাকা এবং কলকাতার কবিতা পাঠকদের চাহিদা কিছুটা ভিন্ন প্রকৃতির হবে—সেটাই ছিল স্বাভাবিক।

ঢাকার কবিতা-পাঠকদের এই ভিন্ন প্রকৃতির চাহিদা পূরণে সক্ষম হয়েছিল 'জাদু প্রতিভার' অধিকারী শামসুর রাহমানের কবিতা। যে কারণে তিনি যখন ঢাকায় তথা পূর্ব পাকিস্তানে উত্তরোত্তর জনপ্রিয় হয়ে উঠছিলেন তখন কলকাতায় তাঁর কবিতাপাঠকের সংখ্যা বিশেষ বৃদ্ধি পায়নি। তিনি এখানে বহুলপঠিত হয়েছিলেন বাংলাদেশ সৃষ্টির প্রাক্কালে। সেটাও বিদেশি কবিদের যেসব কবিতার সর্বজনীন আবেদন সর্বত্র প্রশংসিত হয় শামসুর রাহমানের বেলাতেও অন্তত এই কলকাতায় সেইরকমই ঘটেছিল। তিনি বাংলা ভাষার কবি ছিলেন বটে কিন্তু ভারতের বাংলাভাষী পাঠকদের কাছে তাঁর কবিতার কন্টেন্টের কারণেই তাঁর পক্ষে খুব বেশি আপনজন হয়ে ওঠা সম্ভব হয়নি।

আপনজন হয়ে ওঠার পথে তাঁর কবিতায় ব্যবহৃত মুসলিম অনুষঙ্গও কিছুটা বাধা হিসাবে কাজ করেছে। মুসলিম অনুষঙ্গ নজরুল ইসলামের কবিতাতেও ছিল প্রভূত পরিমাণে। তবুও প্রাক্-স্বাধীনতা পর্বের বাংলায় হিন্দু-মুসলিম উভয় সম্প্রদায়ের পাঠকদের কাছে আপনজন হয়ে ওঠায় সেটা বাধা হয়ে দাঁড়ায়নি। কারণ তখন পরাধীনতার জোয়াল থেকে মুক্ত হওয়ার আকাঙ্ক্ষার প্রাবল্য ছিল। যে আকাঙ্ক্ষার প্রবল প্রতিফলন ছিল নজরুলের কবিতায়। তাই তাঁর কবিতার মুসলিম অনুষঙ্গগুলি অন্তত সেই সময়টায় অপরিচয়ের ব্যবধান রচনায় কোনও ফ্যাক্টর হয়ে ওঠেনি। কিন্তু দ্বিধাবিভক্ত হয়ে দেশ স্বাধীন হওয়ার ফলে সেই আকাঙ্ক্ষা-পূরণের পরবর্তী পর্যায়ে পাকিস্তান এবং ভারতের কবিতাপাঠকদের মানসিকতায় ফারাক গড়ে ওঠে বিস্তর। ফলে শামসুর রাহমানের কবিতার মুসলিম অনুষঙ্গ ভারতের বাংলাভাষীদের মনে ভিন্ন পরিবেশের বার্তা বহন করে আনে।

যদিও এখানকার মুসলিম বাংলাভাষীদের মধ্যে সেটা ভিন্ন পরিবেশের বার্তা ছিল না কিন্তু আজও তাদের মধ্যে শামসুর রাহমানের কবিতার রসগ্রাহী পাঠকের সংখ্যা নগণ্য। তেমন পাঠক যেহেতু মূলত হিন্দু বাংলাভাষীরাই তাই মুসলিম এবং পূর্ব পাকিস্তানি অনুষঙ্গের কারণে তাঁর কবিতার আবেদন এখনকার পাঠকদের স্পর্শ করেছে খুব সামান্যই। অবশ্য জন্মসূত্রে যেসব বয়স্ক এবং মনস্কপাঠক পূর্ব বাংলারই মানুষ, শামসুর রাহমানের কবিতা তাঁদের স্পর্শ করেছে অপেক্ষাকৃত একটু গভীরভাবেই। তবুও একথা স্বীকার না করে উপায় নেই সর্বজনীন আবেদনের অনেক কবিতা শামসুর রাহমানের হাত দিয়ে বেরলেও তাঁর বেশিরভাগ কবিতার কন্টেন্ট তাঁকে মূলত পূর্ব পাকিস্তান এবং পরবর্তীতে বাংলাদেশের কবি হিসাবেই চিহ্নিত করেছে। বাংলাদেশে তাঁর জনপ্রিয়তার রহস্য নিহিত রয়েছে এইখানটাতেই। তিনি বাংলা ভাষার প্রধান কবি নিঃসন্দেহে, কিন্তু চেষ্টা করলেও ভারতের বাংলাভাষীদের মধ্যে তাঁকে বাংলাদেশের মতো জনপ্রিয় করে তোলা সম্ভব নয়।

কিন্তু জনপ্রিয় না করা গেলেও ভারতীয় বাংলাভাষীদের মধ্যে যাঁরা সংবেদনশীল মনস্কপাঠক তাঁরা অনায়াসেই শামসুর রাহমানের সুদীর্ঘ সময়ের কাব্যচর্চার অনুসরণে পূর্ব পাকিস্তান এবং পরবর্তীকালে বাংলাদেশের নতুন দিনের স্বপ্নদেখা মানুষদের আশা-আকাঙ্ক্ষা, দুঃখ-বেদনা, স্বপ্ন এবং স্বপ্নভঙ্গের হতাশাকে উপলব্ধি করতে পারবেন। অবশ্য সেজন্য তাঁদের খেয়াল রাখতে হবে এই নতুন দিনের স্বপ্নদেখা মানুষদের একটা বড় অংশই সুশিক্ষিত, পরিশীলিত তাঁদের সাহিত্যরুচি, অনুসন্ধিৎসা তাঁদের বিশ্বজোড়া। জ্ঞানরাজ্যের এই অনুসন্ধিৎসু পাঠকদেরও কাব্যপিপাসাকে শামসুর রাহমান তৃপ্ত করতে পেরেছিলেন। শুধু কবির 'জাদু প্রতিভা' বলে সেটা সম্ভব হয়নি। বুদ্ধদেব বসু, বিষ্ণু দে, সুধীন্দ্রনাথ দত্ত, অমিয় চক্রবর্তী প্রমুখের বৈদগ্ধ্যেরও উত্তরাধিকারী ছিলেন শামসুর রাহমান। যদিও তাঁর কবিতা বৈদগ্ধ্যের ভারে কখনও ভারাক্রান্ত হয়নি। কারণ, সহজাত 'জাদু প্রতিভা' বলে আহরিত জ্ঞানভাণ্ডারকে তিনি আত্মস্থ করেছিলেন এবং আপন সৃজনীপ্রতিভার জারকরসে সেসব জারিত করে যেভাবে কবিতার অবয়ব নির্মাণ করেছেন তা নিঃসংশয়ে বাংলাভাষার নিজস্ব সম্পদ হয়ে উঠতে পেরেছে। তাই বিশ শতকে পঞ্চাশের দশকে বাংলাভাষার মেজর কবিদের মধ্যে শামসুর রাহমানের ভূমিকা অনন্য হয়ে উঠতে পেরেছে।

(আগামী সংখ্যায় থাকবে শামসুর রাহমান সম্পর্কে তরুণ সান্যালের প্রবন্ধ।)

স্মরণে

মীজানভাই

শৈলেশকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

সম্পাদকের নামে পত্রিকা! এমন বিচিত্র ব্যাপার তো খুব একটা দেখা যায় না। 'মীজানুর রহমানের পত্রিকা' হাতে পেয়ে সর্বাগ্রে সেই কথাটাই মনে পড়েছিল। গত খ্রিস্টীয় শতাব্দীর ছয়ের দশকের শেষ দিকের কথা। বঙ্গসাহিত্য সমালোচনার ক্ষেত্রে আমার গুরু পরলোকগত অধ্যাপক জিতেন্দ্রনাথ চক্রবর্তীর উৎসাহে এবং তাঁর কাছে নাড়া বেঁধে তাঁরই অভিভাবকত্বে 'কথা সাহিত্য' পত্রিকার এক অত্যন্ত আকর্ষক ফিচার 'সাময়িক সাহিত্য পরিক্রমা'-য় নানা পত্রিকার সমালোচনা লিখছি। অবশ্যই গুরু-নির্ধারিত এক ছদ্মনামে। এই সুবাদে কথা সাহিত্য-এর দপ্তরে আরও অনেক পত্র-পত্রিকার সঙ্গে ভানুবাবুর কাছ থেকে ওই পত্রিকাটিও পেয়েছিলাম।

কৌতুহলী মনে পত্রিকাটি পড়ে ফেললাম। দেখি যেমন তার প্রবন্ধসম্ভার, তেমনই তার সম্পাদকীয়। সজনীকান্ত দাসের মানসপুত্র (অথবা জ্যেষ্ঠাগ্রজ) গোপালদার জবানিতে সম্পাদকীয়তে নরমে-গরমে সরসতার স্বাদ বহু দিন ধরেই আস্বাদন করে আসছি। কিন্তু মীজানুর রহমানের সম্পাদকীয়ের মাধুর্যের স্বাদ ভিন্ন জাতের। সে যেন একেবারে স্পঞ্জ রসগোল্লা। মিষ্টি, গরম এবং গোদুগ্ধের খাঁটি ছানার হওয়ায়, পুষ্টিকরও বটে। গোপালদার জবানির সরসতা যেস্থলে গুরুগম্ভীর—দেশের সমাজ-সংস্কৃতি-রাজনীতি ও ভবিষ্যৎ-ভাবনায় ওতপ্রোত, মীজানুর রহমান সেখানে পরিচিত মানুষজন, পরিবেশের থেকেই তাঁর সরসতার উপাদান খুঁজে নেন। সম্পাদকীয়ের প্রতিটি রচনাই সানুকম্পা মানবীয়, সংবেদনশীলতায় ভরা, গীতায় যে 'অদ্বেষ্টা সর্বভূতানাম্' বলা হয়েছে, তার অনুসরণে সম্পাদক ও তাঁর সম্পাদকীয় পরিচিত-অপরিচিত সবার প্রতিই প্রেম ও প্রীতিরসে ওতপ্রোত। আর সেই সদানন্দ বৃত্তিই ফুটে বেরচ্ছে সম্পাদকের কড়চায়। আবার বিভিন্ন লেখকের প্রবন্ধগুলির সঙ্গে প্রকাশিত একই সম্পাদক রচিত দুই একটি সম্পাদকীয় টিপ্পনী যখন পড়ি, দেখি তাতে প্রজ্ঞা ও ভূয়োদর্শনের হীরকদ্যুতি, তা সে ভাষা-বিজ্ঞান বা শব্দতত্ত্বই হোক, অথবা রাজনীতি, সাহিত্য-সমাজ-বিজ্ঞান-ইতিহাস, সাহিত্য-সমালোচনা, বাংলা-ইংরাজি-আরবি-ফারসি-উর্দু শব্দ বা তার অভিধান সংক্রান্ত কোনও প্রসঙ্গ। সম্পাদকীয় ক্ষুদ্রায়তন টিপ্পনীসহ প্রবন্ধকারের উপস্থাপিত মূল বিষয়কে পাঠকের কাছে এত শিক্ষামূলক ও প্রাঞ্জল করে তুলতে পারে—এর নমুনা আগে কখনও দেখিনি। সাময়িক সাহিত্য পরিক্রমা-য় পত্রিকাটির ভূয়সী প্রশংসা করেছিলাম, বলাই বাহুল্য, কিন্তু তার সঙ্গে সঙ্গে আমি পত্রিকা ও তার অদেখা সম্পাদকের প্রেমে পড়ে গেলাম। 'মিত্র ও ঘোষ'-এ গেলেই ভানুবাবুকে তাগাদা দিই, 'মীজানুর রহমানের পত্রিকা' এসেছে কি না? কখনও পাই। অধিকাংশ সময়ই পাই না। কারণ, পূর্ব পাকিস্তান বা বাংলাদেশ যে নামেই পরিচিত হোক না কেন, আত্মার আত্মীয়দের সঙ্গে সহজ-সাবলীল যোগাযোগ সম্পর্ক বোধহয় কোনও দেশের সরকারি কর্তৃপক্ষই চান না।

আর কর্মসূত্রে আমাকে সাতের দশকের প্রথম দিকে দীর্ঘকালের জন্য কলকাতা ছাড়তে হল। নিয়মিতভাবে 'সাময়িক সাহিত্য পরিক্রমা' রচনা আর সম্ভব নয়। সুতরাং 'মীজানুর রহমানের পত্রিকা'-র রসাস্বাদানের ভবিষ্যৎ আকাঙ্ক্ষা অপূর্ণই রয়ে গেল। তবু পত্রিকার সঙ্গে সঙ্গে তার সহস্রবুদ্ধি সম্পাদকের নামটা মনে স্থায়ী দাগ কেটে রয়েই গেল। থেকে থেকে মীজানুর রহমান নামটি মনে পড়ত।

অবশেষে আকস্মিকভাবে খোদ সম্পাদকপ্রবরের সঙ্গে পরিচয় হয়ে গেল। সালটা ১৯৯৪। বছরের গোড়ায় দিল্লির এক প্রমুখ সর্বভারতীয় গান্ধীজির নামাঙ্কিত স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠানের সম্পাদক হিসাবে শুভেচ্ছা সফরে বাংলাদেশে গেছি। সৌভাগ্যক্রমে ঢাকার ভারতীয় হাইকমিশনারের নামে একটি পরিচয়পত্র থাকায় তাঁর সৌজন্যে হাইকমিশনের সংস্কৃতি-বিষয়ক সুযোগ্য অফিসার ড. খেয়া ভট্টাচার্যের হাতে আমাকে সঁপে দেওয়া হয়েছে। তিনি নিজে যতটা পারেন, আমাকে ওখানকার সাহিত্যিক-শিল্পী ও অন্যান্য সংস্কৃতিক্ষেত্রের নায়কদের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিচ্ছেন। আর অতিরিক্ত হিসাবে সঙ্গী করে দিলেন হাইকমিশনের

বাংলা পত্রিকা 'ভারত-বিচিত্রা'-র সম্পাদক প্রখ্যাত কবি বেলাল চৌধুরীর সঙ্গে। তিনি আমাকে এক দিন বিকেলে নিয়ে হাজির হলেন ওঁদের প্রখ্যাত শিল্পী পরলোকগত কামরুল হাসানের স্মৃতিসভায়। সভা শুরু হবার পূর্বেই আমরা পৌঁছেছিলাম। কিন্তু ইতিমধ্যে শিল্পীর গুণগ্রাহী বেশকিছু অন্তরঙ্গজন উপস্থিত হয়েছিলেন। একে একে তাঁদের সঙ্গে পরিচয় করাতে করাতে হঠাৎ শ্রোতাদের প্রথম সারিতেই মীজানুর রহমানের দেখা পেলাম। খপ করে আমার হাত ধরে 'শৈলেশদা!' সম্বোধনে মীজানভাই আমাকে তাঁর পাশেই বসালেন। আর সেই যে হাত ধরে হৃদয়ের বন্ধন বাঁধা হল, তা অনতিবিলম্বে পারিবারিক বন্ধনে পরিণত হল।

এইখানে বলে রাখা ভাল যে মীজানভাইদের বন্ধু-মিত্র সবাই আদর্শগত ভাবে মুক্তিযুদ্ধপন্থী। অর্থাৎ অসাম্প্রদায়িক গণতন্ত্রপ্রেমী। ওঁদের দেশের সংখ্যালঘুদের প্রাণ দিয়ে নিরাপত্তাবিধানের সঙ্গে সঙ্গে বাংলাদেশ-ভারতের মধ্যে সম্পর্ক স্থাপনায় বিশ্বাসী ও উদ্যোগী। আমিও তাই তাঁর মধ্যে মনের মানুষ খুঁজে পেলাম। সেবারে তাঁর সৌজন্যে ওদেশের একই ভাবনায় ভাবিত বিশিষ্টজনদের সঙ্গে পরিচয়ের সঙ্গে সঙ্গে তাঁর কাছ থেকে তাঁর পত্রিকার কয়েকটি খণ্ড উপহার পেলাম। আর তাতেই দেখলাম মীজানভাই সব্যসাচী। কলমের প্রবন্ধ ও ছড়া কবিতার মতো তাঁর তুলিও চলে সমান তালে।

দিল্লি থাকতে থাকতেই তাঁর পত্রিকার কয়েকটি বিশেষ সংখ্যাও উপহার পেলাম। পাখি, নদী, গণিত, বিদ্যাসাগর ও ওঁদের সমভাবে ভাবিত বিখ্যাত কবি শামসুর রাহমান প্রমুখের ঢাউস আকারের বিশেষ সংখ্যাগুলি নেড়ে-চেড়ে স্থির বিশ্বাস জন্মালো যে ভদ্রলোক বদ্ধ পাগল। নচেৎ এত খরচ করে পত্রিকার এমন সুমুদ্রিত, অলঙ্কৃত সংখ্যা কি কেউ প্রকাশ করে? কয়জন এত দামি বিশেষ সংখ্যা কিনবে? কিন্তু তাঁর সঙ্গে দেখা হতে জানলাম যে আমার অনুমান ভ্রান্ত। তাঁর বিশেষ সংখ্যার অধিকাংশই বিক্রি হয়েছে। গ্রাহকদের চাহিদায় দুই একটির পুনর্মুদ্রণও করতে হয়েছে। বুঝলাম—পাঠকের চাহিদাই কেবল পত্রিকার মান নির্ণয় করে না। পত্রিকার উচ্চমানও পাঠকদের রুচি ও চাহিদার মানোন্নয়ন করে।

মীজানভাই গৃহ বা স্বস্থান বন্দি হয়ে সম্পাদকত্বে বিশ্বাসী ছিলেন না। তিনি ভারতীয় সংস্কৃতির অখণ্ডতায় আস্থাবান ছিলেন বলে কেবল কলকাতায়, যেখানে বাল্যকাল ও কৈশোরের সতেরোটি বছর একটানা কাটিয়েছিলেন—থেকে থেকে আসতেন না, ভারতের অন্যান্য অঞ্চলও ঘুরে দেখতে চাইতেন। আর এ বিষয়ে আমাদের বউমা নূরজাহান বেগম ছিলেন তাঁর যথার্থ সহধর্মিণী। সত্যি কথা বলতে কি ক্ষীণস্বাস্থ্য মীজানভাই এত সফর করতেই পারতেন না যদি না বৌমা তাঁর অমনভাবে হেফাজত না করতেন। আর দিল্লিতেই নয়, লখনউ, জয়পুর, আজমীঢ়, বাঙ্গালোর প্রভৃতি বহু জায়গায় আমার পরিচিতজনদের সঙ্গে তাঁরও বন্ধুত্ব করিয়ে দিতে পেরেছিলাম বলে তাঁদের এই সব সাময়িক ভ্রমণে সহায়তা হত। সব ঠাঁই যে তাঁদের ঘর আছে—এইসব ভ্রমণ শেষে তাঁর সম্পাদকীয় কড়চাতে তার সরস ও সচিত্র (বউমা ভাল রাঁধুনির সঙ্গে সঙ্গে ভাল ফোটোগ্রাফারও বটে) বিবরণ বেরত।

এর মধ্যে (তেসরা আগস্ট, ১৯৯৪) তাঁর মুক্তার মতো হাতের লেখায় তাঁর মতে 'সামান্য' কিন্তু আমার মতে অসামান্য গ্রন্থ 'কমলালয়া কলকাতা' উপহার পেলাম। কলকাতা-বিশেষজ্ঞ রাধাপ্রসাদ গুপ্ত মহাশয়ের (মীজানভাই-এর শাঁটুলদা)। 'কলকাতার ফিরিওয়ালার ডাক আর রাস্তার আওয়াজ' গ্রন্থটি পড়ে তাঁর বাল্যকালের গড়পাড়, মির্জাপুর ও বউবাজার অঞ্চলের বাল্যস্মৃতি জেগে উঠল। কেবল ফিরিওয়ালা বা রাস্তার আওয়াজই নয়, রাস্তার রূপ রস গন্ধ, তার বিচিত্র অধিবাসী, তাদের সখ আহ্লাদ ও আশাভঙ্গের অপূর্ব আখ্যানমালা বাল্যস্মৃতির মণি-কুঞ্চিকা থেকে বার করে তিনি ক্রমে ক্রমে প্রকাশ করলেন তাঁর পাকা হাতের স্কেচ সহ। বাংলাদেশ ও পশ্চিমবঙ্গের পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত সেইসব রসাল রচনা এমন সাড়া জাগাল যে কলকাতার ৩০০ বৎসর পূর্তি উপলক্ষে (আইনত কলকাতার জন্মদিন থাক বা নাই থাকত) প্রকাশিত হল এক আদ্যন্ত কলকাতাপ্রেমীর ওই সচিত্র কাহিনি—'কমলালয়া কলকাতা'। প্রখ্যাত সাহিত্যিক গজেন্দ্রকুমার মিত্র তাঁকে 'মুজতবা আলীর সুযোগ্য শিষ্য' আখ্যা দিলেন। আরও অনেক বিশিষ্টজন তাঁর ওই অমূল্য কৃতিকে নানাভাবে অভিনন্দন জানালেন। এ এমন এক সরস ও তথ্যঋদ্ধ রচনা যা বার বার পড়লেও পুরাতন হয় না।

এমনইভাবে একদিন চমকে উঠলাম পত্রিকায় তাঁর ১৯৪৬ খ্রি. ১৬ই আগস্টের দাঙ্গার স্মৃতিচারণের একটি কিস্তি পাঠ করে। আমি স্বয়ং ভারত-বিভাজনের সূচনাকারী ওই দাঙ্গার গুরুত্ব উপলব্ধি করে তার এবং সঙ্গে সঙ্গে ভারতের তাবৎ হিন্দু-মুসলমান সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার পাঠকের প্রশ্রয়ধন্য ইতিহাস রচনা করেছি। কিন্তু দাঙ্গার প্রত্যক্ষদর্শীর (এবং তাঁর জবানবন্দি অনুসারে 'অংশগ্রহণকারী') এমন নিবিড় স্মৃতিচারণ এর পূর্বে পড়িনি। অবিলম্বে তাঁকে জানালাম যে যথাসম্ভব শীঘ্র তিনি সবটা লিখে গ্রন্থাকারে প্রকাশের ব্যবস্থা করুন। মীজানভাই লেখার ব্যাপারে কেবল perfectionist নন, আড্ডাসহ আরও নানা কাজে সদাব্যস্ত থাকলেও অবশেষে সেই গ্রন্থ প্রকাশিত হল। গত বছর 'বিশ্বকোষ পরিষদে'র সম্পাদক পার্থ সেনগুপ্তের উদ্যোগে তার একটি

কলকাতা সংস্করণও প্রকাশিত হয়েছে। এতেও সেই তথ্য, গভীর সামাজিক বীক্ষণ ও বিশ্লেষণের সঙ্গে সঙ্গে মুজতবা চালে পদে পদে রসিকতা। 'জাহান্নমের আগুনে বসিয়া' এমন 'পুষ্পের হাসি' হাসার বিরল মুনসিয়ানা কদাচিৎ দেখা যায়।

কলাকাতায় ফিরে আসার পর গত তিন বছরে তাঁর সঙ্গে যোগাযোগটা ঘনিষ্ঠতর হয়। কারণ ১৯৪৭ খ্রি. ১৫ই আগস্টের পর অবস্থাগতিকে মীজানভাইকে সপরিবারে কলকাতা ছেড়ে চলে যেতে হলেও কলকাতার প্রতি তাঁর টান পূর্বেরই মতো প্রবল। এ শহরকে তিনি তাঁর 'দ্বিতীয় জন্মভূমি' আখ্যা দিতেন। কোনও সময়ে আমাদের দেখা সাক্ষাৎ, গল্পগুজব ছাড়াও একত্র খাওয়া দাওয়া (হয় তাঁদের সাময়িক বাসস্থানে আর নচেৎ আমাদের বাড়িতে) চলত। নিত্য নতুন বন্ধু জোটাতে তাঁর সমকক্ষ কেউ ছিল না। মাঝে মাঝে বন্ধুদের সম্বন্ধে খবর না দিয়েই তাঁদের দু'চারজনকে নিয়ে চলে আসতেন। তাঁর বিশ্বাস ছিল—সবাই যখন সুজন, তখন তেঁতুল পাতায় নয়জন কেন, নিরানব্বই জনেরও চলে যাবে। মনে-প্রাণে বসুধৈব কুটুম্বকম্ মানুষটি না বউমা নূরজাহান বেগম, না তিনি সদলবলে যাঁদের আতিথ্য গ্রহণ করতে চলেছেন, তাঁদের অপ্রস্তুত অবস্থার কথা চিন্তা করতেন। আর কলকাতায় এলেই পুরাতন—নতুন বন্ধুদের জন্য কিছু না কিছু উপহার নিয়ে রওনা হতেন। তবে সদানন্দ ভুলো-মন মানুষটি উপহার নিয়ে রওনা হলেই যে উদ্দিষ্ট ব্যক্তিটির হাতে সে উপহার পৌঁছাবে, তার অবশ্য নিশ্চয়তা ছিল না। এই তো বছর দুই পূর্বে বৌমাসহ আমাদের বাড়ি এসে জানালেন, দাদা আপনার জন্য যে পার্কার কলমটি নিয়ে আসছিলাম আমার দরকারি কাগজপত্রসহ একটি ব্যাগে ঢাকা বিমানবন্দরে সেটা ফেলে রেখেই বিমানে উঠে পড়েছি। কলকাতা থেকে ঢাকা বিমানবন্দরে খবর পাঠিয়েছি। ব্যাগটি পাওয়া গেলেই আপনার জন্য শখ করে কেনা পার্কার কলমটিও পাওয়া যাবে। পার্কার কলমে লেখার স্বপ্নও আমি কখনও দেখিনি। আর রবীন্দ্রনাথ কর্তৃক ব্যঙ্গচ্ছলে উল্লেখিত আমি সেই গোত্রের লেখকও নই যাঁরা মনে করেন যে ভাল ফাউন্টেন পেন পেলেই তাঁরা মহাকাব্য রচনা করে ফেলবেন। নচেৎ সেই পার্কার কলমটি যার হস্তগত হয়েছিল, এতদিনে তার রচিত মহাকাব্যের খবর পাওয়া যেত।

এবারেও চোখ দেখানোর জন্য এলেন বউমাসহ জুনের প্রথমদিকে। পনেরোই জুন ফোনে বউমার খুশিভরা কণ্ঠস্বর, তাঁরা কমলালয়া কলকাতায়। সাম্প্রতিক পত্রিকাসহ আমাদের দাম্পত্যজীবনের স্বর্ণজয়ন্তী পালন করার জন্য (আমরা নির্দিষ্ট দিনে গা ঢাকা দেবার সংকল্প ঘোষণা করেছিলাম বলে) তাঁরা যখন নিজেদের সময়মতো এক বিশাল কেক আমাদের বাড়িতে এনে আমাদের খাইয়ে ও খেয়ে যে আনন্দোৎসব করে গিয়েছিলেন বউমার নেওয়া সেই ফোটোর নকলও এনেছেন আমাদের জন্য। সুতরাং দেখা হওয়ার সম্ভাবনায় উভয় পক্ষই খুশি। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে সমস্যাও দেখা দিল। আমাদের বাড়ি বউমা একাধিকবার এলেও একা চলা-ফেরায় অক্ষম মীজানভাইকে নিয়ে সেই সল্টলেক থেকে চিনে আসতে পারবেন কীভাবে? ওদিকে সাম্প্রতিক অসুস্থতায় আমার পক্ষেও একা এবং সাধারণ পরিবহনব্যবস্থার সহায়তায় একেবারে দক্ষিণদিক থেকে সোজা উত্তর-পূর্বে অতটা যাওয়াও সম্ভব নয়। ভরসা ওঁদের সাম্প্রতিক কালের মুশকিল আসান বিশ্বকোষ পরিষদের পার্থ সেনগুপ্ত। তিনি মুর্শিদাবাদে ভাষা-শহিদ সালাম-বরকতদের স্মরণসভা সেরে ফেরার পরও পূর্বনির্ধারিত কাজে ব্যস্ত দিন দু'য়েক। অগত্যা 'কোরক' সম্পাদক তাপস ভৌমিক মহাশয়ের সঙ্গে ব্যবস্থা হল ২০শে জুন তিনিই নিয়ে আসবেন মীজানভাই-বউমাকে আমাদের বাড়ি। তাঁরও আসার কথা ছিল আমাদের এখানে এবং তিনি তাঁর পত্রিকাতে লেখার জন্য মীজানভাই-এর সঙ্গে ঢাকাতেই যোগাযোগ করেছিলেন। কবে হঠাৎ ওঁদের ঢাকা চলে যেতে হয় তাই ২০শে জুন দেখা হবে ভেবে যেন হাঁফ ছেড়ে বাঁচলাম।

কিন্তু ২০শে ভোরেই বউমার উচ্চকণ্ঠের ক্রন্দনজড়িত ফোন। গত রাত্রে মীজানভাই তাঁর বহুদিনের কষ্টকর ব্যধি হাঁপানিতে প্রচণ্ড আক্রান্ত হয়ে সল্টলেকেরই এক নামী-দামি নার্সিংহোমে। সান্ত্বনা দিলাম, পুরাতন ব্যধি ঠিক হয়ে যাবে দু'চার দিনে। ইতিমধ্যে পার্থবাবু (সেনগুপ্ত) হাতের কাজ সেরেই পূর্ণশক্তিতে ময়দানে নেমে পড়েছেন। নার্সিংহোমে চিকিৎসার বদলে কেবল জলের মতো ওঁদের অর্থব্যয় করাচ্ছে বলে সেখান থেকে নিয়ে এসে দক্ষিণ কলকাতার এক অভিজ্ঞ ও দরদি ডাক্তার জয়ন্ত সেন মশাহয়ের চিকিৎসাধীন করেছেন মীজানভাইকে। অবস্থা উদ্বেগজনক হলেও স্থিতিশীল। আর সল্টলেকের নার্সিংহোম যদি আজীবন কলকাতাপ্রেমী মীজানভাইকে সর্বার্থে ধনে-প্রাণে মারার ব্যবস্থা করে থাকে তো তার প্রায়শ্চিত্ত করলেন ডাক্তার জয়ন্ত সেন। শুধু চিকিৎসক হিসাবে কলকাতাকে তীর্থ-জ্ঞানকারী মানুষটির দিবারাত্র সদা-সতর্ক চিকিৎসা করেই নয়, বউমার সল্টলেক থেকে এসে মীজানভাই-এর পাশে থাকার অসুবিধা দেখে তাঁর 'কাকীমা'কে তিনি নিজের বাড়িতেই সসম্মানে থাকার ব্যবস্থা করে দিয়েছিলেন। কলকাতাপ্রেমী ও আদ্যন্ত অসাম্প্রদায়িক মীজানভাইকে তাঁর শহর ভোলেনি।

পার্থবাবু ও তাঁর গুটিকয় সহর্মীদের মীজানভাইকে সুস্থ করে দেশে ফেরত পাঠাবার চেষ্টায় দিনের বিশ্রাম ও রাতের

ঘুম এ কয় দিন ছিল না। নিজে শারীরিকভাবে অক্ষম বলে টেলিফোনেই তাঁদের কাজে যতটুক সম্ভব সাহায্য করেছি। কিন্তু রবিবার তাদের বাড়িতে ফোনেও পাওয়া সম্ভব হল না। দুরু দুরু বক্ষে অপেক্ষা করাই সার হল। অবশেষে সোমবার ২৬শে জুন ভোরে ফোন তুলতেই বউমার আর্ত ক্রন্দন, দাদা আপনার ভাই আর নেই! তাঁকে নিয়ে আর দেশে ফিরে যেতে পারব না। দীর্ঘশ্বাস ফেলে তাঁকে সময়োচিত সান্ত্বনা দিলাম। মনে মনে ভাবলাম মীজানভাই তাঁর প্রাণের শহর 'কমলালয়া কলকাতা'-য় শেষ নিঃশ্বাস ফেলতেই এসেছিলেন এবারে। যে-শহরের সঙ্গে তিনি একাত্ম হয়ে গিয়েছিলেন, শেষ সময়ে তাকে ভুলে থাকেন কী করে?

কিছু বাদে শোক ও সমবেদনায় গম্ভীর কণ্ঠে 'কোরক' সম্পাদক তাপসবাবুর ফোন। মীজানভাই এরই মধ্যে বউমাকে দিয়ে আমার জন্য তাঁর শেষ সওগাত প্রতিশ্রুত ফোটোর নকল ও পত্রিকা তাঁর কাছে রেখে গেছেন। শেষ দেখা না হলেও শেষের দিনেও আমরা তাঁর মনে ছিলাম।

পার্থবাবুর ক্ষোভ পুলিস সদ্য-পিতৃহারা মীজানভাইয়ের ছেলে স্নেহাস্পদ তারেককে দেড় ঘণ্টার মতো থানায় বসিয়ে, নানা জিজ্ঞাসাবাদ করেছে। কারণ 'বিদেশি নাগরিক'-এর অসুস্থতার জন্য কেবল ভিসার মেয়াদই শেষ হয়নি, বাসে এসে বিমানে মরদেহ নিয়ে মাতা-পুত্র যেতে চান, তার আইনি ফ্যাকড়াও অনেক। অবশেষে পার্থবাবুকে রাজ্য সরকারের এক মন্ত্রীর সহায়তায় তাড়াতাড়ি মুক্তি দেবার ব্যবস্থা করতে হয় মাতা-পুত্রকে। বোঝালাম, আইন অন্ধ। তাই মীজানভাই যে কলকাতারও ছিলেন—এটা তার চোখে না পড়ারই কথা! কিন্তু কলকাতাবাসী তো তাঁদের প্রিয় কলকাতাপ্রেমীর জন্য ব্যবস্থায় কোনও ত্রুটি রাখেননি। মনে মনে দুই দেশের নাগরিক এরকম বিরল খাঁটি বাঙালিকে মাঝে মাঝে স্মরণ করে এই প্রজাতির দেশ-জাতি-সম্প্রদায়ের ঊর্ধ্বে আদ্যন্ত বাঙালিদের সম্মানিত করে চিহ্নিত করার ব্যবস্থা বাংলা আকাদেমি বা কলকাতার আরও সারস্বত-সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানের প্রয়াসে যদি সম্ভব হয়, তবে মীজানভাইয়ের ফুলের মতো ফুটে উঠে সমগ্র জীবন বাঙালি হবার সাধনা সফল হবে।

বয়োজ্যেষ্ঠের পক্ষে প্রিয় কনিষ্ঠের শোকে স্মৃতিচারণ করা কেবল গভীর দুঃখেরই নয়, বড় দুরূহও বটে। কিন্তু তবু আরও একটু সংযোজন না করলেই নয়। মীজানভাইদের শেষ সওগাতের মধ্যে তাঁর পত্রিকার সর্বাধুনিক (এবং হয়ত বা সর্বশেষও) দুটি ৭৯ ও ৮০ তম (তেইশ বৎসরের অন্তিম ও চতুর্বিংশ বর্ষ-প্রবেশ) সংখ্যা দুটির সম্পাদকের কড়চা পড়ে ধারণা হল মীজানভাই কলকাতায় এটা তাঁর শেষ যাত্রা বুঝেই হয়ত বা এসেছিলেন। পঁচাত্তর বছর হতে না হতেই চোখের দৃষ্টি চলে গেছে। মধ্যবিত্তের পক্ষে অত্যন্ত ব্যয়বহুল, কেবল জ্যেষ্ঠাগ্রজ ও অনুজস্থানীয় গুণগ্রাহীদের অর্থানুকুল্যে কলকাতায় চোখের অস্ত্রোপচার করালেও কোনও উন্নতি হয়নি—এমন সময়ও নিজেকে নিয়ে রসিকতা করেছেন কড়চায় : 'কান বলে পার তো হিয়ারিং-এইড লও, নতুবা আড়ি পাত। এদিকে ফুসফুসকে বাগে আনা যাইতেছে না—কেবলই ফোঁস করিয়া ওঠা উহার স্বভাবে দাঁড়াইয়া গিয়াছে। এই পর্যন্ত সহা গিয়াছিল, কিন্তু মরার উপর খাঁড়ার ঘায়ের মতো চক্ষুযুগল সাঁট করিয়া লাগাতার ধর্মঘটে পরিয়াছে, জগতের আলো হইতে বঞ্চিত—প্রায় অধমের নিকট 'এ আঁধার আলোর অধিক' কবির এই চরণ উপহাসের মতো শোনায়। পড়িতে গেলে হরফগুলি ব্যালে নৃত্যের নর্তকীদের মতো সারা পৃষ্ঠা জুড়িয়া নাচিয়া কুঁদিয়া লঙ্কাকাণ্ড করিয়া বসে।' (৮০তম খণ্ড, ২০০৬)

সাহিত্যিক, সম্পাদক, কবি, চিত্রকরের দৃষ্টি ও শ্রবণশক্তি দুই-ই যদি চলে যায়, তাহলে তাঁর বাঁচার সার্থকতা কোথায়? স্রষ্টা যদি সৃষ্টি করতেই অক্ষম হন, তবে কীসের জন্য তাঁর প্রাণধারণ? মিল্টনের মতো বিরল সৌভাগ্যশালী আর কয়জন? যিনি অন্ধত্বের পরও On His Blindness অমর কাব্য এবং Paradise Lost ও Paradise Regained এর মতো মহাকাব্যের সৃষ্টি করতে পারেন? মীজানভাই তাই হয়ত বা এই দুনিয়াকে আল্ বিদা বলার জন্য তাঁর প্রাণের নগরী কলকাতাকেই বেছে নিয়েছিলেন। বিশ্বজ্ঞান-বিজ্ঞানের রাজ্যে সঞ্চারী মীজানভাইয়ের সুযোগ্য সম্পাদনায় প্রকাশিতব্য দশখণ্ডের 'বিশ্বজ্ঞানকোষ'-এর স্বপ্ন অপূর্ণই রয়ে গেল। মানুষের সব স্বপ্ন কি আর সফল হয়!

With

Best Compliments From

J. BOSECK & Co. (P) Ltd.

15/7 JAWAHARLAL NEHRU ROAD

KOLKATA-700 013

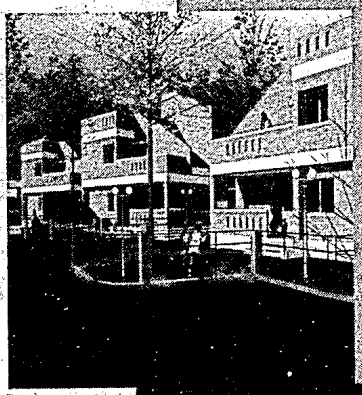
Excellence is writ large on each home that Bengal DCL builds. Be it at the 'Shree' and 'Uttara' complexes at New Town, Kolkata or the 'Kheya' Garden Homes at Santiniketan.

It's because Bengal DCL draws upon the world-class engineering and management resources of the Development Consultants Group - recognized worldwide for its excellence in executing hundreds of projects in India and abroad.

Bengal DCL's commitment to high qualilty is reflected in the design and construction of every home - conceived for the comfort, safety and privacy of your family. In clean, green and protected surroundings. With every amenity you need for happy and peaceful living.

NEW TOWN OR SANTINIKETAN

THE SAME MARK OF EXCELLENCE IN EVERY HOME





Bengal DCL

Bengal DCL Housing Development Co. Ltd.
(A Joint Enterprise of West Bengal Housing Board and DC Properties Ltd.)

1/1 Camac Street, Somnath Bldg. 4th Floor,
Kolkata - 700 016
Phone : 033 2229 2665 ; Fax : 033 2229 2665
Email : support@bengaldcl.com
Website : www.bengaldcl.com



পুজো মানে আনন্দ, সুখ, সমৃদ্ধি ও সঞ্চয়
ভবিষ্যত নিরাপত্তার বরাভয়



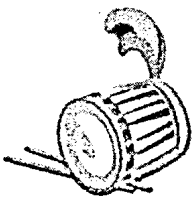
পুজো মানে সুস্থ, সুন্দর জীবন
সেইসঙ্গে রোগের নিরাময়



পুজো মানে নিজগৃহবাস
শান্তির আলয়



পুজো মানে সকলে মিলে হৈ হুল্লোড়
ভালমন্দ খাওয়া, আর প্রীতি বিনিময়

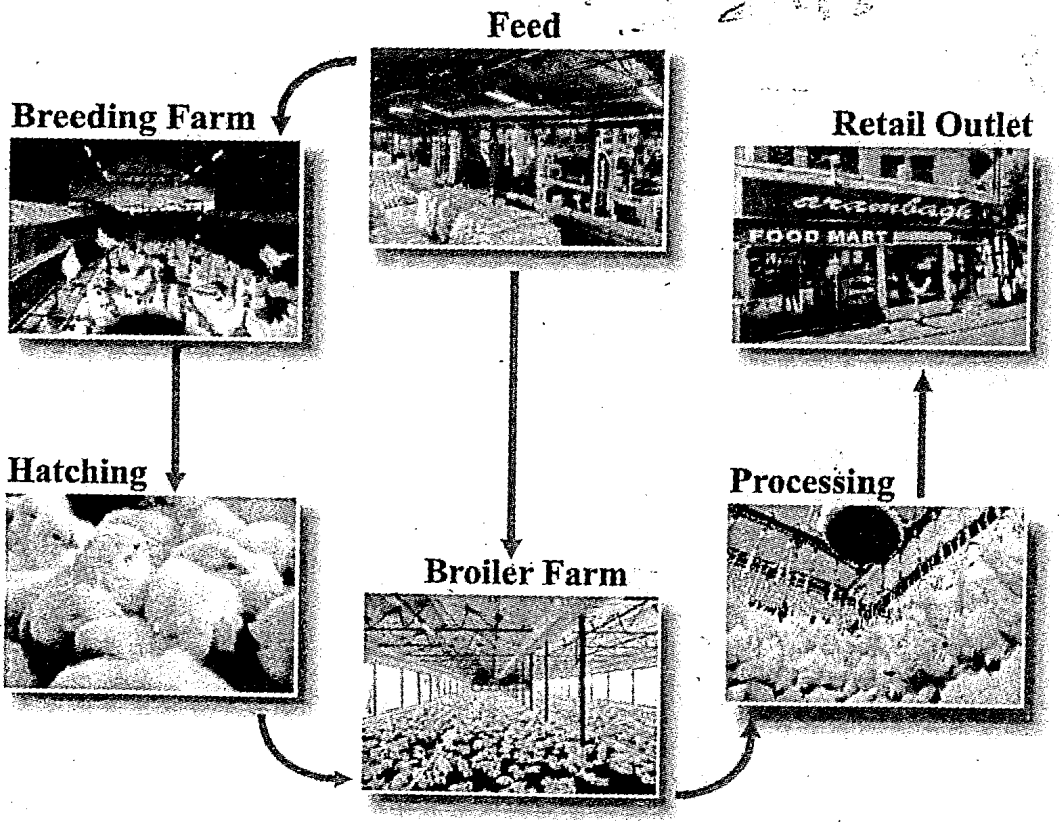


উৎসবমুখর দিনগুলি আনন্দময় হোক

Peerless™
Smart Financial Solutions

Arambagh Hatcheries Ltd.

The only fully integrated poultry organisation in India.



There is full traceability of its branded Chicken products right through the supply chain

SQF stands for- Safe Quality Food
HACCP stands for - Hazard Analysis & Critical control Points

HELP LINE
+91-9433016314

Arambagh's chicken

